দ্বিতীয়
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
১৯৮০-৮৫

পরিকল্পনা কমিশন
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা
মে, ১৯৮০

দ্বিতীয়
পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা
১৯৮০-৮৫

পরিকল্পনা কমিশন
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা
মে, ১৯৮৩

মুখবন্ধ

কিছু দিনের মধ্যে দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসর উত্তীর্ণ হবে। কেউ এ ভেবে আশ্চার্য হবেন যে এমতাবস্হায় আমরা দ্বিতীয় পরিকল্পনার চূড়ান্ত প্রতিবেদন বের করছি। ১৯৮০ সালের ১লা জুলাই দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাজ শুরু হয় এবং ঐ সময়ে খসড়া পরিকল্পনা দলিলও বের করা হয়। সত্তর দশকের পূরাভাগে তৈলের মূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক দায় পরিশোধের সমন্বয় সাধনে ফলপ্রসূ প্রচেষ্টার পটভূমিতে খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু যে সময়ে পরিকল্পনাটি প্রণীত হয় সে সময়ে বৈদেশিক সাহায্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্হায় এমন সমস্ত পরিবর্তন ঘটে যা' চরমভাবে বাংলাদেশের প্রতিকূলে যায়। পরিকল্পনার ভূমিকা অধ্যায়ে পরিকল্পনা সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা আলোচিত হয়েছে এবং তাতে সংশোধনের প্রক্রিয়া পরিষ্কার করে ব্যক্ত করা হয়েছে।

২। বর্তমান বৎসরটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্হাপনার আত্মউপলব্ধির সময়। বেসরকারী উদ্যোগ ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা গ্রহণের পুরোপুরি সুবিধাকল্পে সরকারী ও বেসরকারী খাতের মধ্যে দায়িত্বের যুক্তিসংগত ভাগাভাগি সরকারের মনোযোগকে ব্যাপৃত রেখেছে। দ্বিতীয়তঃ নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করার সাহসী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। তৃতীয়তঃ অর্থনীতিতে আর্থিক শৃংখলা রক্ষণ এবং স্হিতিশীল মুদ্রাব্যবস্হা আনয়নের জন্য এক দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। চতুর্থতঃ সরকারী কর্পোরেশনসমূহের আর্থিক ব্যবস্হাপনা অধিকতর উন্নতি লাভ করেছে। সর্বশেষে, সম্পদ প্রাপ্তি এবং অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় সংগ্রহের মাত্রার দিকে নজর রেখে বিনিয়োগ পরিকল্পিত ও নির্ধারিত করা হয়েছে। যখন এসব বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছিল সে সময়ে এক নূতন ভাবধারা যাকে 'প্রয়োগবাদ এবং রাজস্ব বস্তুতন্ত্রবাদ' বলা হয় তাকে প্রতিফলিত করার জন্য খসড়া দ্বিতীয় পরিকল্পনা সংশোধন করা হয়। তবুও পরিকল্পনাটি কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্চাভিলাষী। বলা যেতে পারে যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের লক্ষ্য, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহনকারীর লক্ষ্য অথবা মৌলিক শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্য পুরোপুরিভাবে অর্জন করা কষ্টকর। যদি উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্খাকে নিশ্চিত করতে হয় তবে এই তিন ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

৩। ব্যাপকতম অর্থে পল্লী উন্নয়নই হল পরিকল্পনার চূড়ান্ত প্রতিবেদনের মূল লক্ষ্য। পল্লী উন্নয়নের নূতন ভাব ধারায় স্হানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তার বাস্তবায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পল্লী উন্নয়ন কর্মকৌশলের ভিত্তি প্রস্তর হল পল্লী এলাকায় কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি এবং একই সাথে চাকুরীর সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা। পরিকল্পনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল খাদ্যশস্য উৎপাদনের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জন করা এবং আশা করা হচ্ছে যে সেচ নির্ভর কৃষি কর্মকৌশলের মাধ্যমে পল্লী এলাকায় বিপুল সম্পদ নিয়োজন এবং বিপুল পরিমাণ কর্ম-সংস্হানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। কিন্ত এ পদক্ষেপ যথেষ্ট নয়। কর্মসংস্হানের জন্য অন্যান্য খামার বহির্ভূত কার্যক্রমসমূহে এবং বিশেষ করে অবকাঠামো তৈরীতে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা উচিত। আগামী বৎসরের শেষ দিকে নির্বাচিত থানা পরিষদসমূহ দেশব্যাপী বৃহৎ আকারে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করার আশা পোষণ করছে। উন্নয়নের উদ্দেশ্যে নয় কোটি তিরিশ লক্ষ লোকের সংগঠন কঠিন হতে পারে, তবে আমাদের সরল আশা যে বাংলাদেশের বিভিন্ন থানার দুই শত হাজার লোকের ইউনিটের সংগঠন সাফল্য মন্ডিত হবে।

৪। অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ বিশ্বের প্রতিকূল অবস্থার প্রেক্ষাপটে পরিকল্পনার চূড়ান্তকরণ পরিকল্পনাবিদদের জন্য একটি মিশ্র অভিজ্ঞতা। দেশের মধ্যে যেখানে দারিদ্র সর্বদাই ব্যাপ্ত, বেকারত্ব দীর্ঘ স্থায়ী, অপুষ্টিহীনতা ব্যাপকতর এবং শিক্ষাহীনতার অভিশাপ বিদ্যমান—সেখানে আশা-নিরাশার এরূপ পরিবেশে পরিকল্পনাবিদদের কাজ ঝুঁকিপূর্ণ—হতাশার পাশাপাশি দুর্বল আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিবেশ এবং একটি জাতির আশা যা' একটি সুন্দর জীবনের জন্য অনেক উচ্চ মূল্যে অর্জন করা হয়েছিল। ইহা এমন এক দেশ যেখানে আশাবাদের কোন বিকল্প নেই—আশা ব্যতীত এ প্রবঞ্চনাকে অতিক্রম করা সম্ভব নয় যা' এ দরিদ্র দেশটির লক্ষাধিক লোককে ঘিরে আছে। আমিও আশাবাদী যে লক্ষাধিক লোকের ভাগ্য উন্নয়নে আমাদের পরিকল্পনাবিদ, প্রযুক্তিবিদ, উন্নয়ন প্রশাসকবৃন্দ, জননেতা এবং আমাদের দাতাবৃন্দের এ পরিকল্পিত প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে। সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে নিশ্চয়ই আলো থাকবে এই আশাকে আমরা উন্নয়ন প্রক্রিয়া বলব।

এ, এম, এ, মুহিত
অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী।
২৯-৫-১৯৮৩

সূচীপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
ভূমিকা	.. ..	ক
	প্রথম ভাগ ঃ পরিকল্পনা কাঠামো	
১।	পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পর্যালোচনা	১
২।	দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্যোক্তাগী ও কৌশলাদি ..	২৯
৩।	পরিকল্পনার আকার, লক্ষ্যসমূহ ও খাতওয়ারী বরাদ্দ ..	৪৩
৪।	অভ্যন্তরীণ সম্পদসমূহ	৫৯
৫।	বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য ও বহিঃসম্পদ ..	৭৭
৬।	পল্লী উন্নয়ন	৯৫
৭।	কর্ম সংস্থান ও জন সম্পদ উন্নয়ন	১০১
৮।	বেসরকারী খাতের ভূমিকা	১১১
৯।	পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও মনিটরিং ..	১২৭
	দ্বিতীয় ভাগ ঃ খাতওয়ারী কর্মসূচী	
১০।	কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী উন্নয়ন	১৩৫
১১।	শিল্প ও খনিজ সম্পদ	১৮৯
১২।	জ্বালানী ও প্রাকৃতিক সম্পদ	২০৫
১৩।	পরিবহণ ও যোগাযোগ	২২৯
১৪।	ভৌত পরিকল্পনা ও গৃহায়ন	২৭৫
১৫।	শিক্ষা, ধর্মীয় বিষয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত গবেষণা ..	২৯১
১৬।	স্বাস্থ্য	৩৩৬
১৭।	জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা	৩৫৭
১৮।	আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো	৩৭৭
১৯।	জনশক্তি ও শ্রম	৩৯৭
২০।	জন প্রশাসন	৪১১
২১।	থানা (উপজেলা) উন্নয়ন	৪২৬

বিস্তারিত সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
	ভূমিকা :	ণ
	*অন্তর্গত লক্ষ্যমাত্রা	ণ
	*বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য	ন
	*অভ্যন্তরীণ সম্পদ এবং পরিকল্পনার অর্থসংস্থান	ন
	*খাতওয়ারী বরাদ্দ	ব
	*প্রবৃদ্ধির হার	শ
	প্রথম ভাগ : পরিকল্পনার কাঠামো	
প্রথম অধ্যায় :	পরিকল্পিত উন্নয়ন পর্যালোচনা	১
	*সূচনা : সামগ্রিক পরিস্থিতি	১
	*প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩—৭৮)	২
	*দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮—৮০)	৪
	*প্রবৃদ্ধির হার, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ	৫
	*খাতওয়ারী উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি	১৭
	*কর্মসংস্থান	১৯
	*মূল্য ও আয় পরিস্থিতি	১৯
	*বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য ও বহিঃসম্পদ	২৩
	*সরকারী খাতের ব্যবস্থাপনা	২৬
দ্বিতীয় অধ্যায় :	দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী ও কৌশলাদী ...	২৯
	*পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী	২৯
	*পরিকল্পনার কৌশলসমূহ	৩২
	*দীর্ঘ-মেয়াদী প্রেক্ষিত	৪১
তৃতীয় অধ্যায় :	পরিকল্পনার আকার, লক্ষ্যসমূহ ও খাতওয়ারী বরাদ্দ ...	৪৩
	*পরিকল্পনার আকার	৪৩
	*বেসরকারী খাতের উপর গুরুত্ব	৪৪
	*পরিকল্পনার অর্থ সংস্থান	৪৪
	*উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা	৪৬
	*খাতওয়ারী বরাদ্দ	৪৭
	*সাবিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, প্রবৃদ্ধি ও ভোগ	৫০
	*উৎপাদনে লক্ষ্যমাত্রা	৫৩
	*পরিকল্পনার পর্যালোচনা	৫৬

		পৃষ্ঠা
চতুর্থ অধ্যায় :	অভ্যন্তরীণ সম্পদসমূহ	৫৯
	°রাজস্ব ও আর্থিক উদ্দেশ্যাবলী	৬৫
	°সরকারী খাতে অর্থসংস্থান	৬৫
	°বাড়তি সম্পদ সংগ্রহ	৭০
	°বেসরকারী সঞ্চয় সংগ্রহ	৭২
পঞ্চম অধ্যায় :	বৈদেশিক লেন-দেনের ভারসাম্য ও বহিঃসম্পদ	৭৭
	°বহিঃসম্পদ খাতের একটি পর্যালোচনা	৭৭
	°বৈদেশিক লেন-দেনের ভারসাম্য নীতিকৌশল	৭৯
	°আমদানীমূলক পরিশোধ ব্যবস্থা	৮০
	°রপ্তানী আয়	৮৫
	°অদৃশ্য আয় ও ব্যয়	৮৮
	°ব্যক্তিগত আয় স্বদেশে প্রেরণ	৮৮
	°বৈদেশিক মূলধন প্রবাহ	৯০
	°বৈদেশিক সাহায্যের গঠন ও পদ্ধতি	৯১
	°বাণিজ্য নীতি সংক্রান্ত বিষয়াবলী	৯২
ষষ্ঠ অধ্যায় :	পল্লী উন্নয়ন	৯৫
	°গ্রামীণ বাংলাদেশ	৯৫
	°প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার পর্যালোচনা ..	৯৬
	°দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা	৯৭
	°কৌশল ও নীতিমালা	৯৮
সপ্তম অধ্যায় :	°কর্মসংস্থান ও জনসম্পদ উন্নয়ন	১০১
	°বেকার সমস্যার প্রকৃতি	১০২
	°কর্মসংস্থান ও প্রযুক্তি	১০৪
	°জনসম্পদ উন্নয়ন	১০৫
	°কর্মসংস্থান ও জনসংখ্যা	১০৭
	°কর্মসংস্থান সম্ভাবনা ও বিনিয়োগ কর্মসূচী	১০৭
	°বিদেশে কর্মসংস্থান	১১০
অষ্টম অধ্যায় :	বেসরকারী খাতের ভূমিকা	১১১
	°কালের পেক্ষিতে বেসরকারী খাতের প্রদত্ত ভূমিকা	১১১
	°শিল্প নীতিতে পরিবর্তন	১১১
	°দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় বেসরকারী বিনিয়োগ	১১৮
	°সাধারন নীতি সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয় .. .	১২০
	°শিল্প খাতের নীতিসমূহ	১২১

		পৃষ্ঠা
	°বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগ	১২২
	°কৃষি, পরিবহন ও গৃহসংস্থান নীতিমালা	১২৩
	°বেসরকারী সম্পদ সংগ্রহ	১২৪
নবম অধ্যায় :	**পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও মনিটরিং**	১২৭
	°পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন প্রক্রিয়া	১২৭
	°বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী	১২৮
	°প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়া	১৩০
	°তহবিল প্রবাহ	১৩০
	°কারিগরী সাহায্য কর্মসূচী প্রণয়ন	১৩১
	°আদেশ প্রদানে বিলম্ব	১৩১
	°পরিকল্পনা সেল	১৩২
	°বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন	১৩২
	°বেসরকারী খাতের বাস্তবায়ন	১৩২
	অংশ ঃ খাতওয়ারী কর্মসূচী	
দশম অধ্যায় :	**কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী উন্নয়ন**	১৩৫
ক-	**কৃষি .. ..**	১৩৫
	°কৃষি খাতের উদ্দেশ্যাবলী	১৩৫
	°কৃষি উন্নয়ন কৌশলের সমস্যাবলী	১৩৫
	ফসল	১৩৭
	°খাদ্যশস্য	১৩৭
	°খাদ্য নীতি	১৩৮
	°অন্যান্য ফসল	১৩৯
	°ভূমি ব্যবহার	১৪২
	°চাষাবাদের ধারা	১৪৩
	°সেচ সুবিধেযুক্ত কৃষি	১৪৪
	°বর্ষানির্ভর কৃষি	১৪৪
	°প্রযুক্তি উপকরণ কার্যক্রম	১৪৪
	°মজুদ কার্যক্রম	১৪৬
	°চাষাবাদের যন্ত্রপাতি	১৪৭
	°কৃষি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা	১৪৭
	°কৃষি সম্প্রসারণ	১৪৮
	°কৃষি বিপণন	১৪৮
	°কৃষি ঋণ	১৪৮

	পৃষ্ঠা
বনজ সম্পদ	১৫০
°বন এলাকা	১৫০
°বনজ সম্পদের ব্যবহার ও উৎপাদন	১৫০
°দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী ও কৌশল ..	১৫১
°উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ	১৫১
°শিক্ষা ও গবেষণা	১৫২
°নীতি সংক্রান্ত বিষয়াবলী	১৫৩
মৎস্য সম্পদ	১৫৪
°উৎপাদনের ভৌত সুবিধে ও অন্তরায়সমূহ	১৫৪
°দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী	১৫৪
°দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা	১৫৫
°দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার কৌশল ও নীতিমালা ..	১৫৫
°মৎস্য চাষের জন্য উপকরণ কার্যক্রম	১৫৬
°মৎস্য ধরা, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন	১৫৭
°মৎস্য সংক্রান্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ	১৫৭
°মৎস্যসম্পদ গবেষণা	১৫৭
°মৎস্যসম্পদ সম্প্রসারণ সার্ভিস	১৫৮
°উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা	১৫৯
প্রবাদি সম্পদ	১৬৩
°প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য ..	১৬৩
°দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী ও কৌশল ..	১৬৪
°কার্যক্রমের বিশেষ দিক	১৬৪
°সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা	১৬৫
°শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ	১৬৬
°গবেষণা	৬৬
°উপকরণ কার্যক্রম	১৬৬
°করেকাট নীতি সংক্রান্ত বিষয়	১৬৭
°উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা	১৬৮
°কৃষি খাতে আর্থিক খরাদ্দ	১৬৮
খ—পানি সম্পদ উন্নয়ন	১৬৯
°প্রকৃত অবস্থা	১৬৯
°প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য ..	১৭০
°পানি সম্পদের সম্ভাবণা	১৭৪

পৃষ্ঠা

°দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ ১৭৫
°দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রা ১৭৫
°লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কৌশল ১৭৬
°বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ১৭৭
°বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা ১৭৯
°বেসরকারী খাত ১৭৯
°উন্নয়ন বিধিবদ্ধী ১৮০
°আর্থিক ব্যয় ১৮২

গ—পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ১৮৩
°দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার কার্যক্রমসমূহ ১৮৩
°পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ১৮৩
°পল্লী পূর্ত কর্মসূচী ১৮৪
°সমবায় ১৮৫
°উন্নয়ন বোর্ডসমূহের কর্মসূচী ১৮৬
°প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ১৮৬
°দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় আর্থিক বরাদ্দ ১৮৭

একাদশ অধ্যায় : শিল্প ও খনিজ সম্পদ ১৮৯
°১৯৭৩-৮০ মেয়াদে সাফল্য ১৮৯
°সরকারী খাতে ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য সমস্যা ১৯১
°বেসরকারী খাতের সম্পাদিত কার্যাদি ১৯১
°দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০—৮৫) ১৯২
°পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ ১৯২
°শিল্পোন্নয়নের নীতি কৌশলাদি ১৯৩
°কার্যক্রমসমূহের বিশেষ বিশেষ দিক ১৯৪
°শিল্পোন্নয়নে বিচার্য বিষয়াদি ১৯৮
°বিদেশ থেকে বেসরকারী পর্যায়ে প্রেরিত অর্থের উৎপাদনমুখী ব্যবহার .. ১৯৯
°বৈদেশিক বিনিয়োগ ২০০
°আর্থিক প্রতিষ্ঠাননমূহ ও ষ্টক এক্সচেঞ্জের ভূমিকা ২০০
°দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ .. ২০১
°রপ্তানী আয় ২০১
°কর্মসংস্থান ২০১
°আর্থিক বরাদ্দ ২০৩

		পৃষ্ঠা
দ্বাদশ অধ্যায় :	জ্বালানী ও প্রাকৃতিক সম্পদ	২০৫
	ক—বিদ্যুৎ খাত	২০৬
	°দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ	২০৭
	°দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়ন কর্মসূচী	২০৯
	°অর্থনৈতিক বিনিয়োগ	২১৪
	খ—প্রাকৃতিক সম্পদ খাত	২১৫
	°অতীত কাজের পর্যালোচনা	২১৬
	°অপরিশোধিত তেল প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং পেট্রোকিমিক্যাল পদার্থের ব্যবহার	২১৭
	°দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ	২১৮
	°দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশলসমূহ	২১৮
	°গ্যাস ও তেলের সরবরাহ এবং চাহিদা	২১৯
	°সুপারিশকৃত নীতি	২২১
	°পরিকল্পনাকালের ভৌত কর্মসূচী	২২১
	°আর্থিক ব্যয় বরাদ্দ	২২৫
	গ—নবায়নযোগ্য ও পল্লী জ্বালানী	২২৬
ত্রয়োদশ অধ্যায় :	পরিবহণ ও যোগাযোগ	২২৯
	ক—পরিবহণ	২২৯
	°অতীত উন্নয়ন প্রচেষ্টার পর্যালোচনা	২২৯
	°দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ	২৩১
	°আর্থিক বরাদ্দ	২৩২
	°বাংলাদেশ রেলওয়ে	২৩৩
	°সড়ক ও জনপথ	২৩৮
	°সড়ক পরিবহণ	২৪৩
	°অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ	২৪৫
	°সামুদ্রিক পরিবহণ	২৪৮
	°বেসামরিক বিমান চলাচল	২৫২
	°বেসরকারী বিনিয়োগ	২৫৮
	খ—যোগাযোগ	২৬০
	°প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য পর্যালোচনা। ..	২৬০
	°দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষি পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, কার্যক্রম ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ..	২৬২
	°টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন	২৬২

পৃষ্ঠা

°বাংলাদেশ ডাকঘর ২৬৬
°আবহাওয়া বিভাগ ২৬৬
°আর্থিক বরাদ্দ ২৬৮

চতুর্দশ অধ্যায় : ভৌত পরিকল্পনা ও গৃহায়ন ২৭৫
°অতীত উন্নয়ন ২৭৫
°দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের উদ্দেশ্য, কৌশল ও কৌলনীতি ২৭৬
°দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য কার্যকক্রমসমূহ .. ২৭৮
°দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য আর্থিক ব্যয় বরাদ্দ .. ২৭৮
°দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রতিষ্ঠানওয়ারী ভৌত কার্যক্রম .. ২৮০

পঞ্চদশ অধ্যায় : শিক্ষাধর্মীয় বিষয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত গবেষণা .. ২৯১
ক—শিক্ষা
°পটভূমি ২৯১
°অগ্রগতি পর্যালোচনা (১৯৭৩-৮০) ২৯২
°দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ২৯৭
°দ্বিতীয় পরিকল্পনার নীতি কৌশল ২৯৭
°শিক্ষা পদ্ধতির যুক্তিসংগতকরন ২৯৮
°পরিকল্পনার অর্থ সংস্থান ২৯৯
°দ্বিতীয় পরিকল্পনার কর্মক্রমসমূহ ৩০০
খ—ধর্মীয় বিষয়াবলী ৩১৮
°অগ্রগতির পর্যালোচনা ৩১৯
°দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী ৩১৯
°দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নীতি কৌশল ৩১৯
°দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার কার্যক্রমগুলো ৩১৯
গ—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা (এস টি আই) ৩১৯
°প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রগতির পর্যালোচনা ৩২২
°পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত সমস্যাবলী ৩২৫
°দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ৩২৬
°দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আর্থিক বরাদ্দ ৩৩০
°দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়ন কার্যক্রম ৩৩২
°নীতি সুপারিশসমূহ ৩৩৪

		পৃষ্ঠা
ষোড়শ অধ্যায় :	স্বাস্থ্য	৩৩৬
	°প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার পর্যালোচনা ..	৩৩৬
	°বর্তমান পরিস্থিতি	৩৩৮
	°দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ	৩৩৯
	°দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মকৌশল	৩৪০
	আর্থিক ব্যয়	৩৪১
	সরকারী খাতে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ	৩৪২
	°জনশক্তি উন্নয়ন	৩৪৬
	°ঔষধপত্র ও টীকার উৎপাদন এবং সরবরাহ	৩৪৮
	°স্বাস্থ্য গবেষণাগার	৩৪৮
	°প্রাইভেট নার্সিং হোম	৩৪৯
	°ভৌত লক্ষ্যসমূহ	৩৪৯
	°প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রদান ব্যবস্থা	৩৫২
	°উপসংহার	৩৫৫
সপ্তদশ অধ্যায় :	জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা	৩৫৭
	°জনসংখ্যার সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ চিত্র	৩৫৭
	°জনসংখ্যা নীতির দৃষ্টিভংগী	৩৫৮
	°অগ্রগতির পর্যালোচনা	৩৫৮
	°দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ	৩৬২
	°দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মকৌশলাদি	৩৬৬
	°দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসূচী	৩৬৭
	°নীতি পরিকল্পনা ও সমন্বয়	৩৭১
	°বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা	৩৭২
	°সামাজিক ব্যবস্থাসমূহ	৩৭৩
	°আইনগত ব্যবস্থাদি	৩৭৪
	°আর্থিক বরাদ্দ	৩৭৫
অষ্টাদশ অধ্যায় :	আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো	৩৭৭
	ক—সমাজকল্যাণ	৩৭৭
	°প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার পর্যালোচনা ..	৩৭৭
	°দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	৩৭৭
	°দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মকৌশল	৩৭৮
	°দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান প্রধান কর্মসূচীসমূহ ..	৩৭৯
	°আর্থিক ব্যয়বরাদ্দ	৩৭৯

	পৃষ্ঠা
খ—মহিলা বিষয়ক	৩৮০
°দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ	৩৮১
°দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মকৌশলাদি	৩৮১
°দ্বিতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচীসমূহ	৩৮২
°আর্থিক বরাদ্দ	৩৮৩
গ—যুব উন্নয়ন	৩৮৩
°দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ	৩৮৪
°দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মকৌশলাদি	৩৮৪
°দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য কর্মসূচীসমূহ ..	৩৮৫
°আর্থিক বরাদ্দ	৩৮৫
ঘ—ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	৩৮৫
ক্রীড়া	৩৮৬
°অগ্রগতির পর্যালোচনা (১৯৭৩—৮০)	
°দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ	৩৮৬
°দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মকৌশলাদি	৩৮৭
°দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসূচীসমূহ	৩৮৭
°আর্থিক বরাদ্দ	৩৮৭
সংস্কৃতি	৩৮৮
°অগ্রগতি পর্যালোচনা (১৯৭৩—৮০)	৩৮৮
°দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ	৩৮৮
°দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মকৌশল	৩৮৮
°দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসূচী	৩৮৯
°আর্থিক বরাদ্দ	৩৮৯
ঙ—গণযোগাযোগ মাধ্যম	৩৯০
°পর্যালোচনা (১৯৭৩—৮০)	৩৯০
°দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ	৩৯০
°আর্থিক ব্যয় বরাদ্দ	৩৯২
উনবিংশ অধ্যায়ঃ জনশক্তি ও শ্রম	৩৯৭
°প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার পর্যালোচনা	৩৯৭
°দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উদ্দেশ্যসমূহ/কর্মকৌশলাদি ..	৪০০

		পৃষ্ঠা
	°দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভৌত কর্মসূচীসমূহ ..	৪০১
	°খাতভিত্তিক কর্মসূচী	৪০২
	°আর্থিক বরাদ্দ	৪১০
বিংশ অধ্যায় :	জনপ্রশাসন	৪১১
	°অতীত অগ্রগতির পর্যালোচনা	৪১১
	°দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী	৪১৪
	°দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মকৌশল	৪১৭
	°দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান প্রধান কর্মসূচী ..	৪১৮
	°আর্থিক ব্যয় বরাদ্দ	৪২৫
একাবিংশ অধ্যায় :	খাদ্য উন্নয়ন	৪২৬

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০—৮৫)

ভূমিকা

১৯৮০ সনের জুলাই মাসে দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার কার্যক্রম শুরু হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বৈদেশিক সাহায্য পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশের দ্রুত উন্নয়নের প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, কৌশল ও লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছিল। কিন্তু পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়নের পর পরই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং বৈদেশিক সাহায্য পরিস্থিতিতে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে। বিশ্বযুদ্ধের পর প্রথম বারের মত ১৯৮১ সালে বিশ্ব বাণিজ্যে কোন প্রবৃদ্ধি ঘটেনি; এমনকি ১৯৮২ সালে প্রবৃদ্ধির হার শূন্যের নীচে নেমে আসে। এই বৎসরগুলোতে উন্নত দেশসমূহ থেকে সরকারী উন্নয়ন সাহায্যের পরিমাণ জাতীয় আয়ের শতাংশ হিসাবে অনেক কমে যায়। বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর রপ্তানীযোগ্য প্রাথমিক পণ্যাদির ক্রয়ক্ষমতা সর্বপেক্ষা বেশী হ্রাস পেয়েছে। পক্ষান্তরে এ সময়ে শুধুমাত্র জ্বালানীর মূল্যই বৃদ্ধি পায়নি, শিল্পজাত দ্রব্য ও যন্ত্রপাতির মূল্যও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। এসব পরিবর্তন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলে। দু' বৎসরে ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের দরুন বাংলাদেশ প্রায় ১০০ কোটী ডলার অস্তির সম্মুখীন হয়েছে। সাধারণভাবে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণও হবির হয়ে পড়ে। বৈদেশিক মুদ্রার তুলনায় টাকার মূল্য ২৫ শতাংশেরও বেশী হ্রাস পায়। ফলে আমদানি কার্যক্রম গভীরভাবে সংকোচিত হয় এবং ইহা আমদানি বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল সরকারী রাজস্বের উপর প্রত্যক্ষ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এসব ঘটনা এবং দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সম্পদ আহরণের মূল আশাবাদী হিসাবে পরিকল্পনা সংশোধনের প্রয়োজনকে তীব্র করে তোলে।

২। ১৯৮০/৮১ সালের প্রারম্ভে পরিকল্পনা সংশোধনের কাজ হাতে নেয়া হয়। প্রথমে আশা করা হয়েছিল যে, বিশ্ব মন্দা ভাব শীঘ্রই কাটিয়ে উঠা সম্ভব হবে এবং যে জন্য পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার কোন বড় রকমের পরিবর্তন প্রয়োজন হবে না, শুধুমাত্র ব্যয় কার্যক্রমকে যুক্তিসংগত/সংকোচিত করে প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে উঠা যাবে। বিভিন্ন কার্যক্রমের অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বাদ দিয়ে পরিকল্পনায় সরকারী খাতের আয়তন শতকরা ২০ ভাগ কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু এই অনুশীলন কার্যক্রম সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই উপলব্ধি করা হয় যে, বিশ্বমন্দা ভাব অতিক্রান্ত হবে না এবং এর প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশের উপর তীব্র হবে। এরূপ অবস্থায় আরো ২০ শতাংশের মত ব্যয় হ্রাস করে দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার জন্য একটি "হার্ডকোর কার্যক্রম" গ্রহণ করার চিন্তা-ভাবনা করা হয়। ইতিমধ্যে পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসরের কার্যক্রম চলছিল।

৩। দুই বৎসরের অভিজ্ঞতা ও তৃতীয় বৎসরের সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনার আরো সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বিভিন্ন কার্যক্রমের গুণগত সংশোধন প্রায় বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। প্রথমতঃ পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহের কোন বড় পরিবর্তন না করে এর গুরুত্বের উপর কিছু পরিবর্তনের কথা চিন্তা করা হয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ এবং বৈদেশিক দেনদেনের ভারসাম্যের উন্নয়ন সাধনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং সামাজিক ও সরকারী পর্যায়ে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান-সমূহের বিকাশের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশ গ্রহণ প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করা হয়। বস্তুত উপলব্ধি করা হয় যে একটি বিকেন্দ্রীয় বাস্তবায়ন কৌশল ছাড়া সীমিত সম্পদের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন যথাযথভাবে অর্জন করা সম্ভব নয়। উন্নয়ন কৌশলেও কিছু মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়। সম্পদ প্রাপ্তির স্বল্পতার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনবোধে অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নয়ন সংকোচিত করে আশু উৎপাদনশীল বিনিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত। আরো উপলব্ধি করা হয় যে হ্রাসকৃত বিনিয়োগ কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রারও যথেষ্ট সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে।

৪। এই প্রেক্ষিতে খাতওয়ারী সম্পদ বন্টনেরও কিছু পরিবর্তন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রত্যক্ষ উৎপাদনশীল কার্যক্রমের উপর গুরুত্ব প্রদানের ফলে গ্রামীণ ও কৃষি খাতে অধিকতর সম্পদ বন্টন করা হয়। শিক্ষা ও জনসংখ্যা পরিকল্পনা খাতের বাস্তবায়ন দক্ষতার প্রেক্ষিতে অন্যান্য খাতেও কিছু সম্পদ বিতরণ করতে হয়। দেশীয় জ্বালানী সম্পদের উন্নয়নের জন্য এই খাতে অধিকতর সম্পদ বন্টনের প্রয়োজন আরো গভীর ভাবে উপলব্ধি হয়। ফলে পরিবহণ ও যোগাযোগ, গৃহায়ন এবং শিল্পের মতো অন্যান্য খাতে বরাদ্দ কিছু হ্রাস করতে হয়েছে।

৫। দেশের বিনিয়োগ নীতিতেও বিশেষ পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য জনগণের কর্মশক্তি এবং উদ্যমকে অধিকতর সুযোগ প্রদানের দরকার। সম্প্রতি সরকার বেসরকারী খাতকে অধিকতর সুযোগ সুবিধা ও উৎসাহ প্রদানের নীতি গ্রহণ করেছেন। বহু শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থপনায় সরকারী সংস্থা সমূহের দায়িত্ব হ্রাস করা হয় এবং একটি বড় আয়তনের বিনিয়োগ প্রত্যাবর্তন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। আগে যে সমস্ত খাত সরকারী খাতের জন্য সংরক্ষিত ছিল সে গুলোও বেসরকারী খাতের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। ইতিপূর্বে ব্যাংকিং ও বস্ত্র শিল্পে নতন প্রকল্প স্থাপনের জন্য বেসরকারী খাতকে অনুমতি দেয়া হয়েছিল। অধুনা বেসরকারী খাত উপরোক্ত খাত সমূহের প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং পাট শিল্প প্রতিষ্ঠানও ক্রয় করার অনুমতি লাভ করেছে। দেশী ও বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় রাজস্ব, আর্থিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। এ নতুন উন্নয়ন কৌশল পরিকল্পনা সংশোধনের দু'টি ভিন্ন দিকের নির্দেশনা দেয়। প্রথমতঃ বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা, দ্বিতীয়তঃ শিল্প, পরিবহণ ও গৃহায়নের মত খাতে সরকারী বরাদ্দ কমিয়ে বেসরকারী খাতে অধিকতর অর্থ বরাদ্দ করা।

৬। দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়নকালে বিভিন্ন খাতে অর্থ বরাদ্দ নির্ধারনের জন্যে পরিকল্পনা কমিশন তিনটি বিভিন্ন বহুখাত বিশিষ্ট ম্যাক্রো মডেল তৈরী করেছিল। পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুততর জাতীয় আয় প্রবৃদ্ধির মডেল হতে নিম্নতর প্রবৃদ্ধির মডেলে আসার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। পরিকল্পনা সংশোধনে মূলতঃ এ মডেলটি গৃহীত হয়েছে তবে প্রথম দুই বৎসরের অগ্রগতির অভিজ্ঞতা এবং তৃতীয় বৎসরের সম্ভাবনার আলোকে এতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ প্রকল্প ও সার কারখানার মত বৃহদায়তনের আকারের চলতি প্রকল্প এবং খাদ্য, বস্ত্র ও প্রাথমিক শিক্ষার মত কিছু পণ্য ও জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডের চূড়ান্ত চাহিদার লক্ষ্য মাত্রার ক্ষেত্রেও এই সংশোধন/ পরিবর্তন বিবেচিত হয়। তা' ছাড়া স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ প্রভৃতি খাতেরও বাস্তবায়ন ক্ষমতার প্রেক্ষিতে সংশোধন করা হয়।

৭। চতুর্থ বৎসরের কার্যক্রম চূড়ান্ত করার পূর্বে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সংশোধন আদৌ সমিচীন কিনা তা' নিয়ে একটি প্রশ্ন উঠেছিল। যা' হউক একটি সংশোধিত পরিকল্পনা কাঠামো পরিকল্পনার অবশিষ্ট দুই বৎসরের কার্যক্রমের জন্য একটি প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশিকা হিসাবে কাজ করবে বলে মনে করা হয়। ইহা দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাকে একটি বাস্তব ভিত্তির উপর স্থাপন করবে। অধিকন্তু, ইহা একটি বেঞ্চ মার্ক প্রদান করবে যার উপর ভিত্তি করে তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার কাজ শুরু করা হবে। পরিশেষে দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া চূড়ান্ত করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়, পরিকল্পনাটি কেবলমাত্র খসড়া পরিকল্পনা হিসাবেই প্রায় তিন বৎসর আছে। পরিকল্পনার সংশোধন ম্যাক্রো পরিকল্পনাকে মাইক্রো পর্যায়ে বিভিন্ন খাতের প্রকল্পের রূপান্তর করার সুযোগ দেয় - ইহা অর্থনৈতিক শৃঙ্খলার কাঠামোর মধ্যে অধিকতর সম্পদ আহরণ ও পরিকল্পিত উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে সহায়তা করার সুযোগও দান করে। যা' হোক এ অবস্থার পরিকল্পনার সংশোধন দু'টি মৌলিক বিষয়ের সতর্ক মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে। ১৯৭৯/৮০ সালের স্থির মূল্যে নির্ধারিত এবং চলতি মূল্যে নির্ধারিত পরিসংখ্যানসমূহের তুলনামূলক আলোচনা একটি সংশয় সৃষ্টি করবে। এই পরিচ্ছেদে মূল খসড়া পরিকল্পনার

একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান সরবরাহ করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন অধ্যায়ের রাইট-আপ এমন ধারনা দিতে পারে যে পরিকল্পনাটি ১৯৮০ সালে প্রণীত হয়েছে। মাঝে মাঝে চলতি তথ্য ও পরিসংখ্যান প্রদানের মাধ্যমে এই প্রভাবকে রোধ করার চেষ্টা চালানো হয়েছে।

বস্তুগত লক্ষ্যমাত্রা

৮। অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও হ্রাসকৃত বিনিয়োগের ফলে বিভিন্ন খাতে পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা সংশোধন করা হয়। খসড়া পরিকল্পনার সাথে বস্তুগত লক্ষ্যমাত্রার কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সারণী ১-এ তুলে ধরা হয়েছে:

সারণী-১

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান বস্তুগত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

বিষয়াদি	একক	১৯৭৯/৮০ (প্রকৃত)	১৯৮৪/৮৫ (লক্ষ্যমাত্রা) সংশোধিত	মূল
১। **কৃষিজাত উৎপাদিত সামগ্রী**				
(১) খাদ্য শস্য	লক্ষ টন	১৩৩·৫০	১৭৫·০০	২০০·৩০
(ক) চাউল	ঐ	১২৫·৪০	১৫৬·৪০	১৭৭·৮০
(খ) গম	ঐ	৮·১০	১৮·৬০	২২·৫০
(২) পাট (কাঁচা)	লক্ষ বেল	৫৯·৬০	৬০·০০	৬৫·০০
(৩) চা	লক্ষ পাউণ্ড	৮০৭·১০	৯৫০·০০	৯৫০.০০
(৪) তামাক	ঐ	৮৭১·৪০	১২৯৩·০০	১৩৫০·০০
(৫) গোল আলু	লক্ষ টন	৯·০১	১৩·৬০	১৩·৬০
(৬) ভোজ্য তৈলবীজ ..	ঐ	১·৭০	৩·৬০	৪·০০
(৭) ডাল ..	ঐ	২·২০	৩·০০	৪·৭৬
(৮) তুলা (কাঁচা) ..	'০০০' বেল	৪·০০	৫৬·০০	২৬৩·০০
(৯) মাছ ..	লক্ষ টন	৬·৫০	১০·০০	১৩·৩০
২। **কৃষিজাত উৎপাদক**				
(ক) **জলসেচ যন্ত্রপাতি বসানো**				
(১) ক্ষুদ্র সেচ পাম্প ..	সংখ্যা	৩৮,৬০০	৬০,০০০	৫০,০০০
(২) অগভীর নলকূপ ..	ঐ	২৩,৪০০	২৫০,০০০	১২০,০০০
(৩) গভীর নলকূপ ..	ঐ	৯,৭৯৫	১৮,০০০	২৫,০০০
(৪) হস্তচালিত নলকূপ ..	ঐ	১১০,০০০	৪৫০,০০০	৫০০,০০০

বিষয়াদি	একক	১৯৭৯/৮০ (প্রকৃত)	১৯৮৪/৮৫ (লক্ষ্যমাত্রা) সংশোধিত	মূল
(খ) সার বিতরণ	.. '০০০' টন	৮৩৮	৯,৬০০	৯,৯০০
(১) ইউরিয়া	.. ঐ	৫৩৬	৭০০	৮৩০
(২) টি, এস, পি	.. ঐ	২০৬	৬০০	৭১০
(৩) এম পি এবং অন্যান্য	.. ঐ	৯৬	৩০০	৩৬০
৩। শিল্পজাত উৎপাদিত সামগ্রী				
(১) চিনি	.. '০০০' টন	৯৩·২০	২০০·০০	২১৬·০০
(২) পাটজাত দ্রব্য	.. ঐ	৫২৫·০০	৬৫০·০০	৭৩৬·০০
(৩) সুতা	.. লক্ষ পাউণ্ড	৯৫০	১৮৩০	২৮৪০
(৪) সুতার কাপড়	.. লক্ষগজ	৫৯২৪	৯৮০০	১২০০০
(৫) সার	.. '০০০' টন	৪৪২	১০৩৭	১৪২৮
(ক) ইউরিয়া	.. ঐ	৩৬১	৯২৭	১৩০০
(খ) টি এস পি	.. ঐ	৭১	১০০	১২০
(গ) এমোনিয়া সালফেট	.. ঐ	১০	১০	৮
(৬) ডিজেল ইঞ্জিন	.. সংখ্যা	২৪১০	২০,০০০	৩৫,০০০
(৭) পাম্প সমূহ	.. ঐ	২,১১০	১৮,১০০	৪৮,১০০
(৮) বাস, ট্রাক ও কার	.. ঐ	২,০৪৮	৩,০০০	৫,০০০
(৯) কাগজ	.. ঐ	৩০·৬১	৪৫·০০	৪৫·০০
(১০) পাল্প	.. ঐ	১২·২৭	৩০·০০	৩০·০০
(১১) নিউজপ্রিন্ট এবং মেকানিক্যাল প্রিন্ট	ঐ	৪১·২৭	৪৮·০০	৪৮·০০
(১২) সিমেন্ট	.. ঐ	৩৪৩	৪৫০	৫৩৫
৪। জ্বালানী সম্পদ				
(ক) শক্তি				
(১) সার্বিক উৎপাদন	মিলিয়ন কে, ডব্লিউ, এইচ	২,৩৫৩	৪৪৫৫	৪৪৫৫
(২) চূড়ান্ত চাহিদা	মেগাওয়াটস	৪৬২	৯২২	১০৩৫

বিষয়াদি	একক	১৯৭৯/৮০ (প্রকৃত)	১৯৮৪/৮৫ (লক্ষ্যমাত্রা) সংশোধিত	মূল
(৩) উৎপাদন ক্ষমতা (গ্রাস) ...	মেগাওয়াট	৫৫৪	১৩৪২	১৩০২
(৪) প্রেরণ লাইন ..	মাইল	১০৯৪	১,৪৯৬	১৬৩২
(৫) বিতরণ লাইন ..	ঐ	১২,৩৯০	৩১,৩৯০	৪৮,১০৬
(৬) পল্লী বিদ্যুতায়ন ..	গ্রামের সংখ্যা	২,১৮১	২৫,০০০	২৩,০০০
(খ) গ্যাস				
(৭) গ্যাস উৎপাদন	এম এম সি এফ	৪৪,৯৭০	১২৮,০০০	১২০,০০০
(৮) প্রেরণ লাইন ..	মাইল	১৪২	৪৭৮	৪২২
(৯) বিতরণ লাইন ..	ঐ	১০০৫	২১৭৫	২২০৫
৫। স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা লক্ষ্যমাত্রা				
(১) থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ..	সংখ্যা	২৯০	৩৫৬	৩৫৬
(২) হাসপাতাল শয্যা (বেসরকারীসহ)	ঐ	২০,৯২৬	৩২,৪৫৫	৩২,৪৬৫
(৩) পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ..	ঐ	১,১৭৩	৩,১৫০	৪,৫০০
(৪) পল্লী ডিসপেনসারী ..	ঐ	১,২৭৫	১,২৭৫	১,২৭৫
(৫) জন্মহার ..	প্রতিহাজার	৪৩.২৫	৩১.৫৬	৩১.৫৬
(৬) মৃত্যুহার ..	ঐ	১৬.৭৫	১৩.৭৮	১৩.৭৮
(৭) সর্বসমক্ষ জন্ম নিরোধক ব্যবহারকারী	(১) লক্ষদম্পতি	২৩.৪	৭০.৮	৭০.৮
	(২) শতকরা যোগ্যদম্পতি	১৪.০	৩৭.৫	৩৮.০
৬। শিক্ষাগত লক্ষ্যমাত্রা				
(১) প্রাথমিক বিদ্যালয়	(১) লক্ষ ছাত্র	৭০	১৩০	১৩০
	(২) ৬-১১ বৎসরের জন সংখ্যার শতাংশ	৬০	৯২	৯২
(২) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ (গণশিক্ষাসহ)	মোট শিক্ষায় বিনিয়োগের শতাংশ	..	৪৮.৫০	৪৬.৮৫

বিষয়াদি	একক	১৯৭৯/৮০ প্রকৃত	১৯৮৪/৮৫ (লক্ষ্যমাত্রা)	
			সংশোধিত	মূল
(৩) কারিগরী শিক্ষার জন্য বরাদ্দ	.. মোট শিক্ষার বিনিয়োগের শতাংশ	..	১২·৫৩	৮·২৯
(৪) মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ	.. ঐ	..	১২·৬৪	১৯·১৭
(৫) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার জন্য বরাদ্দ	ঐ	..	৭·৪০	৬·৬৩
৭। জরুরকাঠামো লক্ষ্যমাত্রা				
(১) পাকা রাস্তা	.. মাইল	২৫৫৪	৩৬৭৯	৪৬০২
(২) সমুদ্রগামী জাহাজ (সরকারী খাত)	(১) সংখ্যা	২৫	২৮	৪০
	(২) '০০০' ডি ডব্লিওটি	৩৬৯	৪৫৭	৬০৭
(৩) বাসসমূহ	.. সংখ্যা	১০,৯৬৯	১২,৯৬৭	১৪,৭০২
(৪) ট্রাকসমূহ	.. ঐ	১৬,২২৮	১৮,৬২৮	২৩,৬৪৭
(৫) ডাকঘর	.. ঐ	৭,২৯২	৭,৯৯২	৮,৬০০
(৬) টেলিফোন লাইন	.. ঐ	১,২০,০১৭	১,৭৫,০১৭	২,৩৮,০০০
৮। কর্মসংস্থান				
(১) শ্রমশক্তি	.. লক্ষ জন	২৮৪	৩২২	৩২২
(২) কর্মসংস্থান	.. ঐ	২৫৩	২৯৩	৩০৫

বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য

৯। **বৈদেশিক বাণিজ্য/বহিঃ** খাতে ঘনীভূত সমস্যাই পরিকল্পনা সংশোধনের মূল কারণ। যদিও ১৯৭৯/৮০ সন থেকে রপ্তানী শতকরা ৪·৭ হারে বৃদ্ধি পায়, প্রকৃত অর্থে রপ্তানী মূল্য হ্রাসের কারনেই রপ্তানী আয় কমে গিয়েছিল এবং অর্থ সংস্থানের অভাবে আমদানি ব্যয় কমাতে হয়। আমদানি মূল্য বৃদ্ধির কারণে প্রকৃত আমদানির পরিমাণও দ্রুত কমে যায়। ফলে আয়তন হ্রাস করা ছাড়াও সংশোধিত পরিকল্পনায় আমদানি বিকল্প রপ্তানী উন্নয়ন মুখী বিনিয়োগের উপর জোর দেয়া হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও সাহায্যের ক্ষেত্রে মন্দাভাবের দরুন ষষ্ঠ পরিকল্পনায় আমদানি ও রপ্তানী অভিক্ষেপের যে রূপরেখা দেয়া হয়েছিল তা' দারুণভাবে বদলিয়ে যায়। মূল ৯ শতাংশ রপ্তানী অভিক্ষেপের স্থলে রপ্তানী এখন বার্ষিক ৮·৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে এবং প্রত্যাশিত আমদানি বৃদ্ধির হার ৮·৪ শতাংশ থেকে ১৯৭৯/৮০ সনের মূল্যমানে মাত্র ০·৩ শতাংশে হ্রাস করা হয়। আমদানি ও রপ্তানী এর অভিক্ষেপ যথাক্রমে সারণী ২ ও ৩ এ দেখানো হয়েছে।

সারণী ২

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আমদানি কার্যক্রম
(১৯৭৯/৮০ মূল্যে)।

(কোটি টাকায়)

	বিষয়াদি	একক	১৯৭৯/৮০ (প্রকৃত)		১৯৮৪/৮৫ (অভিক্ষেপন)			
					সংশোধিত		মূল	
			পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১।	খাদ্যশস্য ..	লক্ষ টন	২৮	৯৬৫	৬	১৯৪	০	০
২।	ভোজ্য তৈল ..	'০০০' টন	৭৮	১০৫	১১৫	১৫৫	১১৭	১৬৪
৩।	তৈলবীজ ..	ঐ	২৪	১৩	৩৮	২১	৮৭	৫০
৪।	পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য ..	ঐ	৪৭৪	১৯৯	৪৬৮	১৯৩	৫৪৬	১৯৩
৫।	অশোধিত পেট্রোলিয়াম ..	ঐ	১২৭৭	৩৯৭	১৪০০	৪৩৫	১৪০০	৪৪৭
৬।	তুলা	'০০০' বেল	১৮২	৮৮	৪১৫	২০১	৫৮৫	২৭৩
৭।	তুলা এবং কৃত্রিম তন্তু ..	লক্ষ পাউণ্ড	৭২	১৭	১৬০	৩৮	৮০	১৭
৮।	সার	'০০০' টন	৫৭৬	২০৭	৪২০	১৫১	১০৫২	৩৪৬
৯।	সিমেন্ট ..	ঐ	৪৮৯	৫৬	৯০০	১০৪	১১৩০	১২৯
১০।	মূলধন দ্রব্য ..		..	৭৩৬	..	১২৩০	..	২৩০৪
১১।	অন্যান্য কাঁচামাল ..		..	৫৯৮	..	৭০০	..	১০৯০
১২।	অন্যান্য ভোগ্যপণ্য ..		..	২৮৬	..	২৯৭	..	৪৮৩
মোট	(ক) কোটি টাকায় ..		..	৩৬৬৭	..	৩৭১৯	..	৫৪৯৬
	(খ) মিলিয়ন ডলার ..		..	২৩৬৬	..	২৩৯৯	..	৩৫৪৬

সারণী ৩

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রপ্তানী কার্যক্রম
(১৯৭৯/৮০ মূল্যে)

(কোটি টাকায়)

বিষয়াদি	একক	১৯৭৯/৮০ (প্রকৃত)		১৯৮৪/৮৫ (অভিক্ষেপন)			
		পরিমাণ	মূল্য	সংশোধিত		মূল	
				পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১। কাঁচা পাট	.. লক্ষ বেল	১৯·৭	২২২·১	২১	২৩৭	২৮	৩০৮
২। পাটজাত দ্রব্য*	.. '০০০' টন	৪৫৫	৬০০·৪	৫৯০	৭৯৫	৬১০	৮১২
৩। চা ..	.. লক্ষ পাউণ্ড	৫২৭	৫১·০	৭৮০	৭৬	৭৫০	৭৫
৪। চামড়া	.. ..	..	১০১·৫	..	১৭৮	..	১৭১
৫। পি ও এল দ্রব্য	.. ..	..	৩৫·৭	..	৫৪	..	৩৭
৬। হিমায়িত খাদ্য	.. ..	..	৬০·৬	..	১৪৫	..	১৮৭
৭। নিউজপ্রিন্ট, পেপার এবং পাল্প।	'০০০' টন	২৫·৪	১৬·৬	৬০	২৬	৬১	৩২
৮। ফল, শাক-সব্জী এবং মশলা	.. ..		২·৯	..	১৪	..	২৬
৯। পোষাক-পরিচ্ছদ এবং বস্ত্র	.. ..		১·২	..	৭০	..	১৫
১০। হস্ত শিল্প	.. ..	..	৫·১	..	৯	..	১১
১১। অন্যান্য	.. ..	..	২০·৮	..	৯৪	..	৩৬
নোট (১) কোটি টাকায়	.. ..	..	১১৭·৯	..	১,৬৯৮		১,৭১৭
(২) মিলিয়ন ডলার (ইউ এস)			৭২১		১,০৯৫		১,১০৮

*পাট কার্পেটিসহ।

১০। বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য রক্ষার মূল কৌশল হচ্ছে রপ্তানী বৃদ্ধি করা, আমদানি বিকল্প বিনিয়োগের উপর জোর দেয়া এবং অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানি হ্রাস করা। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত আমাদের রপ্তানী খাত গতিশীল হয় নাই। প্রকৃত অর্থে (১৯৭২/৭৩ সনের মূল্যে) রপ্তানী আয় বার্ষিক শতকরা ৫ ভাগ হারে বৃদ্ধি পায়। ১৯৭০ দশকের শেষার্ধে আন্তঃ প্রবৃদ্ধির হারও অনুরূপ

ছিল। ইহার প্রধান কারণ ছিল একক শিল্পজাত পণ্যের (পাট বস্ত্র) উপর নির্ভরশীলতা দেশের অতীত শিল্পায়ন কৌশল যাহা অনেক ক্ষেত্রে তুলনামূলক উৎপাদন সুবিধা, বিশ্ব বাণিজ্যে মন্দাভাব ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও রপ্তানী শিল্পে বিনিয়োগএ তেমন গুরুত্ব না দিয়ে আমদানি বিকল্প শিল্পে অত্যাধিক গুরুত্ব প্রদান করে। পরিকল্পনায় এ সমস্ত সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছে কিন্তু রপ্তানী বাজার প্রসারিত করার জন্যে দেশের ভিতরে রপ্তানী শিল্প বিকাশের জন্য যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য অগ্রাধিকার নীতির সাথে বহিঃ বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাজারজাতকরণ নীতি জোরদার করতে হবে। দেশে পরিবহন জাহাজ চলাচল, পণ্যাগার স্থাপনের মত অবকাঠামোতেও পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করা দরকার এবং পণ্যের গুণগত মানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া উচিত। বন্দর নগরী চট্টগ্রাম একটি রপ্তানী পণ্য প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল এবং বৈদেশিক বেসরকারী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে রাজস্ব বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা রপ্তানী ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে অধিকতর বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার সুযোগ দিবে। অধিকন্তু সরকারী খাতে উৎপাদিত কিছু পণ্য যেমন নিউজপ্রিন্ট, কাগজ, সার, বৈদ্যুতিক কেবল ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদির জন্য সম্ভাব্য রপ্তানী বাজার সরকারী সংস্থার বলিষ্ঠ বাজারজাত করণ বিক্রয় নীতি এবং পরিকল্পিত উৎপাদনের মাধ্যমে অনুসন্ধান করতে হবে।

১১। **প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ ঃ** বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ খসড়া পরিকল্পনায় প্রত্যাশিত পরিমাণের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৯ সালের পর জনশক্তি রপ্তানীর হার বার্ষিক ৩৭ শতাংশএ বৃদ্ধি পায়। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের অভিক্ষেপন নীচে দেয়া হল:

সারণী ৪

প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ
(১৯৭৯/৮০ মূল্যে)

প্রেরিত অর্থ				১৯৭৯/৮০ (প্রকৃত)।	১৯৮৪/৮৫ (লক্ষ্য মাত্রা)	
					সংশোধিত	মূল
(ক) কোটি টাকায়	..	..	..	৪০৭	৯১৬	৫১২
(খ) ইউ এস মিলিয়ন ডলারে		..	..	২৬৩	৬০০	৩৬০

১২। **বৈদেশিক সাহায্যের সম্ভাবনা ঃ** পরিকল্পনার প্রথম ৩ বৎসরের বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ আশানুরূপ না হয়ে স্থবির হয়ে পড়ে এবং প্রকৃত অর্থে এর পরিমাণ হ্রাস পায়। খসড়া পরিকল্পনায় প্রত্যাশিত নির্ধারিত ৪৮৫৩ মিলিয়ন ডলারের স্থলে প্রথম ৩ বৎসরে ১৯৭৯/৮০ সনের মূল্যায়নের সাহায্যের অবমুক্তির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৪৭৬ মিলিয়ন ডলার। এ অভিজ্ঞতার ফলে পরিকল্পনাকালে বৈদেশিক সাহায্য-প্রাপ্তির পরিমাণ যথেষ্ট হ্রাস করা হয়। খসড়া পরিকল্পনা ও সংশোধিত পরিকল্পনায় স্থিরকৃত বৈদেশিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ও এর অবমুক্তির একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো:

সারণী ৫

সাহায্যের অংগীকার ও অবমুক্তি
(১৯৭৯/৮০ মূল্যে)

(মিলিয়ন ডলারে)

	প্রারম্ভিক পাইপলাইন		অংগীকার		মোট প্রাপ্যতা		অবমুক্তি	
	সংশোধিত	মূল	সংশোধিত	মূল	সংশোধিত	মূল	সংশোধিত	মূল
খাদ্য সাহায্য ..	৫৫	২৪	৮৮২	১০৮৭	৯৩৭	১৩১১	৮৮৩	১১১১
পণ্য সাহায্য .	৩৯৮	৪৭৩	২২৫২	৩৪৭৭	২৬৫০	৩৯৫০	২১৫৬	৩১৫০
প্রকল্প সাহায্য ..	২১৫৩	২১৫৩	৪৮৬৮	৭৯৫০	৭০২০	৯১০৩	৩০৫৫	৪৯০০
মোট ..	২৬০৬	২৬৫০	৮০০২	১২৫১৪	১০৬০৭	১৪৩৬৪	৬০৯৪	৯১৬১

১৩। সংশোধিত পরিকল্পনায় চলতি মূল্যে বৈদেশিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ও ইহার অবমুক্তির হিসাব সারণী ৬ এতে দেখানো হল:

সারণী ৬

বৎসরওয়ারী সাহায্যের অংগীকার ও অবমুক্তি
(চলতি মূল্যে)

(মিলিয়ন ডলারে)

বৎসর			খাদ্য	পণ্য	প্রকল্প	মোট
১৯৮০/৮১ ..	প্রারম্ভিক পাইপ লাইন		৫৫	৩৯৮	২১৫৩	২৬০৬
	অংগীকার		২০৩	৩৫৫	১০৮২	১৬৪০
		মোট ..	২৫৮	৭৫৩	৩২৩৫	৪২৪৬
	অবমুক্তি		১৯৪	৩৯৩	৫৬০	১১৪৭ (১০৬৫)
১৯৮১/৮২ ..	প্রারম্ভিক পাইপলাইন		৫৯	৩৫৭	২৬৩২	৩০৪৮
	অংগীকার		২১৮	৪৯১	১২৩৩	১৯৪২
		মোট ..	২৭৭	৮৪৮	৩৮৬৫	৪৯৯০
	অবমুক্তি		২৩০	৪২২	৫৮৪	১২৩৬ (১১৮১)

(মিলিয়ন ডলারে)

বৎসর		খাদ্য	পণ্য	প্রকল্প	মোট
১৯৮২/৮৩ ..	প্রারম্ভিক পাইপ লাইন	৪৭	৪২৬	৩২৮১	৩৭৫৪
	অংগীকার	২৩০	৪৫৮	১২৭০	১৯৫৮
	মোট ..	২৭৭	৮৮৪	৪৫৫১	৫৭১২
	অবমুক্তি	২৬০	৪৭৫	৬১০	১৩৪৫ (১২৩০)
১৯৮৩/৮৪ ..	প্রারম্ভিক পাইপ লাইন	১৭	৪০৯	৩৯৪১	৪৩৬৭
	অংগীকার	২৪০	৭০০	১৪০০	২৩৪০
	মোট ..	২৫৭	১১০৯	৫৩৪১	৬৭০৭
	অবমুক্তি	২৪০	৫২০	৭৫০	১৫১০ (১২৯৬)
১৯৮৪/৮৫ ..	প্রারম্ভিক পাইপ লাইন	১৭	৫৮৯	৪৫৯১	৫১৯৭
	অংগীকার	১৪০	৮০০	১৬৫০	২৫৯০
	মোট ..	১৫৭	১৩৮৯	৬২৪১	৭৭৮৭
	অবমুক্তি	১৪০	৬০০	৯২০	১৬৬০ (১৩২২)
১৯৮০—৮৫ ..	মোট অংগীকার	১০৩১	২৮০৪	৬৬৩৫	১০৪৭০
	মোট অবমুক্তি	১০৬৪	২৪০৯	৩৪২৪	৬৮৯৭ (৬০৯৪)

টীকা: বন্ধনীতে ১৯৭৯/৮০ স্থির মূল্যে অবমুক্তি

অভ্যন্তরীণ সম্পদ এবং পরিকল্পনার অর্থ সংস্থান

১৪। যেহেতু অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ অনেকাংশে বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল তাই বিশ্ব বাণিজ্য ও সাহায্যের ক্ষেত্রে মন্দাভাবের দরুন যে কোন হ্রাসকৃত বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের হিসাবকে প্রভাবিত করে। যা' হউক বিনিয়োগ চাহিদা পূরণের জন্য পরিকল্পনার চলতি ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছ্র সাধনের, ভোগ্যপণ্যের উপর শুল্কহার হ্রাস, শিল্প, বিদ্যুৎ, কৃষি, পরিবহনক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার, সরকারী খাতের ব্যবস্থাপনা দক্ষতার অধিকতর বিকাশ সাধন এবং বিনিয়োগের প্রয়োজন মিটানোর জন্য অতিরিক্ত ঋণ সংগ্রহের নীতি গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পনার বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়ে আনার প্রবণতা উপলব্ধি করে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় আহরনের উপর জোর দেয়া হয়। ১৯৭৯/৮০ এবং ১৯৮০/৮১ সনের বৃহৎ বাজেট ঘাটতির প্রেক্ষিতে মুদ্রাস্ফীতি মুখী উন্নয়ন নীতিকে উপযুক্ত বিকল্প হিসাবে বিবেচনা করা সমিচীন হবে না বলে মনে করা হয়। এই সব ঘটনার প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা সংশোধন এর কার্যক্রমে, অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ ও মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

১৫। পরিকল্পনায় মোট ১৭,২০০ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ ছাড়াও কাজের বিনিময়ে খাদ্য কার্যক্রম, খাদ্যমজুদ ও অন্যান্য মজুদ গঠন এবং সংস্থাসমূহের ইকুইটি মূলধন ইত্যাদির মত পরিকল্পনা বহির্ভূত কিছু বিনিয়োগ ও মোট সম্পদ চাহিদার পরিমান নির্ধারণের বিবেচনা করতে হবে। পরিকল্পনার (অন্তর্ভুক্ত ও পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয়ের হিসাব অনুযায়ী) মোট ব্যয় বরাদ্দের পরিমান ১৯,০৭৯ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। মোট ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে ৭,০৯১ কোটি টাকা সরকারী বৈদেশিক সাহায্য, ৩,৮৫৬ কোটি টাকা বৈদেশিক খাতের ট্রান্সফার ও অন্যান্য উৎস এবং অবশিষ্ট ৮,১৩২ কোটি টাকা দেশজ সম্পদ হতে সংস্থান করা হবে। উল্লেখ যে, ট্রান্সফার খাতের একটি বড় অংশ হচ্ছে বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী শ্রমিকদের প্রেরিত অর্থ। মোট উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ এবং ইহার অর্থ সংস্থানের চিত্র সারণী ৭-এ দেখানো হল :

সারণী ৭

উন্নয়ন ব্যয় (পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা বহির্ভূত) এবং তার অর্থসংস্থান

(১৯৭৯/৮০ মূল্যে)

[কোটি টাকায়]

বর্ণনা	ভিত্তিবৎসর (১৯৭৯/৮০)	পরিকল্পনা মেয়াদ (১৯৮০—৮৫)	প্রান্তিক বৎসর (১৯৮৪/৮৫)
১। পরিকল্পনা ব্যয় ..	২,৭১৭	১৭,২০০	৪,২৯৫
২। পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয় ...	৬২৭	১,৮৭৯	২৮০
৩। মোট উন্নয়ন ব্যয় ..	৩,৩৪৪	১৯,০৭৯	৪,৫৭৫
৪। (ক) বহিঃ সম্পদ ..	২,৫৪৪	১০,৯৪৭	২,১৬৫
(খ) বৈদেশিক সাহায্য (নীট) ..	১,৭৯২	৭,০৯১	১,২২৫
৫। অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রয়োজনীয়তা ..	৮০০	৮,১৩২	২,৪১১
৬। জি ডিপি (১৯৭৯/৮০ বাজার মূল্যে) ..	১৮,২০৬	..	২৪,২১০
৭। (ক) জি ডি পি-র শতকরা হিসাবে উন্নয়ন ব্যয় ..	১৮.৪	..	১৮.৯
(খ) জি ডি পি-র শতকরা হিসাবে পরিকল্পনা ব্যয় ..	১৪.৯	..	১৭.৭
৮। (ক) বিনিয়োগ ..	২,৮৯৬	১৬,৫৭৯	৩,৯৫৫
(খ) জি ডি পির শতকরা হিসাবে বিনিয়োগ ..	১৫.৯	..	১৬.৩
৯। (ক) অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ..	৭৮৯	৫,৬৬৮	১,৭৯০
(খ) জি ডি পি-র শতকরা হিসাবে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ..	৪.৩	..	৭.৪
১০। (ক) জাতীয় সঞ্চয় ..	১,১৯৬	৯,২৭৯	২,৭০৬
(খ) জি ডি পি-র শতকরা হিসাবে জাতীয় সঞ্চয় ..	৬.৬	..	১১.২
১১। প্রান্তিক সঞ্চয়হার (অভ্যন্তরীণ) ..	..	১৪.৭	..
১২। কর/জি ডি পি অনুপাত ..	৭.৯	..	৯.৫
১৩। (ক) জি ডি পি-র শতকরা হিসাবে বৈদেশিক সাহায্য নীট	৯.৮	..	৫.১
(খ) উন্নয়ন খরচের শতকরা হিসাবে বৈদেশিক সাহায্য নীট	৬৬.০	৪১.২	২৮.৫

১৬। সরকারী খাতে ১১,১০০ কোটি টাকার কার্যক্রমের অর্থ সংস্থানের জন্য রাজস্ব উদ্বৃত্তি নিশ্চয়তার জন্য খুব প্রচেষ্টা চালাতে হবে। যদিও সরকারী খাতের আকার হ্রাস করা হয়েছে, চলতি প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়নের জন্য প্রচুর সরকারী সম্পদের প্রয়োজন হবে। সরকারী খাতে মোট ১১,১০০ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে ৬,১৯৬ কোটি বৈদেশিক সাহায্য (নীট) হতে এবং অবশিষ্ট ৪,৯০৪ কোটি টাকা অভ্যন্তরীণ সম্পদ হতে সংস্থান করা হবে। সারণী ৮ এ সরকারী খাতের কার্যক্রমের অর্থ সংস্থানের বিবরণ দেয়া হল।

সারণী ৮

সরকারী খাতে কার্যক্রমের অর্থ সংস্থান
(১৯৭৯/৮০ মূল্যে)

[কোটি টাকায়]

১। পরিকল্পনা ব্যয়	..	..	..	১১,১০০
২। অর্থ সংস্থান				
(ক) বৈদেশিক সাহায্য (নীট)	..	..	..	৬,১৯৬
(খ) অভ্যন্তরীণ সম্পদসমূহ	..	..	..	৪,৯০৪
(১) রাজস্ব উদ্বৃত্ত (বর্তমান কর এবং নূতন কর কার্যব্যবস্থা থেকে)			..	৪,২০৫
(২) সংস্থা সমূহের নিজস্ব তহবিল	..	..	..	৩৫০
(৩) মূলধন প্রাপ্তি (নীট)	..	..	..	১১৯
(৪) ব্যাংক এবং বেসরকারী সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ		..	..	২৩০

খাতওয়ারী বরাদ্দ

১৭। খসড়া পরিকল্পনার খাতওয়ারী বরাদ্দকে শুধুমাত্র নিম্নমুখী সংশোধন করা হয় নাই, কোন কোন ক্ষেত্রে আপেক্ষিক অনুপাতও পরিবর্তিত হয়েছে। বিশেষ করে পানি সম্পদ, পল্লী উন্নয়ন অবকাঠামো ও জ্বালানীর মত খাতে অধিক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। প্রয়োজন সত্ত্বেও শিক্ষা ও জনসংখ্যা পরিকল্পনা খাতে বাস্তবায়ন ক্ষমতার দুর্বলতার কারণে অধিক বরাদ্দ দেয়া সম্ভব হয়নি। চলতি প্রকল্প সমূহে বিশেষ করে প্রায় সমাপ্ত প্রকল্প সমূহ আন্তঃখাত মডেলের বরাদ্দকৃত অর্থের তুলনায় বেশী বরাদ্দের দাবী রাখে। শিল্প, পরিবহণ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বরাদ্দ প্রচুর হ্রাস করা হয়। সরকারী খাতের খাতওয়ারী বরাদ্দ সারণী ৯এ দেখানো হলো।

সারণী-৯

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সরকারী খাতে খাতওয়ারী বরাদ্দ

[কোটি টাকায়]

খাত	মূল বরাদ্দ (১৯৭৯/৮০ মূল্যে)		সংশোধিত বরাদ্দ (১৯৭৯/৮০ মূল্যে)		সংশোধিত বরাদ্দ (চলতি মূল্যে)
	পরিমান	শতাংশ	পরিমান	শতাংশ	
১। কৃষি এবং তৎসংশ্লিষ্ট কার্যাদি	৬,৫০০	৩২·৩	৩,৮০২	৩৪·৩	৫,৫৫২
(ক) কৃষি	২,৭০০	১৪·৪	১,৪৭০	১৩·৩	২,১৪৯
(খ) পানি সম্পদ	৩,০০০	১৪·৯	১,৮৫০	১৬·৭	২,৭০২
(গ) পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠানাদী (উন্নয়ন বোর্ডসহ)	৮০০	৪·০	৪৮২	৪·৩	৭০১
২। শিল্প ও খনিজ সম্পদ	৩,২৭৫	১৬·৩	১,৩৯০	১২·৫	২,০৪২
৩। জ্বালানী ও প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ	২,৭৬০	১৩·৭	২,০৫২	১৮·৫	৩,০২৯
(ক) শক্তি	২,০০০	৯·৯	১,৪৩৭	১২·৯	২,১৩০
(খ) প্রাকৃতিক সম্পদ	৭৬০	৩·৮	৬১৫	৫·৫	৮৯১
৪। পরিবহন ও যোগাযোগ	৩,২৩৯	১৬·১	১,৫২৪	১৩·৭	২,১৬০
(ক) পরিবহণ	২,৬৩৫	১৩·১	১,২৮৭	১১·৬	১,৮১৯
(খ) যোগাযোগ	৬০৪	৩·০	২৩৭	২·১	৩৪১
৫। ভৌত পরিকল্পনা ও গৃহায়ন	১,২২০	৬·০	৫৭৪	৫·২	৮২০
৬। শিক্ষা, ধর্ম বিষয়ক এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত গবেষণা	১,০৭৫	৫·৪	৫৭২	৫·২	৮৩৬
(ক) শিক্ষা	৯০৫	৪·৫	৪৭০	৪·৩	৬৯২
(খ) ধর্ম বিষয়ক	১৫	০·১	১০	০·১	১৫
(গ) এস, টি, আর	১৫৫	০·৮	৯২	০·৮	১২৯
৭। স্বাস্থ্য	৫৯৫	৩·০	২৮৮	২·৬	৪১৩
৮। জন্ম নিয়ন্ত্রন ও পরিবার পরিকল্পনা	৬১৫	৩·০	৩১০	২·৮	৩৬৮
৯। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো	৬০৯	৩·০	২০২	১·৮	২৮০
(ক) সমাজকল্যাণ	৮৫	০·৪	৪১	০·৪	৫৯
(খ) মহিলা বিষয়ক	৮৯	০·৪	২২	০·২	৩১
(গ) যুব উন্নয়ন	১০১	০·৫	১৯	০·২	২৬
(ঘ) ক্রীড়া ও সংস্কৃতিক	৯৫	০·৫	৪৩	০·৪	৬০
(ঙ) গণসংযোগ	২৩১	১·২	৭৭	০·৭	১০৪
১০। শ্রম ও জনশক্তি	১৮৫	০·৯	৬১	০·৫	৮৮
১১। জন প্রশাসন	৬০	০·৩	৩৮	০·৩	৫৫
১২। উপ-জিলা উন্নয়ন	..	..	২৮৭	২·৬	৪২৫
মোট	২০,১২৫	১০০.০	১১,১০০	১০০.০	১৬,০৬০

প্রবৃদ্ধির হার

১৮। আশু উৎপাদনশীল প্রকল্পসমূহের উপর গুরুত্ব দেয়া সত্ত্বেও স্বল্প বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধির সামগ্রীক হারের উপর প্রভাব ফেলবে। ইহা লক্ষ্য করা গেছে যে পরিকল্পনার প্রথম ৩ বৎসরের প্রবৃদ্ধির হার খুবই অসামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রথম বৎসরে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬ শতাংশ, দ্বিতীয় বৎসরে ৩·৯ শতাংশ এবং তৃতীয় বৎসরে ৩·৮ শতাংশ হবে। ১৯৮৫ সালে খাদ্য উৎপাদন ২০ মিলিয়ন টন হওয়ার কথা, কিন্তু এই বৎসরে (১৯৮২/৮৩) ইহা ১৫·১ মিলিয়ন টন হবে এবং ১৯৮৫ সালে ১৭·৫ মিলিয়ন টনে দাঁড়াবে। গৃহায়ন এবং নির্মাণ খাত মন্দাভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে সময়ের প্রয়োজন হবে। খসড়া পরিকল্পনা ও সংশোধিত পরিকল্পনায় প্রত্যাশিত প্রবৃদ্ধির হার সারণী ১০ এ তুলে ধরা হল:

সারণী ১০

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে মূল ও সংশোধিত প্রবৃদ্ধির হারের একটি তুলনামূলক প্রতিবেদন

	খাত	গড়পড়তা বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি হারের শতাংশ	
		মূল	সংশোধিত
১।	কৃষি	৬·৩	৫·০
	(ক) চাউল ও গম	৭·১	৪·০
	(খ) অন্যান্য কৃষি	৫·৪	৫·২
২।	শিল্প	৮·৬	৮·৪
৩।	নির্মাণ	১৪·৪	৪·৮
৪।	শক্তি ও গ্যাস	১৬·০	১৬·০
৫।	গৃহায়ন	৪·২	৩·০
৬।	পরিবহণ	১০·৭	৫·৭
৭।	বাণিজ্য ও অন্যান্য সেবা সমূহ	৭·৪	৫·৭
	মোট ..	৭·২	৫·৪

প্রথম ভাগ

পরিকল্পনার কাঠামো

প্রথম অধ্যায়

পরিকল্পিত উন্নয়ন পর্যালোচনা

সূচনা: সামগ্রিক পরিস্থিতি

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এর আয়তন ৫৫,৫২৬ বর্গমাইল এবং ১৯৭৯-৮০ সালে জনসংখ্যা ৮·৭২ কোটি। জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ গ্রামে বাস করে এবং ৮০ ভাগ কৃষির উপর নির্ভরশীল। মোট জাতীয় উৎপাদনের অর্ধেকেরও বেশী আসে কৃষি থেকে। মাথা পিছু গড় আয় মাত্র ২০৮৭ টাকা (১৩৫ আমেরিকান ডলার) এবং ন্যূনতম ক্যালোরী পরিমাপে চার-পঞ্চমাংশেরও অধিক অধিবাসী দারিদ্র-সীমার নীচে অবস্থান করছে। দারিদ্র, অপুষ্টি বেকারত্ব ও নিরক্ষরতা ইত্যাদি সমস্যাজর্জরিত বাংলাদেশ অতীতের ঔপনিবেশিক শাসন আমলের স্বাক্ষর বহন করছে।

১·২ গত দুদশক ধরে পর্যায়ক্রমে কয়েকটি উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে এসব সমস্যাবলী সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে কিন্তু জনসাধারণের জীবনযাত্রা মানে কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়নি। অতীতের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের হাতে যতে যায় এবং এরই ফলশ্রুতি স্বরূপ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। যুদ্ধের ধ্বংসলীলা এত ব্যাপক ছিল যে, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সরকারের উপর যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের এক বিরাট দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। তবে স্বাধীনতা যুদ্ধের রাজনৈতিক পটভূমিকায় যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠন কার্যক্রমের সাথে সাথে একটি নতুন জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা মিটানোর জন্য সামাজিক অগ্রাধিকারগুলোর একটি অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে পুনর্বিন্যাস করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাই কালক্ষেপ না করে এবং তথ্যাদির অপ্রতুলতা সত্ত্বেও তাৎক্ষণিক ও কার্যকরী সাময়িকপূর্ণ একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। মোট ৪৪৫৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধার্য করে ১৯৭৩ সালের ১লা জুলাই প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চালু করা হয়।

১·৩ বাস্তবায়ন পর্যায়ে পরিকল্পনাটি একটির পর একটি বাধার সম্মুখীন হয়। প্রথমতঃ উন্নত দেশগুলি অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতি ও অর্থনৈতিক মন্দার জন্য বাংলাদেশের পরিকল্পিত উন্নয়নে যে সাহায্য করার প্রত্যাশা করেছিল তাতে ব্যর্থ হয়। এই অবস্থা ১৯৭৩–৭৮ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ পরিকল্পনাকাল-ব্যাপী চলে। দ্বিতীয়তঃ ১৯৭৪ সালের অক্টোবর বন্যা বিস্তীর্ণ এলাকাব্যাপী শস্যের ক্ষতিসাধন করে এবং এর ফলে দেশ ব্যাপক দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়। তৃতীয়তঃ বিশ্বের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানী-আমদানী বিনিময়ের হার ক্রমশই অবনতির দিকে যায় যাতে বিশেষ করে জ্বালানী আমদানীর ব্যয় বহুলতায় সম্পদের অপচয় ঘটে। চতুর্থতঃ একটি নতুন জাতির কাছে লগ্নিকারী অর্থ এবং শিল্পের ব্যবস্থাপনার পুনর্গঠন এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে একটি জাতীয় প্রশাসনিক কাঠামো স্থাপন অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ এবং জটিল হয়ে দাঁড়ায়। এসব কারণে অর্থনীতির পুনরুদ্ধার মন্থরগতি ও কষ্টদায়ক হয় এবং জাতীয় উৎপাদন ১৯৭৫/৭৬ সালে কেবলমাত্র মাথাপিছু হারে ১৯৬৯/৭০ সালের স্তরে পৌঁছায়।

১·৪ বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি ও অর্থনৈতিক মন্দাবস্থার ফলে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সমাপ্তির আগেই এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংগে সংগেই শুরু করা যাবে না। তাই প্রাপ্ত সম্পদের মধ্যে যতদূর সম্ভব চলতি প্রকল্পসমূহ সমাপ্ত করার উপর জোর দিয়ে অন্তর দশকের শেষ দুই বছরের (১৯৭৮–৮০) জন্য একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

১·৫ সত্তর দশকের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা সাধারণভাবে হতাশাব্যঞ্জক ছিল। সাধারণ মানুষ আজও জীর্ণকুটিরে দারিদ্র ও অশিক্ষার অন্ধকারে কালাতিপাত করছে। কেবলমাত্র ৫ থেকে ১১ বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে জুনিয়ার হাইস্কুল পর্যায়ে শিক্ষা দানের মাধ্যমে [illegible] তাদের মধ্যে লেখাপড়া ছেড়ে দেবার আগে

যেশ উল্লেখযোগ্য। প্রতি দশ হাজার লোকের জন্য মাত্র একজন ডাক্তার রয়েছে। কৃষিখাতে অগ্রগতি তুলনায় উচ্চহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন খাদ্য ঘাটতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ঋণের বোঝাসহ বর্ধিত হারে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করা ছাড়া এদেশের গত্যন্তর ছিল না। এ অবস্থা গত দু'দশকব্যাপী অব্যাহত থাকলেও ১৯৭৫ সাল থেকে পরিবর্তনের সূচনা হয়।

১·৬ ১৯৭৫ সালের পরবর্তী সময়কে অর্থনীতির ভিত্তিকে সুসংহত করার সময় হিসাবে ধরা যায় এবং এর পূর্ববর্তী সময়ের মধ্যে অর্থনীতির পুনর্বাসনের কাজ সম্পন্ন হয়। যদিও ১৯৭৬/৭৭ এবং ১৯৭৮/৭৯ সালে বন্যা ও খরার জন্য কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়, ১৯৭৫ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত জাতীয় উৎপাদন বার্ষিক প্রায় ৫·২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে শিল্পোন্নত দেশসমূহে অর্থনৈতিক মন্দার ফলে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানীর পরিমাণ স্থির থাকা সত্ত্বেও দেশের রপ্তানী আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়; শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতার অধিক ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং নির্মাণ কার্যে তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। উন্নয়ন তৎপরতা অর্থনীতিকে সুসংহত করে তুলে। প্রকৃতপক্ষে সত্তর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থনীতির সন্তোষজনক অগ্রগতি আশি দশকের জন্য বৃহত্তর পরিকল্পনার ভিত্তি রচনা করে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩—৭৮)

১·৭ যুদ্ধ বিধ্বস্ত অর্থনীতির উপর অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন টানা পোড়েনের পটভূমিকায় প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চালু করা হয়। পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অর্থনীতিকে পুনর্গঠন দারিদ্র হ্রাস এবং সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা। এই পরিকল্পনার বিশেষ লক্ষ্য ছিল জাতীয় উৎপাদন বাৎসরিক ৫·৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি করা, বেকারত্ব হ্রাসের জন্য ৪১ লক্ষ জনবর্ষ পরিমাণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা, বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা মোট বিনিয়োগের ২৭ শতাংশে হ্রাস করা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাৎসরিক ৩ শতাংশ থেকে ২·৮ শতাংশে কমিয়ে আনা।

১·৮ কিন্তু প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জাতীয় উৎপাদন কর্মসংস্থান এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা বহুলাংশে অর্জন করা সম্ভব হয়নি, কেননা পরিকল্পনাধীন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন অভ্যন্তরীণ ও বহিঃসম্পদের অপ্রতুলতা, প্রতিষ্ঠানিক দুর্বলতা এবং দক্ষ জনশক্তির অভাবে ব্যাহত হয়। একদিকে প্রতিকূল আবহাওয়া যেমন প্রায়ঃশই কৃষি কার্যে বিঘ্ন ঘটায়, অন্যদিকে মূল্যস্ফীতি ও অর্থনৈতিক মন্দা দেশের সম্পদ সংস্থানের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে। পরিকল্পনা মেয়াদে বিনিয়োগের ৫১ শতাংশ প্রকৃত পক্ষে অর্জিত হয়। খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির হার (বাৎসরিক প্রায় ২·৫ শতাংশ হারে) জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেয়ে কম ছিল এবং ১৯৭৬/৭৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত শিল্পোৎপাদন ১৯৬১/৭০ সালের স্তরে পৌঁছাতে পারেনি। সরকারী খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ অনভিজ্ঞ ব্যবস্থাপনা, দক্ষ জনশক্তির অভাব এবং খুচরা যন্ত্রাংশ ও উপকরণের অপ্রতুল সরবরাহ ইত্যাদি সমস্যায় জর্জরিত ছিল। রপ্তানী বাণিজ্য মুদ্ধকালীন ক্ষতি কাটিয়ে ক্রমান্বয়ে ১৯৭৭/৭৮ সালে (ডলার মূল্যে) ১৯৬১/৭০ সালের পর্যায়ে ফিরে আসে; কিন্তু বৈদেশিক সাহায্যের উপর আমদানীর নির্ভরশীলতা দ্রুত বেড়ে যায়। এসব কারণে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং ইহা ৫·৫ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বাৎসরিক ৪·০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়।

১·৯ অভ্যন্তরীণ সম্পদের অপ্রতুলতার দরুন উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যাহত হয় এবং সরকারী সম্পদের উপর চাপ পড়ে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংস্থান আশানুরূপ না হওয়ায় বৈদেশিক সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। মোট উন্নয়ন ব্যয়ে বহিঃসম্পদের উপর নির্ভরশীলতার হার হ্রাসের পরিবর্তে আরো বৃদ্ধি পেয়ে ৭৮ শতাংশে দাঁড়ায়। পরিকল্পনাকালে প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ স্থির মূল্যে ছিল ৩০২৭ কোটি টাকা; পক্ষান্তরে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ ছিল মাত্র ১৫৭ কোটি টাকা।

১·১০ স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে সমীক্ষাকালে দুটি পর্যায়ে দেখা যায়। প্রথম পর্যায় স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকে ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি সময়কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সময়ে জাতি স্বাধীনতা উত্তরকালীন যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠন ও পরবর্তীকালে ব্যাপক নিবন্ধিত ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থনীতির ভিত্তি দৃঢ় ও উন্নয়নের অনুকূলে পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কতিপয়

স্থিতিশীলতা আনয়নকারী পদক্ষেপ নেয়া হয়। এই দুই পর্যায়ের মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক সূচক সমূহের তুলনামূলক অগ্রগতি নিম্নে সারণী নং ১·১-তে দেখানো হলোঃ

সারণী ১·১

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দুই পর্যায়ের অর্থনৈতিক উন্নয়নের তুলনামূলক পরিস্থিতি

খাত	প্রথম দু'বছর (১৯৭৩—৭৫)	শেষ তিন বছর (১৯৭৫ - ৭৮)
১। বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির গড় হার (%)	৫·৭০*	৬·৪০
প্রান্তিক বছরের পরিস্থিতি ঃ		
১। মোট বিনিয়োগে চলতি বাজার মূল্যে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতাংশ ..	৬·৩০	১৩·৪৫
২। নীট বৈদেশিক মূলধন প্রাপ্তি চলতি বাজার মূল্যে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতাংশ ..	৭·২৪	৮·৮২
৩। মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় চলতি বাজার মূল্যে মোট জাতীয় উৎপাদনের শতাংশ ..	..	৪·৬৩
৪। কর-রাজস্ব চলতি বাজার মূল্যে জাতীয় উৎপাদনের শতাংশ ..	৪·৩৪	৭·৯৩
৫। চলতি বাজেটের উদ্বৃত্ত (কোটি টাকায়) ..	১২৫·১৪	৩৬৭·৪২
৬। খাদ্যশস্য উৎপাদন (লক্ষ টন) ..	১১২·২৪	১৩১·০০

* ১৯৭২/৭৩ সালের প্রকৃত জাতীয় উৎপাদন স্বাভাবিকস্তরের নীচে থাকায় প্রথম দু'বছরের গড় প্রবৃদ্ধির হার (৫·৭০) মূলতঃ পুনরুদ্ধারের হার কেননা ১৯৭৫/৭৬ সালে জাতীয় উৎপাদন ১৯৬৯/৭০ সালের স্তরে পৌঁছায়।

১·১১ পরিকল্পনার প্রথম দু'বছরে প্রধান অন্তরায় ছিল অভ্যন্তরীণ সম্পদের ঘাটতি, তার ফলে পুনর্বাসন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন খুবই ব্যাহত হয়। রাজস্ব আয় প্রত্যাশিত পরিমাণ থেকে প্রায় ২৬ শতাংশ কম ছিল, অন্যদিকে রাজস্ব ব্যয় লক্ষ্যমাত্রা থেকে ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া উন্নয়ন ব্যয়ের উপর পড়ে। পরিকল্পনায় ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৫২৫ কোটি টাকার সাথে তুলনা করলে ১৯৭৩/৭৪ সালে উন্নয়ন ব্যয় হয়ে ছিল ৪০০ কোটি টাকা যা ১৯৭২/৭৩ সালের বাজার মূল্যে ছিল মাত্র ৩০০ কোটি টাকা। ১৯৭৪/৭৫ সালে অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। ১৯৭৪/৭৫ সালে উন্নয়ন ব্যয় ৫২৫ কোটি টাকা ছিল কিন্তু বিশেষ করে ফসলের ক্ষয়ক্ষতির দরুন অভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায়, তাই এই ব্যয়ের প্রকৃত পরিমাণ ১৯৭৩/৭৪ সালের পর্যায়েই থেকে যায়, পক্ষান্তরে পরিকল্পিত ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৬৪৫ কোটি টাকা।

১·১২ প্রকৃত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দিক থেকে এই পরিকল্পনার প্রথম দু'বছরের অভিজ্ঞতা ছিল হতাশাব্যঞ্জক। পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রার অধিকাংশই অর্জন করা সম্ভব হয়নি। ১৯৭৩/৭৪ সালে জাতীয় আয় প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৪·১ শতাংশ নির্ধারণ করা হয় যাতে ১৯৬৯/৭০ সালের প্রবৃদ্ধির হার অর্জন করা সম্ভব হয়, কিন্তু প্রকৃত জাতীয় আয় বেঞ্চ মার্কের নীচে ছিল। ১৯৭৪/৭৫ সালে প্রবৃদ্ধির হার লক্ষ্যমাত্রা ৫·৫ শতাংশের মাত্র ২·০ শতাংশ অর্জিত হয়। ১৯৭৪/৭৫ সালে কৃষি ও শিল্প উভয় খাতে উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৬৯/৭০ সালের উৎপাদন স্তরের নীচে (যথাক্রমে ১৪% ও ৮৭%) ছিল। বিশেষতঃ নতুন রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে রপ্তানী বাণিজ্য পুনর্বিন্যাস করার প্রয়োজন হয় ফলে রপ্তানী বাণিজ্যে অগ্রগতি ছিল মন্থর। চা, কাঁচা ও পাকা চামড়া, দিয়াশলাই ও কাগজ যা ইতিপূর্বে পাকিস্তানে

বাজারজাত হতো এখন এগুলোর জন্য বাজারের সন্ধান করতে হয়, অন্যদিকে শিল্পোন্নত দেশসমূহে মন্দার-কালে পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এসব কারণে ১৯৭৪/৭৫ সালের মোট রপ্তানী আয় ১৯৬৯/৭০ সালের তুলনায় ২৫ শতাংশ নীচে থাকায় বৈদেশিক সাহায্যের উপর বাংলাদেশের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়।

১·১৩ অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের অনমনীয়তা ও সম্পদের অপ্রতুলতার দরুন পরিকল্পিত বিনিয়োগ কর্মসূচী সংশোধন করার প্রয়োজন হয় যাতে করে পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করা সম্ভব হয়। একটি ত্রি-বার্ষিক "হার্ডকোর" কার্যক্রম (১৯৭৫—৭৮) হাতে নেয়া হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রক্রিয়া এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে শুরু হয়। বিভিন্ন স্থিতিকরণ পদক্ষেপ ও বর্ধিত পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্যের সাথে এই পরিবর্তন অর্থনীতিতে উন্নয়নের গতিধারাকে ত্বরান্বিত করে।

১·১৪ ১৯৭৫ সাল থেকে উন্নয়ন কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পায়। পরিকল্পনার প্রথম দু'বছরে উন্নয়ন ব্যয়ের পরিমাণ চলতি মূল্যে ছিল ৪৬২ কোটি টাকা পক্ষান্তরে শেষ তিন বছরে ইহা বৃদ্ধি পেয়ে গড়ে ১০৫৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৭৭/৭৮ সালে চলতি বাজার মূল্যে উন্নয়ন ব্যয়ের পরিমাণ ১৯৭৩/৭৪ সালের ৪০০ কোটি টাকার স্থলে ১২৬৭ কোটিতে দাঁড়ায়। বিনিয়োগ জাতীয় উৎপাদনের শতাংশ ১৯৭৪/৭৫ সালের ৬·৩০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৭/৭৮ সালে ১৩·৪৫ শতাংশে উন্নীত হয়।

১·১৫ ১৯৭৩—৭৫ সাল পর্যন্ত মোট উন্নয়ন ব্যয়ের মাত্র ২০ শতাংশ অভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। অধিকতর কার্যকরী রাজস্ব ব্যবস্থার ফলে হার্ডকোর কার্যক্রমকালে অভ্যন্তরীণ সম্পদের ভাগ ২৫ শতাংশে বৃদ্ধি পায়। পরিকল্পনার শেষ তিন বছরে সরকারের কর রাজস্বের গড় পরিমাণ প্রথম দু'বছরের ৪২০ কোটি টাকার স্থলে ৮৮৪ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। কর প্রাপ্তি জাতীয় উৎপাদনের শতাংশ হার ১৯৭৩/৭৪ সালের ৪·২৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে পরিকল্পনার প্রান্তিক বৎসরে (১৯৭৭/৭৮ সালে) ৭·৯৩ শতাংশে উন্নীত হয়। পরিকল্পনার প্রথম মেয়াদে সরকার প্রতিবৎসরে গড় ৯৮ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয়ের ব্যবস্থা করে, কিন্তু পরবর্তী তিন বছরে গড়ে প্রতিবৎসরে ঘাটতি ব্যয়ের গড় পরিমাণ ছিল ৬৪ কোটি টাকা এবং ১৯৭৬/৭৭ সালে কোন ঘাটতি ব্যয়ের ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

১·১৬ পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পুনরুদ্ধারের সাথে সাথে রাজস্ব ও মুদ্রাসংক্রান্ত ব্যবস্থাপনায় উন্নতি ও সন্তোষজনক শস্য উৎপাদন মূল্য-স্তরে অনুকূল প্রভাব সৃষ্টি করে। পরিকল্পনার প্রথম দু'বছরে ঢাকার সরকারী কর্মচারীদের জীবনযাত্রার সাধারণ সূচক বার্ষিক গড়ে ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭২/৭৩ সালে ১৮১·৫১ (১৯৬৯/৭০ ১০০) থেকে ১৯৭৪/৭৫ সালে ৪০৭·৫৮ তে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে এই সূচক প্রতি বছর গড়ে ২·৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে শেষ বছরে ৪৪০·৭০তে উন্নীত হয়।

১·১৭ ১৯৭০ দশকের প্রথমার্ধে মুদ্রাস্ফীতির ফলে শিল্প ও কৃষি উভয় ক্ষেত্রে প্রকৃত মজুরী কমে যায়। মজুরীর সাধারণ সূচক ১৯৭২/৭৩ সালে ৬৭·৬ (১৯৬৯/৭০ ১০০) থেকে নেমে ১৯৭৪/৭৫ সালে ৫১·৩৯তে দাঁড়ায়। যদিও এই সূচক ভাল শস্য উৎপাদনের ফলে ১৯৭৫/৭৬ সালে ৬৬·৯তে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই ঊর্ধগতি অনবচ্ছিন্ন রাখা সম্ভব হয়নি। খানাভিত্তিক ব্যয় তথ্যের অনুসারে ১৯৭৪/৭৫ সালে প্রকৃত মজুরীর সূচক ৪৩·৬ এ নেমে আসে (১৯৬৯/৭০—১০০) এবং ১৯৭৭/৭৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৬·৭তে উন্নীত হয় এবং কৃষি ক্ষেত্রে প্রকৃত মজুরীর সূচক একই সময়ে ৫১·৬ থেকে ৬৩·৮ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইহা সব সময়ই প্রাগ-স্বাধীনতা স্তরের নীচেই ছিল।

দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮—৮০)

১·১৮ যদিও প্রথম পরিকল্পনার শেষ দিকে অর্থনীতি অধিকতর স্থিতিশীলতা অর্জন করে এবং উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার উন্নতি ঘটে, তবুও অসমাপ্ত প্রকল্পের আধিক্যহেতু, যা পরিকল্পনার উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অর্থ-বহভাবে প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি। এই অবস্থায় প্রাপ্ত সম্পদের মধ্যে যতদূর সম্ভব চলতি প্রকল্পগুলো সমাপ্ত করার লক্ষ্যে একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়। দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে ছিল ৫·৬ শতাংশ হারে জাতীয় আয়ের (২·৮ শতাংশ হারে মাথা পিছু আয়ের) প্রবৃদ্ধির অর্জন করা, উন্নয়ন কার্যক্রমের ব্যয় মিটানোর জন্য অভ্যন্তরীণ

সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমে অধিকতর স্বনির্ভরতা অর্জন করা, খাদ্যে স্ব-নির্ভরতা অর্জনের প্রচেষ্টা চালানো, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো, খাদ্য বস্ত্র, পানীয় ইত্যাদির মত মৌলিক চাহিদার সরবরাহে উন্নতি বিধান করা ও কর্মসংস্থানক্ষেত্রে আরোও অবনতি রোধ করা।

১·১৯ দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ অধিকাংশেই অর্জন করা সম্ভব হয়নি। জাতীয় উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার ১৯৭৮/৭৯ এবং ১৯৭৯/৮০ সালে যথাক্রমে ৪·০ শতাংশ ও ২·৯০ শতাংশ ছিল। দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় গড় প্রবৃদ্ধির হার পরিকল্পিত প্রবৃদ্ধির হার ৫·৬ শতাংশের স্থলে ৩·৫ শতাংশ ছিল। ১৯৭৮/৭৯ সালে মোট খাদ্য শস্যের উৎপাদন ১৯৭৭/৭৮ সালের তুলনায় কিছু হ্রাস পেয়ে ১৩০·২৯ লক্ষ টনে দাঁড়ায়; কিন্তু ১৯৭৯/৮০ সালে খাদ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৩·৫০ লক্ষ টনে উন্নীত হয়। ১৯৭৯ সালের জ্বালানী তৈল মূল্যের ঊর্ধগতি ব্যতীত প্রতিকূল আবহাওয়া দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে রোধ করে।

১·২০ প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে শিল্প খাতের উৎপাদন ১৯৬৯/৭০ সালের পর্যায়ে উন্নীত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়; ১৯৭৬/৭৭ সালের প্রথম ভাগে সেই পর্যায়ে ফিরে আসা সম্ভব হয় যদিও ইহার গতি পরিকল্পিত হারের তুলনায় মন্থর ছিল। দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে শিল্পখাতের উৎপাদন মূল্যমানে গড়ে মাত্র ২·৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়। বর্ধিত খরচ মিটাতে উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে পাট শিল্প ব্যতীত অন্যান্য পাটটি কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয় তবে প্রায় সব-সেক্টরেই উৎপাদন ক্ষমতা অব্যবহৃত ছিল।

১·২১ শিল্পনীতিকে বেসরকারী বিনিয়োগমুখী করা ছিল দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। বেসরকারী বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা ৩ কোটি টাকা থেকে ১০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী খাতের যৌথ প্রচেষ্টায় শিল্প স্থাপনের জন্য বর্ধিত পরিমাণে শিল্প ঋণের ব্যবস্থা করা হয় এবং পরিত্যক্ত শিল্প থেকে পুঁজি প্রত্যাহার করা হয়। ফলে বেসরকারী বিনিয়োগ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বেসরকারীখাতে ঋণদানের পরিমাণ ১৯৭৭/৭৮ সালে ১২৪ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বছরে ৫১৬ কোটি টাকায় উন্নীত হয়।

প্রবৃদ্ধির হার, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

১·২২ প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক ও দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রবৃদ্ধি হার ভিত্তি বৎসরের (Base year) প্রকৃত জাতীয় উৎপাদনের থেকে হিসাব করা হয়েছে। এই দুটি পরিকল্পনার ভিত্তি বৎসর যথাক্রমে ১৯৭২/৭৩ সাল এবং ১৯৭৭/৭৮ সাল।

১·২৩ প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে জাতীয় উৎপাদন ৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যার ফলে বাৎসরিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ৬·১ শতাংশে দাঁড়ায়।

১·২৪ সারণী নং ১·২-এ প্রদত্ত জাতীয় উৎপাদনের কাঠামো বৈকল্য প্রবৃদ্ধি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে কৃষি খাত ৪·৯ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি লাভ করে এবং দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় এই প্রবৃদ্ধির হার ১·৮ শতাংশে দাঁড়ায়। ১৯৭২/৭৩ সালের প্রকৃত উৎপাদন স্বাভাবিকের নিম্নে থাকার দরুন প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে কৃষির প্রবৃদ্ধির হার দ্রুততর ছিল। ১৯৭৩—৮০ সময়কালীন কৃষির প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৪·০ শতাংশ। শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধি এত মন্থর ছিল যে প্রথম পরিকল্পনার শেষ দিকেও শিল্প খাতের উৎপাদন বেঞ্চ মার্ক পরিমাপের নীচে থাকে। যদিও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনাকালে শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২·৩ শতাংশ কিন্তু ১৯৭৩—৮০ মেয়াদে ১৯৭২/৭৩ সালের প্রকৃত জাতীয় উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৭·২ শতাংশ। পরিবহন, ব্যাংকিং, বাণিজ্য, সরকারী ইত্যাদি সার্ভিস খাত জাতীয় আয়ের চেয়ে অধিক হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করে।

সারণী

প্রথম পঞ্চবার্ষিক ও দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা

(১৯৭২/৭৩ সালের

খাত	১৯৭২/৭৩		১৯৭৪/৭৫	১৯৭৬/৭৮	১৯৭৯/৮০	১৯৭৩ –৭৫ (প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম দু'বছর)	
	বেঞ্চমার্ক	প্রকৃত	প্রকৃত	প্রকৃত	প্রকৃত	বেঞ্চমার্কের উপর	প্রকৃতের উপর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১। কৃষি	২,৮৮৩	২,৭২২	২,৯৭০	৩,৪৫৪	৩,৫৮০	১·৫	৪·৪
২। শিল্প	৫২০	৩৩০	৩৭৪	৫১৩	৫৩৭	(–)২৩·৩	৬·৪
৩। নির্মাণ	১৮৪	১৪৪	১৭৬	২৬৮	৩৭৩	(—) ২·২	১০·৬
৪। শক্তি ও গ্যাস	১৫	৮	১০	১৬	২০	(—)১৮·৩	১১·৮
৫। গৃহায়ণ	২৩৬	২৩৬	২৪৯	২৮১	৩০৪	২·৭	২·৭
৬। বাণিজ্য, পরিবহণ ও অন্যান্য সার্ভিসেস	১,১৬৫	১,০৯০	১,২৮১	১,৫৫৭	১,৭০৭	৪·৯	৮·৪
জাতীয় আয় (মোট)	৫,০০৩	৪,৫৩০	৫,০৬০	৬,০৮৯	৬,৫২১	০·৫	৫·৭
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	৭৪·৩	৭৪·৩	৭৮·৯	৮৩·৭	৮৭·২	৩·০	৩·০
মাথাপিছু আয়(টাকা)	৬৭৩	৬১০	৬৪১	৭২৭	৭৪৮	(—) ২·৪	২·৫

১·২

কালে জাতীয় আয় ও প্রবৃদ্ধির হার

মূল্যমানে)

(কোটি টাকায়)

	বাৎসরিক চক্র বৃদ্ধি হারে প্রবৃদ্ধি (%)				
	১৯৭৩—৭৮ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সময়াধীন			১৯৭৩—৮০ (প্রথম পঞ্চবার্ষিক ও দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা সময়াধীন)	
১৯৭৫—৭৮ (প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ তিন বছর)	বেঞ্চমার্কের উপর	প্রকৃতের উপর	১৯৭৮—৮০ (দ্বি বার্ষিক পরিকল্পনা সময়াধীন)	বেঞ্চমার্কের উপর	প্রকৃতের উপর
৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৫·২	৩·৭	৪·৯	১·৮	৩·১	৪·০
১১·১	(—) ০·৩	৯·২	২·৩	০·৫	৭·২
১৫·০	৭·৮	১৩·২	১৮·০	১০·৬	১৪·৫
১৭·০	১·৩	১৪·৯	১১·৮	৪·২	১৪·০
৪·১	৩·৬	৩·৬	৪·০	৩·৭	৩·৭
৬·৭	৬·০	৭·৪	৪·৭	৫·৬	৬·৬
৬·৪	৪·০	৬·১	৩·৫	৩·৯	৫·৩
২·০	২·৪	২·৪	২·১	২·৩	২·৩
৪·৩	১·৬	৩·৬	১·৪	১·৫	৩·০

১.২৫ বিগত সাত বছরে অর্থনীতিতে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটেনি। সারণী নং ১.৩-তে তা দেখা যেতে পারে। যদিও এ সময়ে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জাতীয় আয়ে কৃষি, শিল্প এবং অন্যান্য খাতে অবদান কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে কিন্তু কৃষি অর্থ ব্যবস্থায় প্রধান খাত হিসেবেই রয়ে গেছে। ঐ সময়ে জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান ৫৭.৬ শতাংশ থেকে ৫৪.১ শতাংশে নেমে আসে। একটি উন্নয়নশীল অর্থনীতির স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান ক্রমশঃ হ্রাস পায় এবং শিল্পের অবদান বৃদ্ধি পায়, কিন্তু ১৯৭০ দশকে বাংলাদেশের বেলায় তা ঘটেনি। গত সাত বছরে মোট বিনিয়োগের কৃষি ও শিল্প খাত পেয়েছে যথাক্রমে ৩০.০৮ শতাংশ ও ১৫.২৪ শতাংশ। অবশিষ্ট বিনিয়োগ অন্যান্য খাতে নিয়োজিত হয়েছে কিন্তু এসব কৃষি ও শিল্পের যৌত প্রবৃদ্ধি হার থেকে দ্রুততর হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অধিকন্তু এই দুই খাতের অগ্রগতি মন্থর হয়ে পড়ে—কৃষি খাতে এই মন্থরতার কারণ প্রধানতঃ প্রতিকূল আবহাওয়া এবং শিল্প ক্ষেত্রে মন্থরতার কারণ উৎপাদন ক্ষমতার অপ্রতুল ব্যবহার ও চলতি প্রকল্প-সমূহের বাস্তবায়নে কালবিলম্ব। বর্ধিত উৎপাদনের অবশিষ্ট সমস্ত খাতের অবদান শতকরা ৫৩ ভাগ যা ১৯৭২/৭৩ সালের বেঞ্চমার্ক পর্যায়ের শতকরা ৩২ ভাগের চেয়ে যথেষ্ট ঊর্ধ্বে। সর্বোচ্চ বৃদ্ধির হার বাণিজ্য ও অন্যান্য খাতে, এর অবদানের পরিমাণ ২৩.৩০ শতাংশ থেকে বর্ধিত হয়ে ৩৫.৭০ শতাংশে দাঁড়ায়। বাণিজ্য ও অন্যান্য খাতের দ্রুততর প্রবৃদ্ধির মূলে রয়েছে বহির্বাণিজ্য বিশেষ করে আমদানী বাণিজ্যের বিপুল বৃদ্ধি, ১৯৭৩/৭৪ সালে আমদানীর পরিমাণ ছিল ৭৪০ কোটি টাকা, ১৯৭৯/৮০ সালে ইহা চলতি মূল্যে ৩৯৫১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অন্য একটি খাত বিশেষ অগ্রগতি লাভ করে, সেটা হল নির্মাণ খাত। সত্তর দশকে বিনিয়োগের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এই খাতে ব্যয় করা হয়।

সারণী ১.৩

জাতীয় আয়ের কাঠামোগত পরিবর্তন

সারণী

জাতীয় আয়ের
(১৯৭২/৭৩ সালের

খাত		১৯৭২/৭৩		১৯৭৯/৮০
		বেঞ্চমার্ক	প্রকৃত	প্রকৃত
১। কৃষি	..	২,৮৮৩	২,৭২২	৩,৫৮০
২। শিল্প	..	৫২০	৩৩০	৫৩৭
৩। নির্মাণ	..	১৮৪	১৪৪	৩৭৩
৪। শক্তি ও গ্যাস	..	১৫	৮	২০
৫। গৃহায়ণ	..	২৩৬	২৩৬	৩০৪
৬। বাণিজ্য, পরিবহণ ও অন্যান্য সার্ভিসসমূহ		১,১৬৫	১,০৯০	১,৭০৭
	মোট ..	৫,০০৩	৪,৫৩০	৬,৫২১

১.৬

কাঠামোগত পরিবর্তন,
মূল্যমানে)

[কোটি টাকায়]

জাতীয় আয়ের গঠন			বর্ধিত উপাদানে বিভিন্ন খাতের অবদান (শতাংশ)	
১৯৭২/৭৩ বেঞ্চমার্ক	১৯৭২/৭৩ প্রকৃত	১৯৭৯/৮০ প্রকৃত	বেঞ্চমার্কের উপর	প্রকৃতের উপর
৫৭.৬০	৬০.০৯	৫৪.৯০	৪৫.৯২	৪৩.০৯
১০.৪০	৭.২৮	৮.২৩	১.১২	১০.৪০
৩.৭০	৩.১৮	৫.৭২	১২.৪৫	১১.৫০
০.৩০	০.১৮	০.৩১	০.৩৩	০.৬০
৪.৭৩	৫.২৯	৪.৬৬	৪.৪৮	৩.৪২
২৩.৩০	২৪.০৬	২৬.১৮	৩৫.৭০	৩০.৯৯
১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

১·২৬ বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ঃ গত সাত বছরে বিনিয়োগ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি মূল্যে ১৯৭৯/৮০ সালের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৭৩/৭৪ সালের তুলনায় সাত গুণেরও অধিক। ১·৪ নং সারণীতে প্রথম পঞ্চবার্ষিক ও দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের হিসাব দেখানো হয়েছে। ১৯৭৫/৭৬ সালে মোট বিনিয়োগ জাতীয় আয়ের ৯·৩২ শতাংশ ছিল, ইহা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৯/৮০ সালে ১৬·৫১ শতাংশে দাঁড়ায়। এই বিনিয়োগের একটা বড় অংশ আসে বৈদেশিক সাহায্য থেকে। দেশের অর্থনীতিতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১০,৭৭৪ কোটি টাকা, পক্ষান্তরে নীট বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির পরিমাণ ছিল ৭,৮৬৭ কোটি টাকা।। ১৯৭৩/৭৪ সালে নীট বৈদেশিক মূলধন জাতীয় আয়ের ৬·১৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৯/৮০ সালে ১২·১৭ শতাংশে উন্নীত হয়।

১·২৭ যদিও মোট বিনিয়োগের অতি সামান্য অংশ অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় থেকে আসে, কিন্তু এতে কিছুটা উন্নতি সাধিত হয়। ১৯৭৩/৭৪ সালে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের অনুপাত শূন্যের কোটা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৯/৮০ সালে ৪·৩৪ শতাংশে দাঁড়ায়, কিন্তু এই বৃদ্ধি অত্যন্ত কম। ইহা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে জনসংখ্যার অধিকাংশেই অত্যন্ত গরীব এবং তাদের পক্ষে সঞ্চয় করা সম্ভব নয়। বন্যা, খরা, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য বাংলাদেশের জনসাধারণ কোন প্রকার ঝুঁকি নিতে বিমুখপরায়ণ হবার দরুণ সঞ্চয়ের হারও কমে গেছে। সত্তর দশকের মুদ্রাস্ফীতি জনসাধারণের সঞ্চয় ক্ষমতাকে কমিয়ে এনেছে। তদুপরি সুদের হার মুদ্রাস্ফীতি হারের নিম্নে থাকায় প্রতিষ্ঠানিক সঞ্চয় ব্যাহত হয়েছে।

সারণী ১-৪

প্রথম পঞ্চবার্ষিক ও দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে
বাৎসরিক বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের হিসাব
(চলতি মূল্য)

সারণী

প্রথম পঞ্চবার্ষিক ও দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে বাৎসরিক

খাত		১৯৭৩/৭৪	১৯৭৪/৭৫
১। জাতীয় আয় (চলতি বাজার মূল্য)	..	৭,১৪৭	১২,৩০৭
২। প্রাপ্তি সম্পদঃ (সাভিংস সহকারে)	..	৪৫০	৯০৯
৩। মোট প্রাপ্তি সম্পদ (১) অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ (আই) ও (২) ভোগের জন্য (সি)	..	৭,৫৯৭	১৩,২১৬
৪। মোট বিনিয়োগ (আই)	..	৪৩৬	৭৭৫
৫। ভোগ (সি)	..	৭,১৬১	১২,৪৪১
৬। নীট বৈদেশিক মূলধন প্রাপ্তি	..	৪৪১	৮৯১
৭। মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	..	(—)৫	(—)১১৬
৮। বাজারদরে জাতীয় আয়ের শতাংশরূপে :	..		
(ক) বিনিয়োগ	..	৬·১০	৬·৩০
(খ) নীট বৈদেশিক প্রাপ্তি	..	৬·১৭	৭·২৪
(গ) সঞ্চয়	..	(—)০·০৭	(—)০·৯৪

উৎস : পরিকল্পনা কমিশন।

১.৪

বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের হিসাব (চলতি মূল্যে)

[কোটি টাকায়]

১৯৭৫/৭৬	১৯৭৬/৭৭	১৯৭৭/৭৮	১৯৭৮/৭৯	১৯৭৯/৮০
১০,৮৬৭	১১,০৭৫	১১,৩৩৮	১৫,৪৫৭	১৮,২০৬
১,৩০৬	৬৯৯	১,২৮৪	১,৪৪৮	২,৫৬২
১২,১৭৩	১১,৭৭৪	১৪,৬২২	১৬,৯০৫	২০,৭৬৮
১,০১৩	১,৪৮৯	১.৭৯৪	২,২৬১	৩,০০৬
১১,১৬০	১০,২৮৫	১২,৮২৮	১৪,৬৪৪	১৭,৭৬২
১,২৫৮	৬২২	১,১৭৬	১,২৬১	২,২১৬
(—)২৪৫	৮৬৭	৬১৮	৯৯৮	৭৯০
৯·৩২	১১·৪৫	১১·৪৫	১৪·৬১	১৬·৫১
১১·৫৮	৫·৬২	৮·৮২	৮·১৭	১২·১৭
(—)২·২৫	৭·৮১	৪·৬১	৬·৪৬	৪·০৪

১·২৮ বিনিয়োগের দিক থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিনিয়োগের উচ্চসীমা নির্ধারণের ফলে বিনিয়োগ সুবিদাধি কমে আসে এবং তার ফলে বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যাহত হয়। অর্থসংস্থান প্রকৃত পক্ষে সমস্যা-জনিত ছিল তার কারণ সঞ্চয়কে সঞ্চালনের জন্য সরকারী কোম্পানীগুলোকে খুবই কম উন্নীত করা হয়েছিল। ব্যাংক প্রতিষ্ঠানগুলি মুনাফা বিহীন সরকারী কর্পোরেশনগুলির আর্থিক চাহিদা মেটাতে ন্যস্ত থাকায় বেসরকারী উন্নয়নে অর্থ যোগান দিতে পারেনি।

১·২৯ সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি বিনিয়োগের উপর মুনাফা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। ১৯৭০/৭৪ সাল থেকে ১৯৭৯/৮০ সাল পর্যন্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি কয়েক হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের উপর কেবলমাত্র ৬৩ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়। ১৯৭৯/৮০ সালে তাদের ব্যাংক হতে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ ২৩৯·৭৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। কর্পোরেশনগুলি জনগণের সঞ্চয়ে কোন প্রকার অবদান না রেখে পক্ষান্তরে ব্যাংক থেকে ঋণ তোলে যা অন্য কোন উৎপাদনমূলক কাজে ব্যবহার করা যেত। এর চেয়েও গুরুতর পরিস্থিতি এই ছিল যে, চলতি ঘাটতির পাশাপাশি কর্পোরেশনগুলোকে তাদের মূলধন পুনঃপ্রতিষ্ঠা কার্যক্রমে (Balancing, Modernisation and Replacement) অর্থযোগানের জন্য বিদেশ থেকে নূতন ঋণ সংগ্রহ করে সরকারকেই তার দায়ভার বহন করতে হয়।

১·৩০ সরকারী খাতে পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কার্যক্রম রাজস্বের উপর তীব্র চাপ সৃষ্টি করে। এছাড়া নতুন জাতীয় সরকার প্রাগ-স্বাধীনতা সময়ে কল্যাণমুখী কার্যক্রমসহ জনসেবা বাড়ানোর জন্য প্রবল চাপের সম্মুখীন হন। এর ফলে ১৯৭২/৭৩ সাল থেকে ১৯৭৯/৮০ সাল পর্যন্ত সরকারের চলতি ব্যয় বাৎসরিক গড়-পড়তা ২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। একই সময়ে কেবলমাত্র ভোগ্যপণ্যে ভর্তুকী ৮১০ কোটি টাকা বা মোট চলতি ব্যয়ের ৪ শতাংশ। চলতি ব্যয় বৃদ্ধির জন্য সরকারের স্বাভাবিক রাজস্ব আয়ে খুব কম সঞ্চয় জমা থাকে। উপরোক্ত সময়ে সরকারী খাতে সঞ্চয় ১১০৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায় যা রাজস্ব আয়ের ৪·২০ শতাংশ। এর ফলে স্বাধীনতা উত্তরকালে সরকারকে বিপুল ঘাটতি অর্থ সংস্থান করতে হয়; কেবল-মাত্র ১৯৭৬/৭৭ সালে ব্যতিক্রম ছিল যখন অন্যান্য ব্যবস্থার পাশাপাশি রাজস্ব ব্যয়ে কৃচ্ছতা অবলম্বন করা হয়।

১·৩১ প্রথম পঞ্চবার্ষিক ও দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে রাজস্ব নীতিমালায় তেমন কোন উল্লেখ-যোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। কর-কাঠামোর ভিত্তি সীমিত এবং অস্থিতিস্থাপক ছিল। রাজস্ব কর বৈদেশিক সাহায্য পুষ্ট আমদানীর উপর নির্ভরশীল ছিল এবং মোট রাজস্ব করের ৮৬ শতাংশ ছিল পরোক্ষ কর। যদিও কর ব্যবস্থা মোটামুটিভাবে বিশদ ছিল, কিন্তু কর-সংগ্রহ অত্যন্ত কম ছিল। সারণী ১·৫ থেকে দেখা যায় যে ১৯৭৩/৭৪ সালে কর প্রাপ্তি জাতীয় আয়ের ৪·২৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৯/৮০ সালে ৭·৯০ শতাংশে দাঁড়ায়।

সারণী ১·৫

জাতীয় আয়ের শতাংশরূপে কর প্রাপ্তি

(চলতি মূল্যে) (কোটি টাকায়)

বৎসর	জাতীয় আয় (চলতি বাজার মূল্যে)	মোট কর	প্রত্যক্ষ কর	পরোক্ষ কর	কর-জাতীয় আয় আনুপাতিক (শতাংশ)
১৯৭৩/৭৪	৭,১৪৭	৩০৬·৪০	৪৭·৬৫ (১৬)	২৫৮·৭৫ (৮৪)	৪·২৯
১৯৭৪/৭৫	১২,৩০৭	৫৩৪·২২	১০৫·৬৫ (২০)	৪২৮·৫৭ (৮০)	৪·৩৪
১৯৭৫/৭৬	১০,৮৬৭	৮২৫·০২	১৬০·১৪ (১৯)	৬৬৪·৮৮ (৮১)	৭·৫৯
১৯৭৬/৭৭	১১,০৭৫	৭৬৯·১৫	১৪২·১৮ (১৮)	৬২৬·৯৭ (৮২)	৬.৯৪
১৯৭৭/৭৮	১৩,৩৩৮	১,০৫৭·৪৫	২০৪·৬৪ (১৯)	৮৫২·৮১ (৮১)	৭.৯৩
১৯৭৮/৭৯	১৫,৪৫৭	১,২৬৫·২৯	২৪২·৭৮ (১৯)	১,০২২·৫১ (৮১)	৮·১৯
১৯৭৯/৮০	১৮,২০৬	১,৪৩৮·৯৫	২৩১·৬৯ (১৬)	১,২০৭·২৬ (৮৪)	৭·৯০

টীকা : বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা মোট করের শতাংশ।

খাতওয়ারী উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি

১·৩২ গত সাত বছরে দেশে জাতীয় আয় ৪৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন কোন খাতে উৎপাদন ১৯৬৯/৭০ সালের মাত্রা অতিক্রম করেছে। কৃষি ও শিল্প খাতের অগ্রগতি নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১·৩৩ **কৃষি :** প্রথম পরিকল্পনায় খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১৫·১৪ মিলিয়ন টন ধার্য করা হয়। পক্ষান্তরে ১৯৭২/৭৩ সালে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১০·০২ মিলিয়ন টন এবং ১৯৬৯/৭০ সালে ১১·৯২ মিলিয়ন টন। ১৯৭৭/৭৮ সালে খাদ্য শস্যের প্রকৃত উৎপাদন দাঁড়ায় ১৩·১১ মিলিয়ন টন অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার ১৫ শতাংশ কম। ১৯৬৯/৭০ সালের পর্যায় থেকে খাদ্য শস্যের উৎপাদন বাৎসরিক গড়ে ১·১ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি লাভ করে, ইহা ছিল জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে কম। ফলে খাদ্য আমদানীর উপর দেশের নির্ভরশীলতা আরো বেড়ে যায়। ১৯৬৯/৭০ সালে খাদ্য আমদানীর পরিমাণ ছিল ১·৫৫ মিলিয়ন টন, ১৯৭৯ সালে খরার ফলে ১৯৭৯/৮০ সালে খাদ্য আমদানীর পরিমাণ ২·৭৮ মিলিয়ন টনে বৃদ্ধি পায়।

১·৩৪ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও উন্নতমানের উৎপাদন পদ্ধতির মন্থরগতিতে সম্প্রসারণ খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনে ব্যর্থতার পরিচয় বহন করে। ১৯৭৯/৮০ সালে মোট আবাদী জমির মাত্র ১১ শতাংশ যান্ত্রিক চাষের আওতায় ছিল এবং কৃষিযোগ্য জমিতে প্রতি একরে মাত্র ৫৬ পাউন্ড সার ব্যবহৃত হয়েছে। ১৯৭৩/৭৪ সাল থেকে ১৯৭৯/৮০ সাল পর্যন্ত সার বন্টন প্রতি একরে বৎসরে ১৪·৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে : তুলনামূলকভাবে প্রাগ-স্বাধীনতাকালে এই বৃদ্ধির হার ছিল ১৬·৩ শতাংশ। প্রথম পরিকল্পনার শেষ বছরে ৪১·২০ লক্ষ একর আবাদী জমি সেচের আওতায় আনা হবে বলে আশা করা হয়েছিল ; কিন্তু মাত্র ২৮·৭৫ লক্ষ একর সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। অধিকন্তু সংগ্রহ ও সরবরাহ পদ্ধতির জটিলতার

দরুন বীজ বণ্টন বিঘ্নিত হয়েছে। উচ্চ ফলনশীল বীজের সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার দরুন দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে উচ্চফলনশীল বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং গুদামজাতকরণের জন্য কয়েকটি উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। স্বল্পমেয়াদী উদার ঋণ ব্যবস্থা কৃষিতে আধুনিক উপকরণ ব্যবহারের পথ সুগম করে। কিন্তু উপকরণের সরবরাহে প্রায়শঃ বিঘ্ন ঘটায় সময়মত ঋণ প্রাপ্তি ব্যাহত হয়। প্রধান প্রধান ফসলের উৎপাদন নীচে দেওয়া হলোঃ

সারণী ১·৬

প্রধান প্রধান ফসলের উৎপাদন

ফসল	একক	১৯৬৯/৭০ (প্রকৃত)	১৯৭২/৭৩ (প্রকৃত)	১৯৭৭/৭৮ (প্রকৃত)	১৯৭৯/৮০ (প্রকৃত)*
১। চাল	লক্ষ টন	১১৮·১৬	৯৯·৩০	১২৭·৬৪	১২৫·৩৯
২। গম	,,	১·০৩	০·৯০	৩·৪৪	৮·১০
৩। ইক্ষু	,,	৭৪·০০	৫৩·১৮	৬৫·৯০	৬৫·৭০
৪। চা	লক্ষ পাউণ্ড	৬৬৮·০০	৫৩২·০০	৮১৬·০০	৭৮৪·৪০
৫। পাট	লক্ষ বেল	৭১·৭১	৬৫·১৪	৫৩·৫৯	৬০·০০

* ১৯৭৮/৭৯ এবং ১৯৭৯/৮০ সালে ধান, ইক্ষু ও চা উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১·৩৫ শিল্পোৎপাদনঃ শিল্প খাতের পুনরুদ্ধার গুরুত্বর ছিল। শিল্পোৎপাদন সূচক (১৯৬৯/৭০= ১০০) ১৯৭২/৭৩ সালে ছিল ৮১, ১৯৭৬/৭৭ সালে ইহা প্রাগ-স্বাধীনতা পর্যায়ে পৌঁছে এবং ১৯৭৯/৮০ সালে ১১২তে উন্নীত হয়। ইহা প্রতীয়মান হয় যে সত্তর দশকের শেষার্ধে সরকারী খাতের অধিকাংশ সমস্যাই কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়েছে, ফলে যে সব সরকারী কর্পোরেশন বহুদিন যাবৎ লোকসান দিয়ে আসছিল সেগুলি লাভ জনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। নীচের সারণীতে প্রথম পঞ্চবার্ষিক ও দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে প্রধান প্রধান শিল্পসমূহের উৎপাদন অগ্রগতি দেখানো হয়েছেঃ

সারণী ১·৭

নির্বাচিত শিল্প পণ্যের উৎপাদন

পণ্য	একক	১৯৬৯/৭০ (প্রকৃত)	১৯৭২/৭৩ (প্রকৃত)	১৯৭৭/৭৮ (প্রকৃত)	১৯৭৯/৮০ (প্রকৃত)
১। পাট বস্ত্র	'000' টন	৫৬১	৪৪৬	৫৪৭	৫২৩
২। বস্ত্র (তুলাজাত) :					
(ক) সুতা	লক্ষ পাউণ্ড	১,০৫৭	৮০৯	১,০৭০	১,১২৯
(খ) কাপড় (মিলে তৈরী)	লক্ষ গজ	৫৯৯	৫৮৪	৮৪৫	৯২৪
৩। কাগজ	'000' টন	৩১	২৩	২৯	৩১
৪। নিউজপ্রিন্ট	,,	৩৬	২৭	৩০	৩৩
৫। চিনি	,,	৯৩	১৯	১৭৫	৯৩
৬। সার	,,	১০১	২১৭	২৬৪	৪৩১
৭। সিমেন্ট	,,	৫৩	৩২	৩৩২	৪৩৪
৮। ইস্পাত (ইঙ্গট)	'000' মেঃ টন	৫৪	৬৮	১১১	১৩৩

১·৩৬ উপরের সারণী হতে প্রতীয়মান হয় যে শিল্প খাতের অগ্রগতি ভিন্ন ছিল। প্রথম পাঁচ বছরে সিমেন্ট, ইস্পাত, চিনি, সার ও সুতা বস্ত্র বেশ অগ্রগতি লাভ করে পক্ষান্তরে পাটজাত বস্ত্র ও কাগজ ১৯৬৯/৭০ সালের স্তরের নীচে থেকে যায়। দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে সিমেন্ট, ইস্পাত, সার ও সুতা বস্ত্র শিল্প আরো অগ্রগতি সাধিত হয় কিন্তু কাগজ শিল্প ১৯৬৯/৭০ সালের স্তরে ফিরে আসে। বিশ্বে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদায় অস্থায়ী এবং বিশ্বব্যাপিস্থা বাংলাদেশের অংশ কমে যাবার ফলে দেশের বৃহৎ শিল্প পাটজাত বস্ত্র পূর্বোপূর্বিকালে পূর্বোপূর্ণ পুনরুদ্ধার ফিরে আসতে পারেনি।

১·৩৭ ১৯৭৪ সাল থেকে শিল্পনীতি উদার ভিত্তিক করার দরুন বেসরকারী বিনিয়োগ কিছুটা পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। সংগঠিত খাতে বেসরকারী বিনিয়োগ ১৯৭৪/৭৫ সালে ১৪০ কোটি টাকা থেকে ১৯৭৯/৮০ সালে ৭৯১ কোটি টাকায় উন্নীত হয়।

কর্মসংস্থান

১·৩৮ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা। যাতে করে দারিদ্র হ্রাস এবং আয়ের সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করা যায়। তাই শ্রম শক্তিতে নবাগতদের জন্য পর্যাপ্ত নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা ও বিদ্যমান বেকারত্ব ও আংশিক বেকারত্ব হ্রাস করাই এই পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল। শ্রম শক্তির বৃদ্ধি ৩১ লক্ষ শ্রম-বর্ষ হিসাব করা হয়েছে, পক্ষান্তরে শ্রম বাজার উন্নয়নে পরিকল্পনায় ৫৬ লক্ষ শ্রমবর্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য ছিল।

১·৩৯ বাংলাদেশের মত একটি দেশে যেখানে আত্মপোষণশীল কৃষি ও অন্যান্য কৃষি বহির্ভূত খাতে আল্প-কর্মসংস্থানই হল বৈশিষ্ট, সেখানে আদমশুমারীর বছর ছাড়া কর্ম-সংস্থানের সঠিক তথ্য পাওয়া দুষ্কর। তাছাড়া আদমশুমারীর বছর এবং পরিকল্পনার প্রান্তিক বছর স্বাভাবিকভাবেই একই বছর হয় না। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারীতে ৭৮·৪ মিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে ০·৫০ মিলিয়ন বেকার দেখানো হয়। পূর্ববর্তী ১৯৬১ সালের আদমশুমারীতে জনসংখ্যা ৫০·৮ মিলিয়নের মধ্যে বেকারত্বের সংখ্যা ছিল ০·০৮ মিলিয়ন। এই দুইটি আদমশুমারীর মধ্যবর্তী সময়ে শহরের জনসংখ্যা ও বেকারত্বের অনেক পরিবর্তন ঘটে। এ সবের উপর ভিত্তি করে প্রথম পরিকল্পনাকালে ০·৩০ কোটি শ্রমবর্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে বলে অনুমান করা হয়েছে যা শ্রমশক্তির প্রকৃত বৃদ্ধির তুলনায় কম। শ্রমশক্তি এবং কর্ম-সংস্থান বৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্যের দরুন বেকারত্ব পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটেছে। এই পরিস্থিতি পরিকল্পনায় বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন না করার দরুন উদ্ভূত হয়েছে।

১·৪০ এক্ষেত্রে দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার অভিজ্ঞতাও প্রথম পরিকল্পনা থেকে খুব একটা ভিন্ন নয়। বিদ্যমান বেকারত্ব এবং আংশিক বেকারত্ব হ্রাসের অভিপ্রায়ে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা ১৮ লক্ষ শ্রমবর্ষ স্থির করা হয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিককালে বেকারত্ব পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে এবং গ্রাম এলাকায় ভূমিহীন ও প্রান্ত ভূমিহীনদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

১·৪১ 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচীর মাধ্যমে কেবলমাত্র কর্মসংস্থান পরিস্থিতির অবনতি এড়ানো সম্ভব হয়েছে এবং পল্লীর দুঃস্থদের আংশিক দুঃখমোচনে সহায়ক হয়েছে। ১৯৭৪ সালের ধ্বংসাত্মক বন্যা ও দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে ১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাসে মাত্র ৩১·৫ হাজার টন গম নিয়ে 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচী আরম্ভ হয়। এর পর থেকে নিয়মিত কর্মসূচী হিসাবে এই কর্মসূচীর আকার ও আয়তন প্রতি বছরই বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৪/৭৫ থেকে ১৯৭৭/৭৮ সাল পর্যন্ত সময়ে মোট ৭৩ হাজার টন গম বিতরণ করে ২৬·৪ কোটি শ্রম দিবস কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে। দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে এই কর্মসূচীর অধীনে ৪৫ হাজার টন গম দিয়ে ১৬·২ কোটি শ্রম দিবস কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে।

১·৪২ ১৯৭৯/৮০ সালে শ্রমশক্তি ২৭·৪৭ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে বলে হিসাব করা হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক ও দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রগতির আলোকে ইহা প্রতীয়মান হয় যে ১৯৭৯/৮০ সালের দিকে বেকারত্ব পরিস্থিতি ১৯৭২/৭৩ সালের চেয়ে কোনও অবস্থায়ই ভাল ছিল না। ১৯৭৯/৮০ সালে কর্মসংস্থান ২৫·৩ মিলিয়নে দাঁড়ায়, অবশিষ্ট বেকারত্বের সংখ্যা দাঁড়ায় ২·১৭ মিলিয়ন, যা মাথা পিছু গণনায় ভিত্তিতে শ্রমশক্তির ৮ শতাংশ। এ ছাড়াও সীমিত আবাদী জমির উপর চাপ, কৃষিকার্যের সাময়িকতা এবং ফসলের উৎপাদনের স্বল্প নিবিড়তার দরুন বেশ কিছু পরিমাণ আংশিক বেকারত্ব বিরাজ করে।

মূল্য ও আয় পরিস্থিতি

১·৪৩ বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি সত্তর দশকে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। মূলধন সামগ্রী মৌলিক কাঁচামাল ও ভোগ্যপণ্য আমদানীর উপর অধিক পরিমাণ নির্ভরশীল হওয়ার দরুন বাংলাদেশ মুদ্রাস্ফীতির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু অত্যাবশকীয় পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে সরকারকে

ভর্তুকীর সাহায্যে মূল্যস্ফীতি রোধ করতে হয়, অনাথায় সাধারণভাবে মুদ্রার অবমূল্যায়নের মাধ্যমে সমস্যা মোকাবেলা করা হয়। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৭৫ সালে মুদ্রার অবমূল্যায়ন করা হয়, ফলে আমদানী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। এর পরে সরকার ১০০ টাকার নোট অচল ঘোষণা এবং ঘাটতি ব্যয় বন্ধ করে মুদ্রাস্ফীতি রোধের চেষ্টা চলায়। ১৯৭৫ সালের আমন ফসলের ভাল ফলন হওয়ায় মূল্য হ্রাস পায়। যাহোক এ পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ঘন ঘন শস্যোৎপাদন হ্রাস, অভ্যন্তরীণ মুদ্রা সরবরাহে দ্রুত বৃদ্ধি এবং ক্রমবর্ধমান বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির ফলে আমদানী পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে আবার মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। সামগ্রিক মূল্য পরিস্থিতিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত মুদ্রা সরবরাহ ১৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায় পক্ষান্তরে একই সময়ে জাতীয় আয় স্থির মূল্যে বৃদ্ধি পায় মাত্র ৪৪ শতাংশ।

১·৪৪ মুদ্রা সরবরাহের তুলনায় মূল্য অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ভোগ্য মূল্য সূচক (১৯৬৯/৭০=১০০) ১৯৭২/৭৩ সালে ১৪১·৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৪/৭৫ সালে ৪০৭·৯ তে দাঁড়ায়, কিন্তু ভাল ফলন হওয়ায় ১৯৭৫/৭৬ সালে ৩৮০·১ তে নেমে আসে। এরপর থেকে ক্রমাগতভাবে মূল্য বাড়তে থাকে; ১৯৭৯/৮০ সালে সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করে মূল্যসূচক ৫৬১·১২তে উন্নীত হয়। মূল্য পরিস্থিতির বিস্তারিত বিবরণ নীচের সারণীতে দেওয়া হলো:

সারণী ১·৮

ভোগ্য মূল্য সূচক (১৯৬৯/৭০=১০০)

বছর	মধ্যবিত্ত শ্রেণী (ঢাকা)	শতকরা পরিবর্তন	শ্রমিক শ্রেণী (নারায়ণগঞ্জ)	% পরিবর্তন
১৯৭২/৭৩	১৮২	..	২০৫	..
১৯৭৩/৭৪	২৫২	৩৮·৪৬	২৮৬	৩৯·৫১
১৯৭৪/৭৫	৪০৮	৬১·৯০	৪১২	৪৬·৫০
১৯৭৫/৭৬	৩৮০	(—)৬·৮৫	৩৮০	(—)৯·৩১
১৯৭৬/৭৭	৩৮২	০·৫৩	৩৬৬	(—)৩·৬৮
১৯৭৭/৭৮	৪৪১	১৫·৪৫	৪৩১	১৭·৭৬
১৯৭৮/৭৯	৪৮৬	১০·২০	৪৬৫	৭·৮৯
১৯৭৯/৮০	৫৬১	১৫·৪৩	৫৩৯	১৫·৯১

১·৪৫ ১৯৭০ দশকের দ্বিতীয়ার্ধে খাদ্য ও অন্যান্য কৃষিপণ্যের মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি ও বাজারে প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যের দুষ্প্রাপ্যতা জনসাধারণের জীবনযাত্রে বেশ অবনতি ঘটিয়েছে। প্রথম বৎসরগুলোতে কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রে মজুরী মুদ্রাস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বৃদ্ধি পায়নি এবং ফলে প্রকৃত মজুরী ১৯৭৪/৭৫ সালে হ্রাস পায়। ১৯৭৫/৭৬ সালে ভাল ফলন হওয়ায় এবং অর্থ ও রাজস্ব ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে প্রকৃত মজুরীতে উন্নতি হয়, কিন্তু এই পুনরুদ্ধার এত মন্থর ছিল

যে ১৯৭৯/৮০ সালে মেহনতী মানুষের প্রকৃত আয় ১৯৬৯/৭০ সালের স্তর থেকে ২০ শতাংশ নীচে ছিল। প্রকৃত মজুরীর পরিবর্তন নীচের সারণীতে দেখানো হলো:

সারণী ১·৯

প্রকৃত মজুরী সূচকের প্রবণতা (১৯৬৯/৭০=১০০)

সাল	সাধারণ মজুরী সূচক।	শতকরা পরিবর্তন।	কৃষি মজুরী সূচক।	শতকরা পরিবর্তন।
১৯৭২/৭৩	৬৭·৫৮	..	৬৬·৫৬	..
১৯৭৩/৭৪	৬৪·৫৭	(—)১৪·৪৫	৬৯·২৪	৪·০৩
১৯৭৪/৭৫	৫১·৩৯	(—)২০·৪১	৫৮·৪০	(—)১৫·৬৬
১৯৭৫/৭৬	৬৬·৪১	৩০·২০	৭৬·৫৬	৩১·১০
১৯৭৬/৭৭	৭১·২০	৬·৪১	৭৫·৬২	(—) ১·২৩
১৯৭৭/৭৮	৬৬·৭৪	(—)৬·২৬	৭৪·৩২	(—) ১·৭২
১৯৭৮/৭৯	৭৫·৭৪	১৩·৪৯	৮০·৯৫	৮·৯২
১৯৭৯/৮০	৮২·৪৫	৮·৮৬	৮৪·৩৩	৪·১৮

১·৪৬ গ্রামে মেহনতী মানুষের মজুরী কমে যাওয়ায় দারিদ্রতা বেড়ে যায় এবং সাধারণ মানুষের ব্যবহারিক জীবনে অবনতি ঘটে। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ন্যূনতম পুষ্টির পরিমাপে ১৯৬৩/৬৪ সালের মূল্যমানে পুষ্টির জন্য মাথা পিছু মাসে ৩৭ টাকা প্রয়োজন বলে ধরা হয়। ১৯৬৩/৬৪ সালে গ্রামীণ খানার ৯৬ শতাংশের আয় এই পরিমাপের নিম্নে থাকায় 'চূড়ান্ত দারিদ্র' (Absolute Poverty) ও 'চরম দারিদ্র' (Extreme Poverty) পরিমাপ ব্যবহার করা হয়। 'চূড়ান্ত দারিদ্র' মাপকাঠিতে শতকরা ৯০ ভাগ ক্যালোরী মিটানোর জন্য মাথা পিছু প্রতি মাসে ২৩·৬১ টাকার প্রয়োজন, পক্ষান্তরে 'চরম দারিদ্রর মাপকাঠিতে শতকরা ৮০ ভাগ ক্যালোরী মিটানোর জন্য মাথা পিছু প্রতি মাসে ১৭·০২ টাকার প্রয়োজন। এর অনুসারে ১৯৬৩/৬৪ সালে গ্রামীণ খানার৫২ শতাংশ এবং জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ 'চূড়ান্ত দারিদ্রা' সীমার নীচে ছিল, 'চরম দারিদ্র্য' সীমার নীচে খানা ও জনসংখ্যার দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০ শতাংশ ও ৫ শতাংশ। পক্ষান্তরে ১৯৭৩/৭৪ সালের খানাভিত্তিক ব্যয় জরিপ থেকে (Household Expenditure Survey) দেখা যায় যে দারিদ্রতা ১৯৬৩/৬৪ থেকে ১৯৭৩/৭৪ দশকে চূড়ান্ত ও চরম দারিদ্র সীমার অধিকতর অবনতি ঘটে। এই অবনতির ব্যপ্তি নীচের সারণীতে দেখানো হলো:

সারণী ১·১০

দারিদ্র সীমার পরিবর্তন

	১৯৬৩/৬৪	১৯৬৮/৬৯	১৯৭৩/৭৪
(ক) চূড়ান্ত দারিদ্র্য :			
খানার শতাংশ	৫২	৮৪	৮৭
জনসংখ্যার শতাংশ	৪০	৭৬	৭৯
(খ) চরম দারিদ্র্য :			
খানার শতাংশ	১০	৩৫	৫৪
জনসংখ্যার শতাংশ	৫	২৫	৪২

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

১·৪৭ এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৭৩/৭৪ সালের ও অর্থনীতি স্বাধীনতা যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তাই স্বাভাবিকভাবেই ১৯৭৩/৭৪ সালের খানার জরিপ দারিদ্র্য স্তরের এক হতাশাব্যঞ্জক অবস্থা তুলে ধরে। কিন্তু স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় অবনতির গতি লক্ষ্যণীয়। কেননা ১৯৬৮/৬৯ সালেও 'চূড়ান্ত দারিদ্র' সীমার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত ১৯৬৩/৬৪ সালের চেয়ে বেশী ছিল। ১৯৬৮/৬৯ সালে 'চূড়ান্ত দারিদ্র্য' সীমার নীচে খানা ও জনসংখ্যার হার ছিল যথাক্রমে ৮৪ ও ৭৬ শতাংশ এবং 'চরম দারিদ্র্য সীমার নীচে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৫ ও ২৫ শতাংশ। ১৯৭৫/৭৬ সালের গ্রামীণ এলাকায় জরীপ থেকে ৩৫ ভাগ খানা চরম দারিদ্র্য সীমার নীচে দেখা যায়; পক্ষান্তরে শতকরা ৯০ ভাগ পুষ্টির পরিমাপে খানার ৪৬ শতাংশ চূড়ান্ত দারিদ্র্য সীমার নীচে অনুমিত হয়। চূড়ান্ত দারিদ্র সীমার উন্নতির মূলে রয়েছে ১৯৭৫/৭৬ সালের ফসলের ভাল ফলন এবং সাধারণ মূল্য স্তরে নিম্ন গতি। এখানে বলা প্রয়োজন যে গ্রামীণ জনসাধারণের উন্নতি কৃষির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়; অন্যথায় চরম দারিদ্র গ্রামীণ সম্পদের মালিকানার উপর নির্ভর করে।

১·৪৮ ১৯৬০ ও ১৯৭৭ সালের মধ্যে জমির মালিকানার পরিবর্তিত ধরণ থেকে উপরোক্ত ফলাফলের সমর্থন পাওয়া যায়। এ সময়ের মধ্যে ঘাঁটি বর্গাদারদের জমির পরিমাণ ১·১১ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ০·৪১ শতাংশে দাঁড়ায় এবং খামারেও তাদের অংশ ১·৬৩ শতাংশ থেকে ০·৫৬ শতাংশে নেমে আসে। জমির উপর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রবল চাপ বর্ধিত ভূমিহীনতার পরিচয় বহন করে। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ এই প্রক্রিয়ায় অবনতি ঘটায় এবং চরম দারিদ্রতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অন্যদিকে একই সময়ে ক্ষুদ্র কৃষকের অংশ (যারা ২·৫ একরেরও কম জমির মালিক) বৃদ্ধি পেয়ে ১৬·২৫ থেকে ১৮·৭৫ এ দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে তাদের সংখ্যা শতকরা হারে কমে মেয়ে ৫১·৬৩ থেকে ৪৯·৭ তে দাঁড়ায়। এতে তাদের জমির মালিকানায় এবং জীবনমানের কিছুটা উন্নতি সাধিত হয়।

১·৪৯ কেবলমাত্র গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন আয়ের লোকের মধ্যে জমি, আয় ও কল্যাণ পুনর্বন্টনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরঞ্চ গ্রাম ও শহর অঞ্চলে আয় বন্টনের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় এবং তা' শহরের অনুকূলে যায়। এই পর্যায়ে খানাভিত্তিক ব্যয় জরিপের তত্ত্ব নীচের সারণীতে দেখানো হলোঃ

সারণী ১·১১

গ্রামীণ ও শহরের আয় বন্টন
(খানার গড় মাসিক আয়)

(টাকায়)

জরিপ	গ্রামীণ	শহর	গ্রামীণ আয় শহরের আয়ের শতাংশরূপে
১৯৬৩/৬৪	১৪৮·৩	২০৮·১	৭১·০
১৯৭৩/৭৪	৪৬৩·৭	৬২৯·৫	৭৩·৭
১৯৭৬/৭৭	৬৭৯·৯	৯৬২·৮	৭০·৬

১·৫০ শহর গ্রামাঞ্চলের পারস্পরিক অবস্থা উৎপাদন ও মূল্য উভয়ের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। ১৯৭৩/৭৪ সালে কৃষি উৎপাদন পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পায় এবং ইহা মূল্যমানে ১৯৬৯/৭০ সালের স্তরের ৯৫ শতাংশ ছিল, পক্ষান্তরে শিল্পখাতে এর পরিমাণ ছিল ৮৮ শতাংশ। দ্বিতীয়তঃ খাদ্য মূল্য কিছুটা উর্ধে থাকার দরুন গ্রাম ও শহরের মধ্যকার বিদ্যমান অবস্থা গ্রামের চাষীদের অনুকূলে যায়। ১৯৭৬/৭৭ সালে উৎপাদন ও মূল্য এই দু'দিক থেকেই পরিস্থিতি পাল্টারূপ ধারণ করে। শিল্পখাতের উৎপাদন ১৯৬৯/৭০ সালের স্তরের ১০৯ শতাংশ ছিল, অন্যথায় কৃষি উৎপাদন ছিল ১০১ শতাংশ। মূল্যের দিক থেকে ১৯৭৩/৭৪ সাল থেকে ১৯৭৬/৭৭ সাল পর্যন্ত কৃষি দ্রব্যের পাইকারী মূল্য সূচক বৃদ্ধি পেয়ে ২১·৭ শতাংশে দাঁড়ায়, আর তা' শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পায় ৩০·৪ শতাংশ। শস্য কাটা-কালীন বিদ্যমান মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষকদের অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। ১৯৭৩/৭৪ সাল থেকে

১৯৭৬/৭৭ সালের মধ্যে আমন ধানের শস্য কাটাকালীন মূল্য মাত্র ১১·৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। তাই ১৯৭৩/৭৪ সালে গ্রামীণ খাতে শহরের তুলনায় যে উন্নতি দেখা দেয় তা পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

বৈদেশিক লেনদেনে ভারসাম্য ও বহিঃসম্পদ

১·৫১ **বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য:** প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল আমদানী বিকল্প ত্বরান্বিত করা এবং নির্বাচিত ক্ষেত্রে রপ্তানী সম্প্রসারণ করা। বেঞ্চমার্কের মূল্যমানে এ সময়ে পণ্য আমদানীর মোট ব্যয় ৭৮৯০ মিলিয়ন ডলার এবং পণ্য রপ্তানী আয় ৪২৮১ মিলিয়ন হবে বলে ধরা হয়েছিল। অদৃশ্য খাতে লেনদেন সমন্বয়ের পর আমদানী রপ্তানী ঘাটতি পূরণের জন্য নীট বৈদেশিক মূলধন ৩৭৪৮ মিলিয়ন ডলার ধরা হয়। দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনাতেও একই উদ্দেশ্য ছিল—দ্রুতগতিতে রপ্তানী আয় এবং আমদানী বিকল্প বৃদ্ধি করা। দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে ১২২০ মিলিয়ন ডলার রপ্তানী আয়ের তুলনায় ৩৪৬১ মিলিয়ন ডলার পণ্য আমদানী ব্যয় ধরা হয়, নীট বৈদেশিক মূলধন ২০৮৬ মিলিয়ন ডলার হবে বলে ধরা হয়।

১·৫২ প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক ও দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে আমদানী ব্যয়, রপ্তানী আয় ও বৈদেশিক মূলধনের একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নের সারণী ১·১২ তে তুলে ধরা হলো:

সারণী ১·১২

বৈদেশিক খাত—লক্ষ্য ও বাস্তবায়ন

(মিলিয়ন ডলার)

খাত	পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা		দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা	
	প্রক্ষেপ (১৯৭৩—৭৮)	প্রকৃত (১৯৭৩—৭৮)	প্রক্ষেপ (১৯৭৮—৮০)	আনুমানিক (১৯৭৮—৮০)
(ক) আমদানী ব্যয়:	**৭৯৬৯**	**৬২৩৯**	**৩৭১৮**	**৪২১৯**
মূলধন সামগ্রী	২৪৫০	১০২১	৮৫২	৮৬৪
কাঁচামাল	২৬৭৩	২৫৩৯	১৯৩০	১৭৫২
ভোগ্যপণ্য	১৬২৩	৬৫৪	২৭৫	৪৯২
খাদ্যশস্য	৭২৯	১৬২১	৪০৪	৮২০
অদৃশ্য খাত	২৯৪	৪০৪	২৫৭	২৯১
(খ) রপ্তানী আয়	**৪৫৭৫**	**২৩৭১**	**১৪৬৭**	**১৬৩৮**
পণ্য রপ্তানী	৪২৮১	২০০০	১২২০	১৩৪০
অদৃশ্য আয়	২৯৪	৩৭১	২৪৭	২৯৮
(গ) নীট বৈদেশিক মূলধন	**৩৭৪৮**	**৩২৮৫**	**২০৮৬**	**২২০৬**

টীকা: প্রকৃত ডলারের চলতি মূল্যে।

১·৫৩ **আমদানী ব্যয়:** প্রথম পরিকল্পনাকালে ১৯৭২/৭৩ সালের মূল্যমানে পরিকল্পিত ১৯৬৯ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় আমদানী ব্যয় চলতি মূল্যে দাঁড়ায় ৬২৩৯ মিলিয়ন ডলার। আমদানীর একক মূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে আমদানীতে বিরাট ঘাটতি দেখা যায়। ১৯৭৭/৭৮ সালে আমদানী মূল্য সূচক (১৯৭২/৭৩=১০০) ২০৬-এ উন্নীত হয়।

১·৫৪ সারণী ১·১২ থেকে দেখা যায় যে, প্রথম পরিকল্পনাকালে মূলধন ও ভোগ্য পণ্য আমদানীতে প্রচুর ঘাটতি ছিল। পরিকল্পনার প্রথম কয় বছরে বৈদেশিক মুদ্রার অপ্রতুলতা এবং আমদানীকৃত কাঁচামালের উচ্চ মূল্যের জন্য কাঁচামালের সীমিত সরবরাহ আমদানী নির্ভরশীল শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা অব্যবহৃত থেকে যায়। বৈদেশিক সাহায্য বৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তিতে উন্নতি

হওয়ায় ১৯৭৫/৭৬ সালের পরে শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশের আমদানী উদারীভিত্তিক করা হয়। কিন্তু সিমেন্ট, তুলা, সুতা, কয়লা ইত্যাদির মত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আমদানী দ্রব্য আমদানী অভিক্ষেপের অনেক নীচেই ছিল। পেট্রো-রসায়ন, সিমেন্ট, তুলা, ও ভেষজ দ্রব্যের মত প্রধান প্রধান আমদানী বিকল্প ক্ষেত্রে খুব সামান্যই অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। অভিক্ষেপের চেয়ে মূলধন সামগ্রীর স্বল্প আমদানী বিনিয়োগ ক্ষেত্রে মন্থর অগ্রগতি প্রমাণ করে যার ফলে আমদানী বিকল্পন এবং রপ্তানী সম্প্রসারণ উভয় কর্মসূচীই ব্যাহত হয় এবং বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যে সমস্যার সৃষ্টি করে।

১.৫৫ দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে প্রকৃত আমদানী ব্যয় ৪২১৯ মিলিয়ন ডলার অনুমিত হয় এবং ইহা অভিক্ষেপের তুলনায় ১৩ শতাংশ বেশী। ১৯৭৪/৭৯ সালে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় বর্ধিত পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানীর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যার ফলে খাদ্য আমদানী অভিক্ষেপ পরিমাণের চেয়ে ১০৩ শতাংশ বেশী ছিল। আমদানীর ব্যয়ও জাতীয় আয়ের শতকরা আনুপাতিক হার ১৯৭৭/৭৮ সালে ১৫·১৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৯/৮০ সালে ২০·১৯তে দাঁড়ায়, পক্ষান্তরে ১৯৭৩/৭৪ সালে তা ছিল ১০·৩৫।

১·৫৬ **রপ্তানী আয়:** প্রথম পরিকল্পনাকাল রপ্তানী আয় ১৯৭২/৭৩ সালের ডলার মূল্যমানে প্রক্কলিত ৪৫৭৫ ডলারের স্থলে ২৩৭১ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। প্রকৃতপক্ষে এই ঘাটতি আরো বাড়ে, কেননা এই সময়ে রপ্তানী মূল্য সূচক ৪৬ শতাংশের উপর বৃদ্ধি পায়। রপ্তানীর নামিক বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭·৫ শতাংশ। রপ্তানী ও জাতীয় আয়ের শতকরা আনুপাতিক হার ১৯৭৩/৭৪ সালের ৪·১২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৭/৭৮ সালে ৫·৬১ শতাংশে দাঁড়ায়। কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্যের কারণেই রপ্তানীতে ঘাটতি দেখা দেয়। সারা বৎসর উন্নয়নশীল দেশসমূহে অর্থনৈতিক মন্দা থাকায় তাদের চাহিদা হ্রাস পায় ফলে পাটজাত দ্রব্য থেকে রপ্তানী আয় কম হয়। মূল্য বৃদ্ধির ফলে চা ও চামড়া থেকে রপ্তানী আয় পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে। পরিকল্পনাকালে শিল্পের উন্নয়ন এবং বর্ধিত পরিমাণে চিংড়ী ও ব্যাঙের পা প্রাপ্তির ফলে হিমায়িত মাছ, চিংড়ী ও ব্যাঙের পা রপ্তানী থেকে অধিকতর আয় সম্ভব হয়।

১·৫৭ দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে রপ্তানী আয় নির্দিষ্টকৃত পরিমাণ থেকে মূল্যমানে ১১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। বর্ধিত রপ্তানী মূল্য এবং আন্তর্জাতিকভাবে অধিকতর পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী এই বৃদ্ধির কারণ। ১৯৭৫ সাল হতে চালের আমদানীর ক্ষেত্রে যে সকল বাধা দেয়া হয় দ্বি-বার্ষিকী পরিকল্পনাকালে রপ্তানী আয়ের বৃদ্ধি তাই প্রমাণিত। রপ্তানী ও আয়ের আনুপাতিক শতাংশ হার ১৯৭৭/৭৮ সালের ৫·৫৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৯/৮০ সালে ৬·১৪ শতাংশ হয়। হিমায়িত খাদ্য রপ্তানীতে সম্ভাবনা উন্নতি ছাড়া পণ্য দরের রপ্তানি বাণিজ্য সামঞ্জস্যহীন অবস্থায় থাকে এবং এক্ষেত্রে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের প্রাধান্যই বেশী ছিল।

১·৫৮ **বৈদেশিক সাহায্য:** পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিনিয়োগ বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়নি; তাই আলাদা করে স্বভাবিকভাবে বৈদেশিক সাহায্য প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যায়। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৮০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট প্রতিশ্রুত বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল ১১৬১ মিলিয়ন ডলার; তার মধ্যে খাদ্য সাহায্য ২১৪০ মিলিয়ন ডলার, পণ্য সাহায্য ৩১৬৩ মিলিয়ন ডলার এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৮৫৮ মিলিয়ন ডলার ছিল। বৎসরগুলোতে প্রতিশ্রুত বৈদেশিক সাহায্যের আকার ও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে।

১·৫৯ স্বাধীনতার পর প্রথম দু'বছরে (প্রাক-পরিকল্পনা সময়ে) প্রতিশ্রুত বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল ১৪১৮ মিলিয়ন ডলার এবং প্রাপ্তির পরিমাণ ছিল ৮২২ মিলিয়ন ডলার। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনাকালে প্রতিশ্রুত বৈদেশিক সাহায্যের মোট পরিমাণ ছিল ৪৭৩৭ মিলিয়ন ডলার এবং প্রাপ্ত সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৩৫৩২ মিলিয়ন ডলার। ইহা প্রতিশ্রুত সাহায্যের ৭৫ শতাংশ। প্রাপ্ত মোট সাহায্যের মধ্যে খাদ্য সাহায্য ছিল ১২২৪ মিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ ৩৫ শতাংশ, পণ্য সাহায্য ছিল ১৪৮০ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৪২ শতাংশ এবং প্রকল্প সাহায্য ৮২৮ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ২৩ শতাংশ।

১·৬০ দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে প্রাপ্ত সাহায্যের পরিমাণ ছিল ২২৫২ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ মোট প্রতিশ্রুত সাহায্যের ৭৬ শতাংশ। মোট প্রাপ্ত সাহায্যের মধ্যে খাদ্য সাহায্য ছিল ৫৫৪ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ২৫ শতাংশ, পণ্য সাহায্য (নগদ টাকাসহ) ৮৬০ মিলিয়ন অর্থাৎ ৩৮ শতাংশ এবং প্রকল্প সাহায্য ৮৩৮ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৩৭ শতাংশ।

১·৬১ স্বাধীনতার পর প্রথম কয়েক বছরে বৈদেশিক সাহায্যের এক উল্লেখযোগ্য অংশ ভোগের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল, খুচরা যন্ত্রাংশ ও যন্ত্রপাতি আমদানীর মাধ্যমে বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৩/৭৪ সালে মোট প্রাপ্ত সাহায্যের ২৭ শতাংশ ছিল প্রকল্প সাহায্য, ইহা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৭/৭৮ সালে ৩৩ শতাংশ এবং ১৯৭৯/৮০ সালে ৩৮ শতাংশে উন্নীত হয়।

১·৬২ **রপ্তানী-আমদানী বিনিময় হার**ঃ প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম কয়েক বছরে পণ্য রপ্তানী-আমদানী বিনিময় হারে যথেষ্ট অবনতি ঘটে। বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির পটভূমিকায় আমদানী মূল্য সূচক ১৫৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, পক্ষান্তরে রপ্তানী মূল্য সূচক কেবলমাত্র ৩১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়; ফলে রপ্তানী আমদানী বিনিময় হার ১৯৭৪/৭৫ সালে ৫২-তে নেমে আসে (১৯৭২/৭৩=১০০) যাহোক ১৯৭৫/৭৬ সাল থেকে ১৯৭৮/৭৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের রপ্তানী আমদানী বিনিময় হারে কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। রপ্তানী-আমদানীর বিনিময় হার ১৯৭৪/৭৫ সালে ৫২ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৮/৭৯ সালে ৭৬তে দাঁড়ায়। পাট ও পাটজাত দ্রব্যের চাহিদার ফলে রপ্তানী মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং তৎসংগে আমদানী মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি পায় ফলে রপ্তানী আমদানী বিনিময় হারে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ১৯৭৯/৮০ সালে এই পরিস্থিতি পালটে যায়, কারণ পাট, চা ও চামড়ার রপ্তানী মূল্য কমে যাবার এবং অন্যদিকে অশোধিত পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য, গম, তুলা, সার ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী মূল্য দ্রুত বেড়ে যাবার ফলে রপ্তানী আমদানী বিনিময় হার উক্ত সনে ৬৩-তে নেমে আসে (১৯৭২/৭৩=১০০)।

নীচের সারণী ১·১৩ তে ১৯৭২/৭৩ সাল থেকে ১৯৭৯/৮০ সাল পর্যন্ত আমদানীতে রপ্তানী মূল্য সূচক এবং বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানী আমদানী বিনিময়ের হার দেখানো হলোঃ

সারণী ১·১৩

বাংলাদেশের রপ্তানী আমদানী বিনিময়ের হার

(১৯৭২/৭৩=১০০)

বছর	আমদানী মূল্য সূচক	রপ্তানী মূল্য সূচক	রপ্তানী আমদানী বিনিময় হার
১৯৭২/৭৩	১০০·০	১০০·০	১০০·০
১৯৭৩/৭৪	১৭৭·০	১০৭·৫	৬০·৭
১৯৭৪/৭৫	২৫৩·০	১৩১·২	৫১·৯
১৯৭৫/৭৬	২১৬·৮	১১৩·৮	৫২·৫
১৯৭৬/৭৭	২২১·২	১৩৩·৭	৬০·৪
১৯৭৭/৭৮	২৩০·৬	১৫৯·২	৬৯·০
১৯৭৮/৭৯	২৬৬·৪	২০১·৬	৭৫·৭
১৯৭৯/৮০	৩৬৩·২	২২৯·২	৬৩·১

১·৬৩ **বৈদেশিক ঋণদায় পরিশোধ**ঃ বাংলাদেশ সাধারণতঃ বৈদেশিক সাহায্য অনুদান ও সহজ শর্তের ঋণ হিসেবে পেয়েছে। ১৯৭৩/৭৪ সালে ঋণের দায় পরিশোধের পরিমাণ ছিল ১৭·৫০ মিলিয়ন ডলার ইহা ১৯৭৫/৭৬ সালে ৫৫·৬০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। অন্যকথায় দায় পরিশোধ ১৯৭৩/৭৪ সালে মোট রপ্তানী আয়ের ৪·৬৯ শতাংশ থেকে ১৯৭৫/৭৬ সালে ১৫·১৪ শতাংশ হয়। ১৯৭৬/৭৭ সালে ঋণ দায় পরিশোধের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে রপ্তানী আয়ের ১২·৩১ শতাংশ হয়। এর পর কোন কোন দাতা দেশ ঋণ মওকুফ করার পরেও বৈদেশিক ঋণজনিত ব্যয় উর্ধ্বমুখী হতে থাকে। ঋণ দায় পরিশোধের পরিমাণ রপ্তানী আয়ের শতাংশ হিসেবে ১৯৭৯/৮০ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ১৪·৫৩ শতাংশ হয়। যেহেতু বাংলাদেশের রপ্তানী আয়ের পরিমাণ কম এবং রপ্তানী প্রসারের ক্ষেত্রে কাঠামোগত জটিলতা রয়েছে, তাই

প্রয়োজনীয় আমদানী অব্যাহত রাখা এবং ঋণের দায় পরিশোধের পরিমাণকে একটি 'নিরাপদ সীমার' মধ্যে রাখার জন্য বৈদেশিক ঋণের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। এর জন্য অনুদান, সহজ শর্তের ঋণ হিসেবে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া ও কঠিন শর্তের ঋণ পরিহার করা এবং একই সাথে সাহায্যদাতা দেশসমূহকে ঋণ মওকুফে সম্মত করার প্রচেষ্টা চালানো প্রয়োজন।

সরকারী খাতের ব্যবস্থাপনা:

১·৬৪ **বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী:** স্বাধীনতার পর থেকে সরকারী খাত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রধান প্রধান শিল্পসমূহ জাতীয়করণ এবং ঐতিহাসিকভাবে বেসরকারী খাত সরকারী খাতের সহায়তার উপর নির্ভরশীল হওয়ায় সরকারী খাতের ব্যয়ের পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই সরকারী ব্যয়ের আহরণ ও গঠন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার নির্ধারণের খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার আর্থিক বরাদ্দের মোট ৪,৪৫৫ কোটি টাকার মধ্যে সরকারী খাতে উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ ছিল ৩৯৫২ কোটি টাকা। দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় পরিকল্পিত ব্যয় বরাদ্দ মোট ৩,৮৬১ কোটি টাকায় সরকারী খাতে ব্যয় বরাদ্দ ৩২৬১ কোটি টাকা ধরা হয়। সরকারী খাতের ব্যয় বরাদ্দ প্রথম পরিকল্পনার মোট আর্থিক ব্যয় বরাদ্দের ৮৯ শতাংশের স্থলে দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় ৮৪ শতাংশে নেমে আসে; কিন্তু সরকারী খাতে প্রাধান্য থেকে যায়। প্রথম পরিকল্পনা ও দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে সরকারী খাতে চলতি মূল্যমানে মোট উন্নয়ন ব্যয় ৮,০৯৫ কোটি টাকা—প্রথম পরিকল্পনায় ৪,১৬২ কোটি টাকা ও দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় ৩,৯৩৩ কোটি টাকা।

১·৬৫ ১৯৭৩/৭৪ সাল থেকে ১৯৭৯/৮০ সাল পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর ব্যয় বার্ষিক গড়ে ৩১ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইহা আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের অধিকতর প্রচেষ্টা, বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি ও উন্নয়ন প্রশাসনকে জোরদার করার ফলশ্রুতি। দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে এসব ক্ষেত্রে উন্নতি দ্রুততর গতিতে চলতে থাকে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর তহবিল ব্যবহারের যথেষ্ট অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। প্রথম পরিকল্পনার প্রথম দু'বছরে ৬৬ শতাংশ অর্থ ব্যবহৃত হয় এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের ফলে 'হার্ডকোর' কার্যক্রমকালে ইহা ৯৬ শতাংশে বৃদ্ধি পায়। প্রথম পরিকল্পনায় এর ব্যয়ের হার ছিল ৮৪ শতাংশ এবং দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় তা ৯১ শতাংশে উন্নিত হয়।

১·৬৬ **উন্নয়ন প্রশাসন:** স্বাধীনতার পর অর্থনীতির গতি ধারাকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে নতুন দিকে প্রবাহিত করা হয়। সে অনুসারে প্রধান প্রধান শিল্প, ব্যাংক, বীমা ব্যবসাকে জাতীয়করণ করা হয় এবং সরকারের ভূমিকা সম্প্রসারণের ফলে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় পুনর্বিন্যাসের সংগে সামঞ্জস্য রেখে যথাযথ প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে উঠে এবং নতুন নতুন মন্ত্রণালয় এবং সেক্টর কর্পোরেশন গঠন করা হয়। বহুদায়তন সরকারী খাতে ব্যবস্থাপনা অভিজ্ঞতার অভাবে এবং আংশিকভাবে ঐতিহাসিক ঘটনার দ্রুত পট পরিবর্তনের ফলে সত্তর দশকে একাধিক প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সাধিত হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুনর্বিন্যাস ঘটে ১৯৭৫ সনের পর। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো (ক) জাতীয় অর্থনীতির প্রধান সমস্যাসমূহের দিকে দৃষ্টি দেবার জন্য মন্ত্রণালয় পর্যায়ের কাজকর্মকে বিভিন্ন বিভাগে পুনর্বিন্যাস, (খ) আর্থিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, (গ) এবং একই পর্যায়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনার প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করা। এসবের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা। এই উদ্দেশ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যকরী তত্ত্বাবধানের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরোকে শক্তিশালী করা হয়। মাননীয় রাষ্ট্রপতির সভাপতিত্বে মন্ত্রী পরিষদ কর্তৃক উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পর্যালোচনার ব্যবস্থা করা হয়। বিকেন্দ্রীকৃত আর্থিক ব্যবস্থার অধীনে সংস্থাসমূহ দুই-চতুর্থাংশ ফিক্সিড টাকার অধিক অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ছাড়া পেত। মোটামুটিভাবে সমস্ত ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হয়; উন্নয়ন ব্যয় ১৯৭৪/৭৫ সালের বাজেট বরাদ্দের ৭৭ শতাংশ থেকে ১৯৭৯/৮০ সালে ৮৯ শতাংশে উন্নীত হয়।

১·৬৭ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন এখনও কিছু সমস্যা দ্বারা ব্যাহত হচ্ছে। প্রথমতঃ সামগ্রিকভাবে উন্নয়ন ব্যয়ের ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও প্রকল্পের সংখ্যা দ্রুততর হারে বেড়ে যাওয়ায় প্রকল্পওয়ারী বরাদ্দের পরিমাণ সীমিত হয়ে পড়ে। এর ফলে খুব অল্প সংখ্যক প্রকল্প প্রতি বছর সমাপ্ত করা সম্ভব হয়েছে; তাই প্রকল্প বাস্তবায়নকাল হ্রাস করা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয়তঃ বর্তমান কার্যক্রম পদ্ধতি এতদুর্বল যে সম্পদের সুষ্ঠু বিভাজন করা হয় না। ফলে, বিভিন্ন খাতে সম্পদ পুনর্বন্টন করতে হয় বা নতুন সম্পদ সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হয়। উন্নয়ন কর্মসূচীর আয়তন বৃদ্ধির সংগে সংগে সম্পদের অপ্রতুলতা

প্রকল্পসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছে; ফলে খুব ঘন ঘন সম্পদ পুনর্বণ্টন করতে হয়। তৃতীয়তঃ প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন সুসংহত না হওয়ার ফলে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অপ্রত্যাশিত সমস্যাবলীর উদ্ভব হয়েছে। যাহোক, এ অবস্থার উন্নতিকল্পে উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতির সংশোধনের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন গতিকে ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সংশোধিত নিয়মানুসারে উদ্যোগী সংস্থা ২০০ লাখ টাকার প্রকল্প অনুমোদন করতে পারে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় পর্যায়ে প্রকল্প অনুমোদনের আর্থিক সীমা ৫০০ লাখ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে, এবং ৫০০ লাখ টাকার অধিক প্রকল্পের জন্য জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন হবে। যদিও এই বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় উন্নতি সাধন করেছে, কিন্তু ইহা সম্পদ বিভাজন দক্ষতার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। উন্নয়ন কার্যক্রম প্রণয়ন এবং তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা পৃথক থাকায় সম্পদ বরাদ্দ ক্ষমতা আরো ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বর্তমান পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় আরো একটি দুর্বল দিক হচ্ছে আভ্যন্তরীণ সম্পদের বরাদ্দ ও বহিঃসম্পদের প্রশাসনের মধ্যে দ্বৈত কর্তৃত্ব এবং ইহা প্রয়োজনীয় অনুক্রম মেনে চলে না। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রকটভাবে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর হওয়ায় বৈদেশিক সাহায্যমুখী প্রকল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে প্রকল্পের অগ্রাধিকার ও প্রযুক্তিগত দিক ব্যাহত হচ্ছে। অতএব, বৈদেশিক সাহায্য চুক্তিতে পরিকল্পনা কমিশনকে আরো কার্যকর-ভাবে জড়িত হওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়।

১-৬৮ মেয়াদের উপর অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও সত্তর দশকের উন্নয়ন প্রয়াস অর্থনীতিতে পুনর্জ্জীবনের সঞ্চার করেছে। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচেষ্টার ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়, তথাপি কতকগুলি ক্ষেত্রে যেমন পল্লী উন্নয়ন এবং জনগণের অংশ গ্রহণ কার্যক্রমে সফলতার সংগে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়। যদিও পূর্ণ সফলতা দাবী করা চলে না তবু নিঃসন্দেহে এসব প্রয়াস উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে। কারণ, এগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বল্পকালীন সময়ের মধ্যেও স্বাধীনতা পূর্বকালীন সময়ের তুলনায় ১৯৭৫/৭৬ সাল থেকে কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে উন্নতি সাধিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী ও কৌশলাদি

জনসাধারণের নিদারুণ দারিদ্র, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, অপুষ্টি ইত্যাদির মত গুরুতর সমস্যাবলীর আলোকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে গ্রামীণভাগ লোকই বাস করে গ্রামে। অতীতে একদিকে উচ্চহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অন্যদিকে অর্থনীতির মন্থর বিকাশ এবং কালক্রমে ঐ সমস্যাগুলিকে আরও প্রকট করে তুলেছে। এখন প্রায় শতকরা ৮৫ জন লোক চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে; এদেশে শতকরা ৭৪ জন লিখতে ও পড়তে জানেন, আর শতকরা ৩৩ জন শ্রমক্ষীবী মানুষের কোন কর্মসংস্থান নেই। এ সমস্যা একটা স্থায়ী বৈশিষ্ট্যের মত আকার নিচ্ছে। এ অবস্থা যদি চলতে থাকে, আগামী দু'হাজার সাল নাগাদ একান্ত দরিদ্র ব্যক্তিদের সংখ্যা ১১৩ মিলিয়নে দাঁড়াবে, আর দারিদ্রের ব্যাপকতা ব্যাঙের ছাতার ন্যায় গজাবে। বর্তমান সমস্যাগুলিও আকারে এত বিশাল যে সেগুলির চূড়ান্ত সমাধানের জন্য একটা দীর্ঘ মেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনার প্রয়োজন হবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ঐ চূড়ান্ত সমাধানের পথ অভিমুখে একটি পদক্ষেপ মাত্র। নিদারুণ সম্পদ সংকটের কারণে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার মেয়াদে সামান্য সাফল্যই অর্জিত হবে বলে ধরে নেয়া হয়েছে। অর্থনীতিতে বিশৃংখলার পরিস্থিতি ক্রমেই জোড় হচ্ছে। এই পরিকল্পনায় ঐ পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে দেয়ার জন্যে যথাসম্ভব প্রয়াস চালানো হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। একটা দীর্ঘ মেয়াদী প্রেক্ষিতের এক বিস্তৃততর কাঠামোর প্রয়োজনে এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলি রচিত হয়েছে। এসব দীর্ঘমেয়াদের কথা বিবেচনা করে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যাবলী গ্রহণ করা হয়েছে:

(১) একটা দ্রুত প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা যাতে মৌলিক চাহিদার পরিপূরণ সম্ভবপর নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান একটা লক্ষ্যণীয় উন্নতি বিধান করা যায়;

(২) সম্ভাব্য কম সময়ের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করা;

(৩) অর্থকরী কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো যাতে মৌলিক চাহিদা পূরণ ও প্রবৃদ্ধি সুফলে অংশীদার হবার মত আয় বন্টনে ও সম্পদের অধিকারী হতে পারে;

(৪) মানব সম্পদের গুণগত উন্নয়নের ব্যবস্থা হিসেবে নিরক্ষরতা দূর করা ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়িত করা;

(৫) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো;

(৬) প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়ন সাধন করে উন্নয়ন তৎপরতায় জনসাধারণের অংশ গ্রহণ উৎসাহিত করা;

(৭) অভ্যন্তরীণ সম্পদ কাজে লাগিয়ে ও বৈদেশিক লেন দেন ভারসাম্য পরিস্থিতির উন্নতি বিধান করে আরও বেশী স্বনির্ভরতা অর্জন করা।

২.২ এই পরিকল্পনায় আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসের প্রতি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বিশ্বের অর্থনৈতিক মানচিত্রে সুস্পষ্ট। বাংলাদেশ এখানে বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলির অন্যতম দেশ হিসেবে প্রতিভাত; এদেশে মাথাপিছু বার্ষিক আয় মাত্র ১০০ মার্কিন ডলার। এমনকি, জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা হলেও বাংলাদেশে কোন

মানুষের ভদ্রোচিত জীবন যাপন খুবই দুঃসাধ্য। দারিদ্র্য এমন প্রকট ও সর্বব্যাপী যে, তিন চতুর্থাংশের অধিক লোক খাদ্যের ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে পারে না। একই সময়ে খাদ্যশস্য, মাছ, প্রোটিন, দুধ ও ডালের মত অনেক নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মাথাপিছু যোগান কমে গেছে। মুদ্রাস্ফীতির কারণে মজুরী নির্ভর গরীব জন সাধারণের দুর্ভোগ বেড়েছে সবচেয়ে বেশী। বিশ্বব্যাপী মন্দাবিরোধী মুদ্রাস্ফীতির কারণে, সাধারণ মানুষের ভোগের ক্ষমতা আরও কমে যায়। নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মাথাপিছু যোগানই শুধু এতে কমেছে তাই নয়, সাধারণ মানুষের কেনার ক্ষমতাও কমেছে। সত্তরের দশকে গোটা অর্থনীতিকে টানাপোড়ানের এক কঠিন চড়াই উৎরাই পার হতে হয় এবং ভোগ ও উৎপাদন উভয় ক্ষেত্রেই ভর্তুকির ওপর নির্ভর করতে হয়। জন কল্যাণই মূলতঃ সরকারী ভর্তুকি দানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যদিও সামগ্রিক অর্থনীতির উন্নতি ছাড়া জনসাধারণের স্থায়ী কল্যাণ সম্ভব নয়।

২.৩ সত্তরের দশকে বন্যার প্রবৃদ্ধির ফলে বেকার সমস্যার আরও অবনতি ঘটে। সক্ষম জনশক্তির এক তৃতীয়াংশের বেশী হয় পূর্ণ বেকার কিংবা অংশতঃ বেকার। অথচ এই ব্যাপক বেকারত্ব সত্ত্বেও কম বয়সের ছেলেমেয়েরা যাদের স্কুলে যাবার কথা তাদের নানা কাজে খাটতে হচ্ছে; এটা দারিদ্রের পরিহাস। গ্রাম এলাকায় যেখানে কৃষি জমিই হচ্ছে প্রধান অর্থনৈতিক সম্পদ সেখানে এই সমস্যা সবচেয়ে বেশী প্রকট। সাধারণতঃ উন্নয়নের আওতায় কৃষি খাতে সম্পদ বরাদ্দের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে, ১৯৭০ এর দশকে উন্নয়ন বরাদ্দে কৃষি খাতের অংশ ঐতিহাসিকভাবে আরও কমে যায়। ফলে গ্রামের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সম্ভাবনাময় কিছু ক্ষেত্রে শ্রম প্রধান নতুন কৃষি প্রযুক্তিও গ্রামের শ্রম-শক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়তে পারেনি, পক্ষান্তরে ঐ সীমিত সম্পদ বন্টনের চিরাচরিত যে নিয়ম প্রচলিত রয়েছে তার পরিণতিতে সম্পদ আরও বেশী করে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কুক্ষিগত হচ্ছে ও সেইসাথে গ্রামে ভূমিহীন ও বেকার মানুষের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। শহরের ছিন্নমূল ভাসমান জনগোষ্ঠির মাঝে গ্রামীণ জীবনের ক্রমাবনতির ছবিই প্রতিফলিত। ৭০ এর দশকে কিছুটা উন্নতি দেখা গেলেও সেই ধারা অক্ষুন্ন রাখা যায়নি, ক্ষুদ্র ও বর্গাচাষী এবং ভূমিহীন চাষীদের মত অপেক্ষাকৃত বেশী গরীব শ্রেণীর আর্থিক অর্থনৈতিক অবস্থা ১৯৬৯/৭০ এরও অনেকটা নীচের নেমে যায়।

২.৪ সাধারণ ভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মন্থরতার কারণে, সমাজের সকল খাতে অগ্রগতি ব্যাহত হয় বলা চলে। পথঘাটের উন্নয়ন, গৃহায়ন ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অতি সামান্য অগ্রগতি হয়েছে। জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ মোটামুটি শিক্ষিত বলা চলে। ৫ থেকে ১১ বছরের ছেলেমেয়েদের দুই-তৃতীয়াংশেরও কম প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। এই অনুপাতগুলি গ্রাম এলাকায় আরও কম। সংক্ষেপে, গোটা জনসমষ্টির ৯০ শতাংশেরও বেশী মানুষের আবাসস্থল গ্রাম এলাকা ব্যাপক দারিদ্র্য, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা ও অপুষ্টিকর এক করুণ চিত্র তুলে ধরে।

২.৫ তাই, উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে দারিদ্র্য হ্রাস এবং এ শতাব্দীর শেষ নাগাদ বাস্তবোচিত পন্থায় সম্পূর্ণতঃ এই দারিদ্র্য মোচনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিই হবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল বিষয় বস্তু। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার গুণগত উৎকর্ষ বিধানই হবে এর পরম উদ্দেশ্য। এর জন্য আবশ্যিক শর্ত হিসেবে দেশের অর্থনীতিকে ক্রমান্বয়ে অধিক আয় ও কর্মসংস্থানের স্তরে উন্নীত করতে হবে। আমাদের আর্থ সামাজিক অবস্থা, উন্নয়নের সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম উন্নয়নই হবে আমাদের দারিদ্রের মোকাবিলা করার উন্নয়ন কৌশলের প্রধানতম মনোনিবেশ স্থান। এর কারণ, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক পল্লী এলাকায় বসবাস করে যেখানে প্রকট দারিদ্র বিরাজ করছে। এই পল্লী এলাকায় প্রবৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা আজও কাজে লাগান হয় নি এবং প্রকৃতির তিনটি দান জমি, পানি আর জনসম্পদের অপচয় এখনও চলছে। এ হচ্ছে, গ্রামীণ জনসাধারণকে চরম অবহেলা করে নাগরিক আরাম

আয়াসময় জীবন ও সংস্কৃতির উপনিবেশিক দর্শনের দীর্ঘ ইতিবৃত্ত যার ফলে নগরেই বিনিয়োগ ঘটেছে খুব বেশী অনুপাতে। তাই, অতীতের উত্তরাধিকার হিসেবে চলে আসা প্রবৃদ্ধির ধারায় একটা সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন আনার প্রয়াস হিসেবে দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রাণবিন্দু হবে গ্রাম উন্নয়ন, আর সেই প্রাণবিন্দুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে উন্নয়নের অন্যান্য উদ্দেশ্যাবলী ও কৌশলসমূহ।

২.৬ জনসাধারণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের এক সামগ্রিক পরিসর জুড়ে চলবে পল্লী উন্নয়ন। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য রক্ষা সংক্রান্ত উন্নয়ন তৎপরতাও এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে। উৎপাদনই কল্যাণের উৎসমূল। তাই কৃষি উন্নয়ন হবে পল্লী উন্নয়নের মূল ভিত্তি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মত স্বল্প মেয়াদে কৃষি খাতে উন্নয়ন পল্লী এলাকার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করবে। কৃষি উন্নয়নের কৌশল হবে চিরাচরিত প্রথার কৃষি ব্যবস্থার আশু রূপান্তরের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির সুযোগ সুবিধাকে আরও সুপরিসর করে তোলা। এ উদ্দেশ্যে পল্লী খাতে পর্যাপ্ত সম্পদের ব্যবস্থা করা হবে এবং সকল শ্রেণীর পল্লীবাসীর জন্য সম্পদ ও আর্থিক সুযোগ সুবিধার নিশ্চিত করা হবে। পল্লী এলাকায় সম্পদ-সম্পত্তির মালিকানায় যে ব্যবস্থা বা রীতি প্রচলিত রয়েছে, প্রধানতঃ সেটাই সম্পদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে রয়ে সম্পদ বন্টন করার সঙ্গে সঙ্গে সম্পদের একটা সুষ্ঠু বন্টন ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি প্রয়োজন। পল্লী এলাকায় সম্পদের মালিকানায় বড় রকমের অসমতা রয়েছে। ইহা শুধু আয়ের সুষম বন্টনেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না বরং সুযোগ সুবিধাও ব্যাহত করে। এতে দারিদ্র মোকাবিলাভুক্ত উদ্দেশ্যাবলী অর্জন যেমন কঠিন হয় তেমনি জনসাধারণের উৎপাদনমুখী উদ্যমকে দমিয়ে দেয়। এমন, প্রকৃতীয়ভাবে সামাজিক ন্যায়বিচারের স্বার্থে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সম্পদ, আয় ও সুযোগ সুবিধের আরও সমানভাবে বন্টনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা দরকার।

২.৭ গ্রামীণ জনসাধারণের মৌলিক চাহিদাগুলি মেটানোর উদ্দেশ্যে একটি দারিদ্র্য নিরসনকারী উন্নয়ন কৌশল স্থির করতে হবে। তাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিও জন সম্পদ উন্নয়নের বিস্তারিত কৌশল সন্নিবেশিত থাকবে। যে প্রযুক্তিতে সুযোগ সুবিধে পেলে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে এবং জীবনের মৌলিক চাহিদা আগের মত পরিপূর্ণ আর হয় সেই প্রযুক্তি সহায়তা বিরাট স্তরের সুযোগ সৃষ্টির সনাতন পদ্ধতি যথেষ্ট নয়। কর্মজীবি মানুষের একটা সঙ্গত পরিমাণ আয় নিশ্চিত করার জন্য জনসম্পদের উৎকর্ষ সাধন করতে হবে। এটা করতে হবে গণমানুষের প্রযুক্তি জ্ঞান ও দক্ষতার প্রসার ও গভীরতা বাড়ানো এবং উন্নততর প্রযুক্তি প্রয়োগের সঙ্গে কায়িক শ্রম ব্যবহারের মাধ্যমে।

২.৮ এই কার্যক্রমের সাফল্যের জন্য উৎপাদন পরিকল্পনার ব্যাপারেও কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, বিশুদ্ধ পানি, গৃহ সংস্থান ও শিক্ষার মত মৌলিক প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সরবরাহ বৃদ্ধি করতে হবে। সম্প্রতিকালে এসব সামগ্রীর অনেকগুলি মাথা পিছু যোগান কমে গেছে এবং চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে পরিমাণগত ব্যবধান অত্যন্ত বেশী হওয়ায় ভারসাম্য হীনতার সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই ব্যবধান দূর করবে ও পর্যাপ্ত সামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা করবে যাতে সাধারণ মানুষের ভোগের মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়।

২.৯ অতীতে নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লী এলাকার মানুষের ত্রাণ ও সাহায্যের জন্য যতটুকু প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে তা ভঙ্গুল হয়ে গেছে। বর্তমানে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় ২.৭ শতাংশ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কোন রকমের উন্নয়ন প্রয়াসই অদূর ভবিষ্যতে পল্লী এলাকার জীবনধারার মান উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে না। পরিকল্পিত উন্নয়নের সাফল্যের জন্য অবশ্যই যুগপৎ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকে পল্লী উন্নয়নের মতই সমান অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রকৃত পক্ষে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পল্লী উন্নয়নের চাবিকাঠি, একটা সমষ্টি সত্ত্বা হিসেবে গ্রামের প্রতিটি পরিবারকে এর আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

২.১০ পল্লী উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে এবং যে সুফল যতদূর সম্ভব পল্লী সমাজের জন্য হস্তার রাখার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে অনেকগুলি পল্লী শিল্প ও মার্কেটিং-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ সমস্ত শিল্পগুলি কৃষি খাতে নানা উপকরণ ও সেবা সরবরাহ যোগাবে, কৃষিজাত কাঁচা-মাল প্রক্রিয়াজাত করবে এবং পল্লীবাসীদের চাহিদা মাফিক শিল্পজাত দ্রব্য তৈরী করবে। ওয়ার্কশপ, কারিগরী প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল প্রদর্শনীর প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন, মজুত ও গুণ দানের জন্য মার্কেটিং কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।

২.১১ পল্লী উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার ফলে দেশের কল্যাণ হবে সর্বাধিক, কারণ পূর্ববর্তী পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার গতানুগতিক ভাবে যা করা হয়েছিল, গ্রাম এলাকায় মুক্ত উন্নয়ন সম্ভাবনা তা থেকে অনেক বেশী। এতে চিরাচরিত শহরের উচ্চ চাহিদা বজায় রেখেও প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে ও দেশকে স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে নিতে সক্ষম করবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশলসমূহ

পল্লী উন্নয়ন কৌশল

২.১২ পল্লীর অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের গুণগত সামগ্রিক উন্নয়ন পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্য। পল্লীর অর্থনীতির উৎপাদন ও প্রযুক্তি বুনিয়াদের প্রসার এবং প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিচর্যা ও পরিবেশের মত সরকারী সার্ভিসের সম্প্রসারণ ঐ লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত। তবে পল্লী উন্নয়ন কৌশলের সাফল্য একদিকে, সাকল্যজনকভাবে জনসংখ্যাবৃদ্ধি রোধ ও অন্যদিকে নারীদের পরিবারের সকলের জন্য উৎপাদনশীল কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল। সন্দেহাতীত এই বিশাল দায়িত্ব পালনে সরকার ও জনসাধারণের সম্মিলিত প্রয়াসের প্রয়োজন। একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, বস্তুতঃ খোদ জনগণই পল্লী উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি; আর সেক্ষেত্রে সরকারের কাজ হবে আর্থিক ও কারিগরী সাহায্য এবং স্থানীয়ভাবে অনুপস্থিত উপকরণ যোগান দিয়ে স্থানীয় প্রয়াসের সম্পূরক ভূমিকা পালন করা। সর্বনিম্ন পর্যায়ে পরিকল্পনার প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য একটি কাঠামো রচনায় স্থানীয় উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে। একথা স্বীকৃত যে জনগণ কোন পরিকল্পনাকে সফল গণ্য না করলে তা সফল বলে বিবেচিত হবে না।

২.১৩ বর্তমানে পল্লী অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা ন্যূনতম পর্যায়ের ও অনেকটা পরোক্ষ। ৬৮ হাজার গ্রামের লক্ষ লক্ষ চাষী ও ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা সেখানকার গোটা অর্থনৈতিক কার্যকলাপের কর্ণধার। পরিসংখ্যানের একটা সমষ্টি ফলের বিবেচনায় কেবল এরা জাতীয় অর্থনীতির অঙ্গ বলে বিবেচিত, অন্যথায়, বর্তমানে তাদের নিজস্ব জীবন যাত্রা প্রণালী পর্যায়ে চলছে। সরকারের পরোক্ষ ভূমিকা যা নানা উপকরণ সরবরাহের মধ্যে সীমিত ছিল তা সমস্যার ব্যাপকতার তুলনায় ছিল নগণ্য এবং প্রত্যক্ষ ভূমিকাটিও এত অকিঞ্চিৎকর ছিল যে বৃটিশ ভারত ভাগ হওয়ার পর দীর্ঘ তিনদশকেও গ্রামীন জীবনে যাত্রায় কোন উল্লেখ যোগ্য পরিবর্তন হয়নি। উত্তরাধিকার হিসেবে প্রাপ্ত এই ঔপনিবেশিক বাধা বিপত্তি কাটিয়ে ওঠার জন্য, থানা পর্যায়ে সরকারী প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের বিষয় অতিমাত্রায় স্থির করা হয়েছে। এর ফলে সরকারের থানা পর্যায়ের অর্থনৈতিক তৎপরতার আরও সুসমন্বয় সুনিশ্চিত হবে। এছাড়াও থানা প্রশাসন কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পাদন সামর্থ্যের স্থানীয় গুরুত্ব সম্পন্ন নানা উন্নয়ন কার্যক্রমের উদ্যোগ নেবে ও সেগুলি বাস্তবায়িত করবে।

২.১৪ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ের সংগঠন গুলিকে স্বায়ত্বশাসন উৎসাহিত করা হবে। এই সংগঠনগুলি শুধুমাত্র উৎপাদনই নয় বরং গ্রামীণ জীবনের কমিউনিটি উন্নয়নমূলক বিভিন্ন উন্নয়ন ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাশ্রমের সুদক্ষ ব্যবহারের পদ্ধতি প্রদান করবে। এক্ষেত্রে সরকার নৈতিক নেতৃত্ব ও নির্দেশনা দান এবং সমঝোতা সৃষ্টির মত ভূমিকা পালন করবেন। পল্লী

প্রতিষ্ঠানগুলির সহায়তা না থাকায় ইতিপূর্বে পল্লী উন্নয়নমূলক সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয়। জনসাধারণের মাঝে উৎসাহ ও প্রেরণার অভাব না থাকলেও শীর্ষ নিম্নাভিমুখী পল্লী উন্নয়ন পদ্ধতি জনগণের প্রয়োজন মেটাবনে একদিকে যেমন ব্যর্থ হয়েছে তেমনি জনগণের উৎসাহ স্তিমিত করেছে। তাই সরকারের অনুসৃত নীতিমালা ও কার্যক্রমে জনগণের প্রয়োজনের প্রতিফলনের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনায় থানা প্রশাসনের সঙ্গে উদ্দিষ্ট জনসমষ্টির সঙ্গে থানা প্রশাসনের কাঁধে কাঁধ মেলানো নিবিড় সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য ঐ জনগণের মাঝে বুনিয়াদী পর্যায়ে উৎপাদন সংগঠন গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

২.১৫ পল্লীর জনসম্পদ উন্নয়ন পল্লী উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। এজন্য প্রয়োজনীয় শর্ত হিসাবে শিক্ষিতের হার যথেষ্ট অনুপাতে বাড়াতে হবে। তাই সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে প্রাথমিক শিক্ষা এবং পরিকল্পনাকালে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হবে। এই সাথে উৎপাদনশীল শ্রমজীবি মানুষের "বয়স্ক শিক্ষার" আওতায় শিক্ষাদানের দিকেও জোর দিতে হবে। এজন্য কমিউনিটি স্কুল বিদ্যালয় গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে শিক্ষাদানের অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিকে জোরদার করা হবে।

কৃষি উৎপাদন কৌশল

২.১৬ কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতার দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য। কৃষিতে আশু পরিবর্তন ছাড়া বাংলাদেশে কোন রকম গ্রামীণ বা জাতীয় উন্নয়ন কিংবা উল্লেখযোগ্য হারে দারিদ্র্য বা বেকারত্ব হ্রাস খুবই কঠিন। প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন, ভূমি সংস্কার, স্থানীয় পর্যায়ের সংগঠন, আঞ্চলিক পরিকল্পনার মত সকল প্রয়াসের কাজ হবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তি যোগানো। মাথাপিছু ভোগের বর্ধিত মাত্রার উপযোগী পর্যায়ে খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জন পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। তেলবীজ, ডাল, সবজী, মাছ ও হাঁস মুরগী প্রভৃতির উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়িয়ে জনসাধারণের জন্য আরও সুষম খাদ্য নিশ্চিত করারও চেষ্টা চলবে। বিভিন্ন ফসলের আবাদ ও অন্যান্য উদ্দেশ্য জমির ব্যবহার কোন আশু পরিকল্পনা আপাততঃ নেই তবে ফলনবৃদ্ধি অর্জিত হলেও সেই বর্ধিত উৎপাদনে স্থিতি এলে বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

২.১৭ বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ ও সহায়তামূলক সার্ভিস তথা সেচ ব্যবস্থা, পানি, সার, কীটনাশক ঔষধ, উন্নতজাতের বীজ, ঋণ সম্প্রসারণ সার্ভিস, মূল্য সমর্থন ব্যবস্থা ও বিপণনের সুযোগ সুবিধের জন্যে উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন ও নীতি ব্যবস্থাদি নিশ্চিত করা হবে কৃষি উৎপাদন কৌশলের লক্ষ্য।

২.১৮ নিশ্চিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচের আওতাবৃদ্ধি এবং অধিক ফলনশীল জাতের ধান ও গমের আবাদ বৃদ্ধি হবে কৃষি উৎপাদন কার্যক্রমের প্রধান কাজ। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সেচের জমির আওতা দ্বিগুণ করা হবে। এতে ছোট ছোট সেচ প্রকল্পগুলির (লো লিফট পাম্প, গভীর নলকূপ ও অগভীর নলকূপসমূহ) বাস্তবায়ন, চালু ও প্রস্তাবিত সেচ সুযোগ সুবিধাসমূহ এবং আউশ ও আমন ফসলের মৌসুমে পরিপূরক পানি সেচ ব্যবস্থাদির ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের প্রতি জোর দেওয়া হবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে অধিক ফলনশীল জাতের ধান ও গম চাষের আবাদী এলাকা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়বে এবং সার ব্যবহারের পরিমাণ দ্বিগুণ হবে। সারের সহজ প্রাপ্তি বর্তমানে সংকটপূর্ণ। সার কারখানাগুলির উৎপাদন ক্ষমতা অধিকতর সদ্ব্যবহার করেও নতুন নতুন কারখানা স্থাপন ত্বরান্বিত করে এবং পরিকল্পনা মাফিক আমদানীর ব্যবস্থা করে সার সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। জৈব সারের উন্নত ও ব্যাপক ব্যবহার প্রচলন করা হবে। সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতে বীজ উৎপাদন ও গুদামজাতকরণকে উৎপাদন পরিকল্পনার অংশ হিসাবে গণ্য করা হবে। আরও বেশী তহবিল বরাদ্দ ও উন্নততর প্রশাসনের মাধ্যমে ঋণ সুবিধে আরও বাড়ানো হবে যাতে উত্তম ঋণ আদায়ও নিশ্চিত হয়। পরিবহণ ও গুদামজাত কৃষি পণ্য বিপণনের পর্যাপ্ত সুবিধে নিশ্চিত করার জন্যে বড় রকমের প্রয়াস চালানো হবে। কারণ, তা না হলে

উৎপাদিত বাড়তি পণ্য বেচা কেনার গুরুত্বর সমস্যা দেখা দেবে। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ভর্তুকি বহুল পরিমাণে হ্রাস করার জন্য একটা সুনির্দিষ্ট সময় বিন্যাস অনুযায়ী কৃষি উপকরণগুলির জন্য প্রদত্ত ভর্তুকি পরিকল্পিত পন্থায় হ্রাস করা হবে। সার ও যন্ত্রপাতিসহ কৃষি ও পল্লী উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অধিকাংশ উপকরণ উৎপাদন করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

২.১৯ প্রধান কৃষি পণ্যগুলির জন্যে উৎসাহমূলক বাজার দর বজায় রাখা হবে। সংগ্রহ ও গুদামজাত ব্যবস্থা বহুল পরিমাণে জোরদার করতে হবে। অভাবের সময়ের জন্য পর্যাপ্ত মজুত গড়ে তোলা হবে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের উৎপাদন বাড়িয়ে বাজারে ছাড়ার মত উদ্বৃত্ত সৃষ্টির প্রয়াস নিতে হবে। একদানাতে চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে এবং ক্রমহ্রাসমান হারে রেশনিং ব্যবস্থা তুলে নেয়া হবে। সার ও অন্যান্য উপকরণের ওপর সাধারণ ভর্তুকি একটা সুপরিকল্পিত প্রত্যাহারযোগ্য লক্ষ্যভিত্তিক প্রণোদনা হিসেবে ক্রমান্বয়ে প্রয়োগ করতে হবে। ন্যায্য মূল্য বিতরণ ও উৎপাদন নীতিমালা প্রয়োগে চাল, গম ভোজ্য তেল, চিনি, শিশুখাদ্য, ডাল, মাছ ও হাঁসমুরগীর মত প্রধান প্রধান খাদ্য বস্তুর মূল্য স্থিতিশীল করতে হবে। খাদ্যের উৎপাদন ও মূল্য পাট, আখ, ডাল ও তেলবীজের মত অন্যান্য পণ্যের দর প্রভাবিত করে, সেজন্য কৃষি কার্যক্রমগুলির সঙ্গে খাদ্যনীতিকে যথোপযুক্তভাবে সমন্বিত করা হবে।

স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদন পরিকল্পনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো: কৌশল

২.২০ এ পরিকল্পনায় খাদ্য শস্য এবং অন্যান্য কৃষিজ ফসল যেমন, পাট, তুলা, আখ, ডাল ও মাছ উৎপাদনের উচ্চ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। কৃষি মূলতঃ বেসরকারী মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় রয়েছে বলে ইতিপূর্বে সরকার চাষীদেরকে সম্পূরকমূলক সুযোগ সুবিধে, প্রশিক্ষণ, ভর্তুকিযুক্ত উপকরণাদি ও ঋণ সুবিধে দিয়ে কৃষির আধুনিকরণের চেষ্টা করেছেন। তবে এই কৌশল গ্রামীণ অর্থনীতিতে সত্যিকার বৈপ্লবিক অগ্রগতি আনার জন্য পর্যাপ্ত বলে মনে করা হয় না। সংখ্যাগরিষ্ঠ চাষীর জমি ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত, এই জমিতে পানি ও শ্রমের সঙ্গে আধুনিক কৃষি উপকরণগুলি সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মাত্রায় প্রয়োগ সম্ভব নয়। চাষীদের একটা বড় অংশের কোন জমির মালিকানা পর্যন্ত নেই, তারা বর্গাচাষী হিসেবে পরের জমি চাষ করে। ঐ জমির মালিক চাষী নয়। আধুনিক চাষাবাদে বিস্তর নগদ অর্থ বিনিয়োগের দরকার, তা ছাড়া, বাজারে বিক্রি করার মত উদ্বৃত্ত উৎপাদনে যেসব ঝুঁকি রয়েছে তা ছোট চাষী বা বর্গাচাষীর পক্ষে সাধারণতঃ বহণ করা সম্ভব নয়। তাই উৎপাদন ও জমি ব্যবহারের পরিকল্পনার ভার শুধু চাষীদের হাতে ছেড়ে দেয়া যায় না, অবশ্য, এজন্যে জমির মালিকানায় হস্তক্ষেপ করারও দরকার নেই। যা দরকার তা হচ্ছে, জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য পরোক্ষভাবে মূল্যনীতির মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে জমি ব্যবহার ও উৎপাদন পরিকল্পনার উপর প্রভাব সৃষ্টি করা। তবে একথা বললে চলবে না যে, জমি বাংলাদেশে সর্বাপেক্ষা বিরল সম্পদ এবং গ্রামীণ কর্মজীবি লোকদের কার্যকর কর্মসংস্থান ও আরও বেশী উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই পরিকল্পনার সাফল্যের জন্যে জমির যথার্থ উন্নয়ন ও ব্যবহার অবশ্যক। স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান পরিকল্পনার একটা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সুবিধে দেয়ার জন্য ইতিবাচক ব্যবস্থাদি নেয়া হবে এবং তাতে জমি, পানি ও জনসম্পদের উন্নততর ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। এটা স্বীকৃত যে, প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলির প্রতি সরকারী সমর্থন ও আইনের স্বীকৃতি ছাড়া জমির আরও সুদক্ষ ব্যবহারের জন্য উৎপাদন, কর্মসংস্থান, স্বেচ্ছায় খণ্ডজোত-জমির একত্রীকরণ প্রভৃতি জোরদার না করলে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির বিকাশ সম্ভব নয়।

২.২১ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি মাছের চাষ, হাঁস মুরগী চাষ ও গবাদি সম্পদ উন্নয়নে ও উৎসাহ যোগাবে ও সংগঠিত করবে। গ্রামের ভূমিহীনদের কর্ম সংস্থানের ব্যাপারে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষভাবে মনোযোগী হবে। এগুলি প্রথম দিকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হলেও গোটা পল্লী জীবনকে ধীরে ধীরে আয়ত্ব করে নেবার প্রক্রিয়ায় সেগুলি ঠিক হয়ে যাবে। শুধু উৎপাদন নয়, স্বাস্থ্য, শিক্ষা জনসংখ্যা পরিকল্পনা এবং জনসম্পদ উন্নয়নেও এই প্রতিষ্ঠানগুলি সংশ্লিষ্ট ভূমিকা পালন করবে।

২.২২ মোট কথা, কৃষি লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের কৌশলে হবে, কৃষি প্রযুক্তির ভিত্তি মজবুত করা, পরিকল্পনা ও বাস্তায়নের মিশ্রিতে ঘুরিয়াদী পর্যায়ে সংগঠন গড়ে তোলা, এবং সংগঠনের মাধ্যমে ব্যাপিত জনশক্তি প্রবাহিত করা। পাশাপাশি আধুনিক উপকরণ সরবরাহ, মূল্য স্থিতি রক্ষার সমর্থনমূলক নীতি অনুসরণ, বিপনন সুবিধার উন্নতির কার্যক্রম এবং অবকাঠামো গড়ে তোলার কার্যক্রম ঐ কৌশলের জন্য সহায়ক হবে।

আঞ্চলিক ও পরিকল্পনা স্থানীয় কৌশল

২.২৩ সার্বিক পল্লী উন্নয়ন ও সেই সঙ্গে শিল্প, অর্থকরী ফসল ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যকলাপের অর্থবহ বিন্যাস সহ বিভিন্ন অঞ্চলের সুষম বিকাশের স্বার্থে অঞ্চল ভিত্তিক পরিকল্পনা জরুরী। দেশকে তার বিভিন্ন অংশের অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে অর্থবহ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও উপ-অঞ্চলে বিভক্ত করা হবে। উৎপাদন, বিপনন ও বিতরণ ব্যবস্থা, পরিবহণের উপায়, নদনদী ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যাবলী এসব কার্যকর অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনে প্রভাব বিস্তার করে। প্রতিটি অঞ্চলকে তার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। আঞ্চলিক পরিকল্পনার জন্য ইউনিয়নকে প্রাথমিক ইউনিট হিসেবে গণ্য করা যায়। ইউনিয়ন ও গোটা দেশের মধ্যবর্তী পরিসরে থানাকে পরিকল্পনা প্রণয়নের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব এবং তারপর পরিকল্পনা প্রণয়নকে জেলা পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যায় ও জেলাগুলির আকার এজন্যে উপযুক্ত পর্যায়ে হ্রাস করা চলে। সার্বিক আঞ্চলিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য পরিকল্পনার কাজ শুরু ব্যবস্থা আছে।

২.২৪ বিভিন্ন এলাকায় মাটি ও অন্যান্য সম্পদের সম্ভাবনা বিবেচনা করে এক একটি অঞ্চল বিশেষ কৃষি পণ্য উৎপাদনে যাতে বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে সেই লক্ষ্যে মোট জাতীয় উৎপাদনের লক্ষ্যে মাত্রা-গুলিকে আঞ্চলিক পর্যায়ে ভাগ করা হবে। আঞ্চলিক পরিকল্পনার সম্ভাবনার কারণেই নৈপুণ্যের নিরীখে অঞ্চলের বিশিষ্টতা অর্জন নিশ্চিত করবে। অধিকন্তু আঞ্চলিক পরিকল্পনার আওতায় আঞ্চলিক দ্রব্য বিশেষ-ত্বের জন্যে উপাদান ও সেবাসমূহের সমষ্টিকে অর্ন্তভূত করতে হবে।

২.২৫ একটি থানার ভৌগোলিক আয়তনের মধ্যে জনসংখ্যা এবং এই এলাকার সম্ভাব্য অর্থনৈতিক তৎপরতা ও আর্থ-সামাজিক বিবেচনা করে ঐ থানার সবচেয়ে উপযুক্ত স্থানে সঙ্গতভাবেই একটি প্রাথমিক শিল্প ও কৃষি সার্ভিস কেন্দ্র স্থাপন করা যায়। কৃষি জাত কাঁচামাল ও অন্যান্য সম্পদের স্থানীয় সরবরাহের ভিত্তিতে একটি সার্বিক থানা উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় প্রতিটি থানার (পুনঃ গঠিত থানার) একটি শিল্পায়ন তথা নগরায়নের কার্যক্রম থাকবে। এসব কার্যক্রম আন্তঃ আঞ্চলিক ও আন্তঃ-শিল্পের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করবে। পরিকল্পনা প্রণয়নকারীরা এ প্রধান কাজ হবে থানা পর্যায়ে কার্যকর কৃষি ভিত্তিক ও কৃষি সহায়ক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প চিহ্নিত করা। সরকার গোড়ার দিকে উপযুক্ত কেন্দ্র সমূহে এসব শিল্প প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে এবং এই শিল্পগুলিতে উৎপাদকদের সমবায় হিসেবে সংগঠিত করে সেগুলির ব্যবস্থাপনা, বিপনন ও ঋণের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন, এবং পরে যখন প্রতিষ্ঠানগুলি টিকে থাকার মত অবস্থায় পৌছাবে তখন সরকার সেগুলি থেকে ধীরে ধীরে সরে যাবেন। থানা পর্যায়ে প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রটি অঞ্চল ও উপ অঞ্চলের নগর-শিল্প কেন্দ্র ও কমপ্লেক্স সমূহের একটা ক্রমবিন্যস্ত পদ্ধতির কাঠামোর মধ্যে গড়ে তোলা হবে এবং সেটিকে দ্রুত গামী পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রধান প্রধান শহর ও বন্দরের সঙ্গে যুক্ত করা হবে।

শিল্প উন্নয়ন কৌশল

২.২৬ যখন শ্রেণী শিল্পায়নের কৌশল হবে গ্রামীণ খাতকে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা দান করা এজন্য কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে শিল্পায়ন কৌশল রচনা করা হয়েছে তাই এ কার্যক্রমে কৃষি সহায়ক ও কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাত করার শিল্পের উন্নয়নে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। গ্রাম-বাসীরা যাতে কৃষি আয় বৃদ্ধির সুফল ভোগ করতে পারে সেজন্য পল্লী অঞ্চলে ভোগপণ্য ও সেবামূলক

শিল্প উন্নয়নের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে। এই শিল্পগুলি পল্লী জনগোষ্ঠিগুলির কাছাকাছি গড়ে তোলা হবে যাতে পল্লী অঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ে। পল্লী এলাকায় বহু সংখ্যক প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র গড়ে তোলার মাধ্যমে স্থানীয় শিল্প ও জন গোষ্ঠির জন্য সকল সরকারী উপযোগ সুবিধেগুলি সহজে পাওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই হবে দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রধান উল্লেখযোগ্য দিক।

২.২৭ শিল্পায়ন কৌশলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সম্ভাব্য সর্বোচ্চ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন এই উদ্দেশ্য অর্জনের অন্যতম অবধারিত পথ। মোটামুটি এই শিল্পগুলি শ্রমিক প্রধান হবে। কিন্তু শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থানের উৎপাদন শীলতার বিকাশের প্রতি ও যথেষ্ট মনোযোগ দেয়া দরকার যাতে করে শ্রমিকরা যা মজুরী পায় তা যেন তাদের মৌলিক চাহিদা কার্যকরভাবে মেটাতে পারে। তাই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন কৌশলের সাফল্যের জন্যে কৃষির সঙ্গে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এক আবশ্যকীয় শর্তবিশেষ।

২.২৮ কৃষি উন্নয়নের ব্যাপারে আজ গুরুত্ব আরোপ করা হলেও এক্ষেত্রের বিপুল সম্ভাবনাকে এখনও পুরোপুরি কাজে লাগাতে চেষ্টা বাকী। কৃষি খাতে এই স্বল্পমেয়াদী গুরুত্ব আরোপের বিষয়টি যুক্তিসঙ্গত। তবে তাই বলে এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, দেশের দীর্ঘ মেয়াদী অর্থনৈতিক স্বার্থ শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। আর তাই সুষ্ঠু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রয়োজন বৈদেশিক ঋণের বোঝা বাড়ছে, কাজেই রপ্তানীমুখী শিল্প গড়ে তুলতে হবে। এ উদ্দেশ্যে শিল্পের ভিত্তিকে আরও মজবুত করতে হবে এবং ঘাতব ও প্রকৌশল শিল্পের ওপর জোর দিতে হবে। অবশ্য এ ধরনের প্রতিটি পদক্ষেপ স্থানীয় প্রযুক্তি ও শ্রম দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার বিষয়টি প্রশ্নাতীত-ভাবে সতর্কতার সঙ্গে মেনে চলতে হবে।

২.২৯ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিল্প উন্নয়ন কৌশল স্পষ্টতঃ পল্লী অভিমুখী। এতে বেসরকারী খাতে আরও বেশী পুঁজি বিনিয়োগের সুবিধে থাকবে। ১৯৭৬ সাল থেকে শিল্পনীতিকে উদার করার ফলে বেসরকারী পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই কিছু অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বেসর-কারী খাতের পরিপূরক হিসাবে কাজ করার পক্ষে সরকারী খাতে বিশেষ করে উপযোগ সেবাসুবিধের উন্নয়ন ও সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানগুলিকে জোরদার করার মাধ্যমে এই দুই খাতের প্রতিষ্ঠানগুলির মাঝে আরও উন্নততর যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতের জন্য শিল্পখাতে আরও অগ্র-গতির জন্য শ্রম পুঁজির সম্পর্কের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিঃসন্দেহে আধুনিক শিল্পবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সংগঠিত শ্রম শক্তি শিল্পবিকাশে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, এর গতিধারা এবং সাফল্য ও ব্যর্থতায় প্রভাব বিস্তার করবে। তাই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীর জন্য আরও প্রগতিশীল নীতি অনুসরণ করতে হবে। এই নীতির উপাদানগুলি হবে শ্রমিকদের যৌথ দর কষাকষির অধিকার এবং শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় তাদের অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা প্রবর্তনের তবে এ ধরণের একটা ব্যবস্থা শিল্প শ্রমিক নীতিতে গ্রামীণ জনগণের দক্ষতা ও প্রযুক্তি উন্নতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রযুক্তি ও শ্রম বাজারে দ্বৈততা অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

জ্বালানী উন্নয়ন কৌশল

২.৩০ এক নাগাড়ে জ্বালানী সঙ্কট যেসব উন্নয়নশীল দেশ তৈল উৎপাদন করেনা তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনাকে ম্লান করে দিয়েছে। কারণ শিল্প, কৃষি ও পরিবহণের আধুনিক প্রযুক্তি প্রধানতঃ জ্বালানী নির্ভর। তেল বা বিদ্যুৎ শিল্প ও পরিবহণের প্রধান চালিকা শক্তি। এমনকি সনাতন প্রথার চাষাবাদকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরিত করতে হলেও অধিক জ্বালানী নির্ভর প্রযুক্তির উপর নির্ভর

করতে হয়। সার-অধিক ফলনশীল বীজ-পানি প্রযুক্তি বহুল চাষাবাদে সনাতন কৃষি পদ্ধতির চেয়ে অনেক বেশী জ্বালানী প্রয়োজন হয়। তাই যতদিন জ্বালানী সঙ্কট থাকবে আর উন্নয়নের চাহিদা মেটানোর উপযোগী কম জ্বালানী ব্যবহার মূলক বিকল্পের আও উদ্ভাবন বিলম্বিত হবে ততদিন অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনিশ্চিত ও দুর্বল হয়ে থাকবে।

২.৩১ জ্বালানী সঙ্কটের ফলে আও বিবেচনায় বাংলাদেশ গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন। এই জ্বালানী সঙ্কটের কারণে তার খাদ্যে স্বনির্ভরতা ও অর্থনৈতিক প্রগতি ব্যাহত হবার সম্ভাবনাতো আছেই এরপরে খাদ্য শস্য যদি উন্নত দেশগুলিতে পরিবহণের বিকল্প জ্বালানী তৈরীতে ব্যবহৃত হয় তাহলে বিশ্ব খাদ্য উদ্বৃত্তে ঘাটতি পড়ারও আশঙ্কা আছে। সত্যিই যদি এটা ঘটে তাহলে বিশ্বে খাদ্যে ঘাটতি বাড়বে এবং জ্বালানী ঘাটতি খাদ্য ঘাটতি দেশগুলির জন্যে পরিণামে অস্তিত্ব সঙ্কটে পর্যবসিত হবে। এজন্যে যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের সঙ্কল্পবদ্ধ প্রয়াস গ্রহণ বিশেষ করে বাংলাদেশের জন্যে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২.৩২ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশের জ্বালানী চাহিদা দ্রুত না বেড়ে পারে না। বাংলাদেশে বর্তমানে মাথাপিছু জ্বালানী ব্যবহারের পরিমাণ প্রায় ১০০ কেজি তেলের অনুরূপ শক্তি সমান। এর দুই-তৃতীয়াংশ পাওয়া যায় জ্বালানী কাঠ, গোবর, খড়, তুষ ইত্যাদি সনাতন উৎস থেকে। তবু জ্বালানী আমদানী খাতে খরচ হয়ে যায় দেশের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের ৫০ শতাংশেরও বেশী। এজন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জ্বালানী সংক্রান্ত কৌশলের অঙ্গ হিসেবে গ্যাসের মত স্থানীয় জ্বালানী উৎসগুলির উন্নয়ন করা। এই উদ্দেশ্যে সেচের বেলায় মূল চালিকা শক্তি তেলের পরিবর্তে বিদ্যুতের ব্যবহার প্রবর্তন করা হবে ও একই সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাস ব্যবহার করা হবে। তবে বিদ্যুতায়নে বিপুল পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন ও যাত্রা নির্ভর সেজন্যে সেচের মোট শক্তি চাহিদার একটা সামান্য অংশ এবং অন্যত্র কিছু যেমন ক্ষুদ্র শিল্প ও পরিবহণের অনুরূপ চাহিদা কেবল বিদ্যুতায়নের খাতে পূরণ হতে পারে। অধিকাংশ সেচ পাম্প, নলকূপ ও যানবাহন এরপরও প্রধানতঃ আমদানী করা তেলের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকবে। এজন্য বিদ্যুতায়নের সঙ্গে কৃষি উন্নয়ন স্বনির্ভর করার জন্য সৌর শক্তি ও বায়ু শক্তির মত প্রাকৃতিক জ্বালানী উৎসের ব্যবহার বৃদ্ধির দিকে প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং অর্থনীতির নানাক্ষেত্রে কম জ্বালানী ব্যবহার ভিত্তিক উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে। বর্তমান জ্বালানী নীতি হচ্ছে কম জ্বালানী ব্যবহার ভিত্তিক জ্বালানী উদ্ভাবন, নবায়নযোগ্য জ্বালানীর অধিক ব্যবহার এবং আমদানী করা জ্বালানীর পরিবর্তে প্রযুক্তিগতভাবে যতদূর সম্ভব স্থানীয় জ্বালানী ব্যবহার।

সরকারী ও বেসরকারী খাতের ভারসাম্য বিধান কৌশল

২.৩৩ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে বাস্তবতার আলোকে সরকারী ও বেসরকারী খাতের ভারসাম্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকারী মালিকানা বজায় আছে এমন সকল প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ এবং মূল্য নির্ধারণের স্বাধীনতা দিয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। সকল ব্যবস্থাপনার জন্য উপযুক্ত উৎপাদনমূলক ব্যবস্থার পুরস্কৃত করা হবে এবং অদক্ষতা ও নিম্নমানের কাজের জন্য শাস্তি বিধান থাকবে। সরকারী খাতের উন্নয়ন কৌশলের একটা গুরুত্বপূর্ণ নীতি হবে ব্যবস্থাপনায় পেশাদারী নৈপুণ্য বৃদ্ধি।

২.৩৪ জনস্বার্থে বেসরকারী খাতের কোথাও কোথাও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে যেমন ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কৃষি ও পরিবহণ, বেসরকারী খাত সন্তোষজনকভাবে পরিচালনার পরিচয় দিয়েছে সেখানে তাদেরকে উৎসাহিত করা হবে। বিশেষ করে গবেষণা, সম্প্রসারণ, উপকরণ সরবরাহ ঋণ ও বিপণনের সুযোগের ব্যবস্থা করে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অনুপ্রাণিত করা হবে। উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে মূলধন বাজার উন্নয়নের উপর জোর দেয়া হবে যাতে উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানের জন্যে আরো সম্পদের যোগান দেয়া যায় বিশেষ করে যাতে বিদেশী বেসরকারী পুঁজি আকৃষ্ট হয়।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কৌশল

২.৩৫ জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের উদ্দেশ্যে অতীতে সরকারের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ সত্ত্বেও অতি হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বাংলাদেশের জন্য একটি উদ্বেগজনক সমস্যা হয়ে রয়েছে। অবশ্য এটা অস্বীকার করা যায় না যে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ন্যায় একটি গণসমস্যার অতি সহজে সমাধান সম্ভব নয়। ব্যাপক নিরক্ষরতা ও মান্ধাতা আমলের সমাজ ব্যবস্থা সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলেছে। কিন্তু এ সমস্যার সংকটজনক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে আরো বলিষ্ঠ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

২.৩৬ এ সমস্যা সমাধানের জন্য এ পর্যন্ত পরিবার পরিকল্পনার উপকরণ সংযোজনের উপর জোর দেয়া হয়েছে কিন্তু এ সমস্যার যথার্থ সমাধান জনগণের উদ্বুদ্ধকরণ এবং তাদের অংশ গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রায় অসম্ভব। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে স্থানীয় পর্যায়ের সংগঠনগুলোর একটি উদ্দেশ্য হবে এর উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি করা। এর সাথে সাথে সহজপ্রাপ্য পদ্ধতি আরো জোরদার করা হবে এবং অধিক বয়সে বিয়ে উদ্বুদ্ধ করা, ছোট পরিবারকে বিভিন্ন সুযোগ প্রদান ইত্যাদি জাতীয় প্রেরণামূলক পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হবে। এগুলোর মধ্যে কতকগুলিকে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হবে। জনসংখ্যা কার্যক্রমের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং যাতে এসব কর্মসূচী স্বাস্থ্য বিভাগের অংকাঠামো ব্যবহারের সুযোগ পায় সে উদ্দেশ্যে জনসংখ্যা কার্যক্রমকে স্বাস্থ্য পরিচর্যা কার্যক্রমের সাথে যথাযথভাবে সমন্বিত করা হবে। এরূপ সমন্বয়ের সাধন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর সম্প্রসারণ বৃদ্ধি করবে। জনসংখ্যা কর্মসূচীর নিয়মিত মূল্যায়ন করা হবে এবং জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস করার যে কোন কার্যকর পদ্ধতির দ্রুততার সংগে বাস্তবায়ন করা হবে।

শিক্ষা উন্নয়ন কৌশল

২.৩৭ জনসাধারণ, শিক্ষিত হলে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্য সহজেই সাধন করা যায়। আধুনিক জীবনযাত্রায় লেখাপড়া জানা একজন মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। প্রত্যেকের সমস্যাদি অনুধাবন, কৃষিতে আধুনিক উপকরণের দক্ষ ব্যবহার, খামার ব্যবস্থা সম্পাদন, সমবায়, ভূমি ব্যবস্থাপনা, পরিবার পরিকল্পনায় উপকরণ ব্যবহার এবং সর্বোপরি একজন নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের ব্যাপারে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বস্তুতঃ আধুনিকীকরণ ও প্রবৃদ্ধির পূর্ব শর্ত হচ্ছে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা।

২.৩৮ প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের সংগে সংগে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণকে জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু যেহেতু সম্পদের পরিমাণ সীমিত, তাই একই সংগে শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি সম্ভব নয় সুযোগ সুবিধাসমূহের সুষ্ঠু ব্যবহারের উপর জোর দেয়া, উচ্চ শিক্ষাকে মেধাবীদের জন্য সীমাবদ্ধ রাখা এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য বেসরকারী খাতকে অধিক পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে উৎসাহ ইত্যাদি নীতির সম্পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়োজন। তাই সরকারী খরচে প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক পর্যায়ে কারিগরী শিক্ষার প্রসার এবং তৎসংগে উচ্চ শিক্ষার জন্য বেসরকারী খাতের উপর অধিকতর দায়িত্ব অর্পণ। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশল হিসেবে অনুমোদন করা হয়েছে।

কর্মসংস্থান কৌশল

২.৩৯ আগেই যুক্তি দেখিয়ে বলা হয়েছে যে, মৌলিক চাহিদার সামগ্রী উৎপাদন নীতির সাথে কর্মসংস্থান ও জনসম্পদ উন্নয়নের নীতির সমন্বয় থাকতে হবে যাতে গরীব জনসাধারণ মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করতে পারে। দেশে বিপুল সংখ্যক শ্রম শক্তি বেকার কিংবা আংশিকভাবে বেকার। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় কর্ম সংস্থানের প্রবৃদ্ধি

শ্রমজীবীর সংখ্যার প্রবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখতে পারেনি। এর কারণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইপ্সিত গতিতে হতে পারেনি, ফলে, ১৯৭০ এর দশকে বেকারত্ব ও আংশিক বেকারত্বের তীব্রতা বেড়েছে। অতীতে বিনিয়োগে কৌশলের উপজাত ফল হিসেবেই স্বাধীনতোত্তর কর্মসংস্থানের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে। তাই, জাতীয় সমস্যা হিসেবে এর যতটুকু অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত ছিল তা পায়নি। তবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল বিষয়ই হচ্ছে সার্বিক কর্মসংস্থান কৌশল এর সর্ব প্রধান উদ্দেশ্য হবে উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান, সুযোগ সৃষ্টি। এই পরিকল্পনায় সকল কার্যক্রম ও প্রকল্প এর প্রতিফলন থাকবে। কর্ম-সংস্থানের মূল কেন্দ্রবিন্দু হবে পল্লী খাত।

২.৪০ দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষি খাতে যথেষ্ট পরিমাণ কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করা হয়েছে। পরি-কল্পিত কর্মসংস্থান নিশ্চিতে হবে আংশিকভাবে পরিকল্পিত চাষের নিবিড়তা বৃদ্ধি করে এবং শস্যের উচ্চ ফলনশীল চাষ বৃদ্ধি করে যাতে সনাতন পদ্ধতির চেয়ে অধিক পরিমাণ শ্রমের প্রয়োজন হয়। মৎস্য চাষ, পশুপালন, বন উন্নয়নের ফলেও কর্মসংস্থান যথেষ্ট বাড়বে। পল্লী পূর্ত কার্যক্রম ও কাজের বিনিময়ে খাদ্য কার্যক্রম ছাড়াও বিশেষ করে বিভিন্ন খাতের আওতায় পল্লী অঞ্চলে অবকাঠামোমূলক নির্মাণ কাজে যথেষ্ট পরিমাণে কর্ম-সংস্থান বাড়বে।

২.৪১ উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান কৌশলের অংশ হিসেবে গবেষণা, উন্নত যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশল অভিযোজন ও পরিব্যাপ্তি, এবং সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদেরকে ঋণ, উপকরণ, কারিগরী প্রশিক্ষণ ও বিপণন সুবিধাদির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ উৎপাদনশীল খাত সমূহে নির্বাচিত উপযুক্ত প্রযুক্তির উন্নয়ন হবে। কৃষি, শিল্প যেখানেই হোক, হাড়ভাংগা খাটুনি এড়িয়ে স্বস্তিতে কাজ করার মত পরিবেশের নিশ্চয়তায় বিধানকারী প্রযুক্তিতে উত্তরণের প্রয়োজন আছে। নতুন কলাকৌশল ও ধারণাগুলি উৎপাদনের অনুকূল প্রভাব সৃষ্টি করবে। এভাবে, মূল কৌশল হবে শ্রমের পরিশ্রমী ও সৎ ক্ষুদ্র চাষী ও উদ্যোক্তাদের পথ থেকে অন্তরায় দূর করা এবং তাদের পরিশ্রমে আরও উন্নততর নৈপুণ্য যোগ করা, উন্নততর সাজসরঞ্জামের সুবিধে বিধান করা এবং উন্নততর অবকাঠামো সুবিধে দেওয়া।

জনসম্পদ উন্নয়ন কৌশল

২.৪২ জনসম্পদ উন্নয়ন কৌশল হচ্ছে কর্মসংস্থান সৃষ্টির পূর্ব শর্ত। জনসম্পদ উন্নয়ন কৌশলের মূল লক্ষ্য হবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও সম্প্রসারণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন এবং এসবগুলোর উপযুক্ত যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন এবং জনসাধারণের কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি। সাড়া সৃষ্টির জন্য এর দু'প্রস্থ চাহিদা আছে। যারা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করছে তারা ছাড়া গ্রাম ও শহরাঞ্চলে যে শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রয়েছে তাদের কারিগরী নৈপুণ্যের মান বাড়াতে হবে। এই শ্রেণীর লোকেরা হয় কোন উৎপাদনমূলক তৎপরতার অস্তিত্ব নয় বয়সের দিক থেকে বাধাগ্রস্ত, আর এজন্যই অত্যন্ত সাধারণ উৎপাদন কুশলতার অধিকারী স্কুল-ছাড়া ছেলেমেয়ে এবং নিরক্ষর বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের দরজা খোলা নেই। এদের মত লোকদের পারদর্শিতা অর্জনমূলক প্রশিক্ষণের জন্য ব্যাপক পরিসরে অপ্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের আয়োজন করা হবে। স্বাক্ষরতা এসব কার্যক্রমের আবশ্যকীয় অংগ হবে। এই ধরনের অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমকে কৃষি, পশুপালন, গ্রামীণ শিল্প, পরিবহণ, যাতায়াত ও সেবামূলক ইত্যাদি, উৎপাদনশীল কার্যকলাপের সাথে কারিকরী যোগসূত্র স্থাপিত করতে হবে। অপ্রতিষ্ঠানিক কর্মসূচী যেমন, চাকরীকালীন প্রশিক্ষণ, স্ব-নিয়োজিত পেশায় প্রশিক্ষণ এবং উদ্যোগের উন্নতি এসবের প্রতি বিশেষ জোর দেয়া হবে।

২.৪৩ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে কমিউনিটি স্কুল নামে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে, এবং বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কাঠামোর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করবে এবং উভয়ে পরস্পরের পরিপূরক হবে। বিদ্যমান মাধ্যমিক স্কুল সমূহকে কমিউনিটি স্কুল নামে অভিহিত করা হবে এবং স্থানীয় জনসাধারণকে এই বিদ্যালয়ের কার্যকলাপে অংশ গ্রহণে উৎসাহিত করা হবে যেমন

শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি গঠন এবং প্রগতিশীল কৃষক, স্থানীয় বিশেষজ্ঞ ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সহযোগে পাঠচক্র উপদেষ্টা কমিটি গঠন ইত্যাদি। এই বিদ্যালয়ের মাধ্যমে সমস্ত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করা হবে। কমিউনিটি সমূহ ছাত্র ছাত্রীদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ দেবে এবং সেই সংগে এর ভৌত ও মানব সম্পদ অন্যান্য সূত্রের উপযুক্ত সম্পূরক, সবকিছু বয়স্কদের বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হবে। খানা পর্যায়ের নীচের স্তরে এ ধরনের সরকারীভাবে আয়োজিত অপ্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম তথা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বর্তমানে নেই। কমিউনিটি স্কুল এই গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি পূরণ করবে এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে এ ধরনের প্রশিক্ষণের সুযোগ সুবিধে প্রদান করবে। পল্লী উন্নয়নের গতি বৃদ্ধির সংগে সংগে কমিউনিটি স্কুলগুলি শেষাবধি গ্রাম পর্যায়ে বিস্তৃত হবে।

২.৪৪ জনসম্পদ উন্নয়নের যে, কোন কর্মসূচীতে গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে উন্নয়নমুখী ফলিত গবেষণা পরিচালনার জন্য যোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে পর্যাপ্ত সাহায্য দেয়া হবে। এসব গবেষণায় কৃষি বিদ্যা(AGRONOMY), খামার ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্র শিল্প, উপযুক্ত প্রযুক্তি, কর্মসংস্থান, বিপণন এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময় ও বিনিয়োগে উচ্চ লাভ দানে প্রতিশ্রুতিশীল গবেষণার ফলসমূহকে সম্প্রসারণ ও উপযুক্ত সরকারী নীতি মালার সাহায্যে বাস্তবে প্রয়োগের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে। প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন নামক এক পদ্ধতি সম্প্রসারণ কর্মসূচী দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে চালু করা হয়েছে; পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এই পদ্ধতিকে আরো জোরদার করা হবে। এটা কেবল কৃষি ক্ষেত্রেই নয় বরং ক্ষুদ্র শিল্প, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং আরও কিছু ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হবে।

সম্পদ সংগ্রহ কৌশল

২.৪৫ বর্তমানে বাংলাদেশের উন্নয়ন ব্যয়ের প্রায় ৮০ শতাংশ সংস্থান করা হয় বৈদেশিক সাহায্য থেকে দেশের রপ্তানী আয় দ্বারা আমদানী ব্যয়ের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ মেটানো যায়। বৈদেশিক সাহায্যের উপর এই ব্যাপক নির্ভরশীলতার পরিণাম অনেক দিক থেকেই অবাঞ্ছিত। এ ব্যাপারে প্রধান সমস্যা হচ্ছে যে, উন্নয়নশীল দেশসমূহকে প্রায়শঃই দাতাদেশের সংগে নিজেদের স্বার্থের আপোষ করতে হয়। প্রযুক্তি নির্বাচনে তাঁর ফলাফল আরও সুদূরতর কারণ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ সহ দাতা দেশসমূহ তাদের উচু মানের প্রযুক্তি চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। বিদেশী সাহায্যের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা উন্নয়ন তৎপরতার বার্ষিক বাস্তব কার্যক্রম প্রণয়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এসব কারণে অধিক পরিমাণে আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ ও রপ্তানী আয় বৃদ্ধি করে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা হবে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন কৌশলের সুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। আশু নির্ভরশীলতা অর্জনের জন্যে যতদূর সম্ভব আমদানী বিকল্পমূলক পণ্য উৎপাদন, বিলাস দ্রব্য আমদানী হ্রাস এবং বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রা অধিক উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

২.৪৬ ভোগ্যপণ্য ও সেচের পানি, সার ইত্যাদি কৃষি উপকরণের উপর শুল্কহার হ্রাস বা বাতিল করে উন্নয়নের জন্য সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়। কিন্তু শুল্কহার হ্রাস বাতিলের ফলে জনকল্যাণ ও উৎপাদনের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এ ধরনের রাজস্ব ব্যবস্থা সতর্কভাবে প্রয়োগ করা উচিৎ। রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনার উন্নতি ও উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার বৃদ্ধি এবং প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় মূল্য নির্ধারণের স্বাধীনতা দানের মাধ্যমেও উন্নয়নের জন্য সম্পদ তাৎপর্য্য পূর্ণ ভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব। মূল্য নির্ধারণে স্বাধীনতা প্রদানের পূর্বশর্ত হচ্ছে সরকারী সংস্থাসমূহে ব্যয় সচেতনা সৃষ্টি করা, যার ফলে অপচয় হ্রাস ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। প্রশাসনের ব্যয় হ্রাস এবং সার্ভিসের মান উন্নত করেও সম্পদ ব্যবহারের একটি পরিমিত অর্থনীতি অর্জন করা সম্ভব। এছাড়া বিদ্যমান কর ব্যবস্থার মাধ্যমে কর আদায়ের পদ্ধতির উন্নতি সাধন করে এবং অনার্জিত আয়ের উপর কর আরোপ করে সম্পদ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল করার কৌশল

২.৪৭ সত্তর দশক বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির দশক বলে পরিচিত এবং বাংলাদেশও মুদ্রাস্ফীতির কবল থেকে রেহাই পায়নি। মুদ্রাস্ফীতি, সঞ্চয়, প্রবৃদ্ধি, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও জনকল্যাণের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে অর্থনীতিকে অস্থিতিশীল করে তোলে। যদিও প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের জন্যে মূল্য স্থিতিশীলতাকে পূর্বশর্ত হিসেবে ধরা হয়েছিল কিন্তু সত্তর দশকের মুদ্রাস্ফীতি সে সবই বানচাল করে দেয়। মুদ্রাস্ফীতির চাপ থাকলেও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-কালে মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে, উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে পুরাপুরি মূল্য স্থিতিশীলতা কল্পনাতীত। প্রবৃদ্ধির প্রক্রিয়া ও অর্থনীতির কাঠামোগত গঠন অর্থনীতিতে কিছুটা মুদ্রাস্ফীতির চাপ সৃষ্টি করতে বাধ্য। আমদানীর উপর এত নির্ভরশীল অর্থনীতি বিশ্বজোড়া মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব থেকে বাঁচতে পারে না। বস্তুতঃ পরিবর্তনশীল মূল্য সম্পদসমূহের নিপুন বন্টনের একটা হাতিয়ারও। সুতরাং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে প্রধান লক্ষ্য হবে মুদ্রাস্ফীতি যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং মুদ্রাস্ফীতির চাপ যেন সমাজের নিম্ন শ্রেণীকে তুলনামূলকভাবে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত না করে।

২.৪৮ সংযমী বাজেট ও মুদ্রানীতির মাধ্যমে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা, দ্রুত ফলদায়ক প্রকল্পের বাস্তবায়ন, স্থানীয় উৎপাদন ও আমদানীর দ্বারা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ বৃদ্ধি, প্রতিযোগিতামূলক বন্টন পদ্ধতি এবং প্রয়োজনবোধে বিশেষ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ভোগ্যপণ্যের মত অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে মুদ্রাস্ফীতি আয়ত্বে রাখা হবে।

দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষিত

২.৪৯ অর্থনৈতিক উন্নয়ন যে একটা অবিরাম প্রক্রিয়া ইহা স্বীকৃত। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এই প্রক্রিয়ার একটি পদক্ষেপ মাত্র। বাংলাদেশের সম্পদ খুব সামান্য, সমস্যা সংকট সংকুল। এ দেশের আর্থ-সামাজিক দুরাবস্থা কাটিয়ে উঠতে হলে একটা দীর্ঘ মেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রয়োজন যথার যোয়াদী এই পরিকল্পনাকে তাই ঐ ধরণের একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এ পরিকল্পনার সাফল্যের একটি মাপকাঠি হবে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে এটা কতটা ত্বরান্বিত করে এবং এর ফলে পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে উন্নয়ন প্রক্রিয়া কতটা সহজতর হবে তার উপর। সুতরাং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যদিও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে দারিদ্র নিরসনের জন্য উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মত স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থার উপর জোর দেয়া হয়েছে, তবুও এই পরিকল্পনায় অর্থনীতির অব্যাহত অগ্রগতির উদ্দেশ্য কতকগুলো মৌলিক কাঠামো তৈরী করতে হবে।

২.৫০ দ্রুততর অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে বিপুল কাঠামো তৈরী করা প্রয়োজন, সীমিত সম্পদের দরুন এ পরিকল্পনাকালে তা সম্ভব নয়। এই পরিকল্পনায় কেবল নমুনতম মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রধান গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, ভৌত অবকাঠামো ও প্রাকৃতিক সম্পদের ভিত্তি উন্নয়ন, পল্লী বিদ্যুতায়ন, গণ সাক্ষরতা ও জনশক্তি উন্নয়ন, প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন, ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত ভারী শিল্পগুলিকে সুসংহত করা এবং গ্রাম পর্যায়ে প্রকৌশল সুবিধাদি সৃষ্টি করার উপর।

২.৫১ এই পরিকল্পনা পণ্য চলাচলে আন্তঃশিল্প সম্পর্কের একটা সহজ কাঠামো ভিত্তিক, চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে বস্তুগত ভারসাম্য রক্ষাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। সুষম আঞ্চলিক উন্নয়ন প্রযুক্তিগত মতামত ও জনশক্তি সরবরাহের দিকগুলি এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার পরিপূর্ণভাবে যাচাই করে দেখা হবে। এগুলি পরিকল্পিত উন্নয়নের মূল বিষয়। কাজেই শুধু সুষম আঞ্চলিক উন্নয়ন কিংবা বাংলাদেশের সনাতন অর্থনীতির উচ্চতর, প্রযুক্তিতে উত্তরণ কোনটার জন্যই পণ্য পরিকল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধ পরিকল্পনা কৌশল আলো পর্যাপ্ত হতে পারে না। এগুলিই এই পরিকল্পনার সীমাবদ্ধতা: ভবিষ্যত পরিকল্পনায় তাই সমাজের সামঞ্জস্যপূর্ণ সুষ্ঠু বিকাশের জন্যে উৎপাদনের পরিকল্পনাসহ স্থানীয় প্রযুক্তিগত ও জনশক্তি পরিকল্পনাও সমন্বিত থাকতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ ও খাতওয়ারী বরাদ্দ

পরিকল্পনার আকার

সর্বব্যাপী দারিদ্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য একদিকে সংকল্পবদ্ধ প্রয়াস, অন্যদিকে একটা সংগত সময়ের মধ্যে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মূল্যতঃ উন্নতি নিশ্চিত করার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা পূরণে পরিকল্পনার সম্ভাব্য সর্ববৃহৎ আকার দেওয়ার প্রয়াস প্রয়োজন। ১৯৭৫/৭৬ ও ১৯৭৯/৮০ এর মধ্যবর্তী সময়ে মাথাপিছু অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাৎসরিক শতকরা ৫·২ হারে বৃদ্ধি পায়। বিদেশী সহায়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভ্যন্তরীণ সম্পদ পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি হয়। মাথাপিছু অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের আনুপাতিক হার ১৯৭৫/৭৬ সালের শতকরা ৭·৬ ভাগ হইতে ১৯৭৯/৮০ সালে শতকরা ৭·৯ ভাগে বৃদ্ধি পায়। একই সময়ে বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির পরিমাণ ৮৫ কোটি ৮৩ লাখ মার্কিন ডলার থেকে ১২২ কোটি ৩০ লাখ মার্কিন ডলারে বৃদ্ধি পায়। অভ্যন্তরীণ ও বহিঃসম্পদের এ রকম একটা উজ্জ্বল পটভূমিকায় ১৯৮০ সালের জুলাই মাসে ২৫,৯২৫ কোটি টাকার (১৯৭৯/৮০ সালের মূল্য অনুসারে) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। পরিকল্পনায় সরকারী উন্নয়ন খাতে ২০,১২৫ কোটি টাকার ব্যয় স্থির করা হয়। আশা করা হয়েছিল; পরিকল্পনা মেয়াদে নীট ১৩,৮৪০ কোটি টাকার বিদেশী সাহায্য আসবে। আর্থ-সামাজিক পরিসরের নানান অপরিহার্যতার কারণে অত্যন্ত সুপরিসর এক পরিকল্পনা গ্রহণ প্রয়োজন থাকলেও দেশী ও বিদেশী সম্পদ প্রাপ্তির পরিস্থিতিজনিত কারণে ঐ আকার অপেক্ষাকৃত ছোট করতে হয়েছে।

৩·২ পরিকল্পনার সূচনাতে ছিল অত্যন্ত অশুভ। উন্নত বিশ্বে মন্দার কারণে বিশ্ববাণিজ্য ও সাধ্যের পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে। আর্থিক সহায়তার অন্তর্মুখি প্রবাহে স্থবিরতা আসে। রপ্তানী আয় কমে যায়। এগুলি একে একে সরকারের বাজেটে প্রতিকূল প্রভাব ফেলে। সম্পদের অভাবজনিত তীব্র চাপের মুখে পরিকল্পনার প্রথম পর পর দু'বছরে যথাক্রমে ১৯৮০/৮১ ও ১৯৮১/৮২ সালের উন্নয়ন কার্যক্রমকে নিম্নাভিমুখী করে সংশোধন করা হয়। পরিকল্পিত লক্ষ্যগুলি যাতে অপেক্ষাকৃত স্বল্পব্যয়েও পেছাবাড়ি অর্জন করা সম্ভব হয় সেজন্যে অপেক্ষাকৃত কম জরুরী ব্যয় এড়িয়ে মৌলিক উন্নয়ন কার্যক্রম অক্ষুন্ন রাখার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হয়। এই অনুসারে সরকারী খাতের ব্যয় কার্যক্রমের সংগতি বিধান করা হয় এবং আকারে ছাঁটাই করে ২০,১২৫ কোটি টাকা থেকে ১৫,৮৮৭ কোটি টাকায় হ্রাস করা হয়। অবশ্য, পরিকল্পনার দ্বিতীয় বছরে সংগতি বিধানের পুনরাবৃত্তি এ বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার করে তোলে যে, সম্পদ সংকটের পরিস্থিতিতে এমনকি, সংগতি বিধান সরকারী খাত কার্যক্রম পরিচালনাও সম্ভব নয়। দু'বছর (১৯৮০—৮২) পরিকল্পিত ব্যয়ের আনুমানিক এক পঞ্চমাংশ কাজে লাগানো সম্ভব হয়। সম্পদ প্রাপ্তির সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য পরিকল্পনার একটা পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন দেখা দেয়।

৩·৩ পরিকল্পনার চূড়ান্ত পরিব্যয় এখন ১৭,২০০ কোটি টাকা—সরকারী খাতে ১১,১০০ কোটি ও বেসরকারী খাতে ৬,১০০ কোটি টাকা। এর অর্থ সরকারী খাতের কার্যক্রমে বড় রকমের সংকোচন। প্রথমে এই খাতে ব্যয় ধার্য ছিল ২০,১২৫ কোটি টাকা; পরে সংগতি বিধান হয়ে ১৫,৮৮৭ কোটি টাকায় গিয়ে ঠেকে। প্রধানতঃ কতকগুলি প্রকল্প বাদ দিয়ে স্থগিত রেখে সরকারী খাতের ব্যয় পরিমাণের সংকোচন ঘটানো হয়েছে। বাদ দেয়া ও স্থগিত রাখা প্রকল্পগুলির মাধ্যমিক মেয়াদে প্রবৃদ্ধি ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে তেমন কোন প্রভাব নেই বললেই চলে। এছাড়া, দীর্ঘ মেয়াদী প্রবৃদ্ধির সহায়ক এখন বেশ কিছু প্রয়োজনীয় প্রকল্পও বাদ পড়েছে। সীমিত সম্পদের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি ও যতদূর সম্ভব রপ্তানী সর্বাধিক বাড়িয়ে বহিঃসম্পদ বৃদ্ধি ও সেই সাথে অভ্যন্তরীণ সম্পদের অভাবজনিত পরিস্থিতি উন্নতির একান্ত তাগিদেই এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছে।

বেসরকারী খাতের উপর গুরুত্ব :

৩.৪ সরকারী খাতের আকার হ্রাস করা হলেও, বেসরকারী খাতে খসড়া পরিকল্পনায় যে বরাদ্দ ছিল তা আরও বাড়ানো হয়েছে। ১৭,২০০ কোটি টাকার মোট ব্যয় থেকে বেসরকারী খাতে বরাদ্দ রয়েছে ৬,১০০, কোটি টাকা। খসড়া পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত মোট উন্নয়ন ব্যয়ে বেসরকারী খাতের অংশ শতকরা ২১ ভাগ থেকে সংশোধিত দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৩৫ ভাগে বৃদ্ধি করা হয়েছে। সরকারী খাতের বরাদ্দ বিনিয়োগ বহির্ভূত ব্যয় তুলনামূলকভাবে অধিক খনে বেসরকারী খাতে বিনিয়োগের হার আরও বেশী হবে। বেসরকারী খাতে এই বর্ধিত ব্যয় বেসরকারী খাতের প্রতি সরকারী নীতি পরিবর্তন প্রতিফলিত করে। নতুন শিল্পনীতিতে বেসরকারী খাতে পুঁজি নিয়োগের জন্য শিল্পের তালিকাটি শুধু সম্প্রসারিত নয়, বেসরকারী পুঁজি নিয়োগের জন্য অনুমোদন প্রক্রিয়াও সহজ করা হয়েছে। এই পরিবর্তনগুলি ছাড়াও বেসরকারী খাতের জন্য পর্যাপ্ত রাজস্বগত ও আর্থিক উৎসাহ দানের ব্যবস্থা থাকবে। এর উদ্দেশ্য হবে বিনিয়োগের লক্ষ্য-মাত্রায় পৌঁছানোর জন্য সঞ্চয় ও পুঁজি বিনিয়োগে উৎসাহিত করা। অবশ্য বিনিয়োগ লক্ষ্য মাত্রা একটা ইংগিতবাচক অঙ্ক মাত্র। শিল্প প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেয়ার ব্যাপারে বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়ার ব্যাপারটি যেহেতু গুরুতর প্রতিবন্ধক হয়ে থাকবে সেহেতু, আন্তর্জাতিক পুঁজির যোগান প্রাপ্তির জন্য বেসরকারী মহলকে আরও বেশী করে কাজে লাগানোর প্রয়োজন হবে। বৈদেশিক পুঁজি প্রাপ্তির সূত্রগুলির জন্য মৌলিক শর্তাদি ইতিমধ্যেই নির্ধারণ করা হয়েছে। রপ্তানীতে উৎসাহ, উদার আমদানী, পুঁজি প্রত্যাবাসন সুযোগ-সুবিধে এবং রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যবস্থা বাংলাদেশ বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে সহায়ক হবে।

পরিকল্পনার অর্থ সংস্থান :

৩.৫ পরিকল্পনায় এই মৌলিক সীমাবদ্ধতার কথাটি স্বীকৃতি যে বর্তমান নিম্নস্তরের আয় থেকে এমন পর্যাপ্ত আভ্যন্তরীণ সম্পদ সৃষ্টি করা যাবে না যাতে জীবন যাত্রার বস্তুবাদী ভিত্তির তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতি এবং দারিদ্রের বেড়াজাল ভাংগা সম্ভব হয়। এ জন্যে গোটা দ্বিতীয় পরিকল্পনা মেয়াদে বহিঃসম্পদের উপর নির্ভরশীলতা একটা যুক্তিসংগত অর্থনীতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের আবশ্যকীয় শর্ত হয়ে থাকবে। পরিকল্পনায় গোটা ব্যয় প্রস্তাবের ৭,০৯১ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য (গীট) আকারে পাওয়া যাবে বলে আশা করা হয়েছে। ১৯৭৫/৭৬ এবং ১৯৭৯/৮০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে (১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে) মোট ৬,৭৩৮ কোটি টাকা পাওয়া যায়। সবচেয়ে কম উন্নত দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম দেশমাত্র শুধু নয়। এ দেশে দারিদ্র, নিরক্ষরতা, অপুষ্টি ও বেকারত্ব ক্রমেই বাড়ছে। আর দেশটি মাথা পিছু হারে যে বহিঃ দেশীয় সহায়তা পায় তাও খুবই সামান্য। এই অবস্থায় বাংলাদেশ অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই বহিঃ সাহায্যের অন্তপ্রবাহের ক্ষেত্রে একটা লক্ষণীয় বৃদ্ধির জন্য দাবী জানাতে পারে। সম্প্রতিকালে উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা ও সাধারণ প্রশাসনের উন্নতি হওয়ায় কার্যকরভাবে আরও বেশীমাত্রার সহায়তা কাজে লাগানোর ব্যাপারে বাংলাদেশের সামর্থ বেড়েছে। বিগত কয়েক বছরে অর্থ নীতিতে প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে গতিসঞ্চার ঘটেছে তা অক্ষুন্নরাখার জন্য বর্ধিত সাহায্য দরকার হয়ে পড়েছে।

৩.৬ পরিকল্পনায় স্বীকার করা হয়েছে যে, বহিঃ সাহায্য জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্থায়ী ভিত্তি হতে পারে না। তবে দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির আবশ্যকীয় পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন উৎপাদনশীল খাতে পুঁজি বিনিয়োগ বৃদ্ধির স্বার্থে বহির্বৈশীয় সহায়তা প্রয়োজন। অভ্যন্তরীণ ও বহিঃসম্পদজনিত সমস্যাবলী কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে উৎপাদন বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ফলপ্রসূ বিনিয়োগের উপর এই পরিকল্পনাতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে এবং বাড়তি উৎপাদনের একটা ন্যায়সঙ্গত অংশ খাতে পুনঃবিনিয়োগের জন্য পাওয়া সম্ভব হয় সেজন্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশে আরও বেশী প্রয়াসের উপর জোর দেয়া হয়েছে। বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যে ঘাটতির উপর ও এই পরিকল্পনায় বিশেষ মনোনিবেশ করা হয়েছে। রপ্তানী প্রসার ও আমদানী প্রণ্যের বিকল্প বিশেষ করে খাদ্য শস্য আমদানীর বিকল্প ব্যবস্থার জন্য আরও বড় রকমের উদ্যোগ নিয়ে বৈদেশিক লেনদেনের ঘাটতি সমাধানের চেষ্টা করা হবে।

৩.৭ সরকারী ও বেসরকারী খাতে ২,৫০০ কোটি টাকার অবিনিয়োগ ব্যয় সহ মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদের চাহিদা ৮,১৩২ কোটি টাকার মত হবে বলে হিসেব করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, পরিকল্পিত উন্নয়ন বরাদ্দ ছাড়াও কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, খাদ্য শস্য ও অন্যান্য মজুত এবং সরকারী সংস্থাগুলির শেয়ার মূলধন অর্থবিনিয়োগ করা হবে। আকস্মিকতার অনিবার্যতার কারণে দেশে মোট খাদ্য শস্যের উৎপাদন দারুনভাবে ওঠা নামা করে। এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ১৯৮৪/৮৫ সাল নাগাদ অন্ততপক্ষে ১৫ লাখ টন খাদ্য শস্যের একটা সরকারী মজুত গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, খাদ্য শস্য ও অন্যান্য মজুত ইত্যাদিতে পরিকল্পনা বহির্ভূত মোট ১,৮৭৯ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে বলে ধার্য্য করা হয়েছে। এর মধ্যে সরকারী সংস্থাসমূহের ৩৩২ কোটি টাকার শেয়ার মূলধন রয়েছে। পরিকল্পনা মেয়াদে মোট বিনিয়োগ হচ্ছে ১৬,৫৭৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৫,৬৬৮ কোটি টাকা অভ্যন্তরীন সঞ্চয়ের আকারে। সারনী ৩.১এ এই সম্পদের একটা চিত্র দেওয়া হয়েছে।

সারণী ৩.১

উন্নয়ন বরাদ্দ (পরিকল্পনাধীন ও পরিকল্পনা বহির্ভূত) এবং এর অর্থ সংস্থান

[কোটি টাকায়]

বর্ণনা	ভিত্তি বছর (১৯৭৯-৮০)	পরিকল্পনা মেয়াদ। (১৯৮০-৮৫)	প্রান্তিক বছর (১৯৮৪/৮৫)
১। পরিকল্পনা বরাদ্দ	২,৭১৭	১৭,২০০	৪,২৯৫
২। পরিকল্পনা বহির্ভূত বরাদ্দ	৬২৭	১,৮৭৯	২৮০
৩। মোট উন্নয়ন বরাদ্দ	৩,৩৪৪	১৯,০৭৯	৪,৫৭৫
৪। (ক) বহিঃসম্পদ	২,৫৪৪	১০,৯৪৭	২,১৬৫
(খ) বৈদেশিক সহায়তা (নীট)	১,৭৯২	৭,০৯১	১,২২৫
৫। অভ্যন্তরীন সম্পদের চাহিদা	৮০০	৮,১৩২	২,৪১১
৬। সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (১৯৭৯-৮০ সালের বাজার দরে।	১৮,২০৬		২৪,২১০
৭। (ক) উন্নয়ন বরাদ্দ সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতকরা হিসাবে)।	১৮৪	..	১৮.৯
(খ) পরিকল্পনা বরাদ্দ সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতকরা হিসাবে)।	১৪.৯	..	১৭.৭
৮। (ক) বিনিয়োগ	২,৮৯৬	১৬,৫৭৯	৩,৯৫৫
(খ) বিনিয়োগ সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতকরা হিসাবে।	১৫.৯	..	১৬.৩
৯। (ক) অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	৭৮৯	৫,৬৬৮	১,৭৯০
(খ) অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতকরা হিসাবে।	৪.৩	..	৭.৪
১০। (ক) জাতীয় সঞ্চয় [1]	১,১৯৬	৯,২৭৯	২,৭০৬
(খ) জাতীয় সঞ্চয় সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতকরা হিসাবে।	৬.৬	..	১১.২
১১। প্রান্তিক সঞ্চয় হার (অভ্যন্তরীণ)	..	১৪.৭	..
১২। ব্যয় সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদন অনুপাত ..	৭.৯	..	৯.৫
১৩। বিদেশী সহায়তা (নীট) সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতকরা হিসাবে।	৯.৮	..	৫.১

টীকা:(১) পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয় ১৯৮৪/৮৫ সালে ১৯৭৯/৮০ সালের চেয়ে কমে গেছে। কারণ ১৯৭৯/৮০ সালে বিপুল পরিমাণ খাদ্য শস্যের মজুত ও সেই সংগে বড় আকারের কাজের বিনিময়ে খাদ্য কার্যক্রম ও ছিল।

(২) ১৯৭৯/৮০ মেয়াদের জাতীয় সঞ্চয় (১০খ) এবং বিদেশী সহায়তা (১৩) সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতকরা হিসাবে বিনিয়োগ অনুপাতের (৮.খ) সমান হয় না। কারণ সঞ্চয় রিজার্ভ থেকে অতিরিক্ত অর্থ তোলা হয়ে যায়। যাহা প্রকৃত পক্ষে সঞ্চয় নয় বরং অন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল থেকে প্রাপ্ত সম্পদ।

(৩) ১৯৭৯/৮০ মেয়াদে ব্যয়বন্টনের ভিত্তিতে মোট বিদেশী সহায়তর পরিমাণ ছিল ১৮৯৬ কোটি টাকা। ১৯৮০/৮১ ও ১৯৮৪/৮৫ মেয়াদে এই পরিমাণ যথাক্রমে ৯৪৪৫ কোটি টাকাও ২০৪৯ কোটি টাকা। এগুলি পরিকল্পনা ব্যয়ের যথাক্রমে ৬৯.৮%, ৫৪.৯% ও ৪৭.৭%।

৩.৮ অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয় স্তর নিশ্চিত করতে হলে ১৯৭৯/৮০ সালের জন্য স্থিরকৃত সঞ্চয় শতকরা ৪.৩ ভাগের তুলনায় ১৯৮৪/৮৫ সালে গড়ে সঞ্চয় হার শতকরা ৭.৪ ভাগ এবং গোটা পরিকল্পনা মেয়াদে প্রান্তিক সঞ্চয় হার শতকরা ১৪.৭ ভাগ হওয়া দরকার। শতকরা ৭.৪ ভাগ হারে সঞ্চয় হার অর্জন খুব কঠিন নয়, কারণ, (১) ১৯৭৯/৮০ সালে ফসল ভাল না হওয়ায় সঞ্চয় হার স্বাভাবিক হারের চেয়েও নীচে নেমে যায়' এবং (২) পরিকল্পনা মেয়াদে প্রবাসী কর্মজীবী নাগরিকেরা দেশে অনেক বেশী পরিমাণে অর্থ পাঠাবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। এতে, অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বাড়বে। তবু, সঞ্চয় কার্যকরভাবে বিনিয়োগ রূপান্তরের জন্যে মূলধন—পণ্য ও আর্থিক সম্পদের সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ নিয়ে চতুর্থ অধ্যায়ে এ বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।

৩.৯ প্রয়োজনীয় সঞ্চয়ের হার ভোগ বা ব্যবহারের ওপর অযথা চাপ সৃষ্টি করবে না। ভোগ তথ্যভিত্তিক বার্ষিক শতকরা ৫.০ ভাগ হারে বাড়বে বলে হিসেব করা হয়েছে। এই প্রবৃদ্ধি হার, জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারের প্রায় দ্বিগুণ এবং অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বার্ষিক শতকরা ৫.৪ প্রবৃদ্ধির হারের চেয়ে কিছুটা কম। এর অর্থ পরিকল্পনাকালে বাড়তি আয়ের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী ভোগের জন্যে পাওয়া যাবে। ফলে পরিকল্পনার মৌলিক চাহিদার লক্ষ্য বাস্তবায়িত করা যাবে। পরিকল্পনার উৎপাদন কার্যক্রমে খাদ্য, বস্ত্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যামূলক ব্যবস্থাদি, প্রাথমিক শিক্ষার মত মৌলিক চাহিদার পণ্য ও সেবাসুবিধে সৃষ্টির ব্যাপারে জোর দেয়া হয়েছে। এর ফলে জনগণের মৌলিক চাহিদা মিটবে এবং তাদের জীবন-যাত্রার মান উন্নত হবে। প্রয়োজনীয় পণ্যাদির সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষ নিজের কেনার সামর্থ্যের মধ্যে সেগুলি সংগ্রহ করতে পারে সেজন্য একটি স্থিতিশীল মূল্যনীতি অনুসৃত হওয়াও প্রয়োজন। এজন্য উৎপাদনশীল কার্যকর্মের সুযোগ সৃষ্টি করে কর্মসংস্থানের পরিসর ও আয়বৃদ্ধির উপর এই পরিকল্পনায় বিশেষ মনোনিবেশ করা হবে।

উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা :

৩.১০ গোটা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও প্রয়োজনীয়তা বহিঃসাহায্য প্রাপ্তির নিশ্চিত করার জন্য দেশের বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় খাতের ব্যবস্থাপনা সামর্থ্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এই সমস্ত সীমাবদ্ধতা জেনে সরকার ইতিমধ্যেই বেসরকারী খাতের প্রতি স্বীয় নীতি উদার করেছেন। উদ্দেশ্য: বেশির উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনামূলক সম্ভাবনা তথা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের সর্বোচ্চ প্রয়োগ নিশ্চিত করা। এই পরিকল্পনায় সরকারী খাতের ব্যবস্থাপনার সমস্যাদি বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে এবং ঐ খাতের ব্যবস্থাপনার ও বাস্তবায়নের সামর্থ্যের উন্নয়ন সাধনের উপায় ও পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ব্যবস্থাপনা দক্ষতার তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতিও হয়েছে। তবে আত্মতুষ্টির কোনই কারণ নেই। এ প্রবণতা অক্ষুন্ন রাখা আবশ্যক। উপযুক্ত নীতি ও কর্মকৌশলের মাধ্যমে বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অত্যন্ত উচুমানের পেশাদারী দক্ষতার ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হবে। পল্লী উন্নয়ন ও জনগণের অংশীদারত্বের প্রতি বর্তমানে বিশেষ জোর দেয়া হচ্ছে। এ কারণে প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন। স্থানীয় প্রতি-ষ্ঠানগুলির উন্নয়ন সাধন করা হলে উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোর কারিগরী প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্বার্থে নতুন প্রতিষ্ঠানিক পরিবেশের চাহিদা ও দেখা দেবে। উন্নয়ন প্রসার প্রক্রিয়ার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে কার্যকরভাবে সাড়া দিতে হবে। প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ সে লক্ষ্যেই একটা পদক্ষেপ। সাথে সাথে স্থানীয় সরকারগুলিকে জোরদার করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য, জাতীয় সরকারের দায়িত্বকে খাটো করা নয় বরং স্থানীয় প্রশাসন ও প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা যাতে সরকারী নীতি ও কার্যক্রমে জনগণের আশা-আকাংখা প্রতিফলিত হতে পারে। যদিও পরিকল্পনার আকার বিনিয়োগের খুব একটা বৃদ্ধি বুঝায় না, তবু উন্নয়ন প্রক্রিয়া প্রসারের ফলশ্রুতিতে ব্যবস্থাপনা সামর্থ্যের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়বে। বেশী করে বরাদ্দ পাওয়ার কল্যাণে বেসরকারী খাতের ক্রমবর্ধমান অংশ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার উন্নতি হবে। তবে উন্নয়ন প্রক্রিয়া প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সরকারী খাতের কর্তব্য হবে মনিটারিং ও নীতি পরিকল্পনার ব্যাপারে আরও বেশী করে গুরুত্ব আরোপ করা যাতে সরকারী উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ও উদ্দেশ্যগুলির বাস্তবায়ন নিশ্চিত হয়।

খাতওয়ারী বরাদ্দ :

৩.১১ শিল্প জাতীয় অগ্রাধিকারের আলোকে খাতওয়ারী বরাদ্দ স্থির করা হয়েছে এবং সেটা করা হয়েছে আন্তঃশিল্প প্রসঙ্গের উৎপাদনগত একটা বহুখাত মডেল এবং বিনিয়োগ উৎপাদন সম্পর্কে একটা বিস্তৃত কাঠামোর মধ্যে জাতীয় অগ্রাধিকার অনুক্রম অনুসারে। খাদ্য, বস্ত্র ও প্রাথমিক শিক্ষার মত কিছু চূড়ান্ত আবশ্যকীয় পণ্য ও সেবা সুবিধাগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অর্জনের প্রয়াস সামাজিক পর্যায়ে ইপ্সিত লক্ষ্য বলে নির্ধারিত সেগুলি এবং ধোক প্রকৃতির কিছু বিনিয়োগ ছাড়া উৎপাদন ও বিনিয়োগ উল্লিখিত মডেলের মাধ্যমেই সেই সুনির্দিষ্ট অভ্যন্তরীণ ক্রমবৃদ্ধির ধারায় নির্ধারিত হয়। খাদ্য ও বস্ত্রের মত আবশ্যকীয় চাহিদা এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মত সামাজিক সামগ্রী ক্ষেত্রে আয়, মূল্য ও বিতরণ নীতির সম্ভাব্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য সেগুলির নানাদিক নির্ণয় করা হয়। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পল্লী বিদ্যুতায়ন, প্রাথমিক শিক্ষা, সিমেন্ট, সার প্রভৃতির জন্য ছাড়া বাকি সকল বিনিয়োগের পরিমাণ চূড়ান্ত সামগ্রীসমূহের একটা হিসাবকৃত চাহিদার ভিত্তিতে এ মডেলের আওতায় মধ্যেই নির্ধারণ করা হয়। মডেলের মাধ্যমে নির্দ্ধারিত বিনিয়োগ প্রথমে সরকারী ও বেসরকারী খাতে এবং তারপর সরকারীখাতের সংস্থা সমূহের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পুনর্বণ্টন করা হয়। সরকারী খাতের বরাদ্দ নির্ণয় করার জন্য সার ও অন্যান্য উৎপাদন ভর্তুকি, জমির দাম ইত্যাদির মত অ-বিনিয়োগ ব্যয় সরকারী খাতের বিনিয়োগ কার্যক্রমে যোগ করা হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অ-বিনিয়োগ ব্যয়গুলি জাতীয় দৃষ্টিকোন থেকে অন্য খাতে স্থানান্তর অর্থাৎ ভর্তুকী ও জমি ক্রয় অথবা আবর্তক ধরনের ব্যয় অর্থাৎ উনুয়ন নিযুক্ত ও গবেষকদের বেতন, তবে এগুলিকে প্রচলিত বাজেট ব্যবস্থার রীতি অনুযায়ী উনুয়ন ব্যয় বলে ধরা হয়। ৩.২ সারণীতে ১৭,২০০ কোটি টাকার খাতওয়ারী বরাদ্দ এবং ৩.৩ সারণীতে সরকারী খাতে বিশদ বরাদ্দ দেখানো হয়েছে।

সারণী ৩.২

খাতওয়ারী বরাদ্দ

(১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে)

[কোটি টাকায়]

	খাত	সরকারী	বেসরকারী	মোট
১।	কৃষি, পানি ও পল্লী উন্নয়ন	৩,৮০২	২,২৫৭	৬,০৫৯
২।	শিল্প ও খনিজ	১,৩৯০	১,৭৬৯	৩,১৫৯
৩।	বিদ্যুৎ ও শক্তি	২,০৫২	..	২,০৫২
৪।	পরিবহন ও যোগাযোগ	১,৫২৪	৯৭৬	২,৫০০
৫।	ভৌত পরিকল্পনা ও গৃহায়ণ	৫৭৪	১,০৯৮	১,৬৭২
৬।	আর্থ-সামাজিক খাতসমূহ	১,৭৫৮	..	১,৭৫৮
	মোট	১১,১০০	৬,১০০	১৭,২০০

সারণী ৩.৩

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারী খাতে খাতওয়ারী বরাদ্দ

[কোটি টাকায়]

	খাত সমূহ	মূল বরাদ্দ (১৯৭৯/৮০) সালের মূল্যে)		সংশোধিত বরাদ্দ (১৯৭৯/৮০) সালের মূল্যে)		সংশোধিত বরাদ্দ (চলতি মূল্যে)।
		টাকা	শতকরা হার	পরিমাণ টাকা	শতকরা হার	টাকা
১।	কৃষি ও সংশ্লিষ্ট তৎপরতা	৬,৫০০	৩২.৩	৩,৮০২	৩৪.৩	৫,৫৫২
	(ক) কৃষি	২,৭০০	১৩.৪	১,৪৭০	১৩.৩	২,১৪৯
	(খ) পানি সম্পদ	৩,০০০	১৪.৯	১,৮৫০	১৬.৭	২,৭০২
	(গ) পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান(উন্নয়ন বোর্ডসহ)	৮০০	৪.০	৪৮২	৪.৩	৭০১
২।	শিল্প ও খনিজ	৩,২৭৫	১৬.৩	১,৩৯০	১২.৫	২,০৪২
৩।	শক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদ	২,৭৬০	১৩.৭	২,০৫২	১৮.৫	৩,০২১
	(ক) বিদ্যুৎ	২,০০০	৯.৯	১,৪৩৭	১২.৯	২,১৩০
	(খ) প্রাকৃতিক সম্পদ	৬০	৩.৮	৬১৫	৫.৫	৮৯১
৪।	পরিবহণ ও যোগাযোগ	৩,২৩৯	১৬.১	১,৫২৪	১৩.৭	২,১৬০
	(ক) পরিবহন	২,৬৩৫	১৩.১	১,২৮৭	১১.৬	১,৮১৯
	(খ) যোগাযোগ	৬০৪	৩.০	২৩৭	২.১	৩৪১
৫।	ভৌত পরিকল্পনা ও গৃহায়ণ	১,২২০	৬.০	৫৭৪	৫.২	৮২০
৬।	শিক্ষা, ধর্মীয় বিষয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত গবেষণা	১,০৭৫	৫.৪	৫,৭২	৫.২	৮৩৬
	(ক) শিক্ষা	৯০৫	৪.৫	৪৭০	৪.৩	৬৯২
	(খ) ধর্মীয় বিষয়	১৫	০.১	১০	০.১	১৫
	(গ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত গবেষণা ..	১৫৫	০.৮	৯২	০.৮	১২৯
৭।	স্বাস্থ্য	৫৯৫	৩.০	২৮৮	২.৬	৪১৩
৮।	জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা ..	৬১৫	৩.০	৩১০	২.৮	৩৬৮
৯।	আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো	৬০১	৩.০	২০২	১.৮	২৮০
	(ক) সমাজ কল্যাণ	৮৫	০.৪	৪১	০.৪	৫৯
	(খ) মহিলা বিষয়	৮৯	০.৪	২২	০.২	৩১
	(গ) যুব উন্নয়ন	১০১	০.৫	১৯	০.২	২৬
	(ঘ) ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	১৫	০.৫	৪৩	০.৪	৬০
	(ঙ) গণ যোগাযোগ মাধ্যম	২৩১	১.২	৭৭	০.৭	১০৪
১০।	জনশক্তি ও শ্রম	১৮৫	০.৯	৬১	০.৫	৮৮
১১।	লোক প্রশাসন	৬০	০.৩	৩৮	০.৩	৫৫
১২।	খানা উন্নয়ন	..	..	২৮৭	২.৬	৪২৫
	মোট ..	২০,১২৫	১০০.০	১১,১০০	১০০.০	১৬,০৬০

৩.১২ খাতওয়ারী বরাদ্দের মৌলিক চাহিদাসমূহের সরবরাহ, কর্মসংস্থান এবং সম্পদ সমাবেশের ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাবশীল খন্ডগুলিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কৃষি, পানি ও পল্লী উন্নয়ন উল্লেখিত শর্তগুলি পূরণ করে বলে সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে এগুলি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পেয়েছে। সরকারী খাতে মোট বরাদ্দের শতকরা ৩৪ ভাগ কৃষি, পানি ও পল্লী উন্নয়ন খাতে দেয়া হয়েছে। দারিদ্র, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা ও অপুষ্টি পল্লী এলাকাতেই সর্বব্যাপি ও সবচেয়ে প্রকট। পল্লী উন্নয়নের জন্য তাই খাতওয়ারী বরাদ্দের চেয়ে বড় আকারের প্রয়াস প্রয়োজন। পল্লী উন্নয়নের সামগ্রিক প্রয়াসের অংশ হিসেবে পরিকল্পনায় পল্লী এলাকাগুলির মৌলিক আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যাতে গ্রামীণ মানুষ আরও বেশী করে সম্পদ ও কর্মসংস্থানের সুবিধে নিয়ে পরিকল্পিত উন্নয়নের ন্যায্য অংশীদার হতে পারে। এভাবে মৌলিক চাহিদা মেটানো ও কর্মসংস্থানে ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, গ্রামের সড়ক, পল্লী বিদ্যুৎতায়ন ও পল্লী স্বাস্থ্য সুবিধের প্রতি পরিকল্পনার আওতায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

৩.১৩ অবশ্য সকল পরিকল্পনাই বিভিন্ন মুখীউদ্দেশ্যের আপোষ বিশেষ। অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও বহিঃ-সম্পদের বিষম অবস্থাজনিত যে সমস্যা রয়েছে তার সঙ্গে পরিকল্পনার একান্ত একাত্মতা থাকতে হবে এবং এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে যে নানা সামাজিক রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা ও সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিনিয়োগ ও উৎপাদন এমনভাবে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে যাতে ভোগ ও কর্মসংস্থানের বড়রকম কোন ব্যাঘাত না ঘটিয়ে একটা যুক্তিসঙ্গত মেয়াদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ ও বহিঃ সম্পদের বিষম অবস্থার সামঞ্জস্য বিধানের মত অর্থনীতি গড়ে ওঠে। বাংলাদেশ ও আরও অনেক দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে যুগপৎ ঐ সামঞ্জস্য বিধানের প্রক্রিয়াটি সফল হয়েছে। এ কারণেই, নিরবচ্ছিন্ন উন্নতির চূড়ান্ত অভীষ্ট সাধনের লক্ষ্যে খাতওয়ারী বন্টনে ঐসব খাতকে কেন্দ্র করেই করা হয়েছে যে খাতগুলি সম্ভাবনার দিক থেকে জাতীয় স্বার্থের বেশী পরিপূরক। কৃষি খাতের পর শক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদ খাতটি উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যদিও বাংলাদেশ বার্ষিক মাথাপিছু মাত্র ৩২ কিলোগ্রাম তেলের সমপরিমাণ বাণিজ্যিক জ্বালানী শক্তির ব্যবহার করে থাকে; তবু তার রপ্তানী আয়ের শতকরা ৫৮ ভাগই ব্যয় হয় তেল আমদানী খাতে। বাংলাদেশে যে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাস আছে বিকল্প জ্বালানী শক্তি হিসেবে তার উন্নয়ন সাধন করা যায়। এ কারণে সরকারী খাতের মোট বরাদ্দের শতকরা ১৮.৫ ভাগ শক্তি খাতে দেয়া হয়েছে।

৩.১৪ নতুন শিল্পনীতিতে পাট ও কাপড়ের কলগুলি বেসরকারী খাতে স্থানান্তরের পরিকল্পনা রয়েছে। এই শিল্পনীতির সঙ্গে সংগতি রেখে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলির জন্য বরাদ্দের পরিমাণ খসড়া পরিকল্পনার শতকরা ১৬.৩ ভাগ থেকে কমিয়ে শতকরা ১২.৫ ভাগ করা হয়েছে। আর একই সঙ্গে বেসরকারী খাতে বিনিয়োগের সম্প্রসারিত সুযোগের চাহিদা মেটানোর জন্যে বেসরকারী খাতের বরাদ্দ খসড়া পরিকল্পনার ১,১১০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে এখন ১,৭৬৯ কোটি টাকা করা হয়েছে। বেসরকারী ও সরকারী খাত মিলিয়ে শিল্পখাতে মোট ১৭,২০০ কোটি টাকা পরিকল্পনার শতকরা ১৮.৪ ভাগ বরাদ্দ করা হয়েছে।

৩.১৫ আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন খাতগুলির মধ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা এবং সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে উচ্চ অগ্রাধিকারযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়; কারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই দুটি খাত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী। খাত দু'টি পরস্পর বিরোধী দুটি কারণে অতীতে ব্যাহত হয়েছে। প্রথমতঃ প্রতিষ্ঠানিক দুর্বলতার কারণে পরিবার পরিকল্পনার সাধারণ্যে গ্রহণযোগ্যতার অভাব ছিল আর দ্বিতীয়তঃ, অপর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দের কারণে প্রাথমিক শিক্ষার বিকাশ ব্যাহত হয়েছে। এই উভয় খাতেই পর্যাপ্ত বরাদ্দের ব্যবস্থা করে বরাদ্দের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্যে পরিবার পরিকল্পনার সংগঠন শক্তিশালী করার এবং অর্থের লাভজনক সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সুবিধার লক্ষ ব্যবহারের ওপর পরিকল্পনায় জোর দেওয়া হয়েছে। এ কার্যক্রমগুলির কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য উভয়-ক্ষেত্রেই গোষ্ঠি অংশাদারী জোরদার করা হবে।

৩.১৬ পরিকল্পনার অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী খাতওয়ারী বরাদ্দ বিভিন্ন ভাগে ধার্য করা হলেও খাতওয়ারী বিনিয়োগ কার্যক্রম প্রণয়নের ওপরই ফলাফল নির্ভর করবে। এই ব্যাষ্টি (Micro) পর্যায়ের পরিকল্পনায় প্রকল্পসমূহের একটি তালিকা বাছাইয়ের মাধ্যমে তৈরী করা এবং সঠিক বিবেচনাগুলির প্রয়োগ করাই হবে পরিকল্পিত অভীষ্ট অর্জনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে প্রকল্পই প্রণয়ন করা হোক তার ফল লাভ হতে হবে জরুরী। পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার সম্প্রসারণ হিসেবে এক-এক বিবেচনার ভিত্তিতে বাছাই এড়াবার জন্য পরিকল্পনার আওতায় বিভিন্ন পরিকল্পনার একটা তালিকা থাকতে হবে। দ্বিতীয় উল্লেখ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, সরকারী খাতে চূড়ান্ত সম্পদ বরাদ্দ হতে হবে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে। এ ব্যাপারে বর্তমানে যে ব্যবস্থা প্রচলিত তাতে অনেক কাঙ্ক্ষিত রদবদলের অবকাশ আছে। বর্তমানে বাজেট বিবরণী খুবই সহজ। এ কারণে শুধুমাত্র এক খাতের অন্তর্গত প্রকল্পগুলির মধ্যে নয় বরং বিভিন্ন খাতের মধ্যেও সীমিত সম্পদের সুষম বরাদ্দ বন্টন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঐ বাজেট বিবরণীকে কার্যক্রম প্রণয়নের হাতিয়ারে পরিণত করা প্রয়োজন। এ কথা অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা দরকার যে, পরিকল্পনা মেয়াদে পাওয়া যাবে এমন নির্ধারিত সম্পদের ভিত্তিতে ৩.২ সারণীতে আন্তঃ খাত বরাদ্দগুলি দেখানো হয়েছে। এর উদ্দেশ্য পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা ও উদ্দেশ্য অর্জনখাত থেকে খাতে প্রয়োগ কৌশলগত পরিস্থিতির কারণে বিভিন্ন হতে পারে আর সে কারণে ফললাভে কাল বিলম্বগত তারতম্য দেখা দিতে পারে বলেই যদি হিসাবকৃত সম্পদের পরিস্থিতি ভিন্ন হয় তাহলে সেটা অবশ্যই দৃষ্টিভঙ্গি যেমন দেখলে চলবে না তেমনি বছর বছর সমানুপাতিক বরাদ্দের কড়াকড়ি নিয়ম মাফিক অনুসরণও করা যাবে না। বিভিন্ন খাতে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থাও বিভিন্ন হতে পারে। আর তাই বার্ষিক পরিকল্পনা বরাদ্দ সর্বাধিক সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যানুসারী বার্ষিক বরাদ্দ বিভিন্ন খাতে সমানুপাতিক না হয়ে বিভিন্ন হতে পারে।

৩.১৭ বেসরকারী খাতে আন্তঃখাত বরাদ্দ করা হয় অংশতঃ বেসরকারী বিনিয়োগের অতীত গতি প্রকৃতি থেকে, আর সেটা হয় বিভিন্ন অর্থ সংস্থানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রচণ্ড প্রভাবে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি ইচ্ছাকৃতভাবেই বিশেষ করে কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলির মত অসংগঠিত খাতগুলির প্রতি বৈরী। এ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয় যে, বেসরকারী বিনিয়োগের স্তর এবং বিভিন্ন খাতে এই বিনিয়োগের বন্টন একটা ব্যাপক পরিসরের দিক নির্দেশনা মাত্র। আর এর বাস্তবায়ন শুধুমাত্র, সরকার কর্তৃক একটা সংগতি সম্পন্ন রাজস্ব ও ব্যয়বরা গ্রহণের ওপর নয় বরং বেসরকারী বিনিয়োগকারীদের মেজাজ মর্জির ওপর নির্ভর করে। রাজস্ব ও মুদ্রা ব্যবস্থা অবশ্য নিঃসন্দেহেই ইপ্সিত লক্ষ্যে বিনিয়োগকে প্রভাবিত করার ব্যাপারে শক্তিশালী হাতিয়ার।

সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, প্রবৃদ্ধি ও ভোগ

৩.১৮ পরিকল্পনায় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৫.৪ ভাগ, নির্ধারণ করা হয়েছে। ৩.৪ সারণীতে গোটা পরিকল্পনা মেয়াদে সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও অর্থনীতির প্রধান প্রধান খাতওয়ারী বন্টন অনুপাতে দেখানো হয়েছে।

সারণী ৩·৪

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি ও গঠন

(১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে)

[কোটি টাকায়]

খাত	যোজিত মূল্য (Value Added)		বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার(%)		
	১৯৭৯/৮০ (প্রকৃত)	১৯৮৪/৮৫ (লক্ষ্যমাত্রা)	১৯৮০—৮৫ (মেয়াদে)	১৯৮০—৮২ (মেয়াদে)	১৯৮২/৮৩
১। কৃষি: ..	৮,৯১৯·১	১১,৪১৮·৫	৫·০	৩·২	৫·১
(ক) খাদ্য শস্য ..	৪,৯৩১·০	৬,২৭৮·৫	৪·৯	৩·৭	৫·১
(খ) অন্যান্য কৃষি ..	৩,৯৮৭.৮	৫,১৪০·০	৫·২	২.৪	৫·১
২। শিল্পোৎপাদন ..	১,৪২১.৬	২,১২৪.৪	৮.৪	৫.৮	০·৮
৩। নির্মাণ	৯২৮.৯	১,১৭৪.৯	৪.৮	১.৫	(—)৪.৬
৪। বিদ্যুৎ ও গ্যাস ..	৩৬.৯	৭৭.৬	১৬.০	১৪.০	১৭.০
৫। গৃহায়ণ	১,১৪৬.৪	১,৩২৯.০	৩.০	৩.০	৩.০
৬। পরিবহণ	১,১২৭.৯	১,৪৮৬.৬	৫.৭	২.০	২.০
৭। বাণিজ্য	১,২৬৫.৯	১,৬৭০.২	৫.৭	২.০	২.০
৮। অন্যান্য সার্ভিস ..	২,৪৩২.৩	৩,১৯০.৮	৫.৭	৫.৪	৫.৭
(ক) সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (উৎপাদিক মূল্যে)	১৭,২৭৯.০	২২,৪৭২.০	৫.৪	৩.৫	৩.৮
(খ) সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (বাজার মূল্যে)	১৮,২০৬.০	২৪,২১০.০	৫.৮	৩.৭	৪.০
(গ) জনসংখ্যা (বিলিয়নে)	৮৭.২৩	৯৮.০৫	২.৪	২.৬	২.৪
(ঘ) মাথাপিছু আয় অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (টাকায়)	২,০৮৭	২,৪৬৯	৩.৫	০.৮	১.৩

সার্বিক ও খাত প্রবৃদ্ধি

৩.১৯ সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য সম্প্রতিক অতীতের বিনিয়োগও পরিকল্পিত বিনিয়োগের ভিত্তিতে স্থির করা হয়েছে। ১৯৭০-এর দশকের শেষার্ধে দেশের অর্থনীতিতে বেশ কয়েকটি ইতিবাচক ফল পাওয়া গেছে। আশা করা যায় অর্থনীতির ব্যবস্থাপনার কল্যাণে বেসরকারী খাতের ভূমিকা প্রসারিত হবে এবং সরকারী খাতে, বিশেষ করে, শিল্পখাতে চাপ কমে যাবে। প্রাতিষ্ঠানিক পুর্ণবিন্যাস ও নীতি পরিবেশের উন্নতির ফলে ১৯৭০-এর শেষের দিকের বছরগুলির চেয়েও ততর বার্ষিক হারে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি সাধিত হবে। উল্লিখিত দ্রুততর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হার অর্থনীতিকে দ্রুততার বর্তমান সমস্যাবলীর গোলক ধাঁধা থেকে উদ্ধার করা এবং তাতে পুনঃবেলসঞ্চার করার জন্য প্রয়োজন। যে দেশে শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে অস্তিত্ব রক্ষা করে এবং বার্ষিক আয় মাথাপিছু বছরে ২,০৮৭ টাকা, সে দেশে আয় পুনর্বন্টনের মাধ্যমে দারিদ্র্য সমস্যার মোকাবিলার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। কাজেই সম্পদের প্রকট সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে হলেও দারিদ্র হ্রাস ও আয় বন্টনের উন্নতির লক্ষ্যে অর্থনীতির দ্রুত প্রবৃদ্ধির দিকে নজর দেয়া ছাড়া বিকল্প নেই। মাঝারি মেয়াদের পরিকল্পনা পরিসরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিষয়টিকে অবশ্য দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষিতে উন্নয়ন থেকে একেবারে আলাদা করে দেখাও সম্ভব নয়। উন্নয়ন একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। অবকাঠামো ও মূল শিল্পের উন্নয়নে উপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ ছাড়া ঐ প্রক্রিয়াকে অক্ষুন্ন রাখা যায় না। এ কারণে, পল্লী সংগঠনের উন্নয়ন, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা প্রণয়ন সামর্থের উন্নতি, দীর্ঘমেয়াদী পানি সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত ভিত্তি আরও গভীর করা এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রবৃদ্ধির জন্য মূল শিল্পগুলিকে সুসংহত করার কাজে এই পরিকল্পনার আওতায় সম্পদের বেশ একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়োজিত করতে হবে। ঐ সম্পদের স্বল্প মেয়াদী উৎপাদনশীল উদ্দেশ্যে ব্যবহার পরিকল্পনা মেয়াদ আরও বেশী প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হলেও তা করা যাবে না।

৩.২০ পরিকল্পনায় প্রধান গুরুত্ব দেয়া হবে খাদ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর যাতে পরিকল্পনা মেয়াদের শেষ নাগাদ খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্জন করা যায় অন্যান্য খাদ্যের চাহিদা ধরে নিলে কৃষিখাতে তুলনামূলকভাবে প্রবৃদ্ধি হার (৫.০%) বেশী হতে হবে। যোজিত মূল্য হিসেবে খাদ্যশস্যের উৎপাদন, বছরে শতকরা ৪.৯ ভাগ হারে বাড়লেও সার্বিক উৎপাদন অর্থে বার্ষিক বৃদ্ধির হার হবে শতকরা প্রায় ৫.৫ ভাগ। শিল্পোৎপাদন খাতে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৮.৪ ভাগ নির্ধারণ করা হয়েছে। এটা হবে প্রধানতঃ সার ও সুতীবস্ত্র উৎপাদনে অতীত বিনিয়োগের ফলে। তবে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী জোর দেয়া হবে উৎপাদন ক্ষমতাকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানোর উপর। বড় বড় বাজারে প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র উন্নয়নের ফলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলি উৎসাহিত হবে। ফলে শিল্পোৎপাদন দ্রুত বাড়বে। জ্বালানী তেল আমদানী খাতে ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য পল্লী বিদ্যুতায়নসহ বিদ্যুত ও গ্যাস খাতে পরিকল্পনায় অত্যন্ত উচ্চ অগ্রাধিকার দেয়ার ফলে শক্তিও গ্যাস খাতে দ্রুত প্রবৃদ্ধি সাধিত হবে (১৬%)।

সার্বিক অভ্যন্তরীন উৎপাদনের কাঠামো

৩.২১ কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশ বলে পরিকল্পনায় কৃষি খাতে জোর দেয়া হয়েছে। এই কারনে পরিকল্পনা মেয়াদে সার্বিক অভ্যন্তরীন উৎপাদন কাঠামোতে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন প্রত্যাশিত নয়। তবে অভ্যন্তরীন উৎপাদন কাঠামোর দীর্ঘ মেয়াদী পরিবর্তনের ভিত্তির এ খাত

শক্তিশালী হবে। সারণী ৩.৫ এ দ্বিতীয় পরিকল্পনা মেয়াদ শেষে সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে কাঠামো গত অবস্থা দেখানো হয়েছে:

সারণী ৩.৫

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের কাঠামো
(১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে)

[শতকরা হারে]

খাত	স্থিতিমাত্রা (১৯৭৯/৮০)	প্রান্তিকবর্ষ (১৯৮৪/৮৫)
১। কৃষি	৫১.৬২	৫০.৮১
২। শিল্প	৮.২৩	৯.৪৫
৩। নির্মাণ	৫.৩৮	৫.২৩
৪। বিদ্যুৎ ও গ্যাস	০.২১	০.৩৫
৫। গৃহায়ণ	৬.৬৩	৫.৯১
৬। পরিবহন, বাণিজ্য ও অন্যান্য সার্ভিস	২৭.৯৩	২৮.২৫

সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে কৃষির অবদান ১৯৭৯/৮০ সালে শতকরা ৫১.৬ ভাগ থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে শতকরা ৫০.৮ ভাগে ইষৎ হ্রাস পাবে। পক্ষান্তরে শিল্পের অবদান শতকরা ৮.২ ভাগ থেকে ৯.৫ ভাগ বৃদ্ধি পাবে। নির্মাণ ও গৃহায়ণ খাতের অবদান পণ্য আমদানীতে দারুন সমস্যার কারণে কমে যাবে। শিল্প উৎপাদন খাতেও অনুরূপ সমস্যা দেখা দেবে। তবে আমদানী করা কাঁচামালের সংকট সমস্যা সত্বেও ইউরিয়া, পাট দ্রব্য, কাগজ, চিনি, তামাক ইত্যাদি রপ্তানী শিল্পপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে এবং সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের একটা বড় অংশ দখল করবে। শক্তি ও গ্যাস খাতও সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে স্বীয় অংশ বৃদ্ধিতে সক্ষম হবে। অবশ্য এই খাতটি এ সত্বেও একটা ক্ষুদ্র খাতই রয়ে যাবে। ভৌত অবকাঠামো, শক্তি ও শিক্ষা এবং কিছু ভারী শিল্পে বিনিয়োগের ফলে দীর্ঘ মেয়াদে অর্থনীতির কাঠামোর উন্নতি হবে যদিও দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালের উৎপাদনের ওপর তার প্রভাব তেমন একটা দৃশ্য গোচর হয়ে উঠবে না।

উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা

৩.২২ খাতওয়ারী অধ্যায়ে বিভিন্ন খাতের কার্যক্রম, অভীষ্ট ও লক্ষ্য মাত্রা নিয়ে আলোচনা হবে। এখানে কার্যক্রমের কিছু বিশেষ দিক (সারণী ৩.৬) দেয়া হয়েছে। খাদ্য শস্যের উৎপাদন ১৯৭৯/৮০ সালের ১৩৪ লাখ টন থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ১৭৫ লাখ টন হবে বলে ধরা হয়েছে। এর ফলে, খাদ্যশস্য ব্যবহারের বর্তমান হারে দৈনিক মাথাপিছু ১৫.৮ আউন্স করে খাদ্য শস্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। আধুনিক প্রযুক্তির দ্রুত প্রসারের মাধ্যমে প্রকৃত উৎপাদনের প্রস্তাবিত সম্প্রসারণ সম্ভব হবে। খাদ্যের পরে মৌলিক আবশ্যকীয় পণ্য মণ্ডলের মধ্যে সুতিবস্ত্র সরবরাহ বৃদ্ধির উপরও জোর

দেয়া হয়েছে। যার ফলে ব্যবহারের জন্য গড়ে ১০ গজের মত কাপড় পাওয়া সম্ভব হবে। প্রধানতঃ হাতে চালিত তাঁতে প্রায় ৯৮ কোটি গজ কাপড় উৎপাদনের লক্ষ্য রয়েছে। পরিকল্পনাকালে অন্যান্য যেসব সামগ্রীর উৎপাদন বাড়ানো হবে সেগুলির মধ্যে মাছ, চিনি, চা ইত্যাদিও রয়েছে। মানুষের সরাসরি ভোগে লাগে না এমন সামগ্রী যেমন সার ও পাটদ্রব্যর উৎপাদনও দ্রুত বাড়বে। কৃষি উৎপাদন কার্যক্রমের সহায়তার জন্য সার (ইউরিয়া) উৎপাদন বেশ দ্রুত বাড়বে। পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে তুলনামূলক ভাবে আগের চেয়ে জোরদার বিপনন নীতি অনুসরণ করতে হবে। পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাথমিক পরিচর্যা, পরিবার পরিকল্পনা সরবরাহ ব্যবস্থার মত মৌলিক সার্ভিস এবং গ্রামের সড়ক ও পল্লী বিদ্যুতায়নের মত পল্লী অবকাঠামো দ্রুত সম্প্রসারণের ব্যবস্থা রয়েছে। ১৯৭৯/৮০ সালে ২,১৮১টি গ্রামে বিদ্যুত সরবরাহের তুলনায় ১৯৮৪/৮৫ সালে আনুমানিক ২৫,০০০ গ্রামে বিদ্যুৎ যাবে। এতে গ্রামের জীবনযাত্রার মানই শুধু উন্নত হবে তাই নয় বরং এটি খাদ্য শস্যের স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য সম্প্রসারিত সেচ ব্যবস্থার মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করবে।

সারণী ৩.৬

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্যমাত্রা সমূহ

বিষয়	ইউনিট	১৯৭৯/৮০ (প্রকৃত)	১৯৮৪/৮৫ (লক্ষ্যমাত্রা)	শতকরা হার বৃদ্ধি
১। খাদ্যশস্য (চাল ও গম)	লাখ টন	১৩৩·৫	১৭৫	৩১
২। পাট (কাঁচা) ..	লাখ বেল	৫৯·৬	৬০	১
৩। তুলা (কাঁচা) ..	'০০০' বেল	৪	৫৬	১৩০০
৪। চা ..	লাখ পাউণ্ড	৮০৭	৯৫০	১৮
৫। তামাক ..	লাখ পাউণ্ড	৮৭১	১২৯০	৪৮
৬। আলু	'০০০' টন	৯০৩	১৩৬০	৫১
৭। মাছ	'০০০' টন	৬৪৭	১০০০	৫৫
৮। চিনি	'০০০' টন	৯৩·২	২০০	১১৫
৯। পাটজাত সামগ্রী	'০০০' টন	৫২৫	৬৫০	২৪
১০। সুতা	লাখ পাউণ্ড	৯৫০	১৮৩০	৯৩
১১। সূতিবস্ত্র (কাপড়)	লাখ গজ	৫৯২৪	৯৮০০	৬৫
১২। রাসায়নিক সার	'০০০' টন	৪৪২	১০৩৭	১৩৫
১৩। কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট ..	'০০০' টন	৬৯	৯৩	৩৫
১৪। সিমেন্ট	'০০০' টন	৩৪০	৪৫০	৩২

বিষয়	ইউনিট	১৯৭৯-৮০ (প্রকৃত)	১৯৮৪-৮৫ (লক্ষ্য মাত্রা)	শতকরা হার বৃদ্ধি
১৫। ডিজেল ইঞ্জিন	'০০০'টি	২·৪১	২০	৭৩০
১৬। পাম্প	'০০০'টি	২·১১	১৮	৭৫৮
১৭। বিদ্যুৎ	মিলিয়ন কিলোওয়াট	২৩৫৩	৪৪৫৫	৮৯
১৮। পল্লী বিদ্যুতায়ন	গ্রামের সংখ্যা	২১৮১	২৫,০০০	১০৪৬
১৯। প্রাকৃতিক গ্যাস	বিলিয়ন সিএফটি	৪৪·৯৭	১২৮	১৮৫
২০। শক্তি উৎপাদন (গ্যাস, বিদ্যুত ও পিওএল সমগ্রী)	মিলিয়ন টন তেলের পরিমাণ	২৭২৩	৪৯৬৩	৭৮
২১। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রী ভর্তি সংখ্যা	(১) লাখ ছাত্র ছাত্রী	৭০·০	১২৯·৯	৮৬
	(২) ৬-১১ বছরের ছেলেমেয়ের	৬০	৯২	..
২২। হাসপাতাল শয্যা সংখ্যা (বেসরকারী হাসপাতালসহ)	'০০০' শয্যা	২০·৯৩	৩২·৪৭	৫৫
২৩। পরিবার পরিকল্পনা নিরবচ্ছিন্ন পরিকল্পনা গ্রাহক	(১) লাখ দম্পতি	২৩·৪	৭০·৮	২০৩
	(২) যোগ্য দম্পতির%	১৪·০	৩৭·৫	..
২৪। রাস্তা (ঢাকা)	মাইল	২৫৫৪	৩৬৭৯	৪৮
২৫। টেলিফোন	'০০০'টি	১৩৮	১৭৫	২৭

৩.২৩ এই পরিকল্পনা প্রাথমিক ভাবে মৌলিক চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রণীত হয়েছে। এজন্য প্রধানতঃ ভোগ চাহিদার ভিত্তিতেই উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে। উৎপাদনের ওপর জোর দেয়া ছাড়াও পরিকল্পনায় যেমন একদিকে মৌলিক প্রয়োজনসমূহ এবং উৎপাদন কাঠামোর উপর তেমনি অন্যদিকে কর্মসংস্থান ও আয়ের মধ্যেও গভীর পারস্পরিক সম্পর্কের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। পল্লী উন্নয়নের নীতি কৌশল এবং খাদ্য ও কৃষির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপের ফলশ্রুতিতে পরম ও আপেক্ষিক উভয় হিসেবেই সম্ভাব্য সর্বোচ্চ উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে ও দারিদ্র্য হ্রাস পাবে। এতে নিত্য ব্যবহার্য পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। গ্রামীণ অর্থনীতির আর প্রভাবকে সম্ভাব্য সর্বাধিক বাড়ানোর লক্ষ্যে পারিবারিক চাহিদার কাছাকাছি অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়িয়েই প্রধানতঃ ভোগ চাহিদা মেটানো হবে। এজন্যে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে পল্লী এলাকায় হালকা ধরনের শিল্পের প্রসার ঘটাতে হবে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, বস্ত্রবয়ন তাঁতশিল্পের বিশেষ এখতিয়ার হয়ে থাকবে। এ প্রচেষ্টার আওতায় পল্লী এলাকার শিল্পগুলির প্রযুক্তি উৎকর্ষের স্তরের উন্নতি গ্রামের কারিগরদের দক্ষতা ও পণ্যের মান বৃদ্ধি করার প্রয়োজন দেখা দেবে। প্রাকৃতিক কারণে জিনিষ পত্রের ঘাটতি দেখা দিলে জরুরী দ্রব্য সামগ্রীর ভোগস্তর অক্ষুন্ন রাখার জন্য আমদানীর প্রয়োজন হবে। এটা বিশেষভাবে উল্লেখ

করা দরকার যে কতকগুলি পণ্যের লক্ষ্য মাত্রা স্বভাবতঃ সামাজিক চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে স্থির করা হয়েছে। সেজন্য উৎপাদন কার্যক্রমের সংগে সংগে অতিরিক্ত ব্যবস্থা হিসেবে বিশেষ করে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির কথা খেয়াল রেখে দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য ও বন্টনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে ভোগের বর্দ্ধিত সুযোগ সুবিধে সৃষ্টির আবশ্যকীয় শর্ত হিসেবে উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে। এজন্যেই মৌলিক চাহিদা মেটানোর বিষয়টি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা হিসেবে ভূমিহীন ও প্রান্তিকচাষী বিশেষ করে অভাব অনটনের মাসগুলিতে ও অভাবগ্রস্ত এলাকায় কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী অব্যাহত রাখতে হবে।

৩.২৪ ৩.৭ সারণীতে মৌলিক দ্রব্যসামগ্রী ও সার্ভিসের সুবিধের মাথাপিছু প্রাপ্যতায় প্রস্তাবিত বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে:

সারণী ৩.৭

মাথাপিছু মৌলিক দ্রব্য সামগ্রী ও সার্ভিস

বিষয়	১৯৭৯।৮০ (প্রকৃত)	১৯৮৪।৮৫ (লক্ষ্যমাত্রা)
(ক) ভোগ্যপণ্য সামগ্রী (মাথাপিছু)		
১। খাদ্যশস্য (আউন্স/দিন)	১৫·৮	১৫·৮
২। মাছ (পাউণ্ড/বছর)	১৬·৬	২২·৮
৩। চিনি ও গুড় (পাউণ্ড/বছর)	১৬·১	১৬·৯
৪। কাপড় (গজ/বছর)	৭·১	১০·০
৫। ইন্ধন শক্তি (এক কেজি তেলের সমপরিমাণ/বছর) ..	৩২·০	৫১·০
(খ) সামাজিক সার্ভিস:		
১। প্রাথমিক শিক্ষা ভর্তি (৬-১১ বছর বয়: গোষ্ঠির ছেলেমেয়ে)	৬০	৯২
২। স্বাস্থ্য সুবিধে		
(ক) হাসপাতাল শয্যাসংখ্যা (প্রতি লাখ লোকের জন্য) ..	২৪	৩৩
(খ) গ্রাজুয়েট ডাক্তারের সংখ্যা (প্রতি লাখ লোকের জন্য) ..	১৩	১৭
৩। পাকা রাস্তা (প্রতি এক হাজার বর্গমাইলে, মাইল হিসেবে) ..	৫৬	৮১

পরিকল্পনার পর্যালোচনা

৩.২৫ এই পরিকল্পনা একটি আপেক্ষিক স্থিতি কাঠামোর ভিত্তিতে রচিত বলে, শুধুমাত্র স্থিতি মাত্রাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে প্রান্তিক বছরের উৎপাদন নির্ধারিত হয় এবং পুঁজি বিনিয়োগ গোটা মেয়াদ শেষে প্রান্তিক বছরে গিয়ে সঞ্চিত হয়। এর দ্বারা এ কথা বোঝায় না যে, পরিকল্পনা স্থিতিমাত্রা থেকে এই মেয়াদে গড়িয়ে প্রান্তিক অবস্থানে যাবে। অতীতের প্রকল্প অংগীকার, উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা প্রযুক্তিগত

পরিস্থিতি এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিঃসম্পদ পরিস্থিতির বিবর্তন বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধির ধারা নির্ধারণ করবে। অবশ্য অতীতের অভিজ্ঞতার নিরীখে ১৯৭৯।৮০ সালে স্থির ও চলতি উভয় মূল্যে (বার্ষিক শতকরা ১২ ভাগ মুদ্রাস্ফীতি ধরে নিয়ে) পাঁচ বছর মেয়াদে সরকারী ও বেসরকারী খাতে বিভাজন দেখিয়ে নিম্নের ৩.৮ সারণীতে উন্নয়ন ব্যয়ের একটা ইংগিতবাচক পর্যায়-বিভিক্তি দেখানো হয়েছে।

সারণী ৩.৮

(ক) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আর্থিক উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দের পর্যায় বন্টন
(১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে)

[কোটি টাকায়]

বছর	মোট	সরকারী	বেসরকারী
১৯৭৯/৮০	২,৭১৭	২,০৮২	৬৩৫
১৯৮০/৮১	২,৯৬২	২,১১২	৮৫০
১৯৮১/৮২	২,৮৯৩	১,৯১৩	৯৮০
১৯৮২/৮৩	৩,৪০৪	২,১৪৪	১,২৬০
১৯৮৩/৮৪	৩,৬৪৫	২,২৩৫	১,৪১০
১৯৮৪/৮৫	৪,২৯৬	২,৬৯৬	১,৬০০
মোট ..	১৭,২০০	১১,১০০	৬,১০০

(খ) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আর্থিক উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দেরপর্যায় বন্টন
(চলতি মূল্যে)

(কোটি টাকায়)

বছর	মোট	সরকারী	বেসরকারী ৫
১৯৭৯/৮০	২,৭১৭	২,০৮২	৬৩৫
১৯৮০/৮১	৩,৩১৭	২,৩৬৫	৯৫২
১৯৮১/৮২	৩,৬১৬	২,৩৯১	১,২২৫
১৯৮২/৮৩	৪,৮০০	৩,০২৩	১,৭৭৭
১৯৮৩/৮৪	৫,৭২৩	৩,৫০৯	২,২১৪
১৯৮৪/৮৫	৭,৬০৪	৪,৭৭২	২,৮৩২
মোট ..	২৫,০৬০	১৬,০৬০	৯,০০০

সারণী ৩.৮ক অনুযায়ী মোট পরিকল্পনা বরাদ্দ ১৯৭৯/৮০ সাল থেকে গড়ে বার্ষিক শতকরা ৮.৮ ভাগ হারে বাড়বে—প্রকৃত মানে সরকারী খাতের কার্যক্রমের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির শতকরা ৪.৩ হতে ভাগ এবং বেসরকারী খাতে প্রবৃদ্ধি শতকরা ২০ ভাগ। আর বাড়তি মূল্যে সরকারী খাতের ব্যয়ের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি শতকরা ১৬.৩ ভাগ। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৭০ এর দশকের শেষ সাত বছরে সরকারী খাতের ব্যয় প্রবৃদ্ধি বার্ষিক হার শতকরা ৩১ ভাগে উন্নীত হয়। যে কোন একটি বছরের বার্ষিক উন্নয়ন ব্যয় অবশ্য অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, বিশেষ করে বিশ্ব মুদ্রাস্ফীতি ও মন্দা জনিত বিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল। এসব পরিস্থিতি বৈদেশিক সাহায্যে প্রবাহ এবং আমদানী-রপ্তানীর স্তর ব্যাহত করতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়

অভ্যন্তরীণ সম্পদসমূহ

৪·১ ১৯৮০/৮১ থেকে ১৯৮৪/৮৫ পরিকল্পনা মেয়াদে পরিকল্পনায় মোট ১৭,২০৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে বলে ধরা হয়েছে। পরিকল্পনার এই ব্যয় বরাদ্দ ছাড়াও কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, খাদ্যশস্য মজুত এবং সরকারী ও বেসরকারী মজুত তালিকায় ও সরকারী সংস্থাগুলোর সমঅংশীপত্রের মূলধনে আরও ১,৮৭৯ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। এ জন্য পরিকল্পনার মোট সম্পদ ও পরিকল্পনার আওতাবহির্ভূত ব্যয় দাঁড়াবে ১৯,০৭৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১৬,৫৭৯ কোটি টাকা বিনিয়োগ বলে ধরা হয়েছে। মোট ৮,১১০ কোটি টাকা ও নীট ৭,০৯১ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাবে (৫ম অধ্যায়ে আলোচিত) বলে অনুমান করা হচ্ছে যা পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের ৪১·২ শতাংশ। ৮,১৩২ কোটি টাকার অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ করার প্রয়োজন হবে বলে হিসেব করা হয়েছে যা পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের ৪৭·৩ শতাংশ, বাকীটা পাওয়া যাবে অন্যান্য বৈদেশিক খাত থেকে। অভ্যন্তরীণ সম্পদের যে স্তর প্রস্তাব করা হয়েছে সেই লক্ষ্যে জাতীয় সঞ্চয়কে বাড়ানোর জন্য যথেষ্ট পরিকল্পিত প্রয়াসের প্রয়োজন হবে। সবচেয়ে কম উন্নত দেশগুলোর যে কোনটির মতই বাংলাদেশে সম্পদের সংকট একান্ত প্রকট; তবু বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক বাধ্যবাধকতা এত প্রবল যে, ঐ সব আর্থ সামাজিক সমস্যা সমাধানে সর্ব প্রযত্নে প্রয়াসী হতে হবে।

৪·২ অভ্যন্তরীণ সম্পদের যে হিসাব করা হয়েছে তাতে পরিকল্পনার শেষ বছরে গড় সঞ্চয়ের হার ৭·৪ শতাংশ বলে ধরে নিতে হয়। পরিকল্পনার মাথা পিছু যে আয়ের কথা বলা হয়েছে অনেক উন্নয়নশীল দেশের আয় ঐ ধরে নেয়া হারের চেয়ে বেশী[১]। ১৯৭৯/৮০ সালে বাংলাদেশে সঞ্চয়ের হার ছিল ৪·৩ শতাংশ। আসলে স্বাধীনতা পরবর্তীকালের ফলশ্রুতি হিসেবে নানা সমস্যায় এবং ফসল খুব খারাপ হওয়ায় সঞ্চয় হ্রাস পায়।

৪·৩ এখানে উল্লেখ করা দরকার যে অর্থনীতির ১৯৬৯/৭০ সালের উৎপাদন স্তর ১৯৭৬/৭৭ সালে পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছে। এই দশকের পেছাবিবিদেশের মাথা পিছু আয় ১৯৬৯/৭০ সালের স্তরের নীচে ছিল। অন্যদিকে পরাধীনতামুক্ত মানুষের আরও বেশী করে বস্তুগত তৃপ্তির আকাঙ্খা বাড়িতে থাকার খুব স্বাভাবিক ভাবেই সঞ্চয়ের ওপর কিছু প্রতিকূল প্রভাব পড়ে। এই সংগে একনাগাড়ে মুদ্রাস্ফীতি চলতে থাকায় ১৯৭০ এর দশকে সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের জন্যই শুধু নয় পরিবার পর্যায়ে পরিকল্পিত সঞ্চয়ের জন্য একটা দুঃসময়ে পরিণত হয়। এসবেও ১৯৭৯ সালের শুরুতে সরকার রাজস্ব ও আর্থিক ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে সঞ্চয় ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি হয়। বিস্তৃত পরিকল্পিত উন্নয়ন সাধনে সরকারের অঙ্গীকার প্রতিফলিত করে। এসব প্রয়াসের একটা সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা নীচে দেয়া হয়েছে। এ থেকে দ্বিতীয় পরিকল্পনা মেয়াদের অভ্যন্তরীণ সম্পদ স্তরের সম্ভাব্যতার যৌক্তিকতা বিচার করা সম্ভব হবে।

(১) কয়েকটি প্রতিবেশী দেশের ১৯৮০ সালের সঞ্চয় হার (সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের %) নিম্নরূপ :

দেশ	মাথাপিছু আয় (মার্কিন ডলারে)	সঞ্চয় হার (শতকরা)
১। নেপাল	১৪০	৭
২। বার্মা	১৭০	১৮
৩। ভারত	২৪০	২০
৪। শ্রীলঙ্কা	২৭০	১৪

সূত্র : ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ১৯৮২ (পৃঃ ১০৮—১১৮)

৪.৪ সরকারী অর্থ সংস্থানের ক্ষেত্রে ১৯৭০ দশকের দ্বিতীয়ার্ধে গৃহীত রাজস্ব ও আর্থিক ব্যবস্থাদির সামগ্রিক ফলাফল সারণী ৪.১ এ দেখানো হয়েছে।

সারণী ৪.১

সরকারী খাতে সম্পদ পরিস্থিতি

(চলতি মূল্যে)

(১৯৭৪/৭৫ থেকে ১৯৭৯/৮০)

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	১৯৭৪/৭৫	১৯৭৯/৮০	বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার (%)
১। প্রাপ্ত কর	৫৩৪	১,৪৩৯	২২.০
২। কর বহির্ভূত প্রাপ্তি	১৫৮	৩৩২	১৬.০
৩। মোট রাজস্ব	৬৯২	১,৭৭১	২০.৫
৪। মোট রাজস্ব ব্যয়	৫৬৬	১,২৩৬	১৬.৯
৫। রাজস্ব উদ্বৃত্ত	১২৬	৫৩৫	৩৩.৫
৬। সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (চলতি বাজার মূল্যে)	১২,৩০৭	১৮,২০৬	৫.৩*
৭। মধ্যবিত্ত শ্রেণী জীবন যাত্রা ব্যয়ের সূচক (১৯৫৯/৬০=১০০)			
৮। কর/সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদন অনুপাত	৪৩	৭.৯	৬.৫

* ১৯৭২/৭৩ মূল্যে সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি।

৪.৫ উল্লিখিত সারণী অনুযায়ী ১৯৭০ এর দশকের শেষার্ধে কর সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অনুপাতে তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতি হয়েছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদের সমাবেশের ক্ষেত্রে সরকারের ক্রমবর্ধমান প্রয়াসের পরিচয় এ থেকে পাওয়া যায়। মুদ্রাস্ফীতির হারের তিনগুণেরও বেশী কর আদায় বেড়েছে। কর বহির্ভূত রাজস্বসহ মোট রাজস্ব আয়েও উচুঁ প্রবৃদ্ধি হার বজায় ছিল। সরকারী খাতের প্রকৃত সম্পদ বার্ষিক ১৪.০০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বার্ষিক ৫.৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাওয়া ধরে নেয়া যায় যে সরকার সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি হারের দ্বিগুণেরও অধিক হারে প্রকৃত সম্পদের সমাবেশ করেছেন। অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট মেয়াদে ঐ সম্পদ সংগ্রহ তৎপরতা সাফল্যের সংগে অনুসৃত হয়েছে।

৪.৬ একই সময়ে অবশ্য সরকারী ভোগও বেশ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি বেড়েছে রাজস্ব সম্পদের ২০.৫ শতাংশ বৃদ্ধির তুলনায় বার্ষিক ১৬.৯ শতাংশ হারে। প্রকৃতপক্ষে সত্যিকার সরকারী ভোগ বার্ষিক ১০.৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায় এবং বাড়তি রাজস্ব হিসেবে সংগৃহীত প্রতি ১০ টাকার ছয় টাকা অতিরিক্ত সরকারী ভোগের অর্থ যোগানে ব্যয় হয়। ফলে, সরকারী খাতে সঞ্চয়ের প্রান্তিক হার দাঁড়ায় ৪০ শতাংশ। অতিরিক্ত কর সংগ্রহ প্রয়াস ছিল মূলতঃ ব্যয় প্রভাবিত। প্রথমে ১৯৭২ সালে ও তারপর ১৯৭৬ সালে প্রশাসনিক পুনর্গঠন করা হয়। উল্লিখিত সময়ে ঐ প্রশাসনিক পুনর্গঠনের কারণেই প্রধানতঃ সরকারী ব্যয় দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধিকে ব্যয় স্তরে কেবল একবার মাত্র পরিবর্তন বিবেচনা করা যেতে পারে। তাই সাম্প্রতিক অতীতের চেয়ে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে

সরকারী ব্যয় অনেক নিম্নমাত্রায় বৃদ্ধি পাবে বলে ধরে নেয়াই হবে বাস্তবসম্মত তবু, একথা স্বীকার করে নেয়া উচিত যে, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে দারিদ্র্য ও বেকারত্বকে বাস্তবতা ধরতে হলে, কেবলমাত্র উন্নয়ন অর্থ সংস্থানেরই সরকারী সম্পদের ওপর চূড়ান্ত দাবী আছে বলে গণ্য করা যায় না। এ কারণে সরকারী ভোগের চাহিদাকে একটা কড়াকড়ি গণ্ডির মধ্যে সীমিত করা প্রয়োজন।

৪·৭ ১৯৭০ এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে কড়া ব্যবস্থাদির ফলে সার্বিক রাজস্ব পরিস্থিতির উন্নতি হলেও এর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা দরকার। প্রথমতঃ ক্রমবর্ধমান হারে সার্বিক অভ্যন্তরীন উৎপাদন অনুপাতের ব্যাপারে একটা বলিষ্ঠ নিরপেক্ষ গতিপ্রবণতার অভাব এতে রয়েছে। ১৯৭৫/৭৬ সাল ও ১৯৭৯/৮০ সালের মধ্যবর্তী এই অনুপাত খুব ওঠানামা করে; এই অনুপাত ১৯৭৮/৭৯তে সর্বোচ্চ মাত্রায় অর্থাৎ ৮·২ শতাংশে ওঠে। তবে ১৯৭৯/৮০তে তা ৭·৯ শতাংশে নেমে যায়। উল্লিখিত প্রবণতার এই বলিষ্ঠতার অভাব অংশতঃ ১৯৭৫/৭৬ সাল থেকে যে গতিসঞ্চারিত হয়েছিল তা হারানো এবং অংশতঃ বাণিজ্য ও সাহায্যের ওঠানামার কারণে ঘটে। মুদ্রাস্ফীতি ও জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের কারণে গুরুতর অর্থনৈতিক কৃচ্ছতার পরিবেশে কর সংক্রান্ত নীতির রাজস্বগত উদ্দেশ্যাবলী একনিষ্ঠতার সঙ্গে রক্ষা করে চলা দুষ্কর হলেও দ্বিতীয় পরিকল্পনার অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশের প্রয়াসে লাগাম শিথিল করার অবকাশ নেই। দ্বিতীয় পরিকল্পনা মেয়াদ কর/সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অনুপাত যথেষ্ট বৃদ্ধি করার প্রয়াস গ্রহণ সরকারের প্রয়োজন হবে। পরিকল্পনার কর ক্ষেত্রে যেসব ব্যবস্থার কথা স্থির করা হয়েছে তাতে ১৯৮৪/৮৫ সালে কর/সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অনুপাত বাড়বে ৯·৫ শতাংশ হারে। অবশ্য বহু উন্নয়নশীল দেশ ইতিমধ্যেই এই হারে পৌঁছে গেছে। কর/সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অনুপাত ৭·৯ শতাংশ কম, এর প্রধান কারণ, বৃদ্ধি আয়ই সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অর্ধেকেরও বেশী অথচ বৃদ্ধি আয়ের খুব সামান্যতেই কর ধার্য করা হয়। এ জন্য, কর তদন্ত কমিশনসহ (১৯৭২) বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের রাজস্ব বিবেচনায় এ বিষয়টি রয়েছে।

৪·৮ বর্তমান কর কাঠামোর দ্বিতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আমদানী শুল্কের ওপর নির্ভরশীলতা। এই আমদানী শুল্ক সংগ্রহই বিক্রয় করসহ একত্রে মোট কর রাজস্বের অর্ধেকেরও বেশী যোগায় এবং অভ্যন্তরীণ উৎপাদন শুল্কের তুলনায় এর ধার্য করের ভিত্তি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিষয়টি ৪·২ সারণীতে প্রদর্শিত হয়েছে:

সারণী ৪·২

কর রাজস্বের গঠন বিন্যাস

	১৯৭২/৭৩		১৯৭৫/৭৬		১৯৭৯/৮০		বার্ষিক প্রবৃদ্ধি (%)	
	কোটি টাকা	শতাংশ	কোটি টাকা	শতাংশ	কোটি টাকা	শতাংশ	১৯৭২—১৯৭৫	১৯৭৫—১৯৮০
পরোক্ষ	১৪৩	৮৬·২	৩৬৫	৮০·৬	১,২০৭	৮৩·৯	৩৪·০	১৬·১
আমদানী শুল্ক	৯০	৩৮·৭	১৫০	৪২·৪	৬২৫	৪৩·৪	৩৭·০	১৫·৬
আবগারী কর	৪৪	১৩·৪	১৮২	২২·১	২৮৫	১৯·৮	২৬·৫	১১·৯
বিক্রয় কর	২১	১১·৪	১২০	১৪·৫	২৮৪	১৯·৭	৪৫·০	২৪·০
প্রত্যক্ষ	২৪	১৩·৮	১৬০	১৯·৪	২০২	১৬·১	৩৭·৫	৯·৭
আয়কর	১৪	৭·৭	১২৪	১৫·২	১৮২	১২·৬	৪৪·৫	৯.৯
ভূমি উন্নয়ন	১	১·৭	১৭	২.১	১৯	১·৩	৩০·০	২·৮
মোট	১৮১	১০০·০	৮২৫	১০০·০	১,৪৩৯	১০০·০	৩৪·৫	১৪·৯

৪·৯ মোট কর-এ আমদানী শুল্কের মোটা অংশ থেকে বুঝা যায়, কর ব্যবস্থা আমদানী বাণিজ্যের দুই তৃতীয়াংশেরও বেশী অর্থ যোগানদার বিদেশী সাহায্যের ওপর কতখানি নির্ভরশীল। এ ধরনের নির্ভরশীলতা আবার বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্যের পরিমাণের ওঠানামার সঙ্গে আমদানী শুল্কখাতে রাজস্ব আয়কেও অনিশ্চিত করে তোলা বিপদ ডেকে আনে। কর কাঠামোর এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই ৪·৫ অনুচ্ছেদে আলোচিত কর/মাথিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের আনুপাতিক সম্পর্কে অস্থিতিশীলতা আসে। এ জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্যতম বড় বিবেচ্য বিষয় হবে কর কাঠামোকে অভ্যন্তরীণ খাত অভিমুখী করে তোলা। পক্ষান্তরে, এতে এও বুঝায় যে, কর ব্যবস্থা এবং অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও আয়ের মধ্যেকার সম্পর্ক তুলনামূলকভাবে দুর্বল।

৪·১০ সারণী ৪·২ এ আরও একটা বেশ অসন্তোষজনক দিক তুলে ধরা হয়েছে। সেটি হচ্ছে এই যে, ১৯৭৫/৭৬ সালের তুলনায় ১৯৭৯/৮০ সালে প্রত্যক্ষ করের অংশের পরিমাণ কমে গেছে। এটি পরিকল্পনার সামাজিক ন্যায় বিচার ও সমতার পরিপন্থী। তবে একদিকে, বিদেশী সাহায্যের ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা আর অন্যদিকে কৃষি আয়ের ওপর কার্যকর করারোপের অনুপস্থিতির মিলিত পরিস্থিতিতে এটা অবশ্যম্ভাবী। এজন্য সামাজিক ন্যায় বিচার ও রাজস্ব স্থিতিশীলতার স্বার্থে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ওপর কর ধার্য বিশেষ করে কৃষি কর আরোপের প্রয়োজন আছে।

৪·১১ সরকারী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক পরিস্থিতির দিকে নজর না দিয়ে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশের চিত্রটি সম্পূর্ণ হতে পারে না। সরকারী সম্পদের ওপর এই সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর চাপ দুরকম। ১৯৭০ এর দশকের প্রথম দিকে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের সময়ে সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক অবস্থা সামগ্রিকভাবে খারাপ ছিল। উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহারে উন্নতি এবং পরপর কয়েকবার উর্ধ্বমুখী মূল্য নির্ধারণমূলক সমন্বয়বিধানের ফলে পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি হয়। মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া ১৯৭৬/৭৭ সালের শিল্প উৎপাদন ১৯৬৯/৭০ এর উৎপাদনের মাত্রায় পৌঁছায়। এর সাথে মূল্য নির্ধারণজনিত সামঞ্জস্য বিধানের কল্যাণের সকল সংস্থা সঞ্চিত লোকসান অবলোপন করে এবং কিছু কিছু মুনাফা করতেও সক্ষম হয় তা সারণী ৪·৪ এ দেখান হল। সরকারী খাতের কিছু কিছু গুরুত্ব পূর্ণপণ্যসামগ্রী ও সেবাপণ্যের মূল্য নির্ধারণমূলক সামঞ্জস্য বিধানের পরিমাণ সারণী ৪·৩ এ দেখানো হয়েছে।

সারণী ৪·৪

সরকারী খাতের পণ্যাদির মূল্য পুনর্বিন্যাস
(মূল্য টাকায়)

পণ্য/সেবাপণ্য	১৯৭২/৭৩ মূল্য	১৯৭৯/৮০ মূল্য	বার্ষিক বৃদ্ধি (শতকরা)
১। ইউরিয়া সার	৬৪০	১,৮৭৭	২৩
২। লেখার কাগজ	৩,৯৫৩	১৬,০১৭	২২
৩। নিউজ প্রিন্ট (টন প্রতি)	১,২১৪	৯,০০০	৩৩
৪। বিদ্যুৎ (প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টা)	০·১৯	০·৬৫	১৯
৫। প্রাকৃতিক গ্যাস (প্রতি মেগা ঘনফুট)	১·২৭	৮·৮৬	৩২
৬। পিওএল পণ্য (গ্যালন প্রতি)	২·৩০	১৩·৯২	৩০

৪·১২ বর্ধিত মূল্যের দরুণ পণ্যমূল্য কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও কয়েকটি সংস্থার বিনিয়োগ খাতে আয়ের হার অত্যন্ত কম। সারণী ৪·৪ এতে বিষয়টি দেখানো হয়েছে।

সারণী ৪·৪

সংস্থার বিনিয়োগ খাতে আয়ের হার
(১৯৭৯/৮০) (কোটি টাকায়)

সংস্থা	মূলধন	১৯৭৯/৮০ মূল্যমান	আয়ের হার(%)
১। ইস্পাত ও পুরকৌশল	২৫৪·৭	১৪·৭	৫·৮
২। রসায়ন	৪৫১·০	৮·০	১·৮
৩। চিনি ও খাদ্য	৭১·৫	১৪·৫	২০·৩
৪। পাটজাত পণ্য	৩৬৭·৪	১০৩·০	২৮·৯
৫। সুতিবস্ত্র	১৬০·৬	(—)১৮·৭	..
মোট ..	১৩০৫·২	১২৫·১	৯·৬

৪·১৩ উল্লেখিত দুটি সারণী একত্রে পাঠ করলে অনিবার্য সিদ্ধান্ত হবে এই যে, শুধু পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোকে আর্থিক দিক থেকে আবার সচ্ছল ভিত্তিতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। কারণ সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর সমস্যা এতটা গভীরে শিকড় গেড়ে আছে যার সমাধান পণ্যব্যবহারকারীর ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে দিয়ে সম্ভব নয়। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সমস্যাদির উপসর্গ শ্রমিক উৎপাদনশীলতাই সুপরিস্ফুট, বিষয়টি সারণী ৪·৫ এ দেখানো হয়েছে :

সারণী ৪·৫

সরকারী খাতে শ্রম উৎপাদনশীলতার সূচকসমূহ
(১৯৬৯/৭০=১০০)

শিল্প	১৯৭২/৭৩	১৯৭৯/৮০
১। পাট বয়ন	১০১·৫	৫৬·৪
২। সুতি বস্ত্র	৭৪·৫	৩২·৭
৩। কাগজ	৫২·৫	৩০·৬
৪। ইস্পাত	৮৪·৬	১২৮·৬

৪·১৪ এজন্য অধিকতর আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের লক্ষ্যে সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক সুষ্ঠুভিত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে বর্ধিত মূল্য সম্পর্কে চেতনা, দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা অর্জনে পরিচালিত করতে হবে। অনিবার্যভাবেই এই প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক সুষ্ঠুতার প্রধানভিত্তি হবে ব্যবস্থাপনা দক্ষতার, শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা এবং যন্ত্র ও উপকরণের ব্যবহার দক্ষতার উন্নতি।

৪·১৫ সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক স্বয়ম্ভরতা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকর শুল্ক ব্যবস্থা এবং অবচয় তহবিলের ব্যবস্থাপনা ঘনিষ্ঠ মনোযোগের দাবীদার। কাঁচামালের আমদানী ও প্রস্তুত পণ্যের মধ্যে রাজস্বগত বৈষম্য দূর করা ছাড়াও একটা ফলদায়ক শুল্ক কাঠামো গড়ে তোলার জন্য একটি সমীক্ষা পরিচালনা করতে হবে। শুধু সম্পদের দক্ষ বরাদ্দ নিশ্চিত করাই এর উদ্দেশ্য হবে না বরং বর্তমানে যে উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে তার দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করাও হবে অন্যতম উদ্দেশ্য।

৪·১৬ সরকারী খাতের সম্পদের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সবচেয়ে অবহেলিত উৎপাদনগুলোর অন্যতম উপাদানটি হচ্ছে অবচয় তহবিলের ব্যবস্থাপনা। পর্যাপ্ত পরিমাণ অবচয় তহবিলের মাধ্যমে মূলধন সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার ব্যাপারে সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর সচেতনার একান্ত অভাব লক্ষ্য করা যায়। কয়েকটি সংস্থা বিশেষ করে কয়েকটি সরকারী প্রতিষ্ঠান তাদের হিসেবপত্রে অবচয়ের জন্য কোন ব্যবস্থা রাখে না। যদি এটা করা হত তাহলে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান তাদের আর্থিক হিসাবপত্রে যে লোকসান দেখিয়ে থাকে তার চেয়ে লোকসানের পরিমাণ বেশী হ'ত। অবচয় তহবিলের ব্যবস্থাপনার অবস্থা আরও শোচনীয়। সংস্থাগুলির যে পরিমাণ তহবিলই অবচয় হিসাবে রাখুক না কেন সেই অর্থ ঐ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরেই চলতি মূলধন হিসাবে সঞ্চালনশীল থাকে হঠাৎ কোন সম্পদ বা সম্পত্তি বদলের জরুরী প্রয়োজন দেখা দিলে ঐ তহবিলের অর্থ তখন পাওয়া যাবে এমন নিশ্চিতা থাকে না। ফলে সুষমকরণ, আধুনিকীকরণ ও যন্ত্রাদির পরিবর্তনের ব্যাপারটি বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এজন্যে নূতন করে ঋণ করে এইখাতের আর্থিক সংস্থান করা হয়। এটি এক দুঃসহ অবস্থার কারণ। এ ধরণের পরিবর্তন ব্যবস্থায় মূলধনই নিঃশেষিত হয়। যন্ত্রাদি পরিবর্তনের ব্যাপারটির জন্য অর্থ সংস্থান স্ব-সংস্থানের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। এজন্য চলতি মূলধনের সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলে আলাদাভাবে অবচয় তহবিল সংরক্ষণ করা দরকার। এজন্য কতকগুলো বিকল্প ব্যবস্থার আশ্রয় নেয়া যেতে পারে। প্রথমতঃ প্রতিপূরক তহবিল পদ্ধতি গ্রহণ কিংবা দ্বিতীয়তঃ অবচয় তহবিলের অর্থ সরকারী সিকউরিটিতে বিনিয়োগ অথবা ঐ তহবিল ব্যাংকে মেয়াদী সঞ্চয় হিসাবে জমা দেয়া যেতে পারে।

বেসরকারী সঞ্চয়

৪·১৭ সরকারী খাতে রাজস্ব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা হবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশের মূল কথা। তবে একথাও স্বীকৃত যে, বেসরকারী সঞ্চয় অতীতের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। নিম্নলিখিত বিষয় থেকে এর সত্যতা প্রতিভাত হবে যেমন (১) পূর্বের পরিকল্পনাগুলোর তুলনায় উন্নয়ন ব্যয়ে বেসরকারী খাতকে অনেক বেশী অংশ দেওয়া হয়েছে এবং (২) এই পরিকল্পনায় পল্লী ও কৃষি উন্নয়নে অধিকতর জোর দেয়ায় বেসরকারী খাতে সম্পদ সমাবেশ প্রায়সে এগুলো বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। কৃষি উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করায় খাবার জমিতে বিনিয়োগ এখনকার চেয়ে লাভজনক হয়ে উঠবে। কৃষি জমির বাড়তি আয় যদি নিরন্তর পুঁজিতে রূপান্তরিত হতে থাকে তাহলে অনুরূপ ক্ষেত্রে অধিক উচ্চ মূল্য কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়নে বিনিয়োগ (যথা, সেচ ব্যবস্থা) ক্রমেই আকর্ষণ হারাবে। পরিকল্পনায় কৃষি খাতে সাফল্য নির্ভর করবে জমি নিয়ে ফটকাবাজির পরিবর্তে উৎপাদনশীল উদ্দেশ্যে পল্লী সঞ্চয় গড়ে তোলার ওপর। সম্ভাব্য আয়ের উপর জমি ভিত্তিক করসহ জমি হস্তান্তর করের কার্যকর প্রয়োগের বিষয়টি এক্ষেত্রে বিবেচনা করে দেখতে হবে। একই সঙ্গে ব্যাংকগুলোর পক্ষ থেকে সঞ্চয়ের জন্য আকর্ষণীয় হারে আয়ের সুযোগ দিয়ে পল্লী সঞ্চয় সংগ্রহের জন্য বিশেষ অভিযান পরিচালনা করতে হবে। নিতব্যয়িতা পল্লী সমাজের একটি ঐতিহাগত ব্যাপার। রক্ষণশীলতার কারণেও এটা হয়ে থাকে। সেজন্য ব্যাংকের সঞ্চয় সংগ্রহ অভিযান এভাবে পরিচালনা করতে হবে যাতে এর লাভজনক দিকগুলো পল্লীগ্রামে অধিক পরিমাণে দ্রব্যাদি প্রবাহের মাধ্যমে বাস্তব আকারে গ্রামের জনসাধারণের চোখে প্রতিভাত হয়।

রাজস্ব ও আর্থিক উদ্দেশ্যাবলী

৪.১৮ ১৯৭০ এর দশকের অভিজ্ঞতার আলোকেও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশের সম্ভাবনা ও সমস্যাবলী এবং আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যাবলীর লক্ষ্যে রাজস্ব, আর্থিক ও ব্যাংকিং ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

(ক) **সরকারী অর্থ সংস্থান**

(১) অভ্যন্তরীণ আয় ও উৎপাদনের উপর করের আরও বেশী গুরুত্ব আরোপসহ ৯.৫ শতাংশ পরিসরে উচ্চতর কর/সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদন অনুপাত অর্জন;

(২) সরকারী সঞ্চয় দ্রুততর হারে বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারী ভোগ (ব্যয়) রোধ করা যাতে এই ব্যয় বৃদ্ধি সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি হারের নীচে থাকে।

(৩) সুচিহ্নিত সামাজিকভাবে দুস্থ জনগোষ্ঠির জন্য শুধুমাত্র খাদ্যশস্যে ভর্তুকি ছাড়া ১৯৮৪/৮৫ সাল নাগাদ সকল ভোগ-ব্যবহারমূলক ভর্তুকি উচ্ছেদ,

(৪) সম্পদের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ বণ্টনের লক্ষ্যে যুক্তিসঙ্গত কর কাঠামো প্রতিষ্ঠা।

(খ) **আর্থিক ব্যবস্থাপনা :**

(১) ১৯৮৪/৮৫ সাল নাগাদ সরকারী পণ্য ও সেবার সকল প্রচ্ছন্ন ও পুনরাবৃত্তিমূলক ভর্তুকি পরিহার।

(২) উৎপাদনশীলতা, উৎপাদন ব্যয় বাস্তবসম্মতকরণ ও যুক্তিসংগত মূল্য নির্ধারণে উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিনিয়োগ থেকে যুক্তিসঙ্গত আয় প্রাপ্তির নিশ্চতাবিধান।

(গ) **অর্থ ও ঋণ :**

(১) পারিবারিক পর্যায়ে সঞ্চয় উৎসাহিত করার জন্য একটা উপযুক্ত ও ইতিবাচক সুদের হারনীতি অনুসরণ;

(২) সম্প্রসারণশীল বাস্তব (পণ্য) খাতের বিপরীতে সুবিবেচিত আর্থিক ও ঋণ সম্প্রসারণের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতির হার হ্রাস।

(১)। **সরকারী খাতে অর্থ সংস্থান :**

৪.১৯ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন সম্ভাবনা বিবেচনা করে দেখা হয়েছে। পরিকল্পনার শেষ বছর ১৯৮৪/৮৫ সালে ৯.৫ শতাংশ হারে কর সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদন হার অনুপাত অর্জিত হলে সরকারী খাতের উন্নয়ন সম্পদের চাহিদা মিটবে। বহু উন্নয়নশীল দেশের কর/সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদন হারের স্তরের থেকে ঐ লক্ষ্য মাত্রা অনেক নিচে। এই লক্ষ্য মাত্রার সম্ভাব্যতা ও কর পরিকল্পনার এর নানাদিক নিয়ে পরে আলোচিত হবে। সারণী ৪.৬ এ সরকারী খাতের অর্থ সংস্থানের সামগ্রিক চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে।

সারণী ৪·৬

সরকারী খাতে অর্থ সংস্থান (১৯৮০—৮৫)
(১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে)

(কোটি টাকায়)

ক। সম্পদ চাহিদা	
১। পরিকল্পিত ব্যয়	১১,১০০
২। পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয়	১,৪৫৩
মোট ..	১২,৫৫৩
খ। অর্থ সংস্থান	
১। সরকারী সঞ্চয়	
(ক) রাজস্ব উদ্বৃত্ত	২,৮৩৮
(খ) মূলধন আয়	৪৫১
(গ) সংস্থাসমূহের অবচয় ও আটক (রিটেইনড) আয়	৩৫০
	৩,৬৩৯
২। বৈদেশিক সাহায্য	৬,৭২০
মোট ..	১০,৩৬৯
গ। সম্পদ ঘাটতি	
পূরণের মাধ্যম	২,১৮৪
(ক) বাড়তি রাজস্ব ব্যবস্থা	১,৩৬৭
(খ) ব্যাংক ঋণ	৮১৭
মোট ..	২,১৮৪

দ্রষ্টব্য (১) পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয়ে কাজের বিনিময়ে খাদ্য, খাদ্য মজুত ও অন্যান্য মজুত এবং সংস্থাগুলির সব অংশিদারী মূলধন অন্তর্ভুক্ত।

(২) খাদ্য মজুতের অর্থসংস্থানে ব্যাংক ঋণ ব্যবহৃত হবে।

রাজস্ব আয়ের চিত্র :

৪.২০ ১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে ও হারে দ্বিতীয় পরিকল্পনা মেয়াদে ১০,০৪০ কোটি টাকায় রাজস্ব পাওয়া যাবে বলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে করের পরিমাণ ৮,১৪১ কোটি টাকা এবং কর বাহির্ভূত রাজস্ব ১,৮৯৯ কোটি টাকা বলে হিসেবে করা হয়েছে। সারণী ৪·৭-এ কর খাতে আয়ের বিন্যাস দেখানো হয়েছে।

সারণী ৪.৭

উৎস ভিত্তিক কর পরিস্থিতি (১৯৮০ থেকে ১৯৮৫)

(১৯৭৯/৮০ সালের হার ও মূল্যে)

কর	১৯৭৯/৮০ (স্থিতিমাত্রা)	১৯৮২/৮৩ পর্যন্ত		১৯৮০/৮৫ মোট (পরিকল্পিত)		বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার (%)
		১৯৭৯/৮০ মূল্য	চলতি মূল্য	১৯৭৯/৮০ মূল্য	চলতি মূল্য	
১। আমদানী শুল্ক	৬২৫	১,৮৫৫	২,৩১৮	৩,২৩২	৪,৬১৮	২·৬
আমদানী	(৫৮৩)			(৩,০৬৬)		৩·৪
রপ্তানী	(৪২)			(১৬৬)		
২। আবগারী কর	২৯৪	৮৯২	১,১২০	২,০১৩	৩,০০১	৯·৫
৩। বিক্রয় কর	২৮৪	৮৬৫	১,০৭৫	১,৫১৭	২,১৬২	৩·৫
৪। আয়কর	১৮২	৫৮৪	৭৩২	১,০৪৬	১,৫০৪	৫·৫
৫। অন্যান্য কর	৫৪	১৯৭	২৩৮	৩৩৫	৪৬৮	..
মোট ..	১,৪৩৯	৪,৩৯৩	৫,৪৮২	৮,১৪১	১১,৭৫৩	৪·৮

৪.২১ **আমদানী শুল্ক :** এ পর্যন্ত কর রাজস্বের বৃহত্তম উৎস শুল্ক এবং আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে আমদানী শুল্ক। ১৯৭৯/৮০ সালে কর থেকে আয়ের ৪০ শতাংশ ছিল আমদানী শুল্ক। সত্যিকার অর্থে মোট পণ্য আমদানীর পরিমাণ কমলেও গোটা পরিকল্পনা মেয়াদে আমদানী শুল্ক থেকে রাজস্ব বার্ষিক ৩·৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে ধরা হয়েছে। খাদ্য ও সারের মত করারোপের অযোগ্য পণ্য আমদানীর হ্রাস এবং তুলনামূলকভাবে বেশী হারে করারোপযোগ্য পণ্য আমদানী বৃদ্ধি এর কারণ। করারোপযোগ্য পণ্য আমদানী বার্ষিক ৩·৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। করারোপযোগ্য আমদানী পণ্যের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়বে বলে মোট আমদানী কর কমে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। এর আরও একটি কারণ আমদানীতে অত্যন্ত বেশী করারোপযোগ্য বিলাস দ্রব্যের পরিমাণও কমে যাবে। অবশ্য জীবিকার্জনকারী (ওয়েজ আর্নার) স্কীমের আওতায় আমদানী এতে একটা প্রতিসাম্য বিধান করবে যদিও এই স্কীমের আওতায় কমবেশী প্রধানতঃ জরুরী পণ্য আমদানী করা হয়। পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত অতিরিক্ত করের প্রধান অবলম্বন হচ্ছে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন। ফলে ১৯৮৪/৮৫ সাল নাগাদ মোট করের শুল্কের আমদানী অংশ হ্রাস পাবে। স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মেটানো ও অভ্যন্তরীণ সম্পদের দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পনাকারে শিল্পপণ্য ও শিল্পের কাঁচামালের উপর করের হার যুক্তি সঙ্গত করতে হবে।

৪.২২ **আবগারী শুল্ক :** সিগারেট, পিওএল পণ্যাদি, প্রাকৃতিক গ্যাস, চিনি ও সিমেন্টর মত গুটি কয়েক কিছু নির্বাচিত পণ্য থেকেই প্রধানতঃ আবগারী শুল্ক আদায় হয়। প্রাথমিকভাবে সুনির্দ্দিষ্ট কর হিসাবে এ কর সংগৃহিত হয়। প্রশাসনিক সমস্যার কারণে মাঝারি ও ছোট আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো প্রধানতঃ আবগারী শুল্ক মুক্ত। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প খাতের বিকাশের উপর জোর দেওয়ায় এগুলিও শেষ পর্যন্ত শুল্ক মুক্ত

থাকতে পারবে না। কর কাঠামোর পরিসর প্রশস্ত করার সমস্যা হচ্ছে এই যে, তাতে কৃষি করের জন্য ব্যাপক আকারের কর প্রশাসন যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বর্তমান আবগারী শুল্ক সুনির্দিষ্ট হার নির্ভর যা মুদ্রাস্ফীতিজনিত পরিস্থিতির প্রতি তত সাড়া দিতে পারে না আর সেটাই হচ্ছে এর গুরুতর দুর্বলতা। মুদ্রাস্ফীতির ক্রমসম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে করের নির্ধারিত হার বৃদ্ধির ব্যবস্থা না হলে মুদ্রাস্ফীতির তুলনায় শুল্ক প্রকৃতপক্ষে কমে যাবে। এমনকি, সেক্ষেত্রে পণ্যের মূল্য অনুসারে কর ধার্য করা হয় এবং সরকার, সিগারেটের মত দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ করেন এবং ঐ মূল্য সমস্তরে পরিবর্তন করা হয় না সেক্ষেত্রেও নির্ধারিত শুল্ক হারের চেয়ে মূল্যানুযায়ী কর নির্ধারণের ব্যবস্থাটিও খুব একটা ভাল নয়। ক্রমবর্ধমান মূল্য স্তর ও একই কারণে সরকারের প্রকৃত সম্পদ হ্রাসের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়টি আরও বিবেচনা দাবি করবে। আবগারী শুল্কযোগ্য পণ্যের উৎপাদন সম্প্রসারণের কারণে বর্তমান হারে অবশ্য আবগারী শুল্ক খাতে আয় ১৯৭৯/৮০ সালের ২৯৪ কোটি টাকার তুলনায় ১৯৮৪/৮৫ সালে ২,০১৩ কোটি টাকায় উন্নীত হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে তবে এ কথা উল্লেখ করা দরকার যে, সার্বিক মূল্য স্তর বৃদ্ধির জন্য ২,১০৩ কোটি টাকায় ক্রয় মূল্য মাত্র ১,৪২০ কোটি টাকায় হ্রাস পাবে। এমনি করে, চলতি হারে আবগারী শুল্কের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলেও পরিবর্তনশীল মূল্য স্তরের সঙ্গে নির্ধারিত হারের সমাঞ্জস্যবিধান করা না হলে সার্বিক মূল্য স্তর বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে পরিকল্পনাকালে স্থির মূল্যানুযায়ী আবগারী শুল্ক খাতে আয় প্রকৃতপক্ষে হ্রাস পাবে। এ জন্যে হয় নির্ধারিত হারের পরিবর্তে মূল্যভিত্তিক হার অথবা মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে নির্ধারিত শুল্ক বৃদ্ধির মত ব্যবস্থার পক্ষে জোরালো কারণ রয়েছে।

৪·২৩ – **বিক্রয় কর** : বিক্রয় কর অংশতঃ আমদানী পণ্যের উপর আমদানী শুল্কের সঙ্গে এবং অংশতঃ অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের উপর আরোপ করা হয়। অবশ্য, আমদানী পণ্যের উপর বিক্রয় কর আরোপের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। ১৯৭৯/৮০ সালে আমদানীর ওপর বিক্রয় করের পরিমাণ ছিল ২৬০ কোটি টাকা অথচ মোট বিক্রয় করের পরিমাণ ২৮৪ কোটি টাকা। এ জন্য বিক্রয় করের ও আমদানী শুল্কের মত একই দুর্বলতা রয়েছে। অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও সার্ভিসের ওপর বিক্রয় করের সংশ্লিষ্ট স্তর কাঠামোর স্কীম ভিত্তির পরিচয় মেলে। এ ছাড়াও তুলনামূলক সুবিধে, উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থা প্রভৃতির বিকল্প কর ব্যবস্থা হিসেবে আবগারী শুল্কের সঙ্গে বিক্রয় করকে আরও যুক্তিসঙ্গত করা দরকার। ১৯৭৯/৮০ সালের হারে পরিকল্পনা মেয়াদে ১,৫১৫ কোটি টাকার বিক্রয় কর পাওয়া যাবে বলে ধরা হয়েছে। তবে কর প্রশাসন শক্তিশালী করা হলে এবং করহারে তদন্ত কমিশনের সুপারিশসমূহের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হলে এর পরিমাণ আরও বাড়ানো সম্ভব।

৪·২৪ **আয় কর** : দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আয়কর প্রাপ্তির পরিমাণ ১,০৪৬ কোটি টাকা ধরে করা হয়েছে। এটা পরিকল্পিত কর আয়ের শতকরা ১৪ ভাগ। ফলতঃ এই অংশে, কম থাকার দরুন সমতা নীতির সঙ্গে বিরোধ দেখা দেবে। অবশ্য এ কথাও মনে রাখা দরকার, অর্থনীতির-বৈশিষ্ট্যই এতে প্রতিফলিত যে অর্থনীতি পুনর্গঠণ পর্যায়ের কৃষি প্রধান, কৃষি খাত থেকেই আসে অর্ধেকেরও বেশী জাতীয় আয়। কিন্তু কর প্রশাসন যন্ত্রের পক্ষে কার্যকরভাবে কৃষি খাত পর্যন্ত পৌছানো শক্ত। কিন্তু উন্নয়ন দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল বিষয় বলে অভ্যন্তরীণ সম্পদের জরুরী চাহিদা মেটানোর জন্য কৃষি করারোপের ব্যাপারে আরও বেশী মনোনিবেশ করতে হবে। আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মধ্যে যে নিম্ন অনুপাত রয়েছে অংশতঃ সরকারী কর্মকর্তাদেরকে আয়কর ছাঁকে ছোনার জাল হিসেবে গণ্য করা হয় বলে। এই কর্মকর্তাদের ওপর যদি করারোপ করা হত তাহলে আজকের অনুপাতের চেয়ে প্রত্যক্ষ করের অংশ আরও বেশী হত। ঐ সব কর্মকর্তার বেতনের ওপর করারোপ করা হলে তাঁদের বেতনও সেভাবে বাড়িয়ে ধার্য করার প্রয়োজন দেখা দেবে ও তাতে একটা অন্তর্নিহিত মুদ্রাস্ফীতিমূলক প্রতিক্রিয়া হবে, কিন্তু

তা সত্ত্বেও বেতনভুক কর্মকর্তাগণ উৎপাদনমূলক ব্যবস্থাদির সুবিধে নেবে বলে ধরে নিলে বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের জন্য প্রদত্ত প্রণোদন সুবিধের ওপর কিছু কুপ্রভাবকর প্রতিক্রিয়া হবে বলে ধরা যায়। এজন্য অর্থনৈতিক কারণে করের সঙ্গে বেতনের সঙ্গতি বিধান করে সরকারী কর্মকর্তাদের বেতনের ওপর কর ধার্যের ক্ষেত্রে সতর্ক বিচার বিবেচনা প্রয়োজন।

৪·২৫ কর প্রশাসন: কর তদন্ত কমিশন কর প্রশাসনের প্রশ্নে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কমিশনের সুপারিশে সংখ্যাগত ও গুণগত উভয় দিক থেকেই জনশক্তি বৃদ্ধি, ভৌত সুযোগ সুবিধে ও সরবরাহমূলক সমর্থনের ব্যবস্থা এবং জনসংযোগের মধ্যে দিয়ে জনসাধারণের কর পূরণের নাগরিক দায়িত্ব সম্বন্ধে চেতনা সৃষ্টির মত কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ করা দরকার, উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক কাঠামোতেও পরিবর্তন আসবে। কাজেই কমিশন একান্ত যথার্থভাবেই কর পরিকল্পনা প্রণয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কমিশন এই একই উদ্দেশ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে একটি গবেষণা ইউনিট প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছেন। কমিশন জমি থেকে সরাসরি আয়ের ওপর জমির ভিত্তিতে পুনর্নিরূপণমূলক কার্যকর কৃষি কর প্রবর্তনের বিষয়ও সুপারিশ করেছেন। তবে কৃষি প্রাকৃতিক কারণে যেহেতু দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত জুড়ে বিস্তৃত, উল্লেখিত কর ব্যবস্থাপনার জন্য এক বিস্তৃত কর প্রশাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হবে। ঐ প্রশাসনের আয়কর প্রশাসনযন্ত্র কত খানি ব্যাপক হবে তা বর্তমানে জমির খাজনা আদায়ের জন্য যে সংগঠনের অস্তিত্ব রয়েছে তারই আলোকে স্থির করে নিতে হবে। অবশ্য, একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, আয়করকে আরও ব্যাপকভিত্তিক ও কৃষি করকে আরও কার্যকর করতে হলে এছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। তবে ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় যে এ ব্যবস্থা সর্বাঙ্গীনে সংকল্পবদ্ধ ও অত্যন্ত স্থির মস্তিষ্কে সুপরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। একই উদ্দেশ্য সাধনে কার্যকর একটি কর ব্যবস্থা গঠনের জন্য আগে একটি ভিত্তি তৈরী করা প্রয়োজন। সেটা হচ্ছে, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবগারী শুল্ক সংগ্রহ তৎপরতারও ব্যাপক বিস্তৃতি প্রয়োজন। এ জন্য প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে স্থানীয় স্তরগুলোতে কৃষিকর ও আবগারী শুল্ক প্রশাসন একই অফিস ভবনে থাকবে কি না সে বিষয়ে আশু সিদ্ধান্ত গ্রহণ একান্ত জরুরী। প্রসঙ্গতঃ একথা মনে রাখা দরকার, তামাক ও আখের মত অনেক ফসল রয়েছে যেগুলির ওপর ইতিমধ্যেই আবগারী শুল্ক ও মেস আরোপিত আছে। যদি মাত্র একটি সংগঠনের মাধ্যমে এই দু'টি কর প্রশাসনের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে উৎপাদন পর্যায়ে উল্লেখিত দুটি করের জন্য ভিত্তি প্রদানের মাধ্যমে তাৎপর্যপূর্ণ অর্থনৈতিক সাশ্রয় হতে পারে। এখানে বলা হচ্ছে, উন্নয়ন কৌশলের চাহিদার উপযোগী করে নতুন একটা কর প্রশাসন ব্যবস্থার জন্য সম্পূর্ণ এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গ্রামীণ উন্নয়ন ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্প ছড়িয়ে দেওয়ার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এজন্য উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কর কাঠামো নির্ধারণ করতে হলে, এক নতুন ধরনের কর সংগঠন গড়তে হবে। কর প্রশাসনের উন্নতি বলতে পদ্ধতি ও কার্যপ্রণালীর সরলীকরণ, কর হারের সঙ্গতিবিধানও অন্তর্ভুক্ত ইত্যাদি পর্যবেক্ষণকেও বুঝায়।

৪·২৬ রাজস্ব ব্যয়: আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৭০ এর দশকে সরকারের রাজস্ব ব্যয় (সরকারী ভোগ) বেশ তাড়া খেতে যায়। এই হার স্বাভাবিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি হারের চেয়েও দ্রুত এবং রাজস্ব বৃদ্ধির কাছাকাছি। সম্প্রসারিত উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পদ সংকটের ক্রমবর্ধমান প্রকট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাড়তি সম্পদ সংগ্রহ তৎপরতার সঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব ব্যয় রোধ করা প্রয়োজন যাতে উন্নয়ন ব্যয় নির্বাহের জন্য বর্ধিত পরিমাণে কর রাজস্ব পাওয়া যায়। ১৯৭০ এর দশকে একটি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধিতে অনিবার্য ঊর্ধ্ব গতির ফলে, স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেয়া যায় যে, অতীতের চেয়ে দ্বিতীয় পরিকল্পনা মেয়াদে রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির গতি অপেক্ষাকৃত কম হবে।

সরকারী যন্ত্রের অতিরিক্ত সম্প্রসারণ কিংবা আমলাতন্ত্রের পরিসরবৃদ্ধির বিষয়টিকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে যাচাই করে দেখতে হবে এবং সেই সঙ্গে বর্তমানে যে পদ্ধতি ও কর্মচারী রয়েছে সেগুলির দক্ষতাবৃদ্ধির দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করতে হবে। এ জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে যে, উন্নয়ন চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সঞ্চয় যাতে বৃদ্ধি পায় সেজন্য ৫·৪ শতাংশ হারে প্রকৃতি সাবিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা রয়েছে তার প্রেক্ষিতে বার্ষিক রাজস্ব ব্যয়ের হার বার্ষিক ৪·২ শতাংশের বেশী বাড়লে চলবে না। রাজস্ব ব্যয় ৪·২ শতাংশ বৃদ্ধির অর্থ ১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে ১,২৩৬ কোটি টাকার রাজস্ব ব্যয়ের তুলনায় ১৯৮৪/৮৫ সালের রাজস্ব ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে ১,৫১৮ কোটি টাকা। পরিকল্পনাকালে মোট চলতি ব্যয় ১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে ৭,২০২ কোটি টাকা এবং চলতি মূল্যে ১০,২৭৮ কোটি টাকায় দাঁড়াবে। ১৯৮২/৮৩ সাল পর্যন্ত চলতি মূল্য অনুসারে মোট রাজস্ব ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৫,৩৩৫ কোটি টাকা। যে ব্যয় স্তরের প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে নির্ধারিত জনগোষ্ঠী ছাড়া আর সকলের ক্ষেত্রে খাদ্য ভর্তুকি তুলে নেয়া হবে বলে ধরা হয়েছে এবং মুদ্রাস্ফীতি জনিত প্রয়োজন সরকারী কর্মচারীদের বেতনে সামঞ্জস্য বিধানের ব্যবস্থা রয়েছে। পরিকল্পনাকালে মোট রাজস্ব আয় ১০,০৪০ কোটি টাকা, চলতি ব্যয় ৭,২০২ কোটি টাকা এবং মোট রাজস্ব উদ্বৃত্ত ২,৮৩৮ কোটি টাকা বলে হিসেব করা হয়েছে। প্রথম তিন বছরে (১৯৮০/৮৩) রাজস্ব উদ্বৃত্ত ১৯৭৯/৮০ মূল্যে ১,৮৮৬ কোটি টাকা এবং চলতি মূল্যে ২,২৯৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

বাড়তি সম্পদ সংগ্রহ

৪·২৭ **কর ব্যবস্থা:** পরিকল্পিত সাবিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার ৫·৪ শতাংশ। এর তুলনায় সাবেকী ৪·৭ এ প্রদর্শিত প্রচলিত করের ভিত্তিতে পরিকল্পিত কর প্রাপ্তি ৪·৮ শতাংশ হারে বাড়বে। এর অর্থ, মূল্যের সঙ্গে সঙ্গে আবগারী হার পরিবর্তিত হলেও, যদি বাড়তি কোন কর বসানোর ব্যবস্থা না নেয়া হয় তাহলে কর/সাবিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অনুপাত পরিকল্পনা মেয়াদে ১৯৭৯/৮০ সালের ৭·৯ শতাংশ থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৭·৫ শতাংশে কমে যাবে। এর প্রধান কারণ সাবিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের একটা মোটা অংশ কৃষি খাত থেকে আসবে বলে পরিকল্পনা করা হলেও এইখাতে করারোপ অত্যন্ত লঘু বলা চলে। এ বিষয়টি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই হ্রাস প্রাপ্তি রোধের জন্য পরিকল্পনাকালে বাড়তি করের ব্যবস্থা নেয়া হবে। প্রকৃত ভিত্তিতে ১৯৭৯/৮০ সালের কর/সাবিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অনুপাত রক্ষা করতে হলে অতিরিক্ত কর হিসাবে ৩০৭ কোটি টাকা উঠাতে হবে। এ খাতে পরিকল্পনায় প্রারম্ভিক স্তরে আবগারী শুল্কের প্রকৃত মূল্য রক্ষার জন্য ৫৯৩ কোটি টাকাসহ প্রকৃতমূল্যে ১,২১৫ কোটি টাকার বাড়তি করের প্রস্তাব রয়েছে। সরকারী খাতের সম্পদ চাহিদা মেটানোর জন্য পরিকল্পনায় ধরে নেয়া হয়েছে ১,২১৫ কোটি টাকার অতিরিক্ত কর রাজস্ব ও ১৫২ কোটি টাকার অতিরিক্ত কর বহির্ভূত রাজস্ব নতুন রাজস্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে সংগৃহিত হবে। ১,২১৫ কোটি টাকার মধ্যে ৮৮১ কোটি টাকা পরিকল্পনার প্রথম তিন বছরে গৃহীত ব্যবস্থাদি থেকে পাওয়া যাবে বলে ধরা হয়েছে। অতিরিক্ত কর পার্থের যে প্রস্তাব করা হয়েছে তার ফলে ১৯৮৪/৮৫ সালে কর সাবিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অনুপাত ৮·৫ শতাংশে উন্নীত হবে। এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে, কেবল মাত্র নতুন করারোপ ব্যবস্থা কিংবা কর বহির্ভূত আয়ের উপরে নয় বরং ঐ কর প্রশাসনের কার্যকারিতার উপর এর সাফল্য নির্ভর করবে। অভ্যন্তরীণ খাতে করের যথেষ্ট সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র রয়েছে যেগুলি কাজে লাগানো যায়। কর সাবিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের নিম্ন অনুপাত (৭·৯ শতাংশ) অনুরূপ সম্ভাবনারই ইঙ্গিত দেয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কৃষি আয় এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরণের শিল্পের আয়ে আজ পর্যন্ত তেমন কর ধরাই হয়নি বলা চলে।

৪·২৮ অভ্যন্তরীণ খাতের প্রশ্নে বর্তমান কর ব্যবস্থার অন্যতম বড় ত্রুটি হচ্ছে এই যে, এই কর ব্যবস্থা সাম্প্রতিককালে এই খাতে করারোপযোগ্য সামর্থ্য বৃদ্ধি পেলেও কৃষিকে প্রত্যক্ষ কর থেকে কার্যতঃ অব্যাহতি দিয়েছে। ১৯৭৬ সালে কৃষি আয়করকে সাধারণ আয়করের সঙ্গে একীভূত করা হয়। তবু তাতে অবস্থার তেমন কোন হেরফের ঘটেনি। কর প্রশাসনজনিত সমস্যার কারণেই তা হয়নি। একই বছর ভূমি রাজস্বে সংশোধনের ফলশ্রুতিতে ভূমি উন্নয়ন কর প্রবর্তিত হয়। সেটিও কৃষিখাতে কার্যকর করের বিকল্প হয়ে উঠতে পারেনি। কৃষি আয়ের ওপর করারোপ ব্যাপারে সকল সম্ভাবনা সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করার পর কর তদন্ত কমিশন (১৯৭৯) সম্ভাবনাময় কৃষি আয়ের ওপর ক্রমান্বিত ভূমি কর প্রবর্তনের সুপারিশ করে। বর্তমানকালের তুলনায় কর ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল ও ন্যায় সঙ্গত করে তোলার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বর্ধিষ্ণু আয়ের কিছুটা বেশী অনুপাতের অংশ সংগ্রহের লক্ষ্যে কর তদন্ত কমিশনের সুপারিশ অনুসারে কৃষি আয়ের ওপর একটা বিস্তৃত পরিসরে কর ধার্য করার প্রয়োজন হবে।

৪·২৯ উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলি, আমদানীর ওপর করের নির্ভরশীলতা হেতু রাজস্ব সংগ্রহে অস্থিতিশীলতা ও অনিশ্চয়তার উৎস তার ওপর অতি নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনবে। তাই ভবিষ্যতে অভ্যন্তরীণ আয় উৎপাদনের ওপর আরো বেশী করে নির্ভরশীলতা আরোপ বাঞ্ছনীয়। আবগারী শুল্ক ও বিক্রয়কর আরোপযোগ্য বহু সংখ্যক সামগ্রীর ক্ষেত্রে কর অব্যাহতির কারণে অভ্যন্তরীণ পণ্যের ওপর করের বিস্তৃতি বিশেষভাবে সংকীর্ণ। অর্থনৈতিক উদ্দীপনা সৃষ্টি বা সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠা যাই হোক এদুয়ের কোনটির ভিত্তিতেই অনেক পণ্যের ক্ষেত্রেই এই কর অব্যাহতি কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ নেই। সুনির্বাচিতভাবে করের হার বাড়িয়ে যেসব ক্ষেত্রে কর অব্যাহতি আর রাখার প্রয়োজন নেই সেগুলি প্রত্যাহার করে কিংবা তার পরিমাণ হ্রাস করে এবং নতুন নতুন কর প্রবর্তন করে আবগারী কর রাজস্বের পরিমাণ যথেষ্ট বাড়ানো যায়। মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের কোন লক্ষণ নেই। এমতাবস্থায়, নির্ধারিত হারের করের পরিবর্তে মূল্যানুযায়ী কর হার প্রবর্তনের বিষয় জরুরী ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে। ছোট ও মাঝারি শিল্পের ওপর আরও অনেক বেশী শুল্ক আরোপের কারণ ধরেই নিতে হবে যে আবগারী শুল্ক প্রশাসন ক্রমশঃ শক্ত ব্যাপার হয়ে উঠবে যে পরিকল্পনায় অর্থযোগানোর জন্য যদি পর্যাপ্ত সম্পদের ব্যবস্থা করতেই হয় তাহলে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হবে এবং আগের আলোচনা অনুসারে কর প্রশাসনের উন্নতি সাধন করতে হবে।

৪·৩০ বেসরকারী সঞ্চয় ও বিনিয়োগ এবং বেসরকারী উদ্যোগে কাজে উৎসাহ সৃষ্টি, সুষম আঞ্চলিক উন্নয়ন ও সামাজিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্য সাধনে বর্তমান কর ব্যবস্থার অতিরিক্ত পরিমাণ অব্যাহতি, বিয়োজন ও রেয়াতের ব্যবস্থা রয়েছে। এ সবে মিলে করের কার্যকর হারকে অনেকটাই হালকা করে তোলে, ফলে কর/সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অনুপাত নেমে যায়। সম্পদের নিদারুণ সংকটের মুখে আর্থ সামাজিক বাধ্যবাধকতাসমূহের আলোকে এইসব রেয়াতি সুপার্কে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে যে, ইপ্সিত উদ্দেশ্যাবলী সাধনে এগুলির অবদান কতটুকু। লঘু কর ভারের আরেকটি এলাকা হিসেবে শহরের সম্পত্তির কথা বলা যায়। গত এক দশকের মুদ্রাস্ফীতিতে সবচেয়ে বেশী লাভবান হয়েছে শহরের সম্পত্তি। ১৯৭৪/৭৫ সালে বাড়ী ভাড়া কর ধার্য করা হয়েছিল, কিন্তু পরে প্রত্যাহার করা হয়। উত্তুঙ্গ হয়ে ওঠা সংকটের চাপের মুখে এই কর পুনঃ বিবেচিত হবার দাবী রাখে। পরিকল্পনায় এই বিষয়টির ওপর না গুরুত্ব দিয়ে উপায় থাকে না যদিও রাজস্বনীতি কেবলমাত্র রাজস্বের স্বার্থে অনুসৃত হতে হবে এমন নয়। আবার কোন একটা রাজস্বগত রেয়াতের একমাত্র উদ্দেশ্য অ-রাজস্বগত লক্ষ অর্জনই নয় কিংবা রাজস্বগত উদ্দেশ্য অনুসরণ অ-রাজস্বগত উদ্দেশ্য অর্জন থেকে বঞ্চিত তাও শুধু নয় বরং এ বিষয়টি উপলব্ধি করা হবে যে রাজস্ব খাত ছাড়া হচ্ছে তা অ-রাজস্ব উদ্দেশ্য অর্জনেও কোন সাহায্য করে না এ কথাও উপলব্ধিতে ঠাঁই দেয়া।

৪·৩১ **কর বহির্ভূত ব্যবস্থাদি :** নতুন ব্যবস্থাদি ছাড়াও, সম্পদসমূহের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্যও প্রয়াসের প্রয়োজন হবে। এই লক্ষ্য অর্জনে সরকারী খাতের সংস্থাও প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের মূলধনের একটা ন্যূনতম আয় প্রদান করার জন্য বলা হবে। কর্পোরেশনগুলির অন্য প্রতিষ্ঠানগুলির সুদক্ষ পরিচালনার একটা মনোভাব গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি সংস্থার মুনাফার ধ্রুপদী যাত্রিক হার নির্ধারণ করে দেয়া প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানগুলিকে পর্যাপ্ত মূলধন কাঠামো ক্রয় ও বিক্রয় নীতি: ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত স্বায়ত্তশাসন এবং মূল্য নির্ধারণ ও শ্রম ব্যবস্থাপনায় স্বাধীনতা দিতে হবে। যে প্রতিষ্ঠানগুলির মুনাফা করার সম্ভাবনা ক্ষীণ সেগুলি থেকে মূলধন প্রত্যাহার করে নিতে হবে। আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কয়েকটি কর্পোরেশনের যা অধিক পরিস্থিতি তাতে সেগুলির জাতীয় সামগ্রিক উন্নয়ন প্রয়াসে অবদান যোগাতে হলে অনেকটা পথ এখনও পেরোতে হবে।

৪·৩২ সরকারী উপযোগ প্রতিষ্ঠানগুলোর পুঁজি বিনিয়োগ থেকে সন্তোষজনক হারে আয় প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে কার্যকর ও সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এগুলির মধ্যে থাকবে ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক দক্ষতাবৃদ্ধি, আরও বেশী করে উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার। উৎপাদনের পরিকল্পনা, উপকরণ কেনার পর্যায়ক্রমিক পরিকল্পনা, আলস্য ও অপচয় রোধ এবং যন্ত্রপাতি ও সাজ সরঞ্জামের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবর্তনের মাধ্যমে কারখানার দক্ষতাবৃদ্ধির ব্যবস্থাদি। শুধু মাত্র অতিমাত্রায় লোকসানদায়কারী বলেই না বরং সেগুলির অযোগ্যতা ও ব্যয়বাহুল্য শিল্প ও অন্যান্য খাতের দক্ষতা হ্রাস করে বলেও বিদ্যুৎ ও পরিবহণ খাতের পরিচালনায় বিশেষ মনোনিবেশের একান্ত প্রয়োজন।

ব্যাংক ঋণ :

৪·৩৩ পরিকল্পনায় স্থির রয়েছে যে, সরকার খাদ্য মজুতের অর্থযোগানের জন্য ঋণ গ্রহণ করবেন। এই ধরণের ঋণ গ্রহণের কোন রকম মুদ্রাস্ফীতির ঝুঁকি থাকবে না। কারণ এই ঋণ তখনই নেয়া হবে যখন ভাল ফসলের জন্য বাজারে বড় রকমের উদ্বৃত্ত থাকে। তাছাড়া, এ ধরনের ঋণ গ্রহণের ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদনে উৎসাহমূলক মূল্য বজায় রাখার একটা শুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। পরিকল্পনার জন্য ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে অর্থ সংস্থানের বিষয়টি নিজে নিজেই মুদ্রাস্ফীতি ঘটায় না যদি পাশাপাশি বেসরকারী পর্যায়ে সঞ্চয় নিশ্চিত করা যায় পক্ষান্তরে বিরাট অ-আর্থিক খাতকে বিপনন প্রক্রিয়ার মধ্যে আনার জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার ঋণ দানের পরিসরের বিস্তৃতি আর্থিক সম্পদের চাহিদা মেটানোর জন্য সরকারী ঋণ গ্রহণ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে। যদি ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাহায্যে নিপুণ দক্ষতার সংগে খাদ্য সংগ্রহ অভিযান জনিত কারণে পল্লী খাতে অর্জিত অতিরিক্ত আয় সংগ্রহ করা সম্ভব হয় তাহলে অর্থ ও ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণের প্রতিক্রিয়াটি ভাল ফসলের সংগে সঙ্গতিক্রমে সুচারুভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

২। বেসরকারী সঞ্চয় সংগ্রহ :

আর্থিক ও ঋণ নীতি :

৪·৩৪ বিশাল আর্থিক সম্প্রসারণ ১৯৭০ এর দশকের সবচেয়ে বেশী স্থিতিশীলতা ক্ষুণ্নকারী বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম। সামান্য মুদ্রা সরবরাহ (প্রচারিত কাগজী নোট চলতি আমানতসহ) ১৯৭৩ সালের জুন মাসের ৬৯৬ কোটি টাকা থেকে ১৯৮০ সালের জুন মাসে ১,৬৯৮ কোটি টাকা অর্থাৎ দ্বিগুণেরও বেশী হয়ে যায়। এর ফলে একই মেয়াদে বার্ষিক বার্ষিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ৫·৮ শতাংশের তুলনায় বার্ষিক ১৩·৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। অর্থের সঙ্গে সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অনুপাত (১৯৭২/৭৩ সালের মূল্যে) ১৯৭৩ সালের ১৫·৪ শতাংশ থেকে ১৯৮০ সালের জুন মাসে ২৪·৫ শতাংশ হয়।

৪·৩৫ দেশের অভ্যন্তরে মুদ্রার সরবরাহ সম্প্রসারণ, বিশ্বে অব্যাহত মুদ্রাস্ফীতি ও সেই সঙ্গে বন ঘন ফসলহানি পরিকল্পিত উন্নয়নের অন্যতম মূল শর্ত অর্থাৎ মূল্যের স্থিতিশীলতা লঙ্ঘিত হয়। কোন উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে কাঠামোগত অনমনীয়তা ও বৈদেশিক সহায়তার উপর অত্যন্ত বেশী রকম নির্ভরশীলতা থাকলে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থ সরবরাহ নীতি এবং উৎপাদনের খাতগুলিতে আর্থিক নীতির মূল দর্শন হওয়া উচিত। এজন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আর্থিক নীতির লক্ষ্য একটা নিরাপদ চৌহদ্দির মধ্যে নগদ অর্থ সরবরাহ সম্প্রসারণ নিশ্চিত করা, অর্থাৎ সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি প্রাণধারণ ভিত্তিক অর্থনীতি খাতে মুদ্রা রূপান্তরের হার এবং দুষ্প্রাপ্যতার চেয়ে প্রকৃত উৎস ব্যয় (true resource cost) প্রতিফলিত করে এমন প্রয়োজনীয় স্তরে পণ্য ও সার্ভিসের মূল্য বৃদ্ধির অপরিহার্য সীমা যাতে ঐ মুদ্রা সরবরাহ অতিক্রম না করে তা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। পরিকল্পনা মেয়াদে ঠিক কি পরিমাণে মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে তার পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব নয়, কারণ আমদানী মূল্য এবং ফসল উৎপাদনের জন্য আবহাওয়ার মত বিবেচ্য বিষয়গুলি অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণের আওতার বাইরে। তবে মুদ্রাস্ফীতির হার নিম্নতম পর্যায়ে রাখার জন্য অধিকতর সরবরাহ ও উৎপাদনশীলতা এবং ঋণ ও বাজেট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চেষ্টা করা হবে।

৪·৩৬ উৎপাদন পরিকল্পনার ফলশ্রুতিতে অর্থনীতির মুদ্রায়ন হার দ্বিতীয় পরিকল্পনা মেয়াদে বাড়বে। সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে কৃষি খাতের অংশ ৫১ শতাংশে অপরিবর্তিত থাকলেও খাদ্যসহ কৃষি খাত ক্রমবর্ধমান হারে বাণিজ্যিক ভিত্তিক হয়ে উঠবে। ফলে বাজারে আরও বেশী পরিমাণে কৃষি উদ্বৃত্ত পাওয়া যাবে। এছাড়া কৃষি প্রসম্ভার কর্মসূচীও কৃষিখাতকে আরও বাণিজ্যিক লেনদেন ভিত্তিক করে তুলবে। এ সব কারণে পরিকল্পনাকালে সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি হারের চেয়েও নগদ অর্থ সরবরাহের চাহিদা দ্রুত হারে বাড়বে। এই বৃদ্ধির পরিমাণ ১৯৭৯/৮০ সালের ৩,৪৩১ কোটি টাকা থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৬,৫১৭ কোটি টাকা হবে বলে হিসেব করা হয়েছে। নিম্ন সারণীতে পরিকল্পনা মেয়াদে মুদ্রা সরবরাহ ও নগদের সম্ভাব্য সম্প্রসারণের নির্দেশনা পাওয়া যাবে।

সারণী ৪·৫

মুদ্রা সরবরাহ ও নগদ সম্প্রসারন

[কোটি টাকায়]

বিষয়	১৯৭৯/৮০	১৯৮৪/৮৫	পরিবর্তন
(১) মুদ্রা সরবরাহ	১,৬৯৯	৩,৩১৩	১,৬১৪
চলতি নোট	৭২০	১,৪৩২	৭১২
চলতি আমানত	৯৭৮	১,৮৮১	৯০৩
(২) মেয়াদী আমানত	১,৭৩২	৩,২০৪	১,৪৭২
(৩) নগদ তারতম্য (১+২)	৩,৪৩১	৬,৫১৭	৩,০৮৬

৪·৩৭ ঋণ চাহিদার পরিকল্পিত যে হিসেব দেখানো হয়েছে তাতে ধরে নেয়া হয়েছে যে, রাজস্ব তৎপরতা অক্ষুন্ন থাকবে এবং চাষীদের মূল্য সহর্থনের জন্য খাদ্যশস্য ক্রয়ের মত ব্যতিক্রম ক্ষেত্র ছাড়া সরকারী খাতের জন্য ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে না। কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতে আরোপিত গুরুত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে

গ্রামীণ খাতে ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে। খাদ্যশস্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে আধুনিক উপকরণ ব্যবহার ছাড়াও পরিকল্পনা আমলে অকৃষি তৎপরতার যথেষ্ট প্রসারেরও ব্যবস্থা রয়েছে। ক্ষুদ্র চাষী, বর্গাচাষী ও গ্রামীণ শিল্পগুলির জন্য পর্যাপ্ত ঋণ নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া, বিনিয়োগ ঋণেরও প্রয়োজন হবে যা ব্যাংকগুলি সরবরাহ করবে। যেমন বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থার জন্য ঋণপত্রের মাধ্যমে অর্থযোগান দেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি, বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রমের এলাকের ঋণপত্র মারফত অর্থযোগাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি এবং জাতীয় সমবায় ব্যাংককে ঋণ প্রদান করবে বাংলাদেশ ব্যাংক।

৪'৩৮ অধিকতর উৎপাদনশীল খাতে ঋণ প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পনাকালে ঋণের সম্প্রসারণের বিষয়টিকে প্রয়োজনীয় শৃংখলা বিধান সাপেক্ষ করতে হবে; এটা করতে হবে, নির্বাচন-মূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে। সরকারী খাতে সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে এবং যেহেতু সরকারী খাত প্রায় ক্ষেত্রেই ব্যাংকগুলির ঋণদান প্রক্রিয়ায় গতি সঞ্চারকের ভূমিকা পালন করে যেহেতু ব্যাংক-গুলিকে পরিকল্পনাকালে অর্থনীতির ঋণ চাহিদা মেটানোর জন্য স্বীয় সম্পদের উৎসভিত্তি গড়ে তোলার ব্যাপারে বেসরকারী সঞ্চয়ের ওপরই বেশী নির্ভরশীল হতে হবে।

৪'৩৯ **সুদের হার নীতি :** অতীতে সুদের সত্যিকার নিম্নহারের দরুণ বেসরকারী সঞ্চয় নিরুৎসাহিত হয় এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির তৎপরতাও অনেকটা বিপর্যস্ত হয়। অন্যদিকে আবার যাও বা সঞ্চয় হয় সেগুলিও অনুৎপাদনশীল বিনিয়োগ যেমন, ভূসম্পত্তি, ফটকাবাজিমূলক ব্যবসায়, মজুতদারী ও স্বর্ণ ক্রয়ে নিয়োজিত হয়। হিসেবে দেখা যায় যে, মেয়াদী আমানত থেকে আসের প্রকৃত হার ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৯ সালের মধ্যে ৫'৩ শতাংশ থেকে কমে ৫'১ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। ব্যাপক পরিসরে আমানতের সুদের হারে বৃদ্ধি ঘটলেও সঞ্চয় কিন্তু সুদের হারে অনুপাতে স্থিতিস্থাপক। এ জন্য প্রচুর পরিমাণে সঞ্চয় গড়ে তুলতে হলে সুদের হারও বেশী করতে হবে। একটি ইতিবাচক সুদের হারের আওতায় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিতেও অন্যান্য মাধ্যমিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আমানতে প্রদত্ত সুদের হার যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াতে হবে। এতে সঞ্চয় উৎসাহিত হবে এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি বেশ তাৎপর্য-পূর্ণ পরিমাণ বেসরকারী সঞ্চয় আহরণ কার্যক্রমের আওতায় আরও উৎপাদনমূলক ও জরুরী কাজে নিয়োজিত করার সহায়তা প্রদান করতে পারবে।

৪'৪০ সক্রিয় সুদহার নীতি স্বল্প-মেয়াদী ঋণের জন্য হত বর্ধমান চাহিদা এবং সম্প্রসারণশীল অর্থনীতিতে ব্যাংকগুলির জন্য সম্পদের ব্যাপকতর ভিত্তির প্রয়োজন মেটাবে। নোটের বদলে আমানতে মনোনিবেশের ফলে একদিকে তা কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের ওপর বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে অন্যদিকে, আর্থিক নীতির আওতায় গৃহীত ব্যবস্থাদির প্রয়োগ ক্ষেত্রেও ঐসব ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে। অর্থনীতিতে নোটের অনুপাত হ্রাসের ফলে মুদ্রার গুণক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং তাতে সেই অনুপাতে রিজার্ভ মুদ্রার চাহিদাও বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে তফসিলী ব্যাংকগুলোর ঋণ গ্রহণের বাধ্যবাধকতা হ্রাস পাবে।

৪'৪১ আমানতের সুদের হারের মত ঋণের জন্য প্রযোজ্য সুদের হারও মুদ্রাস্ফীতির হারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। প্রকৃত পক্ষে ঋণের জন্য সুদের বিভিন্ন হারগুলি মুদ্রাবাজারের হারের চেয়ে অনেক কম হওয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের ওপর চাহিদার চাপ অতিরিক্ত মাত্রায় বেড়েছে। এ ধরণের সুলভ মুদ্রানীতি শুধু মুদ্রাস্ফীতিরই সহায়ক নয় বরং এ থেকে উৎপাদনও হয় তুলনামূলকভাবে কম, কারণ এর দরুন সম্পদের সুষ্ঠু বরাদ্দ ক্ষুন্ন হয়। ব্যাংকের টাকার অধিক ঝুঁকিপ্রবণতার জন্য ব্যবহারের পরিবর্তে ঋণের তুলনামূলক কম হার ঋণ গ্রাহককে তুলনামূলকভাবে কম লাভজনক কাজে এ ঋণ

ব্যবহারে উৎসাহিত করে। এতে দেখা যায় চলতি ভোগে অবকাশমূলক ব্যয় প্রতিফলিত না হওয়ায় একদিকে সঞ্চয় নিরুৎসাহিত হয় অন্যদিকে, সবচেয়ে উৎপাদনশীল কাজে সঞ্চয়ের ব্যবহার বিঘ্নিত হয়। এ জন্য আমানত ও ঋণ উভয়ের সুদের হার বাড়ানো প্রয়োজন। মূলধনের প্রকৃত মূল্য জ্ঞাপক ইতিবাচক সুদহার নীতি ঋণ গ্রহণকারীকে তাদের মূলধন আরও দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগাবার ব্যাপারেও প্রেরণা যোগাবে। ঋণের সুদের উঁচু হার শ্রমভিত্তিক কাজে উৎসাহ যোগাবে যা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান উন্নয়ন কৌশল কারণ এতে মূলধনের প্রধান প্রযুক্তিকে সঞ্চয়ের পুরো-মূল্য বহনে বাধ্য করবে।

৪·৪২ আমানত ও ঋণের চলতি সুদের হারের ব্যাপারে শুধুমাত্র কালেভদ্রে একবার উর্ধমুখী বিন্যাস করে ছেড়ে দিলেই চলবে না। সুদ হার নীতিকে নমনীয় হতে হবে যাতে মুদ্রাস্ফীতির হার ও ব্যবসায় পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যায়। সুদ হার কাঠামোর সংস্কারে প্রগতানী; গ্রামীণ শিল্প, কৃষি ও স্বনিয়োজিত ব্যক্তিদের মত বাঞ্ছিত খাতকে অগ্রাধিকার দানের মাধ্যমে সামাজিক অগ্রাধিকারগুলির প্রতি স্বীকৃতির নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

বেসরকারী সঞ্চয়

৪·৪৩ পরিকল্পনায় বেসরকারী সঞ্চয়ের হিসেব ৬,২৩৪ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। সরকারী সঞ্চয় ও বিদেশী মূলধন প্রবাহের ভিত্তিতে বিনিয়োগগত ব্যবধানের অবশেষ হিসাবে বেসরকারী সঞ্চয়ের পরিমাণ হিসেব করা হয়েছে। বেসরকারী ও সরকারী সঞ্চয় একত্রে ১৯৭৯/৮০ সালের ৪·৫ শতাংশের তুলনায় ১৯৮৪/৮৫ সালের স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৮ শতাংশ হবে। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার দেখা যায় সঞ্চয়ের এই লক্ষ্যমাত্রা হার অর্জন কঠিন হবে না। অবশ্য এর বাস্তবায়ন একটা ইতিবাচক সুদ হারনীতি অনুসরণ, ফাটকাবাজী নোট সংগ্রহের জন্য অধিকতর প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াস, উৎপাদনশীল বিনিয়োগের জন্য সুযোগ বৃদ্ধি এবং সামগ্রিক বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নতির ওপর নির্ভর করবে। ব্যাংক আমানত ছাড়াও কোম্পানীর ঋণপত্র, শেয়ার, স্টক, বণ্ড, সঞ্চয়পত্র, বীমাপত্র ইত্যাদি আর্থিক সম্পদ অর্জনের সম্ভাবনাও সম্প্রসারিত করা দরকার। তবে আশা করা হচ্ছে, পরিকল্পনা মেয়াদে বেশ বড় রকম বেসরকারী সঞ্চয় হবে মেয়াদী আমানতের আকারে। এর পরিমাণ ১,৫৯২ কোটি টাকা হবে বলে ধরা হয়েছে। আর্থিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের বৃদ্ধির একটা তাৎপর্যপূর্ণ অংশ পাওয়া যাবে পল্লী খাতে যেখানে ব্যাংকিং এর সুযোগ সুবিধে পুরোপুরি বিকশিত হয়নি। তাছাড়া জনসাধারণের ব্যাংকে সঞ্চয়ের অভ্যাসও এখনও গড়ে ওঠেনি। তাই ব্যাংকিং ব্যবস্থা পল্লী এলাকায় কীভাবে গড়ে ওঠে তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করবে।

৪·৪৪ বেসরকারী সঞ্চয় গড়ে তোলার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে শাখা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চয়ে অভ্যাস গড়ার জন্য উৎসাহ দানমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে; বিশেষ সঞ্চয় স্কীমের প্রবর্তন ও গ্রাহকসেবার উন্নতি বিধান করতে হবে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ছাড়া ছোট খাট পর্যায়ে বেসরকারী সঞ্চয় সংগ্রহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান জীবনবীমা পত্র। জীবনবীমা কর্পোরেশন ও অন্যান্য মাধ্যমিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের তৎপরতা অবশ্যই বহুমুখী করে তুলতে হবে এবং বেসরকারী সঞ্চয় আকর্ষণ করার গতিশীলতা দেখাতে হবে। বিশেষ করে বহুরকমের সঞ্চয় ও বীমা পরিকল্পনার মাধ্যমে তা করতে হবে। গ্রাহকদের চাহিদা আরও ভালভাবে পূরণের জন্য মিউচুয়াল ফাণ্ড, বিনিয়োগ ট্রাস্ট প্রভৃতির মত নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। স্টক এক্সচেঞ্জকে যদিও আবার সক্রিয় করে তোলা হয়েছে তা সঞ্চয় গড়ে তোলার বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা এখনও তাৎপর্যপূর্ণ নয়। এর প্রধান কারণ সংস্থা বা যৌথমূলধনী খাতের আকার এখনও ছোট। শেয়ার বাজারে গতিশীলতা নেই। তাছাড়া, আরও স্থিতিপত্রের মত পরিচালনাগত ফলাফলের তথ্যাদি

অনুপস্থিত। বেসরকারী খাত স্বয়ং নিজেকে কীভাবে সংগঠিত করে তোলে মূলতঃ তারও পরেই স্টক এক্সচেঞ্জের ভূমিকা নির্ভরশীল। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো প্রাথমিকভাবে পারিবারিক প্রতিষ্ঠান। এগুলি ব্যক্তিমালিকানা, অংশীদারী ও প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী আকারে গড়ে উঠেছে। বেসরকারী কোম্পানীগুলো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তরিত হয়ে জনসাধারণের তাতে শেয়ারগ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত না করা পর্যন্ত সঞ্চয় সমাবেশকারক হিসেবে স্টক এক্সচেঞ্জের ভূমিকা সীমিত থেকে যাবে। এজন্য পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর প্রসারের জন্য রাজস্বগত উৎসাহ প্রয়োজন। বিভিন্ন মাত্রার ঝুঁকির শেয়ারসহ দীর্ঘ মেয়াদী সরকারের নানা মাধ্যম প্রবর্তন করা হলে পারিবারিক ভিত্তিতে ও সঞ্চয় প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষ থেকে বিনিয়োগের সুযোগ বাড়বে। এক্ষেত্রে সরকার কয়েকটি বিদেশী কোম্পানীতে বিনিয়োজিত কিছু শেয়ার থেকে মুনাফা প্রত্যাহার করে ইতিমধ্যেই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এই শেয়ারগুলি ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ কর্তৃক ইতিমধ্যে আণ্ডাররাইট করা এবং আরও কিছু অন্য শেয়ারের মিলিত অর্থ মিউচুয়াল ফাণ্ড প্রবর্তনের জন্য প্রাথমিক তহবিল যোগাবে। বিনিয়োগকারীদের তরফ থেকে সাড়া পেলে বিদেশী কোম্পানীগুলিতে আরও সরকারী শেয়ার মিউচুয়াল ফাণ্ডের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা যায়। সরকার আইডিবির ইউনিট সার্টিফিকেট ইস্যু অথবা মিউচুয়াল ফাণ্ডের মাধ্যমে সরকারী খাতের কয়েকটি সংস্থার সংখ্যালঘিষ্ঠ শেয়ার থেকে মূলধন প্রত্যাহারের কথাও বিবেচনা করতে পারেন। আইসিবি সম্প্রতি ৫০ লাখ টাকার তহবিল নিয়ে মিউচুয়াল ফাণ্ড প্রবর্তন করেছেন।

৪.৪৫ এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ সঞ্চয় ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের সঞ্চয় সংগ্রহের ওপর বিশেষ জোর দিতে হবে। অধিকতর উন্নয়ন ব্যয়, কৃষি পণ্যের আরও লাভজনক মূল্য এবং পল্লী এলাকায় অধিক ঋণ প্রবাহ, পল্লী আয়কে যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়ে দেবে। বিনিয়োগের পর্যাপ্ত সুযোগের অভাবে প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের অর্জিত আয়ের একটা বড় অংশ জমি ও স্বর্ণ জাতীয় মত অনুৎপাদনশীল বিনিয়োগে ব্যয় করা হয়। এই আয়ের তাৎপর্যপূর্ণ অংশ বিভিন্ন সঞ্চয় স্কীমের আওতায় সংগ্রহ করা যেতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়

বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য ও বহিঃসম্পদ

বহিঃসম্পদ খাতের একটি পর্যালোচনা

ক্রমবর্ধমান ঘাটতি ও শ্রমিকদের প্রেরিত টাকা এবং বাংলাদেশের অর্থ সংস্থানে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা বাংলাদেশের বৈদেশিক-লেনদেনের ভারসাম্য পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য। ১৯৭৩/৭৪ থেকে ১৯৭৯/৮০ পর্যন্ত আমদানী ব্যয় ৭৪০ কোটি টাকা থেকে ৩,৬৬৭ কোটি টাকা বা ৯২৫ মিলিয়ন ডলার থেকে ২,৩৬৬ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান ডলার মূল্যে আমদানী বৃদ্ধি পেয়েছে বার্ষিক প্রায় ১৭ শতাংশ হারে যদিও প্রকৃতপক্ষে এই বৃদ্ধি (১৯৭২/৭৩ সালের মূল্য অনুযায়ী) ৫·৬ শতাংশ মাত্র। পক্ষান্তরে রফতানী বৃদ্ধি পেয়েছে ২৯০ কোটি টাকা (৩৬৩ মিলিয়ন ডলার) থেকে ১,১১৮ কোটি টাকায় (৭২১ মিলিয়ন ডলার)। ডলারের চলতি মূল্যে বার্ষিক বৃদ্ধির হার ১২·১ শতাংশ। এই সময়ে (১৯৭২-৭৩ সালের মূল্য অনুযায়ী) কোন রকম প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ঘটেনি। আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের চাইতে বেশী বিনিয়োগের জন্য এবং প্রধানতঃ ক্রমানুত বাণিজ্যিক অবস্থার ফলে সৃষ্ট এই বিশাল পার্থক্য রাশিকভাবে পূরণের জন্য ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক সম্পদের প্রয়োজন পড়ে। ১৯৭৩/৭৪ সালে বাংলাদেশ ৩৬৫ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য পেয়েছে। ১৯৭৯/৮০ সালে নাম মাত্র এটা ১,৮৯৬ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে (১৯৭২/৭৩ আমদানী মূল্য অনুযায়ী), ১৯৭৩/৭৪ সালে ২১১ কোটি টাকা (২৬৪ মিলিয়ন ডলার) থেকে ১৯৭৯/৮০ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৯০ কোটি টাকা (৭৩৮ মিলিয়ন ডলার)। এ দিকে ১৯৭৩-৭৪ সালে ৪৯ শতাংশ এবং ১৯৭৯/৮০ সালে ৫২ শতাংশ আমদানী ব্যয় বহন করা হয়েছে। মোদিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদন হিসাবে বৈদেশিক সাহায্যের বরাদ্দ এ সময়ে ৫·১ শতাংশ থেকে ১০·৪ শতাংশে পেয়েছে।

৫·২ বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যের এই পার্থক্য একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য কোন ব্যতিক্রম বলা যায় না। বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যের এই ব্যবধান শুধুমাত্র চলতি হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রা পরিশোধের ঘাটতি নয় বরং অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের চাইতে বেশী বিনিয়োগের কারণে এই ঘাটতি বা ব্যবধান দেখা দেয়। কাজেই বৈদেশিক সাহায্য দিয়ে ঐ ঘাটতি যতটুকু পূরণ করতে পারে ততটাই পূরণ করা হয় এবং এরপর ঐ ঘাটতি বাড়বে প্রতিকূল বাণিজ্য পরিস্থিতির কারণে। প্রতিকূল বাণিজ্যিক পরিস্থিতিতে স্বভাবতঃ সম্পদ দেশের বাইরে চলে যায়।

৫·৩ ১৯৭৯/৮০তে বাণিজ্যের হার ৭১ এ (১৯৭২/৭৩=১০০) নেমে যায়। ১৯৭৪/৭৫ সালে এটা সর্বনিম্ন পর্যায়ে (৫৪) পৌঁছে। ফলে টাকার অবমূল্যায়ন করতে হয় ৫৮ শতাংশ। রফতানী মূল্য বৃদ্ধি আমদানী মূল্যের সাথে তাল মিলাতে ব্যর্থ হলে বাণিজ্য পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। রফতানী মূল্যের হার ১৯৭৪/৭৫ এ ১২৮·৯ থেকে (১৯৭২/৭৩=১০০) ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৯/৮০তে ২২৭·০তে দাঁড়ায়। কয়েকটি প্রাথমিক পণ্যও সেগুলি থেকে তৈরী শিল্প সামগ্রীর উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার ও সেগুলির চাহিদা খুব কম হওয়ায় রফতানী বাণিজ্যের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। রফতানী মূল্য আন্তর্জাতিক মুদ্রাস্ফীতির কারণ নিতে পারেনি অথচ আমদানি মূল্যের সূচক ১৯৭৩/৭৪ এ ১৭৩·১ থেকে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৯/৮০তে ৩২১·৩ এ দাঁড়িয়েছে। তেলের মূল্যের উর্ধগতি অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণদিক; কিন্তু তা পুরোপুরি দায়ী নয়। বাংলাদেশ ১৯৭৩/৭৪ এর ৬৬ কোটি টাকা (৮৪ মিলিয়ন ডলার) ব্যয়ে ১০·৭৭ লাখ টন অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলজাত দ্রব্য আমদানী করে। ১৯৭৯/৮০ সালে এ সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৭·৫১ লাখ টন ও ৫৯৬ কোটি টাকা (৩৮৪ মিলিয়ন ডলার)। আমদানী মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে অপরিশোধিত ও পেট্রোলজাত দ্রব্যের পরিমাণ আমদানী মূল্যসূচক বৃদ্ধির ৫২ শতাংশ। পশ্চিমা শিল্প অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির ফলে খাদ্যশস্য, তুলা, সার, শিল্পের কাঁচামাল, সিমেন্ট ও মূলধন পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। ১৯৭০ এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশ এসব দ্রব্য আমদানী করে।

৫.৪ আমদানী মূলতঃ ভোগ্যপণ্য ভিত্তিক থেকে গেলেও ১৯৭০ দশকের দ্বিতীয়ার্ধে অভ্যন্তরীণ ধারণ ক্ষমতা সদ্ব্যবহারের জন্য মাধ্যমিক পণ্য ও বর্ধিত বিনিয়োগের সহায়তার জন্য মৌল দ্রব্যাদির পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হয়। ১৯৭৩/৭৪ ও ১৯৭৯/৮০তে বার্ষিক গড়পড়তা ১৭ লাখ টন খাদ্যশস্য আমদানী করতে হয় এবং তা আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের হারের অনুপাতে উঠা-নামা করে। মোট আমদানী মূল্যের গড়পড়তা ২৫ শতাংশ এতে ব্যয় হয়। খাদ্যশস্য বহির্ভূত ভোগ্যপণ্য যথা খাবার তৈল, বস্ত্র, দুগ্ধজাত খাদ্য, ঔষধপত্র ইত্যাদির আমদানী ১৯৭৩/৭৪ সালে ১৪২ কোটি টাকা (১৭৮ মিলিয়ন ডলার) থেকে ১৯৭৯/৮০তে ৫২৭ কোটি টাকায় (৩৪০ মিলিয়ন ডলার) বৃদ্ধি পায়। খাদ্য শস্য নয় এমন মাধ্যমিক পণ্যের আমদানী ১৯৭৩/৭৪ সালের ৪৮ শতাংশের তুলনায় ১৯৭৯/৮০ তে ৫৩ শতাংশ এবং মূলধন পণ্যের আমদানী ২২ শতাংশের তুলনায় ২৭ শতাংশ ছিল। ভোগ্যপণ্যের অংশ ১৯৭৩-৭৪ এর ৩০ শতাংশ থেকে ১৯৭৯/৮০ তে ২০ শতাংশে নেমে আসে।

৫.৫ ১৯৭৯/৮০তে রপ্তানী আয় ছিল সার্বিক আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রায় ৬ শতাংশ এবং এ থেকে আমদানীর ৩০ শতাংশ ব্যয় নির্বাহ হয়েছে। সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের রপ্তানীর এই অংশ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির তুলনায় শুধু যে খুব কম তাই নয় বরং রপ্তানীর কাঠামোতে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের প্রাধান্য ছিল; ১৯৭৯/৮০তে রপ্তানী আয়ের ৭৩ শতাংশ পাট ও পাটজাত পণ্য এবং পাটজাত দ্রব্য চা, চামড়া, হিমায়িত মাছ, কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট এই ৬টি পণ্য রপ্তানী আয়ের ৯৪ শতাংশ ছিল।

৫.৬ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করা দরকার যে ১৯৭২/৭৩ থেকে ১৮৭৯/৮০ পর্যন্ত রপ্তানীর পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়নি। কাঁচা পাট রপ্তানীর পরিমাণ প্রকৃত পক্ষে কমেছে; আর পাটজাত পণ্যের রপ্তানী ১৯৭২/৭৩ এর পর্যায়ে রয়ে গেছে। ১৯৭৬/৭৭ থেকে রপ্তানী আয় বৃদ্ধি মূলতঃ মূল্য বৃদ্ধির কারণে। সত্তরের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশী উৎপাদিত পণ্যের ব্যাপক চাহিদা ছিল এবং বর্ধিত হারে সরবরাহ করা হলে সব রপ্তানীযোগ্য পণ্য আরো বেশী পরিমাণ বাজারজাত করা যেত। ১৯৭৫ সালে টাকার অবমূল্যায়ন এবং পরবর্তী বছর গুলিতে বিনিময় হারের সমন্বয় হেতু পাট ও কৃত্রিম তন্তুর মধ্যে মূল্য প্রতিযোগিতা যথেষ্ট বেড়ে যায়। কিন্তু পাট চাষে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির অভাব এবং ধানের তুলনায় পাটের মূল্য কৃষকদের আকৃষ্ট করতে না পারায় কাঁচা পাটের সরবরাহ বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। পাটের উৎপাদন ১৯৬০ দশকের পর্যায় থেকে কম ছিল। পক্ষান্তরে, পাট কলের সুষমকরণ ও আধুনিকীকরণের অভাব, বিদ্যুৎ বিভ্রাট, শ্রমিক অসন্তোষ ও শিল্পমানের ব্যবস্থাপনার কারণে পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন ক্ষমতার অনেক নীচে রয়ে যায়। জুট কার্পেটের ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আভ্যন্তরীণ ধারণ ক্ষমতার স্বল্পতার কারণে রপ্তানী সীমিত হয়ে পড়ে। চা রপ্তানী ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৭৫/৭৬ এ ৬৫ মিলিয়ন পাউণ্ডে পৌঁছে। কিন্তু পরে আন্তর্জাতিক চাহিদা হ্রাস পাওয়া হেতু ও অপর্যাপ্ত বাজারজাত করণ প্রচেষ্টার জন্য তা হ্রাস পায়।

৫.৭ এর ফলশ্রুতিতে ধারাবাহিক চলতি হিসাবে অর্থ পূরণের প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়ায় বৈদেশিক অর্থনৈতিক সাহায্য। বছরের পর বছর বৈদেশিক সাহায্যের বণ্টন বেড়ে যায়। ১৯৭৩/৭৪এ ৩৬৫ কোটি টাকার (৪৫৬ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় ১৯৭৯/৮০তে মোট বৈদেশিক সাহায্য বণ্টনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৮৯৬ কোটি টাকা (১,২২৩ মিলিয়ন ডলার)। ক্রমবর্ধমান হারে আরো প্রকল্প সাহায্য ব্যবহৃত হওয়ায় বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তনও সূচিত হয়। প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ১৯৭৩/৭৪এর ৯৯ কোটি থেকে ১৯৭৯/৮০তে ৭২৯ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পায়। ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক মুদ্রা সংকটের প্রেক্ষিতে ১৯৭৮/৭৯ পর্যন্ত বৈদেশিক সহযোগিতায় পণ্য সাহায্য প্রাধান্য বিস্তার করে এবং বিভিন্ন কাঁচামাল আমদানীতে এর ব্যবহার বৃদ্ধি পায়।

৫.৮ ঋণ পরিশোধের পরিমাণ (স্বল্পমেয়াদী ঋণসহ ১৯৭৯/৮০ তে ২০৫ কোটিতে দাঁড়ায়। যদিও বহু সাহায্যদাতা ঋণ মওকুফ করেছে এবং ঐ বছর পণ্য রপ্তানী আয়ের অনুপাতে ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ১৮ শতাংশে পৌঁছে। দ্রুত রপ্তানী আয় বৃদ্ধি না পেলে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অনুদানের আকারে সাহায্যদাতারা সহায়তা না করলে আগামী বছরগুলিতে ক্রমবর্ধমান ঋণ পরিশোধের কারণে অর্থনীতির আমদানী ক্ষমতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(খ) বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য নীতি কৌশল

৫.৯ পূর্ববর্তী বিভাগের পর্যালোচনায় বাংলাদেশের বৈদেশিক খাতে মৌলিক দুর্বলতাগুলি দেখানো হয়েছে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সরকারী নীতি অনুযায়ী সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোও চিহ্নিত করা হয়েছে। পরিকল্পনায় বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, রপ্তানী-আমদানীর ব্যবধান অনুমানযোগ্য বৈদেশিক সহায়তার সীমা অতিক্রম তোর করা। রপ্তানীর মাত্রাবৃদ্ধি, যথাসাধ্য আমদানীর বিকল্প পণ্য উৎপাদন অপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানী বন্ধ ও শ্রমিকদের দেশে অর্থ প্রেরণে উৎসাহিত করার মাধ্যমে এটা অর্জন করতে চাওয়া হয়েছে। অর্থবর্তীকালীন মেয়াদে রপ্তানীর কাঠামোগত পরিবর্তনে অসুবিধার কথা এতে স্বীকার করা হয়েছে। কাজেই পরিকল্পনায় রপ্তানী উন্নয়নের একটি ভিত্তি স্থাপনের প্রচেষ্টার পাটি, পাটজাত দ্রব্য, চা, চামড়া, আবহিক বীজ ও নিউজপ্রিন্ট রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য বর্তমান ক্ষমতাকে ব্যবহারের উপর জোরদার করা হয়েছে। এবং পুরাতন পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হলো গুণগত মান বৃদ্ধির সাথে সাথে কার্যকরভাবে বাজার অনুসন্ধান করা। এই অর্থবর্তী মেয়াদে দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনাময় অন্যান্য রপ্তানী পণ্য হলো: শাকসব্জী, হস্তশিল্প, তৈরী পোশাক ও বস্ত্র। একই সময়ে কাঁচামাল ও অর্ধ প্রক্রিয়াজাত পণ্য ইত্যাদি (যেমন চামড়া) রপ্তানীর পরিবর্তে প্রস্তুত সামগ্রী রপ্তানীর মাধ্যমে বর্ধিত মূল্য পাওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে। শিল্পায়ন কর্মসূচীর ভিত্তি হবে শ্রমিকদের প্রস্তুত পণ্যাদি রপ্তানী তথা প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে প্রস্তুত পণ্য রপ্তানী ইহা অর্থনীতির ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে অনুকূল—যেমন ইউরিয়া সার।

৫.১০ রপ্তানীকে উৎসাহিত করার জন্য আভ্যন্তরীণ পরিবহন, জাহাজ চলাচল, বন্দর ও গুদামের সুবিধা, উন্নয়ন মোড়ক বাঁধাই ও গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ কড়াকড়িভাবে বলবৎ করাসহ উপযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণ ও অবকাঠামো উন্নত ও উন্নয়নশীল সকল দেশে বাংলাদেশ অধিকতর সুবিধাপ্রাপ্ত দেশ হিসেবে পণ্য হওয়া এবং সমন্বিত পণ্য কার্যক্রমের আওতায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পণ্যাদির (যেমন: পাট, চা, চামড়া) দ্রুততার সাথে সাথে বাণিজ্যিক আলাপ-আলোচনা পূর্ব সম্পন্ন করার পর দেশের রপ্তানী উন্নয়ন কার্যক্রমের সাফল্য একান্তভাবে নির্ভরশীল। বৈদেশিক বাণিজ্যে বর্ধিত অংশ নিশ্চিত করার জন্য শিপিং কর্পোরেশন ও সাধারণ বীমার কার্যক্রমকে অধিকতর সম্প্রসারিত করতে হবে। প্রবাসীদের পাঠানো টাকা বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের খুবই উৎসাহব্যঞ্জক উৎস বলে দেখা গেছে। সম্ভাব্য বিদেশগামী শ্রমিকদের পেশাগত, কারিগরী ও অন্যান্য বৃত্তিমূলক কারু শিল্প প্রশিক্ষণ দান এবং প্রবাসীদের সঞ্চয় বাংলাদেশে লাভজনকভাবে বিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি করে ব্যাপক কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে এর উন্নয়ন প্রয়োজন।

৫.১১ বৈদেশিক মুদ্রার আয় বৃদ্ধির জন্য শুধু মাত্র উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলোই কেবল বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের ক্ষেত্রে চাপ হ্রাসের জন্য যথেষ্ট নয়। কাজেই, রপ্তানী উন্নয়নের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার পাশাপাশি পরিকল্পনা মেয়াদে রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য সর্বাধিক প্রয়াস চালানোর সঙ্গে সঙ্গে সম্ভাব্য সর্বাধিক আমদানী বিকল্প উৎপাদন কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রয়োজন। বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই এক্ষেত্রে কিছুটা সাফল্য লাভ করেছে এবং এখানেও অভ্যন্তরীণ উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বাড়িয়ে খাদ্যশস্য, ভোজ্যতেল, তুলা, ডাল, সার, পেট্রোলিয়াম, সিমেন্ট, ঔষধ, সাধারণ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম আমদানীর বিকল্প সৃষ্টির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। পরিকল্পনায় দ্রুত তাড়াতাড়ি সম্ভব খাদ্যশস্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

শিল্প কর্মসূচীতে ইউরিয়া সারের সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ, তুলা বস্ত্র কাগজ ও ঔষধের মত মৌলিক চাহিদা মিটানো এবং স্থানীয় শিল্প কারখানা থেকে সেচের পাম্প ইঞ্জিন ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সরবরাহ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে। অন্যথায় বিদেশী প্রতিযোগিতা থেকে দেশী শিল্পকে রক্ষার জন্য অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর জন্য উৎপাদন যথেষ্ট এমন সব পণ্য আমদানী নিষিদ্ধ করা এবং শুল্ক ব্যবস্থা ও বৈদেশিক মুদ্রা নীতি প্রয়োগ করে আমদানীকৃত বিলাস দ্রব্যের মূল্য ধরা ছোঁয়ার বাইরে বাড়ান হবে।

৫.১২ এটা স্বীকৃত যে পুঁজি বিনিয়োগের জন্য বিদেশী মূলধনের উপর বর্তমান নির্ভরশীলতা অনেক বেশী কিন্তু বিদেশী সাহায্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ নিয়োজন প্রচেষ্টার বিকল্প নয়। সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদন এবং মাথাপিছু আয় সাধারণ মানুষের সর্বনিম্ন মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য যুক্তি সংগত উচ্চহারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের অপরিহার্যতা এবং ১৯৮০ দশকে অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তরের সূচনা করার আর্থে বিনিয়োগের পর্যায়কে উল্লেখযোগ্যভাবে জোরদার করা দরকার। তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে পরিকল্পনার বার্ষ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বিনিয়োগ/সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অনুপাত ১৯৭৯/৮০এর ১৬.৭ শতাংশ থেকে ১৯৮৪/৮৫তে ২১.২ শতাংশে বাড়াতে হবে। পরিকল্পনার সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধি করেও চলতি ব্যয়ে মিতব্যয়িতার দ্বারা সরকারী সংস্থাসমূহের এবং উপযোগ সমূহের অর্থনৈতিক উৎপাদনতার উন্নয়ন করে এবং বেসরকারী সঞ্চয় উৎসাহিত করে সঞ্চয়/সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদন অনুপাত ১৯৭৯/৮০তে ৪.৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৯৮৪/৮৫তে ৯.৫ শতাংশে করার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। সর্বোচ্চ মাত্রায় অভ্যন্তরীণ সম্পদ নিয়োজনের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পরিকল্পনার বাস্তবায়ন বহিসূত্র থেকে প্রাপ্ত প্রকৃত সম্পদের প্রবাহের উপর একান্তভাবে নির্ভর করবে। সবচেয়ে কম উন্নত দেশ হিসাবে বাংলাদেশে ব্যাপক দারিদ্র দূর করে ফলপ্রসূ অগ্রগতি অর্জনের জন্য প্রকৃত সম্পদের পর্যাপ্ত প্রবাহ প্রয়োজন। পরিকল্পনায় প্রদত্ত ধারণা অনুযায়ী সাম্প্রতিককালের মত বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তি বৃদ্ধির একই হার বজায় থাকবে। আশা করা যাচ্ছে যে মাথাপিছু মোট সাহায্য ১৯৭৯/৮০ এর ১৪ মার্কিন ডলার থেকে ১৯৮৪/৮৫তে ১৬ মার্কিন ডলারে বৃদ্ধি পাবে।

৫.১৩ অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে যেহেতু খাদ্য সাহায্য হ্রাস পাবে তাই বৈদেশিক সাহায্য মূলতঃ শিল্পের কাঁচামাল ও মূলধন পণ্য আমদানীতে ব্যবহার করা হবে। কাজেই সুবিধাজনক শর্তে ও উন্নত পদ্ধতিতে আরও পণ্য ও প্রকল্প সাহায্যের প্রয়োজন হবে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ও প্রাপ্তি অস্থিতিশীল ছিল। সাহায্য প্রবাহের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য সরকার ও সাহায্য দাতাদের পক্ষ থেকে মূল্যায়ন, আলাপ-আলোচনা ও সংগ্রহ পদ্ধতির আরও উন্নতি বিধানের প্রয়োজন হবে।

গ। লেনদেন ভারসাম্যের অভিযোজন ও বিদেশী মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা

৫.১৪ দেশের অভ্যন্তরের উৎপাদনের সম্ভাবনাসমূহ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও প্রযুক্তি বিনিময়ের জন্য বৈদেশিক খাত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি উপায় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদের সম্ভাব্য সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পণ্যের উৎকর্ষ বিধান ও আমদানী বিকল্প পণ্যের সম্ভাব্য সর্বাধিক উৎপাদনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে রপ্তানী খাতে নিরবচ্ছিন্ন প্রবৃদ্ধির উদ্দেশ্য সামনে রেখে বিভিন্ন খাতের উৎপাদন কার্যক্রমগুলো স্থির করা হয়েছে। পরিকল্পনা মেয়াদে লেনদেন ভারসাম্য পরিস্থিতি ও বিদেশী মূলধন প্রাপ্তির ধারণা নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে।

গ.১ আমদানী মূলক পরিশোধ ব্যবস্থা

৫.১৫ পরিকল্পনার পাঁচ বছরে মোট পণ্য আমদানীর (১৯৭৯/৮০ পরিবহন ভাড়া ও বীমা ব্যয়) ব্যয় ১৭,৮০২ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। আমদানী ব্যয় ১৯৭৯/৮০ এর ৩,৬৬৭ কোটি টাকার তুলনায়

১৯৮৪/৮৫তে ৩,৭১৯ কোটি টাকার দাঁড়াবে। খাদ্যশস্য আমদানীর মূল্য ধরা হয়েছে ২,০১৩ কোটি টাকা বা পরিকল্পনা খাতে মোট পণ্য আমদানীর ১১.৩ শতাংশ পক্ষান্তরে ১৯৭৯/৮০তে তা ছিল ২৬ শতাংশ। খাদ্য বহির্ভূত আমদানী বার্ষিক ৫.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে ধরা হয়েছে, আমদানী মূল্য ১৯৭৯/৮০ এর ২,৭০২ কোটি টাকা থেকে ১৯৮৪/৮৫এ ৩,৫২৫ কোটি টাকাতে দাঁড়াবে। খাদ্য বহির্ভূত আমদানী বৃদ্ধির নির্ধারিত হার গত পাঁচ বছরে অর্জিত ১১.৩ শতাংশ হার বৃদ্ধির চাইতে অনেক কম।

৫.১৬ নির্ধারিত খাদ্য বহির্ভূত আমদানীতে (ক) পরিকল্পনা কালে উন্নয়ন কর্মসূচীর কালবিন্যাস এবং (খ) বিভিন্ন পণ্যের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও ভোগে বৃদ্ধির সম্ভাব্য প্রবণতা বিবেচনা করা হবে। খাদ্য বহির্ভূত আমদানী থেকে যা পাওয়া যাবে বলে ধরা হয়েছে তা হলো (ক) মাথাপিছু ভোগের কাংক্ষিত পর্যায় নিশ্চিত করার জন্য অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যপণ্যের নিয়মিত সরবরাহ, (খ) কৃষি, শিল্প, জ্বালানী পরিবহন ও অন্যান্য খাতে বর্তমান ও নতুন উৎপাদন ক্ষমতার সদ্ব্যবহারের জন্য কাঁচামাল সরবরাহ ও যন্ত্রাংশ সংরক্ষণ; এবং (গ) সরকারী ও বেসরকারী খাতের বিনিয়োগ কর্মসূচীতে পরিকল্পিত নির্মাণ সামগ্রী ও মূলধন পণ্য নির্মাণ। আমদানীর অগ্রিম কর্মসূচী এবং অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ন্যূনতম চাহিদার তালিকা রাখার বিষয়টি শুধুমাত্র সময়ে সময়ে দুষ্প্রাপ্যতা এড়াবে না বরং প্রশাসন যন্ত্রকে সাময়িক কিন্তু ঘনঘন সংকটের হাত থেকে মুক্ত রাখবে। কাজেই, বিভিন্ন পণ্যের আমদানী চাহিদা নির্ণয় করতে গিয়ে খাদ্যশস্য, সার, সিমেন্ট, ইস্পাত ও লোহা, তুলা, পেট্রোলিয়াম ও কয়লার মত জরুরী পণ্যের তালিকা রাখা হয়েছে।

৫.১৭ খাদ্য বহির্ভূত মোট আমদানীর মধ্যে ৫১ শতাংশ মাধ্যমিক পণ্য, ৩১ শতাংশ মূলধন দ্রব্য ও ১৮ শতাংশ ভোগ্যপণ্য আছে। পরিকল্পনা কালে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে ভোগ্যপণ্য ও মাধ্যমিক পণ্য আমদানী ক্রমানুয়ে কমে যাবে। ১৯৭৯/৮০ এর ৫৩ শতাংশের তুলনায় শেষ বছরে মাধ্যমিক পণ্যের অংশ ৪৮ শতাংশে হ্রাস পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে এবং ভোগ্যপণ্য শুরুর বছরে প্রায় ২০ শতাংশের তুলনায় ১৭ শতাংশে হ্রাস পাবে। মূলধন পণ্য আমদানী বৃদ্ধি পাবে কারণ পরিকল্পনাকালে মৌল দ্রব্যের কোন বিকল্প ক্ষমতা অর্জনের আমদানীর আশা করা যায় না।

৫.১৮ প্রধান প্রধান দ্রব্য অনুযায়ী সারণী ৫.১৩ পণ্য আমদানী দেখানো হলো :

সারণী ৫.১

প্রধান প্রধান পণ্যের আমদানী অভিক্ষেপ

(১৯৭৯/৮০ সি,আই,এফ মূল্য অনুযায়ী)

[মূল্য কোটি টাকায়]

	একক	১৯৭৯/৮০		১৯৮৪/৮৫	
		পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১। খাদ্য শস্য	লাখ টন	২৮	৯৬৫	৬	১৯৪
২। ভোজ্য তেল	হাজার টন	৭৮	১০৫	১১৫	১৫৫
৩। তেলবীজ	,,	২৪	১৩	৩৮	২১
৪। পেট্রোলজাত দ্রব্য	,,	৪৭৪	১৯৯	৪৬০	১৯৩
৫। অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	,,	১২৭৭	৩৯৭	১৪০০	৪৩৫
৬। তুলা (টায়ার ফাইবারসহ)	হাজার বেল	১৮২	৮৮	৪১৫	২০১
৭। তুলা ও কৃত্রিম সুতা	লাখ পাউণ্ড	৭২	১৭	১৬০	৩৮
৮। যন্ত্র	...	...	৫৩	...	৪৮
৯। গম	হাজার টন	৫৭৬	২০৭	৪২০	১৫১
১০। সিমেন্ট	,,	৪৮৯	৫৬	৯০০	১০৪
১১। মূলধন দ্রব্যাদি	...	...	৭৩৬	...	১২৩০
১২। অন্যান্য কাঁচামাল	...	...	৫৯৮	...	৭০০
১৩। অন্যান্য ভোগ্যপণ্য	...	...	২৩৩	...	২৪৯
	মোট :	...	৩৬৬৭	...	৩৭১৯

৫.১৯ বিভিন্ন পণ্য আমদানী লক্ষ্যমাত্রা সংক্রান্ত বিষয় নীচে আলোচনা করা হলো :

৫.২০ **খাদ্যশস্য :** অন্তর্বর্তীকালীন খাদ্য উৎপাদন পরিকল্পনার (এমটিএফপি) লক্ষ্য অনুযায়ী খাদ্য শস্যের আনুমানিক উৎপাদন ১৯৭৯/৮০ এর ১৩৩.৫ লাখ টন থেকে ১৯৮৪/৮৫ তে ২০০ লাখ টনে বৃদ্ধি করা। অবশ্য অন্তর্বর্তীকালীন খাদ্য উৎপাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত সম্পদ সংগ্রহে অসুবিধার জন্য

১৯৮৪/৮৫ এ উৎপাদন ১৭৫ লাখ টনের বেশী নাও হতে পারে। মোট অভ্যন্তরীণ সরবরাহ থেকে প্রাপ্তি ভিত্তি বছরের প্রায় ১২০ লাখ টনের স্থলে ১৯৮৪/৮৫ এ আনুমানিক ১৫৮ লাখ টন ধরা হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মাথা পিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধির ভিত্তিতে হিসাবকৃত খাদ্যশস্যের ব্যবহার ১৯৮৪/৮৫ এ ১৫৭ লাখ টনে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। স্বভাবতঃই পরিকল্পনার শেষ বছরে খাদ্যশস্য আমদানীর প্রয়োজন নেই বলেই ধারণা করা হচ্ছে।

৫.২১ উল্লেখ করা যেতে পারে যে দেশে কালবাহিনীর বছরে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানী ও বিতরণের দরকার পড়ে। পক্ষান্তরে, ভাল ফসল-এর বছরে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য আভ্যন্তরীণ পর্যায়ে সংগ্রহ করা হয়। প্রায়শঃ সরকারকে সীমিত বাজেট ও প্রশাসনিক সম্পদের উপর চাপ সৃষ্টি করে জরুরী ভিত্তিতে আমদানী করতে হয়েছে। এ অভিজ্ঞতার শিক্ষা হচ্ছে খাদ্য নিরাপত্তা ও খোলা বাজার তৎপরতা উভয় খাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ মজুত রাখা অভিপ্রেত। প্রান্তিক বছরে ১৭৫ লাখ টন উৎপাদন ও ১৫৭ লাখ টন ভোগের প্রেক্ষিতে ১৯৮৪/৮৫ এ খাদ্য শস্য মজুদের পরিমাণ ২০ লাখ টন (৫ লাখ টন নিরাপত্তা রিজার্ভসহ) থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন সরকারী বিতরণ ব্যবস্থার নিয়মিত সরবরাহ বজায় রাখা ও প্রয়োজনে পরিস্থিতি আওতাধীন করার জন্যে হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্যে ২০ লাখ টন মজুদ রাখা বাঞ্ছনীয়। উৎপাদন বাড়লে, অভ্যন্তরীণ খাদ্য শস্য সংগ্রহ ব্যবস্থা বিস্তৃত ও দক্ষ হয়ে ওঠে, এতে খাদ্য শস্যের মূল্য যেমন উৎপাদনমূলক স্তরের নীচে নামতে পারে না তেমনি অন্যদিকে আকালের বছরগুলিতে খোলা বাজারে সংগৃহীত খাদ্যশস্য বিক্রীর মাধ্যমে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৫.২২ পরিকল্পনা কালে খাদ্যশস্যের মোট আমদানী চাহিদা ৬৪ লাখ টন ধরা হয়েছে। যদিও ১৯৭৯/৮০ এর ২৮ লাখ টনের তুলনায় ১৯৮৩/৮৪ এ ১৪ লাখ টন ও ১৯৮৪/৮৫ এ খাদ্যশস্য আমদানী ৬ লাখ টনে হ্রাস পাবে। অবশ্য প্রকৃতির প্রতিকূলতার ফলে ফলন অনিশ্চিত হয়ে পড়লে, আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ঘাটতি পূরণের জন্য অতিরিক্ত খাদ্যশস্য আমদানী করতে হতে পারে।

৫.২৩ সার: ১৯৭৫/৭৬ থেকে রাসায়নিক সারের ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য বর্তমানে মাত্র ১০ শতাংশ কৃষিতে সার ব্যবহৃত হচ্ছে এবং উর্বরতার ক্ষেত্রে গুরুতর ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়েছে। কৃষি কর্মসূচীতে রাসায়নিক সার ব্যবহার বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। সারের ব্যবহার ১৯৭৯/৮০ এর ৮.৪ লাখ টন থেকে ১৯৮৪/৮৫ এ ১৩.৮ লাখ টনে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আমদানীকৃত সারের মত গুরুত্বপূর্ণ সারকে যাতে উপযুক্ত সময় ও স্থানে পাওয়া যায় সে জন্য ৫ মাস বিতরণের উপযোগী পরিমাণ সার মজুত প্রয়োজন। ইউরিয়ার আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে ডিএপি ক্রয় মজুত নিয়েও বিতরণ কর্মসূচী চালাতে সক্ষম হবে এবং ইউরিয়ার আভ্যন্তরীণ সরবরাহ ইউরিয়ার সম্পূর্ণ চাহিদা মিটাতে সক্ষম হবে। সার ব্যবহারের ভারসাম্যহীনতা দূর করার জন্য ক্রমবর্ধমানভাবে অধিক পরিমাণ ট্রিপল সুপার ফসফেট (টিএসপি) ও মিউরেট অব পটাশ (এমপি) ব্যবহার করা হবে। টিএসপির আভ্যন্তরীণ উৎপাদন সীমিত বিধায় বিতরণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বর্ধিত পরিমাণ আমদানী করা হবে। সারের আমদানী চাহিদা ১৯৭৯/৮০ এর ৫.৮ লাখ টনের স্থলে ১৯৮৪/৮৫ এ ৪.২ লাখ টন বলে ধরা হয়েছে।

৫.২৪ তুলা ও বস্ত্র: শিল্প কর্মসূচীর অধীনে পরিকল্পনা কালে আভ্যন্তরীণ বস্ত্র উৎপাদন প্রায় ৬১ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। ১৯৭৯/৮০ এর প্রায় ৬০টি কোটি গজের তুলনায় ১৯৮৪/৮৫ এ ৯৮ কোটি গজ কাপড় উৎপাদিত হতে পারে। এই কাপড়ের মধ্যে প্রায় ৮৬ শতাংশ হস্তচালিত তাঁত ও ক্ষুদ্র কারখানায় উৎপাদিত হওয়ার আশা আছে। সূতা কলের বর্তমান ও নতুন উৎপাদন ক্ষমতা সুতার বেশীরভাগ চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে। শুধু উচ্চ কাউন্টের উৎকৃষ্ট মানের সূতা আমদানী করতে হবে।

৫·২৫ কাঁচা তুলা ও বয়ন তন্তু প্রভৃতি বা বস্ত্র শিল্পের জন্য কাঁচামাল বর্তমানে সম্পূর্ণভাবে আমদানী করা হয়। বাংলাদেশে সুতা আমদানীর বিকল্প সৃষ্টির উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা আছে। কিন্তু অন্তবর্তীকালীন অভ্যন্তরীণ উৎপাদন তুলার সম্পূর্ণ চাহিদার একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র পূরণ করতে পারবে। তুলার আমদানী ১৯৭৯/৮০ এর প্রায় ১·৭ লাখ বেলের স্থলে ১৯৮৪/৮৫ এ ৩·৬ লাখ বেলে উন্নীত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সুতা উৎপাদনে ৮০:২০ হারে তুলা ও ভিসকোজ নিশানোর জন্য স্টাপল ফাইবার আমদানী বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

৫·২৬ **অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলজাত দ্রব্য :** আমদানীকৃত জ্বালানীর উচ্চ মূল্য বাংলাদেশের মত তৈলবিহীন দেশে সম্পদের উপর মারাত্মক বোঝা হয়ে পড়েছে। পরিকল্পনা কালে উন্নয়নের গতি বৃদ্ধির সাথে সাথে বাণিজ্যিক জ্বালানীর চাহিদা বেড়ে যাবে। অপরিশোধিত তৈল, পেট্রোলজাত দ্রব্য ও কয়লা পুরোটাই আমদানী করতে হয় এবং তা বাণিজ্যিক পর্যায়ের জ্বালানীর শতকরা ৬০ ভাগ। ১৯৭৯/৮০ সালে অপরিশোধিত ও পেট্রোলজাত দ্রব্যের আমদানী মূল্য ছিল ৫৯৬ কোটি টাকা; এটা রফতানী আয়ের ৫৩ শতাংশ। আমদানীকৃত জ্বালানীর উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করার জন্য জ্বালানী কর্মসূচীতে প্রাকৃতিক গ্যাসের সর্বাধিক ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। কর্মসূচীতে পাম্প ও নলকূপ বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে চাষাবাদে ডিজেল ব্যবহারের বিকল্প, পল্লী ও আধা শহর এলাকায় গৃহবিদ্যুতায়নের মাধ্যমে আলো ও রান্নার জন্য কেরোসিনের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ডিজেল ও ফার্নেস তৈল ব্যবহারের বিকল্প বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের ব্যাপক ব্যবহার এবং ফার্নেস তৈল ও কেরোসিনের পরিবর্তে গ্যাস ব্যবহার পরিকল্পিত হয়েছে। কৃষি, শিল্পোৎপাদন, বিদ্যুৎ, পরিবহণ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পেট্রোলের চাহিদা এবং গ্যাস ও বিদ্যুতের সম্ভাব্য বিকল্প ব্যবহার হিসাবে ধরে পেট্রোল আমদানীর চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছে। আমদানীর বিকল্প ও দৈপন্য ব্যবস্থা কার্যকর হলে পেট্রোলজাত দ্রব্য ব্যবহার ১৯৭৯/৮০ এর ১৬·৫ লাখ টনের স্থলে ১৯৮৪/৮৫ এ ১৭·৮ লাখ টনে স্থিতিলাভ করবে। অপরিশোধিত তৈল আমদানীর হিসেবে ধরা হয়েছে যে ইষ্টার্ণ রিফাইনারী ১৯৮৩/৮৪ থেকে বছরে ১৪ লাখ টন পরিশোধন করতে পারবে।

৫·২৭ **সিমেন্ট :** সরকারী ও বেসরকারী খাতে নির্মাণ তৎপরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সিমেন্টের ব্যবহার ১৯৭৯/৮০ এর প্রায় ১০ লাখ টনের স্থলে পরিকল্পনার শেষ বছরে ১৩·৭ লাখ টনে দাঁড়াবে। যেহেতু অভ্যন্তরীণ উৎপাদন মাত্র ৩৫০·০০০ টন তাই সময়ের সিমেন্ট ঘাটতি নির্মাণক্ষেত্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছে। সিমেন্ট আমদানী ১৯৭৯-৮০ এর ৪·৮৯ লাখ টনের স্থলে ১৯৮৪-৮৫ এ ৯·০০ লাখ টনে বৃদ্ধি পাবে।

৫·২৮ **মূলধন পণ্য :** মূলধন পণ্যের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ক্ষমতা সীমিত এবং কতিপয় সুবিধা এখনো উৎপাদনের প্রাথমিক স্তরে। এর ফলে পরিকল্পনা কালে সেচ যন্ত্র ও পাম্প, বৈদ্যুতিক ও অবৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, যানবাহন ও গুদামজাত সরঞ্জাম আমদানী অব্যাহত থাকবে। মূলধন পণ্যের আমদানী চাহিদা নির্ধারণে সেচ পাম্প ও ইঞ্জিন, পরিবহণ ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, পাট ও বস্ত্র শিল্পের খুচরা যন্ত্রাংশের সম্ভাব্য অভ্যন্তরীণ সরবরাহ হিসাবে ধরা হয়েছে। মূলধন পণ্য আমদানীর মূল্য ১৯৭৯/৮০ এর ৭৩৬ কোটি টাকা থেকে ১৯৮৪/৮৫ এ ১,২৩০ কোটি (১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে) টাকায় বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হয়েছে।

৫·২৯ **অন্যান্য কাঁচামাল :** এই শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শিল্পের কাঁচামাল আছে—যেমন লৌহ পিণ্ড ও বর্জিতাংশ, রং ও রাসায়নিক দ্রব্য, ক্লিংকার, কয়লা ও কোক, ঔষধশিল্পের কাঁচামাল, অশোধিত চর্বি, তরার, রক ফসফেট ইত্যাদি। বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পিত নতুন শিল্প ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য এই কাঁচামালের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং এর কোন আমদানী বিকল্প নেই। এই শ্রেণীর কাঁচামাল আমদানী ১৯৭৯/৮০ এর ৫৯৮ কোটি টাকা থেকে ১৯৮৪/৮৫ এর ৭০০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

৫.৩০ অন্যান্য ভোগ্যপণ্য : এতে রয়েছে দুগ্ধজাত খাদ্য, ঔষধপত্র, মসলা, তরল পানীয়, মধ্যমজাত দ্রব্য, বই ও সাময়িকী ইত্যাদি। পরিকল্পনা কালে এগুলির চাহিদা বাড়বে এবং অভ্যন্তরীণ সরবরাহ বর্ধিত চাহিদার বেশ কিছু পূরণ করতে পারবে। কাজেই এই শ্রেণীর ভোগ্য পণ্যের আমদানী অন্যান্য খাদ্য বহির্ভূত পণ্য আমদানীর তুলনায় ধীর গতিতে বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গ.২ রফতানী আয় :

৫.৩১ পণ্য রপ্তানীর মোট মূল্য ১৯৭৯/৮০ মেয়াদের ১,১১৮ কোটি টাকার তুলনায় ১৯৮৪/৮৫ এ ১,৬৯৮ কোটি টাকায় (১৯৭৯/৮০ এর এফওবি মূল্যে) বৃদ্ধি পাবে বলে ধরা হয়েছে। ফলে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার হবে ৮.৬ শতাংশ। পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানী থেকে আয় কম হারে বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হয়েছে। পাট বা পাটজাত নয় এমন সব পণ্য রপ্তানী বাবদ এক বছরে আয় যেখানে ১৮.২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে ধরা হয়েছে সেখানে পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানী বাড়বে মাত্র ৪.৫ শতাংশ। পাট নয় এমন সব পণ্যের রপ্তানীর লক্ষ্যমাত্রা, এই পণ্যগুলির রপ্তানীর পরিমান নিয়োক্ত যুক্তিক বলে বৃদ্ধি করা সম্ভব। তবে সে জন্য রপ্তানীযোগ্য উদ্বৃত্ত সৃষ্টির জন্য সুসমন্বিত বিনিয়োগ কার্যক্রম, মান উন্নয়ন, উপযুক্ত পণ্য মূল্য ও বিপনন নীতি নির্ধারণ প্রয়োজন। সরকারী খাতের সংস্থাসমূহ ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি উভয়কেই তাদের উৎপাদন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করতে হবে, রপ্তানীযোগ্য বিভিন্ন পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধির প্রতি অগ্রাধিকার দিতে হবে, বিদেশে জোর বিপণন তৎপরতা চালাতে হবে এবং মান নিয়ন্ত্রণের দিকে উপযুক্ত মনোনিবেশ করতে হবে। রপ্তানীর অর্থ যোগান, দক্ষ জাহাজ পরিবহণ, শস্যগার ও গুদামের সুযোগ সুবিধে এবং প্যাকেজিং এর সুযোগ সুবিধার মত আনুষঙ্গিক সুবিধা প্রাপ্তির ওপর ও রপ্তানী সম্ভাবনার বাস্তবায়ন নির্ভর করে। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের শিল্পোন্নত দেশে বিশেষ বাণিজ্য ও তারিফ সুবিধা রয়েছে এবং পরিকল্পনা কালে এই অবস্থা শুধু অব্যাহত থাকবে না বরং বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। এছাড়াও বাংলাদেশ দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে আঞ্চলিক বাণিজ্য উন্নয়নের আরো প্রচেষ্টা চালাবে।

৫.৩২ নীচের তালিকায় পণ্য অনুযায়ী রফতানী আয় দেখানো হয়েছে :

সারণী ৫.২

পণ্য রফতানির ধারণা লক্ষ্য মাত্রা
(১৯৭৯/৮০ এর এফওবি মূল্য অনুযায়ী)

[মূল্য কোটি টাকায়]

	পণ্য	একক	১৯৭৯/৮০		১৯৮৪/৮৫	
			পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১।	কাঁচা পাট	লাখ বেল	১৯.৬৮	২২২.১২	২১	২৩৭
২।	পাট দ্রব্য	হাজার টন	৪৫৫	৬০০.১৫	৫৯০	৭৭৯
৩।	জুট কার্পেট	হাজার টন	..	০.২৩	..	১৬
৪।	চা	কোটি পাউণ্ড	৫২৭	৫১.০০	৭.৮০	৭৬
৫।	চামড়া	..	..	১০১.৪৭	..	১৭৮
৬।	মাছ, চিংড়ি ও ব্যাঙের পা	..	..	৬০.৬১	..	১৪৫
৭।	ফল, সবজী ও মশলা	..	..	২.৯৪	..	১৪
৮।	ন্যাপথা, কার্বোন তৈল ও বিটুমিন	..	..	৩৫.৭৪	..	৫৪
৯।	নিউজ প্রিন্ট, কাগজ ও মণ্ড	হাজার টন	২৫.৪৩	১৬.৬১	..	২৬
১০।	তৈরী পোশাক ও বস্ত্র	..	..	১.১৭	..	৭০
১১।	হস্তশিল্প	..	..	৫.০৬	..	৯
১২।	অন্যান্য	..	..	২০.৮০	..	৯৪
	মোট	..		১১১৭.৯০		১৬৯৮

৫.৩৩ **কাঁচাপাট:** ১৯৮০ দশকে মহার্ঘ চাহিদা বৃদ্ধির পূর্বাভাস সত্ত্বেও বাংলাদেশ বর্তমান রফতানীর ধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে, এমনকি পাটের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন মূল্য হ্রাস করা সম্ভব হলে এর পরিধান বৃদ্ধি করতে পারবে বলে আশা করে। কাঁচা পাটের সীমিত বৈদেশিক চাহিদা এবং একদিকে কৃত্রিম আঁশের সাথে প্রবল প্রতিযোগিতা ও অন্যদিকে খাদ্য উৎপাদনের উপর গুরুত্ব আরোপের প্রেক্ষিতে মূল্যের ওঠা-নামা এড়ানোর জন্য বাংলাদেশের উৎপাদন স্থিতিশীল পর্যায়ে রাখা অত্যাবশ্যক। সরবরাহে ঘাটতির জন্য মূল্য চড়া হলে পাটের বাজারে বিকল্প দ্রব্য ঢুকে পড়বে। কিন্তু অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য মূল্য পড়ে গেলে কৃষকরা বিকল্প ফসল উৎপাদনকে লাভজনক হিসাবে গণ্য করবে। কাজেই পাট/ধানের মূল্যের উপযুক্ত অনুপাত বজায় রাখা ও উচ্চ ফলনের মাধ্যমে পাট চাষের ব্যয় হ্রাস পাট বাণিজ্যের সাফল্যের জন্য অত্যাবশ্যকীয় শর্ত।

৫.৩৪ পাট চাষকে ১৭ লাখ একরে সীমিত করা এবং ১৯৮৪/৮৫ এর উৎপাদন ৬০ লাখ বেলে উন্নীত করা কৃষি কর্মসূচীর লক্ষ্য। উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান পন্থা হবে নিবিড় পাট চাষ কর্মসূচীর অধীনে ১০ লাখ একরে উৎপাদন বৃদ্ধি করা। মিলের চাহিদা পূরণ ও একটা যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে পাটের মজুত রাখার পর কাঁচাপাট রফতানী ১৯৭৯/৮০ সালে ২০ লাখ বেলের স্থলে ১৯৮৪/৮৫ সালে মাত্র ২১ লাখ বেলে বাড়ানো যাবে বলে নির্ধারণ করা হচ্ছে।

৫.৩৫ **পাটজাত দ্রব্য:** বিশ্বে পাটজাত দ্রব্যের সামগ্রিক ব্যবহার স্থিতিশীল রয়েছে এবং ১৯৮০ দশকের প্রথমার্ধে পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের কোন আভাস পাওয়া যায়নি। শিল্পোন্নত দেশে চাহিদা আরো হ্রাস পেলে উন্নয়নশীল দেশে ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে তা পূরণ হতে পারে। পতনমুখী বিশ্ব বাণিজ্যের পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশ তার বাজারের অংশ ১৯৭২/৭৩ এর প্রায় ৩৫ শতাংশ থেকে ১৯৭৮/৭৯ প্রায় ৪৮ শতাংশ বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। পাটের যে কোন চাহিদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ লাভজনক পর্যায়ে রয়েছে। এটা অবশ্য নির্ভর করবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরবরাহ ব্যয় হ্রাস করে বিকল্প কৃত্রিম আঁশের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক মূল্য বজায় রাখা এবং উচ্চ মানের দক্ষতা ও গুণগত মানোন্নয়নে পাটশিল্পের সামর্থ্যের উপর। সম্ভাব্য চাহিদা, উৎপাদন ক্ষমতা ও পাটশিল্পে জরুরী কার্যক্রম বিবেচনা করে পাটজাত দ্রব্য রফতানীর পরিমাণ ১৯৭৯/৮০ এর ৪.৫৫ লাখ টন থেকে ১৯৮৪/৮৫ এ ৫.৯০ লাখ টনে বৃদ্ধি পাবে বলে ধরা হয়েছে—এই বৃদ্ধির হার বার্ষিক প্রায় ৫ শতাংশ।

৫.৩৬ **চা:** বাংলাদেশ থেকে চা রফতানী ১৯৭৬/৭৭ এ শুরু করে এবং ১৯৭৮/৭৯ বরাবর রফতানীর পরিমাণ প্রায় ৬৩ মিলিয়ন পাউণ্ডে স্থিতিশীল রয়েছে। বাংলাদেশ থেকে রফতানীর বর্তমান পর্যায় হচ্ছে বিশ্ব চা রফতানীর প্রায় ৩ শতাংশ। কিন্তু তা বিশ্ব চা বাণিজ্যে বাংলাদেশের ৪ শতাংশের কোটার চাইতে কম। এর জন্য দায়ী সরবরাহে অসুবিধা ও অপর্যাপ্ত বিপণন প্রয়াস। ১৯৭৮/৭৯ এ চায়ের উৎপাদন ৭৯.৪ মিলিয়ন পাউণ্ডে পৌঁছে। কিন্তু দীর্ঘ খরার জন্য ১৯৭৯/৮০ এ ৭৮.৪ মিলিয়ন পাউণ্ডে হ্রাস পায়। নতুন গাছ লাগানো ও ব্যাপক চাষের মাধ্যমে চা বাগানগুলোর বর্তমান পুর্নবাসন কর্মসূচী পরিকল্পনা কালে সরবরাহ বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। ১৯৮৪-৮৫ এ উৎপাদন ৯৫ মিলিয়ন পাউণ্ডে পর্যায়ে পৌঁছুবে বলে আশা করা যাচ্ছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের পর পরিকল্পনা কালে রফতানী যোগ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ সামান্য কিছুটা বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। চা রফতানী ১৯৭৯/৮০ এর ৫৩ মিলিয়ন পাউণ্ড থেকে ১৯৮৪/৮৫ এ ৭৮ মিলিয়ন পাউণ্ডে বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হয়েছে। বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে চা বোর্ড ইইসি, পাকিস্তান, মধ্যপ্রাচ্য ও অষ্ট্রেলিয়ার বাজারে খোলা চা, প্যাকেট করা চা ও টিব্যাগ রফতানীর জন্য আন্তর্জাতিক চা উন্নয়ন সমিতির সহযোগিতায় ইতিমধ্যে বাজারজাতকরণ ও উন্নয়ন কর্মসূচী শুরু করেছে। ইইসির বাজারে চা বিক্রীর জন্য পরিকল্পনাকালে লণ্ডনে একটি বাংলাদেশ চা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

৫.৩৭ **মাছ, চিংড়ি ও ব্যাঙের পা:** বিদেশে চিংড়ি বিশেষ করে বাংলাদেশের মিঠাপানির চিংড়ির চাহিদা প্রাণবন্ত এবং চাহিদানুযায়ী রফতানীর বাঁধা হচ্ছে উন্নতমানের পণ্য সরবরাহ ও তা মৌসুমে শিপিংয়ের অভাব রফতানীর জন্য সামুদ্রিক চিংড়ি ধরা বৃদ্ধি, মাছ সংরক্ষণ, গুদাম ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী খাতে ট্রলার ও যান্ত্রিক নৌকা সম্প্রসারণ ও উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষের জন্য মৎস্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে ১৯৮৪/৮৫ তে ৮৫০০০ টনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পরিকল্পনা কালে চিংড়ি ও সামুদ্রিক মৎস্য মাছ রফতানী বৃদ্ধি পাবে। হিমায়িত চিংড়ি ও ব্যাঙের পা রফতানীর মোট আয় ১৯৭৯/৮০ এর ৩১ কোটি টাকার স্থলে ১৯৮৪/৮৪ এ ১৪৫ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাবে। এই লক্ষ্য অর্জনে মান নিয়ন্ত্রণে ও বিদেশী ক্রেতাদের কাছে গ্রহণযোগ্য মান নিশ্চিত করার জন্য একটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

৫.৩৮ **চামড়া:** ১৯৭৫/৭৬ থেকে চামড়া রফতানী স্থিরভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্ব চাহিদার পূর্বাভাষে চলতি দশকে চামড়া সরবরাহে ঘাটতির ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। অভ্যন্তরীণ চর্ম শিল্পের ক্ষমতা, সরবরাহ ও বাজারজাতকরণের সীমাবদ্ধতার জন্য এই খাতে রফতানী বাধাগ্রস্ত হচ্ছে যদিও বাংলাদেশে উন্নত মানের ছাগলের চামড়া উৎপাদিত হয়। সৌখিন 'আপার' ও 'গ্লাভ লেদার' তৈরীর জন্য বাংলাদেশের চামড়ার যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। এদেশের গরুর চামড়াও সুনাম আছে কারণ তা ইউরোপের বড় বাছুরের চামড়ার অনুরূপ। 'ওয়েটব্লু' চামড়ার মান উন্নয়ন এবং ক্রাষ্ট, পাকা চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যের ন্যায় চড়াদামের সামগ্রী প্রস্তুতের মাধ্যমে আয় বাড়ানোর কৌশল অবলম্বন করা যায়।

৫.৩৯ চামড়া রফতানীর আয় ১৯৭৯/৮০ এর ১০১ কোটি টাকা থেকে ১৯৮৪/৮৫ এ ১৭৮ কোটি টাকায় পৌছাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। উচ্চ মূল্যের ট্যান করা চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য রফতানী করে প্রথমত: রফতানী আয় বাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তবে গুণগত মান অর্জনের জন্য জবাই, চামড়া ছাড়ানো ও প্রক্রিয়াজাতের ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে। যেহেতু ফ্রত স্টাইলের পরিবর্তন ঘটছে তাই উচ্চ মূল্যের সামগ্রী রফতানীর জন্য বিদেশী বাজারের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রাখাও জরুরী। এই লক্ষ্যে প্রস্তুত সামগ্রী বাজারজাত করার কারিগর জ্ঞান সম্পন্ন বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে বাজারজাত করণের ব্যবস্থাসহ কারিগরী ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা উৎসাহিত করা উচিত।

৫.৪০ **অন্যান্য সামগ্রী রফতানী:** কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট, তাজা ফল, সবজী ও মশলা, তৈরীপোষাক ও হস্তশিল্প সব মিলিয়ে পণ্যের রফতানীর প্রায় ৫ শতাংশ দাঁড়ায়, তবে এগুলির রপ্তানী সম্প্রসারণের চমৎকার সুযোগ রয়েছে। এই ধরণের পণ্য রফতানী বৃদ্ধির বাধা হলো রফতানীর জন্য অপর্যাপ্তসরবরাহ, পণ্যের মান উন্নয়নের অভাব এবং রফতানী চাহিদার তুলনায় বাজারজাতকরণের অপর্যাপ্ত প্রচেষ্টা। প্রতিবেশী দেশগুলোতে বাংলাদেশের নিউজপ্রিন্টের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। সুষমকরণ ও আধুনিকরণের পর খুলনা নিউজপ্রিন্ট ফ্যাক্টরী রফতানী বাজারে প্রায় ২৬,০০০ টন নিউজপ্রিন্ট সরবরাহ করতে সক্ষম হবে। অনুরূপভাবে সুষমকরণ আধুনিকায়ন ও পুনঃস্থাপনের কর্মসূচী (BMR) সমাপ্তির পর কর্ণফুলী কাগজের কল অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে ১৯৮৪/৮৫ এ প্রায় ১৯,০০০ টন কাগজ রফতানী করতে সক্ষম হবে। মণ্ডের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ১৯৮৪/৮৫ এ প্রায় ১৫,০০০ টনের রফতানীযোগ্য উদবৃত্তসহ ৩০,০০০ টনে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ক্রেতার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনসহ বাজারজাতকরণ প্রচেষ্টা, জাহাজে চালানোর নির্ধারিত সময় তৎপরতা বজায় রাখা পণ্য মান উন্নয়ন ও প্যাকেট করা ইত্যাদির উদ্যোগ নিতে হবে। এই ধরণের পণ্যের রফতানী ১৯৭৯/৮০ এর ২৬ কোটি টাকা থেকে ১৯৮৪/৮৫ এ ১১৯ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

৫.৪১ বাজার জরিপে দেখা যায় যে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি বিশেষ করে সউদী আরব ও উপসাগরীয় দেশে বাংলাদেশী ফল, সবজী ও মশলা বাজারজাতের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। নিয়মিত সরবরাহের জন্য সংগঠিতভাবে রফতানীযোগ্য উদবৃত্ত সৃষ্টি করতে পারলে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা যায়। নিয়মিত সরবরাহ

ব্যবস্থার জন্য হিমাগার ও পরিবহণ সুবিধা এবং বিতরণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। নির্বাচিত এলাকায় ফলমূল ও সবজীর ব্যাপক চাষের একটি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

৫.৪২ ইইসি, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার দেশগুলিতে বাজার সুবিধা ব্যবহার করে তৈরী পোষাক, ঘরে ব্যবহৃত লিনেন ও বিশেষ বস্ত্রাদি রফতানী উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানো যেতে পারে। তৈরী পোশাক ও বস্ত্রাদি (টেক্সটাইল) থেকে আয় ১৯৮৪/৮৫ এ ৭০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। হস্তশিল্প রফতানী বৃদ্ধি পাচ্ছে তবে এই খাতে স্বল্প ব্যয়ে উৎপাদনের জন্য কারিগরী ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রয়োজন। বিশেষ করে কাঁচামালের সরবরাহ, ডিজাইন ও সংগঠিত বাজারজাতকরণ হস্তশিল্প রফতানীর পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি করতে পারে। এই তৎপরতার সহায়তার জন্য হস্তশিল্প রফতানী সামগ্রী উন্নয়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে।

৫.৪৩ ন্যাপথা রফতানী এই পরিকল্পনা কালে ৭৪,০০০ টনে স্থিতিশীল থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সুসমন্বিত বাজারজাতকরণ কর্মসূচীর মাধ্যমে খুলনার কেবল ফ্যাক্টরী ১৯৭৯/৮০ এর ৪৪,০০০ কিলোমিটারের স্থলে টেলিফোন কেবল রফতানী ১৯৮৪/৮৫ এ ১.৯০ লাখ কিলোমিটারে বৃদ্ধি করতে পারবে। পরিকল্পনা কালে সীমিত পরিমাণ ইউরিয়া সার রফতানী সম্ভব হবে। পরিকল্পনা কালে রফতানী-মুখী ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপনের জরুরী প্রচেষ্টা চালাতে হবে। হার্ডবোর্ড ও পার্টিকেলবোর্ড, টিনজাত ফল ও সবজী ইত্যাদির ন্যায় ছোট খাট দ্রব্যের রফতানী আয় ১৯৭৯/৮০ এর প্রায় ২০ কোটি টাকা থেকে ১৯৮৪/৮৫ এ ৩৮ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাবে। প্রচলিত পণ্য রফতানীর আয় লক্ষ্যমাত্রার চাইতে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে যদি বাংলাদেশের রফতানী কারকরা অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিদেশী বাজারের সুবিধা গ্রহণের জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টা চালান।

গ.৩ অদৃশ্য বৈদেশিক আয় ও ব্যয়

৫.৪৪ অদৃশ্য আয়ের মধ্যে রয়েছে বিমান ও শিপিং কর্পোরেশনের সার্ভিসের জন্য অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা, বিদেশী বিমান ও জাহাজ সরবরাহকৃত বিমান জ্বালানী ও বাংকার তেল সরবরাহ, বাংলাদেশী বন্দরে আগত বিদেশী শিপিং কোম্পানীর জাহাজের খরচ, বাংলাদেশে পর্যটকদের ব্যয়, আন্তর্জাতিক অর্থবাজারে সিকিউরিটি ও বণ্ড বাবদ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিনিয়োগকৃত আয় এবং বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী দূতাবাসের ব্যয়। অদৃশ্য আয় ১৯৭৯/৮০ এর ৩৯২ কোটি টাকার তুলনায় ১৯৮৪/৮৫ এ ৪৪৭ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা যায়। অন্যদিকে অদৃশ্য ব্যয় ১৯৭৯/৮০ এর ৩৮৭ কোটি টাকার স্থলে ১৯৮৪/৮৫ এ ৫৯১ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা যায় এবং বৃদ্ধির বার্ষিক হার ৮.৮ শতাংশ। অদৃশ্য ব্যয় বৃদ্ধির প্রধান দিকগুলো হচ্ছে বিমান ও শিপিং কর্পোরেশনের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় ও বিদেশী ঋণের (স্বল্পমেয়াদী ঋণসহ) সুদ পরিশোধ। অদৃশ্য আয়ের তুলনায় অদৃশ্য ব্যয় দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে ১৯৮৪/৮৫ এ মোট অদৃশ্য ব্যয় ১৪৪ কোটি টাকা বাড়বে।

গ.৪ ব্যক্তিগত আয় স্বদেশে প্রেরণ

৫.৪৫ বাংলাদেশী নাগরিকদের বিদেশ থেকে অর্থপ্রেরণ গত কয়েক বছরে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৯/৮০ এ অর্থপ্রেরণের পরিমাণ ছিল ৪০৭ কোটি টাকা। এই সূত্র থেকে প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা আমদানী নীতি যথেষ্ট নমনীয় করতে এবং আংশিক অবাধ বৈদেশিক মুদ্রা বাজার সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে। বাংলাদেশী নাগরিকদের অর্থ প্রেরণ প্রাথমিকভাবে ওয়েজ আর্নার স্কীমের সাথে জড়িত; ১৯৭৫ সালে এই স্কীম চালু করার পর উপার্জনকারী ও প্রাপকদের প্রয়োজন অনুযায়ী এই স্কীমের পরিচালনার যথেষ্ট সংশোধন ও অভিযোজন করা হয়েছে।

৫·৪৬ ভবিষ্যতে অর্থ প্রেরণের মাত্রা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে মোট প্রবাসী শ্রমিক এবং বাংলাদেশে তাঁদের বিনিয়োগ করার জন্য প্রদত্ত সুবিধার উপর নির্ভর করবে। উল্লেখযোগ্য হারে শ্রমিকদের বিদেশ গমন বাংলাদেশের সাম্প্রতিক বৈশিষ্ট্য এবং সারা বিশ্বে মোট প্রবাসী শ্রমিকদের মধ্যে তার অংশ শতকরা একভাগেরও কম। এটা বাংলাদেশ থেকে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার দেশগুলিতে অর্ধদক্ষ ও দক্ষ শ্রমিক প্রেরণ বৃদ্ধির সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে। অভ্যন্তরীণ উন্নয়নকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে এসব দেশে নির্দিষ্ট শ্রেণীর জনশক্তির চাহিদা পূরণে সুপ্রণীত জনশক্তি নীতির উপর সুফল নির্ভরশীল। বাংলাদেশ সস্তা অথচ তরুণ শ্রমশক্তির আধার। এদেরকে দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে নিয়োগের জন্য অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে সাধারণপেশা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া যায়। বর্তমানে এই দুই ভিত্তিতে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীকে প্রয়োজনীয় দক্ষতার শ্রমশক্তি অব্যাহতভাবে সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য স্থায়ী করা প্রয়োজন এবং উপযুক্ত বাজার জরীপের ভিত্তিতে পরিচালনা করা দরকার। আন্তঃ সংস্থা প্রশিক্ষণ সুবিধা সমন্বিত করাও শ্রমিকদের বিদেশে প্রেরণ উত্তর ব্যাপারের জন্য জনশক্তি ব্যুরোকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

৫·৪৭ দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সংখ্যা প্রায় ৩·৪ লাখে বৃদ্ধি পাবে এবং এ বৃদ্ধির বার্ষিক হার ৮ শতাংশ। বর্তমান প্রবাসীদের সন্তান্য আর বৃদ্ধি এবং স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকারী প্রবাসীর সঞ্চিত অর্থ স্থানান্তরের ফলে অর্থপ্রেরণের হার বৃদ্ধি পাবে। এটা ১৯৭৯/৮০-এর ৪০৭ কোটি টাকা থেকে ১৯৮৪/৮৫ এ ৯১৬ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাবে।

৫·৪৮ আমদানী রপ্তানীর হিসাবের ভিত্তিতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮০—৮৫) বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যের অবস্থা নীচের সারণী ৫·৩ এ দেখানো হলো :

সারণী ৫·৩
(লেনদেন ভারসাম্য পরিস্থিতি)
(১৯৭৯/৮০ সনের মূল্যে)

কোটি টাকায়

দ্রব্য	১৯৭৯/৮০	১৯৮৪/৮৫	(১৯৮০—৮৫) মোট
১। আমদানী ..	—৪,০৫৪	—৪,৬১০	—২০,৩৭৭
(ক) পণ্য (সীআইএফ) ..	—৩,৬৬৭	—৩,৭১৯	—১৭,৮০২
(খ) সার্ভিস ..	—৩৮৭	—৪৯১	—২,৫৭৫
২। রফতানী ..	৯,৫১০	২,১৪৫	৯,৪৫৮
(ক) পণ্য (এফওবি) ..	১,১১৮	১,৬৯৮	৭,৪২৫
(খ) সার্ভিস ..	৩৯২	৪৪৭	২,০৩৩
৩। পণ্য ও সার্ভিসের ভারসাম্য (১+২) ..	—২,৫৪৪	—২,১৬৫	—১০,৯১৯
৪। বাণিজ্য সমমূল্যের শর্ত ..	..	— ৬৮২	— ২,৭১০
৫। বিদেশ থেকে প্রেরিত মোট অর্থ ..	৪০৭	৯১৬	৩,৬১১
৬। চলতি হিসাব (৩+৪+৫) ..	—২,১৩৭	—১,৯৩১	—১৩,০১৮
৭। ঋণ পরিশোধ (আইএমএফছাড়া) ..	—২০৪	—১১৮	—৮৬৪
৮। রিজার্ভে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন (—বৃদ্ধি)	১৮৩	..	৩৬
৯। বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবধান (৬+৭+৮) ..	—২,০৫৮	—২,০৪৯	—১০,৮৪৬

গ. ৫ বৈদেশিক মূলধন প্রবাহ

৫.৪৯ বৈদেশিক মুদ্রা আয় ও আমদানী ব্যয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত ব্যবধান সরকারী উন্নয়ন সাহায্য (ওডিএ), বহুজাতিক সংস্থার সহায়তা ও বেসরকারী বিদেশী বিনিয়োগসহ বৈদেশিক মূলধন প্রবাহ দিয়ে পূরণ করতে হবে। সারণী ৫.৪এ বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবধান হিসাব করা হয়েছে ১০,৮৪৬ কোটি টাকা (১৯৭৯/৮০-এর ডলারের স্থিরমূল্য ৬৯৯৭ মিলিয়ন) এবং ৫ বছরের জন্য দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সূত্র থেকে সাহায্য প্রবাহ ৯,৪৪৫ কোটি টাকা (১৯৭৯/৮০ ডলারের মূল্যে ৬,০৯৪ মিলিয়ন)। বৈদেশিক মূলধনের ক্ষেত্রে বর্তমান অসুবিধাজনক সাহায্য পরিস্থিতিকে ধরা হয়েছে এবং বর্তমান স্তরের পর্যায় থেকে মাত্র সামান্য বৃদ্ধির ধারণা করা হয়েছে। এখানে দুটি বিষয় লক্ষ্য করতে হবে। প্রথম, যেহেতু সমুদয় রফতানী-আমদানীর ব্যয় ১৯৭৯/৮০ এর মূল্যে ধরা হয়েছে তাই বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই যে অবনতি হয়েছে তা এই হিসাবে প্রতিফলিত হয়নি প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে প্রথম দু'বছরের বাণিজ্যের পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে এবং বাকী বছর গুলোতে ১৯৮১/৮২র খুবই নিম্নস্তরের তুলনায় সামান্য উন্নতি আশা করা যায়। পাঁচ বছর এ বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ হবে ২,৭১০ কোটি টাকা। দ্বিতীয়, বেসরকারী খাতে সরকারী উন্নয়ন সাহায্য হ্রাসের প্রেক্ষিতে সরকার অত্যাবশ্যকীয় আমদানীর ব্যয়ভার বহনের জন্য চড়া সুদে স্বল্প মেয়াদী বাণিজ্যিক ঋণ নেয়ার ফলে সুদের বোঝা যথেষ্ট বেড়েছে। এই উপাদান বর্তমান মূল্যে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবধান বৃদ্ধি করবে। বর্তমান মূল্যে এই ব্যবধানের পরিমাণ ২,৫৬৩ মিলিয়ন ডলার (পরিশিষ্ট ১)।

৫.৫০ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রথম দু'বছরে বৈদেশিক সাহায্য বন্টনের ঘাটতি পূরণের জন্য সরকারকে তার সীমিত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হতে অর্থ তুলতে হয় এবং স্বল্পকালীন ঋণও নিতে হয়। ফলে ১৯৮২/৮৩ অর্থ বছরের প্রথম থেকেই দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ খুবই নিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে। আয় প্রাপ্তি ও পরিশোধের ধারার মধ্যে ব্যবধানের জন্য এবং বৈদেশিক সাহায্য চুক্তি সম্পাদন ও সাহায্য প্রাপ্তি একই সময়ে না হওয়ার কারণে আমদানী ও উৎপাদন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ন্যূনতম রিজার্ভ রাখার একান্ত প্রয়োজন। সে জন্য বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবধান অতিক্ষেপণে রিজার্ভের কিছু পূর্ণগঠন ধরে নেয়া হয়েছে।

সারণী ৫.৪
রফতানী আমদানী ও বৈদেশিক বিনিময় ব্যবধানের অভিক্ষেপ
(১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে)

[কোটি টাকায়]

বছর	পণ্য ও সার্ভিস রপ্তানী।	পণ্য ও সার্ভিস আমদানী।	বৈদেশিক বিনিময় ব্যবধান।
১৯৭৯/৮০	১,৫১০	৪,০৫৪	২,০৫৮
১৯৮০/৮১	১,৭১১	৪,০৫৭	২,৫৭৪
১৯৮১/৮২	১,৭৫১	৩,৭৬৯	২,০০৮
১৯৮২/৮৩	১,৮৪১	৩,৯৯০	১,৯০৬
১৯৮৩/৮৪	২,০১০	৪,২৫১	২,০০৯
১৯৮৪/৮৫	২,১৪৫	৪,০১০	১,৮৬৯
মোট ১৯৮০—৮৫	৯,৪৫৮	২০,৩৭৭	১০,৮৪৬
বার্ষিক প্রবৃদ্ধি (%)	৭.৪	১.২	৩.৫

চলতি হিসাবে ঘাটতি হ্রাস পরিশোধ এবং বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভে আবশ্যকীয় পরিবর্তন বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবধানে অন্তর্ভুক্ত।

ঘ. বৈদেশিক সাহায্যের গঠন ও পদ্ধতি:

৫.৫১ **খাদ্য সাহায্য:** আগেই বলা হইয়াছে যে পরিকল্পনায় ১৯৮৪/৮৫ সাগাদ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্জন করবে এবং মজুতের জন্য খুব সামান্য পরিমান আমদানী করতে হবে। তাই খাদ্য সাহায্য বরাদ্দ ১৯৭৯/৮০-এর ৩৭৫ মিলিয়ন ডলার থেকে ১৯৮৪/৮৫এ ১০৭ মিলিয়ন ডলারে হ্রাস পাবে। খাদ্য সাহায্য কার্যক্রমের অধীনে সম্পূর্ণ খাদ্য শস্য আমদানীর ব্যয় বহণ করা হইবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

৫.৫২ **পণ্য সাহায্য:** বাংলাদেশে সাহায্য কর্মসূচীর মধ্যে এ পর্যন্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী হ'ল পণ্য সাহায্য। ১৯৭৩/৭৪ সালে খাদ্য বা প্রকল্প সাহায্যের তুলনায় পণ্য সাহায্য দানের পরিমাণ বেশী এবং বিগত বছরগুলোতে তা অব্যাহতভাবে বেড়েছে। পণ্য সাহায্য বিভিন্ন ধরণের কাঁচা মাল ও কতিপয় ভোগ্যপণ্য আমদানীর অর্থ যোগায়। এটা গুরুত্বপূর্ণ বাজেটের বড় রকমের সহায়কও বটে। সাধারণভাবে পণ্য সাহায্য উৎপাদন ক্ষমতার উন্নতর ব্যবহারের লক্ষে উদার আমদানীর সহায়ক। বহু রকমের পণ্য যেমন সুতা, ভোজ্য তৈল, দুগ্ধজাত খাদ্য, পিগ, লৌহ ও বিলেট, সার, ক্লিংকার সিমেন্ট তার, সোডা এ্যাশ, রং ও রাসায়নিক দ্রব্য, ডিজেল, ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল, পাট ও বস্ত্র কলের যন্ত্রাংশ, কাঁচকাগজ, স্টেশনারী শিল্পের কাগজ ও কাঁচামাল, বিদ্যুৎ ও পরিবহণ খাতে ইত্যাদি পণ্য সাহায্যের অধীনে আমদানী করা হয়। পণ্য সাহায্য ১৯৭৯/৮০-এর ৩৮৭ মিলিয়ন ডলার থেকে ১৯৮৪/৮৫এ ৪৭৬ মিলিয়ন ডলারে বৃদ্ধি পাবে। বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদন কর্মসূচী বজায় রাখার উদ্দেশ্যে কাঁচা মালের অবাধ সরবরাহের জন্য সময় মত পণ্য সাহায্যের অঙ্গীকারও এর সরবরাহের নিশ্চয়তা সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখা অত্যাবশ্যক। এ ছাড়া খাদ্য সাহায্য হ্রাস পাওয়ার ফলে শুধুমাত্র পণ্য সাহায্যই বিকল্প তহবিলের লোকসান পূরণ করতে পারে এবং তুলা, বস্ত্র, ভোজ্যতৈল, দুগ্ধজাত খাদ্য ও ঔষধের মত জনসাধারণের মৌলিক চাহিদার সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারে।

৫.৫৩ **প্রকল্প সাহায্য:** প্রকল্প সাহায্য দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৯/৮০এর ৪৭০ মিলিয়ন ডলার থেকে ১৯৮৪/৮৫এ ৭৪০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়াবে। প্রকল্প সাহায্য ব্যবহারের অভিজ্ঞতা ইঙ্গিত দেয় যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বর্দ্ধিত হারে প্রকল্প সাহায্য গ্রহণের অনুকূল। এটা ১৯৭৫/৭৬ এর ১২৪ মিলিয়ন ডলার থেকে ১৯৭৯/৮০এ ৪৬৯ মিলিয়ন ডলারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য খাদ্য সাহায্য হ্রাস ও পরিণামে বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে পণ্য সাহায্যের ক্ষেত্রে সাহায্যদাতারা প্রকল্পের স্থানীয় মুদ্রার বিষয়টি বিবেচনার মধ্যে না ধরলে কিংবা প্রকল্পের স্থানীয় খরচ যোগান না দিলে সেগুলো প্রকল্প সাহায্য ব্যবহারে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। যাহোক অর্থনীতির নিরবচ্ছিন্ন বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য বর্ধিত পণ্য সাহায্য ও প্রকল্পগুলোতে স্থানীয় অর্থ সংস্থান জোরদারসহ প্রকল্প সাহায্য অগ্রণি ভূমিকা পালন করবে।

৫.৫৪ খাদ্য বা পণ্য সাহায্যের তুলনায় প্রকল্প সাহায্যের চুক্তি ও বরাদ্দ খুবই জটিল ও ঝামেলাময়, প্রকল্প সাহায্যের চুক্তি বিশেষভাবে সময় সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। এতে সামগ্রিক ঋণ কর্মসূচী স্থির করা, নির্দিষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন এবং বিভিন্ন অগ্রাধিকার প্রকল্প/কর্মসূচীর জন্য ঋণের উপযুক্ত পদ্ধতির ব্যবস্থা করতে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন। প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দের ক্ষেত্রে যথেষ্ট কালক্ষেপণের প্রেক্ষিতে প্রকল্পের বিবরণ তৈরী রাখা প্রয়োজন। যাতে আলোচনা সময়মত শুরু করা যায় এবং প্রকল্প বরাদ্দের কাজ কাঙ্খিত গতিতে আগাতে পারে। প্রকল্প প্রণয়ন, সাহায্য চুক্তি ও সর্বশেষ পর্যায়ে অনুমোদনের যতদূর সম্ভব সময় সংক্ষেপ করাও প্রয়োজন। এর জন্য পদ্ধতিকে সুষ্ঠু ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

৫'৫৫ মূল্যায়ণ, পর্যালোচনা, অঙ্গীকার বৈচিত্র্য, পরিশোধ পদ্ধতি ও সংগ্রহ ব্যবস্থার শর্তারোপের বেলায় সাহায্যদাতারা নমনীয় না হলে ঐ ধরনের সময়ের পর্যায় বিন্যাস অক্ষুন্ন রাখা কষ্টসাধ্য হতে পারে। খরচ ও সময় বাঁচানো এবং বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহার ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে পদ্ধতির কিছু সমন্বয় ও সাহায্যদাতাদের মধ্যে উন্নততর বোঝাপড়া যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে। এ ব্যাপারে দেশে আঞ্চলিক কূটনৈতিক মিশনগুলিকে আরও ক্ষমতা দিলে অনেক সময় বেঁচে যাবে। অন্যদিকে, একাধিক ও প্রায়শঃ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকল্পের মূল্যায়ন মিশন নিয়োগ করলে যে সময় ও অর্থ ব্যয় হ'তো তাও বেঁচে যাবে। স্থানীয় সামগ্রী সংগ্রহের কিংবা অপেক্ষাকৃত সস্তা অন্য সূত্র থেকে এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও সেই সাথে নির্মাণ কাজে স্থানীয় উপদেষ্টা নিয়োগের শর্তাবলী নমনীয় করে অনেকখানি সাহায্য করতে পারেন।

৫'৫৬ প্রকল্প ও পণ্য সাহায্যের আওতায় উপদেষ্টা সেবা, প্রশিক্ষণ সুবিধাদি, সেই সঙ্গে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের মতোন আকারে কারিগরী সাহায্যও থাকে। সাহায্য নির্ভর প্রকল্পের সম্ভাব্যতা ভিত্তিপ, সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠান ও কারিগরী প্রতিষ্ঠানগুলো ভালভাবে চালু রাখার জন্য দ্বিপক্ষীয় ভিত্তিক সাহায্যদাতা ও বহুপক্ষীয় সংস্থা উভয়ের কাছ থেকে বর্ধিত আকারে কারিগরী সহযোগিতা প্রয়োজন। দেশের উন্নয়ন কর্মসূচীতে সংশ্লিষ্ট কারিগরী সহযোগিতা, অগ্রাধিকারমূলক ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ এবং ক্রমবর্ধিত হারে স্থানীয় যোগ্য উপদেষ্টা নিয়োগের জন্য কারিগরী সহযোগিতার উন্নতি প্রয়োজন। যেহেতু কতিপয় সাহায্যদাতা দেশ পণ্য ও প্রকল্প সাহায্যের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য করেন না। তাই প্রকল্পে অর্থ যোগানের জন্য কিছু পণ্য পাওয়া যাবে বলে ধরা যায়। এরূপ নমনীয় মনোভাব সাহায্যের সদ্ব্যবহারের উন্নয়নে সাহায্য করে।

৫'৫৭ শিল্পে বিদেশী বেসরকারী পুঁজি বিনিয়োগ, তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান, ব্যাঙ্কিং ইত্যাদিসহ বেসরকারী খাতে উৎসাহ প্রদানের প্রেক্ষিতে যৌথ উদ্যোগ, সরাসরি বেসরকারী বিনিয়োগ ও সরবরাহকারী ঋণ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। পরিকল্পনাকালে প্রধান প্রধান খাতে বিদেশী মূলধনের অঙ্গিকার ও বরাদ্দের বিবরণ সারণী ৫'৫এ দেয়া হলো:

সারণী ৫'৫

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে (১৯৮০-৮৫) বৈদেশিক মূলধনের প্রতিশ্রুতি ও বরাদ্দ

(১৯৭৯/৮০ এর অপরিবর্তনীয় ডলারে)

[মিলিয়ন মার্কিন ডলারে]

	ওপেনিং পাইপলাইন	অঙ্গীকার	মোট	বরাদ্দ বন্টন
১। খাদ্য সাহায্য ..	৫৫	৮৮২	৯৩৭	৮৮৩
২। পণ্য সাহায্য ..	৩৯৮	২,২৫২	২,৬৫০	২,১৫৬
৩। প্রকল্প সাহায্য	২,১৫৩	৪,৮৬৭	৭,০২০	৩,০৫৫
মোট ..	২,৬০৬	৮,০০১	১০,৬০৭	৬,০৯৪

৩। বাণিজ্য নীতি সংক্রান্ত বিষয়াবলী

৫'৫৮ পূর্বাহ্নে আমদানী ও রপ্তানী সংক্রান্ত বাণিজ্যের দিকগুলো আলোচিত হয়েছে। নীচে বাণিজ্যনীতির কতিপয় এলাকা যেখানে পরিকল্পনাকালে উন্নয়ন প্রয়োজন সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে:

৫'৫৯ **আমদানী বাণিজ্য:** জাতীয় উন্নয়নে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলি প্রতিফলিত করার লক্ষ্যে আমদানী নীতির কিছু মৌলিক পরিবর্তন করা হবে। ভোগ, উৎপাদন ও রপ্তানীর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হবে আমদানীর উদ্দেশ্য। পরিকল্পনা কৌশলের বিস্তৃত কাঠামোর আওতায় অত্যাবশ্যক নয় এমন

পণ্য আমদানী নিরুৎসাহিত এবং বিদেশী প্রতিযোগিতার মুখে দেশের শিল্পগুলোকে কার্যকর সংরক্ষণ এবং অনভিপ্রেত সংরক্ষণের উপাদান দূর করার নিশ্চিত লক্ষ্যে শুল্ক নীতিকে যুক্তি সংগত করে তুলতে হবে। বাণিজ্য ও শিল্প সংস্কার নীতির উপর একটি সমন্বিত সমীক্ষা এই পরিকল্পনাকালে সম্পন্ন করা হবে।

৫.৬০ বাজেট ও আর্থিক উন্নয়ন কার্যক্রমের সংগে সংশ্লিষ্ট করে ১৯৭৮/৭৯ সাল থেকে পরিমিত আমদানী নীতি প্রণয়ন চালু হয়েছে। এই নীতি অব্যাহত থাকা প্রয়োজন। তা ছাড়া ঘাটতি কিংবা অতিমাত্রায় আধিক্য পরিহার করার লক্ষ্যে কদাচিৎ সার, সিমেন্ট, লোহা ও ইস্পাত, কয়লা, পেট্রোলিয়াম তৈল ও তুলা ইত্যাদি জরুরী ক্ষেত্রে অগ্রিম আমদানী কার্যক্রম ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা আবশ্যক। আমদানীর ধারাবাহিকতা বজায় রাখলে অভ্যন্তরীণ সরবরাহ স্থিতিশীল হবে এবং তাৎক্ষণিক সংকট মোকাবেলা করা থেকে প্রশাসন অব্যাহতি পাবে।

৫.৬১ বাংলাদেশ বহু দেশের সংগে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও লেনদেন চুক্তিতে আবদ্ধ এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক বাণিজ্য অনুরূপ ব্যবস্থার, বিশেষ করে ঋণের ব্যবস্থার আওতাধীন। সাম্প্রতিক বছর গুলিতে পণ্য সরবরাহ উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করে দেশের সীমিত বৈদেশিক মুদ্রার উপর চাপ সৃষ্টি করছে। এর প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে বাণিজ্য চুক্তিতে, বিশেষ করে যেসব পণ্যের জোর চাহিদা রয়েছে সেগুলির অন্তর্ভুক্ত করা থেকে বিরত থাকতে হবে। বাণিজ্য চুক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ করে দুটি আদর্শ বিবেচনা করতে হবে, যথা

(ক) প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে অত্যাবশ্যকীয় পর্যায়ের আমদানীর উপর ভিত্তি করে চুক্তির আকার নির্ধারিত করতে হবে; এবং

(খ) স্বল্প সময়ের মধ্যে রপ্তানী ও আমদানীর লেনদেনকে সমন্বিত করতে হবে যাতে রপ্তানী আয় অধিক না হয়।

৫.৬২ অত্যাবশ্যকীয় নয় ও বিলাস দ্রব্য এমন আমদানী ক্ষেত্রে আমদানী কারকের সক্ষমতা ও উৎসাহ প্রদানকে বিসর্জন না দিয়ে ও বন্ধ করার জন্য সময়ে সময়ে ক্ষেত্রের তৎপরতা পর্যালোচনা করতে হবে।

৫.৬৩ **রপ্তানীবাণিজ্য** : রপ্তানী বৃদ্ধি ও বাঞ্ছিত বহুমুখিতা অর্জনের জন্য সময়োপযোগী বিনিময় হার নীতি অনুসরণ প্রয়োজন। সাধারণতঃ ঘাটতিসম্পদ খাতে কাঠামোগত সামঞ্জস্য বিধানের জন্য যেখাতে বাণিজ্য প্রধান পণ্য উৎপাদিত হয় সেইসব খাতে সম্পদের প্রবাহ উৎসাহিত করার উপযোগী করে বিনিময় হার নীতি নির্ধারণ করতে হবে। তবে বিনিময় হারের সংগে বৈদেশিক বিনিময় অবস্থান মূল্য সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার সংগে সংগে সেটাকে অবশ্যই উৎপাদন কাঠামো ও সরবরাহের সমস্যাগুলির ব্যাপারে বিরাজমান বস্তুনিষ্ঠ অবস্থাগুলির আলোকে মূল্যায়ন করতে হবে। কাঠামোগত অনমনীয়তা ও প্রতিষ্ঠানিক নানা বিষয় অভ্যন্তরীণ সম্পদের আন্তঃখাত স্থানান্তরে অন্তরায় হলে কেবলমাত্র মূল্য বাঞ্ছিত ফল দিতে পারে না। সুদের রেয়াতী হার, রপ্তানী সম্পাদন লাইসেন্স (এক্সপিএল) ও কর রেয়াতের আকারে রপ্তানীকারকদের আর যেসব উৎসাহ দেয়া হচ্ছে রপ্তানী বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সেগুলোর পুনর্বিবেচনা আবশ্যক। বিশেষ করে এক্সপিএল পদ্ধতির রপ্তানী সম্পাদন লাইসেন্স মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে নীট বৈদেশিক মুদ্রা আয়, শ্রমমুখী উৎপাদন, দেশজ কাঁচামাল ব্যবহার, রপ্তানীতে বহুমুখিতা আনয়নে অবদান ইত্যাদি বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত। শুল্ক ফেরত প্রকল্প রপ্তানীকারকদের অত্যন্ত সীমিত আকারে উৎসাহিত করতে সক্ষম হয়েছে। কারণ, পদ্ধতিটি জটিল ও সময় সাপেক্ষ। তাই কর ও শুল্ক ফেরত দানের উদ্দেশ্য দলিলাদির সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য স্কীম-টিকে সফল করা দরকার।

৫.৬৪ সরকারী খাতের সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিল্প পণ্যের সিংহভাগ রপ্তানী হয়। তবে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাগুলি মূল্য বা বাজার সুবিধার ব্যাপারে সজাগ হয় বা রপ্তানী বহুমুখিতার প্রতি প্রতি ধীরে সাড়া দেয়। এটা তাদের বাণিজ্যিক দৃষ্টি ভংগির অভাব বা আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের

কারণে করে। সরকারী সংস্থার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও তার ফলাফল পর্যালোচনা এই সমস্যা দূর করা ও তাদের রফতানী তৎপরতা উন্নয়নে সহায়তা করতে পারে। পাটজাত দ্রব্য, চা ও চামড়ার প্রচলিত বাজার এবং নতুন এলাকায় রফতানীর চেষ্টা করতে হবে। রফতানী সম্ভাবনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও বাণিজ্য মেলার আয়োজনই যথেষ্ট নয়, পণ্য বিক্রির ব্যাপক প্রচেষ্টার জন্য বেসরকারী খাতের সহযোগিতায় এক্সপোর্ট হাউস প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রফতানী প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল যদিও বিদেশী মূলধন ও জ্ঞান আকর্ষণে সহায়ক তবুও তা বিদেশী বিনিয়োগকারীর উদ্যোগের উপর নির্ভরশীল।

পরিশিষ্ট-১

বৈদেশিক লেন দেনের ভারসাম্য অভিক্ষেপ

(বর্তমান মূল্যে)

[মিলিয়ন মার্কিন ডলারে]

	১৯৭৯/৮০	১৯৮০/৮১	১৯৮১/৮২	১৯৮২/৮৩	১৯৮৩/৮৪	১৯৮৪/৮৫
১। আমদানী						
(ক) পণ্য (সিআইএফ)	—২৩৬৬	—২৫৩৩	—২৩০০	—২৩৭৭	—২৭৫০	—২৯৯৮
(খ) সার্ভিসসমূহ	—১৫২	—২৬০	—৩০৭	—৩৫৫	—৩৫৩	—৩৭০
২। রফতানী						
(ক) পণ্য (এফওবি)	৭২১	৭১১	৬২৬	৭০০	৭৮৪	৮৮০
(খ) সার্ভিসসমূহ	১৬৫	২৭১	২৩৯	২৪৫	২৬৮	২৮৮
৩। পণ্য ও সার্ভিসের ভারসাম্য (১+২)	—১৬৩২	—১৮১১	—১৭৪২	—১৭৮৭	—২০৩১	—২২০০
৪। বিদেশ থেকে মোট অর্থ প্রেরণ	২৬৩	৩৫৭	৩৮৫	৫০০	৬০০	৭০০
৫। চলতি হিসাব ..	—১৩৬৯	—১৪৫৪	—১৩৫৭	—১২৮৭	—১৪৩১	—১৫০০
৬। ঋণ পরিশোধ ..						
(ক) এমএলটি ডেট এমর টাইটিজেশন	—৪৬	—৩৪	—৪৪	—৯২	—৬৯	—৭৬
(খ) অন্যান্য ঋণ পরিশোধ	—২১	—৪৩	—৫১	—৯৯	—৫০	..
৭। রিজার্ভ পরিবর্তন (—=বৃদ্ধি)	১১৮	২৩	১৩৯	—৭০	—৭০	
৮। বৈদেশিক বিনিময় ব্যবধান (৫+৬+৭)	—১৩১৮	—১৫০৬	—১৩১০	—১৫৪৮	—১৬২০	—১৫৭৬
৯। সাহায্য বরাদ্দ ..	১২২৩	১৩৪৭	১২৩৫	১৩৪৫	১৫১০	১৬৬০
(ক) ঋণ ..	৩৭৫	১৯৪	২০০	২৬০	২৪০	২৪০
(খ) পণ্য ..	৩৭৮	৩৯৩	৪২১	৪৭৫	৫২০	৬০০
(গ) প্রকল্প ..	৪৭০	৫৬০	৫৮৪	৬১০	৭৫০	৮২০
১০। মোট আইএমএফ সম্পদ ..	১১৭	১৫৫	৭৯	৩৬	—৬৪	—৭০
১১। অন্যান্য মূলধন ও ঋণ ..	৭২	১৪৯	১০৩	৩০	৩০	..
১২। বছর শেষে মজুদ ..	২৭৪	২৪৯	১১০	১৮০	২৫০	২৫০
১৩। বিনিময় হার ..	১৫·৩০	১৬·৩৪	২০·০০	২০·০০	২০·০০	২০·০০

৯৬ অধ্যায়

পল্লী উন্নয়ন

গ্রামীণ বাংলাদেশ

বাংলাদেশ গ্রাম প্রধান এবং এর অর্থনীতিতে রয়েছে কৃষির প্রাধান্য। এর জনসংখ্যার প্রায় ৮৭ শতাংশ লোক গ্রামে বাস করে এবং শ্রম শক্তির ৭০ শতাংশের ও বেশী কৃষি কাজে নিয়োজিত, মার্গিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে কৃষির অবদান প্রায় ৫৫ শতাংশ। পল্লী খাতে এটাই প্রধান অর্থনৈতিক তৎপরতা এবং অকৃষি বা খামার বহির্ভূত খাতে প্রবৃদ্ধি খুবই কম।

৬·২ কম উৎপাদন, জনসংখ্যার উচ্চ চাপ ও বেকারত্ব, কৃষির বাইরে কাজের সুযোগের অভাবের মধ্যে পল্লী অর্থনীতির স্বল্পোন্নয়ন প্রতিফলিত এবং এর ফলে পল্লীর দরিদ্র জনগণের জীবন যাপন অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটছে। ভূমিহীনতার পরিধি বেড়েছে এবং তা পল্লীর জনসংখ্যার প্রায় ৫১ শতাংশ (একেবারে ভূমিহীন এবং যাদের ০·৫০ একর পর্যন্ত জমি আছে) এবং বেকারত্ব ও নিম্ন পর্যায়ে কর্ম সংস্থানের পরিমাণ শ্রম শক্তির ৩০ শতাংশের ও বেশী। যদিও কৃষিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে, তবুও ক্রমবর্ধমান শ্রম শক্তির অবিরত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা কৃষির দ্বারা সম্ভব নয়। কৃষির বাইরে কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত হওয়ায় চাষাবাদহীন মৌসুমে কর্মসংস্থান পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করে। একদিকে ভূমিহীনতা ও বেকারত্ব অন্যদিকে কাজের সুযোগের অভাব, এর ফলে পল্লী অঞ্চলে ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান দারিদ্র ছড়িয়ে পড়ছে।

৬·৩ খামার খাতে বৈষম্যমূলক জমি বন্টনের ফলে ভাগ চাষ, নিম্ন উৎপাদন এবং ক্ষুদ্র কৃষকের আয়ের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে ৭·৫ একরের উর্ধ জমির ৯ শতাংশের মধ্যে খামার এলাকার পরিমাণ ৩২ শতাংশ, সেখানে ২·৫ একরের কম জমির ৫০ শতাংশের মধ্যে খামার এলাকার পরিমাণ ১৯ শতাংশ। এক একরের কম জমির পরিমাণ ১৬ শতাংশ এর মধ্যে খামার এলাকার পরিমাণ মাত্র ২·৬ শতাংশ। আর্থ সামাজিক প্রক্রিয়া ক্ষুদ্র আকারের জমির আরো (এক একরেরও কম) বিলুপ্তি ঘটিয়েছে এবং মাঝারি আকারের জমির (২·৫ একর থেকে ৭·৪ একর) পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে এবং ভূমিহীনতা, বেকারত্ব ও দারিদ্র বাড়িয়ে তুলছে। জমির ক্ষুদ্রাকৃতি ও ভাগচাষ ব্যবস্থার কারণে উচ্চতর প্রযুক্তি গ্রহণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে এবং এর ফলে উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে।

৬·৪ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়াও রাস্তা, পানি নিষ্কাশন, গুদাম ইত্যাদির মত অন কাঠামোগত সুবিধা এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য জিনিসের মত সেবামূলক ব্যবস্থার প্রকট অভাব রয়েছে।

৬·৫ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচীতে পল্লী উন্নয়ন অগ্রাধিকার পেয়েছে। কিন্তু গৃহীত কৌশল ও কর্মসূচী মূলতঃ কৃষির প্রবৃদ্ধির জন্য দেয়া সত্ত্বেও প্রধানতঃ ভূমির মালিক শ্রেণীই এর ফলে উপকৃত হয়েছে। পল্লীর দরিদ্ররা পেয়েছে খুবই সামান্য বা প্রান্তিক সুবিধা। দেশব্যাপী দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী হচ্ছে দুই স্তরের সমবায়ের আকারে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী (আইআরডিপি) এবং পল্লী পূর্ত কর্মসূচী (আর ডব্লু পি)। ৪৮০টি থানার মধ্যে ৩৫০টি থানার সমবায় হচ্ছে উন্নত কৃষি তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য কৃষি সমবায়। এই সমবায়গুলোতে ক্ষুদ্র চাষীদের অংশগ্রহণের পরিমাণ খুব কম এবং ভূমিহীন শ্রমিকের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য নয়। পল্লী পূর্ত কর্মসূচীর মৌল লক্ষ্য হচ্ছে বাস্তব অবকাঠামোর উন্নয়ন ও কর্ম সংস্থান সৃষ্টি। কিন্তু এর পরিসর এবং মৌসুমভিত্তিক কাজ হওয়ার কারণে ক্রমবর্ধমান শ্রম শক্তির জন্যে অব্যাহত-ভাবে কাজের সংস্থান করার সুযোগ সীমিত। কর্মসংস্থানের যে ব্যবস্থা করা হয় তাও খুব অস্থায়ী ধরনের।

৬.৬ ১৯৭৬ সাল থেকে নির্দিষ্ট এলাকা ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং অনুরূপ তিনটি প্রকল্প (পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ১, সিরাজগঞ্জ আইআরডি প্রকল্প ও নোয়াখালী আইআরডি প্রকল্প) ৫ থেকে ৬ বছর সময় চালু রয়েছে। মোট ১৩৩ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ এই প্রকল্পে মাত্র ১৪টি থানা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অর্থাৎ একটি থানায় গড়পড়তা ব্যয় ৯.৫ কোটি টাকা। ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে বহুবিধ কার্যাবলী থাকার কারণে প্রকল্পগুলিতে সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনার সমস্যা দেখা দেওয়ায় বাস্তবায়নের সময়সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এই সব প্রকল্পে প্রধান বিনিয়োগের মধ্যে রয়েছে অবকাঠামো, ভবন, সেচ সমৃদ্ধিত কৃষি ও সীমিত এলাকায় সামাজিক সেবামূলক কাজ।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার পর্যালোচনা

৬.৭ দারিদ্র হ্রাস এবং উন্নয়নের জন্য উৎপাদন ও প্রতিষ্ঠানিক কর্মসূচী গ্রহণ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল এতে পল্লীর জনগণের প্রতিষ্ঠানিক সমস্যা, সম্পদের ব্যবহার এবং স্থানীয় পরিকল্পনা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য পল্লীর প্রতিষ্ঠানগুলোর পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। এতে প্রতিষ্ঠানিক দুর্বলতাকে চিহ্নিত করে বলা হয়েছে যে এটা উপর থেকে চাপানো, অপ্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র এবং ভিতর থেকে সম্পদ সংগ্রহের উপর পর্যাপ্ত গুরুত্ব আরোপ ব্যতিরেকে কেই বাহির থেকে প্রাপ্ত সম্পদ বিতরণ ও ব্যবহারের একটি মাধ্যম পরিকল্পনাটিতে বিভিন্ন গ্রুপের প্রতিনিধি নিয়ে ব্যাপক ভিত্তিতে সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়েছে যা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিজস্ব ব্যবস্থাপনা ও নিজস্ব অর্থে চলতে সক্ষম হবে, আমলাদের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত এবং উৎপাদন বৃদ্ধি ও আয়ের সমবন্টনে সক্ষম হবে।

সমবায়

৬.৮ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমবায় আন্দোলনের জন্য নিম্নলিখিত লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে :

(ক) সমবায় প্রতিষ্ঠানকে ব্যাপক ভিত্তিক করা এবং ব্যবস্থাপনায় গ্রুপগুলির আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে সমবায়সমূহ ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের মত দরিদ্র গ্রুপগুলির স্বার্থ রক্ষা করা। আইআর ডিপি-র দৃষ্টান্তের কাঠামোর মধ্যে গ্রুপগুলো থাকবে।

(খ) প্রাথমিক সমবায়কে উপকরণ বিতরণের ডিলারশীপ দেয়া হবে।

(গ) সমবায়গুলো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিকল্পনা ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সাহায্য করবে এবং এ উদ্দেশ্যে শ্রমিক সংগ্রহ করবে।

(ঘ) ডিসিসিএ সদস্যদের প্রতিনিধি সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি সমবায় উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হবে এবং আইআরডিপিকে বোর্ডের অধীনে ন্যাস্ত করা হবে।

(ঙ) সমবায় বিভাগ মৎস্য, পরিবহন, বুনন ইত্যাদি ক্ষেত্রের সমবায়কে উৎসাহিত করবে।

স্থানীয় সরকার ও পল্লী পূর্ত কর্মসূচী

৬.৯ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়সহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে :

(ক) স্থানীয় সরকার সর্বনিম্ন পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মসূচীর কার্যকর পরিকল্পনা, সমন্বয় ও জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।

(খ) সমস্যা আলোচনা, কাজের পরিকল্পনা এবং সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গ্রাম পর্যায়ে একটি আনুষ্ঠানিক গণপরিষদ গঠন করা হবে।

(গ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো অবকাঠামো, সেচ, গণস্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সমাজকল্যাণমূলক সার্ভিস প্রদান ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং আইন শৃংখলা পরিস্থিতি রক্ষা, সমবায়ের উন্নয়নের জন্য দায়ী থাকবে।

(ঘ) আরডব্লুপিকে ঋণ ও অনুদান ভিত্তিতে অর্থ প্রদান করা হবে এবং সুবিধাভোগীরা ঋণ পরিশোধের মাধ্যমে উপকারিতার ব্যয় বহন করবে। ইউনিয়ন পঞ্চায়েত ঋণ আদায় করবে।

৬·১০ দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা প্রকৃত পক্ষে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যে একটি অন্তবর্তীকালীন পরিকল্পনা। এর উদ্দেশ্য চালু কর্মসূচী ও প্রকল্পগুলো সমাপ্ত করা। পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এতে নীতি বা সূচীর ক্ষেত্রে বড় ধরনের কোন পরিবর্তন করা হয়নি।

৬·১১ দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় ৩০০ থানায় আইআরডিপি সমবায় সম্প্রসারণ সমবায় বিভাগের জেলে ও চাষী প্রভৃতির সমবায় সম্প্রসারণ, পল্লী পূর্ত কার্যক্রম সম্প্রসারণ, গ্রামে স্বনির্ভর কর্মসূচীর উন্নয়ন, ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে জমি বিতরণের জন্য প্রতিষ্ঠান এবং এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচী নামে অভিহিত নির্দিষ্ট এলাকায় বহুখাত বিশিষ্ট উন্নয়ন কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত।

৬·১২ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সুপারিশকৃত মূল আদর্শ ও নীতি বাস্তবায়িত হয়নি। প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো আগের মতই, রয়ে গেছে। স্থানীয় সরকার কাঠামো ইউনিয়ন পর্যায়ে উপর পর্যন্ত গণপ্রতিনিধিহীন রয়ে গেছে এবং জনগণের বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রুপের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা যায়নি। প্রস্তাবিত সমবায় উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়নি, আইআরডিপির সম্প্রসারণ অব্যাহত রয়েছে এবং ক্ষুদ্র ও ভূমিহীন চাষীদের প্রতিষ্ঠানিক চাহিদা মিটানোর ব্যাপারে এর সুযোগ সীমিত রয়ে গেছে। বিপুল সংখ্যক অদক্ষ কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্ম সংস্থানের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্মসূচী নেই। স্থানীয় সরকারের সদস্য, সরকারী কর্মকর্তা, সমবায়ের সদস্য ও অন্যান্যের প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী টিটিডিসি ও অন্যান্য ইন্সটিটিউটের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পূর্বে উল্লেখিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পগুলি প্রতিষ্ঠানিক ও ব্যবস্থাপনার অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। এর ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এ ছাড়া কর্মসূচীতে ভূমিহীনও দরিদ্র গ্রুপের আয়ের সুযোগ প্রদান ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার সুযোগ নেই বললেই চলে।

৬·১৩ উন্নয়ন কর্মসূচীগুলি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কেন্দ্র ভিত্তিক রয়ে গেছে। নেতৃত্বের সংকট, সংস্থাগুলোর মধ্যে বিরোধ এবং শক্তিশালী স্থানীয় সরকারের অভাবে স্থানীয় পরিকল্পনা ও সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠান হিসেবে টিটিডিসি-র কর্মতৎপরতার ক্রমাবনতি ঘটেছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

৬·১৪ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার উৎপরতা এবং সুবিধার অসম বন্টনের পটভূমিতে পল্লী এলাকার উন্নয়নের জন্য বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলোর পুর্বগঠন, বর্তমান কর্মসূচীকে পুনঃ পরিচালনা ও নূতন কর্মসূচীর জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রেক্ষিত পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের ভিত্তি স্থাপন করবে। পরিকল্পনাকালে একটি উৎপাদনমুখী ও সামাজিকভাবে কাংখিত কল্যাণ ধর্মী প্রক্রিয়া শুরু করা হবে যাতে কৃষি ও অকৃষি উভয় খাতে ব্যাপক তৎপরতা, দক্ষতা উন্নয়ন, কুটির ও গ্রামীণ শিল্প, স্বাস্থ্য পরিচ্ছন্নতা ও পুষ্টির মত কল্যাণধর্মী সেবা, পল্লীর মহিলা ও শিশুদের উন্নয়ন এবং অবকাঠামো ও প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৬·১৫ বিশেষ করে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল লক্ষ্যগুলো হলো—

(১) পল্লীর দারিদ্র্যতা হ্রাস করা এবং এই উদ্দেশ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও পল্লীর দরিদ্র লোকদের আয় বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে সকলের মধ্যে সুযোগের সুষ্ঠু বিতরণ নিশ্চিত করা।

(২) নির্দিষ্ট গ্রুপের বিশেষ করে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষী, খামার শ্রমিক ও কারিগরদের মধ্যে বেকারত্ব ও আংশিক বেকারত্ব হ্রাস করা।

(৩) ভোগ ও আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো সুবিধা সৃষ্টি ও বজায় রাখা।

(৪) পরিকল্পনার প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রশাসনিক পরিবর্তন সূচনার লক্ষ্যে পল্লীর জনগণকে সংগঠিত করা এবং নেতৃত্ব, দক্ষতা ও সম্ভাবনা উন্নয়নের জন্য স্থানীয় প্রশাসন গড়ে তোলা।

কৌশল ও নীতিমালা

৬' ১৬ এই পরিকল্পনা স্থানীয় সরকারের সহায়কদের প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকাশ সাধনে সক্ষম হবে ইতিমধ্যে যে সম্পর্কে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে স্থানীয় উন্নয়ন প্রভাবান্বিত হবে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো যে সব লাভ-লাভিক পালন করবে তা হবে সম্পূর্ণভাবে তাদের নিজস্ব এবং এই সব কার্যক্রমের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কোন সম্পর্কীয়ের কর্তৃত্ব থাকবে না। এই সব কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে লোক ও অর্থের আকারে পর্যাপ্ত সম্পদ দিতে হবে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিকল্পনার প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা থাকতে হবে। এগুলো শুধু স্থানীয় সম্পদ ও চাহিদার উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনাই প্রণয়ন করবে না উপরন্তু এসব পরিকল্পনার বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালাবে। স্বভাবিকভাবে এই প্রক্রিয়ার অর্থ হলো কেন্দ্র থেকে জেলা ও থানা পর্যন্ত সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তর এবং এর সাথে সাথে প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ। এটা স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করবে।

৬' ১৭ ইউনিয়ন, থানা ও জেলা পর্যায়ে স্থানীয় নির্বাচিত সরকারের একটি পদ্ধতি স্থাপন করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কতিপয় তৎপরতা বিভিন্ন স্তরের স্থানীয় সরকার সংস্থার কাছে স্থানান্তর করা হবে। পল্লীর রাস্তা, বাজার, ওয়্যারহাউস ও ওয়ার্কশপ উন্নয়ন, প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব, পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা থানার আওতাধীন থাকবে এবং স্থানীয় সরকারের থানা পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলি এই ধরনের অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন করবে। এই পরিবর্তনের জন্য পরিকল্পনাকালে একটি কর্মমুখর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কিছু রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা থাকবে তবে তাদের রাজস্বের প্রধান সূত্র হবে পূর্ব নির্ধারিত কেন্দ্রীয় রাজস্বের অংশ এবং জাতীয় উন্নয়ন তহবিলের একটি অংশ।

৬' ১৮ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়নের দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এরা জনসম্পদ ও সামগ্রীর জরিপ করবে, উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করবে, অগ্রাধিকার ও লক্ষ্য নির্ধারণ করবে এবং সর্বশেষ পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। থানা ও জেলার পরিকল্পনা প্রস্তুতিকালে সতর্কতার স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনার সাথে সামগ্রিক জাতীয় পরিকল্পনার সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হবে। জাতীয় পরিকল্পনা কাঠামোর মধ্যে আঞ্চলিক পরিকল্পনার পদ্ধতি এবং বিকেন্দ্রীকরণ পরিকল্পনা পদ্ধতি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন।

৬' ১৯ পল্লী এলাকায় উৎপাদন পরিকল্পনা, প্রণয়ন প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্ম তৎপরতার জন্য সমবায়কে একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। পল্লীতে এই ধরনের তিনটি সমবায় অথবা প্রাক-সমবায় বা ধরোয়া গ্রুপ লালন ও বিকাশ করতে হবে। এগুলো হলো: (ক) কৃষির জন্য কৃষি সমবায় সমিতি (কেএসএস), (খ) পল্লীর দরিদ্রের জন্য বিত্তহীন সমবায় সমিতি (বিএসএস) এবং (গ) দুস্থ মহিলাদের জন্য মহিলা সমবায় সমিতি (এমএসএস)। বি,এস,এস, গঠন করতে হবে ভূমিহীন বা যাদের ০.৫০ একরের কম জমি আছে তাদের নিয়ে।

৬·২০ সমবায়ের জন্য বর্তমান দুই স্তরের টিসিসিএ-কেএসএস পদ্ধতির ভিত্তিতে একই ধরনের কাঠামো গড়ে তোলা হবে। গ্রামভিত্তিক প্রাথমিক গ্রুপ, কে এস এস, বি এস এস ও এম এস এস সমবায়সমূহকে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থাসহ থানা পর্যায়ে সঙ্ঘবদ্ধ করা হবে। প্রাথমিকভাবে, উচ্চ পর্যায়ে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গড়ে না তোলা পর্যন্ত বি এস এস ও এম এস এস থানায় টি সি সি-এর সঙ্গে যুক্ত করা হবে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় একক কাঠামোতে পুনর্গঠিত করার জন্য সমবায়গুলোর শ্রেণী বিন্যাসের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

৬·২১ পল্লী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন, বিভিন্ন সংস্থার কর্মসূচীর মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং বিভিন্ন পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন তদারকের লক্ষ্যে সরকার বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেছেন। বোর্ড সমবায় উন্নয়ন এবং সেগুলোকে সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার উদ্দেশ্যে নীতি প্রণয়নও করবে। সমবায় বিভাগ বিধিবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণ কাজ কর্মের দায়িত্ব পালন করবে।

৬·২২ ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ ও জেলা পরিষদ জনপ্রতিনিধিদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হবে। পক্ষান্তরে সমবায় হবে অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী এবং আর্থিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়নে, ঋণ সহযোগিতা প্রদানে, পল্লী মূলধন গঠনের ব্যাপারে এই অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনায় খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এতদ্ব্যতীত, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভাগীয় এবং স্বায়ত্ব শাসিত উভয় সংস্থা থাকবে যারা কারিগরী সহযোগিতা, সরবরাহ, সার্ভিস সুবিধা এবং স্থানীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মান নির্ধারণে নিয়োজিত থাকবে। যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় সরকারের একটি ইউনিটের ভৌগলিক সীমানার মধ্যে কাজ করবে সেখানে স্থানীয় সরকারের একটি উপযুক্ত ইউনিট কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থাগুলোর জন্য সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করবে। এইভাবে জাতীয় উন্নয়ন তৎপরতা স্থানীয় পরিকল্পনার সাথে অবিচ্ছন্ন থাকবে এবং স্থানীয় চাহিদা ও কার্যকলাপে সাড়া দিবে।

৬·২৩ অপরিহার্যভাবে উন্নয়ন তৎপরতার তিনটি পর্যায় থাকবে। কিছুকাজ সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থাগুলো করবে। কিছু কাজ থাকবে সম্পূর্ণভাবে ইউনিয়ন পরিষদের আওতাধীন এবং আন্তঃথানার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ করবে জেলা পরিষদ। এই তিন পর্যায়ের তৎপরতার মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন। থানা পরিষদের অধীনে বিশেষজ্ঞদের ব্যবস্থা এই সমন্বয়ের কাজে যথেষ্ট সহায়তা করবে কারণ নিম্ন পর্যায়ে প্রকৃত পরিচালক হচ্ছে থানা পর্যায়ের কর্মকর্তারা। প্রকৃত সমস্যা হবে জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যাতে স্থানীয় পরিষদের মত পার্থক্যের কারণে বিচ্যুত না হয় তা নিশ্চিত করা এবং স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত সার্ভিসের মানের সমতা যাতে বজায় থাকে। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা, সমন্বয় ও পরিদর্শনের কাজ হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৬·২৪ স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনার উন্নয়নের একটি সংকটময় ক্ষেত্র হলো বেকার শ্রম শক্তির ব্যবহার। ব্যাপক কৃষি ও সেচ প্রযুক্তি নিঃসন্দেহ যথেষ্ট পরিমাণে অতিরিক্ত শ্রমিকের কর্মসংস্থান করবে। কিন্তু বিপুল সংখ্যক বেকার শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য ইহা যথেষ্ট নয়। পল্লীর বেকার শ্রমিকদের বর্ধিত আয়ের ব্যবস্থা না করলে কৃষি উৎপাদন অবশ্যই ব্যাহত হবে। সেহেতু, পল্লীর বেকার জনসংখ্যাকে দক্ষ করে তোলা এবং তাদের দক্ষতাকে উৎপাদনমুখী কাজে লাগানোর সুযোগ দান করা জরুরী। পল্লী অঞ্চলে আয় বৃদ্ধির জন্য থানার বহির্ভূত তৎপরতার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ, সম্প্রসারণ ও ঋণের উপর জোর দিতে হবে।

৬.২৫ আমাদের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হচ্ছে মহিলা। এই বিপুল জনশক্তিকে সামাজিক শিক্ষা ও উৎপাদন মুখী কাজে লাগাতে হবে। পল্লী অঞ্চলের মায়েদের সংগঠিত করতে হবে এবং পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিশুর যত্ন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তাদেরকে গৃহকর্মের সাথে সাথে আয়ের সুযোগ-সুবিধা (দক্ষতা, ঋণ, উপকরণ) দেয়া হবে। এই তৎপরতার মধ্যে রয়েছে বুনন ও ছাপার কাজ, খাদ্য ও শস্য প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণ, গবাদি-পশু ও হাঁস-মুরগী পালন, সবজী বাগান ও ঘরে সেলাইয়ের কাজ ইত্যাদি।

৬.২৬ সার্বিক পল্লী উন্নয়নের জন্য পল্লী এলাকায় সমন্বিত সার্ভিস কেন্দ্রের প্রস্তাবিক সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে সব থানা সদর দপ্তরকে অনুরূপ সার্ভিস কেন্দ্র হিসাবে উন্নত করা হবে। এসব কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় বাজার সুবিধাদির উন্নয়ন করা হবে। পরিবহন ও যোগাযোগের মাধ্যমে এগুলোকে জেলা সদর দপ্তর এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প কেন্দ্রগুলির সাথে যুক্ত করা হবে। সেখানে বৈদ্যুতিক সংযোগ দেয়া হবে। ডাকার হাটিন ও ডাক্তারদের সুবিধারও ব্যবস্থা করা হবে। সেখানে উৎপাদন উপকরণের জন্য গুদাম ও সার্ভিস প্রদানের কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হবে। বি এ ডি সি, বি কে বি, আই আর ডি পি, আরইবি ও এন সি বি ইত্যাদির মত বিভিন্ন সংস্থার সার্ভিস প্রদান কেন্দ্রগুলোর অবস্থান এসব প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রের কাছাকাছি স্থানে করতে হবে। একই সঙ্গে পল্লীর হাট-বাজারের মত গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোকে প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা হবে এবং পল্লীর জনগণের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সব সুবিধা দেয়া হবে। এসব প্রবৃদ্ধির কেন্দ্রের উন্নয়নের ফলে একদিকে অর্থনৈতিক তৎপরতাকে পল্লী এলাকার সরিয়ে নিয়ে যাবে অন্যদিকে শহরের বস্তির দিকের চাপকে প্রতিহত করবে। এসব প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রে কৃষি ভিত্তিক এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাত শিল্প এবং সার্ভিস শিল্পের বিকাশকে উৎসাহিত করা হবে।

সপ্তম অধ্যায়

কর্ম সংস্থান ও জন সম্পদ উন্নয়ন

বাংলাদেশের বেকার সমস্যা দারিদ্রের তীব্র বহিঃপ্রকাশ। ১৯৭৯/৮০ সালে মোট বেকারের সংখ্যা ৩১.৩ লাখ। তবে বেকারত্বের এই স্তরটি সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়ার জন্য একত্রে কয়েকটি বিষয় বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। প্রথমতঃ গ্রাম অঞ্চল ও শহরের অনিদ্দিষ্ট ক্ষেত্রেই প্রধানতঃ কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে। এসব খাতে কাজে স্বনিয়োগই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য। এছাড়াও, কর্ম সংস্থানের কোন ধারণা নিতে গেলে তাতে বেকারের প্রকৃত সংখ্যা নিয়ে যেমন সমস্যা দেখা দেয়, বেকারত্বের সংখ্যা নিরূপণের ক্ষেত্রেও সংকট দেখা দেয়। দ্বিতীয়তঃ জনগণের সবচেয়ে বড় পেশা হ'ল কৃষিতে কর্ম সংস্থান বা বৈশিষ্ট্যগতভাবে মৌসুম। যেমন্তে প্রধান ফসল আমন ধানের ফসল তোলার সময় কৃষিতে কর্ম সংস্থান শীর্ষ বিন্দুতে পৌছে এবং বছরের সময় চাষের জমির পরিমাণ যখন কমে আসে তখন কর্ম সংস্থানের পরিমাণও কমে যায়। কৃষিতে কাজের এই মৌসুমী চরিত্র ছাড়াও দুই ফসলের মধ্যবর্তী সময়েও কৃষিক্ষেত্রে কর্মজীবি মানুষ অলসে দিন কাটায়। দেশের কৃষি উৎপাদনের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে বিশেষ করে এই কর্মহীনতা দেখা দেয়। তৃতীয়তঃ কৃষিতে জনসাধারণের ক্রমিক নির্ভরশীলতার জন্য জমির ওপর চাপ বেড়ে যাওয়ার ফলে কৃষি খাতে বেশ অনেকটা ছদ্ম বেকারত্বের সৃষ্টি হয়েছে। সর্বোপরি কৃষি ও অকৃষি উভয়খাতেই ব্যাপকভাবে নিম্ন শ্রমিক ব্যবহার করা হচ্ছে যা বেকারত্বের বিরাজমান পরিস্থিতিতে যুক্তি বিরুদ্ধ ব্যাপার। কর্ম সংস্থানের মৌসুমী বৈশিষ্ট্য অপর্যাপ্ত কর্মসংস্থান (under employment) ও শিশুশ্রমের ব্যবহার এসব মিলে কর্ম সংস্থানের পরিসংখ্যানকে বাস্তবতার দিক থেকে অর্থহীন করে তুলেছে। কর্ম সংস্থান সংক্রান্ত এ সকল বিষয়ে যথেষ্ট সঙ্কট থাকা সত্ত্বেও দেশের শতকরা ৯০ ভাগ লোক যখন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জমি মানুষের ক্রমবর্ধমান আনুপাতিক জমির ওপর নির্ভর করে চলতে বাধ্য হচ্ছে এবং সার্বিক জাতীয় উৎপাদনে শিল্প খাতের অবদান মাত্র ছয় শতাংশের মত নিম্নস্তরে থেকেই যাচ্ছে তখন সেরকম একটা পরিস্থিতিতে কর্মসংস্থান সমস্যার পরিস্থিতি কি তা উপলব্ধি করা কঠিন নয়। জমির অপ্রতুলতা ও বিনিয়োগের অভাবে কর্ম সংস্থানের দিগন্ত কার্যতঃ রুদ্ধ হবার ফলে ও সেই সাথে সাম্প্রতিক কয়েক দশকে জন সংখ্যা বৃদ্ধির চাপে বেকার সমস্যার অবস্থতি অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

৭.২ আনুষ্ঠানিক বেকারত্ব সম্পর্কে উল্লিখিত বিষয়গুলি সাপেক্ষে ১৯৭৯৮/০ সালে কর্মসংস্থানের পরিমাণ ছিল ২৫৩ লক্ষ বা মোট সংখ্যার ২৮ শতাংশ। বয়ঃগোষ্ঠীমাফিক নেগামরিক শ্রম শক্তির আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞার ভিত্তিতে উল্লিখিত বছরে অনুযায়িক শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২৮৪.৩ লাখ তার অর্থ ৩১.৩ লাখ লোক সরাসরি বেকার, অর্থাৎ সরল পরিসংখ্যান অনুযায়ীও ১৯৭৯/৮০তে শ্রম শক্তির ১১ শতাংশ বেকার। অবশ্য কৃষিতে মৌসুমী বেকারত্ব ও গ্রাম্য পর্যায়ের কর্মসংস্থানের বিষয় ধরলে এর প্রকৃত ব্যাপকতা অনেক বেশী হবে। ১৯৭৯-৮০ সালে কর্মসংস্থানের পেশাগত শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী ২০০ লাখ লোক কৃষি কাজে লিপ্ত ছিল। এই খাতে একজন লোক বছরে গড়পড়তা মাত্র ১১৫ দিন কাজে নিয়োজিত থাকে। কৃষিতে কাজের সুযোগ এত কম যে একজন সাধারণ কৃষি শ্রমিককে ফসল বা খামারের বাইরের কাজ করে রোজগারে ঘাটতি পূরণ করতে হয়। তবু বছরে ১৮৫ দিনের বেশী তার কোন কাজ থাকে না। কাজেই কৃষি খাতে অপর্যাপ্ত বেকারত্বের পরিমাণ কার্যতঃ পরিসংখ্যানগতভাবে প্রদত্ত বেকারের সংখ্যার দ্বিগুণ। এতে বেকারত্বের কার্যকর হার দাঁড়ায় ৮৫ লক্ষ এবং অর্থ ১৯৭৯/৮০ সালের শ্রম শক্তির প্রায় এক তৃতীয়াংশকে কর্মহীন ধরা যায়।

৭·৩ গোড়াতেই এ এক গুরুতর সমস্যা। ১৯৮৪/৮৫ সালের মধ্যে আরও ৩৮·২ লাখ লোকের কর্মসংস্থানের প্রয়োজন হবে। ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনা মেয়াদে কর্মসন্ধানী লোকের মোট সংখ্যা ৬৯ লাখের কোঠায় গিয়ে দাঁড়াবে অপরদিকে আরও ৫০ লাখ লোক বেশী লাভজনক অর্থবা পূর্ণ-কর্ম সংস্থানমূলক কাজের জন্য চেষ্টা চালাবে।

বেকার সমস্যার প্রকৃতি

৭·৪ **কৃষিখাতে কর্ম সংস্থান:** যে সব বিষয় কর্মসংস্থান সমস্যার প্রকৃতি নির্ধারণ করে সেগুলির আলোচনা এখানে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ কৃষিকাজ গ্রামীণ মানুষের প্রধান পেশা বলে ভূমি বণ্টন ব্যবস্থা ব্যক্তি কর্ম-সংস্থানের সুযোগ-সুবিধে ও বণ্টন নির্ধারণ করে। জমির মালিকানার গঠন কাঠামোর জন্য সমাজের নানা গোষ্ঠির মানুষের কর্মনিয়োগেও ভিন্নতা দেখা যায়। ভূমিহীনেরা ভাড়াটে মজুর হিসেবে কাজ করে। ছোট ও প্রান্তিক পর্যায়ের চাষীরা নিজেরা নিজেদের জমিতে কাজ করেও অংশতঃ অন্যের জমিতে ভাড়াটে মজুর হিসেবে কাজ করে। ১৯৭৭ সালের ভূমি মালিকানা জরিপে দেখা যায় ৩৩ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারের কোন চাষের জমি নেই, ১৭ শতাংশ পরিবারের জমির পরিমাণ অর্ধ একরেরও কম; ফলে, গ্রামের ৫০ শতাংশ পরিবার কার্যতঃ ভূমিহীন বলা যায়। বিনিয়োগের অভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে কর্ম সংস্থানের পরিধির না বাড়ার দরুন ভূমিহীন ব্যক্তিরা গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন। এ অবস্থা চলতে থাকার ফলে ১৯৭৭ সালের পর ভূমিহীন কেত মজুরের সংখ্যা অনিবার্যভাবে আরও বেড়ে গেছে। ১৯৬০ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে ক্ষুদ্র খামারের সংখ্যা ৩.৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে প্রজাবিলির অধীন খামারের সংখ্যা আরও ব্যাপকভাবে অর্থাৎ ৬৪·৬ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। প্রজাস্বত্বের জমির পরিমাণও প্রায় একই হারে (৬৩·২ শতাংশ) কমেছে। ভূমিহীনদের এই জনসমষ্টিই হবে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য।

৭·৫ দ্বিতীয়তঃ আধুনিক জীব-রসায়ন প্রযুক্তি কায়িক শ্রম প্রধান বলে বিবেচিত। এই প্রযুক্তি প্রসারের হারের ওপর কৃষিক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ তাৎপর্যপূর্ণভাবে নির্ভর করে। এই প্রযুক্তিতে এর নতুন প্রসঙ্গার প্রয়োগের জন্য যেমন, তেমনি উন্নততর কৃষিরীতি ও ফসলের জন্য বেশী শ্রমিকের প্রয়োজন। চিরাচরিত প্রথায় চাষাবাদের চেয়ে এই প্রযুক্তির আওতায় প্রায় দ্বিগুণ শ্রমিকের প্রয়োজন হবে এবং এতে জমি ব্যবহারেরও উন্নতি হবে। এতে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে তার প্রায় অর্ধেক আসে অর্থাৎ প্রায় ৫০ শতাংশ হারে কৃষি শ্রমিকের চাহিদা বাড়বে। ১৯৭১/৭২ এবং ১৯৭৮/৭৯ সালের মধ্যে পানি সেচকৃত জমির পরিমাণ ২৭·২ লাখ একর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬·৯ লাখে উন্নীত হয়েছিল। এই বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল শতকরা ৪·৫ ভাগ, আর খাদ্য উৎপাদনের হার ছিল জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চাইতে কম। ফলে, বাড়তি গ্রামীণ শ্রম-শক্তির অর্ধেকের বেশী কৃষি কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। ভূমি বণ্টন ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ হওয়া সত্ত্বেও ১৯৭০ এর দশকে গ্রামীণ কর্মসংস্থান পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ ১৩৪ লাখ টন থেকে ১৭৫ টনে বৃদ্ধি পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই বৃদ্ধির হার হচ্ছে শতকরা ৩০ ভাগ। এই অতিরিক্ত খাদ্য পাওয়া যাবে চাষাবাদের কাজে আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে। কাজেই, আশা করা যাচ্ছে, এর ফলে কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিকের চাহিদা শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পাবে। ১৯৭৯/৮০ সালে শস্য উৎপাদন খাতে মোটামুটিভাবে ১২৪ লাখ লোক নিয়োগ করা হয়েছিল। আধুনিক প্রযুক্তি চাহিদা শতকরা ১৫ ভাগ বেড়ে যাওয়ায় শস্য উৎপাদন খাতে আরও অতিরিক্ত ১৮.৭ লাখ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। এর তুলনায় ১৯৭৯/৮০ সালে গ্রামীণ শ্রমিকের সংখ্যা ২৪·৮১ লাখ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৯/৮০ সালের ২৪৯·৬ লাখ থেকে ১৯৮৪/৮৫তে ২৭৪·৪ লাখে দাঁড়াবে। অন্য কথায় বলতে গেলে, পানি সেচকৃত ভূমির পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেলেও শুধুমাত্র প্রযুক্তি সম্প্রসারণ শস্য উৎপাদন খাতে এককভাবে নবাগত শ্রমিকের সবার জন্য কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে না। মৎস্য চাষ, পশুপালন, ছোট অবকাঠামো নির্মাণ

ও পল্লী শিল্পের মত অন্যান্য খাতের সম্প্রসারণ না করলে পল্লীর কর্ম সংস্থান পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটবে। এইসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে পল্লীর ক্রমাবনত বেকার পরিস্থিতির বোঝা ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের কাঁধে পড়বে যাদের সংখ্যা অতীতে যারা অব্যাহত থাকলে ক্রমশঃ বাড়তেই থাকবে।

৭.৬ খামার শ্রমিকের ব্যবহারে দুটি দিশি লক্ষ্যনীয়। প্রথমতঃ ১৯৬০ এবং ১৯৭৭ সালের মধ্যে বর্গা চাষের পরিমাণ হ্রাস পাওয়া অব্যাহত থাকে; তবে এতে প্রতি একর জমিতে শ্রমিক নিয়োগের সংখ্যা বাড়বে। কারণ, বর্গাচাষে ক্ষেতমজুরের ব্যবহার অতটা ব্যাপক নয়। দ্বিতীয়তঃ, এই একই সময়ে ভূমি বন্টনের ধারা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ছোট কৃষি খামারের তুলনায় বড় বড় কৃষি খামারগুলিতে ভূমি পরিমাণ অনেকাংশে সংকুচিত হয়েছে। মাঝারি ধরণের খামারগুলির জমি যদি একীভূত করা যায়, তাহলে চাষাবাদে শ্রমিক ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু বর্গা চাষের জমির পরিমাণ কমিয়ে আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা হলে ভূমিহীন শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থলে, শ্রমিকের সংখ্যা আরও বেড়ে যাবে। এই ভয়াবহ অবস্থার প্রেক্ষিতে এটা স্বীকার করতে হয় যে, খামার বহির্ভূত কর্ম সংস্থান বৃদ্ধি না করলে খাদ্য উৎপাদনকে অব্যাহতভাবে জোরদার করা যাবে না। কারণ খাদ্য শস্যের উৎপাদন কৃষিতে কর্ম সংস্থানের হ্রাসকে ছিগুণ করে বলে ধারণা করা হয়।

৭.৭ এ কারণে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়নের উপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। পল্লী উন্নয়নের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছেঃ (১) উন্নয়ন কার্যক্রমকে অধিক ফলপ্রসূ করার উদ্দেশ্যে থানা পর্যায় পর্যন্ত প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ, (২) গ্রামীণ অকাঠামোর উন্নতি সাধন, (৩) গ্রামীণ শিল্পকারখানার ক্রম বিকাশ এবং (৪) গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়ন। কিন্তু শ্রমিক সরবরাহ এবং ভূমিহীনতার ক্ষেত্রে ভূমি বন্টন ব্যবস্থা ও ধারিত স্বল্পের সরাসরি প্রভাবের প্রেক্ষিতে উক্ত পরিকল্পনায় ভূমি ব্যবস্থার যুক্তি সংগত পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে জরুরী ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যাতে করে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বেকার শ্রমিকের কর্মসংস্থান পরিকল্পনা এই উভয় উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারে।

৭.৮ কৃষি ও অকৃষিখাতের বিনিয়োগের সীমাবদ্ধতার দরুণ পল্লী পূর্ত কার্যক্রম এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে হবে ও সেই সংগে উক্ত কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়েরও পরিবর্তন করতে হবে; যাতে করে তা পল্লী উন্নয়ন ও গামাঞ্চিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আরো কার্যকরী মাধ্যম হতে পারে। পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ভূমিহীন ও সমাজে অবহেলিত ও অনগ্রসর ব্যক্তিরা সুযোগের ভাগী হতে পারেন।

৭.৯ **নারী কর্মসংস্থানঃ** সমাজে পশ্চাদপদ শ্রেণীগুলোর মধ্যে শ্রমিক মহিলারা অন্যতম। তাই তাঁদের বিষয়টি বিশেষ বিবেচনার দাবী রাখে। মহিলারা মোট শ্রমশক্তির প্রায় অর্ধেক। তবু পরিবার ও সমাজের চিরাচরিত ঐতিহ্যের ধারায় তাঁদের আদৌ কর্মসংস্থানের প্রয়োজন আছে এমন স্বীকৃতি নেই বললেই চলে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মেয়েদের অংশ নগণ্য। শুধু তাই নয় ১৯৭০ এর দশকে গ্রামে কর্মসংস্থান পরিস্থিতি অর্থনীতির ফলশ্রুতিতে ঐ পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে। শুধুমাত্র গত কয়েক বছরে উন্নয়ন তৎপরতায় তাদের অংশগ্রহনের গুরুত্বস্বীকৃতি পেয়েছে। এটা এতদিন যে হয়নি তার কারণ বাংলাদেশের সমাজ ঐতিহ্য ভাঙার অনুকূল নয়। তাই বাংলাদেশের উন্নয়ন পারিবারিক মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের রুদ্ধ প্রাচীর ডিংগিয়ে এগেতে পারেনি। পরিবর্তনের প্রতিভূ হিসেবে মহিলাদের ভূমিকা পরিবার পরিকল্পনায় প্রতিফলিত হয়েছে। পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মত অন্যান্য ক্ষেত্রেও আরো কার্যকর ভূমিকা এবং সর্বোপরি, উৎপাদনমুখী তৎপরতায় তাঁদের সমান সুযোগ লাভের অধিকারের প্রতি স্বীকৃতি প্রদানের কথা বলা হয়েছে। সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ভূমিকা হিসাবে নারী শিক্ষা পারিবারিক পরিবেশ পুনর্বিন্যাসের জন্য প্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। মহিলাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপর বিশেষভাবে জোর দেয়া প্রয়োজন এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা (অধ্যায় ১৮ খন্ডঃ) মহিলা ভিত্তিক বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। অবশ্য

গোঁড়া সমাজের জড়তা এবং শিক্ষা সমাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় কাল বিলম্বের কারণে পরিকল্পনাকালে মহিলা শ্রমিকের সামান্য সম্প্রসারণই আশা করা যাচ্ছে। ১৯৮৪/৮৫ সালে মোট শ্রম শক্তির প্রায় ১০ শতাংশ মহিলা হবে বলে ধরা হয়েছে। তবু শ্রম বাজারের পরিস্থিতির জন্য তাদের কর্ম সংস্থানের বিষয়টি সমস্যার সম্মুখীন হবে এবং সে জন্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা এবং অফিসের কাজে তাদের সুযোগ দিতে হবে।

৭.১০ **যুব কর্মসংস্থান:** উল্লিখিত বর্তমান শ্রমিক বাজারের অন্যতম স্ববৈপরীত্য হচ্ছে যে, যখন স্বীকৃতি বয়সসীমার নীচের শ্রমিকরা খামার বা অখামার খাতে কাজ করে তখন বিপল সংখ্যক সবলদেহী যুবক বেকার হয়ে দিন কাটায়। এই বৈপরীত্যের প্রধান কারণ দুটি। প্রথমত: পরিবারে সম্পদ ব্যবহারের ক্ষমতা কৃষি জীবিকা এবং পল্লী ও শহুরে সাধারণ খাত উভয় ক্ষেত্রে কর্ম সংস্থানের সামর্থ্য নির্ধারণ করে এবং দ্বিতীয়ত: অপর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের ব্যাপ্তিশীলতার কারণে মজুরী প্রাপ্তির দিক থেকে বয়সের পার্থক্য তেমন বর্তব্য নয়। যদিও এটা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি ইংগিতবাহী তবুও ইতিমধ্যেই শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেকার সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত যুবক হয় বেকার নতুবা এমন কাজে নিয়োজিত যা স্বল্প শিক্ষিত লোকও সুচারুভাবে করতে পারে। আংশিকভাবে, অতীতে কর্ম সংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণের অভাবে এবং অংশত: বৃত্তিমূলক শিক্ষা পরিকল্পনার অভাবে শিক্ষা ও কাজের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কৃষিতে অপর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের তুলনায় শিক্ষিত কর্মসংস্থানের অর্থ দাঁড়ায় শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাজে খরচ এবং খোদ শিক্ষা ক্ষেত্রের জন্য তা ক্ষতিকর। কারণ এতে চাকুরীর বাজারে শিক্ষার মূল্য নেমে যায়। এই বৈষম্যজনিত সমস্যার কোন সরল, স্বল্পমেয়াদী সমাধান নেই। কারণ প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা হচ্ছে দীর্ঘ প্রক্রিয়ার বিষয়। তাই দীর্ঘ-মেয়াদী, সমস্যার একমাত্র সমাধান হিসেব একটি শীর্ষ মেয়াদী জনশক্তি পরিকল্পনার সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু কাজের বাজার দ্রুত পরিবর্তনশীল তাই শুধুমাত্র জনশক্তি পরিকল্পনাকে ক্রমাগতভাবে সমন্বোপযোগী করার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত বাজার পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য যুবকদের স্বল্প-মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন। কারণ প্রত্যক্ষ জ্ঞান সংক্রান্ত শিক্ষা জ্ঞান ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে সেকেলে হয়ে যাওয়ার ব্যাপক ঝুঁকি রয়েছে।

কর্ম সংস্থান ও প্রযুক্তি

৭.১১ পরিকল্পনার কর্মসংস্থান ও আয় অনুসন্ধানের লক্ষ্য নির্ধারণের বেলায় অবশ্যই একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। তা হলো প্রযুক্তি বাছাই। উদ্বৃত্ত শ্রমিক ও মূলধনের অভাবজনিত পরিস্থিতিতে সর্ব সম্মত মত হচ্ছে বাংলাদেশের শ্রম প্রধান প্রযুক্তি গ্রহণ করা উচিত। উল্লেখ করা হয়েছে যে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি এর জৈব-রাসায়নিক চরিত্রের জন্য এ রীতির চাহিদা মিটাবে। কিন্তু শিল্প ও পরিবহন এবং কোন কোন পর্যায়ে কৃষি তৎপরতার যেখানে যান্ত্রিক প্রযুক্তি জড়িত সেখানে প্রযুক্তি ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। শুধুমাত্র রসায়ন শিল্প ছাড়া যেখানে অনুরূপ প্রযুক্তি অনন্য, এমনকি, যেখানে এই বিকল্পের প্রযুক্তিগত সম্ভাবনা অব্যাহত রয়েছে কেবল সেখানে মূলধনের জন্য শ্রমিকের বিকল্পে বাস্তব সীমারেখা থাকতে পারে। কিন্তু শিল্প ও পরিবহন এবং কৃষিকাজের কোন পর্যায়ের মত ক্ষেত্রে যেখানে যান্ত্রিক প্রযুক্তি প্রয়োজন সেক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি বাছাই ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য। তবে রসায়ন শিল্পের মত যে ক্ষেত্রে উল্লিখিত প্রযুক্তি অবচ্ছেদ্য ও যৌক্তিক সম্পন্ন সে ক্ষেত্রটিই কেবল উল্লিখিত সংঘাতের সম্ভাবনামুক্ত। এমনকি, কোন ক্ষেত্রে এই বিকল্পের প্রযুক্তি সম্ভাবনা নিরবচ্ছিন্ন থাকবার পরেও ঐ ক্ষেত্রে শ্রমিক নিয়োগের পরিবর্তে বিকল্প হিসাবে মূলধন পণ্য নিয়োগের ক্ষেত্রে গোটা পরিকল্পনার কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগত প্রতিবন্ধকতা দেখা দেবে। প্রতি ইউনিট মূলধনের ওপর যত বেশী করে শ্রমিক নিয়োগ করা হবে মোট উৎপাদন ততই কম বাড়তি উৎপাদন যোগ হতে থাকবে এবং এমন এক পর্যায়ে গড় উৎপাদন পৌঁছাবে যে তা পরিকল্পনার আয়ের লক্ষ্যের সরাসরি সংঘর্ষে অবতীর্ণ হবে। পরিকল্পনার আয় ও কর্মসংস্থানের অন্বেষণের লক্ষ্যের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি তাই একটি মূলধন বিষয়। কাজেই

পরিকল্পনায় শুধু কর্মসংস্থানের নয় বরং উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান চাওয়া হয়েছে। আয় ও উৎপাদনের সাথে শিল্প প্রযুক্তি বিবেচনা খুবই সুচিন্তিত হওয়া দরকার।

৭.১২ কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও প্রযুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশ একানুবর্তী পরিবার ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে এক ব্যক্তি বা তাঁর পরিবারকে কর্মসংস্থানের একটি ইউনিট হিসাবে ধরা হবে কিনা। কর্মসংস্থান ও বেকারত্বের ইউনিট চিরাচরিতভাবে ব্যক্তির ভিত্তিতে ধরা হয়। কিন্তু বাংলাদেশ গ্রামীণ কৃষিতে অবশ্য সর্বাধিক পারিবারিক আয়ের জন্য ব্যক্তি নয় পরিবারই একটি ইউনিট হিসাবে ব্যবহৃত। শ্রমিক উদ্বৃত্ত গুহ অর্থনীতির জন্য এটা নিছক বুদ্ধিগ্রাহ্য, ভুমিকা। এই লক্ষ্য অর্জনে দু'টি বিকল্প রয়েছে। তা হলো অধিক সংখ্যক পারিবারিক শ্রমিকের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বা শ্রমিকের সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতার মাধ্যমে। চিরাচরিত কৃষিতে প্রথম বিকল্পটি অনুসরণ করতে দেখা যায়। কিন্তু অধিক মাত্রার মাথাপিছু আয় ও কর্মসংস্থানের জন্য পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের আরিথমিক দিক হলো যে একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে উভয় বিকল্পের ব্যবহার প্রয়োজন।

৭.১৩ সীমিত সম্পদের সাহায্যে সর্বোচ্চ আয়ের জন্য পরিকল্পনায় স্বতঃসিদ্ধ দু'টি পৃথক কৌশলের কথা বলা হয়েছে। প্রথমে স্বীকার করতে হবে যে উল্লেখযোগ্য হারে সম্পদ বৃদ্ধি ছাড়া ফলপ্রসূভাবে ক্রমাগত কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি সম্ভব নয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়াও সম্পদও বৃদ্ধি করা যাবে না। কাজেই স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদে যথাযোগ্যভাবে সম্পদ ব্যবহারের দীততর ক্ষেত্রে কোন শৈথিল্য ঘটলে তা আয় ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যের বিরোধী হবে। তবে যেহেতু উভয়ক্ষেত্রে চেষ্টা চালাতে হবে এবং সে জন্যে দু'টি কৌশল অবলম্বনের প্রয়োজন। প্রথম, শ্রমিককে অনুরূপ প্রযুক্তির সাথে জড়িত করতে হবে যা বর্তমান বা এর কাছাকাছি উৎপাদনের ভিত্তিতে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করবে। এতে শ্রমনিবিড় জনগণের বস্তুগত সন্তুষ্টি বেশী হয়। তার অর্থ সরাসরি উৎপাদন তৎপরতার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিকে উৎপাদন ভিত্তিক হতে হবে, কর্মসংস্থান ভিত্তিক নয়। প্রান্তিক পরিস্থিতির কারণে যেখানে এটা সীমাবদ্ধ সেখানে শ্রম প্রযুক্তি ও দক্ষতাকে বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা জানতে হবে যেমন, হাতে চালিত তাঁত শিল্পে, আধা স্বয়ংক্রিয় তাঁত চালু করতে হবে। যেখানে উৎপাদিত দ্রব্যের বৈশিষ্ট্যগত কারণে প্রযুক্তিগত কারণে প্রযুক্তি গ্রহণ সীমাবদ্ধ সেখানে শ্রমিকদের আয় বৃদ্ধির জন্য মান ও সামগ্রীর উন্নয়নে জোর দিতে হবে। দ্বিতীয় কৌশল, পরোক্ষ উৎপাদন তৎপরতায় যা শ্রমভিত্তিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে যা অখিলম্বে না হলেও সুদূর ভবিষ্যতে উৎপাদনের উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য সম্পদের সৃষ্টি করবে। অনুরূপ দীর্ঘমেয়াদী তৎপরতার মধ্যে রয়েছে বাঁধ নির্মাণ, ব্যাপক ভূমি উদ্ধার, পানি সংরক্ষণাগার, নর্দমা, খাল, সড়ক ইত্যাদির মত নির্মাণ অবকাঠামো নির্মাণ। এসব তৎপরতা আশু ফলদায়ক হবে না, কাজেই শ্রম ভিত্তিক প্রযুক্তির ব্যবহারে উৎপাদন ধরাতে হবে না। কাজেই বর্তমান উৎপাদন এর সর্বোচ্চ পর্যায়েই থাকবে। দু'টি কৌশলকে নিশ্চিত করার জন্য নির্দিষ্ট প্রকল্পে প্রযুক্তিগত দিক নির্দেশনা স্থির করতে হবে এবং যেখানে রাসায়নিক কারখানার মত প্রকল্পের জন্য প্রযুক্তিকে একক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে কর্মতৎপরতার ভিত্তিতে এমন কি অত্যাধুনিক কারখানার ক্ষেত্রেও শ্রমিকের সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সহায়ক কার্যাবলীও শ্রমভিত্তিক হতে পারে।

জনসম্পদ উন্নয়ন

৭.১৪ কর্মসংস্থানে আয় ও উৎপাদনশীলতার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে প্রযুক্তিগত দিক নির্দেশ সন্নিবেশিত করা ছাড়াও শ্রম শক্তির কারিগরী দক্ষতার অব্যাহত উন্নয়ন সাধন প্রয়োজন হবে। একদিকে নতুন প্রযুক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করণ এবং অন্যদিকে উপযুক্ত প্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিরাজমান বেকারত্বের প্রেক্ষিতে স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা ও কর্মসূচীতে শ্রমিক ও কারিগরীর দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে তরুণদের মধ্যে নতুন দক্ষতা সৃষ্টির দিকে জোর দেয়া হবে। অবশ্য

পরিকল্পনায় এই বাস্তবতাকে স্বীকার করা হয়েছে যে জনগণের কারিগরী দক্ষতা উন্নয়নের অব্যাহত দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী জনসংখ্যা উন্নয়নের বাস্তব দৃষ্টান্ত গ্রহণ ছাড়াও অব্যাহত। আরো সুস্পষ্টভাবে বলতে গেলে, বাংলাদেশের আত্মপেক্ষনশীল অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ জীবিকা সংক্রান্ত জ্ঞানের পরিবর্তনাধন অনুরূপ অর্থনীতি পরিবর্তনের পূর্বশর্ত। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের অনেক উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বাংলাদেশে নিরক্ষরতার হার অনেক বেশী যা শুধু নতুন, লাভজনক কাজ গ্রহণেরই অন্তরায় নয় বরং চিরাচরিত জীবিকা সংক্রান্ত জ্ঞান ও অর্থনীতিকে তুলে ধরে। কাজেই শিক্ষা হচ্ছে অর্থনীতি উন্নয়নের কেন্দ্র, এটাই শুধুমাত্র একজন লোককে প্রযুক্তিগত চাহিদা অনুযায়ী মানব মূলধন পরিবর্তিত করতে পারে। শিক্ষা হচ্ছে জনসম্পদের ভিত্তি এবং প্রযুক্তির নির্ভর বিন্দু।

৭.১৫ স্বল্পমেয়াদী পর্যায়ে বেকারদের উৎপাদনশীল কাজে নিয়োগের জন্য তাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। অন্যদিকে, দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষাপটে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে জনসম্পদ উন্নয়নের ভিত্তি হিসাবে ধরে নেয়া হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা এ জন্যই শিক্ষা কার্যক্রমে সর্বাধিক গুরুত্বলাভ করবে। প্রাথমিক শিক্ষাকে উচ্চতর শিক্ষার পথে প্রথম সোপান হিসেবেই শুধু নয় বরং সংশ্লিষ্ট ছাত্রের ব্যক্তিগত ও সামাজিকপরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলার জন্য স্কুলের পাঠক্রম পুনর্বিন্যাস করা হবে।

৭.১৬ দ্বিতীয়তঃ ঝিরাপড়া থেকে যারা পড়া ছাত্র ও নিরক্ষর বয়স্ক যারা ঐতিহ্যগতভাবে প্রাপ্ত দক্ষতা ছাড়া আর কিছুই জানেনা তাদেরকে অস্থায়ী কর্মসূচীর অধীনে দলগতভাবে সংগঠিত করে আত্মনির্ভরশীল করার জন্য নতুন দক্ষতা, বাণিজ্য ও হস্তশিল্পে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। অনুরূপ কর্মসূচীতে সৃষ্ট সামাজিক যোগাযোগ ও বৃহত্তর সচেতনতার ভিত্তি হিসাবে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হবে। এছাড়াও রীতিসিদ্ধ ও রীতি বহির্ভূত দুই শিক্ষার জগতকে কমিউনিটি স্কুলের মাধ্যমে যুক্ত করা হবে যাতে জ্ঞান ও বাস্তবতা পরস্পরকে সমৃদ্ধ করতে পারে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর মধ্য থেকে কমিউনিটি বিদ্যালয় নির্বাচন করা হবে। এগুলি সক্রিয়ভাবে সমাজ উন্নয়নে অংশগ্রহণ করবে। কমিউনিটি বিদ্যালয়গুলোর জনগণের কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বাস্তব জীবনের জ্ঞানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করবে। এর প্রেক্ষিতে অর্থাৎ বাস্তব জীবনে জ্ঞানের ব্যবহারের বিষয়টি কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, পূর্ণ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনায় কর্ম সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন (টি এ্যাণ্ড ভি) ব্যবস্থার উন্নয়নের সাহায্যে বাস্তবায়িত করা হবে। প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন ব্যবস্থা বাস্তব জীবনে জ্ঞানের পরিবর্তনের সুযোগ দেবে। এটা পল্লীর সমস্যার প্রতি একটা নতুন দৃষ্টিভংগি, কাজেই প্রাথমিক অবস্থায় এটা শুধু নির্বাচিত ক্ষেত্রেই ব্যবহার করতে হবে।

৭.১৭ প্রযুক্তি ও জনসম্পদ উন্নয়নের ভারসাম্যের জন্য কর্মসংস্থান ও আয় সৃষ্টি উদ্যোগের সংগে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উপযোগিতা চিহ্নিত করা এবং প্রযুক্তি ও দক্ষতাকে পরস্পরের মিলন ঘটানোর জন্য জনশক্তি ও অন্যান্য প্রদত্ত সম্পদের পটভূমিতে তাদের সম্ভাব্যতা নিরূপন করা প্রয়োজন। পরিকল্পিত উন্নয়নের লক্ষ্য হলো উৎপাদনের মাধ্যমে মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি কাজেই পরিকল্পিতভাবে দু'টি পদ্ধতির রদবদল করতে হবে। এক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতির অসুবিধাকে সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মারাত্মক বাধা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। উন্নত দেশ থেকে প্রাপ্ত অত্যাধুনিক প্রযুক্তি দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। অন্যদিকে, অধিকাংশ অর্থনীতি নিরক্ষরকারী চিরাচরিত প্রযুক্তিস্বল্প উৎপাদনশীল স্থায়ী প্রযুক্তির ভিত্তি বর্ধিষ্ণু অর্থনীতিকে সমর্থনের জন্য খুবই দুর্বল হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সম্মিলিত গবেষণা ও উন্নয়ন (আর এ্যাণ্ড ডি) প্রচেষ্টার মাধ্যমে জোরদার ও সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন। এর জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলো জোরদার করতে হবে। তাছাড়া গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসূচী সংহত করা এবং দেশের সমস্যার প্রতি কার্যকরভাবে সাড়া দেয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বীকৃতি দান প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে, সমস্যার গুরুত্বের ভিত্তিতে একটি কর্মসূচী কাঠামো গঠন, প্রাপ্ত প্রযুক্তিগত সমাধান চিহ্নিতকরণ এবং পরীক্ষামূলকভাবে গবেষণা ও

উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে সংহত করা যেখানে। প্রাপ্ত সুযোগ প্রদত্ত সম্পদের সংগে খাপ খাবে না সেখানে গ্রহণযোগ্য গবেষণা চালাতে হবে। পরিকল্পনায় জনসম্পদ উন্নয়ণ ও জনশক্তি পরিকল্পনার একটি প্রযুক্তিগত পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অনুরূপ পরিকল্পনা অর্থনীতির প্রযুক্তিগত উন্নয়নের দীর্ঘ মেয়াদী কাঠামো হবে এবং গবেষণা ও উন্নয়ন প্রচেষ্টা- উৎপাদন মূল্যের বিকৃতি সংশোধনে দক্ষতা গঠন, চাকুরীর ভবিষ্যত ও পরস্কার ব্যবস্থা এবং দুষ্প্রাপ্য সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহারের জন্য প্রতিষ্ঠানিক উন্নতি বিধানে গুরুত্ব আরোপ করবে। শেষের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে যে বাংলাদেশে বহু সংখ্যক গবেষণা আছে কিন্তু তাদের খুব কমই সম্পদ পরিকল্পনার অভাবে এ পর্যন্ত কার্যক্রম হতে পেরেছে। দুষ্প্রাপ্য সম্পদ বহু অসমাপ্ত প্রকল্পের মধ্যে খুবই সামান্য আকারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। পরিকল্পনায় বর্তমান গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসূচীকে বাস্তব সম্মত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

কর্মসংস্থান ও জনসংখ্যা

৭.১৮ চূড়ান্ত বিশ্লেষণে কর্মসংস্থানের সমস্যা জনসংখ্যা সমস্যার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। মধ্যম মেয়াদে শ্রমশক্তি সরবরাহ জনসংখ্যার আকার ও তার কাঠামোর উপর নির্ভর করে। যদিও স্বল্প ও মধ্যম মেয়াদে এগুলি সুনির্দিষ্ট ও বাঁধা তবু সামাজিক-সাংস্কৃতিক বন্ধনের কারণে শ্রমশক্তির আকার প্রভাবিত হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, এইভাবে বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের কার্যকর ব্যবহার অর্থ বিদ্যালয় থেকে বাদ পড়াদের এবং কাজ সন্ধানকারীর সংখ্যা হ্রাস ও সেই সংগে শ্রমশক্তির গুণগত উন্নয়ন, অনুরূপভাবে দক্ষতা বৃদ্ধি ও স্বনিয়োজিত কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, যুব প্রশিক্ষণ ইত্যাদির অর্থ হবে চাকুরীর বাজারে কম সংখ্যক লোক। যা হোক, শ্রম বাজারে দীর্ঘ মেয়াদী প্রতিক্রিয়া নির্ভর করবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা এলাকা তৎপরতার উপর। কারণ এতে জনসংখ্যার আকার ও বয়স কাঠামো উভয়ই প্রভাবিত হবে। শ্রমশক্তির নিরঙ্কুশ আকারে এর উপর সরাসরি প্রতিক্রিয়া ছাড়াও তা বয়ঃকাঠামোর পরিবর্তনের ফলে শ্রমশক্তি ও জনসংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধি করবে। তাতে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেবে। জনসংখ্যা ও শ্রমশক্তির ভবিষ্যত আকার নির্ধারণের জন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেও পরিকল্পনায় বর্তমান জনসংখ্যাকে উন্নয়নের সম্ভাবনাময় সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। জনসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচী এদেরকে একটি বাস্তব ও সৃজনশীল ভূমিকা পালনে সহায়তা করবে।

কর্মসংস্থান সম্ভাবনা ও বিনিয়োগ কর্মসূচী

৭.১৯ প্রযুক্তি সাপেক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি নির্ভর করবে পরিকল্পনাকালে বিনিয়োগের মাত্রা এবং এর খাতওয়ারী বন্টনের ওপর। এই পরিকল্পনার মজুতখাতে ১,১১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ ছাড়াও ১৫,১৩৪ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। কম মূলধন উৎপাদন অনুপাত এবং ব্যাপক শ্রমিকের ব্যবহার এই দুই কারণে কৃষিখাত, পানি ও পল্লী প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগসহ সর্বাধিক বরাদ্দ লাভ করবে। কৃষিতে সরাসরি বিনিয়োগ ছাড়াও একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পল্লীতে বাস্তব অবকাঠামোতে বিনিয়োগ করা হবে। পরিকল্পিত বিনিয়োগ ছাড়া ও পরিকল্পনাকালে ভূমিহীন কৃষিচাষী ও প্রান্তিক চাষীদের কর্মসংস্থানের জন্য পল্লী পূর্ত কার্যক্রম ও কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে। এছাড়াও পল্লী উন্নয়নের উপর জোর দেয়ার জন্য কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন, চাষীদের সাধারণ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সরবরাহ এবং বিভিন্ন ভোগ্যপণ্যের জন্য গুদের চাহিদা মিটানের মত অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭'২০ কৃষি খাতে শস্যের বর্ধিত উৎপাদন ও ব্যাপক চাষাবাদের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। হিসাব করা হয়েছে যে সেচ সম্প্রসারণের ফলে ১৯৭৯/৮০এর ৩১৯'৭৫ লাখ একর ফসলী জমির স্থলে ১৯৮৪/৮৫তে ৩৪৪'০২ লাখ একরে শস্য উৎপাদন বাড়বে। সেচের আওতাভুক্ত এলাকা ৩৬ লাখ একর থেকে ৭২ লাখ একরে বৃদ্ধি পাবে। খাদ্যশস্যের বর্ধিত উৎপাদনের প্রধান অবলম্বন হবে সেচ। কাজেই খাদ্য শস্য উৎপাদনের প্রেক্ষিতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী খামার পর্যায়ের কর্মসংস্থান ১৫ শতাংশ বাড়বে। অর্থাৎ অতিরিক্ত ১৮'৬ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হবে। শ্রমিক ব্যবহার বৃদ্ধির উপর সেচ ও খালের প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত এক সাম্প্রতিক জরিপে দেখা যায় যে মোট শস্য উৎপাদন এলাকার পরিমাণ যদি ২০ শতাংশ বাড়ে তবে খামার শ্রমিকের চাহিদা ৩০ শতাংশের ও বেশী বাড়বে। যেহেতু মোট শস্য উৎপাদন এলাকা ৭ শতাংশ বাড়বে বলে আশা করা যায়, কাজেই অনুরূপ এলাকা বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকের চাহিদা ১০'৫ শতাংশ বেড়ে যাবে। এছাড়াও শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে কারণ, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যাপকতার জন্য সেচ, সার ব্যবহার, আন্তঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদিতে অধিক শ্রমিক প্রয়োজন। হিসাব করা হয়েছে যে সেচ এলাকার ১০ শতাংশের বৃদ্ধির ফলে শস্য উৎপাদন এলাকার প্রতি একরে শ্রমিক ব্যবহার ০'৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। অধিক ফলনশীল বীজ এবং সার ব্যবহারের ১০ শতাংশ পরিবর্তনের পরবর্তী ফল হবে যথাক্রমে ০'৩০ শতাংশ ও ০'৫৩ শতাংশ। এইভাবে পরিকল্পিত সেচ এলাকা দ্বিগুণ হলে কর্ম সংস্থানের উপর সাম্ভাব্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল দাঁড়াবে নিম্নরূপ :

(প্রতি একরে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার)

	শতাংশে
(ক) উৎপাদিত শস্যের এলাকা	১০'৫
(খ) সার ব্যবহার	৫'৩
(গ) উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহার	৩'০
মোট বৃদ্ধি ..	১৮'৮

এর অর্থ কৃষি শ্রমিকের চাহিদা ১৯৭৯/৮০ র ১২'৪ মিলিয়ন থেকে ১৯৮৪/৮৫তে ১৪'৭ মিলিয়নে অর্থাৎ ২৩ লাখ বৃদ্ধি। পল্লীর শ্রমিক সরবরাহে মোট বৃদ্ধি ২৫'৬ লাখের (মোট স্থানান্তরিত) তুলনায় কৃষি জমিতে নতুন কর্মসংস্থান ১৮'৬ থেকে ২৩ লাখের মধ্যে থাকবে। ফসল খাতের বাইরে মৎস্য চাষ, পশুপালন ও বনসম্পদে বর্ধিত কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকবে— সুযোগের পরিমাণ ৬'০ লাখের কাছাকাছি হবে। এইভাবে কৃষি খাত কমপক্ষে ২৪'৬ লাখ লোককে গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

৭'২১ পল্লীর কর্মসংস্থান কর্মসূচীর একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হলো কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী (FWP) এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনায় ১৪ লাখ টন গম বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পল্লীর কর্মসংস্থানের মান অনুযায়ী ১৮৫ কর্মদিনে এক বছর হিসাবে ৩,৬৩৯'৯০ লাখ লোক দিবস বা ১'৯৮ মিলিয়ন লোক-বছরের সমপরিমাণ কাজের হিসাব ধরা হয়েছে। বস্তুতঃ পক্ষে, প্রকৃত কর্মসংস্থানের প্রেক্ষিতে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর প্রভাব আরো ব্যাপক হবে কারণ এই কর্মসূচী শুধুমাত্র খরা মাসগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ। শীত ও গ্রীষ্মের মাসগুলোতে (ফেব্রুয়ারী থেকে মে) তুলনামূলকভাবে কম কৃষি কাজের কথা বিবেচনা করে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী একজন কৃষকর্মী প্রকৃত কৃষিকাজে ১১৫ লোক দিবসের পরিবর্তে ১২০ লোক দিবসের হিসাব করে ৩০ লক্ষ লোকের কাজের সুযোগ করে দেবে। কাজেই বার্ষিক ভিত্তিতে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী পরিকল্পনাকালে ১ মিলিয়ন লোককে কাজে নিয়োজিত হবার সুযোগ দিতে পারে। কিন্তু অব্যাহত প্রক্রিয়াগুলক চিরস্থায়ী কাজের পরিবর্তে নির্মাণমূলক মেয়াদী

কাজে এই কর্মসূচীর কাজ সীমিত বিধায় অব্যাহত ভিত্তিতে ফলপ্রসূ কর্মসংস্থান হবে মাত্র ২ লাখ লোকের। অবশ্য কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী পল্লী অর্থনীতিতে অতিরিক্ত শ্রমিকের জন্য শুধুমাত্র স্বল্প মেয়াদী কাজের ব্যবস্থা করবে।

৭·২২ অনিবার্যভাবেই কৃষি পল্লীর সব বেকারদের কর্মসংস্থান করতে পারবে না। কাজেই পল্লীর কর্মসংস্থানের জন্য বিকল্প পথ খুঁজতে হবে। যথেষ্ট কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনাময় একটি এলাকা হচ্ছে বিদ্যালয় ও সড়কের মত অবকাঠামোর উন্নয়ন। পরিকল্পনায় এইসব এলাকার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ নতুন ভবন নির্মাণের সুযোগ এনে দেবে।

৭·২৩ নির্বাচিত কিছু প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রে কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শ্রম ভিত্তিক শিল্প উন্নয়ন পল্লী খাতে কর্মসংস্থান এর সুযোগ বৃদ্ধি করবে। অবশ্য এজন্য সচেতনভাবে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নতি ঘটাতে হবে। এক্ষেত্রে প্রধান অবলম্বন হবে তাঁত শিল্প যেখানে বন্ধ হয়ে থাকা তাঁতের সংখ্যা ১,৭৭,০০০। এই তাঁতগুলি পুনরায় চালু করলে তাঁত প্রতি ২·৫ জন, হিসাবে শুধুমাত্র ধরনের ক্ষেত্রে ৪·৪৬ লাখ লোককে নিয়োগ করা যাবে। তাঁত শিল্পের সম্প্রসারণের মাধ্যমে সুতিবস্ত্রের বর্ধিত চাহিদা পুরণ করা যাবে। পক্ষান্তরে যন্ত্র ধরণের সুতো কলগুলো শুধুমাত্র সুতোকাটার কাজে নিয়োজিত থাকবে। পরিকল্পনা-কালে পল্লী কর্মসংস্থানের সুযোগ সর্বাধিক সম্প্রসারণ, সেই সংগে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা উন্নত করার ব্যাপারে চামড়া ও জুতা প্রস্তুত, নারিকেল ও রেডিও সংযোজন, লৌহ শিল্প, ধানকল, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনা পদ্ধতিগতভাবে গ্রহণ করা হবে।

৭·২৪ পল্লীর শিল্প উন্নয়ন নীতি পল্লীর চাহিদা পুরোপুরি মিটানোর লক্ষ্যে পরিচালিত হবে যাতে পল্লীর ব্যয় ও এর বৃদ্ধির ওপর পূর্ণ প্রভাব সৃষ্টি করে। অধিকাংশ পল্লী শিল্পের উৎপাদন চাহিদার বিবেচনায় সীমিত হয়ে গেছে, বিশেষতঃ বৃহৎ শিল্পের পণ্যসামগ্রীর অনুপ্রবেশের কারণে। তাই ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের স্বার্থে বৃহৎ শিল্পের প্রতিযোগিতার ব্যাপকতাকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে কমিয়ে আনতে হবে। অতীতে উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা ও উৎপাদন ব্যয় ভিত্তিক মূল্যমান নির্ধারণ শহুরে এলাকায় বৃহৎ মূলধন সমৃদ্ধ শিল্পকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ওপর অতিরিক্ত সুবিধে দিয়েছিল। অনুরূপ মূল্য নির্ধারণের অবসান করা হবে। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রেও অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। তাই ঋণ নীতিকে ক্ষুদ্র, শিল্প ও ক্ষুদ্র ঋণগ্রহণকারীদের স্বার্থে পুনর্বিন্যস্ত করা হবে। একটি সাম্প্রতিক জরিপে দেখা যায়, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে মূলধন আরো কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়, কারণ সেখানে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন সুদের হারের বহুগুণ বেশী বলে দেখা যায়। কাজেই, সমস্যাটি মূলধন যোগানের নয় বরং ব্যাংক ও ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতার মধ্যে আস্থার অভাব বা শুধুমাত্র ঋণের প্রাপ্তি যোগ্যতার ব্যাপার মাত্র। আরো দেখা গেছে যে, ক্ষুদ্র শিল্পের শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন প্রচলিত মজুরীর হারের চেয়ে বেশী। এটা এই খাতে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার ইংগিতবাহী।

৭·২৫ ১৯৭৯ সালের পল্লী শিল্প সমীক্ষায় দেখা যায় যে একটি চাকুরী সৃষ্টি করতে কুটির শিল্পে বেশী হইলে ৪০০০টাকা বিনিয়োগ করতে হয়; পক্ষান্তরে ১৯৭৬/৭৭ সালের উৎপাদন শিল্প জরিপ (CMI) অনুযায়ী ১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যমানে একটি চাকুরী সৃষ্টি করতে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের যথাক্রমে ২০০,০০০ টাকা ও ৬৬,৮০০ টাকা বিনিয়োগ করার প্রয়োজন। যদি ধরা হয় পরিকল্পনার অর্থায়নে সরকারী খাতে সব বিনিয়োগেই হবে বৃহৎ শিল্পের জন্য এবং পরিকল্পিত বিনিয়োগের মাত্র ৩ শতাংশ যাবে কুটির শিল্পে তাহলে একান্ত রক্ষণশীল হিসাব অনুযায়ী শিল্পে নতুন কর্মসংস্থানের পরিমাণ হবে ৫·২০ লাখ। ১,৭৭,০০০ ইউনিট অচল তাঁত আবার চালু করলে ৪·৪৬ লাখ চাকুরী সৃষ্টি হতে পারে। তবে প্রকৃতপক্ষে এর বেশীর ভাগই কর্মহীন সময় হ্রাসের জন্য ব্যবহৃত হবে। নূতন কর্মসংস্থান সংযোগের মধ্যে মাত্র ১·৭ লাখ তাঁতীর নতুন কাজকেই হিসাব ধরা হয়েছে। কাজেই শিল্পে নতুন কর্মসংস্থানের নূন্যতম হিসাব হচ্ছে ৬·৯ লাখ।

৭.২৬ কৃষি ও শিল্প খাতে একত্রে ৩১.৫ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হবে। নির্মাণ, বাণিজ্য, পরিবহণ ও সেবামূলক কাজে ৫.০ লাখ নতুন চাকরী সৃষ্টি করবে ধরা হয়েছে। কাজেই পরিকল্পনা-কালে অনুমিত ৩৪.৩ লাখ নতুন শ্রমিকের পরিবর্তে মোট শ্রমিকের পরিমাণ দাঁড়াবে ৩৬.৫ লাখ।

বিদেশে কর্মসংস্থান

৭.২৭ সস্তা ও পর্যাপ্ত শ্রমিক নিয়ে বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক অদক্ষ ও অর্ধ-দক্ষ শ্রমিকের জন্য বিদেশের চাহিদা পূরণের সুযোগ রয়েছে। ক্ষুদ্র এলাকার অধিকারী হলেও বাংলাদেশ প্রচুর জনশক্তি রফতানী সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ১৯৭৯ সালে অনুরূপ প্রবাসী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২৪,৪৮৫ জন; ১৯৮২ সালের হিসাব ৬২,০০০ জন। এই বৃদ্ধি হার বজায় রাখলে পরিকল্পনাকালে জন-শক্তি রপ্তানীর পরিমাণ ৩.৪০ লাখে পৌঁছাবে। অবশ্য বাংলাদেশের শ্রমিকদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি ও যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর সহায়তা দিতে হবে। দেশে ও বিদেশে পরি-কল্পনাকালে মোট কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা দাঁড়াবে ৩৯.৯ লাখ। এটা বেকার পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি সম্ভাবনার ইংগিত বহন করে।

অষ্টম অধ্যায়

বেসরকারী খাতের ভূমিকা

কালের প্রেক্ষিতে বেসকারী খাতের প্রদত্ত ভূমিকা

ঐতিহাসিকভাবে, বেসরকারী মূলধন ও শিল্পায়নের অভাবে বাংলাদেশ পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রচেষ্টায় বেসরকারী খাত তুলনামূলকভাবে সামান্য ভূমিকা পালন করেছে। এ সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য স্বাধীনতার পূর্বে কৃষিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেসরকারী খাতকে পুষ্ট করা হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) মোট আর্থিক সম্পদ ৪,৪৫৫ কোটি টাকার মাত্র ১১ শতাংশ অর্থাৎ ৫০১ কোটি টাকা বরাদ্দ করে বেসরকারী খাতকে তুলনামূলকভাবে সীমিত ভূমিকা পালন করতে দেয়া হয়। বেসরকারী খাতকে সরকারী খাতের সাথে প্রতিযোগিতামূলক নয় বরং সম্পূরক হিসাবে ধরা হয়েছিল। অবশ্য বেসরকারী খাত যে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে তার স্বীকৃতিস্বরূপ অর্থনীতিতে বেসরকারী খাতের সুযোগের ক্ষেত্রে নীতির যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। বিনিয়োগ সুবিধার সম্প্রসারণ ও বহুমুখীতার মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণকে বিস্তৃতি করা হয়েছে। একই সময়ে সরকার বিনিয়োগ ভাতা ও বেসরকারী খাতে দীর্ঘমেয়াদী লগ্নীর আকারে যথেষ্ট রাজস্ব ও আর্থিক উৎসাহ প্রদান করেছেন। দ্বিবার্ষিক (১৯৭৮-৮০) পরিকল্পনাকালে মোট ৩,৮৬১ কোটি টাকার মধ্যে ৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে বেসরকারী খাতের অংশ ১৬ শতাংশে উন্নীত করা হয়। এ ছাড়া বিনিয়োগ সিলিং তুলে দিয়েও পশ্চাৎপদ এলাকায় সুবিধাজনক কাষ্টমস ডিউটি সম্প্রসারণ করে এবং অন্যান্য সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে আরো উৎসাহ প্রদান করা হয়। সরকার বেসরকারী খাতে আস্থা সৃষ্টি এবং এতে অবিলম্বে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের জন্য সংরক্ষিত খাতের বাইরে সরকারী ব্যবস্থাপনাধীন পরিত্যক্ত ইউনিটগুলো বিক্রি শুরু করেছেন। বেসরকারী বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার নীতিমালার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে বিদেশী বিনিয়োগকে উৎসাহ প্রদান। এই উদ্দেশ্যে পৃথকভাবে বা বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে যৌথভাবে বেসরকারী শিল্পস্থাপনের জন্য রফতানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।

শিল্পনীতিতে পরিবর্তন

৮'২ স্বাধীনতার পর বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণের পর বেসরকারী খাতকে তুলনামূলকভাবে খুবই সামান্য ভূমিকায় নামিয়ে দেয়া হয়। ১৯৭৩ এর জানুয়ারীতে প্রকাশিত প্রথম শিল্পনীতি বিবৃতিতে বেসরকারী খাতকে ২৫ লাখ টাকা বিনিয়োগ মাত্রা বা লাভ পুনঃ বিনিয়োগ করে ৩৫ লাখ টাকা পর্যন্ত বাড়ানোর সুযোগ দিয়ে কার্যতঃ এর তৎপরতা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। এতে অবশ্য জাতীয়করণের ক্ষেত্রে ১০ বছরের মোরাটোরিয়াম নিশ্চিত করা হয় এবং সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীকে আর্থিক ও অন্যান্য উৎসাহ প্রদান করা হয়।

৮'৩ ১৯৭৪ সালের জুলাইয়ের বিনিয়োগনীতি সংশোধিত করা হয় এবং মূল্য ও ব্যয় বৃদ্ধি বিবেচনা করে বিনিয়োগ সিলিং ২৫ লাখ টাকা থেকে ৩ কোটি টাকাতে বৃদ্ধি করা হয় এবং কতিপয় যৌথিক শিল্প ছাড়া স্থানীয় ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সরকারী খাতের কর্পোরেশনের পাশাপাশি শিল্প প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয়া হয়। এছাড়াও জাতীয়করণের ক্ষেত্রে মোরাটোরিয়ামের মেয়াদ ১০ থেকে ১৫ বছর বৃদ্ধি এবং স্বল্পোন্নত এলাকার জন্য ৫ থেকে ৭ বছর মূল্য অবকাশ দানের ব্যবস্থা করে আইন শিথিল করা হয়। ১৯৭৪ এর অক্টোবরে নবনীয় ট্যারিফের জন্য একটি অগ্রাধিকার শিল্প তালিকাও (পি এল আই) প্রকাশ করা হয়। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিশৃঙ্খলতার সাথে অপর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ বেসরকারী মূলধনের গতিকে মন্থর করে দেয়।

৮.৪ বেসরকারী খাতে সীমান্য সাড়ার প্রেক্ষিতে ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বরে শিল্পনীতি আরও সংশোধিত করা হয় এবং সরকার উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বেসরকারী খাতের বৃহত্তর ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিতে শুরু করেন। তখন থেকেই বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নয়ন এবং শিল্পোন্নয়নে বেসরকারী খাতের সম্ভাবনাকে ভালভাবে কাজে লাগানোর নীতি ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করা হয়।

ব্যবস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে

(১) বিনিয়োগ সিলিং ৩ কোটি টাকা থেকে আরো বৃদ্ধি করে ১০ কোটি টাকায় উন্নীত করা এবং সর্বশেষে ১৯৭৮ এর সেপ্টেম্বরে সিলিং প্রত্যাহার, সরকারী খাতের জন্য সংরক্ষিত ৬ ধরনের (মৌল) শিল্প বাদে সকল শিল্পে স্থানীয় ও বিদেশী বিনিয়োগকে অনুমতি দিয়ে বিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

(২) জাতীয়করণের ক্ষেত্রে বোরাটোরিয়াম প্রত্যাহার এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন শিল্প জাতীয়করণ করার ক্ষেত্রে ন্যায়সংগত ক্ষতিপূরণ দানের ঘোষণা।

(৩) (ক) ১৯৭৬এ চালু ইক্যুইটি এক্সচেঞ্জকে পুনরায় চালু করে (খ) ইক্যুইটি ফিনান্স ও আণ্ডার-রাইটিং সুবিধা প্রদানের জন্য ১৯৭৬ এর অক্টোবরে বাংলাদেশ বিনিয়োগ কর্পোরেশন (আইসিবি) গঠন এবং বহির্বিশ্বে ব্যাংকিং ও অন্যান্য অর্থ-ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য ১৯৭৬ এর অক্টোবরে ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স এ্যাণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কোম্পানী গঠনের মাধ্যমে শিল্প বিনিয়োগে বেসরকারী সঞ্চয় সংগ্রহের জন্য মূলধন বাজার উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ;

(৪) বেসরকারী খাতে অবিলম্বে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের জন্য ছোট ছোট সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ক্রমান্বয়ে পুঁজি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত;

(৫) বিনিয়োগ অনুমোদন ও ঋণ বরাদ্দ পদ্ধতির উন্নয়ন ও সহজীকরণ করা হয়; শিল্পের ২২টি উপ-খাত বিনিয়োগকারীদের সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দেয়া হয় যেখানে ওয়েজ আর্নার স্কীম বা স্থানান্তরের অযোগ্য বিদেশী বিনিয়োগের অধীনে মূলধন যন্ত্রপাতি আমদানী করলে শিল্পস্থাপনে কোন আনুষ্ঠানিক অনুমতি লাগবে না;

(৬) স্বল্পোন্নত এলাকার ক্ষেত্রে মূলধন যন্ত্রপাতি আমদানীর শুল্ক ২০ শতাংশের থেকে ২.৫ শতাংশে হ্রাস, উন্নত ও স্বল্পোন্নত এলাকার জন্য যথাক্রমে ৫ থেকে ৭ বছর ও ৭ থেকে ৯ বছর কর অবকাশের মেয়াদ বৃদ্ধি, ১৯৭৮/৭৯ তে বার্ষিক ভিত্তিতে আমদানীনীতি ঘোষণা, ওয়েজ আর্নারস স্কীম ও রপ্তানী সম্পাদন লাইসেন্স (এক্সপিএল) এর অধীনে আমদানীর সুবিধে সম্প্রসারণ এবং কাঁচামালের জন্য অবাধ সাধারণ লাইসেন্স (ওজিএল) চালু করা;

(৭) ১৯৭৮ এর সেপ্টেম্বরে অগ্রাধিকার উন্নয়ন এলাকা প্রতিষ্ঠা যেগুলো যন্ত্রপাতির উপর ২.৫ শতাংশ হ্রাসকৃত হারে আমদানী শুল্ক ছাড়াও উচ্চতর ঋণ-ইক্যুইটি অনুপাত ৭০:৩০ এবং ১১.৫ শতাংশ সুদ সিলিং সুবিধে লাভ করবে;

(৮) অবস্থান স্থল নির্বিশেষে রফতানীমুখী শিল্পকে ২.৫ শতাংশ মূল্যানুসারে শুল্ক প্রদান এবং উন্নত এলাকায় অবস্থিত হলেও ওয়েজ আর্নার স্কীম ও বিএসসিআইসি শিল্প এষ্টেটের শিল্পের জন্য মূলধন যন্ত্রপাতি আমদানীতে ৫ শতাংশ শুল্ক প্রদানের সুবিধে দেয়া হয়েছে; এবং

(৯) বেসরকারী শিল্পকে উন্নয়ন সার্ভিস দেয়ার জন্য বিনিয়োগের সুযোগ চিহ্নিতকরণ ও বেসরকারী বিনিয়োগকারীকে সাধারণ দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য ১৯৭৬ এ বিনিয়োগ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, অনুরূপভাবে বেসরকারী খাতে সম্ভাব্যতা জরিপের জন্য ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উপদেষ্টা কেন্দ্রকে (আইএসিবি) পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে।

১৯৮১ ও ১৯৮২ অর্থ বছরে বেসরকারী খাতে নীতি পরিবর্তন

৮'৫ ১৯৮০র জুলাই ও ১৯৮২ জুনের মধ্যে বেসরকারী খাতে বিনিয়োগের নীতিগত পরিবেশের আরো উন্নতি সাধন করা হয়, এগুলো হলো:

(১) ১৯৮০র জুলাইয়ে প্রতিটি ১২,৫০০ স্পিণ্ডেলের কটন টেক্সটাইল মিল এবং প্রতিদিন ২০০ টন মাঝারি ক্ষমতা সম্পন্ন চিনিকল বেসরকারী খাতে দিয়ে বেসরকারী পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ আরো বৃদ্ধি করা হয়;

(২) একই অর্থ বছরে (১৯৮০/৮১) রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের পাশাপাশি বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক পরিচালনার অনুমতি দিয়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, এবং

(৩) বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগসহ বেসরকারী খাতে শিল্প প্রবৃদ্ধির জন্য ১৯৮১র নভেম্বরে চারটি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার একটি গ্রুপের সহযোগিতায় একটি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল প্রমোশন এ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী গঠন করা হয়। কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। কোম্পানীতে বাংলাদেশ সরকারের ৩০ শতাংশ ইক্যুইটির অংশ আছে।

১৯৮৩ অর্থ বছরে নীতির পরিবর্তন

৮.৬ অর্থনীতিতে বেসরকারী খাতকে আরো সুস্পষ্ট ভূমিকা পালন করতে দেয়ার জন্য ১৯৮৩ অর্থ বছরে বেসরকারী খাতের প্রতি সরকারী নীতি আরো স্পষ্টভাবে বিন্যাস করা হয়। বেসরকারী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা সরকারের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে একটি বিশেষ কমিটির কর্তৃক ১৯৭৬/৭৭ থেকে ১৯৮২র এপ্রিল পর্যন্ত বরাদ্দকৃত শিল্প প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যালোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে যা বেসরকারী বিনিয়োগ সমস্যা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা দেবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ১৯৮২র ১লা জুন সরকার একটি নতুন শিল্পনীতি (এনআইপি) ঘোষণা করেছেন। নতুন নীতিতে বেসরকারী বিনিয়োগ পূর্ণ উৎপাদনকারী শিল্পের এলাকা সম্প্রসারণ এবং সরকারীখাতকে মৌলিক ভারী ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। নতুন শিল্পনীতির মূল বৈশিষ্ট হলো:

(ক) সরকারী খাতে ৬টি মূল খাতকে সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ১৩টি খাতকে সংযুক্ত তালিকায় রাখা হয়েছে যেখানে সরকারী ও বেসরকারী উভয় বিনিয়োগই চলবে। সংরক্ষিত তালিকায় শিল্পের নিম্নলিখিত খাতগুলো রয়েছে: (১) অস্ত্র ও গোলাবারুদ এবং আনুসংগিক প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, (২) আণবিক শক্তি, (৩) বিমান পরিবহণ, (৪) টেলি যোগাযোগ, (৫) বিদ্যুৎ উৎপাদন (অপেক্ষমান উৎপাদন বাদে) ও বিদ্যুৎ বিতরণ (পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পল্লী বিদ্যুতায়ন বাদে) এবং (৬) কাঠ সংগ্রহ (বাণিজ্যিক)। সংযুক্ত তালিকায় অন্যান্যের মধ্যে রয়েছে পাট শিল্প ও বস্ত্র শিল্প। এটা বেসরকারী বিনিয়োগকে প্রেরণা যোগাবে কারণ স্বাধীনতার পূর্বে এ দু খাত ছিল বেসরকারী বিনিয়োগ তৎপরতার প্রধান ক্ষেত্র। এ নীতি অনুসারে সাবেক বাংলাদেশী মালিকদের কাছে পাট ও বস্ত্রকল ফিরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রকৃত পক্ষে ১৯৮৩র ২রা মার্চ ২৮টি পাট কল ও ২২টি বস্ত্র কল ফেরত দান বা মূল উদ্যোক্তার কাছে পুনরায় বিক্রি করা হয়েছে।

(খ) স্থানীয় শিল্পকে রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য কতিপয় শিল্প দ্রব্যের আমদানী নিষিদ্ধ করা হয়েছে যেমন: পিভিসি কম্পাউণ্ড সুপারগ্রেড, বৈদ্যুতিক পাল্প (১৫—১০০ ওয়াট) বৈদ্যুতিক সিলিং ফ্যান, ড্রাই সেল ব্যাটারী, তালা (২½" আকার পর্যন্ত) ইত্যাদি। এছাড়া যে কোন দ্রব্য বিদেশ থেকে সংগ্রহের আগে সরকারী বিভাগ সংস্থাকে প্রথম শিল্প ও বাণিজ্যিক যন্ত্রপাতির শিল্প বিভাগের কাছ থেকে দেশে নির্মিত দ্রব্য পাওয়া যায় না বলে সার্টিফিকেট নিতে হবে।

(গ) নূতন শিল্প নীতির লক্ষ্যকে প্রতিফলিত করে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাকী সময়ের জন্য ১৯৮২র জুলাইয়ে একটি সংশোধিত শিল্প বিনিয়োগ তফসিল ঘোষণা করা হয়। এতে ৬৪৪' ৭৭ কোটি টাকা মৌলিক মুদ্রাসহ ১,৩৫৯' ৩৫ কোটি টাকা বিনিয়োগের কথা বলা হয়েছে। সংশোধিত বিনিয়োগ তফসিলের ১৩টি প্রধান গ্রুপের অধীনে শিল্পের ১১০টি উপখাত অন্তর্ভুক্ত করেছে। বৃহত্তর বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের জন্য উপ-খাতের সংখ্যা ১৯৪ থেকে ১১০এ হ্রাস করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং হস্ত শিল্পের জন্য ৪০টি উপ খাতের সংরক্ষিত তফসিল পৃথক বিনিয়োগ তফসিল জারী করা হয়েছে। এসব শিল্পের জন্য বিনিয়োগ বরাদ্দ ৪০০ কোটি টাকা।

(ঘ) নতুন শিল্পনীতিতে বেসরকারী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বরাদ্দ পদ্ধতি সহজ করা হয়েছে। অবাধ তালিকার শিল্পের সংখ্যা ২২ থেকে ৪৯ এ বৃদ্ধি করা হয়েছে যেখানে ওয়েজ আর্নার স্কীম, সরবরাহকারীর ঋণ বা স্থানান্তরের অযোগ্য বিদেশী বিনিয়োগের অধীনে যন্ত্রপাতি আমদানীতে কোন অনুমতি লাগবে না। সম্প্রসারিত উপ-খাতে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত যেমন, বিশেষ বস্ত্র, তৈরী পোষাক, হালকা প্রকৌশল শিল্প প্রতিষ্ঠান, দুগ্ধ খামার ও দুগ্ধ সামগ্রী, জুতা ও প্রস্তুত চর্ম সামগ্রী।

(ঙ) সরকারী বরাদ্দ পদ্ধতিকেও সহজ করা হয়েছে। প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ, জমি দখল, বিদ্যুৎ/গ্যাস ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদানের জন্য শিল্প বিভাগে একটি বিনিয়োগ সহযোগিতা ইউনিট খোলা হয়েছে। ওয়ান স্টপ সার্ভিসে যেসব বিষয়ের নিষ্পত্তি হবে না সেগুলি দেখার জন্য শিল্প সচিব পরিচালককে চেয়ারম্যান এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিদের সদস্য করে ওয়াকিং কমিটি নামে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিনিয়োগের দরখাস্ত বাছাই ও ঋণ বরাদ্দের জন্য সর্বোচ্চ সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া ঋণ প্রদানকারী সংস্থা এবং সরকারী ও আধা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের আঞ্চলিক অফিসগুলোকে প্রধান কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়াই স্বাধীনভাবে বিনিয়োগের দরখাস্তসমূহের ব্যবস্থা করার বর্ধিত ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

(চ) আঞ্চলিক উন্নয়নের বিকাশ, সহজ প্রশাসন ও পরিচালনা দক্ষতার স্বার্থে এবং অগ্রাধিকারমূলক রাজস্ব ও আর্থিক উৎসাহ দেয়ার লক্ষ্যে দেশকে উন্নত ও স্বল্প উন্নত এলাকা (বর্তমান তিনটি শ্রেণীর পরিবর্তে) এভাবে পুনঃ শ্রেণীভাগ করা হয়েছে। ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও খুলনা মহানগরী অঞ্চলগুলি নিয়ে গঠিত উন্নত এলাকার জন্য মূলধন যন্ত্রপাতির জন্য আমদানী শুল্কের হার হবে মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ এবং দেশের অবশিষ্ট অনুন্নত এলাকার জন্য এই শুল্কের হার হবে ২' ৫ শতাংশ। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার শিল্প এষ্টেটগুলিতে (উন্নত এলাকায় অবস্থিত হলেও) যে সব শিল্প স্থাপিত হবে সেগুলি এবং যে শিল্পগুলি ৭০ শতাংশ বা ততোধিক দেশী কাঁচামাল ব্যবহার করে (অগ্রাধিকার ভিত্তিক শিল্প বলে অভিহিত) সেগুলির যন্ত্রপাতি আমদানীর জন্যও বেয়াতী ২' ৫ শতাংশ শুল্কহারের সুবিধে দেওয়া হবে।

বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগ

৮.৭ নূতন শিল্প নীতির অধীনে বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগকে উৎসাহদান অব্যাহত থাকবে, বিশেষ করে যেসব নতুন শিল্প যাতে নির্দিষ্ট বিদেশী প্রযুক্তির প্রয়োজন হবে, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপক ব্যবহার করবে এবং রপ্তানীর সম্ভাবনা থাকবে। বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার জন্য ১৯৮২ এর ফেব্রুয়ারীতে "ইউনিডোর" সহযোগিতায় ঢাকায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে একটি "বিনিয়োগ ফোরাম" গঠন করা হয়েছে। ফোরাম বিদেশী বিনিয়োগকারীদের স্থানীয় বিনিয়োগকারী ও শিল্পপতিদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ, বিনিয়োগ সুযোগ সুবিধা অনুসন্ধান এবং বাংলাদেশে বেসরকারী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারী নীতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ দিবে। যৌথ উদ্যোগসহ বিদেশী

বেসরকারী বিনিয়োগ অনুমোদন পদ্ধতি ত্বরান্বিত করার জন্য সরকার প্রধানের কার্যালয়ে একটি বিদেশী বিনিয়োগ সেল স্থাপন করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ পত্র সহ বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগের প্রস্তাব শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রীর কার্যালয়ে গ্রহণ করা হবে এবং মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক অবগতির পর সেল অনুমোদন দেবে।

রফতানীমুখী শিল্প

৮.৮ নূতন শিল্প নীতিতে রফতানীমুখী (যে শিল্পের ৮০ শতাংশ সামগ্রী রফতানীর সম্ভাবনা আছে) উন্নয়নের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে অতিরিক্ত রাজস্ব আর্থিক উৎসাহ দেয়া হবে যেমন বিনিয়োগ ঋণের সুদের ১ শতাংশ পর্যন্ত ডিসকাউন্ট, প্রি-শিপমেন্ট ও প্যাকিং ঋণের ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত সুদের হার, অপরিবর্তনীয় লেটার অব ক্রেডিট অনুযায়ী চলতি মূলধন চাহিদার ৯০ শতাংশ ব্যাংক ঋণ। যোগ্য রফতানীমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে মূলধন যন্ত্রপাতি আমদানীর জন্য নগদ বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ ও বিবেচনা করা হবে।

রফতানীমুখী শিল্প যন্ত্রপাতি আমদানীর উপর শুল্কের হ্রাসকৃত হার (২.৫ শতাংশ), ১২০টি রফতানীমুখী পণ্যের ক্ষেত্রে রফতানী সম্পাদন লাইসেন্সিংয়ের বর্ধিত সুবিধা ও রফতানী পণ্য বিক্রির উপর আরোপিত করের ৩০ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ আয়কর রেয়াত দেয়া হবে।

৮.৯ বিনিয়োগনীতি শিথিল এবং রাজস্ব ও ঋণনীতি সহজ করার ফলে প্রথম পরিকল্পনা ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে মোট শিল্প বিনিয়োগ বরাদ্দের পরিমাণ বিনিয়োগ তফসিলে ৭৫৯.০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ বরাদ্দের স্থলে ৪,০৫৯টি শিল্প ইউনিটের জন্য ১,০৩৬.২৪ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বস্তুতঃপক্ষে ১৯৭৯/৮০ এর বরাদ্দের মেয়াদকালী খাতে আস্থা বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়, এর পরিমাণ ছিল ১৯৭৩/৭৪—১৯৭৯/৮০ সময়ে মোট বরাদ্দের প্রায় ৫৭ শতাংশ। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৮০—৮৫) প্রথম দু'বছরে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৯৫৫.৮০ কোটি টাকা। ১৯৭৩/৭৪ থেকে ১৯৮১/৮২ সময়ে প্রতিষ্ঠানিক ঋণের মাধ্যমে বেসরকারী উৎপাদন শিল্পে প্রকৃত বরাদ্দ সারণী ৮.১ এ দেয়া হলো :

সারণী ৮.১

উৎপাদন শিল্পের বেসরকারী বিনিয়োগ

(কোটি টাকায়)

বছর	বিনিয়োগ বরাদ্দ।	বিনিয়োগ মঞ্জুরী।	মঞ্জুরকৃত ইউনিটের সংখ্যা	বরাদ্দের শতকরা হার হিসেবে মঞ্জুরী	প্রকৃত বিনিয়োগ	মঞ্জুরীর হার হিসেবে প্রকৃত বিনি-বিনিয়োগ।
১৯৭৩/৭৪ ..	৩০	৮.৭৪	৩০৮	২৯	৮.২৪	৯৪
১৯৭৪/৭৫ ..	৭০	১৫.০৫	৩০৪	..	১৩.৩২	৮৯
১৯৭৫/৭৬	৭০.১১	৩২০	১২২	১৯.৮০	২৮
১৯৭৬/৭৭ ..	১৯১	৮০.৯৯	৫৪৮	১৫২	৬২.০০	৭৭
১৯৭৭/৭৮ ..	২০৯.১৪	৮৯৯	৯৭.৫০	৪৭
১৯৭৩—৭৮	২৯১	৩৮৪.০৩	২,৩৮২	১৩২	২০০.৮৬	৫২
১৯৭৮/৭৯	২১৭.৯২	৭৪৯	১৩৯	৯৮.২০	৪৫
১৯৭৯/৮০ ..	৪৬৮	৪৩৪.৩৩	৯২৮	..	১৪৮.১৩	৩০
১৯৮০/৮১ ..	৪০০	৬৬৮	১৭৪৩	১৬৭	২৯০.০০	৩১
১৯৮১/৮২	২৮৭.৫৫	৬০৭	৭৪	২২৬.০০	৭৯

৮.১০ উৎপাদন শিল্পে এই বিনিয়োগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর অধিকাংশই নতুন ক্ষমতা সৃষ্টিতে নিয়োজিত হবে। ১৯৭৪/৭৫ সাল থেকে সাত বছর সময়ে মোট মঞ্জুরীকৃত বিনিয়োগের মাত্র ২০ শতাংশ অর্থাৎ ৩৭৫·৭৬ কোটি টাকা পুরোপুরিভাবে রপ্তানীমুখী শিল্পে বিনিয়োগ করা হয়েছে দেখা যায়। এর অর্ধেকেরও কিছু কম ১৯৮০—৮৩ তে বিনিয়োগ করা হয়। স্থানীয় বাজারে উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয় অপেক্ষাকৃত সহজ তাই অধিকাংশ উদ্যোক্তা পুরোপুরি অথবা আংশিকভাবে স্থানীয় বাজারের সুবিধে আছে এ সব শিল্পের পক্ষপাতি। সামগ্রীকভাবে ঋণ-ইকুইটির অনুপাত ৬২:৩৮ এবং ৩৮ শতাংশ ইকুইটির মধ্যে রয়েছে ১৮ শতাংশের কিছু বেশী উদ্যোক্তার নিজস্ব তহবিল ও অবশিষ্টাংশ বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, এবং জাতীয়করণকৃত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির সহযোগিতায় বাংলাদেশ পুঁজি বিনিয়োগ কর্পোরেশন কর্তৃক গঠিত কনসোর্টিয়ামের ফাঁক পূরণ অর্থ সংস্থানের (bridge financing) আর্থিক অংগীকার।

৮.১১ অথচ ইকুইটি মূলধন প্রধানতঃ বিদেশী বেসরকারী খাত থেকে যোগানো হয়েছে বলে দেখা যাচ্ছে যা বিনিয়োগের উল্লিখিত ধাঁচের একান্ত বিপরীত, ১৯৭৩/৭৪ থেকে ১৯৮১/৮২ মেয়াদে মোট বিনিয়োগ মঞ্জুরীর পরিমাণ ১৫২·১৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে বিদেশী ইকুইটি বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১০০·৯৬ কোটি টাকা কিংবা মোট বিনিয়োগ মঞ্জুরীর ৬৬ শতাংশেরও বেশী। বাকীটা ছিল স্থানীয় ইকুইটি অংশীদারী (৩৪ শতাংশ) এবং পে এস ইউ আর্ন (Pay As you Earn) স্কীমের আওতায় বিদেশী বিনিয়োগ। বাংলাদেশে বেসরকারী শিল্প বিনিয়োগ খাতে স্থানীয় পুঁজি বিনিয়োগের নিম্ন পর্যায়ে বলে ঋণ বা পোর্টফিলিও বিনিয়োগের চেয়ে ইকুইটি বা সরাসরি বিনিয়োগের মাধ্যমে বিদেশী পুঁজির আন্তপ্রবাহ তুলনামূলকভাবে অধিকতর গ্রহণযোগ্য। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে প্রধানতঃ হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং, পাট ও কাপড়ের কল, বস্ত্রপাতি ও আনুষংগিক দ্রব্যাদি, ভেষজ ও ঔষধ তৈরী, পোষাক, গভীর সমুদ্রে মাছধরা, জাহাজ নির্মাণ, আধুনিক হোটেল, ডিজেল ইঞ্জিন, চামড়া ও জুতা ইত্যাদি ক্ষেত্রেই বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ ঘটেছে। আর অধিকাংশ বিনিয়োগের উৎসগুলি হচ্ছে, জাপান সিংগাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, যুক্তরাজ্য ও ভারতের প্রতিষ্ঠানসমূহ।

৮.১২ ১৯৭৯/৮০ মেয়াদে বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ চলতিমূল্যে ৭৯৯ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। একই মেয়াদে সরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ ১,৯১৫ কোটি টাকা। ফলে বেসরকারী খাতের বিনিয়োগ মোট বিনিয়োগের প্রায় ৩০ শতাংশ দাঁড়িয়েছে। বেসরকারী বিনিয়োগের হিসেবে অ-আর্থিক বিনিয়োগ ধরা হয়নি।

৮.১৩ ১৯৭৯/৮০ র হিসাবে বেসরকারী বিনিয়োগের খাতওয়ারী গঠন সংক্ষিপ্ত আকারে নীচের সারণীতে দেয়া হলো:

সারণী ৮.২

১৯৭৯-৮০ তে বেসরকারী বিনিয়োগ

খাত		বিনিয়োগ (কোটি টাকায়)	মোটের হার
১। কৃষি	.. .. ..	২০০	২৫.০৩
২। শিল্প	.. .. ..	১৭০	২১.২৮
৩। পরিবহন	.. .. ..	১১৫	১৪.৩৯
৪। ভৌত পরিকল্পনা ও গৃহসংস্থান	.. ..	১৬৪	২০.৫৩
৫। বাণিজ্য ও অন্যান্য খাত সমূহ	.. ..	১৫০	১৮.৭৭
	মোট ..	৭৯৯	১০০.০০

এভাবে কৃষি বেসরকারী বিনিয়োগের গ্রহীতা হয়েছে কিন্তু এর অংশ জাতীয় উৎপাদনে এর অংশের অনেক কম, পক্ষান্তরে শিল্প খাতে সাবিক জাতীয় উৎপাদনের অনেক বেশী অংশ পেয়েছে। অন্য খাতগুলোর ক্ষেত্রেও এটা সত্য। এগুলি থেকে আভাস পাওয়া যায় যে বেসরকারী খাত প্রধানতঃ শহুরে ও আধুনিক খাতমুখী। বেসরকারী বিনিয়োগের ব্যাপারে এ ধরন পল্লী ও কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্রীকে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার জন্য গভীর উদ্বেগজনক। অর্থাৎ বেসরকারী বিনিয়োগকে এমনভাবে পুনর্বিন্যাস করতে হবে যাতে এটা পরিকল্পনার অর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের কার্যকর হাতিয়ার হিসাবে কাজ করতে পারে। শুধু কৃষির দিকেই নয় বরং সামগ্রিকভাবে পল্লী খাতের দিকে আরও বেসরকারী বিনিয়োগকে পরিচালিত করতে হবে। ব্যাংকিং খাতে পল্লীর অবকাঠামো উন্নয়নও পল্লীর সঞ্চয় বৃদ্ধি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এর পরেও অবশ্য বেসরকারী বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণকারী বিনিয়োগ তপশিলের আবশ্যিক ভূমিকা হবে পল্লী খাতে ব্যাপক ভিত্তিতে বেসরকারী বিনিয়োগ পরিচালনায় মূল কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করা।

৮.১৪ সারণী ৮.৩ এ দেখানো বেসরকারী বিনিয়োগের সময় ক্রমে দেখা যায় যে বেসরকারী খাতে ব্যাংক ও বিশেষ অর্থ সংস্থার ঋণ বরাদ্দ বিশেষ করে কৃষি, শিল্প ও গৃহনির্মাণে গত কয়েক বছরে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই আথক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান উভয়েই পল্লী খাতে বেসরকারী বিনিয়োগ পরিচালনায় বর্ধিত ভূমিকা থাকবে। পুনর্গঠিত থানা প্রশাসন এবং রাস্তা, বিদ্যুৎ সরবরাহ ও ওয়ার্কসপ সুবিধাসহ প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা পল্লী এলাকায় বেসরকারী বিনিয়োগের খুবই অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবে। বেসরকারী বিনিয়োগের সুবিধা প্রসারের জন্য সরকারী নীতি ও যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়েছে:

সারণী ৮.৩

১৯৭৯/৮০-১৯৮১/৮২ সময়ে বেসরকারী খাতে প্রতিষ্ঠানিক ঋণ বরাদ্দ

কোটি টাকায়

উৎস	১৯৭৯/৮০	১৯৮০/৮১	১৯৮১/৮২
১। কৃষি ঋণ :	২৬৮·৮৮	৩৫২·২৮	৩৯৮·৮৫
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	১৪২·০০	২০৯·৭৪	২৭১·০০
রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক	১০১·৩০	১১৬·৮৪	১০৯·৮৫
বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ব্যাংক	২৫·৫৮	২৫·৭০	১৮·০০
২। শিল্প ঋণ :	৯৪১·৩১	৯৪৫·৮০	১৩৬·০২
বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক	৩৪·৪১	৫২·২৪	৪৮·৮০
বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা	৪৮·৮৩	৫৬·৫৮	৩০·৩৭
বাংলাদেশ বিনিয়োগ সংস্থা	১৬·৪৫	২৪·৭৭	৮·৭১
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	৩·৫৯	১২·২০	২·০৪
রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক	৩৮·০৩	৭১·৭৪	৫৪·৮১
৩। গৃহ নির্মাণ ঋণ :	৮৪·৫০	৮২.৪৯	৫৪·৫৩
বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা	৭৫·০৮	৬৬·০১	৪৭·১৭
রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক	৯·৪২	১৬·৪০	৭·৩৬
৪। পরিবহন ঋণ	২৯·৩৯	৩২·৯৮	৯৬·৫১
বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক	৬·২২	৫·৮৮	৬·৩৫
বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা	৩·৭৭	৯·৮৭	১·৯৬
রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক	১১·৪০	১৭·২৩	৮·২০
মোট ..	৫১৬·০৮	৬১৩·২৭	৬০৫·৯১

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বেসরকারী বিনিয়োগ

৮.১৫ যেহেতু বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিম্ন পর্যায়ের সঞ্চয়, তাই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বেসরকারী খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকবে। অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হিসাবে দেখা যায় যে বেসরকারী সঞ্চয় অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের বড় অংশ এবং বেসরকারী খাতে বিশেষ করে কৃষি ও পল্লী খাতে গুরুত্ব আরোপের ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে এর অংশ বৃদ্ধি পাবে। এতে আরো স্বীকার করা হয়েছে যে বেসরকারী খাতে শিল্প উদ্যোগের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে এবং সরকারী খাতের ব্যবস্থাপনার আবশ্যিক স্বাভাবিক অসুবিধার কারণে এতে আগের চাইতে বেশী পরিমাণ সাড়া পাওয়া যাবে।

৮.১৬ দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে আর্থিক খাতে বেসরকারী বিনিয়োগ ৬,১০০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় ১১ শতাংশ ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় ১৬ শতাংশের স্থলে এটা ১৭,২০০ কোটি টাকার মোট পরিকল্পনার ৩৫ ৪ শতাংশের বেশী। অর্থ দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বেসরকারী খাতের উপর আগের যে কোন সময়ের চাইতে অনেক বেশী ভূমিকা ন্যস্ত করা হয়েছে। ১৯৭৯/৮০ বেসরকারী বিনিয়োগের তুলনায় বেসরকারী খাতে পরিকল্পিত বরাদ্দ প্রায় আট গুণ। লক্ষণীয় যে বেসরকারী খাতের বরাদ্দ প্রধানতঃ নির্দেশক। কিন্তু তা অর্জনের জন্য সরকার রাজস্ব ও ঋণ সুবিধার আকারে প্রয়োজনীয় নীতিগত সমর্থন দেবে। তুলনামূলক অগ্রাধিকারসহ মোট বিনিয়োগের খাতওয়ারী বিস্তারিত সারণী ৮.৪,এ দেয়া হলো। বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ বরাদ্দ সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হয়েছে:

(ক) **কৃষি** : কৃষি খাতে মূলধন ব্যয় বিনিয়োগ করা হবে প্রধানতঃ অগভীর নলকূপ এবং টিউবওয়েল বসানো, ক্ষুদ্র পানি সেচ ও নালা ব্যবস্থা, গুদাম নির্মাণ পশুচালিত শক্তি উন্নয়ন ও গোশালা নির্মাণ। কৃষিতে বেসরকারী বিনিয়োগের অন্যান্য ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক মৎস্য শিকার, বনায়ন, হাঁস মুরগী ও দুগ্ধ খামার। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পরিকল্পিত মোট বেসরকারী বিনিয়োগের প্রায় ৩৭ শতাংশ কৃষি খাতের বিনিয়োগ করা হবে বলে ধরা হয়েছে। কৃষি খাতে অধিক বিনিয়োগ খাদ্য উৎপাদন ও পল্লী উন্নয়নের উচ্চতর লক্ষ অর্জনের ব্যাপারে পরিকল্পনার নীতি কৌশলকে প্রতিফলিত করে।

সারণী ৮.৪

দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় বেসরকারী বিনিয়োগ

খাত	১৯৭৯-৮০র জন্য বিনিয়োগ হিসাব	দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্প-নায় বিনিয়োগ বরাদ্দ
১। কৃষি, পানি ও পল্লী উন্নয়ন	২০০	২২৫৭
	(২৫' ০৩)	(৩৭)
২। শিল্প	১৭০	১৭৬৯
	(২১' ২৮)	(২৯)
৩। পরিবহন ও যোগাযোগ	১১৫	৯৭৬
	(১৪' ৩৯)	(১৬)
৪ ভৌত পরিকল্পনা ও গৃহ সংস্থান	১৬৪	১০৯৮
	(২০' ৫৩)	(১৮)
৫। বাণিজ্য ও অন্যান্য সেবা	১৫০	..
	(১৮' ৭৭)	..
মোট ..	৭৯৯	৬১০০
	(১০০)	(১০০)

(বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত সংখ্যা মোট বিনিয়োগের শতকরা হার)

(খ) **শিল্প :** শিল্পে খাতে বেসরকারী বিনিয়োগ ১,৭৬৯ কোটি টাকা বা প্রস্তাবিত মোট বেসরকারী বিনিয়োগের ২৯ শতাংশ। যদিও ক্ষুদ্র কুটির ও শিল্পের উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেয়া হবে তবুও মাঝারি ও শিল্পে যথেষ্ট বিনিয়োগ করা হবে। পরিকল্পনার অধীনে বেসরকারী খাতে বিনিয়োগের দিক নির্দেশক হিসাবে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি শিল্প বিনিয়োগ তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। এটা বেসরকারী খাতের জন্য তৃতীয় শিল্প বিনিয়োগ নীতির অধীনে পঞ্চম বিনিয়োগ তফসিল। এতে ১৪টি বড় গ্রুপের অধীনে শিল্পের ১৯৪টি উপ-খাতে ১,৩৯০ কোটি টাকা নৈলেশিক মুদ্রাসহ ২,৬৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ মঞ্জুরী দেয়া হয়েছে। নূতন শিল্প নীতিতে ১৩টি বড় গ্রুপের অধীনে শিল্পের উপ-খাত ২১০টিতে হ্রাস করা হয়েছে। প্রস্তাবিত ২,৬৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগের মধ্যে ২,৩৯১.০২ কোটি টাকা বা ৯০ শতাংশের বেশী নতুন শিল্প ক্ষমতা সৃষ্টির কাজে ও বাকীটা সামঞ্জস্যবিধান, আধুনিকীকরণ ও প্রতি স্থাপন কার্যক্রমে ব্যবহার করা হবে। বিনিয়োগ বরাদ্দ ২,৬৫০ কোটি টাকার ২৬ শতাংশ বা ৬৮০ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নে বরাদ্দ করা হয়েছে।

বিনিয়োগ তফসিল বাস্তবায়নের রফতানীমুখী এবং সাধারণ মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের উপযোগী শিল্পকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। রফতানীমুখী শিল্পের সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগানো হবে এবং প্রয়োজনে বিদেশী পুঁজির সহযোগিতা নেওয়া হবে। বরাদ্দকে কার্যকর করার জন্য বিনিয়োগ তফসিল বাস্তবায়নের নিরবচ্ছিন্ন পর্যালোচনা চলবে। বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ কর্মসূচীতে নতুন উদ্যোগে বিশেষ করে রফতানীমুখী শিল্প, বিশেষ নির্বাচিত ক্ষেত্র ও উচ্চ প্রযুক্তি সম্পদ শিল্প ক্ষেত্রে বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার সাথে সাথে ইকুইটি ও সরাসরি বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

(গ) **পরিবহন :** বেসরকারী খাত পরিবহন খাতের প্রধান অবলম্বন। রেলওয়ের, বিমান পথ এবং যান্ত্রিক সড়ক ও নৌ পরিবহনের একাংশ ছাড়া প্রায় গোটা পরিবহন ক্ষেত্রটাই বেসরকারী খাতে পরিচালিত। বস্তুতঃ সড়ক ও অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহনে বেসরকারী খাতের ভূমিকাই মুখ্য। এই খাতে অবকাঠামো সুবিধাদি প্রদান প্রাথমিক দায়িত্ব সরকারী খাতের হলেও আধুনিক পরিবহনে বেসরকারী খাতের আধিপত্য অব্যাহত থাকবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মাত্রী ও মালামালের পরিবহন অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হারের চেয়েও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাবে। একই সঙ্গে এই পরিবহন বাণিজ্যিক ভিত্তিক হয়ে উঠবে। বর্ধিত মাত্রী ও মালামালের চাপ মোকাবেলার জন্য বেসরকারী খাতে পরিবহন ক্ষমতা বাড়াতে হবে। এজন্যে, পরিকল্পিত বেসরকারী বিনিয়োগের প্রায় ১৬ শতাংশ বা ৯৭৬ কোটি টাকা বেসরকারী বিনিয়োগকারীর পরিবহন খাতে বিনিয়োগ করবেন বলে অনুমান করা হচ্ছে। পরিকল্পিত বিনিয়োগের অর্ধেকেরও বেশী সড়ক পরিবহনে বিনিয়োগ করা হবে।

(ঘ) **ভৌত পরিকল্পনা ও গৃহায়ণ :** আবাসিক গৃহ, বাণিজ্যিক ভবন ও শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণের উল্লেখযোগ্য অংশ বেসরকারী খাতে হচ্ছে। নির্মাণকাজে বেসরকারী খাতের বৃহত্তর অংশ গ্রহণের প্রেক্ষিতে ভৌত পরিকল্পনা ও গৃহ নির্মাণ খাতে ১,০৯৮ কোটি টাকায় বেশ বড় বরাদ্দের বিনিয়োগ স্থির করা হয়েছে। এটা দ্বিতীয় পরিকল্পনার বেসরকারী খাতে মোট প্রস্তাবিত বিনিয়োগের ১৮ শতাংশেরও বেশী। এই চার বৃহৎ ক্ষেত্র ছাড়া সড়কপথী ও জেনারেশনমূলক ভবন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে বেসরকারী বাণিজ্য ও অন্যান্য সেবামূলক ক্ষেত্রেও বেসরকারী পুঁজি বিনিয়োগ ঘটবে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতেও স্বল্প পরিমাণ বিনিয়োগ হবে আশা করা যায়। প্রধানতঃ সমাজে শিক্ষার সুযোগ সুবিধের প্রতিষ্ঠা ও সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণের পারিবারিক পর্যায়ে স্বেচ্ছা শ্রম ও সমঝোতার মধ্য দিয়েই ঐ বেসরকারী বিনিয়োগ ঘটবে। অন্যদিকে, স্বাস্থ্যখাতে বেসরকারী বিনিয়োগ ঘটবে স্বাস্থ্য ক্লিনিক, মাতৃসদন এবং চিকিৎসামূলক সার্ভিসে। এসব বিনিয়োগ গৃহসংস্থান ও নির্মাণের আকারে হবে বলে এক্ষেত্রে বিনিয়োগ বরাদ্দ গৃহায়ণ খাতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

সাধারণ নীতি সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়

৮.৭ দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে যেসব দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারী খাতের সম্ভাবনাকে পুরাপুরি কাজে লাগানোর জন্য ইতিপূর্বে গৃহীত নীতিগত সুবিধাকে ব্যবহার করা হবে, তেমনি অব্যাহত অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বেসরকারী শিল্পোদ্যম আরও সহায়ক হবে। বেসরকারী খাতের সম্ভাবনা এবং বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে নীতিমালাকে নিয়মিত পর্যালোচনা করা হবে। প্রধান বাধা এবং তার নীতিগত সুপারিশ নীচে আলোচনা করা হয়েছে:

(১) যেহেতু অবকাঠামোর সুবিধার অপর্যাপ্ত বিনিয়োগ বিস্তারিত ক্ষেত্রে বাধা হিসাবে কাজ করতে পারে, তাই এসব ক্ষেত্র সরকার কর্তৃক পর্যাপ্ত পরিপূরক বিনিয়োগ প্রয়োজন। একটি কার্যকর সেচ পদ্ধতি পল্লীর বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ, প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র নির্মাণ কর্মসূচী এবং সড়ক, রেলপথ, নৌ পথ ও বন্দরের উন্নতি সাধনের সরকারী বিনিয়োগ বেসরকারী খাতের বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে।

(২) যেহেতু শিল্প উদ্যোগ কাংখিত পর্যায়ের নীচে তাই বিপুল পরিমাণ সহজ ঋণ ও ইক্যুইটির সহায়তা শিল্প প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করতে পারে। ইক্যুইটি মূলধন বাজার হ্রাসের প্রেক্ষিতে বিনিয়োগে ইক্যুইটি সহায়তা বৃদ্ধির জন্য উদ্যক ঋণ দেয়া দরকার যা ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করবে। প্রাথমিক বিনিয়োগ কোম্পানী গঠনকে উৎসাহদানের মাধ্যমে ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জকে সহায়তা করতে হবে। শেয়ার ও সিকিউরিটি বিনিয়োগে ক্ষুদ্র ও মাঝারী সঞ্চয়কে আকৃষ্ট করার জন্য বাংলাদেশ বিনিয়োগ সংস্থার (আইসিবি) সুযোগ ও তৎপরতাকে সম্প্রসারিত করতে হবে। সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা ও রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির সহযোগিতা বাংলাদেশ বিনিয়োগ সংস্থার উদ্যোগে গঠিত আন্ডারটাইকিং ও ঋণ থেকে অর্থ সংস্থান কনসোর্টিয়ামের সব অংশীদারদ্ব তহবিলের সমর্থনমূলক সুবিধাদিও ব্যাংকিং এর দৃষ্টিতে লাভজনক সকল প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া যেতে পারে।

(৩) বেসরকারী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য মৌল অবকাঠামো এবং জনহিতকর সেবা যেমন বিদ্যুৎ পরিবহন ও টেলি-যোগাযোগের সামর্থ্য ও পরিচালনা দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। বেসরকারী বিনিয়োগের মুনাফা বৃদ্ধির জন্য আর্থিক, কারিগরী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দক্ষতাও বৃদ্ধি করতে হবে। খুচরা স্তরে ও মাঝারিক কাঁচামাল নিয়মিত সরবরাহের জন্য দেশজ শিল্পের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আমদানী নীতির অধীনে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দের মাধ্যমে কাঁচামালের একটি কার্যকরী মজুদ গড়ে তোলা আমদানী কর্তৃপক্ষীয় প্রধান নিয়ন্ত্রক কর্তৃক সময়মত আমদানী লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে বেসরকারী খাতের সামগ্রিক পরিচালনা দক্ষতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। সন্তোষজনক বেতন কাঠামোসহ যুক্তি সংগত শ্রম নীতি বাস্তবায়ন শিল্পে অসন্তোষ হ্রাস করে বেসরকারী খাতে উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করবে।

(৪) সারা দেশ জুড়ে সুষম বন্টনের নির্ধারিত লক্ষ্যের বিপরীতে অধিকাংশ শিল্পের সমাবেশ ঘটেছে শুধুমাত্র ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনার উন্নত এলাকায়। শিল্প শুমারীতে (১৯৭৬/৭৭) দেখা যায় শিল্পের মোট স্থায়ী সম্পদের ৮৬ শতাংশেরও বেশী ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে স্থান পেয়েছে। পক্ষান্তরে, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগে যথাক্রমে মাত্র ১০ শতাংশ ও ৩.৮৬ শতাংশ মূলধন গড়ে উঠেছে। স্বল্প উন্নত এলাকায় বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে বেসরকারী বিনিয়োগের মোকাবেলায় ইতিমধ্যেই শিল্পের মত সরকারী বিনিয়োগ একটি প্রাথমিক প্রযুক্তিগত ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে। শিল্প এলাকায় ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য বিএসসি-আইসি ফ্যাক্টরী, ছাউনী ভবন বা এর অংশ বিশেষ নির্মাণ করা যেতে পারে এবং ক্ষুদ্র শিল্প

উদ্যোক্তাদের সহায়ক অবকাঠামো সুবিধাসহ শিল্প প্লট বরাদ্দের অতিরিক্ত হিসেবে এগুলো লীজ দেয়া যেতে পারে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিজ নিজ এলাকায় বিক্ষিপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে তাদের সমস্যা সমাধানের যে উদ্যোগ নিতে দেখা যায় তার পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম উন্নত অঞ্চলগুলোর উন্নয়ন সাধনে সম্মিলিত সর্বাত্মক প্রয়াস প্রয়োজন।

(৫) সরকারী সংস্থাগুলোর নিয়ামক ও নিয়ন্ত্রণ তৎপরতাকে বেসরকারী বিনিয়োগের উন্নয়নের স্বার্থে শিথিল করতে হবে। বিনিয়োগ মঞ্জুরী পদ্ধতি দ্রুত ও সহজ করতে হবে। ঋণের ব্যবস্থা পূর্ণ চাহিদা মিটানোর উপযোগী হতে হবে। চলতি মূলধনের জন্য অবাধ ব্যবস্থা রাখতে হবে। বিনিময়, ঋুকিজনিত দায় ভাগাভাগির জন্য কোন পদ্ধতি বের করতে হবে। প্রকল্প প্রস্তাব মূল্যায়ন দক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ হতে হবে এবং এর জন্য স্বাধীন উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ গ্রহণের ব্যবস্থাকে নিয়মে পরিনত করতে হবে। রিয়ারেন্সের আনুষ্ঠানিকতা এবং সেই সঙ্গে লাইসেন্সের চাহিদাকেও হ্রাস করতে হবে। বিনিয়োগ খাতের দীর্ঘ অবাধ তালিকা প্রবর্তন, চলতি মূলধনের সুবিধা, ও অনুরূপ ব্যবস্থাদির ফলে কিছু উন্নতি ঘটেছে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিবর্তনের প্রয়োজন।

শিল্পখাতের নীতিসমূহ :

৮.১৮ বেসরকারী শিল্প বিনিয়োগ তৎপরতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ও আর্থিক মঞ্জুরীর উপর নির্ভরশীল। বিনিয়োগ প্রস্তাব ও ঋণ বরাদ্দের পদ্ধতি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান সন্তোষজনকভাবে করা যায় যদি প্রকল্প প্রণয়নের শুরু থেকেই মঞ্জুরী ও অর্থ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সক্রিয় আগ্রহ নেন। বেসরকারী বিনিয়োগ উন্নয়নের জন্য এসব প্রতিষ্ঠানের একটি করে শাখা আছে। তবে সেগুলিকে প্রয়োগের দিক থেকে জোরদার করতে হবে। এছাড়া সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীর জন্য বাজার জরিপ, কারিগরী ও অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা পরীক্ষা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলসহ স্বাধীন উপদেষ্টা প্যাকেজ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উপদেষ্টা কেন্দ্র (আই এসিবি), বিনিয়োগ উন্নয়ন কেন্দ্র, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা ইত্যাদি ন্যায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে জোরদার করতে হবে। শিল্প এস্টেটের নিম্ন মাত্রার ব্যবহারের প্রেক্ষাপটে (১৯৮১ এর জুনে উন্নত প্লটের মাত্র ১৪ শতাংশ) বিএসসিআইসির উন্নয়নমূলক ভূমিকাকে আরও জোরদার করতে হবে। বিনিয়োগের জন্য সরকারী নীতি ও বিধিবিধান সেই সঙ্গে বিনিয়োগ সুবিধার তথ্য দূতাবাস ও হাই কমিশনের মাধ্যমে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশের নাগরিকদের জানাতে হবে এবং তাদের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় সংগ্রহ করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশের বাইরে ব্যাংকিং ও অন্যান্য আর্থিক বাণিজ্য পরিচালনার জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক অর্থ ও বিনিয়োগ কোম্পানী লিঃ কে এক্ষেত্রে তার ভূমিকা পালন করতে হবে। শিল্প ও বণিক ব্যাংক এবং বিনিয়োগ উন্নয়ন কেন্দ্রকে আগের চাইতে বেশী উন্নয়নমূলক ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। আমদানী বিকল্প শিল্পগুলোর বিকাশ ব্যাহত করে কাঁচামাল আমদানী এবং প্রস্তুত সামগ্রীর রাজস্বগত সেবা বৈষম্য বিরাজ করছে এমন সব চিহ্নিত ক্ষেত্রে দ্রুত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং কার্যকরভাবে উপযুক্ত সংরক্ষণ সুবিধে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অনতিবিলম্বে গোটা বিষয়টি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। বেসরকারী পুঁজি বিনিয়োগের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য একটা সঙ্গতকর ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিসঙ্গত ও দক্ষ কর প্রশাসন ও অন্যতম পূর্বশর্ত।

৮.১৯ প্রধানতঃ বিদ্যুৎ বিভ্রাট, শ্রমিক অসন্তোষ, কাঁচামালের অভাব, ওয়েজ আর্নার স্কীমের অধীনে প্রস্তুত সামগ্রীর সহজ আমদানী শর্তসাপেক্ষ ঋণ ও বাটার এবং নগদ বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দে অপর্যাপ্ততার জন্য শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা অব্যাহত থাকায় দেশ বিপুল লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে। গত কয়েক বছরে কতিপয় বেসরকারী খাতের শিল্পের বিদ্যমান ক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হওয়া

সত্ত্বেও ১৯৮০/৮১ তে কয়েকটি বেসরকারী খাতের শিল্প বার্ষিক উৎপাদন তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে যেমন চর্ম শিল্প বিশেষ করে ক্রোম চামড়া এবং সাবান, টুথপেষ্ট, কাঁপা কাঁচ, শিশুখাদ্য, বনস্পতি ঘি, মাদকহীন পানীয়, রং ও বার্নিশ, ড্রাইসেল ব্যাটারী, স্টেনলেস ষ্টীলের বাসন পত্র, ষ্টীল রিং-রোলিং মিল ইত্যাদি। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৭৮/৭৯ ও ১৯৮০/৮১ এর মধ্যে সিগারেট উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার ৬৪ থেকে ৮৭ শতাংশ, দেশলাই ৫২ শতাংশ থেকে ৬৭ শতাংশ এবং টিভি সংযোজন ৪০ শতাংশ থেকে ৬৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ওয়েজ আর্নার স্কীমের অধীনে উদার আমদানীকে দেশের শিল্পায়ন নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখে নির্দিষ্ট চাহিদা উপযোগী করতে হবে। বিমান, হোটেল ও রেস্তোরাঁর ন্যায় বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান আমদানীকৃত চিনি, পানীয় ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী ব্যবহার করে। আন্তর্জাতিক মানে এই পণ্যগুলির আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বেসরকারী খাতে উৎসাহিত করতে হবে।

শিল্প বিভাগের ভূমিকা

৮.২০ শিল্প বিভাগ তাদের বিভাগীয় ও জেলা সদরে শাখা আফিসসহ সরাসরি বেসরকারী শিল্পের সাথে জড়িত। বিএসসিআইসি, বিএসবি, বিএসআরএস ও বিভাগীয় উন্নয়ন বোর্ডের ন্যায় অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর বেসরকারী খাতে দ্রুত শিল্পোন্নয়নে তাদের প্রচেষ্টা দ্রুততর করার সময় সরাসরি নিয়ন্ত্রনের চাইতে নীতি পদ্ধতির উপর নির্ভর করা উচিত। এবং অপ্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদ্ধতি এড়ানো উচিত। নতুন শিল্পনীতি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে তবে এর আরও উন্নতির জন্য এর কর্মসম্পাদনগত চাহিদার পরিবর্তনশীল পর্যালোচনা আবশ্যক। যে সব প্রকল্প বিনিয়োগ করা হয়েছে সেগুলির বিস্তারিত মূল্যায়ন ও ঐ প্রকল্পগুলোর মধ্যে সম্পর্ক রক্ষার সুফল প্রমাণ করার জন্য বিনিয়োগ মঞ্জুরকারী ও অর্থ সংস্থানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ফলদায়ক সমন্বয় নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ ছাড়া নতুন ক্ষমতা সৃষ্টি এবং সামঞ্জস্যবিধান, আধুনিকীকরণ ও প্রতিস্থাপন, আমদানী বিকল্প ও রফতানীমুখী শিল্প ইত্যাদি শিল্পের বিভিন্ন উপখাতের মধ্যে তুলনামূলকভাবে অগ্রাধিকার বিনিয়োগ নীতি ও তফসিলের পর্যালোচনার মাধ্যমে সঠিকভাবে ঠিক করতে হবে।

কৃষি ভিত্তিক শিল্পোন্নয়ন

৮.২১ শিল্প উদ্যোগে পেশাগত সামর্থের অভাব বেসরকারী শিল্পের বিকাশে অন্যতম অন্তরায়। এ কারণেই, নতুন ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য সমর্থন দিয়ে ছোট ছোট ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদেরকে পল্লী শিল্পায়ন কার্যক্রমের আওতায় গড়ে তুলতে হবে। এ জন্যে গড়ে তুলতে হবে পর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য। শিল্পোন্নয়ন কৌশলের অংশ হিসাবে পল্লীর থানা সদর ও প্রধান হাটবাজারের প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রগুলিতে শ্রমিক ভিত্তিক ছোট আকারের কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হবে। এই প্রবৃদ্ধির কেন্দ্রগুলির জন্য যোগাযোগের সুষ্ঠ ব্যবস্থা বিদ্যুৎ ও অন্যান্য আনুসাঙ্গিক সুযোগ সুবিধে থাকবে। সেবাবরাদ্দের জন্য পরিকল্পনা রয়েছে তার সঙ্গে ঐ কৃষি নির্ভর শিল্পগুলির যোগসূত্র থাকতে হবে।

বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগ

৮.২২ সরকারী খাতের জন্য সংরক্ষিত অপরিহার্য্য ৬টি মূল খাত ছাড়া বাংলাদেশের সব শিল্প দেশী ও বিদেশী উভয় বেসরকারী বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত। সরকারী ও স্থানীয় শিল্পপতি উদ্যোগের সহযোগিতায় বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগের অনুমতি দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাকালে বিদেশী ইকুইটি অংশগ্রহণকে উৎসাহ দান অব্যাহত থাকবে, বিশেষ করে এ সব শিল্প যেখানে কাঁচামাল সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় কিন্তু স্থানীয়ভাবে কারিগরী জ্ঞান অবর্তমান, মাঝারি প্রযুক্তি আটল বা মূলধন ভিত্তিক এবং উৎপাদিত সামগ্রী রফতানীমুখী। ইকুইটি অংশগ্রহণ ছাড়া বিদেশী কারিগরী সহযোগিতাকে অবশ্য প্রায়

সব ধরনের শিল্পের ক্ষেত্রে অনুমোদন দেয়া হবে। বিদেশী সহযোগিতার ক্ষেত্রে ইক্যুইটি মূলধন অংশ গ্রহণের সীমা সম্পর্কে কোন কড়াকড়ি নেই। সরকার বিদেশী বিনিয়োগকে চালু করার জন্য বর্তমান উৎস আথিক রাজস্ব ও অন্যান্য উৎসাহ দান অব্যাহত রাখবেন। বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য ১৯৮০ র ডিসেম্বরে বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগ (উন্নয়ন ও সংরক্ষণ) আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পদক্ষেপ অলাবসাথিক কোন ঝুকি থাকলে তা দূর করা এবং প্রতিশ্রুতিশীল বিদেশী বিনিয়োগ কারীদের মধ্যে আরো অধিক আস্থার সৃষ্টি করবে। ইতিমধ্যেই বিদেশী সরকারগুলির সঙ্গে কয়েকটি বিদেশী বিনিয়োগ উন্নয়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

৮.২৩ বিদেশী বিনিয়োগ সংক্রান্ত সরকার নীতি ও বিধিমালা এবং বিদেশী উদ্যোক্তাদের শিল্প তৎপরতার জন্য উন্মুক্তক্ষেত্র সম্পর্কে প্রচারনা বিদেশে জোরদার করতে হবে। নতুন শিল্পনীতিকে শিল্প-চর্চার পরিব্যাপ্তিকে দ্রুততর করা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার মাধ্যমে সহনশীলতাকে জীবনের অঙ্গ হিসাবে গণ্য করাকে বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত বলে স্বীকার করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংস্থান ও উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য শ্রম মূলধনের মধ্যে শিল্পের শান্তি ও সমযোতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৮.২৪ বিদেশী বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার জন্য চট্টগ্রামে একটি রফতানী পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) স্থাপন করা হচ্ছে। শুল্ক মুক্ত রফতানী পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য রফতানী প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ আইন নামে আইনগত আঠানো প্রনয়ন করা হয়েছে। অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত বিনিয়োগের ধরন নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা পদ্ধতি এবং সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীকে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় কর, কাষ্টম ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপযুক্ত উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা এতে রয়েছে।

৮.২৫ যেসব রফতানমুখী শিল্প রপ্তানী পণ্য প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে এ স্থাপনের সম্ভাবনা রয়েছে তা হচ্ছে পোষাক-পরিচ্ছদ, বস্ত্র শিল্প, চামড়াজাত পণ্য, পাদুকা, আসবাব পত্র, কাঠের জিনিষ ও ডাক্তারী অস্ত্রোপাচারের যন্ত্রপাতি, চশমালামগ্রী, ইঞ্জিনিয়ারিং ও বৈদ্যুতিক সামগ্রী, বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম, খেলনা, বাদ্যযন্ত্র ক্রীড়া সরঞ্জাম, অলঙ্কার, চারু ও হস্ত শিল্প, কাঁচ ও সিরামিক সামগ্রী, প্লাষ্টিক দ্রব্য, মৃৎ শিল্প, ঔষধ শিল্প সামগ্রী ও আনুসঙ্গিক দ্রব্যাদি।

কৃষি, পরিবহন ও গৃহ সংস্থান নীতিমালা

৮.২৬ কৃষিতে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রতিষ্ঠানিক সূত্রে পর্যাপ্ত কৃষি ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। সমীক্ষায় দেখা যায় যে প্রারম্ভিক সঞ্চয়ের হার পল্লী এলাকায় খুব বেশী কাজেই আয় বৃদ্ধির সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে সঞ্চয় দ্রুত বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। সঞ্চয়কে উৎপাদনশীল করতে হবে, পল্লীর জনগণের মধ্যে ব্যাংকিং ও সঞ্চয়ের অভ্যাস বৃদ্ধির প্রয়োজনে পল্লী অঞ্চলে আথিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সম্প্রসারিত করতে হবে। সঞ্চয়কে বিনিয়োগ রূপান্তরের জন্য পল্লী অঞ্চলে সেচ সরঞ্জাম ও নির্মাণ সামগ্রীর ন্যায় মূলধন দ্রব্যাদি বর্ধিত হারে সরবরাহ করতে হবে।

৮.২৭ পরিবহণে সম্ভাবনাময় বিনিয়োগকারীকে আরও সুবিধেজনক ঋণ ছাড়া এ খাতে বেকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য রাজস্ব সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। জাহাজ পরিবহনে বেসরকারী বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য ১৯৮১/৮২ অর্থ বছরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নিয়োজিত ৭০০০ ডেডওয়েট টন ও তার বেশী ওজনের সমুদ্রগামী জাহাজকে ২.৫ শতাংশ হ্রাসকৃতহারে আমদানী শুল্কের সুবিধা দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে রেজিষ্ট্রীকৃত সমুদ্রগামী জাহাজ, মাছ ধরার ট্রলার ও অভ্যন্তরীণ নৌ পথে চলাচলকারী যাত্রীবাহী নৌযানের জন্য মোট মূল্যের উপর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে যথাক্রমে ৪০ শতাংশ, ৩০ শতাংশে ও ২০ শতাংশ অবচয় ভাতা প্রদান করা হবে।

৮.২৮ পরিবহন সার্ভিসের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকারের উচিত বেসরকারী প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটকে তাদের দক্ষতার বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা এবং দেশে ব্যাপকহারে যে সমস্ত বেসরকারী প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপিত হচ্ছে সেগুলির ব্যাপারে নিয়ন্ত্রিত বিধি ব্যবস্থা প্রয়োগ করা। সরকারের কাছ থেকে তারা অবশ্যই উৎসাহ ও সমর্থন পেতে পারে তবে তার নিয়ন্ত্রিত প্রয়োজন।

৮.২৯ ভৌত পরিকল্পনা ও গৃহসংস্থানে বিনিয়োগের মাত্রা জোরদার করার জন্য কাঠ, সিমেন্ট, এম, এস, ইত, গাজ সরঞ্জাম ইত্যাদির নির্মাণ সামগ্রীর পর্যাপ্ত ও অব্যাহত সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। বহুতল ফ্ল্যাট বাড়ী নির্মাণের জন্য সহজ ঋণ দান নীতিকে পুনরায় চালু করার কথা বিবেচনা করতে হবে। ক্ষুদ্র সঞ্চয়ীদের স্বার্থ ও নিরাপত্তা যান রক্ষার্থে গ্রহণযোগ্য কতিপয় আইনগত শর্ত সাপেক্ষে গৃহ নির্মাণ সমিতিকে বেসরকারী উৎসাহদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রামীণ শিল্প, ব্যবসায় বাণিজ্য ও সেবামূলক ব্যবস্থাদি

৮.৩০ প্রায় ৫০ শতাংশ পল্লীবাসী ভূমিহীন এবং প্রায় ৪০ শতাংশ গ্রামীণ শ্রমিক কোন না কোন রূপে গ্রামীণ অকৃষিকাজে লিপ্ত। বাণিজ্যিক ও সার্ভিসসমূহ এবং ক্ষুদ্র শিল্পসমূহ দুটি বিষয়ে ঘাটতির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত তা হলো ঋণের অভাব ও পর্যাপ্ত প্রযুক্তির অভাব। উৎপাদন কমছে, বেকারত্ব বাড়ছে। পল্লী ঋণ ও শিল্প সম্প্রসারণ সার্ভিসের পরীক্ষামূলক কর্মসূচী কিছুকাল যাবত বাস্তবায়িত হচ্ছে। নির্বাচিত ক্ষেত্রে বেসরকারী সংস্থাগুলি তৎপর। কিছু সময় পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক পরীক্ষামূলক পল্লী অর্থনীতি ও গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প শুরু করছে। এ পরীক্ষামূলক ব্যবস্থাগুলি অকৃষিযোগ্য কাজে ঋণ ও সম্প্রসারণ কর্মসূচী এবং পল্লীর আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সাফল্যের প্রমাণ দিয়েছে। অনুরূপ কর্মসূচীতে তত্ত্বাবধায়ক ঋণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সমন্বিত ধারণা ফলদায়ক। এতে জরুরী কর্মসূচী সম্প্রসারণের গতি মন্থর হলেও বাণিজ্য, সার্ভিসসমূহ ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য পল্লী ঋণ সম্প্রসারণের প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার প্রতি পরিকল্পনাকালে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হবে।

বেসরকারী সঞ্চয় সমাবেশ

৮.৩১ দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে আভ্যন্তরীণ বেসরকারী সঞ্চয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৬,২৩৪ কোটি টাকা। অংশতঃ আমানত, সিকিউরিটি বিক্রয়, শেয়ার, ঋণপত্র, বণ্ড ইত্যাদির আকারে বাণিজ্যিক ও বিশেষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান উভয় ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে এ সঞ্চয় বাস্তবায়ন হবে।

৮.৩২ এছাড়া ডাক সঞ্চয় হিসাব, প্রতি রক্ষা সঞ্চয়পত্র, সরকারী কর্মচারীর প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ইত্যাদি সরকারী সঞ্চয় স্কীম এবং সেই সঙ্গে বীমা সংস্থার মাধ্যমে বেসরকারী সঞ্চয় সংগ্রহ করা হবে। বেসরকারী সঞ্চয়ের পরিকল্পিত পরিমাণ ১,৭৯২ কোটি টাকা মেয়াদী আমানত আকারে পাওয়া যাবে। এর মধ্যে পারিবারিক জমার পরিমাণ হবে প্রায় ৭০ শতাংশ এবং বাকীটা জমা হবে ব্যবসা বাণিজ্যিক ও অন্যান্য খাত থেকে। সরকারের বিভিন্ন সঞ্চয় পদ্ধতির মাধ্যমে মোট ১৯৯ কোটি টাকা বেসরকারী সঞ্চয় খাতে তোলা যাবে।

৮.৩৩ আনুমানিক সঞ্চয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ পল্লী খাত থেকে আসবে বলে আশা করা যাচ্ছে। বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে ঋণ প্রদান পদ্ধতিতে বর্তমানে অ-প্রতিষ্ঠানিক ঋণ বা ঋণের প্রাধান্য রয়েছে। এ ধরনের ঋণ সাধারণতঃ অকার্যকর ও অনুৎপাদনশীল কাজেই দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বাণিজ্যিক ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, ডাকঘরসমূহ ও সমবায় ব্যাংকের ঋণের মাধ্যমে এ পদ্ধতির বিকল্প প্রক্রিয়াকে জোরদার করা হবে। শাখা সম্প্রসারণের পাশাপাশি বাণিজ্যিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পল্লীর জনগণের মধ্যে ব্যাংকিং ও সঞ্চয় অভ্যাসকে উৎসাহিত করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ অভিযান এবং বিভিন্ন গোষ্ঠির সঞ্চয়ীদের জন্য পর্যাপ্ত আকর্ষণ সৃষ্টি করে বিশেষ সঞ্চয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

৮.৩৪ দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান ঊর্ধগতির কারণে বিভিন্ন প্রকার আমানতের ওপর বিরাজমান হার তেমন ফলদায়ক নয় বলেই প্রমানিত হয়েছে। কাজেই, পারিবারিক সঞ্চয়ে উৎসাহদান এবং বণ্ড, ঋণপত্র, সঞ্চয়পত্র ইত্যাদি বিভিন্ন আর্থিক সম্পদিত বিনিয়োগের জন্য ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য সুদের হার বৃদ্ধির ইতিবাচক নীতি গ্রহণ করা উচিত। বাণিজ্যিক ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দেয় আমানতের ওপর সুদের হার যুক্তিসংগত পর্যায়ে বাড়িয়ে নির্ধারণ করা হলে ঐ সব আমানত থেকে আয়ের প্রকৃত হার যথেষ্ট আকর্ষনীয় হয়ে উঠবে এবং ফলতঃ তা বেসরকারী পর্যায়ে যথেষ্ট পরিমাণ সঞ্চয়ের একটা সম্ভাবনাময় সুযোগ সৃষ্টি করবে। ১৯৮০ অক্টোবরে সুদের হার যুক্তিসংগত পর্যায়ে বাড়ানো হয়। এ সংশোধনের ফল কার্যকর প্রমানিত হয়েছে। কারণ ১৯৮১/৮২তে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মেয়াদী আমানত ১৯৮০/৮১র ২৭০ কোটি টাকা ও তার আগের বছরে ১২১ কোটি টাকার তুলনায় ৭২৬ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

৮.৩৫ ব্যাংকিং ব্যবস্থা ছাড়াও গোষ্ঠির সঞ্চয় গড়ে তোলার জন্য একটি সুষ্ঠু মূলধন বাজার গড়ে তোলা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আকর্ষণীয় আয়প্রদানকারী সরকারী সিকিউরিটি, রাজস্ব সুবিধা ও অন্যান্য উৎসাহ প্রদান অব্যাহত রাখা হবে। এছাড়া বেশী করে নিউচ্যুয়াল ফাণ্ড ও বিনিয়োগ ট্রাষ্ট সার্টিফিকেটের মত সঞ্চয় মাধ্যম বর্ধিত হারে ব্যবহার করা হবে। কোম্পানী শেয়ারের মত দীর্ঘ মেয়াদী সঞ্চয়ের জন্য নতুন ব্যবস্থায় পারিবারিক ও প্রতিষ্ঠানিক সঞ্চয়ের দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের ও সুযোগ দিবে। সরকারী খাতের বর্তমানে লাভজনক কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে সরকারের ক্ষুদ্র শেয়ার আইসিবির শেয়ার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কার্যকর সমর্থন যোগাতে পারে।

নবম অধ্যায়

পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও মনিটরিং

পরিকল্পনার সার্বিকার বাস্তবায়ন যতটুকু হয় ততটুকুই ভাল। কারণ, সেটিই প্রকৃত সাফল্য। শুধু লক্ষ্যমাত্রা স্থির বা সম্পদের বরাদ্দের তেমন তাৎপর্য নেই যদিও অর্থনীতিতে এগুলি প্রতিফলিত নির্ধারণ। বাস্তবায়নের সমস্যাগুলি যদি পরিকল্পনায় উপেক্ষিত থেকে যায় তাহলে অলীকার ও প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন যেমন পরিকল্পনার বাস্তবায়নে অন্তরায় সৃষ্টি করে তেমনি ঐ পরিকল্পনাই ব্যর্থ হবার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয়। এ কারণে, পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য জাতীয় সমস্যাবলীর বিশ্লেষণ ও নিবিড় বিশ্লেষণের পর পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও নীতিগুলি নির্ধারণ এবং সেগুলির মধ্যে পরিকল্পনাবিদ, নীতিনির্ধারক ও প্রশাসক-বর্গের সম্মিলিত বিচক্ষণতার প্রতিফলন পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয়।

পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন প্রক্রিয়া

৯·২ বাংলাদেশে পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত দায়িত্ব প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়সমূহ ও পরিকল্পনা কমিশনের মধ্যে বিভক্ত। কিন্তু যেহেতু প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়গুলি তাদের নিজ নিজ অর্থনীতির খাতের জন্য দায়ী সেহেতু পরিকল্পনা কমিশনকে জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের (একনেক) নির্দেশমোতাবেক জাতীয় পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়নের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অর্থনৈতিক গতিধারার রূপরেখা অংকন ও বিকল্প সম্ভাবনাগুলি চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে পরিকল্পনা কমিশনের পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়ার সূচনা ঘটে। আর তারই ফলশ্রুতিতে বিকল্প কতকগুলি মডেলসহ পরিকল্পনার প্রয়োগ কাঠামো গড়ে তোলা হয়। মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলি তথ্যের উৎস হিসেবে পরোক্ষ এই প্রায়োগিক কাজে অংশ নেয়। কারণ, নানা প্রযুক্তি-গত বিকল্প থেকে উপযুক্ত বিকল্পটি বেছে নেবার কাজে এগুলির অভিজ্ঞতা অত্যন্ত মূল্যবান। কার্যক্রম ও নীতিমালা নির্ধারণে এরা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে। প্রকল্প প্রণয়নেও এদের অবদান অনন্য। পরিকল্পনা প্রণয়নে তাদের অংশ নেবার পরিসর বৃদ্ধি লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলিকে একটি নির্দিষ্ট ব্যয় পর্যন্ত (২ কোটি টাকা) ব্যয় সাপেক্ষ প্রকল্প অনুমোদনের কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে। এ কারণে, বর্তমান পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতার ফলশ্রুতি বলে উল্লেখ করা হয়।

৯·৩ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বাংলাদেশের বেশ দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা রয়েছে। স্বাধীনতার পর পরই পরিকল্পনার প্রশ্নে একটা কট্টর নীতিবাদী দর্শন অনুসৃত হয়। কিন্তু ইদানিং তাতে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। এখন বেসরকারী খাত ও জনসাধারণের অংশ গ্রহণের ওপর বেশী করে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। প্রথমতঃ বেসরকারী খাতের ভূমিকা সম্প্রসারণ, বিশেষ করে শিল্প খাতে বেসরকারী খাতে ভূমিকা সম্প্রসারণ পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য অনেকটা বদলে দিয়েছে। বেসরকারী খাতের বরাদ্দ প্রথম পরিকল্পনার ১১ শতাংশ থেকে ক্রমাগত বেড়ে দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় ১৬ শতাংশ, হালনা দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ২১·৪ শতাংশ এবং সংশোধিত দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৩৫·৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এই পরিবর্তন বিনিয়োগ ও উৎপাদন কর্মসূচীর উপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে বেসরকারী খাতকে সমাজের আকাঙ্খিত লক্ষ্যে পরিচালনার জন্য অর্থনৈতিক মাধ্যমের মত পরোক্ষ পদ্ধতি ব্যবহার এবং নীতিগত পরিকল্পনার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ প্রয়োজন। পরিকল্পনাকে কর্তৃত্বারোপের চাইতে নীতিগত বিধিব্যবস্থার উপর বেশী নির্ভর করতে হবে। এই পরিবর্তনের পাশাপাশি উন্নয়ন পর্যালোচনার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপেরও প্রয়োজন রয়েছে। যেহেতু, অর্থনীতির ওপর সরকারী খাতের গুরুত্ব আর আগের মত থাকবে না, কাজেই পরিকল্পনা কমিশন এবং মন্ত্রণালয়সমূহকে পরিকল্পিত লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর নীতির মাধ্যমে জাতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের বিশ্লেষণী ক্ষমতাকে ব্যবহার ও জোরদার করতে হবে।

৯·৪ পরিকল্পিত উন্নয়নে জনগণের অংশ গ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারণে সরকার থানা পর্যায় অবধি প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। পরিকল্পনার এবং পল্লী উন্নয়নের মূলে লক্ষ্য থানা প্রশাসন জোরদার করা। এই থানা প্রশাসনকে পল্লী উন্নয়নের বাহন করাই এই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য। থানা নির্বাহী অফিসার কৃষি উপকরণ, সেচের ছোট খাট সরঞ্জাম, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন, শিল্প, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সুবিধে প্রতিষ্ঠা, কর্ম সংস্থান বৃদ্ধি ও কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় পূর্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়নের সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করবেন যাতে ঐ সব কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সরকার ইউনিয়ন পর্যায়ে উন্নয়নের ভূমিকাসহ স্থানীয় সরকারকে পুনরায় সক্রিয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পরে থানা পর্যায়ের উন্নয়ন পর্যবেক্ষণের জন্য থানা পরিষদকে নির্বাচিত সংস্থা হিসাবে গঠন করা হয়। স্থানীয়পর্যায়ের তৎপরতার জন্য থানা উন্নয়ন তহবিল গঠনের ব্যবস্থা করা হবে যাতে তারা জাতীয় পরিকল্পনা কাঠামোর মধ্যে নিজেরা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও জাতীয় লক্ষ্য উন্নয়নে ব্যয় করতে পারে। পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার এই ব্যাপ্তি পরিকল্পিত তৎপরতায় বৃহত্তর সমন্বয়ের প্রয়োজন হবে, তেমনি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নমনীয়তার আরো প্রয়োজন দেখা দিবে।

৯·৫ বর্তমানে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নমনীয়তা নিশ্চিত করার প্রধান উপায় বার্ষিক পরিকল্পনা। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যও আকারের প্রতি দৃষ্টি রেখে এবং অতীত তৎপরতার মূল্যায়ন ও ঐ বছরের প্রাপ্য সম্পদের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। সরকারী খাতের কর্মসূচীর বার্ষিক আকার হ্রাস এবং পরবর্তীতে নীতিগত পরিকল্পনার জন্য ধারা পরিবর্তনের ফলে দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য নির্ধারণের অধিক প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে এবং পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় রদ বদলের জন্য ঐ দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যের বার্ষিক পর্যালোচনা করতে হবে। নীতিগত পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বেসরকারী ও সরকারী খাতের মধ্যে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা। যেহেতু বেসরকারী খাতের ভূমিকা বৃদ্ধি পাবে কাজেই বেসরকারী খাতের প্রয়োজনে নীতিসমূহ যাতে কার্যকর হয় তা পরিকল্পনায় নিশ্চিত করতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনে একটি নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে শিল্পখাতে তুলনামূলক সুবিধাও কার্যকর শুল্ক আরোপের ওপর গুরুত্ব দিয়ে বাণিজ্য ও শিল্পনীতির একটি জরিপের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। খাদ্য ও কৃষি প্রশ্নে একটি সরকারীনীতি সংক্রান্ত সমীক্ষার কাজ খাদ্য পরিকল্পনা ও মনিটরিং ইউনিটের অধীনে (এফপিএমইউ) এগিয়ে চলেছে। অন্যদিকে একটি অর্থনৈতিক খাত সমীক্ষা শেষ পর্যায়ে রয়েছে যা সরকারকে পরিকল্পনাকালে মুদ্রানীতি জোরদার করতে সহায়তা করবে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

৯·৬ সরকারী খাতে বিনিয়োগ কার্যক্রমের আকার পরিকল্পনার গোটা আকারের তুলনায় হ্রাস পাবে। তবে এক্ষেত্রে খেয়াল রাখা দরকার যে, বিগত কয়েক বছরে সম্পদ সংগ্রহে সরকারী খাতের ক্রমবর্ধমান অসুবিধা এবং অংশতঃ রাষ্ট্রায়ত্ব খাতের প্রতিষ্ঠানগুলিতে ব্যবস্থাপনা সংকট এর কারণ। এ জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীকে আরও বাস্তবসম্মত হতে হবে। কারণ এই বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীই সরকারী খাত সম্পদ বরাদ্দের চূড়ান্ত হাতিয়ার। এ ব্যাপারে পরিকল্পনায় অনেকগুলি দুর্বলতার কথা স্বীকার করা হয়েছে। প্রথমতঃ পরিকল্পনায় আর্থিক পরিকল্পনা অপর্যাপ্ত। সাধারণতঃ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য সম্পদ হয় কম ধরা হয় নতুবা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা হয়ে থাকে তাই হয়। অর্থাৎ সম্পদের পরিমাণ অতিরিক্ত ধরা হয়। কিন্তু কারণও সেই একই, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকল্পের ভীড় এত্রবেশী যে সেগুলি ন্যায় সংগতভাবে খুব সামান্য সম্পদ পায়। তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী সংখ্যক প্রকল্প হওয়ার দরুন ঐ প্রকল্পগুলির চাহিদা যেহেতু স্বভাবতঃই অপূর্ণ থাকে সেহেতু কখনও কখনও দেখা যায় বছরের মাঝখানে নতুন সম্পদের সন্ধানে তত্ত্ব তালাস পড়ে যায় অথবা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যা ঘটতে দেখা যায়

তা হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়নমূলক অনুশীলনের সূচনায় সম্পদকে বেশী করে দেখানো হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিশ্ববাণিজ্য ও সাহায্য পরিস্থিতির অনিশ্চয়তার জন্য এই সমস্যার অবনতি ঘটেছে এবং প্রকৃত উন্নয়ন ব্যয় ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মধ্যে ব্যবধান বেড়ে গেছে। পরিকল্পনার প্রথম দু'বছরে অর্থাৎ ১৯৮০/৮১ ও ১৯৮১/৮২তে ঘাটতি ছিল যথাক্রমে ১২·৪ শতাংশ ও ২০·৭ শতাংশ। সরকারী খাতের পরিকল্পনার আকার ২০,১২৫ কোটি টাকা থেকে ১১,১০০ কোটি টাকায় পুনর্বিন্যাস করায় প্রকল্পের জন্য অর্থের চাপ প্রশমিত হলেও তহবিল সরবরাহের হিসাব বাস্তবমুখী না করার কোন কারণ নাই। এই উদ্দেশ্যে সম্পদের হিসাব ও ঘনঘন সম্পদের অবস্থা পর্যালোচনার জন্য সম্পদ কমিটিকে সহায়তা করতে একটি কারিগরী পর্যায়ের ওয়ার্কিং সেক্রেটারিয়েট খোলা হয়েছে। এছাড়াও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য একটি মূল কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে যাতে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রকল্পগুলিতে বছরের প্রারম্ভে পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ নিশ্চিত করা যায়। রাজস্ব পরিস্থিতি বেশ সর্বসম্প্রতিক আকারে পাওয়া গেলেও ব্যয়ের হিসাব পাওয়া এখনও দুরূহ।

৯·৭ সম্পদের চাহিদা ও বরাদ্দের মধ্যে এই বড় ধরণের ব্যবধানের প্রধান কারণ হলো এডিপিতে বহু প্রকল্পের সমাবেশ। ১৯৭৩/৭৪-এ স্কীমের সংখ্যা ছিল ১৩৮৫ এবং প্রথম পরিকল্পনার (১৯৭৭/৭৮) শেষে তা ১৫১৯-এ বৃদ্ধি পায়। দ্রুত সংখ্যা বেড়ে যাওয়া এবং এর ফলে সম্পদের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় এবং চালু প্রকল্পগুলি বাছাই করা হয়। প্রকৃতপক্ষে চালু প্রকল্পগুলি একান্ত অপরিহার্য ধরণের বিধায় দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় চালু প্রকল্পগুলিকে পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ করে সেগুলির যতগুলি সম্ভব সমাপ্ত করার ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে স্কীমের সংখ্যা ১৯৭৯/৮০তে ১৪০৬-এ হ্রাস পায়। কিন্তু ১৯৭০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে উন্নয়ন তৎপরতার অগ্রগতির পটভূমিতে প্রণীত ঘসড়া পরিকল্পনায় ১৯৮০/৮১তে প্রকল্পের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। প্রকল্প সংখ্যা প্রথম বছরে ১৫৫০এ এবং ১৯৮১/৮২তে ১৬৯১এ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮২/৮৩তে ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ প্রয়াসের মাধ্যমে এর সংখ্যা ১৯২৮এ নামিয়ে আনা হয় (মূল সংখ্যা ১৫৮০)। একটা নির্দিষ্ট চক্রাবর্তনে এই পদ্ধতি চলছে। সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে সম্পদের উপর চাপ যখন ক্রমান্বয়ে অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছায় তখন জোরদারভাবে প্রকল্প ছাঁটাই করতেই হয়। দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার ১৯৭৮/৭৯ এবং চলতি বছর (১৯৮২/৮৩) এটাই ঘটেছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অত্যধিক স্কীম অন্তর্ভুক্ত হলে তাতে তহবিল ও বাস্তবায়না সামর্থ্যের মত বিরল সম্পদ বহু স্কীমের মধ্যে ছিটেফোঁটার মত ভাগ হয়ে যায়। এতে আবারও লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সাফল্যের মাঝে ব্যবধান অর্থাৎ এটা দ্বিতীয় ব্যবধানের সৃষ্টি হয়ে থাকে। নিম্নে প্রকল্পসমূহের সংখ্যা, সম্পূর্ণকরণের লক্ষ্যমাত্রা ও সাফল্যের একটা হিসাব দেখানো হলঃ

বছর	এডিপিতে প্রকল্পসমূহ	সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য
১৯৭৪/৭৫	১৩৫২	২১	১২
১৯৭৫/৭৬	১৩৩৯	৫৫	৪১
১৯৭৬/৭৭	১৪৭৭	১৭৫	৮৫
১৯৭৭/৭৮	১৫১৯	৩৯১	১৪৫
১৯৭৮/৭৯	১৪৭৫	২৬১	১১৬
১৯৭৯/৮০	১৪০৬	৫১২	৩৫৭
১৯৮০/৮১	১৫৫৬	৩২১	১৬০
১৯৮১/৮২	১৬৯১	২২৮	১৩৩

সম্পদ সংকটের মুখে স্কীমের সংখ্যা বৃদ্ধি উন্নয়ন মাধ্যম হিসাবে এডিপির কার্যকারিতা হ্রাস করেছে। বহু সংখ্যক স্কীমের ভীড়ে অনেক স্কীমই অস্তিত্ব রক্ষার পর্যায়ে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ১৯৮১/৮২তে ৩৬ শতাংশ স্কীম ৮৪ শতাংশ বরাদ্দ পেয়েছে। পক্ষান্তরে ৬৪ শতাংশ স্কীম মাত্র ১৬ শতাংশ বরাদ্দ পেয়েছে।

৯·৮ যথাযথ মূল্যায়নের আগেই বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ঢালাও স্কীমের অন্তর্ভুক্তির কারণেই মাত্রাতিরিক্ত কার্যক্রমের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে; এমন কি, কোন কোন ক্ষেত্রে অনেক প্রকল্প ধারণা পর্যায় থেকে সুষ্ঠু আকার নেবার আগেই বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম দু'বছরে অননুমোদিত স্কীমের সংখ্যা ৪৫৯ থেকে ৭১৬-এ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮১/৮২ সালে এডিপিতে প্রকল্পগুলির ৪৭·১ শতাংশে দাঁড়ায়। ১৯৭৮/৭৯-এ ইহা ৩৩·৮ শতাংশ ছিল। অসমাঞ্জস্যহীনভাবে অননুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এডিপির মান ও কার্যকারিতাও হ্রাস পায়। উল্লেখিত ১৯৮২/৮৩ সালে যৌক্তিক করার কারণে এডিপিতে গৃহীত অননুমোদিত স্কীমের সংখ্যা আরাত্মকভাবে ৩১৩ বা মোট সংখ্যার ২৭·৭ শতাংশে হ্রাস পায়। খাদ্য উৎপাদন, শিক্ষা, জনসংখ্যা ও জ্বালানীর মত বিভিন্ন খাতের অন্তর্বর্তী বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এই ব্যবস্থা প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও প্রস্তুতির সহায়ক। এডিপিতে এখন অননুমোদিত প্রকল্প অন্তর্ভুক্তির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হবে। এডিপিকে উন্নয়নের কার্যকর মাধ্যমে পরিণত করার জন্য বিষয়টি অনুকূল। কোন স্কীম সীমিত সম্পদ থেকে বরাদ্দ লাভের ব্যাপারে অন্য স্কীমের চেয়ে নিজের অগ্রাধিকারের দাবীর সপক্ষে যুক্তি দেখাতে না পারলে অনুমোদন লাভ করার পরেও বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না—এই বিষয়টির প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে।

প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়া

৯·৯ প্রকল্প অনুমোদনের মন্থর প্রক্রিয়া অননুমোদিত স্কীম অন্তর্ভুক্তির অন্যতম কারণ। অতীতে অনুমোদন প্রক্রিয়া সরলীকরণ এবং প্রকল্প প্রণয়ন ও চূড়ান্ত অনুমোদনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান হ্রাসের চেয়ে স্কীম অনুমোদনের জন্য এতদ্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এক্ষেত্রে অনেকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমতঃ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের স্কীম অনুমোদনের ক্ষমতা ৫০ লাখ টাকা থেকে ২০০ লাখ টাকায় বৃদ্ধি করে স্কীম অনুমোদনের কর্তৃত্বকে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, একই সময়ে স্কীম প্রক্রিয়াকরণ সময় পর্যায়ভিত্তিক তফসিল গ্রহণ করা হয়েছে। এই সূচী অনুযায়ী ৫ কোটি টাকার বেশী ব্যয় সাপেক্ষে বা এর কাছাকাছি প্রকল্পের জন্য সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের (ইসিএনইসি) কাছ থেকে অনুমোদন নিতে হবে এবং এজন্য প্রকল্প প্রণয়নের দিন থেকে অনুমোদন পর্যন্ত মাত্র ১৮০ দিন লাগবে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে স্কীম অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ের বর্ধিত ক্ষমতা সীমিত সম্পদের সিংহভাগে ভাগ বসানোর চেষ্টার চেয়ে সার্বিক জাতীয় স্বার্থকেই বড় করে দেখবে। কারণ পরিকল্পনা কমিশন আন্তঃ খাতের বরাদ্দ দেন। তাই মন্ত্রণালয়গুলি তাদের ক্ষমতা যথাযথভাবে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হলে তা শেষ পর্যন্ত তাদের নিজ খাতের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করবে।

তহবিল প্রদান

৯·১০ এডিপিতে কোন প্রকল্প অন্তর্ভুক্তির পর তার বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ তহবিল প্রদান। অতীতে কর্মসূচী বা প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীরগতি বা বিলম্বের জন্য তহবিল প্রদানের পদ্ধতিগত ও প্রশাসনিক অনুষ্ঠানিক সবচেয়ে বেশী দায়ী। কাজেই অবাধে তহবিল প্রদান নিশ্চিত করার জন্য সরকার একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করেছেন এবং এর সুপারিশ ১৯৮২/৮৩ অর্থ বছর থেকে কার্যকর করা হয়েছে। নতুন পদ্ধতির প্রধান দিক হলো বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও প্রকল্প পরিচালকদের (প্রকল্পের বিনিয়োগ ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল) অস্থায়ী পদসমূহ সৃষ্টি ও সেগুলি বজায়

রাখা, তহবিল পুনর্বিন্যাস, অনুমোদিত উন্নয়ন স্কীমের প্রশাসনিক অনুমোদন, উন্নয়ন স্কীমের কাজের প্রশাসনিক অনুমোদন, অনুমোদিত প্রকল্পের সরঞ্জাম ও ষ্টেশনারী ক্রয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব প্রদান। দ্বিতীয়তঃ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার ঋণের দায় উন্নয়ন বাজেটে চিরকালের বাধা হওয়ার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া চালু প্রকল্পের ঋণ পরিশোধ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, সমাপ্ত প্রকল্পের ঋণদায় সংক্রান্ত সমস্যা একটি বিশেষ কমিটি পর্যালোচনা করবে।

৯'১১ জাতীয় অগ্রাধিকারকে ক্ষুণ্ণ না করে তহবিল প্রদান সহজতর করা এবং দক্ষতার সঙ্গে সীমিত সম্পদ বরাদ্দ করার একটি নতুন ব্যবস্থা হচ্ছে ১৯৮২/৮৩-র এডিপিতে মূল কর্মসূচীর ধরণা প্রবর্তন। মৌল কর্মসূচীতে শুধুমাত্র সর্বোচ্চ জাতীয় অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই ঐসব প্রকল্পের তহবিল প্রদান ব্যাহত হবে না। মোট বাজেটের মধ্যে মঞ্জুরীর দাবীতে খাতওয়ারী বিস্তারিত হিসাবের প্রতিফলন থাকলে আমদানী শুল্ক ও বিক্রয় কর (সিডিএফটি) ছাড়া সরকারী বিভাগ বা সংস্থার মৌল প্রকল্পের জন্য টাকার তহবিল সংশ্লিষ্ট প্রশাসক মন্ত্রণালয় ও বিভাগ সারা বছরের জন্য এক কিস্তিতে প্রদান করতে পারে। স্বায়ত্তশাসিত ও আধা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার মৌল প্রকল্পের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়, ডিভিশন অর্থ বিভাগ বা পরিকল্পনা কমিশনকে পূর্বাহ্নে না জানিয়েই তিন কোয়ার্টার অর্থাৎ তিন কিস্তির টাকা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে তহবিল প্রদান করবে। শুধু শেষ কিস্তির তহবিল অর্থ বিভাগের পূর্বাহ্ন অনুমতি নিয়ে প্রদান করা হবে।

৯'১২ আমদানী শুল্ক ও বিক্রয় করের জন্য অর্থের ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় কম হওয়ায় যন্ত্রপাতি, মরঞ্জাম ও অন্যান্য সামগ্রীর কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স পেতে দেরী হয়। তাতে সরকারী খাতের প্রকল্প বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হচ্ছে। এজন্য প্রতিটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার জন্য শুল্ক কর্তৃপক্ষের কাছে এক সঙ্গে থোক বাজেট বরাদ্দ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যা থেকে প্রকৃত আমদানী শুল্ক ও বিক্রয় কর কেটে নেওয়া হবে। এর ফলে সংস্থাগুলি শুল্ক কর্তৃপক্ষের তরফে আগে থেকে মূল্যায়নের সুবিধে হবে। সংস্থাগুলির নিকট বাড়তি শুল্ক দাবী মিটানোর জন্য উন্নয়ন বাজেটে থোক বরাদ্দের ব্যবস্থা থাকবে। কতিপয় ক্ষেত্রে কর বরাদ্দ বাজেটের থেকে বেশী ধরা হয়েছে। তাই এই নতুন পদ্ধতি আন্তঃ সংস্থা সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে নমনীয়তার সুবিধে দেবে।

কারিগরী সাহায্য কর্মসূচী প্রণয়ন

৯'১৩ কারিগরী সহযোগিতা কর্মসূচী নির্ধারণ সমস্যার সৃষ্টি করেছে; বিশেষ করে যেগুলি কিছুটা অদৃষ্ট পূর্ব সেইসব চাহিদার স্থান করে দেওয়ার অসুবিধার ক্ষেত্রে। অপচয়মূলক জরিপ ও উপদেষ্টা সার্ভিসের অভিযোগও রয়েছে। তৃতীয় বিষয় হচ্ছে, দেশী উপদেষ্টা নিয়োগ বা তাঁদেরকে কমপক্ষে বিদেশী উপদেষ্টাদের সঙ্গে যুক্ত করা। কারিগরী সাহায্য প্রকল্পের নমনীয় ও দ্রুততর বিবেচনার জন্য একটি নতুন পদ্ধতি এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। কারিগরী সহযোগিতা প্রকল্প মনিটর করা এবং পুনরাবৃত্তি এড়াবার জন্য বহিঃ সম্পদ ডিভিশনে (ERD) একটি কারিগরী সহযোগিতা সমন্বয় সেল গঠন করা হচ্ছে। স্থানীয় বিশেষজ্ঞ নিয়োগ সংক্রান্ত একটি নীতি নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হচ্ছে।

আদেশ প্রদানে বিলম্ব

৯'১৪ দ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পণ্য বা সার্ভিসের অর্ডার প্রদানে বিলম্ব এখনো একটি গুরুতর বাধা। পণ্য ও সার্ভিসের জন্য টেন্ডার প্রদান পদ্ধতির এবং কনসালটেন্ট নিয়োগের পৃথক নীতি-মালা অনেক দিন থেকেই আছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে শুধুমাত্র এই নীতিমালা সম্পর্কে সজাগ করে দেয়া নয় বরং তা অনুসরণ করারও অতিরিক্ত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

পরিকল্পনা সেল

৯·১৫ কিছুদিন থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে পরিকল্পনা সেল চালু রয়েছে। এগুলিকে মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত ব্যবস্থার মধ্যে কি করে সমন্বিত করা যায় তা দেখার জন্য তাদের তৎপরতার মূল্যায়ন করা হচ্ছে। স্বীকার করা হয়েছে যে বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলিতে শক্তিশালী পরিকল্পনা কাঠামো থাকা উচিত। মন্ত্রণালয় পর্যায়ে এই সেলগুলির সমন্বয়, বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে। এ কথা মনে রেখে এগুলিকে জোরদার করা হচ্ছে। প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ে অনুরূপ সেল থাকার প্রয়োজন নেই কারণ এদের কারো কারো উন্নয়নের দায়িত্ব শুধুমাত্র প্রান্তিক ব্যাপার এবং কারো কারো এটাই একমাত্র কাজ। যেসব মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় খুবই জরুরী এবং উন্নয়ন ছাড়া অন্য তৎপরতা ও অনুরূপ মনোযোগ অপরিহার্য সেখানেই পরিকল্পনা সেল থাকা উচিত। পরিকল্পনা কাল শেষ হওয়ার আগে যেখানে প্রয়োজন একটি মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত কাঠামোর মধ্যে সেখানে এই সেলগুলি স্থাপনই একান্ত উদ্দেশ্য।

বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন

৯·১৬ দ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে বাধা অপসারণের জন্য প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির সরেজমিনে পরিদর্শনের পাশাপাশি অগ্রগতির রিপোর্ট প্রদানের একটি ব্যবস্থা বাস্তবায়ন মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিভাগ কাজে লাগাচ্ছে। প্রকল্পের সমস্যা ও অগ্রগতি এনইসি পর্যায়ে ত্রৈমাসিক ও মন্ত্রণালয়ে মাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। অবশ্য নেটওয়ার্ক পর্যালোচনা, সিপিএম এবং অন্যান্য মূল্যায়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে মনিটরিং ব্যবস্থাকে আরো উন্নত করতে হবে। এজন্যে প্রকল্প নকশা ও প্রকল্প প্রোফর্মাতেও এর উন্নয়ন দরকার হবে। এছাড়াও প্রকল্পের ফলাফল নির্ভর করে এর বাস্তবায়ন সময়মত শুরু করা এবং পরিকল্পিত ব্যয়ের উপর পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে বিচ্যুতির ব্যাখ্যার জন্য প্রকল্পের সমাপ্তিপূর্ব মূল্যায়ন প্রয়োজন। পরিকল্পিত উন্নয়নের অংশ হিসাবে এদিকে জোর দৃষ্টি দেয়া হয়নি। এদিকে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

বেসরকারী খাতে বাস্তবায়ন

৯·১৭ বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ কর্মসূচীর সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে কয়েকটি ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই কার্যকর রয়েছে। অধ্যায় ৮-এ এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নীচে উল্লেখ করা হলো:

(ক) আবেদন পত্রের বিভিন্ন ফরম সহজ করে ও মঞ্জুরীর সময়সীমা বেঁধে দিয়ে বিনিয়োগ মঞ্জুরীর পদ্ধতি উদার করা হয়েছে।

(খ) ঋণদান সংস্থা কর্তৃক ঋণ বিলির সর্বোচ্চ সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।

(গ) বাড়তি ক্ষমতা দিয়ে অঞ্চল ও জেলা পর্যায়ের ঋণ মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ ও ঋণ বিলিকারী সংস্থার আরও বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে।

(ঘ) শিল্প বিভাগে বিনিয়োগ সহযোগিতা ইউনিট স্থাপন করে শিল্প প্রকল্প ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সার্ভিসের ক্ষেত্রে 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' সুবিধা চালু করা হয়েছে।

(ঙ) বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার জন্য বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগ (উন্নয়ন ও রক্ষা) আইন চালু করা হয়েছে।

(চ) বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগ প্রস্তাব মঞ্জুরী ত্বরান্বিত করার জন্য প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের কার্যালয়ে একটি সেল গঠন করা হয়েছে।

(ছ) বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য চট্টগ্রামে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সব অবকাঠামো ও সংশ্লিষ্ট সুবিধাসহ রফতানী প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল বাস্তবায়িত করা হচ্ছে।

(জ) বেসরকারী খাতে বিনিয়োগে ইক্যুইটি ফিনান্সিংয়ের জন্য সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বিক্রি করে এবং মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও ইউনিট সার্টিফিকেট চালুর মাধ্যমে আইসিবিকে জোরদার করা হয়েছে।

(ঝ) বেসরকারী শিল্প উদ্যোগের জন্য আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলির সহযোগিতায় একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রমোশন এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী (আইপিডিসি) গঠন করা হয়েছে।

(ঞ) বেসরকারী ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করার জন্য বিদ্যুৎ, পরিবহন ও অন্যান্য অবকাঠামো সুবিধাসহ পল্লী অঞ্চলে বেশ কয়েকটি কৃষিভিত্তিক শিল্প কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

(ট) কৃষি ঋণ কর্মসূচী বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ঋণ বরাদ্দের সহজ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সহায়ক সমস্যা কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা হয়েছে।

(ঠ) বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়হারজনিত ঝুঁকির ব্যয় বেসরকারী খাতের বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা। বৈদেশিক মুদ্রার হারের উঠানামাজনিত বোঝা হ্রাসের জন্য বিষয়টি পরীক্ষা করা হচ্ছে।

দ্বিতীয় ভাগ

খাতওয়ারী কর্মসূচী

দশম অধ্যায়

কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী উন্নয়ন

ক—কৃষি

বাংলাদেশের কৃষি প্রধান অর্থনীতিকে দেশটির অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতার লক্ষণ হিসেবে ধরা হলেও বাংলাদেশে কৃষি খাতের উন্নতি সাধনের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে এবং এজন্য কৌশলগত কারণে, উন্নয়নের সামগ্রিক গুরুত্ব কৃষি খাতেই আরোপ করা দরকার। আধুনিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, প্রথমে কিংবা একই সংগে কৃষি উন্নয়ন ছাড়া খুব কম দেশেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে কিছু উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ছাড়া আন্তর্জাতিক মানের তুলনায় বাংলাদেশের কৃষি খাতে উৎপাদনশীলতা এখনও কম রয়ে গেছে এবং এটাই তুলে ধরে যে কৃষি খাতে আরও উন্নয়নের অবকাশ রয়েছে। এদেশে মাত্র ১৬ শতাংশ জমিতে সেচের সুবিধা রয়েছে এবং একর প্রতি মাত্র ৪০ কেজি রসায়নিক সার ব্যবহার করা হয়। এসব বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ও দেশের খাদ্য ঘাটতি মেটাতে দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনের মত গুরুত্বপূর্ণ কারণে কৃষি উন্নয়নে বড় রকমের গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কৃষির দ্রুত উন্নয়ন দেশের জনসাধারণের চির সংগী দারিদ্র লাঘবে সহায়তা হতে পারে; কারণ উৎপাদক ও উপার্জনকারী উভয় হিসাবেই দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ গরীব জনসাধারণ জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তাই সামগ্রিক পল্লী উন্নয়ন কাঠামোতে কৃষি খাতের উন্নয়নের উপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

কৃষি খাতের উদ্দেশ্যাবলী

১০·২ কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের মূল বিষয় পানি-সার-বীজ প্রযুক্তি কৌশলের দ্রুত সম্প্রসারণ যার ফলে সম্ভাব্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা যায়। পরিকল্পনার প্রান্তিক বছরে (১৯৮৪/৮৫) খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তি বৎসর ১৯৭৯/৮০ সালের ১৩·৪ মিলিয়ন থেকে ১৭·৫ মিলিয়ন টনে নির্ধারিত হয়েছে। একই সময়ে শীতকালীন ফসলের উন্নয়ন এবং কৃষি বহুমুখীকরণকেও উৎসাহিত করা হবে যাতে আমদানীর বিকল্পের একটি প্রশস্ত এবং দৃঢ় ভিত্তি গড়ে উঠে এবং রপ্তানী বৃদ্ধি পায়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়াও, পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানের লক্ষ্যগুলোও প্রধানতঃ কৃষি খাতেই বাস্তবায়িত করার চেষ্টা চলবে। এর কারণ, গ্রামের অধিকাংশ গৃহস্থালী জমির উপর নির্ভরশীল, জমির সংগে তাদের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি বিপুল শ্রমিকের কর্মসংস্থানের দিক থেকেও যুক্তিযৌক্তিক। কৃষিতে সৌভাগ্যক্রমে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান উভয়বিধ উদ্দেশ্যেরই একত্র সমাবেশ ঘটেছে। তৃতীয়তঃ সামাজিক ন্যায়বিচার ও আয়ের আরও ন্যায় সংগত বন্টন নিশ্চিত করার যে জাতীয় উদ্দেশ্য রয়েছে সে উদ্দেশ্য প্রধানতঃ কৃষি উন্নয়নের মধ্যে দিয়েই অর্জন করতে হবে। কারণ, কৃষি জমিই দেশের প্রধান সম্পদ এবং এদেশে পল্লী এলাকায় বেকারত্ব ও আংশিক বেকারত্বের পরিমাণও অত্যন্ত বেশী। বর্ধিত ফসল এবং কৃষি জমির উন্নয়ন ও অন্যান্য ক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনায় উন্নতির সাথে সাথে অধিক কর্মসংস্থানের ফলে কৃষি খাতে আয় বন্টনের বৈষম্যের উপশম হবে এবং তাতে বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের জীবন মানের একটা সার্বিক উন্নতি ঘটবে বলে আশা করা যায়। এটা নিশ্চিত করার জন্য, পরিকল্পনায় এক দিকে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও অন্যদিকে স্থানীয় সরকার ও জনগণের উৎপাদনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

কৃষি উন্নয়ন কৌশলের সমস্যাবলী

১০·৩ বাংলাদেশে কৃষি বর্তমানে নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে যা শুধু সুপরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমেই সমাধান করা যেতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এই যে কৃষি খরা, কীটপতংগের হামলা ও বন্যা ইত্যাদির মত দুর্যোগের কাছে অত্যন্ত নাজুক। মাঝে মাঝে ঘূর্ণিঝড়, তুফান, ইত্যাদিতেও ফসলহানি ঘটে থাকে। গত দশকের প্রায় প্রতি এক বছর অন্তর কৃষি কোন না কোন বড় রকমের প্রাকৃতিক দুর্যোগের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দেশের জমির মাত্র ছয়ভাগের একভাগে পানি সেচের ব্যবস্থা আছে। ফলে বেশীর ভাগ জমি বা ফসল বিপজ্জনকভাবেই আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল। মওসুমী বায়ুপ্রবাহই আমাদের দেশের কৃষিকে নিয়ন্ত্রণ করে, বিশেষ করে খারিফ শস্যের মৌসুমে। কিন্তু মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ অনিশ্চিত বলে ব্যাপক ফসলহানির ঝুঁকি সবসময়েই থেকে যায়। এজন্য কৃষি উন্নয়নের প্রধান কৌশল হবে সেচ

সুবিধের দ্রুত প্রসার। দ্বিতীয় সমস্যা সাম্প্রতিককালে চিহ্নিত হয়েছে ; সেটা হচ্ছে, মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার প্রতি মনোযোগের অভাবে মাটির উর্বরতা গুরুতরভাবে নষ্ট হচ্ছে। বাড়তি জনসংখ্যার প্রবলচাপে পতিত জমির পরিমাণ এত কমে আসছে যাতে জমির স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিজস্ব উর্বরতায় পুনরুদ্ধার ঘটে না যদিও এদেশের এক চিলতে জমি থেকে বছরে গড়ে মাত্র প্রায় দেড়টি ফসল উৎপাদিত হয়ে থাকে। নিবিড় চাষের জন্য প্রায় দুই দশক আগে বাংলাদেশে রাসায়নিক সার ব্যবহার শুরু হয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও মাটিতে সূক্ষ্ম পুষ্টি উপাদানের ভাগ এত কমে গেছে যে রাসায়নিক সার দিয়েই মাটি থেকে সুফলপ্রাপ্তির পরিমাণ কমেই চলেছে। গম ও ধানের ক্ষেত্রে কিছুটা সাফল্য ছাড়া অনেক ফসলের ক্ষেত্রেই এখনও বীজগত কোন উৎকর্ষ সাধিত হয়নি যাতে করে আধুনিক উপকরণগত সুযোগ সুবিধে কাজে লাগানো যায়। অধিক ফলনশীল ধান ও গমের ক্ষেত্রেও বীজগত বুনিয়াদ বিস্তৃত না হয়ে ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসছে। ফলে ভাইরাসের আক্রমণে বীজের অস্তিত্বই লোপ পাবার সমূহ আশংকা সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশে সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যয় তুলনামূলকভাবে বেশী। আর তাই অধিক ফলনশীল জাতের ফসলের উপরেই কৃষির সাফল্য নির্ভরশীল। বীজ গবেষণা, উন্নত মৃত্তিকা, পানি ব্যবস্থাপনা, যুক্তিসঙ্গতভাবে ফসল ফলনের পদ্ধতি এবং জৈব ও অজৈব সারসহ মাটিকে সূক্ষ্ম পুষ্টি উপাদানে সমৃদ্ধ করার উপর জোর দিয়ে কৃষি উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হবে।

১০·৪ বর্তমানে প্রচলিত জমি বন্টন ব্যবস্থা জমিতে কৃষির আধুনিক উপকরণের নিবিড় প্রয়োগের বিরোধী। মোট জমির পাঁচ ভাগের একভাগ বর্গাচাষীরা চাষ করে থাকেন। কাজেই ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী এই বর্গাচাষীরা জমিতে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মাত্রায় আধুনিক উপকরণগুলি প্রয়োগ করতে পারে না। প্রায় ৫১ শতাংশ চাষীর হাতে জমির পরিমাণ অর্ধ একরেরও কম। কৃষির আধুনিক উপকরণগুলি প্রান্তিক চাষীদের নাগালের বাইরে। তাছাড়া, গত কয়েক বছরে এসব উপকরণের দামও বেড়েছে অনেক। অন্যদিকে বড় চাষীরা ছোট চাষীদের তুলনায় একর প্রতি কম পরিমাণে সার ব্যবহার করতে দেখা যায়। নতুন প্রযুক্তি দ্রুত প্রসারের ভিত্তিতে কৃষি উন্নয়নের জন্য সংগতভাবে ভূমি সংস্কারের প্রয়োজন। প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধে অনুযায়ী কৃষি উন্নয়ন ক্ষেত্রে ন্যায্যতা ও উৎপাদনের উভয় দিকে নজর দিতে হবে। ১৯৭৭ সালের কৃষি শুমারীতে দেখা যায়, ১৯৬০ সালের পর থেকে ভূমি বন্টন ব্যবস্থায় তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ১৯৬০-এর পর বর্গাচাষের পরিমাণ শুধু কমেনি ; মাঝারি আকারের খামার-গুলিতেই জমি কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এটা ভূমিহীনদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ইংগিত। ক্ষুদ্র চাষীদের ব্যাপক হারে আধুনিক কৃষি উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পনা মেয়াদে বেশী পরিমাণে কৃষি ঋণ দেওয়া হবে।

১০·৫ পরিশেষে, একথা অনস্বীকার্য বাংলাদেশের কৃষির বৈশিষ্ট্য প্রধানতঃ জীবনধারণমূলক। এর ফলে, আধুনিক প্রযুক্তি প্রসারে বিপণন প্রক্রিয়ার (market mechanism) ব্যবহারও সীমিত হয়ে পড়ে। আবার বাজার পরিস্থিতি যদি উপকরণগুলির মূল্য নির্ধারণ করতে থাকে তাহলে ঐ প্রক্রিয়ায় বিপরীত ফল দর্শাতে পারে, কাজেই যতদিন চাষীরা নতুন প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে কৃষিতে জীবন ধারণের স্তর পেরিয়ে উদ্বৃত্ত উৎপাদনের দোর গোড়ায় না পৌঁছাবে ততদিন কৃষি উপকরণের মূল্য নির্ধারণের জন্য যুক্তিসংগত-নীতি অনুসরণ করতে হবে। উদ্বৃত্ত উৎপাদনের দ্বারপ্রান্তে এলেই সমস্যা উপকরণের মূল্য নির্ধারণের থেকে উৎপাদনের মূল্যে অতিক্রান্ত হবে এবং জীবনধারণ পর্যায়ের যেসব চাষীকে উদ্বৃত্ত উৎপাদন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না তারা এক নতুন অনিশ্চয়তায় পড়বেন ; এতদিন অনিশ্চিত প্রকৃতির যে সমস্যা তাদের ছিল এরপর তাঁরা বাজারের অনিশ্চিয়তায় পড়বেন। মূল্য সমর্থনমূলকনীতির মাধ্যমে এই সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে। উৎসাহদানমূলক মূল্য নির্ধারণ ছাড়াও প্রতিদ্বন্দ্বী ফসলগুলির পরস্পর পরিপূরক একটা সম্পর্কেও নির্ধারিত হবে। এই নীতির আওতায় ক্রমবর্ধমান মাত্রায় উৎপাদনের পরিস্থিতিতে প্রতিদ্বন্দ্বী ফসলগুলির কারণে কোনও একটি ফসলের মূল্যের স্থিতিশীলতায় অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে। পরস্পরজনিত সম্পর্কের ক্লাসিক দৃষ্টান্ত প্রসংগে চাল ও পাটের কথা উল্লেখ করা যায়। আবার বোরো ও তৈলবীজ যখন তৈলবীজ কোষের ফলনে কোন বৈপ্লবিক অগ্রগতি সাধিত হয় এবং ধান ও ইক্ষু—এই দুই জোড়া ফসলের এক একটি জোড়ার মধ্যে ঐ একই ধরণের পারস্পরিক সম্পর্ক হতে পারে। কৃষিতে অগ্রগতির সংগে সংগে এই পরস্পর সম্পর্ক তীব্রতর হয়ে উঠতে পারে। এ কারণেই কৃষি পণ্যগুলির মূল্য সমস্যা সংগত মূল্য নির্ধারণনীতির মাধ্যমেই সমাধান করতে হবে।

ফসল

খাদ্যশস্য

১০·৭ অপ্রতুল বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচানো ও গরীব জনসাধারণের দুর্ভোগ নিরসনে যতদ্রুত সম্ভব খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। পরিকল্পনার প্রান্তিক বছর ১৯৮৪/৮৫ সালের জন্য এই অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৯৭৯/৮০ সালে উৎপাদিত ১৩·৪ মিলিয়ন টনের তুলনায় ১৭·৫ মিলিয়ন টন। এর অর্থ ১৯৭৯/৮০ সালের মতই মাথাপিছু দৈনিক খাদ্যশস্য যোগানের পরিমাণ ১৫·৮ আউন্স। এই লক্ষ্য অর্জনের কৌশল সেচের পানি, বীজ ও সার সমন্বিত আধুনিক জৈব রসায়নিক প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল। প্রযুক্তি প্রসারের হার ত্বরান্বিত করার জন্য চাষীদেরকে গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে বিভিন্ন কৃষি উপকরণ ও ঋণ পূর্ণাঙ্গ আকারে সরবরাহ করা হবে। প্রযুক্তির মেরুদণ্ডসদৃশ্য সম্প্রসারণ সার্ভিসকে প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন পদ্ধতির সংগে সঙ্গতিবিধান করে নতুন করে পুনর্গঠিত করা হবে। সর্বাধিক ফললাভের জন্য সবচেয়ে সম্ভাবনাময়, বিশেষ করে, সেচ সুবিধেযুক্ত কৃষি এলাকাতেই প্রধানতঃ প্রয়াস কেন্দ্রীভূত হবে এবং আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য দেশের অবশিষ্ট অঞ্চলে সেচের মত প্রধান ন্যূনতম সুবিধে সুনিশ্চিত করা হবে। পরিকল্পনার ১৯৮৪/৮৫ মেয়াদে সেচ এলাকা ১৯৭৯/৮০ মেয়াদের ৩·৬ মিলিয়ন একর থেকে বাড়িয়ে দ্বিগুণে অর্থাৎ ৭·২ মিলিয়ন একরে এবং একই মেয়াদে সারের ব্যবহার ৮·৫০ লাখ টন থেকে প্রায় দ্বিগুণে বাড়িয়ে ১৬·০ টনে উন্নীত করা হবে। বর্ধিত খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিকল্পনার শ্রেষ্ঠাংশই পাওয়া সম্ভব হবে অধিক ফলনশীল এবং স্থানীয় উন্নতজাতের ধান ও গম থেকে। অধিক ফলনশীল জাতের ধানের উৎপাদন এলাকা ১৯৭৯/৮০ সালের ৩০·৮৫ লাখ একর থেকে বেড়ে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৫৮·০০ লাখ একরে দাঁড়াবে। প্রস্তাবিত উৎপাদন প্রধানতঃ সেচের দ্বারা প্রভাবান্বিত হবার দরুণ শীতকালের বোরো ধান ও গম চাষের ব্যাপক সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাড়তি ফসল পাওয়া যাবে। নিম্নে খাদ্যশস্য উৎপাদনের বণ্টন দেখানো হলোঃ

(লক্ষ টনে)

খাদ্য শস্য	১৯৭৯/৮০ (প্রকৃত)	১৯৮৪/৮৫ (অভিক্ষেপ)
(১) আউশ	২৮·০৯	৩৮·৯০
(২) আমন	৭৩·০১	৮৩·৫০
(৩) বোরো	২৪·২৭	৩৪·০০
মোট চাল	১২৫·৩১	১৫৬·৪০
(৪) গম	৮·১০	১৮·৬০
মোট খাদ্য শস্য	১৩৩·৪৯	১৭৫·০০

১০·৭·১ **আউশঃ** আউশ ধান উৎপন্ন হয় ৭৮ লাখ একর জমিতে অর্থাৎ ধানী জমির মোট ২৮ ভাগ এলাকায় কিন্তু মোট উৎপাদিত ধানের শতকরা ২৪ ভাগ আউশ থেকে পাওয়া যায়। ফসল বন্যা, খরা, শিলাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়। চাষাবাদে বড় রকমের ঝুঁকি থাকায় চাষীরা জমিতে সারের মত আধুনিক কৃষি উপকরণ কম পরিমাণ ব্যবহার করার ফলে ফলন কম হয়। তবে শীত মৌসুমে সেচের সম্প্রসারণের মাধ্যমে ইরি নামে আউশ ধানের আশু ফলন যথেষ্ট বাড়ানো যায়। পরিকল্পনায় উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানের চাষ ১৯৭৯/৮০ সালের ৮·৩০ লাখ টনের তুলনায় ১৯৮৪/৮৫ সালে ১৫·০০ লাখ টন হবে বলে ধরা হয়েছে। তবে আউশের উৎপাদন বৃদ্ধির সংগে সংগে ফসল মাড়াই ও শুকানোর ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দেবার প্রয়োজন। কারণ, এ ফসল কাটার সময় বর্ষা মৌসুম শুরু হয়।

১০·৭·২ **আমনঃ** দুজাতের আমনের মধ্যে গভীর পানিতে যে আমনের আবাদ হয় অর্থাৎ যে জাতের আমন বীজ বোনা পদ্ধতিতে চাষ হয়ে থাকে সেই আমন ধানের বিষয়ে অতীতে গবেষক বা কৃষিবিদদের তেমন মনোযোগ পড়েনি ; কারণ, বেশ একটা কঠিন ভূপ্রাকৃতিক পরিবেশে ঐ ধানের চাষাবাদ হয়ে থাকে। মোট ধানী জমির শতকরা ১৬·২ ভাগ এলাকায় এই জাতের ধানের চাষ হয় বলে এই জাতের ধানের দিকে যথাযোগ্য মনোনিবেশ প্রয়োজন। প্রাকৃতিক নানা সীমাবদ্ধতার কারণে বোনা আমনের উৎপাদন বাড়ানো যুক্তিসংগত নয়। রোপা আমন বলে পরিচিত আমন বর্ষার পানিতে ভাল জন্মায় বলে সম্পূরক পানি সেচের ব্যবস্থা করে এই জাতের ধানের উৎপাদন ১৯৭৯/৮০ সালের ৫৭·২৩ লাখ টন থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৬৭·৩০ লাখ টনে উন্নিত করা হবে। উচ্চ ফলনশীল জাতের রোপা ধানের চাষ ১৯৭৯/৮০ সালের ১১·২৬ লাখ একরের তুলনায় ১৯৮৪/৮৫ সালে ১৮·০০ লাখ একরে বাড়ানো হবে।

১০·৭·৩ **বোরোঃ** ধানী জমির শতকরা ১০ ভাগ এলাকায় বোরো ধানের আবাদ হয়। বোরো ধানের উৎপাদন ধানের মোট উৎপাদনের ১৬ শতাংশ। শীতকালে সেচ সুবিধে সম্প্রসারণের সংগে সংগে এই ধানের চাষের এলাকাও বাড়ছে, এই ধান চাষেই প্রথম কৃষির আধুনিক প্রযুক্তি ও উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার করা হয়েছে। বোরো ধান চাষে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে ভাল ফল পাওয়া যায়। কারণ, সেচের আওতায় পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত থাকে এবং প্রচুর সূর্যালোকের ফলে কার্যকরী সালোকসংশ্লেষন প্রক্রিয়ার দ্বার প্রয়োগকৃত সারের অধিকতর সদ্ব্যবহার হয়। সেচের পানি পাওয়া গেলে এই ধান চাষের জন্য যথেষ্ট জমিরও অভাব নেই। সেচের সুবিধেযুক্ত উচ্চ ফলনশীল বোরোর চাষ ১৯৭৯/৮০ সালের প্রায় ১৫·৬৫ লাখ একরের তুলনায় ১৯৮৭/৮৫ সাল ২৫·০০ লাখ একরে বৃদ্ধি পাবে। সেচ সুবিধের সম্প্রসারণের ফলে আরও বেশী এলাকা অধিক ফলনশীল জাতের ধান চাষের আওতায় চলে যাবার দরুণ সনাতন প্রথায় পানি সেচের সুবিধেযুক্ত এলাকায় (১১ লাখ একর) স্থানীয় জাতের ধানের চাষ ১৯৮৪/৮৫ সাল নাগাদ প্রান্তিক পর্যায়ে হ্রাস পাবে।

১০·৭·৪ **গমঃ** সাম্প্রতিককালে গম চাষের দ্রুত সম্প্রসারণ অন্যতম প্রতিশ্রুতিব্যঞ্জক ঘটনা। আরও যথেষ্ট পরিমাণে গম চাষ প্রসারের সম্ভাবনা রয়েছে। শুকনো মৌসুমের ফসল গম তুলনামূলকভাবে দুর্যোগমুক্ত আর সেচের ওপর অপেক্ষাকৃত কম নির্ভরশীল। সরকারের বীজ বিতরণ ও সম্প্রসারণ ধর্মী প্রয়াসে চাষীদের সাড়াও অনুকূল। শীতকাল কর্মতঃ গম চাষের জন্য জমির কোন অভাব নেই বলে ১৯৭৯/৮০ সালে উৎপাদিত ৮·১০ টনের তুলনায় ১৯৮৪/৮৫ সাল নাগাদ ২১ লাখ একর জমিতে গম চাষের মাধ্যমে ১৮·৬০ লাখ টন ফসল পাওয়া যাবে অনুমান করা হয়েছে।

১০·৮ **মোটা দানার শস্যঃ** মোটা দানার শস্য ভুট্টা, যব, সরগম, বজরা ও জোয়ারের ন্যায় দেশের অপ্রধান শস্যের শ্রেণীভুক্ত। এগুলি এখনও প্রধান খাদ্য হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে না উঠলেও দেশের কৃষিভিত্তিক শিল্পের উন্নয়নে এগুলির বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। এই শস্যগুলি প্রান্তিক পর্যায়ের আবাদে-কানাচের জমিতে জন্মায়। এগুলি অস্বাভাবিক ধরণের ফসলহানির ক্ষেত্রে বেশ উল্লেখযোগ্য রকমের খাদ্য মজুত থাকার মত সুবিধে দিতে পারে। উন্নততর জাতের বীজ ও উন্নত ব্যবস্থাপনা রীতি প্রবর্তনের মাধ্যমে এসব ফসলের ফলন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা যায়। অতীতে এসব ফসলের চাষ উপেক্ষিত হয়েছে। তবে এখন এগুলি যথেষ্ট মনোযোগ লাভের দাবীদার। এসব ফসল উৎপাদন ও বিপণনের সমস্যাবলী এবং বর্ধিত উৎপাদন ও দেশের অভ্যন্তরে মোটা দানা শস্য খাদ্যরূপে ব্যবহারের প্রতি চাষীদের দৃষ্টিভঙ্গী চিহ্নিত করার জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে একটি সমীক্ষা পরিচালনার কাজ হাতে নেওয়া দরকার যাতে করে দেশে এসব ফসলের সম্ভাবনা যাচাই করা যায়।

খাদ্যনীতি

১০·৯ এই পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের বর্ধিত উৎপাদন প্রয়াসে সাম্প্রতিক অতীতের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি উপকরণ ও উৎপাদিত ফসলের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে জোরদার নীতিগত সমর্থন প্রয়োজন। ১৯৭০ দশকের শেষার দিকে আন ব্যবহারের পরিমাণ বার্ষিক ১৩·৩০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়, তবে, দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা আমলে ঐ পরিবর্ধিত হার অংশতঃ আন্তর্জাতিক কারণে অর্থাৎ ১৯৭৯ সালের খরা ও প্রধানতঃ সারের মূল্য বৃদ্ধির কারণে কমে আসে। সারের (ইউরিয়ার) ও ধানের পরস্পরের অনুপাতের তারতম্যেও অবনতি ঘটে। ১৯৭২/৭৩ সালে ৫ মণ ধানের দামে ১৩ মণ ইউরিয়া কেনা যেত। ১৯৭৭/৭৮ সালে ঐ অনুপাত ৫ঃ১১-তে এবং ১৯৭৯/৮০-তে ৫ঃ৯-এ নেমে যায়। অনুভাব করা হচ্ছে যে, চাষীরা সার কিনতে অতিরিক্ত খরচের জন্য চালের বর্ধিত দামের আকারে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ পাননি। খাদ্য শস্যের লক্ষ্যমাত্রা ও সার বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে একটা যুক্তিসঙ্গত

উপকরণ ও উৎপাদনের মূল্য নীতি অনুসৃত হবে এবং একই সাথে সারের ও অন্যান্য কৃষি উপকরণের যথার্থ ব্যবহারের দিকে জোর দেওয়া হবে। উপকরণ ও উৎপাদনের মূল্য নীতির উদ্দেশ্য হবে চাষীদের জন্য ধান ও চালের উৎসাহজনক মূল্য নিশ্চিত করা। খাদ্যশস্যের দাম ফসল তোলার মৌসুমে যখন সবনিম্ন স্তরে পৌঁছায় বিশেষ করে তখন খাদ্যশস্য সংগ্রহ কার্যক্রম চালিয়েও চাষীদের ফসলের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা হবে।

১০·১০ এটা অনস্বীকার্য যে প্রয়োজনীয় মূল্য সমর্থন এবং কৃষি উপকরণ সরবরাহমূলক সমর্থন সত্ত্বেও বাংলাদেশের চাষবাদ প্রকৃতি খামখেয়ালীর অসহায় শিকার হয়েই থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত সেচ কার্যক্রমের মাধ্যমে আবহাওয়ার মর্জির ওপর নির্ভরশীলতা যথেষ্ট পরিমাণে না কমানো যায়। তাই, পরিকল্পনা মেয়াদে বড় রকমের ফসলহানির সম্ভাবনা থেকেই যায়। এ ধরণের জরুরী খাদ্য পরিস্থিতি এত আকস্মিকভাবে ঘটতে পারে যে বিদেশ থেকে যথাসময়ে খাদ্য সহায়তা নিশ্চিত করা দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। তাই পরিকল্পনাকালে দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহের মাধ্যমে ১৯৮৪/৮৫ সাল নাগাদ ১৫ লাখ টনের এক খাদ্যশস্যের মজুত গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। জরুরী পরিস্থিতিতে জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা পরিকল্পনা ছাড়াও দেখা যায় এমন কি স্বাভাবিক সময়েও বাজারে যখন খাদ্যশস্য পাওয়া যায় তখনও ক্রয় ক্ষমতার অভাবে বাংলাদেশের বহু পরিবার খাদ্যশস্য কিনতে পারে না। তাই সকলের খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা পরিকল্পনা পরিবার পর্যায়ে সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন। সকল পরিবারের খাদ্যশস্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হলে একদিকে কৃষি উপকরণের জন্য প্রদত্ত ভর্তুকি নিরীখে উৎপাদিত ফসলের জন্য সমর্থনমূলক ব্যবস্থা ও অন্যদিকে, দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারে সরকারের অনুপ্রবেশের তুলনামূলক তাৎপর্য বাচাই করার লক্ষ্যে সরকারী নীতির পুনর্বিবেচনা করতে হবে। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মন্দা বিরাজ করলে পণ্যের আকারে মজুরী প্রদান অথবা অভাবগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্যের ব্যবস্থার মত বিকল্প পদ্ধতি অভাবী লোকজনের কাছে খাদ্য পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে গ্রহণ করতে হবে। উল্লিখিত সীমারেখার মধ্যে প্রতিটি পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টিকে পরিকল্পনায় জনসাধারণের একটা সার্বজনীন চাহিদাকে আয় ও কর্মসংস্থান কার্যক্রমের মাধ্যমে ফলদায়ক চাহিদায় রূপান্তরিত করার কথা চিন্তা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, এই বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে যে, জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা যেমন উৎপাদন ও সরবরাহ নির্ভর তেমনি পরিবার পর্যায়ের খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি পারিবারিক চাহিদা কেন্দ্রিক। তৃতীয়তঃ খাদ্যনীতিকে এটাও স্বীকৃতি পাবে যে, বাজার দামের ওঠানামার কারণেও বিভিন্ন সময়ে পরিবারগুলিতে যথেষ্ট চাপের সৃষ্টি হয়। এজন্য, খাদ্য নিরাপত্তা পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের মূল্য সাধারণভাবে স্থিতিশীল রাখার একটা কর্মক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। খাদ্যশস্য সংগ্রহ কার্যক্রম ফসলের মৌসুমে চাষীদের ফসলের উৎসাহদানমূলক মূল্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করবে, পক্ষান্তরে খাদ্যাভাবের মাসগুলিতে খাদ্যশস্যের মূল্যের স্থিতিশীলতা কার্যক্রম সংখ্যাগরিষ্ঠের ঘরে খাদ্যশস্য সরবরাহের ব্যবস্থা করবে। মূল্য স্থিতিশীল করার কর্মক্রমের অংশভুক্ত খাদ্যশস্য সংগ্রহ কর্মক্রমের সম্ভাব্য অনুষঙ্গ হিসেবে সরকার ফসল তোলার সময় সংগৃহীত খাদ্যশস্য খোলা বাজারে বিক্রয় করবেন।

অন্যান্য ফসল

১০·১১ **পাটঃ** বাংলাদেশের প্রধান বাণিজ্যিক ফসল। পাট বাংলাদেশে বৃহত্তম শিল্পের (পাট বয়ন) কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রপ্তানী আয়ের তিন-চতুর্থাংশ আসে পাট থেকে। আবহমানকাল ধরে সংগতভাবেই বাংলাদেশের অর্থনীতিকে চাল ও পাটের অর্থনীতি বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। অবশ্য, কিছুকাল হল পাটচাষের জমির পরিমাণ ও উৎপাদন ক্রমান্বয়ে কমে গেছে। ১৯৬৯/৭০ সালের ২৩·৭ লাখ একরের তুলনায় পাটের চাষ ১৯৭৯/৮০ সালে ১৮·৭ লাখ একরে এবং পাটের উৎপাদন একই সময়ে ৭১·৭ লাখ গাইট থেকে ৫৯·৬ লাখ গাইটে হ্রাস পেয়েছে এবং একইভাবে কাঁচাপাটের রপ্তানী ৩৬·৪ লাখ গাইট থেকে ১১·৮ লাখ গাইট এবং পাটজাত পণ্যের রপ্তানী ৫·১ লাখ টন থেকে ৪·৩ লাখ টনে কমে গেছে। পাট ও পাটজাত পণ্য উৎপাদন শিল্পের জটিলতা আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিরই ফলশ্রুতি। দেশে পাট চাষ ধান চাষের তুলনায় ক্রমেই কম লাভজনক হয়ে উঠছে। ১৯৬৯/৭০ সালে কৃষিপণ্য বিনিময়ের অনুপাতের (চাষীদের প্রাপ্য মূল্যে) ছিল ০·৯৪; ১৯৭৯/৮০ সালে এই অনুপাত মাত্র ০·৭৩-তে দাঁড়ায়। দেশে চালের তুলনায় পাটের অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে; বিশ্বের বাজারেও পাট কৃত্রিম তন্তুর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার শিকার হয়েছে। ১৯৭০ দশকে এই প্রতিযোগিতা বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে একনাগাড়ে মন্দাভাব বিরাজমান থাকার দরুণ কঠিন ছিল। এই উভয়ক্ষেত্রে সবচেয়ে ব্যাপক অসুবিধাজনক বিষয় ছিল পাটের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের অভাব যার ফলে বাংলাদেশের পাট প্রতিযোগিতামূলক সমর্থা হারিয়েছে। কম ফলন ও উঁচু উৎপাদন ব্যয়ের ফসল পাট যেমন দেশে ধানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠেনি, বিদেশেও কৃত্রিম তন্তুর প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে পারেনি। আধুনিক কৃষি উপকরণ প্রয়োগ ও উন্নতজাতের বীজ

উৎপাদন করে এই পরিস্থিতির একটা সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। ১৯৭৭ সালে নিবিড় পাট চাষ প্রকল্প শুরু করা হয় এবং পাট চাষের জন্য উপযোগী ৮·৮ লাখ একর জমি নিবিড় পাট চাষের আওতায় এনে ৩৭ লাখ গাঁইট পাট উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়। এই প্রকল্পের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা তো ছিলই, তার ওপরে বাজারের অবস্থার কারণে চাষীরা পাট চাষে উপযুক্ত উৎসাহ পায়নি, কেননা প্রশাসনিক অসুবিধার জন্য সরকারের মূল্য সমর্থন নীতিও তেমন ফলপ্রসূ হতে পারেনি।

১০·১২ পাট দেশের জন্য এক নিদারুণ সমস্যা, কারণ, এর সঙ্গে ৩০ লাখ চাষী, দুই লাখ পাটকল শ্রমিক ও দেশের রপ্তানী ভবিষ্যত জড়িত। এই পর্যায়ে সমস্যা মোকাবেলার জন্য কয়েকটি বিকল্পের কথা বিবেচনা করা যায়। এগুলির মধ্যে পাটের জন্য রপ্তানী বোনাস থেকে কার্যকর মূল্য সমর্থন নীতি অন্তর্ভুক্ত। তবে দেশের অর্থনীতিতে এ ফসলের গুরুত্ব, চালের সঙ্গে এই ফসলের পারস্পরিক সম্পর্কের কারণে ফলন বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় আর্থিক ও মূল্য সমর্থন দেবার লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত ও নীতি উভয় দিক থেকে পাট সমস্যার মোকাবেলায় যথেষ্ট সতর্কতার সাথে অনুধাবন করা দরকার। একটা সঙ্গতিপূর্ণ পাট ও চালনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন একান্ত জরুরী। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৬০ লাখ গাঁট পাট উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পাটের বিশেষ গুরুত্ব অনস্বীকার্য এবং সেজন্য একটা যুক্তিসঙ্গত নীতি নির্ধারণের জন্য পাট সমস্যার ওপর একটা বিশদ সমীক্ষা হওয়া দরকার।

১০·১৩ **চাঃ** পাটের পরেই চা বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানী ফসল। তবে চায়ের চাষ প্রথম থেকেই বাগান শিল্প হিসেবে সুসংগঠিত বা পাট চাষের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। চা একটি দেশজ উদ্ভিদ হলেও, ১৯৩৯ সালে চীনা জাতের চারা লাগান হয়। (দ্রঃ স্যার পিজে গ্রিফিথ্‌স, এ হিস্ট্রি অব জয়েন্ট ষ্টীমার কোম্পানীজ, ১৯৭৯, পৃঃ ১৩)। সিলেট ও চট্টগ্রামে চায়ের চাষ হয়। তবে বেশীরভাগ চায়ের চাষ হয় সিলেটে। স্বাধীনতার পর মুক্তিযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির কারণে গোড়ার দিকে কিছু অসুবিধের পর এ যাবৎ চায়ের উৎপাদন দ্রুত বেড়ে গেছে। ১৯৬৯/৭০ সালে ৬২·৯ মিলিয়ন পাউন্ড চা উৎপাদিত হয়। ১৯৭৯/৮০ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৮০·৭ মিলিয়ন পাউন্ডে যদিও আগের বছর অর্থাৎ ১৯৭৮/৭৯ সালের উৎপাদন এর চেয়ে বেশী হয় যার পরিমাণ ছিল ৮৪·৪ মিলিয়ন পাউন্ড। ১৯৭৯/৮০ সালে খরার কারণে উৎপাদন কম হয়। চা চাষের মোট জমির পরিমাণ কার্যতঃ অপরিবর্তিত থাকলেও উন্নততর উৎপাদনের মাধ্যমে সত্তর দশকের শেষের দিকে উৎপাদনের এই পরিমাণ বৃদ্ধি সম্ভব হয়। উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রপ্তানীও ১৯৭৬/৭৭ সালের ৪১·১ মিলিয়ন পাউন্ড থেকে ১৯৭৯/৮০ সালে ৫২·৭ মিলিয়ন পাউন্ডে বৃদ্ধি পায়। মোট ১০৬,০০০ একর চায়ের জমির মধ্যে ২০,০০০ একরে নতুন করে চারা রোপণ করে ও ৮১,০০০ একরে নিবিড় চাষ প্রবর্তন করে ফলন বৃদ্ধি করা হয়। চায়ের কড়া লিকারের জন্য বিদেশে বাংলাদেশের চায়ের বেশ ভাল চাহিদা আছে। এই অনুকূল পরিস্থিতি কাজে লাগানোর জন্য ৪০ দশকের শেষের দিকে চট্টগ্রামে চায়ের নীলামের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৮৪/৮৫ সালে চায়ের উৎপাদন ও রপ্তানীর লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ৯৫ মিলিয়ন পাউন্ড ও ৭৮·০ মিলিয়ন পাউন্ড ধার্য করা হয়েছে। চা রপ্তানীর ক্ষেত্রে প্লাইউড ও চায়ের পেটির সরবরাহে প্রায়ই সমস্যা দেখা দেয়। দেশের বনজ সম্পদ সীমিত বলে বিকল্প হিসেবে পিভিসির তৈরী পেটি ব্যবহারের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখতে হবে এবং আরও ব্যাপকহারে প্যাকেট চা রপ্তানীর প্রয়াস চালাতে হবে। চায়ের মান ফাক্টরীতে প্রক্রিয়াজাত করার ওপর অংশতঃ নির্ভরশীল। চা ফাক্টরীগুলির পুনর্বাসন ও সেগুলিতে বিদ্যুত সরবরাহ নিশ্চিত করা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান কার্যক্রমগুলির অন্তর্ভুক্ত।

১০·১৪ **আখঃ** আখ একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কৃষি পণ্য। ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে এর চাষ হয়। তবে চিনিকল এলাকাগুলির আশেপাশেই এর ফলন নিবিড়। ১৯৭৯/৮০ সালে ৩·৫৯ লাখ একর জমিতে ৬৩-৪০ লাখ টন আখ উৎপাদিত হয়। আখ চাষের আওতাধীন মোট জমির ১·০৬ লাখ একরে মিল এলাকায় নিবিড় পদ্ধতিতে আখ চাষ করা হয়; এতে আখ উৎপাদিত হয় ২১·২ লাখ টন। নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে আখ উৎপাদন এলাকায় তদারককৃত ঋণ ও কৃষি উপকরণ সরবরাহ কার্যক্রমের দরুন বেশ ফলন বেড়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চিনিকল এলাকাগুলিতে মোট ১·৬২ লাখ একরে নিবিড় পদ্ধতির আখ চাষ সম্প্রসারণ করে ৩৫·৬ লাখ টন আখ উৎপাদন করা হবে। যাতে করে ১৯৮৪/৮৫ সালে চিনি উৎপাদনের ২ লাখ টন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যায়। নিবিড় পদ্ধতিতে আখের উৎপাদন বড়লেও, দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলের অনেক দেশের উৎপাদনের তুলনায় তা এখনও অনেক কম যদিও বাংলাদেশের আবহাওয়া আখ চাষের পক্ষে চমৎকার। এজন্য, এই পরিকল্পনাকালে, আখের জাতের উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ জোর দেওয়া হবে। প্রমাণিত উন্নত জাতের যে আখের চাষ চিনিকল এলাকাগুলিতে ইতিমধ্যে প্রবর্তিত হয়েছে, চিনিকল এলাকার বাইরে এর চাষ প্রবর্তন করা হবে।

১০·১৫ **তামাকঃ** স্থানীয় সিগারেট শিল্পের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আমলে ভার্জিনিয়া জাতের তামাক চাষের জন্য এক জরুরী কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়। ১৯৭৭/৭৮ সাল নাগাদ এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতিও হয়। ১৯৭৯/৮০ সালে ৩৪,২৪০ একর জমিতে ভার্জিনিয়া তামাকের আবাদ করা হয় এবং ৩৫·৮৩ মিলিয়ন পাউন্ড তামাক উৎপাদিত হয়। রপ্তানীর সম্ভাবনা থাকায়, ১৯৮৪/৮৫ সালে ভার্জিনিয়া তামাক উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ৬৭·৫ মিলিয়ন পাউন্ড। এতে দেশের আনুমানিক চাহিদা ৪৮·৫ মিলিয়ন পাউন্ড মেটানো ছাড়াও রপ্তানীর জন্য ১৯ মিলিয়ন পাউন্ড তামাক উদ্বৃত্ত পাওয়া যাবে। রপ্তানী লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে আধুনিক 'কিওরিং' প্রক্রিয়াও উন্নততর মজুত ব্যবস্থার মাধ্যমে তামাকের মান বৃদ্ধির প্রতি সবচেয়ে বেশী জোর দেয়া হবে। স্থানীয় জাতের মতিহারি, জাতি ইত্যাদি ধরণের তামাক উৎপাদন ৫১·৩ মিলিয়ন পাউন্ড থেকে ৬১·৮ মিলিয়নে বৃদ্ধি করা হবে।

১০·১৬ **তুলোঃ** পরিকল্পনায় তুলা চাষের প্রতি উচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। মাঝারি আঁশের আমেরিকান জাতের তুলা বিভিন্ন ধরণের মাটিতে চাষ করা যায়। যশোর, কুষ্টিয়া, রংপুর, বগুড়া, দিনাজপুর, ঢাকা ও টাংগাইলের বহু চাষী সাফল্যের সংগে এই জাতের তুলার চাষ করেছেন। দেশের কাপড়ের কলগুলিতে কাঁচা তুলার ব্যবহারের পরিমাণ ৩·৫০ লাখ গাঁইটের মত এবং এর প্রায় সবটুকুই বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়। আয় ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সংগে সংগে কাপড়ের চাহিদা ও সেইসাথে কাঁচাতুলার চাহিদাও বাড়বে। ১৯৭৯/৮০ সালে প্রায় ১৫,০০০ একর জমিতে মাঝারি আঁশের তুলার চাষ করা হয় এবং উৎপাদিত তুলার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪,০০০ গাঁইটে। মাঝারি আঁশের তুলা চাষের যে কার্যক্রম এখন চলছে দ্বিতীয় পরিকল্পনা আমলে তা সম্প্রসারিত করার দরুন ৭৫,০০০ একর জমিতে তুলা চাষ হবে এবং তাতে ৫৬,০০০ লাখ বেল লিন্টতুলা উৎপাদিত হবে।

১০·১৭ তুলা চাষের প্রসারের ক্ষেত্রে দেশের ভূমি সম্পদের সুচিন্তিত ব্যবহার করা হবে যাতে জমির লাভজনক ব্যবহারের ওপর প্রতিকূল প্রভাব ন্যূনতম হয় এবং আবহাওয়া ও মাটির গুণাগুণের যথাযথ সদ্ব্যবহার ঘটে। এজন্য, হেসব এলাকায় পতিত জমি পাওয়া যায় এবং অন্য বিকল্প ফসল থেকে আয় তুলার চেয়ে কম প্রধানতঃ ঐসব এলাকাতেই তুলা চাষ কেন্দ্রীভূত রাখা হবে। দেশের পশ্চিমাঞ্চলেই প্রধানতঃ তুলা চাষের অনুরূপ অনুকূল পরিস্থিতি বিদ্যমান। পশ্চিমাঞ্চলেই দেশের ৮৪ শতাংশ তুলা চাষ এলাকা গড়ে তোলা হবে। এই এলাকায় পানিসেচ সুবিধা থাকবে বলে, ঋণ, সম্প্রসারণ ও বিপণনের সুযোগ-সুবিধাসহ সার্বিক আকারে ঐ অঞ্চলে আধুনিক কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা হবে। তুলা, অবশ্য, এখনও একটি নতুন ফসল এবং এর চাষের প্রসারের জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

১০·১৮ কুমিল্লা তুলা নামে পরিচিত আরেক জাতের তুলা অন্যান্য ফসল—ধান, ভুট্টা, সিসামাম ও সব্জী ইত্যাদির সংগে প্রধানতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। ভাল বীজ ও তুলা বাজারজাত করার সুবিধের অভাবে এই তুলা চাষের জমির পরিমাণ দ্রুতগতিতে হ্রাস পেয়েছে। এই তুলা পশমের সংগে মিশ্রিত করার উপযোগী। পরিকল্পনাকালে প্রায় ৩৩,০০০ একরের মত পাবর্ত্য জমি এই জাতের তুলা চাষের আওতায় আনা হবে যাতে প্রায় ১৩,০০০ গাঁইট কুমিল্লা তুলা উৎপন্ন করা যায়।

১০·১৯ **আলুঃ** সাম্প্রতিক বছরে আলুর চাষ দ্রুত বেড়েছে। ১৯৭৯/৮০ সালে ২·৩৮ লাখ একর জমি থেকে ৯ লাখ টনেরও বেশী আলু উৎপাদিত হয়। আলু চাষের জমি ও ফলন উভয়ই দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে আলুকে এখন সব্জীর পরিবর্তে বিকল্প খাদ্যশস্য হিসাবে ব্যবহারের ও সেই সাথে রপ্তানীরও সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আলু চাষের এই প্রবণতা বজায় রাখার জন্য চাষীদের মধ্যে উন্নতমানের বীজ সরবরাহসহ আধুনিক কৃষি উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে, হিমাগারে আলু রাখার ক্ষমতা বাড়ানো হবে এবং রপ্তানী বাজারের জন্য জোর অনুসন্ধান চালানো হবে। খাদ্যশস্যের পরিপূরক হিসেবে মিষ্টি আলু চাষেরও সম্ভাবনা রয়েছে। আলু উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১৩·৬০ লাখ টনে নির্ধারিত হয়েছে।

১০·২০ **ডালঃ** ডাল বিশেষ করে গরীব পরিবারের প্রোটিন লাভের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ডালের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তেমন উল্লেখযোগ্য প্রয়াস চালানো হয়নি। ১৯৭৯/৮০ সালে মাত্র ৮·১৯ লাখ একর জমিতে ডালের চাষ হয়, মোট উৎপাদন ছিল ২·১৪ লাখ টন। দেশজ উৎপাদন থেকে মাথাপিছু দৈনিক প্রায় ৮ গ্রাম ডাল পাওয়া যেত। প্রোটিন সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতির জন্য ভিত্তি স্তরের ২·১৪ লাখ টনের তুলনায় ১৯৮৪/৮৫ সালে ৩·০০ লাখ টন ডাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। এতে ডাল আমদানী খাতে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচতে সহায়ক হবে। সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম অধিক ফলনশীল জাতের ডাল সম্পর্কে গবেষণা এবং LIV (৫৪) জাতের ডালের বীজ নির্বাচন ও বর্ধিত-করণের মাধ্যমে চাষীদের মধ্যে বিতরণের জন্য জোর দেওয়া হয়েছে।

১০·২১ **তৈলবীজঃ** ১৯৭৯/৮০ সালে দেশে ০·৫৫ লাখ টন ভোজ্য তেল উৎপাদিত হয় এবং এতে দেশের মোট চাহিদার মাত্র ২৭ শতাংশ মেটে। দেশের মোট বার্ষিক চাহিদা ২·০৭ লাখ টন। এজন্য প্রতিবছর বিপুল পরিমাণে ভোজ্য তেল ও তৈলবীজ আমদানী করতে হয়। এমন কি, বিপুল পরিমাণ তেল আমদানীর পরও বর্তমান তেল ব্যবহারের ন্যূনতম চাহিদা স্তরের নীচে বলে বিবেচনা করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রান্তিক বছরে ভোজ্য তেলের চাহিদা ২·৫০ লাখ টনে উন্নীত হবে বলে ধরা হয়েছে। আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যেকার ব্যবধান হ্রাস করার জন্যে পরিকল্পনাকালে তৈলবীজ উৎপাদনের জন্য একটা সার্বিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। উচ্চ ফলনশীল জাতের সরিষা বীজ প্রবর্তন করে ও চীনাবাদাম চাষের প্রসারের দিকে যথাযথ জোর দিয়ে ঐ কার্যক্রমকে জোরদার করা হবে।

১০·২২ সবরকম তৈলবীজ চাষের জমির পরিমাণ ১৯৭৯/৮০ সালের ৭·৬৮ লাখ থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৮·২৫ লাখ একরে সম্প্রসারিত করা হবে। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১৯৭৯/৮০ সালের ২·৪৬ লাখ টনের তুলনায় ৩·৬০ লাখ টনে ধার্য করা হয়েছে। তৈলবীজ প্রধানতঃ রবিশস্য হিসেবে উৎপন্ন হয়; তাই তৈলবীজের পরিকল্পিত চাষ বাড়াতে জমির কোন অভাব নাই। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বিপণন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যবস্থাসহ নিবিড় চাষাবাদ এলাকাগুলিতে উচ্চ ফলনশীল জাতের সরিষা, চীনাবাদাম ও অন্যান্য তৈলবীজ চাষের সমন্বিত কার্যক্রম শুরু করা এবং সেইসাথে কিছু নির্বাচিত এলাকায় বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলে সূর্যমুখী ও সয়াবীন চাষ প্রবর্তন করা হবে। তিসি ও ভেরেন্ডার মত শিল্পে ব্যবহৃত তেলের চাষ অব্যাহত রাখা ও উৎসাহিত করা হবে। এছাড়া বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন তৈলবীজের উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ উদ্ভাবনের জন্য যথাযোগ্য মনোনিবেশ করা হবে।

১০·২৩ **ফল ও শাকসব্জীঃ** বাংলাদেশে সাধারণ ও নানা ধরণের শীতকালীন শাকসব্জীর চাষ ও রপ্তানীর বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশে বহু রকমের ফলও উৎপন্ন হয়ে থাকে। বিদেশে আনারস, লিচু, কলা ইত্যাদির মত এসব ফলের জোর চাহিদা রয়েছে। বর্তমানে বছরে ১·৪ মিলিয়ন টন ফল এবং ১·৪ মিলিয়ন টন শাকসব্জী বাংলাদেশে উৎপাদিত হয়ে থাকে। তবু আভ্যন্তরীণ চাহিদার তুলনায় এই সরবরাহ যথেষ্ট নয়। ফলে, অতীতে, দেশে মাঝে মাঝে অভাব দেখা দেওয়ায় এসব ফলমূল ও শাক-সব্জী রপ্তানীর প্রয়াস বিপর্যস্ত হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ফল ও শাকসব্জীর চাষের সম্প্রসারণের জন্য চারা রোপণ সামগ্রীর সরবরাহ জোরদার করা হবে। কমপক্ষে ১৪ লাখ একর জমিতে ফল ও শাকসব্জীর চাষ করা হবে। এই মোট উৎপাদনের অর্ধেক পাওয়া যাবে বসতবাড়ীর আঙ্গিনায় শাকসব্জী ও ফলের বাগান থেকে। বাকী অর্ধেক আসবে রাস্তা ও খালের বাঁধ ও ফলফলারী খামার থেকে। রপ্তানীর উদ্দেশ্যে বড় বড় শহর ও নগরের চারপাশে এবং নির্বাচিত কিছু এলাকায় ফল ও সব্জী চাষের নিবিড় উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা হবে।

১০·২৪ **মশলাঃ** বাংলাদেশে অনেক রকমের মশলা উৎপাদিত হয়। এগুলির মধ্যে রয়েছে মরিচ, পিয়াঁজ, আদা, হলুদ ও রসুন। এরকম কিছু মশলার চাষ ব্যাপক আকারে হয়, রপ্তানীর সম্ভাবনাও ভাল। ১৯৭৭/৭৮ সালে ৩·৮৭ লাখ একরে নানা মশলাজাতীয় ফসলের চাষ হয়; উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩·০৩ লাখ টন। উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষের প্রবর্তনের পর চাষীদের মনোযোগ এই ধরণের কম মেয়াদের ফসল থেকে বহুলাংশে ঐ জাতের ধানচাষেই আকৃষ্ট হয়েছে। আবহাওয়াও বাজারের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মশলাজাতীয় ফসলগুলির ফলন ও উৎপাদনের পরিমাণেও যথেষ্ট ওঠানামা ঘটে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার তাই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে উৎপাদনে স্থিতিবিধান, বীজের উৎকর্ষসাধনের মধ্য দিয়ে পিয়াঁজের মত সাধারণ ও বহুল ব্যবহৃত মশলা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সরবরাহের, মৌসুমী ওঠানামার সমস্যা মোকাবেলার জন্য মজুত ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সুযোগ-সুবিধা উন্নয়নে উৎসাহ দান। এছাড়া, চিহ্নিত বিদেশী বাজারে রপ্তানীর জন্য কতকগুলো মশলা বিশেষ করে আদা, মরিচ বা হলুদ উৎপন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

ভূমি ব্যবহার

১০·২৫ জমির চলতি ব্যবহারের হার নীচু বলে বিবেচিত। সেচের মাধ্যমে জমি ব্যবহারের হার বাড়ানো যেতে পারে। পানির অভাবে শীতকালে প্রায় ৫২ শতাংশ জমি অনাবাদী পড়ে থাকে। পরিকল্পনায় এই অনাবাদী জমির এক অংশবিশেষ সেচ সুবিধের আওতায় আনার মাধ্যমে শীতকালে সেচ সুবিধার আওতাধীন আবাদী জমির নীট বৃদ্ধির বিষয় স্থির করা হয়েছে এবং এগুলি করা হবে অবশিষ্ট আর্দ্রতা নির্ভর ফসল উৎপাদনের জমিতে কোন রকম হস্তক্ষেপ না করেই। আখ ও তুলার সঙ্গে তৈলবীজ, ডাল ও মশলার মিশ্র চাষাবাদ করে জমিতে নিবিড় চাষাবাদের মাত্রা বৃদ্ধি করা হবে এবং এতে চাষীর ফসল হারাবার ঝুঁকি কমিয়ে এনে তার আয় অনেকটা স্থিতিশীল করতে সহায়তা করবে। বাংলাদেশে জমি বিরল সম্পদ, তাই রাস্তা ও বাঁধের ধার ইত্যাদি পতিত জমিতে ফল ও শাক-সব্জী চাষ প্রসারের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ

করা হবে। এ থেকে প্রধানতঃ উপকৃত হবেন ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীরা। এমনকি, নতুন নতুন জমি সেচ সুবিধের আওতায় আসার পরও প্রতিটি ফসলের জন্য বিশেষ করে শীতকালে অপরিবর্তিত পরিমাণ ফসল্ল আসতে থাকবে—এমন পরিস্থিতিতে যতটা দরকার তত পরিমাণ জমি বরাদ্দ করা যাবে না। তাই একর প্রতি ফল বৃদ্ধি একান্ত আবশ্যক আর তা হলেই কেবল উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। শীতকালে জমি ব্যবহার ও ফসলের হার নিম্নে প্রদত্ত হলো:

সারণী ১০·১

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে গুরুত্বপূর্ণ শীতকালীন ফসল আবাদের জমি ব্যবহার কার্যক্রম
(আয়তন '০০০' একরে, উৎপাদন '০০০' টনে এবং ফলন টনের হিসাবে)

ফসল	১৯৭৯/৮০ (প্রকৃত)			১৯৮৪/৮৫ (প্রক্ষেপ)		
	আয়তন	উৎপাদন	ফলন/একর	আয়তন	উৎপাদন	ফলন/একর
(১) বোরো	২,৮৩৯	২,৪২৭	০·৮৫	৩,০০০	৩,৪০০	১·১৩
উচ্চ ফলনশীল	১,৭৮৮	১,৮৮২	১·০৫	২,৫০০	৩,০০০	১·২০
দেশী	১,০৫১	৫৪৫	০·৫৭	৫০০	৪,০০০	০·৮০
(২) গম	১,০৭০	৮০৯	০·৭৬	২,২০০	১,৮৬০	০·৮৯
সেচযুক্ত	১,০১৪	৭৯১	০·৭৮	১,৭০০	১,৭০০	১·০০
সেচবিহীন	৫৬	১৮	০·৩২	৪০০	১৬০	০·৪৬
(৩) আখ	৩৫৪	৬,০৪০	৩৭ ৬৬	৩৮০	৭,৭০০	২০·০৩)
(শুদারকৃত এলাকা)	(১৫৬)	(২১২)	(২০·০০)	(১৬২)	(৩,৫৬০)	(২১·৯৮
(৪) আলু	২৩৮	৯০৩	৩·৭৯	৩২০	১,৩৬০	৪·২৫
(৫) তুলাবীজ ('০০০' পাউণ্ড) (জাভিজিয়া)	৩৪	৩০,৮৩১	০·৪৭	৪৫	৬৭,০০০	০·৬৭
(৬) তুলা ('০০০' গাঁইটে) (মাঝারী আঁশ)	১৫	৪০	০·২৭ (গাঁইট)	৭৫·০	৫৬·০	০·৭৫ (গাঁইট)
(৭) তৈলবীজ	৭৬৮	২৪৬	০·৩২	৮২৫	৩৬০	০·৪৫
(৮) ডাল	৮১৯	২১৪	০·২৬	৮৩০	৩০০	০·৩৬
(৯) শীতের শাক সব্জী	১৮৫	৪৯০	২·৬৫	২৫০	৬৭৫	২·৭০

চাষাবাদের ধারা

১০·২৬ দেশের চাষাবাদের ধারা মূলতঃ বর্ষার পানি দ্বারা প্রভাবান্বিত। অকাল বর্ষা, বর্ষা মৌসুমের বর্ষণ, ভূ-প্রকৃতি, বন্যার মাত্রা ইত্যাদি বহুলে পরিমাণে ফসলের ধরণ ও আবাদপদ্ধতি নির্ধারণ করে। ১৯৭৯/৮০ সালে নীট ফসলী জমির পরিমাণ ছিল ২০·৮৪ মিলিয়ন একর। এর মধ্যে ১১·৩ মিলিয়ন একর জমি এক ফসলী, ৭·১ মিলিয়ন একর দুই ফসলী আর ২·৬ মিলিয়ন একর বছরে তিনটি ফসল হয়। ফলতঃ ফসল ঘনত্বের মাত্রা দাঁড়ায় শতকরা ১৫৩ ভাগ। উঁচু ও মাঝামাঝি উচ্চতার জমিতে দুইটি ফসলের আবাদের পরিমাণ বেশী। নদীর তীর বরাবর এলাকায় দুফসলী জমির পরিমাণ-সবচেয়ে বেশী। এই জমিগুলিতেই সবচেয়ে বেশী নিবিড় চাষাবাদ হয়ে থাকে।

১০·২৭ বছর মেয়াদী ফসল আখ ছাড়া প্রধানতঃ ধানের চাষই বেশী, কারণ আমাদের কৃষি ব্যবস্থা জীবনধারণ পর্যায়ের। বর্ষা মৌসুমে জমিতে প্লাবনের মত পরিস্থিতিও ফসল নির্ধারণ করে দেয় যখন ধান ও পাটের আবাদ হয়ে থাকে। তুলনামূলকভাবে উঁচু জমিতে ধারানুক্রমে আউশ অথবা পাট ও পরে রোপা ধানের চাষ করা হয়। আবার বরেন্দ্র অঞ্চলের জমির মত জমিতে কেবলমাত্র একটি ফসল অর্থাৎ রোপা আমনের চাষ হয়। কিছু কিছু উঁচু জমিতে রোপা আমন ফসল ওঠার পর ডাল ও তৈলবীজের চাষ হয়। মধ্যম শ্রেণীর জমিতে চাষাবাদের হার বেশী এবং তাতে প্রথমে আউশ বা পাট অথবা রোপা আমন এবং তারপর ডাল ও তৈলবীজ অথবা বিকল্প প্রথমে আউশ বা পাট পরে গম, শাকসব্জী বা মোটাদানার শস্যের চাষ হয়। নিচু এলাকায় বোনা আমন বা আউশ ও বোনা আমন ধানের চাষ হয়। লোনা উপকূলীয় এলাকা-গুলিতে হয় একটিমাত্র রোপা আমন ফসল জন্মায় কিংবা কিছু কিছু অনুকূল এলাকায় ঐ আমন ফসল ওঠার পর তৈলবীজের চাষ হয়ে থাকে। উচ্চ ফলনশীল জাতের বোরো ও রোপা আমনের প্রসারের ফলে ফসল চাষের ধারায় ইতিমধ্যেই কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

সেচ সুবিধেযুক্ত কৃষি

১০·২৮ শীতকালে নীট আবাদী এলাকার মাত্র ২০ শতাংশে চাষ করা হয় যদিও এ সময়কার আবহাওয়া বোরো ধান, গম, যব, মিলেট জাতীয়, তৈলবীজ, ডাল জাতীয়, শণ, তুলা ও শাকসব্জীর মত বহুসংখ্যক ফসল চাষের জন্য অনুকূল, কারণ এসব ফসলের জন্য মাঝারি শীতোষ্ণ আবহাওয়া প্রয়োজন। তবে শীতকালে পানির অভাবই চাষবাসে প্রধান বাধা। সেচ সুবিধে শীতকালে সম্প্রসারিত করা গেলে ফসল আবাদ আরও নিবিড় চাষাবাদের ধারা আরও যৌক্তিক এবং জমির ব্যবহার আরও লাভজনক হয়ে ওঠবে এ জন্য ৭·২ মিলিয়ন একর জমিকে সেচসুবিধেযুক্ত চাষাবাদের আওতায় আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এই মোট জমির একটা বড় অংশে বোরো, গম, ও অন্যান্য শীতকালীন শস্যের চাষ করা হবে। এখন পর্যন্ত বেশীরভাগ ফসল বর্ষা মৌসুমেই উৎপাদিত হয়ে থাকে। এই পরিকল্পনার আওতায় শীতে সেচ যুক্ত চাষাবাদই হবে কৃষি উন্নয়নের প্রধান বাহন। সেচ সুবিধের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য সেচসুবিধেযুক্ত এলাকায় নিবিড় কৃষি পদ্ধতি অনুসৃত হবে। এসব এলাকায় মূল্যবান ফসল (যেমন তৈলবীজ ও ডাল) এবং উচ্চ ফলনশীল খাদ্যশস্যের চাষের প্রবর্তন করা হবে। সর্বাগ্রে বেশী সংখ্যক চাষীর কাছে সেচ সুবিধে পৌঁছে দেবার জন্য স্বল্প খরচ সম্পন্ন সেচপদ্ধতি অনুসৃত হবে। এই প্রসঙ্গের বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রধানতঃ হস্তচালিত নলকূপ, অগভীর নলকূপ এবং লোলিফট্ নলকূপ সহযোগেই নিম্নব্যয়ের সেচ চলবে।

বর্ষা নির্ভর কৃষি

১০·২৯ বন্যামুক্ত, সংরক্ষিত বর্ষাবিধৌত এলাকাগুলিতে উচ্চ ফলনশীল ও শ্রম প্রধান জাতের ধানের চাষের সম্প্রসারণ অগ্রাধিকারমূলক উদ্দেশ্য থাকবে এবং বর্তমানে আউশ ও রোপা ধানের চাষ হয় এ রকম এলাকায় কমপক্ষে ২৩ শতাংশ জমিতে ঐ আউশ ও রোপা ধানের পরিবর্তে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানের চাষ প্রবর্তন করা হবে। তবে মৌসুমী আবহাওয়ার অনিশ্চিতার দরুন এই এলাকাগুলিতে সম্পূরক সেচের প্রয়োজন হবে।

প্রযুক্তি উপকরণ কার্যক্রমসমূহ

১০·৩০ বীজ (উচ্চ ফলনশীলজাতের), পানি, সার ও কীটনাশক ঔষধ এগুলিই একত্রে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি। পানি ছাড়া অন্যান্য কৃষি উপকরণ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হ'লো।

সার

১০·৩১ পানির মত সারও ফলনশীল ও অন্যান্য বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৭০ দশকে সারের ব্যবহার বেশ দ্রুত বৃদ্ধি পেলেও মাথাপিছু খুব কম জমির কারণে বাংলাদেশে রাসায়নিক সারের সামগ্রিক ব্যবহার উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে সর্বনিম্ন। অধিকন্তু, রাসায়নিক সারের ব্যবহারও এখনও সন্তোষজনক নয়। ১৯৭৯/৮০ সালে ০·৫৪ মিলিয়ন টন ইউরিয়া, ০·২১ মিলিয়ন টন ট্রিপল সুপার ফসফেট এবং ০·১০ মিলিয়ন টন মিউরেট অব পটাশ সার ব্যবহৃত হয় যদিও, কৃষি বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় সাধারণভাবে ২:১:১ মাত্রায় উল্লিখিত সারগুলি প্রয়োগের সুপারিশ রয়েছে। সার প্রয়োগে এ ধরণের ভারসাম্যহীনতা ও সেইসঙ্গে নিম্নতম প্রয়োজনীয় পরিমাণ থেকে কম সার প্রয়োগের ফলে বীজ সার প্রযুক্তির মোটেও আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন সারের আপেক্ষিক মূল্যে রদবদল করে সারের সুষম ব্যবহার উৎসাহিত করা হবে। বর্তমানে প্রচলিত সার ব্যবহার পদ্ধতির আরেকটি সমস্যা রয়েছে, ইউরিয়া এখন যেভাবে

প্রয়োগ করা হয় তাতে ইউরিয়ার নাইট্রোফিকেশন ঘটে। রাসায়নিক সার জমির ওপরে না ছড়িয়ে দিয়ে লাঙ্গল দিয়ে খাত কেটে মাটির মধ্যে মিশিয়ে দিলে কিংবা কাদার ছোট ছোট গোলার আকারে চাষের জমিতে ছড়িয়ে দিলে তাতে ভাল ফল পাওয়া যায়। এছাড়াও জ্বালানী শক্তির ও সারের চড়া দামের কারণে খামারের সার ও মিশ্র সারের ব্যবহার আগের চেয়ে বাড়াতে হবে। দেশের অনেক এলাকার মাটিতে অনুসেদ্রিয় পুষ্টি উপাদান তথা রাসায়নিক পুষ্টি উপাদানের পরিলক্ষিত হবার পরিপেক্ষিতে এ ব্যাপারে সমস্যার প্রকৃতি ও পরিসর নির্ধারণের জন্য যথাযথ সমীক্ষা ও জরীপ পরিচালনা করা এবং রাসায়নিক সার প্রয়োগ থেকে সর্বাধিক সুফল লাভের জন্য একটা সার্বিক কার্যক্রম প্রণয়ন করা প্রয়োজন। শিমজাতীয় উদ্ভিদ ও অন্যান্য সবুজ সার উৎপাদনক উদ্ভিদের চাষ ও ব্যবহার বৃদ্ধি করে, আবহাওয়া মণ্ডলে নাইট্রোজেনের যথাযথ অনুপাত রক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করে মাটিকে সমৃদ্ধ ও সেইসঙ্গে মাটির আশ ও আন্তঃমূলক উপাদানের উন্নতি বিধান করতে হবে এবং অন্যদিকে, জৈব গ্যাস ব্যবহারে মাটিতে অনুজৈব উৎপরতার বৃদ্ধির সুফল হিসেবে মাটিতে অনুজৈব উপাদান যথাযথ পর্যায়ে রক্ষিত হতে পারবে।

১০·৩২ নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার উদ্দেশ্যে ১৯৮৪/৮৫ সাল নাগাদ সারের ব্যবহার নিম্নে প্রদত্ত ১·৬০ মিলিয়ন টন বাড়ানো হবে বলে ধরা হয়েছেঃ

সারণী ১০·২

'০০০' টনে

সার	১৯৭৯/৮০ (প্রকৃত)	১৯৮৪/৮৫ (পরিকল্পিত)
১। ইউরিয়া	৫৩৬	৭০০
২। ট্রিপল সুপার ফসফেট	২০৬	৬০০
৩। মিউরিয়েট অব পটাশ ও অন্যান্য	৯৬	৩০০
মোট ..	৮৩৮	১৬০০

১০·৩৩ সারের চাহিদার এই পরিসরে বৃদ্ধি ও ঐ চাহিদা বজায় রাখার জন্যে ফসল ও সার উভয়ের ক্ষেত্রে ফসলের উৎসাহদানমূলক দর এবং পর্যাপ্ত ঋণ সুবিধে সম্প্রসারণমূলক তৎপরতা, পরিবহণ, মজুত, বিপণনের সুবিধে ইত্যাদির মত সমর্থনমূলক ব্যবস্থা বজায় রাখা হবে। যাতে সময়মত সার পাওয়া যায়। সার ব্যবসায় তৎপরতার মোকাবেলা করার জন্য এই পরিকল্পনা মেয়াদে বেসরকারী খাতে সারের খুচরা ব্যবসায় চালানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা বেশী করে সার সংগ্রহ, চলাচল ও মজুত তৎপরতায় আত্মনিয়োগ করবে।

উন্নত বীজ

১০·৩৪ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশে ফসলের উৎপাদন স্থিতিশীলতা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কম। বীজের উৎকর্ষসাধন ছাড়া এতে কোন তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সম্ভব নয়। বীজের উন্নতি ছাড়া সার ও সেচ সুবিধার মত ব্যবহৃত কৃষি উপকরণপ্রয়োগ করে কার্যতঃ কোন কাজ হবে না, হলেও তা হবে নেহাত অপ্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের উদ্দেশ্যে বীজের চাহিদা পূরণে (১) স্থানীয় অবস্থার উপযোগী উপযুক্ত গুণাবলীসম্পন্ন উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজের উদ্ভাবন, (২) চাষীদের আধুনিক উন্নত জাতের বীজ উৎপাদন, সার্টিফিকেশন ও সরবরাহ, (৩) চাষীদের মধ্যে বীজ সংরক্ষণ প্রযুক্তিজ্ঞানের সম্প্রসার এবং (৪) চাষীদের বা চাষীদের সমবায় প্রতিষ্ঠানকে বীজের ব্যবসায়ে নামতে উৎসাহিত করতে হবে। দিবতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বীজ কার্যক্রমের কৌশলের মূলবিষয়বস্তু হবে ধান, গম, পাট, আলু, তৈলবীজ, ডাল ও অন্যান্য নির্বাচিত ফসলের উচ্চ ফলনশীল বা উপযুক্ত বীজ উদ্ভাবনেই প্রধানতঃ আত্মনিয়োগ করা। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (BRRI), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট (BARI), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা, (BADC), বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইন্সটিটিউট (BJRI) ও ইক্ষু গবেষণা ইন্সটিটিউটের মত সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানগুলি ধান, গম, পাট, তৈলবীজ, আলু ও আখের উন্নততর বীজ উদ্ভাবনে নিয়োজিত রয়েছে।

১০·৩৫ পরিকল্পনায় উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসল চাষের অধীন মোট জমির ১০ শতাংশের জন্য সার্টিফায়েড বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা মোট ২০·৫০ হাজার টন বীজ সরবরাহের মধ্যে ৭০০০ টন বীজ বিএডিসির নিজ খামারে এবং অবশিষ্ট পরিমাণ উৎপাদিত হবে বিএডিসির তালিকাভুক্ত চাষীদের মাধ্যমে। বিএডিসি চাল ও গমের যে উচ্চ ফলনশীল/শ্রমপ্রধান জাতের বীজ সরবরাহ করবে নিম্নে তার বছরওয়ারী হিসেব দেওয়া হল:

সারণী ১০·৩

'০০০' টন

ফসল	১৯৮০/৮১	১৯৮১/৮২	১৯৮২/৮৩	১৯৮৩/৮৪	১৯৮৪/৮৫
১। চাল	৬·০০	৭·০০	৭·৫০	৮·০০	৮·৫০
২। গম	৫·০০	৮·০০	১০·০০	১১·০০	১২·০০

১০·৩৬ নিবিড় পাটচাষ কার্যক্রমে সহায়তার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইন্সটিটিউট (BJRI) চাষীদের সঙ্গে ঠিকা চুক্তি বলে বার্ষিক প্রায় ৪৫,০০০ টন উন্নতমানের পাট বীজ উৎপাদন করবে।

১০·৩৭ বিএডিসি, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইন্সটিটিউট ও ইক্ষু গবেষণা ইন্সটিটিউটের মত সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি বীজের মোট চাহিদার সামান্য অংশ সরবরাহ করতে পারবে বলে বেসরকারী পর্যায়ে বীজ উৎপাদন ও বিপণনের কার্যক্রম শক্তিশালী করা হবে। বেসরকারী খাতের ভূমিকা প্রসারিত করার ফলে উন্নত বীজের সংশংকরণ (Certification) ও বীজ বাছাই প্রক্রিয়ার গুরুত্ব বহুলে পরিমাণে বেড়ে যাবে। বিভিন্ন ফসলের উদ্ভাবিত বীজ ছাড়ার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড ও বীজ শংসন প্রতিষ্ঠান (Seed Certification Agency) কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করছে। সংশোধিত বীজ উৎপাদনের জন্য ঠিকা চাষীদের সংগঠিত করার ওপর গুরুত্ব দেয়া হবে। বীজ বাছাই, পরিষ্কার ও ট্রাক্টরের মত সাজসরঞ্জাম বীজ উৎপাদনকারীদের সরবরাহ করা হবে। গ্রাক পরিষ্কৃত বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রগুলিতে প্রক্রিয়া ও গুদামজাত করে রাখা হবে। ঠিকা বীজ উৎপাদকদের কাছাকাছি এলাকায় নতুন বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রগুলি স্থাপন করা হবে। গোট বীজ উন্নয়ন কার্যক্রম বীজ বিপণনের কাজটি বর্তমানে সবচেয়ে দুর্বল পর্যায়ে রয়েছে বলে, পরিকল্পনা আমলে প্রতিটি থানায় কমপক্ষে একটি করে বীজ বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

উদ্ভিদ সংরক্ষণ

১০·৩৮ নতুন জাতের বীজ প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর ও দক্ষ উদ্ভিদ সংরক্ষণ সার্ভিস অতীব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। চলতি উদ্ভিদ সংরক্ষণে মূলতঃ রাসায়নিক আগাছানাশক ও কীটপতঙ্গনাশক ওষুধ ব্যবহৃত হচ্ছে। এগুলির সবগুলিরই প্রতিবেশের ওপর বিশেষ কার মাছ ও পাখির ওপর কিন্তু কিছু অনভিপ্রেত প্রতিক্রিয়া রয়েছে। এজন্য এসব রাসায়নিক পদার্থ খুবই সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে ও সেই সাথে পোকামাকড় ও রোগবালাইর হাত থেকে ফসল বাঁচানোর জন্য জৈব, রীতিগত ও যান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বে লাগানোর চেষ্টা করতে হবে। ব্যয় সংগত ও অত্যন্ত কার্যকর কীট নিয়ন্ত্রণের জন্য একটী সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর অধিকতর জোর দিতে হবে। সেই সাথে বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় সংস্থাকে পর্যবেক্ষকের ও নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করতে হবে; কারণ, কীটনাশক ওষুধগুলির বিপণন ও বিতরণ বেসরকারী খাতের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

গুদামজাত কার্যক্রম

১০·৩৯ **খাদ্যশস্য গুদামজাত:** খাদ্যশস্য উৎপাদন দ্রুত বেড়ে যাওয়ার সংগে সংগে আভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য গুদামজাত সুবিধের বৃদ্ধির প্রয়োজনও দেখা দেবে। ১৯৭৯/৮০ সালে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মোট খাদ্যশস্য গুদামজাত ক্ষমতা ছিল প্রায় ১১·৫৯ লাখ টন। ১৯৮৪/৮৫ সাল নাগাদ পর্যায়ক্রমে খাদ্যশস্য গুদামজাত ক্ষমতা বাড়িয়ে ২২·৫০ লাখ টন উন্নীত করা হবে। উপজেলা এলাকাগুলিতে সাধারণভাবে নিম্নলিখিত কাজে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত করা হবে। খাদ্য বিভাগের গুদামগুলি ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় উপ-জেলা পর্যায়ে খাদ্যশস্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট গুদাম নির্মাণের কাজ হাতে নিবে।

১০·৪০ **সার মজুতঃ** বিএডিসির মোট সার মজুতের ক্ষমতা ০·৯৭ লাখ টন ; এর মধ্যে ১·৫৭ লাখ টনের মজুত ক্ষমতা সংস্থার একান্ত নিজস্ব। এই পরিকল্পনা মেয়াদে অতিরিক্ত ০·৪৪ লাখ টন মজুত ব্যবস্থা নির্মাণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে, যার ফলে মোট খাদ্য মজুত ক্ষমতা ৫·০ লাখ টনে দাঁড়াবে। ভাড়া করা গুদামগুলি ক্রমান্বয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে।

১০·৪১ **বীজ মজুতঃ** বিএডিসির বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে মোট ১৫,০০০ টন বীজ মজুত করার ক্ষমতা রয়েছে। বিভিন্ন ফসলের বীজ সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধের ব্যবস্থা এবং সারা দেশে চাষীদের কাছে নিয়মিত ও সময়মত বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পনা মেয়াদে সব রকমের বীজের জন্য অতিরিক্ত ৩৩,০০০ টন মজুত ক্ষমতা গড়ে তোলা হবে।

চাষাবাদের যন্ত্রপাতি

১০·৪২ কৃষি প্রযুক্তির ক্রমান্বয়ে পরিবর্তনের ফলে দেশে বিভিন্ন ধরণের কৃষি যন্ত্রপাতির জন্য ইতিমধ্যেই চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। উন্নত দেশজ ও নতুন যন্ত্রপাতি যেমন, লাঙ্গল, আগাছা পরিষ্কারক (Weeder) সীড ড্রিল (বীজ বোনা যন্ত্র), হস্তচালিত নলকূপ, বীজ, তরল পদার্থ ছিটানোর যন্ত্র ইত্যাদির মত সরঞ্জাম বা মূলধন ও শক্তি খাতে ব্যয় কমিয়ে আনে সেগুলি নিবিড় চাষাবাদে ব্যাপকভাবে প্রবর্তন করা হবে। এই যন্ত্রপাতিগুলিকে তিনটি মূল শর্ত মেটাতে হবে। এগুলি হচ্ছেঃ যন্ত্রপাতিগুলি (১) শ্রম সহযোগে শ্রমের উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদিত পণ্যের মান বৃদ্ধি করবে ; (২) চাষী সমাজের মাঝে দ্রুত জ্ঞান ও নৈপুণ্য বিস্তারে সহায়ক হবে এবং (৩) জ্বালানী শক্তি দক্ষ ভিত্তিক হবে। এসব যন্ত্রপাতির প্রতিশ্রুতিশীল স্থানীয় উৎপাদকদের সর্বপ্রকার সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান করা হবে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রদেয় ঋণের মধ্যে কৃষি যন্ত্রপাতিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। চাষীদের ব্যবহারের জন্য যন্ত্রপাতির উপযোগী ডিজাইন পরীক্ষা ও সুপারিশের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে একটি জাতীয় মাননির্ধারক কমিটি স্থাপন করা হবে। তাছাড়া, পরিকল্পনা মেয়াদে একটি উপযোগী প্রযুক্তি কেন্দ্রও স্থাপন করা হবে।

কৃষি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

১০·৪৩ পল্লী উন্নয়নে কৃষি সমস্যায় আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হবে। যে দেশে সাক্ষরতার হার মাত্র ২২ শতাংশ সে দেশে অবশ্য অনেক কিছু নির্ভর করবে প্রধানতঃ গণশিক্ষা কার্যক্রমের সাফল্যের উপর। কারণ একমাত্র গণশিক্ষার মাধ্যমেই প্রযুক্তি বিশারদ ও ক্ষেত্র বিশেষজ্ঞ এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারকারী এবং উপকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে বিরাজমান যোগাযোগের অভাব দূর হতে পারে।

১০·৪৪ কৃষি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর চাহিদা মেটানোর জন্য সকল স্তরে কৃষি বিষয়ক শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারের প্রয়াস চালানো হবে। সীতাকারের চাষাবাদের পরিস্থিতির সংগে কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের সংগসূত্র স্থাপন করে কৃষি বিষয়ে শিক্ষাদানকে জোরদার করা হবে। তেরটি সম্প্রসারণ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান উপ-কারিগরি স্তরের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেবে। চলতি সম্প্রসারণমূলক তৎপরতা মূলতঃ গবেষণাগারে লব্ধ ফলাফলকেন্দ্রিক ও দিক নির্দেশনায় অক্ষম, তাই ফলাবর্তনও অনুপস্থিত। এই ফাঁক পূরণ এবং গবেষণা ও বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে নিশ্চিত করার জন্য প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন পদ্ধতি (T&V Method)।

কৃষি গবেষণা

১০·৪৫ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রে ভৌত অবকাঠামো ও জনশক্তি তাৎপর্যপূর্ণভাবে গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সকল কৃষি বিষয়ক গবেষণা তৎপরতা সুসংহত করা হবে; একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্প্রসারণ সার্ভিসের জন্য অভিযোজনমূলক গবেষণার উপর জোর দেওয়া হবে। গবেষণায় সমর্থন পাওয়া না গেলে ঐ গবেষণা দীর্ঘদিন কার্যকর থাকতে পারে না। ফেল কেন্দ্রগুলিকে কাজে লাগিয়ে অভিযোজনমূলক গবেষণা চলবে।

১০·৪৬ জাতীয় পরিকল্পনার ও অগ্রাধিকারের অনুপস্থিতি কমপক্ষে ৯টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন, সম্পদ ও জনশক্তির অভাব কৃষি গবেষণা প্রয়াস ব্যাহত হয়েছে। এসবের কিছু সমস্যা লাঘবের জন্য গবেষণা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সমন্বয় উৎসাহিত করা হবে এবং কৃষি গবেষণা পরিষদের মাধ্যমে কৃষি গবেষণায় সমন্বয় নিশ্চিত করা হবে।

১৩.৪৭ কৃষি গবেষণার প্রধান ক্ষেত্রগুলি হবে নিম্নরূপঃ

(ক) মাটি ও আবহাওয়ার অঞ্চলগত তারতম্য এবং চাষে শ্রমিক বেশী লাগে, ফসল পাকতে কম সময় লাগে এমন জাতের উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়গুলি বিবেচনা করে প্রধান ফসলগুলির উৎকর্ষসাধন;

(খ) জনসাধারণের জন্য আরও পুষ্টিকর খাবার যোগানো এবং সীমিত জমির যথাসম্ভব সর্বাধিক সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যে দানাজাতীয় শস্য, ডাল, তৈলবীজ, ফল ও শাক-সব্জীর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ফসল চাষের ধারায় উন্নয়ন;

(গ) পরিবেশ রক্ষা ও সমন্বিত কীট-পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের ওপর জোর দিয়ে মাটি ও পানির ব্যবস্থাপনা; এবং

(ঘ) ফসল কাটার পরবর্তীকালের চাষাবাদ প্রযুক্তিসহ কৃষি প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং উর্বরতা ও প্রতিবেশের ওপর দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণসহ সর্বাপেক্ষা নিবিড় চাষাবাদের ধারায় এবং বিভিন্ন সকল ক্ষেত্রে সামগ্রিক সুফলের মূল্যায়ন।

কৃষি সম্প্রসারণ

১০.৪৮ প্রযুক্তি জ্ঞানের বাঞ্ছিত প্রসারের হার অর্জনের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ সার্ভিস একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, ইতিমধ্যেই গ্রাম স্তর পর্যন্ত একটা সুবিস্তৃত সম্প্রসারণ সংগঠনের অস্তিত্ব রয়েছে যার আওতায় রয়েছে বিষয়-বিশেষজ্ঞ ও সম্প্রসারণ প্রতিনিধিরা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সম্প্রসারণ সার্ভিস জোরদার করা হবে এবং উৎপাদন সম্ভাবনা বিচার করে একটি ইউনিয়নে একাধিক সম্প্রসারণ প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। শ্রমশক্তিসহ স্থানীয় নানা সম্পদের সর্বোত্তম সদ্ব্যবহারের জন্য সম্প্রসারণ তৎপরতা ক্ষেত্র পর্যায়ের সমীক্ষায় ভিত্তি করতে হবে। সম্প্রসারণ প্রতিনিধিরা এর আওতায় ঠিকচাষীদের সঙ্গে নিয়মিত দেখাশোনা করবেন, ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ঠিকচাষীদের নিয়মিত ইনসার্ভিস প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং এসবের ফল দিয়ে সম্প্রসারণ প্রতিনিধি/কর্মীর দক্ষতার মানোন্নয়ন ঘটবে। এই পদ্ধতিটি প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন পদ্ধতি নামে পরিচিত। এটি প্রথমে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে প্রবর্তন করা হবে।

কৃষি বিপণন

১০.৪৯ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ ছোট ছোট চাষী বাজারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠবেন। কৃষিপণ্যের এই বাজার চাষীরা কেন ফসল উৎপাদন করবেন, বিভিন্ন ফসলের আওতে কী পরিমাণ সম্পদ বরাদ্দ করবেন এবং কী কী আধুনিক উপকরণ ব্যবহার করা হবে ইত্যাদির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। তবে উন্নয়নশীল দেশগুলির বাজার ত্রুটি-বিচ্যুতির দরুণ বহুক্ষেত্রেই সম্পদের সুদক্ষ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়। এজন্য, পরিবহন, মজুত ব্যবস্থা, প্রক্রিয়াজাতকরণের সুবিধা ও তথ্য প্রচারের মাধ্যমে বিপণন সুবিধাদির উন্নতি সাধন প্রয়োজন যাতে চাষীদের লাভজনক মূল্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা যায়। কিছু নির্বাচিত ক্ষেত্রে মূল্য সমর্থন দানমূলক তৎপরতা পরিচালিত হবে।

কৃষি ঋণ

১০.৫০ আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির এবং ছোট ও প্রান্তিক চাষীদের আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা নির্দেশ করে তাদেরকে আবার ঋণ পাওয়ার ব্যাপারে গুরুতর সমস্যার মধ্যেও ফেলে। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি প্রধানতঃ সার, বীজ ও সেচের পানির মত বাণিজ্যিক উপকরণের উপর নির্ভরশীল। তবে ঐ প্রযুক্তি বিস্তারের হার ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা শুধুমাত্র আধুনিক কৃষি উপকরণ প্রাপ্তির উপর নির্ভর করে না, এজন্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের ঋণ সুবিধে পাওয়ার নিশ্চয়তাও আবশ্যক। ১৯৭০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে কৃষি ঋণের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটলেও চাষীদের সার ও অন্যান্য উপকরণের চাহিদা যে হারে বেড়েছে তার সঙ্গে তা সমান তালে সম্প্রসারিত হয়নি। ফলে, আজও গ্রামে মহাজনরাই কৃষি ঋণের প্রধান অবলম্বন এবং এই মহাজনের ঋণের টাকার উপর ৫০ শতাংশ, এমনকি তার চেয়েও বেশী সুদ আদায় করে। ১৯৭৯/৮০ প্রতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কৃষি ঋণের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩৫২.৩ কোটি টাকা যার মধ্যে চা বাগানগুলির জন্য প্রদত্ত ৬০.৭ কোটি টাকার ঋণও অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও জাতীয়কৃত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিই প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠানিক ঋণ প্রদান করে থাকে। বিভিন্ন সময়ে চাষীদের

নির্দিষ্ট চাহিদাসমূহ মেটানোর জন্য প্রদত্ত কৃষিঋণ বিভিন্ন কার্যক্রমের আকার নেয়। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৯/৮০ সালে এই ব্যাংক ছিল বাণিজ্যিক ঋণের বৃহত্তম উৎস। কৃষি খাতে প্রদত্ত মোট ঋণের ৫৯·৯ শতাংশ যোগায় কৃষি ব্যাংক। জাতীয়কৃত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির এ পর্যন্ত অনেক শাখা খোলা হলেও এগুলি মোট কৃষি ঋণের মাত্র ছয় শতাংশ যোগান দিয়েছে। সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম (IRDP) দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান মাত্র ৭·২ শতাংশ কৃষি ঋণ যোগান দিয়েছে। কৃষি ঋণ প্রদানে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ব্যাংক প্রদত্ত কৃষি ঋণের পরিমাণও অনুরূপ। তফসিলী ব্যাংকগুলি প্রদত্ত কৃষি খাতের আগমের সামগ্রিক স্তরও অনেক নীচু। মোট আগাম অর্থাৎ ২৫৬৪ কোটি টাকার মধ্যে তফসিলী ব্যাংকগুলি প্রদত্ত আগামী ৩১৮ কোটি টাকা বা মোট আগামের ১২·৪ শতাংশ যদি কৃষি খাত থেকেই আসে সার্বিক আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অর্ধেকেরও বেশী। পরিকল্পনায় কৃষি ও পল্লী উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের একটা বড় রকমের আনুপাতিক ভাগ অবশ্যই কৃষি খাতের জন্য দিতে হবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা মেয়াদের শেষ নাগাদ প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের অংশ ১২·৪ শতাংশ থেকে প্রায় ২৫ শতাংশে বৃদ্ধি করা হবে বলে ধরা হয়েছে।

১০·৫১ কৃষি ঋণের পরিমাণের স্বল্পতা ছাড়াও ইহার গঠনও স্বল্পমেয়াদী উৎপাদন ঋণমুখী। ১৯৭৯/৮০ মেয়াদে ঐ ধরণের ঋণ ছিল কৃষি খাতে প্রদত্ত মোট ঋণের ৪৭ শতাংশ। চলতি উপকরণগুলির জন্য উৎপাদন ঋণ গুরুত্বপূর্ণ হলেও এ কথা অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে, সেচ সুবিধের সম্প্রসারণের ওপর প্রযুক্তি প্রসারের দ্রুততা নির্ভর করবে। এজন্য সেচের যন্ত্রপাতি সংগ্রহের ব্যবস্থার জন্য মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান জোরদার করতে হবে। ঋণকে স্বল্পমেয়াদী উৎপাদন ঋণ থেকে সাজসরঞ্জাম কেনার জন্য মধ্যম/দীর্ঘমেয়াদী ঋণে রদবদল করে এবং মূলধনের স্টক বাড়িয়ে এটা করা যাবেনা। কৃষি ঋণ কার্যক্রমকে একই সংগে বর্ধিত হারে উপকরণ ও সাজসরঞ্জামের চাহিদা মেটাতে হবে।

১০·৫২ টাকা আমানতের ক্ষেত্রেকে চিরাচরিত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা বর্গাচাষী ও প্রান্তিক চাষীর মত ক্ষুদ্র ঋণ গ্রাহককে ঋণ দান নিরুৎসাহিত করে। সেইসাথে সনাতন সমবায় ব্যবস্থায় গতিশীলতার অনুপস্থিতির ফলশ্রুতিতে ১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার জন্য এক নতুন সমবায় পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। ১৯৭৯/৮০ সালে ৪০,০০০ কৃষি সমবায় সমিতি ছিল। সেগুলির মধ্যে ১৭,০০০টি সমিতি ঐ বছরই ঋণ গ্রহণ করে। প্রদত্ত ঋণ ১৯৭৬/৭৭ সালের ৬·৬ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১৯৭৯/৮০ সালে ২৫·৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পাশাপাশি গ্রামীণ পর্যায়ে প্রায় ৩,০০০ গতানুগতিক ধরণের সমবায় সমিতি আছে যেগুলি নিয়ে গঠন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক (৬২); এগুলি আবার বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড-এর (বিএসবিএল) সংগে সম্বন্ধীকৃত। দুটি সমান্তরাল পদ্ধতিভিত্তিক বিএসবিএল ও আইআরডিপির পাশাপাশি অস্তিত্ব যে বিভ্রান্তির উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা পরিহার করা হবে।

১০·৫৩ কৃষি ঋণের আরেকটি দিক হচ্ছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ঋণের জন্য বিভিন্ন হারে সুদ ধার্য করে এ বিষয়টির দিকে অবিলম্বে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। অর্থ সংস্থানেরও উৎস গারান্টির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রমে এই সুদের হারে ব্যাপক তারতম্য হয়ে থাকে। আইআরডিপির সুদের হার ১৭·৫ শতাংশ, অন্যেরা ১২ শতাংশ হিসেবে আদায় করে। চাষীদের দিক থেকে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ঋণদান কার্যক্রমগুলির মধ্যে সমন্বয় বিধানের জন্য সুদের বিভিন্ন হার একরকম করার পক্ষে জোরালো যুক্তি রয়েছে। ঋণের প্রকারভেদ তথা ধরণ কিংবা ভৌগোলিক অঞ্চল ভিত্তিতে শেষোক্ত সমন্বয় সাধন সম্ভব। যে পদ্ধতিই ব্যবহার করা হোক, ঋণের একাধিক স্তরীকরণ পরিহার করতে হলে সমন্বয় আবশ্যক।

১০·৫৪ প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সঞ্চয় ও আমানতের ওপর নির্ভর করে বলে পল্লী অঞ্চলে সঞ্চয় সংগ্রহ করার জন্য পল্লী অঞ্চলে আমানত ব্যাংকিং-এর প্রসার ঘটিয়েই কেবল বর্ধিত কৃষি ঋণের চাহিদা মেটানো যেতে পারে। এই লক্ষ্যে সরকার পল্লী এলাকায় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির শাখা দ্রুত বিস্তারনীতি অনুসরণ করেছেন। ফলে, ১৯৭৬ সালের জুন মাসে যেখানে পল্লী অঞ্চলে শাখার সংখ্যা ছিল ৮২৮, ১৯৮০ সালের জুন মাসে সেখানে শাখার সংখ্যা ২১০৩-এ উন্নীত হয়। পল্লী অঞ্চলের আমানতেও উন্নতি হয়েছে; পল্লী আমানতের অংশ ১৯৭৬ সালের প্রায় ১০ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯৮০/৮১ সালে ১৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তবে এই প্রবৃদ্ধি পল্লী এলাকার প্রদত্ত আগামে অনুরূপ উন্নতি বিধানে ব্যর্থ হয়েছে। পল্লী শাখাগুলিতে আগাম ও আমানতের অনুপাতে উন্নতি হলেও ১৯৭৯/৮০ সালে ঐ অনুপাত মাত্র ০·৬৩ ছিল। এ থেকে দেখা যায়, পল্লী অঞ্চলে আগাম প্রদানের চেয়ে সেখানে আমানত সংগ্রহের ওপর অনেক বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যদিও বাংলাদেশ ব্যাংক পল্লী অঞ্চলের ব্যাংকিং তৎপরতা পরিচালনায় ভূমিকা দেবার উদ্দেশ্যে

পল্লী ও শহরাঞ্চলে নতুন ব্যাংক খোলার ব্যাপারে ২:১ অনুপাতের নীতি গ্রহণ করে শুধু কার্যক্ষেত্রে বিপরীত ঘটতে দেখা গিয়েছে। নীতি ব্যবস্থার মাধ্যমে এসব অনিয়ম সংশোধন করার প্রয়োজন রয়েছে যাতে পল্লী এলাকাগুলো থেকে সম্পদের পাচার বন্ধ করা যায়।

বনজ সম্পদ

১০·৫৫ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে বনভূমি এলাকার আয়তন খুবই কম। দেশের মোট আয়তনের প্রায় ৯ শতাংশের মত এবং আভ্যন্তরীণ উৎপাদনে এর অবদানও কম অর্থাৎ মাত্র ৫ শতাংশের মত বলে ধরা হয়েছে। তবে এ সম্পদ নবায়নযোগ্য ও গ্রামীণ জনগণের প্রধান সূত্র বলে গ্রামের জ্বালানী সমস্যা উপশমের ক্ষেত্রে বনজ সম্পদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অর্থনীতিতে বনজ সম্পদের অবদান কাষ্ঠ সম্পদ আহরণের ও চারা রোপণের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আরও বাড়ানো যায়। এছাড়াও, বন উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জোয়ার জলোচ্ছ্বাসের বিরুদ্ধে 'সবুজ প্রাচীরের' কাজ করে।

বন এলাকা

১০·৫৬ বনজ সম্পদ উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। ৩·২৫ মিলিয়ন একরের সংরক্ষিত বন ছাড়াও পাহাড়ী এলাকায় ২·৪ মিলিয়ন এলাকায় অনির্দিষ্ট বন রয়েছে যেগুলি অশ্রেণীকৃত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চল (ইউএসএফ) বলে পরিচিত। এই বনগুলির প্রশাসনের দায়িত্ব পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা কর্তৃপক্ষের। এই বনভূমি অঞ্চল স্থানীয় লোকদের বারংবার জায়গা বদলন ঝুম চাষের ফলে প্রায় উজাড় হয়ে কার্যতঃ আগাছায় জঙ্গলে রূপান্তরিত হয়েছে। বনভূমির প্রায় ১·৮০ মিলিয়ন একর ব্যবহারযোগ্য বনভূমি অঞ্চল। বনভূমি ছাড়াও দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ১·২০ মিলিয়ন একরের মত নতুন জমি জেগে উঠছে। এই এলাকার মৃত্তিকা সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রায় ০·৩ মিলিয়ন একর ইতিমধ্যেই চরা রোপণের উপযোগী হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলায় বিপুল পরিমাণ পতিত সরকারী খাস জমি রয়েছে; পল্লী এলাকায় জ্বালানী সংকট এবং চাষাবাদের জন্য জমির ওপর প্রবল চাপের কারণে মৃত্তিকা ও পরিবেশের অবিরাম ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে বলে ঐ খাস জমির একটা অংশে বনভূমি গড়ে তোলা দরকার। মহাসড়ক (২,৯০০ মাইল) রেলপথ (১,৮০০ মাইল), উপকূলীয় বাঁধ (২,৫০০ মাইল) এবং জেলা পরিষদের সড়কের (৪,০০০ মাইল) দুধারে বরাবরও বৃক্ষ রোপণের সুবিধা রয়েছে। এসব যায়গার একত্র মিলিত পরিমাণ ৪০,০০০ একরের মত।

বনজ সম্পদের ব্যবহার ও উৎপাদন

১০·৫৭ বনজ সম্পদ উৎপাদনের বর্তমান স্তর অনেক কম, বনজ সম্পদ উৎপাদন ও ব্যবহারের হিসাব যদিও নির্ভরযোগ্য নয় তবু সম্ভবতঃ ১৯৬০ দশকের পর থেকে জ্বালানী কাঠ হিসেবে বন সম্পদের ব্যাপক ব্যবহার অনেক কমে গেছে। বাংলাদেশ জ্বালানী সমীক্ষার হিসেব অনুযায়ী ১৯৭৫ সালে বার্ষিক মাথাপিছু জ্বালানী কাঠ ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ০·৪ ঘনফুট। বন বিভাগের হিসাবে দেখা যায়, আসবাবপত্রের কাঠের ব্যবহার বার্ষিক মাথাপিছু প্রায় ০·৩ ঘনফুট। সারা দেশে সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে সম্প্রতি বিশ্বখাদ্য সংস্থা/পরিকল্পনা কমিশন পরিচালিত কাঠ ব্যবহার সমীক্ষায় দেখা যায়, বার্ষিক মাথাপিছু জ্বালানী কাঠ ২·৭১ ঘনফুট এবং আসবাবপত্রের কাঠ ০·৪-০·৫ ঘনফুট ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গাছের ডালপালা, লতাপাতা হিসেবের মধ্যে ধরলে গাছ থেকেই শতকরা ৪০ শতাংশের মত জ্বালানী শক্তি পাওয়া যায়। উল্লিখিত সমীক্ষায় দেখা যায় বাংলাদেশে মোট কাঠ ব্যবহারের শতকরা ৮০ শতাংশের মত জ্বালানী কাঠ যদিও তা পল্লী অঞ্চলে ব্যবহৃত জ্বালানী শক্তির মাত্র ১৫ শতাংশের মত। নেপাল ও বর্মা একই ধরণের আবহাওয়া বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত এবং দেশ দুটির লোকজনের মাথাপিছু আয়ের স্তরও বাংলাদেশের অনুরূপ হওয়া সত্ত্বেও ঐ দেশগুলিতে জ্বালানী কাঠের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী বা ২০ ঘনফুটেরও বেশী বলে হিসেব করা হয়েছে। বাংলাদেশে জ্বালানী কাঠের সম্পদের ভাগ কম হওয়ায় তা কৃষিক্ষেত্রে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করবে। প্রথমতঃ গাছপালা বিরল হওয়ায় জমির প্রচণ্ড রকম ভূমিক্ষয় হওয়ার আশংকা থাকে; দ্বিতীয়তঃ জমিতে ফসলের অবশিষ্টাংশ থাকে না এবং জৈব ও আদ্রতা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় গোবরও জমিতে পড়ে না কারণ গোবর গৃহস্থালীতে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অবস্থার চাপে পড়ে, এমন কি প্রয়োজনের তাগিদে ফলবান গাছও কেটে ফেলা হয়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত বর্ধনশীল গাছপালা লাগিয়ে পল্লী অঞ্চলের জ্বালানী সমস্যার দ্রুত সমাধান আশু প্রয়োজন।

১০·৫৮ প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্ট বনের গাছগুলি খুব ধীরে ধীরে বাড়ে, পরিপক্কতা লাভ করতেও সময় নেয় বলে উৎপাদনও খুব কম। বর্তমান উৎপাদন একান্তই কম। গত কয়েক বছরে সরকারী বনগুলি থেকে গড়ে ২৬·০০ মিলিয়ন ঘনফুট আসবাব উপযোগী কাঠ ও ২০·০০ মিলিয়ন ঘনফুট জ্বালানী কাঠ কাটা হয়েছে। অবশ্য বর্তমানে যে পরিমাণ কাঠ পাওয়া যাচ্ছে, বনগুলি থেকে তার চেয়েও বেশী সম্পদ পাওয়া সম্ভব। স্বাভাবিকভাবে সৃষ্ট বনগুলির গাছপালার অর্থনৈতিক মূল্য অপেক্ষাকৃত কম, সেজন্য সুপরিকল্পিতভাবে ঐসব বন পরিষ্কার করে অপেক্ষকৃত মূল্যবান গাছের চারা লাগানো যেতে পারে। এতে গাছ কাটার জন্য যে সময় দরকার তার মেয়াদও কমে যাবে। এজন্য একদিকে বনভূমির গাছগুলির তালিকাভুক্তি সর্বসম্প্রতিক করার প্রয়োজন যেমন হবে তেমনি অন্যদিকে বন পরিদপ্তরের ব্যবস্থাপনা সামর্থও জোরদার করতে হবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী ও কৌশল

১০·৫৯ একদিকে, জমির ওপর ক্রমবর্ধমান চাপের জন্য জমি ও আবহাওয়ার মধ্যে প্রতিবেশ ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার আশংকা এবং অন্যদিকে জ্বালানী কাঠ ও আসবাবপত্রে কাঠের ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যাবলী অনুসৃত হবেঃ

(১) বর্তমান বনজ সম্পদ থেকে পরিকল্পিতভাবে উৎপাদন বাড়ানো;

(২) বনভূমি যাতে আর হ্রাস না পায় সেজন্য যত দ্রুত সম্ভব সরকারী বনগুলির সম্পদের উন্নয়ন করা;

(৩) বেসরকারী বসতবাড়ী এবং সড়ক রেলপথ, খাল ও বাঁধের ধারে বৃক্ষ রোপণসহ সরকারী জায়গায় বৃক্ষ সম্পদ বিশেষ করে দ্রুত বর্ধনশীল জাতের গাছ ও ফলের গাছ লাগানো; এবং

(৪) ঘূর্ণিঝড়, সমুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, ভূমিক্ষয় প্রতিরোধ ও সামগ্রিক প্রতিবেশমন্ডলের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা।

উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ

১০·৬০ **বনের উৎপাদনঃ** বনজ সম্পদের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে যে ফাঁক রয়েছে এবং বসতবাড়ির বাগান ও জংগল ক্ষেতের ফসলের অবশেষ ইত্যাদির ওপর ঐ ব্যবধানজনিত অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার জন্য বনভূমি সংক্রান্ত কার্যক্রমগুলিতে উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। বনজ সম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনাময় উৎস হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি। এই বন থেকে ভিত্তি বছরের উৎপাদন প্রায় ২·১ মিলিয়ন ঘনফুটের তুলনায় বার্ষিক ১০·৬ মিলিয়ন ঘনফুট কাঠ পাওয়া সম্ভব। এই সম্ভাবনা বাস্তবায়িত করতে হলে বর্তমান অবকাঠামোগত, কারিগরী ও ব্যবস্থাপনা সমস্যাগুলি বিহিত করতে হবে। ভারী বর্ষা ও আলগা মাটির বৈশিষ্ট্যের কারণে ঐ এলাকায় সড়ক ব্যবস্থা বা বিকল্প পরিবহন ব্যবস্থার পরিকল্পনা সতর্কতার সংগে প্রণয়ন করতে হবে। পরিকল্পনাকালে সরকারী বনগুলি থেকে উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৭৯/৮০ সালের ৩৬·০ মিলিয়ন ঘনফুট থেকে ৫০·০ মিলিয়ন ঘনফুট বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

১০·৬১ **চারা রোপণঃ** পরিকল্পনায় চারা রোপণ এলাকা মোট ৩·৫৯ লাখ একরে উন্নীত করা ব্যবস্থা রয়েছে। এর মধ্যে পার্বত্য অঞ্চলে গাছ কেটে উজাড় করা ৯৪,০০০ এলাকায় চারা রোপণ, অশ্রেণীকৃত সরকারী বন ও উপকূলীয় এলাকায় প্রতিটিতে ১ লাখ একরের বনায়ন এবং বৃক্ষ বিরান করে ফেলা বনভূমির ৬৫,০০০ একরে পুনর্বনায়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। রোপণের জন্য উপযুক্ত জাতের ও ধরণের গাছ বাছাই হবে এই কার্যক্রমের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। পার্বত্য বনভূমিতে কিছু পরীক্ষা-নীরিক্ষায় দেখা গেছে দ্রুত বর্ধনশীল দেশী ও বিদেশী গাছের অত্যন্ত উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

১০·৬২ **বিশেষ ধরণের চারা রোপণঃ** এই শ্রেণীর চারা রোপণের আওতায় রয়েছে অত্যন্ত অগ্রাধিকারসম্পন্ন ও কাঠ হিসেবে ব্যবহার্য নয় এমন গাছের চারা যেমন বাঁশ, রবার, তূঁত গাছ, তৈল পাম ও ভেষজ গাছ ইত্যাদি রোপণ। বাঁশের শিল্পজনিত ও গৃহস্থালী উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহার রয়েছে। গত কয়েক বছর এসব গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ যথেচ্ছ কর্তনের ফলে অনেক হ্রাস পেয়েছে। এসব গাছের চারা রোপণের কার্যক্রম এবং এগুলির উৎকর্ষ বিধান অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

১০.৬৩ বাংলাদেশ বিশ্বের চিরায়ত রবার উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলির অন্যতম পরিসীমান্ত বাইরের এলাকার হলেও এদেশে রবার চাষের ভাল সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে আভ্যন্তরীণ উৎপাদন থেকে দেশের কাঁচা রবারের মোট চাহিদার প্রায় ২০ শতাংশ মেটে। রবার চারা রোপণ তথা রবার বাগান কার্যক্রমের আওতায় চারা রোপণের এলাকার মোটামুটি সংরক্ষণ (১৩,০০০ একর) এবং অপর্যাপ্ত গাছপালার জন্য যেখানে ভৌত উৎপাদন সম্ভাব্য সর্বোচ্চ উৎপাদনের নীচে নেমে গেছে সেইসব এলাকার পুনর্বাসনের (১২,০০০ একর) ব্যবস্থা রয়েছে। পরিকল্পনার শেষে নতুন রবার বাগান এলাকার মোট আয়তন হবে ২৫,০০০ একর।

১০.৬৪ পরিকল্পনাকালে টিলাপাহাড় ও ভূতি বাগান এলাকার আয়তন প্রতিটির জন্য ১০,০০০ একরে উন্নীত করা হবে। ভূতি গাছের চাষের ফলে পল্লী এলাকায় কর্মসংস্থান ও রেশম শিল্পের প্রসারের সুবিধে হবে।

১০.৬৫ কৃষি-বন: জুম চাষের জন্য যেসব পার্বত্য বনভূমির ক্ষতি হয়ে থাকে সেই এলাকাগুলির পুনর্বাসনে ঐ এলাকায় কৃষি বন পদ্ধতিও পুনর্বাসন হবে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই পদ্ধতিতে বন ও কৃষি ব্যবস্থা সমন্বিত থাকবে উৎপাদন বাড়ানোর বিকল্প হিসেবে। আশ্রয়হীন রাষ্ট্রীয় বনভূমির এই বিকল্প ব্যবহার স্থানীয় উপজাতীয় অধিবাসীদের স্থায়ী পুনর্বাসন ও তাদের নিয়মিত উপার্জনের ব্যবস্থার জন্য অত্যন্ত বাঞ্ছিত ব্যবস্থা। চারা রোপণ ও রোপণ করা চারাগুলির সফল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় উপজাতীয় অধিবাসীদের সংশ্লিষ্ট করা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিকল্পনায় প্রায় ৩'০০ লাখ একর জমিতে কৃষি বন গড়ে তোলার ব্যবস্থা রয়েছে।

১০.৬৬ পল্লী বনভূমি: প্রধানতঃ তিন ভাবে গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে বনভূমির ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রয়েছে। সেগুলি হচ্ছে: (১) বন থেকে খাদ্য, জ্বালানী এবং নির্মাণ সামগ্রী ও কৃষি যন্ত্রপাতিসহ গ্রামীণ জীবনযাত্রার অন্যান্য জরুরী সামগ্রীর সরবরাহ পাওয়া যায়; (২) বনভূমি ভারসাম্যরক্ষাগত স্থিতিশীলতা রক্ষার সাহায্য করে যার ওপর খাদ্যশস্য উৎপাদন নির্ভরশীল এবং (৩) বনভূমি গ্রামের অধিবাসীদের জন্য কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। তবে গ্রামে বন তৈরীর ব্যাপারে এ পর্যন্ত তেমন কিছুই করা হয়নি বলা চলে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে পল্লী এলাকার বন সম্পদ উন্নয়নের জন্য একটি মোটামুটি আকারের কার্যক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। এই কার্যক্রমের আওতায় ২০,০০০ একরের সংরক্ষিত বন ও খাস জমিতে (বেশিরভাগ পতিত ভূমি) স্থানীয় অধিবাসীদের দিয়ে চারা রোপণ।

১০.৬৭ বসতবাড়ীর বৃক্ষরাজি: বসতবাড়ীর গাছগুলি গ্রামের জনসাধারণের আসবাবপত্র ও জ্বালানী চাহিদা মেটানোর প্রধান উৎস। গত কয়েক বছরে, এই সম্পদ কাঠের জন্য প্রবল চাহিদার কারণে খুবই কমে গেছে। এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা যায় প্রায় ২০ শতাংশ বসতবাড়ীতে কোন গাছ নেই। গ্রামে বসতবাড়ী-গুলির বড় আয়তন ছোট চারাও উপযুক্ত অন্তরে গাছ বাড়াই করে সেখানে আরও গাছ লাগানোর সুযোগ রয়েছে। বসতবাড়ীসমূহের চারার চাহিদা মেটানোর জন্য প্রায় ৫১টি নতুন নার্সারী স্থাপন করা হবে এবং ভিত্তি বছরের ৬৮'০০ লাখ চারার তুলনায় এই পরিকল্পনার প্রতিটি বছরে জনসাধারণের মধ্যে ১'১৬ কোটি গাছের চারা বিতরণ করা হবে। এছাড়াও এই কার্যক্রমের আওতায় নিবিড় তত্ত্বাবধানে ৮০০০ নির্বাচিত গ্রামে গাছের চারা রোপণ করা হবে। বেসরকারী নার্সারীগুলিকে উৎসাহ প্রদান করা হবে। জনসাধারণকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও উপকরণ দেওয়া হবে।

১০.৬৮ বৈথিক বৃক্ষরোপণ: বাংলাদেশে জ্বালানীর জন্য জমি সংরক্ষিত রাখা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে। তাই সড়ক, রেলপথ, খাল ও নদীর দু'পাশে বৃক্ষরোপণের চমৎকার সুযোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এই পরিকল্পনা মেয়াদে ১,৩৬১ মাইল গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বৈথিক বৃক্ষরোপণ নির্ধারিত করা হয়েছে।

১০.৬৯ শিক্ষা ও গবেষণা: আগেই বলা হয়েছে, বনায়নকল্পে বনভূমির উন্নয়নের কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায়। এরূপ সম্ভাবনার ক্ষেত্রে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অপর্যাপ্ততা আশঙ্কাজনক জায়গায়। এই কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য ১১৮৫ সাল নাগাদ বন ব্যবস্থাপনার স্তরের সংখ্যাগরিষ্ঠ আনুমানিক ২,৮৭০ জন পেশাদার ও অর্ধ-পেশাদার বাহিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া ইতিমধ্যে যে ১,৩০৩ জন বন বিভাগীয় কর্মী রয়েছেন তাঁদেরকেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। বন ব্যবস্থাপনার তাত্ত্বিক জ্ঞান, ব্যাপক ও সংরক্ষিত বন থেকে বনায়ন সম্পদ আহরণের মধ্যেই সীমিত রয়েছে। "পল্লী বনভূমি ও কৃষি বনায়ন" ধারণাটি নতুন। তাই বর্তমান বন ব্যবস্থাপনা নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় অংশ হিসেবে অনুসন্ধান, প্রশিক্ষণ ও সম্প্র-সারণের জন্য বিভাগগুলি বন বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এছাড়া, শিক্ষালয় ও প্রশিক্ষণের বিভিন্ন পর্যায়ে যে অভাব ও অসঙ্গতি রয়েছে সেগুলি দূর করা হবে এবং পরিকল্পনা মেয়াদে স্বল্পকাল প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হবে।

১০·৭০ **বন গবেষণা :** সার্বিকভাবে বলতে গেলে উদ্দেশ্য অর্জনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বর্তমান বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের পুনর্গঠন প্রয়োজন। ক্ষেত্র তৎপরতায় গবেষণা কেন্দ্রীভূত হবে এবং তা বন ব্যবস্থাপনায় সমন্বয় বিধান করবে। আরও বিস্তৃত পরিসরে গবেষণার প্রয়োজন থাকলেও সম্ভাব্য কম সময়ের মধ্যে বন উন্নয়নের প্রধান উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের স্বার্থে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ কেন্দ্রীভূত করা হবে : বনবৃক্ষের চারার জন্য উৎকৃষ্ট মানের বীজ, গাছের জাত বাছাই ও মূল্যায়ন, দেশী ও বিদেশী দ্রুত-বর্ধনশীল গাছ বাছাই, উপকূলীয় বনায়নের জন্য গবেষণা, কেওড়া জাতীয় লবণাক্ত এলাকার উপযোগী গাছের জাতের উৎকর্ষসাধন, বনসম্পদ আহরণ ও পরিবহণের অর্থনৈতিক লাভালাভ যাচাই এবং প্রযুক্তি নির্ধারণ। বনজ সম্পদ ও সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াগুলির মান নির্ধারণের কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হাতে নেওয়া হবে।

১০·৭১ **বনজ সম্পদের তালিকাভুক্তি :** বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য বনজ সম্পদের একটা সর্বসাম্প্রতিক ও ব্যাপক পরিসর ভিত্তিক তালিকাকরণ একান্ত অপরিহার্য। বসতবাড়ীর গাছপালার ব্যাপারে একটি বনবিভাগ/বিশ্বব্যাঙ্ক সমীক্ষা/জাতিসংঘ উন্নয়ন কার্যক্রমের যৌথ সমীক্ষা প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। বনজ সম্পদের প্রধান ভাগ সরকারী বনগুলির সম্পদের তালিকাভুক্তি জরীপ পরিচালনা অনেক দিন থেকেই অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে। এ ধরণের শেষ তালিকাকরণ হয়েছিল ১৯৬০-এর দশকে। এজন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আমলে বনজ সম্পদের পূর্ণ তালিকাকরণের কাজ হাতে নেওয়া হবে।

১০·৭২ **উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল :** বিভিন্ন ধরণের বন্য প্রাণীকুলের তালিকাভুক্তি ঐসব প্রাণী সংরক্ষণের লক্ষ্যে উন্নয়ন বিকল্পসমূহের মূল্যায়ন এবং পশুপাখীর অভয়ারণ্য, উদ্ভিদ উদ্যান ও জাতীয় উদ্যান উন্নয়নসহ সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাসমূহ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

নীতি সংক্রান্ত বিষয়াবলী

১০·৭৩ বনজ সম্পদের স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ নীতিমূলক বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হবে :

(১) **বনভূমির সদ্ব্যবহার :** বাংলাদেশে জনপ্রতি জমির পরিমাণ খুব কম। কিন্তু এর পরেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ এলাকা হয় বনহীন, বৃক্ষ বিরল না হয় পতিত অবস্থায় রয়েছে। আর সেই সাথে এ যাবৎ অক্ষত বনভূমিতে নতুন হস্তক্ষেপ চলেছে। এসব সম্ভাবনাময় বনভূমির যথাযোগ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে সকল আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক বাধা দূর করা আশু প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে অর্জনের জন্য অনুপস্থিত ভূস্বামীদের কাছ থেকে কিছু পরিমাণ এ ধরণের জমি নিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে বা বন বিভাগকে (যে নির্দিষ্ট কাজে ব্যবহার করা যায় তা সাপেক্ষে) পুনর্বণ্টন করে দেওয়ার দরকার হবে।

(২) উপকূল অঞ্চলে নতুন জেগে ওঠা এলাকাগুলিতে উৎপাদন ও এসব এলাকা রক্ষার জন্য দ্রুত বনায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। কেন্দ্রীয় বন কর্তৃপক্ষের কাছে এগুলির ব্যবস্থাপনা হস্তান্তরও প্রয়োজন।

প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়াবলী

১০·৭৪ পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাগুলি অর্জনের জন্য বন বিভাগকে উপযুক্তভাবে পুনর্গঠিত ও শক্তিশালী করতে হবে। বন বিভাগের শুধু বনজ সম্পদের সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণের ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতা আছে, পল্লী অঞ্চলে বন গড়ে তোলার ব্যাপারে এই বিভাগের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। বর্তমানে বসতবাড়ী এলাকায় ও জনপদ তথা সমষ্টি পর্যায়ে বন সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে বলে, বন সার্ভিসের দৃষ্টিভঙ্গি, প্রশিক্ষণ ও গঠন কাঠামোতে, বিশেষ করে এর সম্প্রসারণ তৎপরতার মৌলিক পরিবর্তন আবশ্যক। বন বিভাগের বর্তমান সম্প্রসারণ সার্কেলটিকে পল্লী ও জনপদ বন উন্নয়নের জন্য শক্তিশালী করে তোলার প্রয়োজন হবে।

১০·৭৫ দ্বিতীয়তঃ বন গবেষণা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে একটি একক সংস্থার আওতাভুক্ত করতে হবে। বর্তমান বন গবেষণা ইন্সটিটিউট,, বন ইন্সটিটিউট, রেঞ্জারস কলেজ, ফরেষ্ট স্কুল এবং বন উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এগুলির অন্তর্গত।

১০·৭৬ তৃতীয়তঃ বনজ সম্পদের দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও আহরণের সমস্যাবলীর ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে এবং পল্লী ও জনপদ বনায়নে প্রদত্ত গুরুত্বের আলোকে, সরকারী কর্মকর্তাগণের সহায়ক হিসেবে সম্ভাব্য সর্বাধিক পরিসরে বেসরকারী উদ্যোগ ও বিনিয়োগ প্রয়োজন। স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় সরকার জনপদ বনায়নে অংশ গ্রহণ করবে। তৈলপাম ও রবারের বাণিজ্যিক ভিত্তিক রোপণের মাধ্যমে বেসরকারী পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ সম্প্রসারিত করা হবে। পরিকল্পনায় পার্বত্য এলাকায় অ-শ্রেণীকৃত রাষ্ট্রীয় বন এলাকায় ২০,০০০ একরেরও বেশী জমিতে রবার বাগান প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়েছে। অসম্প্রসারণ কার্যাবলী ও চারা সরবরাহের মধ্যে দিয়ে বেসরকারী নার্সারী প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হবে।

মৎস্য সম্পদ

১০·৭৭ বাংলাদেশে খাদ্য হিসেবে মাছের গুরুত্ব অনন্যসাধারণ। গ্রামীণ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠির প্রাণীজ প্রোটিনের জন্য মাছই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস এবং মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের সম্ভাবনাও ব্যাপক। বাংলাদেশের এক-সপ্তমাংশ ভূভাগ জুড়ে রয়েছে পুকুর, দীঘি, হাওড়-বিলঝিলী ও নদনদী। এছাড়াও, ধানের ক্ষেত ও নীচু এলাকা যেগুলি বর্ষার পানিতে প্রতি বছর ৪-৬ মাস ডুবে থাকে (আয়তন প্রায় ৭ মিলিয়ন একর) সেগুলি মিলে বর্ষা মৌসুমে মোট মৎস চাষের উপযোগী এলাকা দেশের মোট আয়তনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশে দাঁড়ায়। এজন্য আভ্যন্তরীণ পানির মাছই সবসময় বাংলাদেশে প্রাণীজ প্রোটিনের প্রধান উৎস এবং আভ্যন্তরীণ পানির মাছই দেশের মোট উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ। সামুদ্রিক মৎস্য এলাকাও বেশ উল্লেখযোগ্য কিন্তু দেশের অভ্যন্তরীণ সূত্রে মাছ সরবরাহের প্রাচুর্যের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুদিন আগ পর্যন্তও ঐ সামুদ্রিক সম্পদ অব্যবহৃত ছিল।

১০·৭৮ ১৯৭৯/৮০ সালে সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে মৎস্য সম্পদ খাতের অবদান ছিল প্রায় ৪·১ শতাংশ। এই খাতে দেশের উপার্জিত মোট বৈদেশিক মুদ্রার ৫ শতাংশের অধিক অর্জিত হয়। এছাড়া, দেশের মোট জনসমষ্টির ৬ শতাংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই খাতে কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

উৎপাদনের ভৌত সুবিধে ও অন্তরায়সমূহ

১০·৭৯ সাম্প্রতিককালে মানুষের তৈরী কৃত্রিম ও কিছু প্রাকৃতিক কারণে দেশের অভ্যন্তরে মাছের উৎপাদন বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছে। উচ্চ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত মাছ ধরার জন্য ও মাছের উৎসগুলির যথাযথ সংরক্ষণের অভাবেই দেশে মাছের উৎপাদন কমে গেছে। এছাড়া নদীতে বিস্তৃত চর পড়ে যাওয়া, স্থানে স্থানে পানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তথা বাঁধ নির্মাণ, পানি সেচ, চাষাবাদের উদ্দেশ্যে হাওড়, বিল এবং নিম্ন এলাকার জমি পুনরুদ্ধার এবং ক্লোরিনযুক্ত কীটনাশকের প্রয়োগ ইত্যাদি কারণে আভ্যন্তরীণ মৎস্য সম্পদ সামগ্রিকভাবে লোপ পাচ্ছে।

১০·৮০ উল্লিখিত বিষয়গুলি মাছের স্বাভাবিক বংশবৃদ্ধি রুদ্ধ করছে এবং অন্যদিকে উপযুক্ত পরিপোষণমূলক কার্যক্রমের অনুপস্থিতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার কারণে ক্ষতিপূরণ সম্ভব হয়নি। প্রধান প্রাতিষ্ঠানিক ঘাটতিগুলি নিম্নরূপঃ

(১) উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রণোদিত জনশক্তির অভাব;

(২) চাষী/মাঝি পর্যায়ে কারিগরী পরামর্শ ও সমর্থনের অভাবসহ সম্প্রসারণ সার্ভিসের অপ্রতুলতা;

(৩) ব্যাপকহারে মাছের পোনা উৎপাদনের অপর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধে; এবং

(৪) আভ্যন্তরীণ জলভাগের ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রণে বহু কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী

১০·৮১ ১৯৭৯/৮০ সালে ৬,৪৭ লাখ টন মাছ উৎপাদিত হয়। মাছের ন্যূনতম চাহিদার তুলনায় ঐ পরিমাণ অনেক কম। গত দুই দশকে গড়ে দৈনিক মাথাপিছু মাছের পরিমাণ ১৯৬৪/৬৫ সালের ৩৬ গ্রামের তুলনায় ১৯৭৯/৮০ সালে ২০ গ্রামে হ্রাস পেয়েছে। এই সময়ে দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় আর অন্যদিকে মাছের উৎপাদন আনুপাতিকভাবে না বেড়ে যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পায়। মাছ এদেশে প্রাণীজ প্রোটিনের প্রধান উৎস। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ১৯৮৪/৮৫ সাল নাগাদ দৈনিক জনপ্রতি ২৭ গ্রাম মাছ সরবরাহের উপযোগী পরিমাণে মাথার মাছের যোগানের উন্নতি সাধন।

১০·৮২ মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপঃ

(১) বর্ধিত মাছের উৎপাদন ও আহারের নিশ্চয়তাবিধানের মাধ্যমে জনসাধারণের পুষ্টির মাত্রা বৃদ্ধি;

(২) সাধারণভাবে পল্লীবাসী মানুষের এবং বিশেষ করে, জেলে ও মাছ চাষীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ ও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন;

(৩) প্রধানতঃ রপ্তানীর জন্য চিংড়ি, কাঁকড়া, ব্যাঙের পা, কচ্ছপ হাঙ্গরের পাখনা, একোয়ারিয়ামে রাখার মাছ ইত্যাদি কিছু বাছাই মৎস্যজাত পণ্যের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা;

(৪) স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে প্রচলিত প্রযুক্তির উন্নয়ন ও সেই সাথে সহজ, পরীক্ষিত ও শ্রম প্রধান প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধন;

(৫) মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ সার্ভিসের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদনের জন্য পল্লী গ্রাম শক্তির সংগঠন ও সমাবেশ; এবং

(৬) অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের ওপর গবেষণা তৎপরতা জোরদার করা।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা

১০·৮৩ পরিকল্পনার শেষ নাগাদ (১৯৮৪/৮৫) নিম্নলিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হবেঃ

(১) বর্তমান উৎপাদন মাত্রা প্রায় ৬·৪৭ লাখ টন থেকে মাছের উৎপাদন ১০ লাখ টনে (আভ্যন্তরীণ ৮·২০ ও সামুদ্রিক ১·৮০) বৃদ্ধি করা হবে। মোট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ০·৮৩ লাখ টন মাছ পাওয়া যাবে সরকারী খাতের বিভিন্ন প্রকল্প থেকে;

(২) বর্তমানে ২·৭৪ লাখ একর জলভাগের জলজ চাষ চলে যাতে কখনও কখনও অল্পহারে মাছের চাষও করা হয়। পরিকল্পনাকালে এরকম ১·৪৪ একর জলভাগে জলজ চাষ বৃদ্ধি করা হবে;

(৩) পরিকল্পনার প্রান্তিক বছরে কমপক্ষে ৪,০৮০ জন দিবসের সমান অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে; এবং

(৪) ১৫,০০০ টন চিংড়ি, ১,৫০০ টন ব্যাঙের পা এবং ১,৫০০ টন নির্বাচিত মাছ ও মাছজাত পণ্য রপ্তানী করা হবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশল ও নীতিমালা

১০·৮৪ পরিকল্পনার জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাগুলি অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত কৌশল অনুসৃত হবে ঃ—

(১) মাছের ডিম ফুটানোর জন্য নির্মীয়মান হ্যাচারীর কাজ সম্পূর্ণ করা এবং দেশের নানা স্থানে আরও নতুন হ্যাচারী প্রতিষ্ঠা যাতে কৃত্রিম স্পনিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ১৯৭৯/৮০ সালের ২৬ মিলিয়ন-এর তুলনায় ১৯৮৪/৮৫ সালে ৩২০ মিলিয়ন মাছের ডিম ফুটানো সম্ভব হয়;

(২) ডিম ফুটানোর পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য বেসরকারী পর্যায়ে মাছের চারা বা পোনা পরিচর্যা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধে ও উৎসাহদান;

(৩) মাছের ডিম থেকে ফুটানো বাচ্চা পোনাগুলি (০-৪ ইঞ্চি আকারের) স্থানীয় উদ্যোক্তাদের পরিচর্যায় বড় করার ব্যবস্থা, এ ব্যাপারে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান অগ্রণীয় ভূমিকা নেবেন এবং সরকারের মৎস্য বিশারদ কারিগরী নির্দেশনা দিয়ে সাহায্য করবেন।

(৪) বর্তমান মাছের পোনা উৎপাদন খামার ও পরীক্ষামূলক কেন্দ্রগুলিকে মাছের চারা বা পোনা উৎপাদন ও মৎস্য চাষ বেসরকারী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ দান ও প্রদর্শনী বৃদ্ধি করা হবে;

(৫) উপকূলে সংরক্ষণমূলক নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করে ও মাছ চাষের ব্যবস্থা করে স্থানীয় জাতের মাছগুলির সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হবে;

(৬) অফিসার ও ক্ষেত্রকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি কল্পে (ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে) তাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা উন্নত করা যাতে তাঁরা স্থানীয় মৎস্য চাষী ও যুবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদেরকে বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থায় প্রশিক্ষণ দিতে ও প্রেরণা যোগাতে সমর্থ হয়;

(৭) মধ্যম পর্যায়ের সম্প্রসারণ কর্মী তৈরীর জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হবে;

(৮) মৎস্যচাষী/জেলেদের জন্য বীমা ও ঋণ সুবিধের ব্যবস্থাসহ সম্প্রসারণ সার্ভিস, মাছের পোনা, মাছের খাদ্য/সার, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, মাছ ধরার নৌযান ও সাজসরঞ্জামের মত উৎপাদন সামগ্রীর পর্যাপ্ত সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান;

(৯) বেসরকারী উদ্যোক্তা ও সমবায়গুলির মাধ্যমে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাছ চাষের জন্য বিরাট আকারের জলভাগ/জলকরগুলিকে ছোট ছোট ইউনিটে বিভক্ত করা;

(১০) আভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক মাছের খলসই, প্রক্রিয়াজাতকরণ, হিমায়ন, হিমাগারে সংরক্ষণ বিপণন ও বিতরণের সুবিধে সম্প্রসারিত করা;

(১১) উন্নতমানের চিংড়ি, মাছ, মাছের উপজাত পণ্য ও ব্যাঙের পা ইত্যাদি রপ্তানী নিশ্চিত করার জন্য কিছু নির্বাচিত স্থানে মৎস্য পরিদর্শন কেন্দ্র ও মান নিয়ন্ত্রণাগার প্রতিষ্ঠা; এবং

(১২) গণযোগাযোগ মাধ্যমে আধুনিক মৎস্য চাষ কৌশল ও সংরক্ষণ সম্পর্কে প্রচারণা।

মৎস্য চাষের জন্য উপকরণ কার্যক্রম

১০·৮৫ **জলভাগসমূহ:** দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পুকুর, হাওড়, খাল, দীঘি, উপকূলীয় নিম্নাঞ্চল/লবণাঞ্চল ও ধানক্ষেত মিলে ২২,০০৯ একর জলভাগে সরকারী প্রকল্পসমূহের আওতায় এবং ৬,২১,৬৮১ একর জলভাগে বেসরকার/সমবায় খাতের আওতায় মাছের চাষ করা হবে। খোলা পানিতে যেমন দীঘি, নদী ইত্যাদিতে এলাকা ভিত্তে বেসরকারী খাতে জলজ চাষ তথা মৎস্য চাষ শুরু করা হবে। এছাড়াও মোট ১,০০,৯২,৫০০ একর পরিমিত নদী, হাওড়, ধানক্ষেত, কাপ্তাই হ্রদ ও খাঁড়ি এলাকা থেকে মৎস্য শিকার করা হবে। ছোট ছোট উদ্যোক্তাদেরকে উপকূলীয় এলাকার (উপকূল বরাবর কমপক্ষে ৩০ মাইল এলাকার পরিসরে) মাছের চাষে উৎসাহ প্রদান করা হবে। অন্যদিকে গভীর সাগরে (২০০ মাইল পর্যন্ত) মাছ শিকারে যন্ত্রচালিত নৌযান ও ট্রলার ব্যবহার করা হবে। আভ্যন্তরীণ পানি সম্পদকে সেচের মত অন্যান্য কাজেও লাগানো হয় বলে সেচ ব্যবস্থা, আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন ও আভ্যন্তরীণ মৎস্য কার্যক্রমগুলির মধ্যে সমন্বয় বিধান জরুরী।

১০·৮৬ **মাছের পোনা উৎপাদন:** পরিকল্পনায় নির্ধারিত মাছের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পর্যাপ্ত পরিমাণ মাছের পোনা উৎপাদনের জন্য গৃহীত জরুরী কার্যক্রমে এগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:—

(১) রুই-কাতলা জাতীয় মাছ, ভিঙ্গল ও চিংড়ি মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন কেন্দ্রগুলির তালিকা প্রণয়ন এবং মানুষের ক্রমবর্ধমান কার্যকলাপের হাত থেকে সেগুলি সংরক্ষণ;

(২) অগ্রসরী চাষীদের মধ্যে বিতরণের জন্য গ্রাস কার্প, সিলভার কার্প (রুই কাতলা জাতীয় মাছ) প্রভৃতি বিদেশী জাতের এবং মাগুর, কৈ, ইত্যাদি দেশীজাতের মাছ প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন;

(৩) প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত মাছের পোনা পালন, সংগ্রহ ও স্থানান্তরের উন্নততর পদ্ধতি প্রবর্তন;

(৪) মাছের বংশবৃদ্ধির জন্য বর্তমান সরকারী মাছের পোনা উৎপাদন খামারগুলির উন্নয়ন ও পুনর্বাসন এবং সেই সঙ্গে কৃত্রিম প্রজনন ও ষ্টকিং আকৃতির মাছের পোনা প্রতিপালনের সুবিধাদি প্রবর্তন;

(৫) মৎস্য বিশারদদের কারিগরী সহায়তাক্রমে ও স্থানীয় উদ্যোগে স্থানীয় পর্যায়ে (৫-৬ ইঞ্চি) লম্বা মাছের পোনা প্রতিপালন উন্নয়ন; এবং

(৬) পোনা উৎপাদকদের কাছে ঋণ ও কারিগরী জ্ঞানসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ।

১০·৮৭ মাছের খাদ্যঃ রুই-কাতল এবং মাগুরখোকা এ উভয় জাতের মাছের চাষের জন্য মাছের খাদ্য অতীব প্রয়োজনীয় এক উপকরণ। কশাইখানার সামগ্রী, মাছের ফলতু অংশ, ক্ষুদ্রাকৃতির মাছ, কৈ, সিংগি, মাগুর জাতীয় মাছের খাদ্য তৈরীতে সুন্দর কাজে লাগানো যায়। ক্ষুদ্র ও অকেজো মাছ কাজে লাগানোর জন্য উপকূলীয় অঞ্চলের যেসব জায়গায় ব্যাপক আকারে মাছ শিকার চলে সেখানে বেসরকারী উদ্যোক্তাদের সংগে একযোগে কয়েকটি মাছের খাবার তৈরীর কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

১০·৮৮ সারঃ বর্তমানে খুব সীমিত মাত্রা নাইট্রোজেন জাতীয় মৎস্য সার প্রয়োগ করা হয় এবং তা করা হয় প্রধানতঃ সরকারী খাতের জলাশয়গুলিতে। পরিকল্পিত পুকুর, দীঘি ও হাওর প্রভৃতিতে দেওয়ার জন্য থানা ফিশারী অফিসারের মাধ্যমে আগ্রহী মাছ চাষীদেরকে স্বাভাবিক ভর্তুকী সুবিধাযুক্ত দরে সার সরবরাহ করা হবে।

১০·৮৯ রসায়নিক পদার্থঃ মৎস্য বিভাগীয় কর্মীদের তত্ত্বাবধান ও কারিগরী নির্দেশনায় আগ্রহী মাছ চাষীদেরকে তাদের পুকুরগুলি মাছ চাষে তৈরী করার জন্য ঐসব পুকুরে প্রয়োগের জন্য চুন, রোটেনন ইত্যাদি রসায়নিক উপকরণ যথাসময়ে সরবরাহ করা হবে।

মাছ ধরা, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন

১০·৯০ আভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক উভয় প্রকার মাছ শিকারের জন্য প্রয়োজনীয় জালের চাহিদা আংশিকভাবে মেটানোর জন্য তিনটি স্থানে জাল তৈরীর কারখানা স্থাপন এবং কুমিল্লার জাল তৈরীর কারখানাটিকে আরও জোরদার করা হবে। পরিকল্পনা মেয়াদে গভীর সাগরে মাছ ধরার জন্য সরকারী ও বেসরকারী খাতে আরও ৬২টি ট্রলার ও ২,৬০০ মোটর চালিত নৌযান চালু করা হবে। চট্টগ্রামের বর্তমান মৎস্য পোতাশ্রয়টিকে পুনঃসজ্জিত করা হবে এবং আরও একটি মৎস্য পোতাশ্রয় এবং হিমায়ন ও হিমাগার সুবিধেসহ ১৬টি বিপণন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এগুলি সামুদ্রিক মাছের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করা হবে। তাজা/হিমায়িত মাছ দ্রুত পরিবহনের জন্য আরও হিমায়নযন্ত্রযুক্ত মোটরযান চালু করা হবে।

মৎস্য সংক্রান্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

১০·৯১ মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের জন্য আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও প্রযুক্তি প্রয়োগ জরুরী। এ উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সুযোগ-সুবিধে গড়ে তোলা হবে। বর্তমানে ময়মনসিংহের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য অনুষদের ছাত্রদেরকে মৎস্য বিজ্ঞানে ডিগ্রী দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও পর্যাপ্ত সংখ্যক মৎস্য সম্পদ প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হবে। এগুলিতে ডিপ্লোমার ব্যবস্থা থাকবে। এর উদ্দেশ্য হবে মধ্যম পর্যায়ে ফিশারী টেকনিশিয়ন সৃষ্টি যারা বুনিয়াদী স্তরে ফিশারী কর্মীর কাজ করবেন এবং মাছ চাষীদের প্রশিক্ষণ দেবেন। বর্তমানে যেসব প্রশিক্ষণ সুবিধে রয়েছে সেগুলির সম্প্রসারণ করে যন্ত্রচালিত মাছ ধরা নৌযান ও ট্রলার চালানোর জন্য আরও বেশী করে মেরিন কাডেট তৈরীতে কাজে লাগানো হবে।

মৎস্য সম্পদ গবেষণা

১০·৯২ আজ অবধি পর্যাপ্ত গবেষণা সুবিধে গড়ে তোলার কোন কার্যকরী উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তাছাড়া দেশে বড় আকারের মাছ উৎপাদন কার্যক্রম চালানোর মত নির্ভরযোগ্য গবেষণা উপাত্ত পাওয়া যায় না। অতি সম্প্রতি মৎস্য বিজ্ঞানীরা মৎস্য সম্পদের বিভিন্ন দিক নিয়ে অভিযোজন ধরণী ও মৌলিক গবেষণা শুরু করার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতেই প্রধানতঃ মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রীভূত থাকবেঃ

(ক) মৎস্যজীবীদের ও এই পেশায় সংশ্লিষ্ট অন্যান্যের আর্থ-সামাজিক অবস্থাসহ বিভিন্ন মৎস্য সম্পদের ওপর সমীক্ষামূলে বিস্তারিত উপাত্ত সংগ্রহ;

(খ) পাখনাযুক্ত মাছ, ঝিনুক ইত্যাদি মাছের চাষ দেশের অভ্যন্তরে সুবিধেজনক জোনা পানি অঞ্চলে প্রসারের জন্য কারিগরী কৌশল উন্নয়নের ব্যাপারে অভিযোজনমূলক গবেষণা পরিচালনা;

(গ) কৃত্রিম মৎস্য প্রজনন পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং মাগুর, কৈ, সিংগি ও পাবদা মাছের মত বাছাই করা স্থানীয় জাতের মাছের চাষের প্রসার;

(ঘ) বাংলাদেশের সমুদ্রে অর্থনৈতিক পরিসীমায় সারা বছর ধরে বিস্তারিত গবেষণা ও জরিপ পরিচালনা যার উদ্দেশ্য হবে 'পেলাজিক' (Pelagic)ও ডিমার্সাল (Demarsal) উভয় ধরণের বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আহরণযোগ্য সামুদ্রিক জলজ প্রাণীর সম্ভাবনা সম্পর্কিত উপাত্ত সংগ্রহ; এবং

(ঙ) গবেষণার সুফল শিল্পগুলিকে পৌঁছে দেবার জন্য প্রযুক্তিগত গবেষণা ইউনিট ও মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমঝোতা ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা।

মৎস্য সম্পদ সম্প্রসারণ সার্ভিস

১০·১৩ দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মাছের উৎপাদনের সম্ভাবনার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সম্প্রসারণ কর্মীসহ মৎস্য সম্প্রসারণ সার্ভিস জোরদার করা হবে। উৎপাদনের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক সম্প্রসারণ কর্মী নিয়োগ করে মৎস্য সংক্রান্ত উপদেশনা সার্ভিস জোরদার করা হবে। ফসল সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মত মাছ উৎপাদন কার্যক্রমেও 'প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন পদ্ধতি' প্রবর্তন করা হবে। এছাড়া, মৎস্য কর্মী ও চাষীদের মধ্যে তথ্যগত ব্যবধান রয়ে গেছে। এটি দূর করার জন্য গণযোগাযোগ মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ তথ্য সার্ভিস চালু করা হবে।

বীমা

১০·১৪ মাছ শিকার বিশেষ করে সাগরে মাছ শিকার বহুলাংশে ব্যাপার। কারণ, ঝড়, ঘূর্ণিঝড় অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি আছে। অন্য জেলে বা মৎস্যজীবীরা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত যেভাবে ধরা যাক সীমিত সামর্থ্যের মানুষ। তাই এসব পরিপ্রেক্ষিতে মৎস্য বীমা পরিকল্পনা চালু করার বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা হবে।

ঋণ সুবিধে

১০·১৫ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও অন্যান্য জাতীয়কৃত ব্যাংক এখন চাষীদেরকে ঋণ প্রদান করে। বর্তমানে মাছচাষী/জেলেদের জন্য যে ঋণ দান পদ্ধতি চালু রয়েছে তা আরও সহজ করা হবে।

আর্থিক বরাদ্দ

১০·১৬ উল্লিখিত কার্যক্রমগুলির বাস্তবায়নের জন্য মৎস্য সম্পদ খাতে (চলতি মূল্যে) মোট ১৭৪·৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে ২১·৮৪ কোটি টাকা মৎস্য ও গবাদি সম্পদ ডিভিশনে, ৮১·৮০ কোটি মৎস্য পরিদপ্তর এবং ৭০·৬৬ কোটি টাকা মৎস্য উন্নয়ন সংস্থার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। ১৯৭৯/৮০-এর মূল্যে মৎস্য সম্পদ খাতে মোট বরাদ্দের মূল্য হবে আনুমানিক ১১৯·০০ কোটি টাকার মত। সমবায় প্রতিষ্ঠানসহ বেসরকারী খাত মৎস্য সম্পদ খাতে ৯০০ কোটি টাকা (চলতি মূল্যে) বিনিয়োগ করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। সারণী ১০·৪-এ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রদত্ত বরাদ্দের সংস্থা ও কার্যক্রমওয়ারী বরাদ্দ দেখানো হয়েছেঃ

সারণী ১০.৪

আর্থিক বরাদ্দের বন্টন
(চলতি মূল্য)

(কোটি টাকায়)

খাত/কার্যক্রম	সরকারী খাত			
	মৎস্য ও পশুসম্পদ বিভাগ (মূলা)	মৎস্য সম্পদ পরিদপ্তর	বাংলাদেশ বৎস্য উন্নয়ন সংস্থা	মোট
১	২	৩	৪	৫
(১) গবেষণা, জরীপ ও সম্ভাব্যতা	২১·৮৪	৩·৯৬	০·২৪	২৬·০৪
(২) প্রশিক্ষণ	..	১·৭৮	১·৩৪	৩·১২
(৩) মাছের পোনা ও সম্প্রসারণ	..	৪৮·২৬	..	৪৮·২৬
(৪) মাছ ধরা বাঁধ, সাজসরঞ্জাম, জাল তৈরী কারখানা।	..	৫৫·৩৮	৫৫·৮৩	৫৫·৩৮
(৫) মাছ খালাসী, প্রক্রিয়াজাতকরণ মজুত ও বন্টন সুবিধাদি।	..	..	১০·৭০	১০·৭০
(৬) উপকূল বনভাগগুলি, মাছের খাবার ও সার ইত্যাদি উন্নয়ন।	..	২৭·৮০	৩·৫০	৩০·৮০
মোট ..	২১·৮৪	৮১·৮০	৭০.৬৬	১৭৪·৩০

উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা

১০ ম ১৯৭৯/৮০ সালে প্রকৃত মাছের উৎপাদন ও ১৯৮৪/৮৫ সালের জন্য লক্ষ্যমাত্রা পানির ধরণ ও উৎপাদনের উৎস অনুসারে সারণী ১০.৫ এ দেওয়া হয়েছে। এই সারণী থেকে দেখা যায়, ১০ লাখ টনের প্রত্যাশিত মাছ উৎপাদনের অংশ অর্থাৎ প্রায় ৮.২ লাখ টন পাওয়া যাবে দেশের অভ্যন্তরের জলভাগ থেকে আর বাকী ১.২ লাখ টন পাওয়া যাবে সাগর থেকে।

সারণী ১০·৫

বিভিন্নসূত্র থেকে মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা

পানির ধরণ	উৎপাদন সূত্র	১৯৭৯/৮০ (প্রকৃত)		১৯৮৪/৮৫ (অভিক্ষেপ)	
		মাছ ধরা যানের সংখ্যা/জল ভাগগুলির আয়তন (একরে)	উৎপাদন (টনে)	মাছ ধরা যানের সংখ্যা/ জল ভাগগুলির আয়তন (একরে)	উৎপাদন (টনে)।
১	২	৩	৪	৫	৬
আভ্যন্তরীণ	সরকারী খাত চাষ (ডি, ও, এফ)				
	—পুকুর	২৫,২০০	২,৭৯৯	৭,০০০	৯,১০০
	—বাওড়	২,৬১৬	১৩৮	২,৬১৬	১,৪৩৮
	—বাঁচা, 'পেন' ঘেরাজায়গা বাঁধ দেওয়া বাওড় ইত্যাদি।	..	..	১,৫০৪	২,৫১৮
	—সেচ খাল	..	..	৫,৬৮৯	২,২৭৫
	—উপকূলীয় জলভাগ	৩০০	১৪১	৫,৫০০	৩,০০০
	উপ-মোট (ডি ও এফ) ..	২৮,৪১৬	৩,০৭৮	২২,৩০৯	১৮,৬৩১

৫ আভ্যন্তরীণ বেসরকারী খাত

ক। চাষ

—ছোট পুকুর	১০০,০০০	২,০০০	১০০,০০০	১১,০০০
—পুকুর	৮৮,৬২০	৫,১৮৮	১৬৪,০০০	৮২,০০০
—খাওড়	৭৭,৩৮৪	৫,২৩৫	৩৭,৩৮৪	১১,০৮৪
—বাঁচা, 'পেন' বেরা জায়গা	..	..	১০,৯৮৬	১৪,২৮০
—উপকূলীয় জলভাগ	২০,০০০	৪,৮৫১	২০০,০০০	১০০,০০০
—সেচ খাল	..	..	৯,৩১১	৩,১০৪
—ধানক্ষেত ও বন্যায় পানিতে ডোবা জমি।	..	..	১০০,০০০	১০,০০০
উপ-মোট (ক) ..	২৪৬,০০৪	১২,২৭৬	৬২১,৬৮১	২৫৫,৪৬৮

খ। শিকার

—নদী	২,০৫১,২০০	১৯৯,৯৭০	২,০৪০,০০০	১৯৩,৮০০
—খাওড়	৬৮৪,০০০	৬৩,৯২৯	৬৮২,০০০	৮৮,৯৬০
—ধান খেত ও বন্যায় ডুবে যাওয়া জমি	৭,০০০,০০০	২৩৭,৬৭৫	৬,৯০০,০০০	২৩৪,৬০০
—কাপ্তাই হ্রদ	২২৪,০০০	২,০০০	২২৪,০০০	৯,০০০
—সেচ খাল	১৫,০০০	১,০০০	..	..
—খাড়ি	৪৫২,০০০	৪,৮৫২	২৪৬,৫০০	১৯,৬৮০
উপ-মোট (খ) ..	১০,৪২৬,২০০	৫,০৯,৪২৬	১০,০৯২,৫০০	৪৪৬,০৪০
উপ-মোট (বেসরকারী) ..	১০,৬৭২,২০৪	৫২১,৭০২	১০,৭১৪,১৮১	৮০১,৫০৮
আভ্যন্তরীণ মোট (সরকারী + বেসরকারী) ..	১০,৭০০,৬২০	৫২৪,৭৮০	১০,৭০৬,৪৯০	৮২০,১৩৯

পানির ধরণ	উৎপাদন সূত্র	১৯৭৯/৮০ (প্রকৃত)		১৯৮৪/৮৫ (অভিক্ষেপ)	
		মাছ ধরা যানের সংখ্যা/জল ভাগ গুলির আয়তন (একরে)	উৎপাদন (টনে)	মাছ ধরা যানের সংখ্যা/ জল ভাগগুলির আয়তন (একরে)	উৎপাদন (টনে)
১	২	৩	৪	৫	৬
সমুদ্র : সরকারী খাত (বিএফডিসি)					
	ট্রলার—	৯	৩,৫০০	৮	৪,০০০
	মোটর ইঞ্জিন সজ্জিত যান	৭০০	১৪,০০০	৩,০০০	৬০,০০০
	উপমোট সরকারী ..	৫০০	১৭,৫০০	..	৬৪,০০০
সমুদ্র : বেসরকারী খাত					
	ট্রলার	৩	১,৫০০	৬৬	৩৩,০০০
	মোটর চালিত নৌকা	৭০০	১৪,০০০	১,০০০	২০,০০০
	পালের নৌকা	১২,০০০	৮৯,০০০	৯,০০০	৬৩,০০০
	উপ-মোট (বেসরকারী) ..		১০৪,৫০০	..	১১৬,০০০
সামুদ্রিক মোট (সরকারী ও বেসরকারী) ..			১২২,০০০	..	১৮০,০০০
সরকারী (আভ্যন্তরীণ ও বেসরকারী) ..			২০,৫৭৮	..	৮২,৬৩১
বেসরকারী (আভ্যন্তরীণ+সামুদ্রিক) মোট ..			৬২৬,২০২	..	৯১৭,৫০৮
সর্বমোট (আভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক) ..			৬৪৬,৭৮০	..	১,০০০,১৩৯
	মোট			..	১০·০০ লাখ টন

মাছ রপ্তানী :

১০·৯৮ ১০·৬ সারণীতে ১৯৭৯/৮০ মেয়াদে প্রকৃত মাছ রপ্তানী ও ১৯৮৪/৮৫ মেয়াদের জন্য লক্ষ্যমাত্রা দেখানো হয়েছে :

সারণী ১০·৬

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মাছ রপ্তানী

বিষয়	১৯৭৯/৮০ (প্রকৃত)		১৯৮৪/৮৫ (লক্ষ্যমাত্রা)		১৯৭৯/৮০ উপর বৃদ্ধি (শতকরা হার)
	পরিমাণ (টনে)	মূল্য (কোটি টাকায়)	পরিমাণ (টনে)	মূল্য (কোটি টাকায়)	
চিংড়ি	৮১০০·৭০	৫৯·৫১	১৭০০০·০০	১৩৪·৫০	১২৬
মাছ ও মাছ থেকে উৎপাদিত সামগ্রী	১১৪৩·০০	৪·৪৬	১৫০০·০০	৬·০০	৩৫
ব্যাঙের পা	১৫২২·০০	৩·৯৫	১৬০০·০০	৪·৫০	১৪
মোট ..	১০৭৬৫·৭০	৬৭·৯২	২০১০০·০০	১৪৯·০০	১১০

গবাদি সম্পদ

১০·৯৯ কৃষিজাত ও পল্লী অঞ্চলের পরিবহনের জন্য পশু শক্তি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। ফসল উৎপাদনের প্রায় ৩০ শতাংশ যোগায় পশু শক্তি। এ ছাড়াও গোবর, জৈব সার ও পাড়াগাঁয়ের জ্বালানীর একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। গবাদি পশু মানুষের খাদ্যের প্রোটিনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। তবে বর্তমানে গবাদি পশু মানুষের প্রোটিনের চাহিদার খুব সামান্য অংশ অর্থাৎ দিনে মাথাপিছু মাত্র প্রায় ৩·২ গ্রাম যোগায়।

১০·১০০ বাংলাদেশে গবাদি পশুর মোট সংখ্যা ২১·৮ মিলিয়ন গরু ও মহিষ, ৯·৬ মিলিয়ন ভেড়া ও ছাগল এবং ৬৩·৩ মিলিয়ন হাঁস-মুরগী। এসব গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী অধিকাংশই দেশী এবং এগুলির প্রজনন ক্ষমতাও খুব কম। পশু পাখীর খাবারের ও চিকিৎসার অভাবে এই নিম্ন মাত্রার উৎপাদন ক্ষমতারও পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য

১০·১০১ পশু চিকিৎসা ও পরিচর্যা জনশক্তি, হাসপাতাল, ডিসপেনসারী, টীকা ও ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে রক্ষণাবেক্ষণমূলক সার্ভিস দানের প্রতি প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে জোর দেওয়া হয়। কৃত্রিম প্রজনন, মোরগ বিনিময়, বাচ্চা ফুটানোর ডিম ও মুরগী ছানা বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে বড় আকারের গৃহপালিত পশু ও হাঁস-মুরগীর বংশ বিস্তার-মূলক বিনিয়োগে নীতিত আকারের সুযোগ-সুবিধে প্রদান করা হয়। তবে যতটুকু, সম্ভব পাওয়া যায় তারও কম সদ্ব্যবহারের কারণে ঐ কার্যক্রমের দরুণ কোন তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়নি। বর্তমান পরিস্থিতির উন্নতির জন্য সুষম খাদ্য এবং উন্নত বাচ্চা উৎপাদনসহ উন্নত পালন নীতির ব্যবস্থা একান্ত জরুরী।

১০·১০২ সরকারী খাতে ব্যবস্থাপনা দক্ষতার ঘাটতি উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও এই খাতে সম্পদের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ব্যবহার বিঘ্নিত করেছে। এজন্য, বর্তমানে যেসব প্রাতিষ্ঠানিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধে রয়েছে একদিকে সেগুলির উন্নততর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং অন্যদিকে জনসাধারণ ও বেসরকারী উদ্যোক্তাদের অংশ গ্রহণে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী ও কৌশল

১০·১০৩ উন্নতজাতের শাবক, উৎপাদন, খাদ্য ও খড়-বিচালীর মত পশু খাদ্যের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা, জোরদার সংরক্ষণমূলক কার্যক্রম এবং উন্নততর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গবাদি সম্পদের যথেষ্ট উন্নতি সম্ভব। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপঃ

(ক) উন্নতজাতের গবাদিপশু এনে পশু চালিত শক্তি বৃদ্ধি করা;

(খ) গবাদি পশুজাত প্রোটিনের উৎপাদন বৃদ্ধি করা; এবং

(গ) পর্যাপ্ত পশুপালনমূলক সেবা সুবিধে ও আধুনিক খাদ্যের ব্যবস্থা।

কার্যক্রমের বিশেষ দিক

পশুটানা শক্তিঃ

১০·১০৪ ১৯৭৯/৮০ সালে জমিতে চাষ ও গাড়ী টানার জন্য দেশে প্রায় ১১·৪ মিলিয়ন গরু ও মহিষ (৩·৪ মিলিয়ন গরুসহ) নিয়োজিত ছিল। জমির উপযুক্ত চাষাবাদ ও ফসল তোলার পরবর্তী কাজগুলির চাহিদার তুলনায় এই পশুগুলির কাজের ক্ষমতা অপর্যাপ্ত। ব্যস্ততম কাজের মৌসুমে, পশুর শক্তির ঘাটতির কারণে ফসলের চাষাবাদের ধরণও প্রভাবিত হয়েছে। পশুর প্রাণহানি ও জন্মকালীন মৃত্যুরোধ, উন্নতজাতের উৎপাদন, পর্যাপ্ত খাদ্য ও খড়বিচালী সরবরাহ, উন্নত সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা রীতি এবং পশু ব্যবহারে উন্নত পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে পশু টানা শক্তির উন্নয়ন সাধন সম্ভব।

সংরক্ষণঃ

১০·১০৫ রোগব্যাধিসহ নানা কারণে প্রতি বছর বহু সংখ্যক পশুপাখী মারা পড়ে। পশুর ক্ষেত্রে এ ধরনের মৃত্যু হার ১০ শতাংশ এবং হাঁসমুরগীর প্রায় ৩৩ শতাংশ। একটি সুসংগঠিত ও ফলদায়ক নিবারণ ও নিরাময়মূলক পদ্ধতি একান্ত জরুরী। মারাত্মক ধরনের রোগ নিবারণে টীকা দান সবচেয়ে কার্যকর ব্যবস্থা। এ পর্যন্ত এক্ষেত্রে যে অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত। কিন্তু এর পরেও এই সুযোগ সুবিধেরও পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হয়নি। ১৯৭৯/৮০ সালে দেশে ৪৫ মিলিয়ন ডোজ টীকা উৎপাদিত হয় যদিও চাহিদা ৫৫০ মিলিয়ন ডোজ। যথাযথ সংরক্ষণ, মজুত ও পরিবহনের সুযোগ সুবিধের অভাবে এই উৎপাদনেরও পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি।

১০·১০৬ পরিকল্পনাকালে, ১৯৮৪/৮৫ সালে প্রায় ৩০০ মিলিয়ন ডোজ টীকা পাওয়া যাবে। এর মধ্যে ২৮০ মিলিয়ন ডোজ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হবে। পরিকল্পনায় সকল জেলা সদরে হাসপাতাল ও সকল থানা সদরে ডিসপেনসারী স্থাপনের ব্যবস্থা রয়েছে। ওষুধ পত্রের উৎপাদন ১৯৭৯/৮০ সালে উৎপাদিত ১০ মিলিয়ন ডোজের তুলনায় ১৯৮৪/৮৫ সালে উৎপাদন ৫০ মিলিয়ন ডোজে উন্নীত হবে।

১০·১০৭ পশুপালন পরিদপ্তরে প্রায় ৮০০ পশু চিকিৎসাকর্মী আছেন। এদের অনেককে ব্যাধি নিয়ন্ত্রণকার্যক্রমের তত্ত্বাবধান (মনিটরিং)-এর জন্য জেলা পর্যায়ে নিয়োগ করা হবে। নিরাময় ও নিবারণমূলক তৎপরতা ব্যবস্থাপনার জন্য হাসপাতাল ও ডিসপেনসারীগুলিতে নিয়োজিত প্রায় ৩০০ পশু চিকিৎসাকর্মীকে হাঁস-মুরগীর টীকা দানে চাষীদের প্রশিক্ষণ দান এবং পশুপালন বিভাগীয় ক্ষেত্র সহকারীদের চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে নিয়োজিত করা হবে। এছাড়াও রোগ নিবারণ ও নিরাময়মূলক কাজে প্রায় ৪০০ থানা পশুপালন কর্মকর্তাদেরকেও নিয়োজিত করা হবে। সরকারী খাতে পশুপালন কর্মীদের সামর্থ সীমিত বলে বেসরকারী খাতে নিয়োজিত এজেন্ট ও স্থানীয় সংস্থাগুলি এক্ষেত্রে পরিপূরক ভূমিকা পালন করবে।

বংশবৃদ্ধি (Breeding)

১০·১০৮ বড় আকারের গবাদি পশুঃ গবেষণার ফলে দেখা যায়, কৃত্রিম প্রজননে উন্নতজাতের পশুর শঙ্কর জাত সৃষ্টি করার মাধ্যমে স্থানীয় জাতের পশুর উৎপাদন ক্ষমতা ও শক্তির উন্নয়ন সম্ভব। সরাসরি প্রজননের মাধ্যমে গবাদি পশুর উন্নয়নের প্রয়াস ১৯৫৮ সাল থেকেই এদেশে চলে আসছে। এখন দেশে কিছু কিছু উন্নতমানের গবাদি পশু পাওয়া যায়। সরাসরি প্রজননের লক্ষ্যে প্রায় ছয় শতাধিক উন্নতজাতের ষাঁড় প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের নানাস্থানে সরবরাহ করা হয়েছে। ২৫০টি হরিয়ানা ষাঁড় আমদানীর প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়াও শাবক উৎপাদন খামারগুলিতে প্রায় ৫০০ বড় জাতের ষাঁড় তৈরী করা হবে।

১০·১০৯ ১৯৭৯/৮০ সালে কৃত্রিম প্রজননের সংখ্যা ছিল ২ লাখ। ১৯৭৯/৮০ সালে জেলা সদর পর্যায়ে ১৭ ও থানা পর্যায়ে ৮৪টি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র ছিল। কৃত্রিম প্রজননের জন্য সকল জেলা ও থানাগুলিতে পর্যাপ্ত সুবিধের ব্যবস্থা করা হবে। বীর্য উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৭৯/৮০ মেয়াদের ২·০ লাখ ডোজের তুলনায় ১৯৮৪/৮৫ সালে ৫·০ লাখ ডোজে বৃদ্ধি পাবে।

১০·১১০ ক্ষুদ্র প্রাণীঃ ছাগল ও ভেড়ার মত ক্ষুদ্র প্রাণীগুলির বংশবিস্তার সাধন গবেষণা পর্যায়ে সীমিত থাকবে। এই গবেষণার উদ্দেশ্য হবে দেশে এই প্রাণীগুলির চর্বির অনুপাত বাড়ানোর মাধ্যমে এগুলির মাংসের উৎকর্ষ বৃদ্ধি। বাংলাদেশের কাল রং-এর ছাগলের চমৎকার গুণমান বজায় রাখতে হবে এবং একই সঙ্গে উন্নত বিদেশী জাতের ছাগলের সঙ্গে এই জাতের শঙ্কর করার বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কেবল সমীক্ষা ও গবেষণার উদ্দেশ্যে প্রাথমিকভাবে ক্ষুদ্র পরিসরে কৃত্রিম প্রজনন প্রবর্তন করা হবে।

১০·১১১ হাঁস-মুরগীঃ ১৯৭৯/৮০ মেয়াদে দেশে ৬·৩ কোটি হাঁস-মুরগী ছিল। বিগত ১৯৪০ দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকে এ দেশী ও বিদেশী জাতের শঙ্কর জাত তৈরীর চেষ্টা চলে আসছে। পরিকল্পনাকালে, সরকারী খামারগুলিতে ১·৪ মিলিয়ন মোরগ বড় করা হবে। এই উদ্দেশ্যে ডিম ফুটানো ইত্যাদি যন্ত্র স্থানীয়ভাবেই তৈরী করা হবে। হাঁস-মুরগীর ছানার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বাচ্চা ফুটানোর উপযোগী ডিম বিক্রি নিয়ন্ত্রিত করা হবে।

পশু-পাখীর খাবার

১০·১১২ গৃহপালিত পশুপাখী আমাদের দেশে দারুন অপুষ্টিতে ভোগে; ফলে দেশের প্রাণীজ প্রোটিনের ক্ষতি হয়। কৃষি ফসলের উপজাত দ্রব্যাদিই গবাদিপশুর খাদ্যের প্রধান উৎস। তবে বামনজাতের ধান ও গমের বিচালীতে সিলিকার পরিমাণ বেশী থাকায় ঐ বিচালীর মান নিকৃষ্ট, এগুলিকে প্রক্রিয়াজাত করে গবাদি পশুর আহারের জন্য উন্নততর করা দরকার।

১০·১১৩ সাভারের দুগ্ধ ও গবাদি সম্পদ উন্নয়ন খামারে পরিচালিত গবেষণা এবং এ পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্র যাচাই থেকে দেখা যায়, কতকগুলি উজ্জল সম্ভাবনাময় জাতের পশুখাদ্য আছে যেগুলি অর্থনৈতিক দিক থেকে অন্যান্য ফসলের চেয়ে লাভজনক। সম্প্রসারণ তৎপরতার মাধ্যমে ঐ ধরনের পশুখাদ্য তথা ফসলের চাষ ধীরে ধীরে বাড়ানো হবে। শিম জাতীয় ফসলের উৎপাদন বাড়লে অতিরিক্ত পশুখাদ্য পাওয়া যাবে। এই ধরনের ফসলগুলি মাটির জৈব উপাদান সমৃদ্ধ করে। বাড়তি জমি, ফালি বা চিলতে জমি, বাঁধের ধার ইত্যাদি জায়গাগুলিতে পশু খাদ্যের উপযোগী ফসল চাষ। পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে সরকারী খাতে পশু খাদ্যসার উৎপাদন হাতে নেওয়া হবে। সুষম মিশ্র পশুখাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে পশুখাদ্য মিল স্থাপনের জন্য ঋণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধে দিয়ে বেসরকারী খাতকে উৎসাহিত করা হবে।

সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা

১০·১১৪ ফসল উৎপাদনের সঙ্গে একসাথে মিশ্র খামারে গবাদি পশু পালন করা হয়। ৬·৮৫ মিলিয়ন কৃষিজোতের মধ্যে ৫·৮৩ মিলিয়ন জোতে পশুচারণ চলে। আর প্রায় সবচাষীই কোন না কোন রকম হাঁস-মুরগী পালন করেন। শুধুমাত্র ০·৬ মিলিয়ন জোত পুরোপুরি গবাদি পশু খামার। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে চাষীরা অজ্ঞ বলে এইসব খামারে পালিত পশুপাখির 'উৎপাদনের হার' খুব কম। এজন্য পশুপালনের মৌলিক প্রয়োগ কৌশলগুলির প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চাষীদের আধুনিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শিক্ষাদানের সুবিধা সম্প্রসারণ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য। ডিসপেনসারী, পশু চিকিৎসা প্রশিক্ষণ

ইন্সটিটিউট, সরকারী গবাদি পশুপালন খামার, কৃষি সম্প্রসারণ প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এবং থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্রগুলির মত বর্তমান সকল সুযোগ সুবিধা চাষীদের জন্য স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনায় কাজে লাগানো হবে।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

১০·১১৫ ময়মনসিংহের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল গবাদি পশু বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর শিক্ষাদান অব্যাহত থাকবে। কারিগরী শিক্ষা, যেমন অপর্যাপ্ত তেমন ক্ষেত্র পর্যায়ে কারিগরী কর্মচারীরও দারুন অভাব রয়েছে। বর্তমানে কেবলমাত্র একটি গবাদিপশু প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে কারিগরী প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। পরিকল্পনাকালে, বার্ষিক ৪০০ ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ৪টি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধের ব্যবস্থা করা হবে। নিম্ন পর্যায়ের কারিগরী কর্মচারীর অভাব পূরণের জন্য হাঁসমুরগীর টীকাদান ও গবাদি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মত সহজ কাজে আনুমানিক ৩,০০০ প্রগতিশীল চাষী ও গ্রামীণ তরুণকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

গবেষণা

১০·১১৬ ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি গবেষণা পরিষদ এবং গবাদি সম্পদ পরিদপ্তরের বিভিন্ন গবেষণা শাখা গবাদি পশু পালনের নানাবিধ সমস্যা লইয়া কাজ করে। বংশবিস্তার, পুষ্টি, হাঁস-মুরগী পালন, গবাদি সম্পদ সংক্রান্ত অর্থনৈতিক বিষয়াবলী ও অন্যান্য সমস্যার প্রশ্নে আরও গবেষণামূলক কাজের জন্য এই শাখাগুলিকে পুনর্গঠিত ও উন্নততরভাবে সজ্জিত করতে হবে।

উপকরণ কার্যক্রম

১০·১১৭ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উপকরণগুলিতে নিম্নলিখিত লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে:

সারণী ১০.৭

উপকরণসমূহের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা

বিষয়	ইউনিট	ভিত্তিমাত্রা ১৯৭৯/৮০	লক্ষ্যমাত্রা ১৯৮৪/৮৫	শতকরা হার ভিত্তিমাত্রার উপর বৃদ্ধি
(১) টীকা	কোটি ডোজে	৪·৫	৩০·০	৫৬৭
(২) ওষুধপত্র	কোটি ডোজ	১·০	৫·০	৪০০
(৩) প্রজনন	লাখ	২·০	৫·০	১৫০
(৪) মোরগ/হাঁস বিতরণ	ঐ	০·১	১৪·০	..
(৫) ছানা বিতরণ	ঐ	০·৮	৫·০	৫২৫
(৬) ডিম বিতরণ	ঐ	৬·৫	২০·০	২০৮
(৭) খাদ্য বিতরণ	('০০০' টন)	৫·০	৫০০·০	..
(৮) খড় বিচালী বিতরণ	ঐ	১২·৫	১০০·০	৭০০
(৯) ভিস্পেন্সারী ও হাসপাতাল	(মোট সংখ্যা)	৩৩৭	৪০০	১৯
(১০) কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র	ঐ	১০১	৪০৪	৩০০
(১১) বড় গৃহ পালিত পশুর খামার	ঐ	৩	৮	১৫৭
(১২) হাঁস মুরগীর খামার	ঐ	১৬	২৮	৭৫
(১৩) বেসরকারী গবাদি পশুর খামার	লাখ	১·০	৫·০	৪০০

কয়েকটি নীতি সংক্রান্ত বিষয়

১০.১১৮ উল্লিখিত কার্যক্রম ও কর্মতৎপরতা ছাড়াও পরিকল্পনা মেয়াদে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সংক্রান্ত নীতিগুলি বলিষ্ঠতর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হবে:

(১) বর্তমান প্রচলিত পশু আইন সেকেলে হয়ে পড়েছে, বর্তমান কালের বিভিন্ন চাহিদার উপযোগী করার জন্য এই আইনের সংশোধন করতে হবে।

(২) ছোট চাষী ও উদ্যোক্তার যারা গবাদি পশু পালন ও বিপণনে উৎসাহী তাঁদের জন্য ঋণ ও অন্যান্য প্রসঙ্গার সুবিধের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) বিভিন্ন উপকরণের উৎপাদন ও সরবরাহের জন্য সাংগঠনিক ব্যবস্থা করতে হবে।

আর্থিক বরাদ্দ

১০.১১৯ উল্লিখিত কার্যক্রমগুলি বাস্তবায়নের জন্য গবাদি সম্পদ খাতে ১২৩.৪৬ কোটি টাকা (চলতি মূল্যে) বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রধান কার্যক্রম খাতে বছরওয়ারী বরাদ্দ বন্টন সারণী ১০.৮-এ দেখানো হয়েছে।

সারণী ১০.৮

আর্থিক বরাদ্দ (চলতি মূল্যে)

[লাখ টাকায়]

কার্যক্রম	১৯৮০/৮১	১৯৮১/৮২	১৯৮২/৮৩	১৯৮৩/৮৪	১৯৮৪/৮৫	মোট
১। সংরক্ষণ						
(ক) নিবারণ	৭.২২	৬৬.১৯	২৯৯.২৪	৩২৪.২৫	২৩৩.২২	৯৩০.১২
(খ) চিকিৎসা	২১৯.৮	৭২.০৬	৩২০.৬৪	১৪৬৯.৪২	১৪৫২.৬৯	৩৫৩৪.৬২
২। বংশবৃদ্ধি						
(ক) হাঁস মুরগী	৩৯০.৭৭	৫৬৬.৮৬	৫০২.৪৫	২৭৯.০০	১৮৩.৫০	১৯২২.৫৮
(খ) বড় আকারের গবাদি পশু	১৫৮.১৭	৫৪৯.২৭	৭৩৪.২৮	৫০১.৬২	৫০৩.৩৫	২৪৪৬.৬৯
(গ) ছোট আকারের পশু	..	..	..	১২৫.০০	১২৮.০০	২৫৩.০০
৩। প্রশিক্ষণ ও গবেষণা	৮.৭০	২২৩.৩২	৫৮৪.৯৯	৩৯৯.০৪	২৮১.০০	১৪৯৭.০৫
৪। খড়/বিচালী/খাদ্য	১১.১২	৪৬.৫১	১৩৪.২৫	১৭৪.৬৯	১৮৩.৬৫	৫৩০.২২
৫। অন্যান্য	৪৭.২১	১৬৩.৮১	৩৯২.৭৬	৩৬০.৭৪	২৪৭.২০	১২১১.৭২
মোট :	৮৪৩.০০	১৬৮৮.০২	২৯৬৮.৬১	৩৬৩০.৭৬	৩২১২.৬১	১২৩৪৬.০০

উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা

১০·১২০ উপকরণসমূহের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য গবাদি পশু পালনকারী খামার চাষীদেরকে ঋণ দেওয়া হবে। পরিকল্পনার মেয়াদ শেষে দুধ, মাংস, ডিম ও পশুটানা শক্তির আনুমানিক উৎপাদন সারণী ১০·৯-এ দেখানো হয়েছে :

সারণী ১০·০৯

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা

বিষয়	ভিত্তিমাত্রা ১৯৭৯/৮০	লক্ষ্যমাত্রা ১৯৮৪/৮৫	ভিত্তিমাত্রার উপর বৃদ্ধি (শতকরা হার)
(১) দুধ (১০০০ টন)	১০৩৬·০০ (৩২·৫৫)	১২৫৯·৯০ (৩৫·২০)	২১·৬
(২) মাংস (১০০০ টন)	৩৩০·৩৫ (১০·৫৫)	৩৮৬·১৪ (১০·৭৯)	১৬·৯
(৩) ডিম (১০০০ টন)	৪৭·৩০ (১·৪৮)	৫০·৫৮ (১·৪১)	৬·৯
(৪) পশুর টানা শক্তি (লাখ এইচপি)	২২·০০	২৫·৩৮	১৫·৪

বিঃ দ্রঃ—বন্ধনীর মধ্যে প্রদর্শিত রাশি দৈনিক মাথা পিছু গ্রাম হিসেবে উৎপাদন বোঝায়।

কৃষি খাতে আর্থিক বরাদ্দ

১০·১২১ কৃষি খাতের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের জন্য ১৯৭৯/৮০ মূল্যে (চলতি মূল্যে ২,১৪৯ কোটি টাকা) ১,৪৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ১০·১০-ক সারণীতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উক্ত বরাদ্দের উপখাতওয়ারী বণ্টন (১৯৭৯/৮০ মূল্যে ও চলতি মূল্যে) দেখানো হয়েছে। এছাড়াও ১০·১০-খ সারণীতে ১৯৭৯/৮০ ও চলতি উভয়মূল্যে মোট বরাদ্দের বছরওয়ারী পর্যায় বিভাজন দেখানো হয়েছে।

সারণী ১০·১০-ক

উপখাতওয়ারী আর্থিক বরাদ্দ

[:কোটি টাকায়]

উপখাত	দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বরাদ্দ	
	১৯৭৯/৮০ মূল্যে	চলতি মূল্যে
ফসল	১১৩৮·৩৬	১৬৬৬·৩৮
বন	১২৯·০০	১৮৪·৮৬
মৎস্য সম্পদ	১১৯·০০	১৭৪·৩০
গবাদি সম্পদ	৮৩·৬৪	১২৩·৪৬
মোট (১৯৮০—৮৫)	১৪৭০·০০	২১৪৯·০০

সারণী ১০·১০(খ)

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বরাদ্দের বছরওয়ারী পর্যায়ভাগ

(কোটি টাকায়)

	১৯৮০/৮২	১৯৮২/৮৩	১৯৮৩/৮৪	১৯৮৪/৮৫	মোট (১৯৮০-৮৫)
১৯৭৯/৮০ মূল্যে	৫০৬	২৭১	৩১৯	৩৭৪	১৪৭০
চলতি মূল্যে	৫৯৭	৩১৩	৫০১	৬৫৮	২১৪৯

(খ) পানি সম্পদ উন্নয়ন।

১০·১২২ বাংলাদেশের কৃষি কাজ দুটি প্রচণ্ড প্রাকৃতিক ধারার মধ্যে দিয়ে চলে; একদিকে, ব্যাপক চাষের জন্য জমির অভাব ও অন্যদিকে শীতকালে পর্যাপ্ত পানির অভাব। দেশে মোট জমির পরিমাণ প্রায় ৩৫ মিলিয়ন একর; এর মধ্যে ২০ মিলিয়ন জমি আবাদযোগ্য। আবাদযোগ্য জমির মধ্যে ২১ মিলিয়ন একরেরও বেশী জমি খারিফ (বর্ষা) মৌসুমে চাষ করা হয়। ফলে এই মৌসুমে ফসলের এলাকা সম্প্রসারণের সুযোগ খুব কম থাকে। অন্যদিকে, রবি মৌসুমে (শীতকালে) মাত্র ৭ মিলিয়ন একর জমিতে চাষ হয়। ফলে ফসল আবাদের নিবিড়তা ১৫৩ মাত্রার মত একান্ত নিম্নস্তরে নেমে যায়। চাষ শুরু করার মত পতিত জমির পরিমাণও খুব একটা বেশী নয়। কাজেই দেশকে খাদ্য স্বয়ম্ভর হওয়ার জন্য যে পরিমাণ খাদ্যশস্য দরকার তা অবশ্যই ফসল চাষ আরও নিবিড় করে তুলে এবং অধিক ফলনশীল জাতের বীজ প্রবর্তনের মাধ্যমে উৎপাদন করতে হবে। অবশ্য, এ দুটিই নির্ভর করে সেচ সুবিধে সম্প্রসারণের উপর। এমনকি, বর্ষা মৌসুমেও মাঝে মাঝে প্রচণ্ড খরা হতে দেখা যায়। ঐ সময় প্রয়োজনীয় পানি সেচের ব্যবস্থা না করা গেলে ক্ষেতের ফসলের ক্ষতি অনিবার্য।

১০·১২৩ বন্যা বর্ষা মৌসুমে আর একটি বিপর্যয়কর সমস্যা। দেশের চাষযোগ্য এক তৃতীয়াংশ জমি নীচু। সেজন্য এই ধরণের জমিকে প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় নিষ্কাশন ও রক্ষামূলক ব্যবস্থা থাকা দরকার। ঐসব সমস্যা তো আছেই, তাতে আবার মাত্র ১৬ শতাংশ জমিতে পানি সেচের ব্যবস্থা আছে। তাই সেচ ও পানি সম্পদের নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির ভৌত ও কৌশলগত সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আধুনিক সেচ ব্যবস্থার আরও বৃহত্তর ভূমিকা নিশ্চিত করা যেতে পারে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে যার জন্য পানি হচ্ছে জরুরী উপকরণ। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদন কার্যক্রম বিশেষ করে খাদ্যশস্য উৎপাদন কার্যক্রমের এই বীজ-পানি-সার প্রযুক্তি ও কৌশলের ওপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। চাষীদের অধিক ফলনশীল জাতের বীজ ও রাসায়নিক সার ব্যবহার কার্যতঃ সেচের পানি পাওয়ার ওপর নির্ভর করবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এ কারণে সেচের ওপর অত্যন্ত উচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

প্রকৃত অবস্থা

১০·১২৪ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বিডব্লিউডিবি) ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) দেশের পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য দায়িত্বশীল দুটি সরকারী খাতের সংস্থা। অতি সম্প্রতিকালে চাষীরা ব্যক্তিগতভাবে কিংবা সমষ্টিগতভাবে সেচ সুবিধা গড়ে তোলার প্রত্যক্ষভাবে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। তবে মোট যে পরিমাণ জমিতে সেচ হয় তার মধ্যে ঐ চাষীদের উদ্যোগের মোট অংশ খুবই নগণ্য। ১৯৮০ সালের জুন মাসে মোট সেচের আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ ছিল ২·৫ মিলিয়ন একর (চিরাচরিত প্রথার সেচ পদ্ধতির আওতাধীন ১ মিলিয়ন একর ব্যতিরেকে) এতে বেসরকারী খাতে অংশ ১ লাখ একর মাত্র। শ্লো-লিফট পাম্প (এল, এলপি) অগভীর নলকূপ (এসটিডব্লিউ), গভীর নলকূপ (ডিটিডব্লিউ) ও হস্তচালিত নলকূপের (এইচ টি ডব্লিউ) মাধ্যমে সেচের পানি সরবরাহ বিএডিসির প্রধান কাজ। আর বিডব্লিউডিটির কাজের মধ্যে রয়েছেঃ ভূ-উপরিস্থ পানির উৎস উন্নয়নের মাধ্যমে সেচের পানি সরবরাহ, বন্যারোধ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা ইত্যাদি। চাষীদের মধ্যে সেচের সুবিধে প্রসারের জন্য আরও কয়েকটি সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠান জড়িত রয়েছে। এগুলি হচ্ছেঃ কৃষি ব্যাংক ও সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম। বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট হয়েছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য

১০·১২৫ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে পানি সম্পদ খাতে অর্জিত সাফল্যের বিবরণ সংক্ষেপে বড় প্রতিষ্ঠানগুলির খাতে নিম্নে আলোচিত হলো।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

১০·১২৬ **বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ঃ** প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বিডব্লিউডিবি ২১·৪০ লাখ একর জমিতে বন্যারোধ ও নিষ্কাশন সুবিধে এবং ১৯৭৭/৭৮ সাল নাগাদ অতিরিক্ত ১·১৯ লাখ একরে পানি সেচ সুবিধে দেওয়ার পরিকল্পনা নেয়। তবে সে তুলনায় প্রকৃতপক্ষে ১৫ লাখ একর জমিতে বন্যরোধ ও নিষ্কাশন সুবিধের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। অন্যদিকে মাত্র ৩৮ হাজার একর জমিতে সেচ সুবিধে দেওয়া হয়। ১৯৭৮ সালের জুন নাগাদ সবশুদ্ধ মোট ৪৫ লাখ একর জমিতে বন্যারোধ ও নিষ্কাশন সুবিধে দেওয়া হয়, যদিও লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫১·৪০ একর জমি। অনুরূপভাবে একই মেয়াদে সবশুদ্ধ মোট ১·৩০ লাখ একর জমিতে সেচ সুবিধে দেওয়া সম্ভব হয়, লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২·৪১ লাখ একর (সারণী ১০·১১)। কয়েকটি সমাপ্ত প্রকল্পের আওতা এলাকা বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়।

১০·১২৭ **বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা ঃ** সেচ খাতে বিনিয়োগের দ্রুত সুফল পাওয়ার জন্য প্রথম পরিকল্পনায় লো-লিফট পাম্প, অগভীর নলকূপ ও গভীর নলকূপ দ্বারা সেচের মত ছোট আকারের ও দ্রুত ফলদায়ক সেচ কার্যক্রমের ওপর জোর দেওয়া হয়। লো-লিফট পাম্প, অগভীর নলকূপ ও গভীর নলকূপ দ্বারা পানি সেচ এলাকা বেশ অনেকখানি বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা করা হলেও প্রকৃত সাফল্য লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে (সারণী ১০·১১) কম। বিএডিসির সেচ কার্যক্রমের পর্যালোচনা নীচে দেওয়া হলো ঃ

১০·১২৭·১ **লো-লিফট পাম্প ঃ** ১৯৭৮ সালের জুন মাস নাগাদ ৪৫,০০০ লো-লিফট পাম্প জমিতে চালু করে সর্বশোট সেচ এলাকা ২২·৫০ লাখ একর করার লক্ষ্যমাত্রা ছিল। অথচ এর তুলনায় প্রকৃতপক্ষে ৩৬,৭৩০টি লো-লিফট পাম্প চালু করা এবং ১৩·৫৫ লাখ একর জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হয়। অবশ্য, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রারম্ভে যে অতিরিক্ত সেচ সুবিধে অর্জিত হয়েছিল তা হচ্ছে ১২·০০ লাখ একরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৩·০৫ লাখ একর।

সারণী ১০.১১

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার ভৌত লক্ষ্য ও সাফল্য

সারণী ১০·১১

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে লক্ষ্য ও সাফল্য

[আয়তন লাখ একরে]

সংস্থা/কার্যক্রম	ভিত্তিমাত্রা আউতা ১৯৭৩, জুন (সর্বমোট)	প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩—৭৮)				লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের শতকরা হার	দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮—৮০)			১৯৮০ জুনে মোট আউতা (১১=৬+৯)
		লক্ষ্যমাত্রা		সাফল্য			লক্ষ্যমাত্রা (অতিরিক্ত)	সাফল্য (অতিরিক্ত)	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের শতকরা হার	
		অতিরিক্ত	সর্বমোট	অতিরিক্ত	সর্বমোট					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ক) বিডব্লিউডিবি :										
(১) বন্যরোধ ও নিষ্কাশন	৩০·০০	২১·৪০	৫১·৪০	১৫·০০	৪৫·০০	৭০	৭·০০	২·৯০	৪১	৪৭·৯০
(২) পানি গেজ	১·২২	১·১৯	২·৪১	০·৩৮	১·৬০	৩২	০·৮০	০·৪৭	৫৯	২·০৭
খ) বিএডিসি :										
(১) লো-লিফট পাম্প	১৮·৫০ (৩০,০০০)	১২·০০ (১৫,০০০)	২২·৫০ (৪৫,০০০)	৩·০৫ (৬,৭৩০)	১৩·৫৫ (৩৬,৭৩০)	৪৫ ২৫	৪·৪৫ (৮,২৭০)	০·৮৫ (১,৯৭০)	১৯ —	১৪ ৪০ (৩৮,৬০০)
(২) অগভীর নলকূপ	০·১৬ (২,০০০)	২·০৯ (১৩,০০০)	২·২৫ (১৫,০০০)	০·৪৩ (৪,৬০১)	০·৫৯ (৬,৬০১)	২১	১·৪১ (১৩,৩৯৯)	০·৮১ (৫,০৯৯)	৫৭	১·৪০ (১১,৭০০)
(৩) গভীর নলকূপ	১·২৫ (২,৯০০)	১০·১৯ (১৬,১০০)	১১·৪৪ (১৯,০০০)	২·১০ (৪,৫৭০)	৩·৩৫ (৭,৪৭০)	২১	২·৭০ (৩,৫৩০)	২·৫৩ (২,৩২৫)	৯৪	৫·৮৮ (৯,৭৯৫)
(৪) হস্তচালিত নলকূপ	—	—	—	—	—	—	০·৭০ (১৪০·০০০)	০·০৬ (২০,০০০)	৯	০·০৬ (২০,০০০)
উপমোট (খ)	১১·৯১	২৪ ২৮	৩৬·১৯	৫·৫৮	১৭·৪৯	২৩	৯·২৬	৪·২৫	৪৬	২১·৭৪

(গ) বেসরকারী খাত (সেচ) :										
(১) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক অগভীর নলকূপ	—	১·৫০ (১৫,০০০)	১·৫০ (১৫·০০০)	০·৪১ (৬,০১২)	০·৪১ (৬,০১২)	২৭	১·০৯ (৮,৯৮৮)	০·৩৯ (৫,৭৪৮)	৩৬	০·৮০ (১১,৭৬০)
(২) আইআরডিপি হস্তচালিত নলকূপ		০·২৮ (৬০,০০০)	০·২৮ (৬০,০০০)	০·২৫ (৬০·০০০)	০·২৫ (৬০,০০০)	৮৯	০·২৩ (৬০,০০০)	০ ৮৩ (৩০,০০০)	১৫	০·২৮ (৯০,০০০)
(৩) প্রচলিত	১০·০০	—	১০·০০	(—)৯.০০	৯·০০	—	১·০০	১·০০	১·০০	১০·০০
উপ-মোট(গ) :	১০·০০	১·৭৮	১১·৭৮	(—)০·৩৪	৯·৬৬	২১	২·৩২	১·৪২	৬১	১১·০৮
মোট : পানি সেচ [ক(২)+খ+গ]	২৩·১৩	২৭·২৫	৫০·৩৮	৫·৬২	২৮·৭৫	২১	১২·৩৮	৬·১৪	৫০	৩৪·৮৯

দ্রষ্টব্য : বন্ধনীতে প্রদর্শিত রাশি সরঞ্জাম-এর (যন্ত্রের) সংখ্যা।

১০·১২৭·২ **অগভীর নলকূপঃ** ১৯৭৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত ২,০০০ অগভীর নলকূপ বসানো হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বিএডিসির এ ছাড়াও ১৩ হাজার অগভীর নলকূপ বসানোর কার্যক্রম গ্রহণ করে। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে অগ্রগতি ছিল অত্যন্ত মন্থর। এই পরিকল্পনা মেয়াদের শেষ নাগাদ মোট চালু অগভীর নলকূপের সংখ্যা ছিল মাত্র প্রায় ৬,৬০০ এবং এগুলির পানি সেচ এলাকার পরিমাণ ০·৫৯ লাখ একর। প্রথম পরিকল্পনা মেয়াদে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রায় ৬০০০ অগভীর নলকূপ স্থাপন করে যেগুলির পানি সেচ এলাকার পরিমাণ ০·৪১ লাখ একর। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ১৫,০০০ অগভীর নলকূপ বসানোর কর্মসূচী ছিল।

১০·১২৭·৩ **গভীর নলকূপঃ** ১৯৬৭/৬৮ মেয়াদে গভীর নলকূপ স্থাপন শুরু হওয়ার পর থেকে ১৯৭৩ সালের জুন মাস অবধি সময়ে বিএডিসি মোট ২,৯০০ গভীর নলকূপ স্থাপন করেছে। প্রথম পরিকল্পনাকালে ১৯,০০০টি গভীর নলকূপ বসানোর লক্ষ্যমাত্রা ছিল। অবশ্য, আসলে মাত্র ৭,৪৭০টি গভীর নলকূপ চালু করা হয় যেগুলির সেচ এলাকার মোট পরিমাণ ৩·৩৫ লাখ একর যদিও সর্বমোট সেচ এলাকার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১১·৪৪ লাখ একর, ১০·১৯ লাখ একর নতুন এলাকার সেচ সুবিধে দেওয়ার লক্ষ্য-মাত্রার স্থলে মাত্র ২·১০ লাখ একর নতুন এলাকায় সেচ দেওয়া সম্ভব হয়।

আর্থিক সাফল্যের বিবরণ

১০·১২৮ প্রথম পরিকল্পনায় এই খাতে ৫৭৮ কোটি টাকা বিনিয়োগ ধরা হয়েছিল। বিডব্লিউডিবি ও বিএডিসি নামক সরকারী খাতের দুটি প্রধান সংস্থাকে যথাক্রমে ৩২১ কোটি ও ২৫৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। পরিকল্পনাকালে চলতি মূল্যে বিডব্লিউডিবি ও বিএডিসির প্রকৃত ব্যয় ছিল যথাক্রমে ২৪৪ কোটি টাকা ও ২৮১ কোটি টাকা। এই মেয়াদে মুদ্রাস্ফীতির হার বিবেচনায়, প্রকৃত অর্থে ব্যয়ের ঘাটতির পরিমাণ ৫০ শতাংশের মত।

দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা

১০·১২৯ দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ নাগাদ ১৯৭৯/৮০ মেয়াদে সর্বমোট ৪৭·৯০ লাখ একর জমি বন্যারোধ ও নিষ্কাশন কাজের আওতায় আনা হয়েছে; এর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫২ লাখ একর পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ৪১·১৩ লাখ একরের তুলনায় ১৯৭৯/৮০ সালে মোট ৩৪·৮৯ লাখ একর জমিকে সেচ সুবিধের আওতায় আনা হয়েছে।

১০·১৩০ পানি সম্পদ খাতে মূল বরাদ্দ ৩২৫ কোটি টাকা (বিডব্লিউডিবি ২৪৫ কোটি টাকা; বিএডিসি ২১৯ কোটি টাকা ও অন্যান্য ৫ কোটি টাকা) থেকে একই খাতে আর্থিক বরাদ্দ ৪৬৯ কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে।

১০·১৩১ সারণী ১০·১১-তে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনাকালে গৃহীত বিভিন্ন পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত সাফল্য দেখানো হয়েছে।

পানি সম্পদের সম্ভাবনা

১০·১৩২ **ভূ-উপরিভাগের পানি সম্পদঃ** বন্যা ও খরা-দেশ এই দৈবত সমস্যায় আক্রান্ত। বর্ষা মৌসুমে নদীগুলি দিয়ে মোট প্রায় পাঁচ মিলিয়ন কিউসেক পানি প্রবাহিত হয়। অথচ খরা মৌসুমে তা কমে মাত্র সিকি মিলিয়ন কিউসেকে নেমে আসে। নদীগুলিতে বার্ষিক মোট প্রবাহ হ্রাসের পরিমাণ প্রায় ১১০০ মিলিয়ন একর ফুট। নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত ছয়মাস দেশে পানির সরবরাহ একান্ত অপর্যাপ্ত থাকে। দেশের বিভিন্ন বৃষ্টিপাতেও অত্যন্ত তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। ৮০ শতাংশেরও বেশী বৃষ্টিপাত ঘটে মে থেকে অক্টোবরের মধ্যে। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার তখন নদীর পানি প্রবাহ ও বৃষ্টিপাত থেকে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির সরবরাহ যখন সবচেয়ে কম থাকে সেই সময়ই পানির চাহিদা সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছায়।

১০·১৩৩ কয়েকটি সমীক্ষায় দেখা যায়, বর্তমানে ভূ-পৃষ্ঠস্থ উৎস থেকে যে পরিমাণ পাওয়া যায় তা দিয়ে দুই কিউসেক ক্ষমতার ৫২,০০০ লো-লিফট পাম্পের চাহিদা পূরণ হতে পারে।

ভূগর্ভস্থ পানি

১০·১৩৪ বিশেষ করে দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে নলকূপযোগে সেচের জন্য ভূগর্ভস্থ পানি পাওয়া যায়। নলকূপ বসানোর জন্য উপযুক্ত স্তর সাধারণতঃ দেশের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম নীচুতেই পাওয়া যায়।

১০·১৩৫ সারাদেশে ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদের প্রাপ্যতা সংক্রান্ত পরিস্থিতি এবং তা আহরণের জন্য কত সংখ্যক যন্ত্র বসানো সম্ভব তা এখনও সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের সামগ্রিক ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদ সম্ভাবনা সম্পর্কে কয়েকটি জরীপ ও অনুসন্ধানের কাজ হাতে নিয়েছে। বিএডিসিও দেশের ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদের সম্ভাবনা সংক্রান্ত সমীক্ষায় নিয়োজিত রয়েছে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদের ওপর প্রকল্পভিত্তিক কয়েকটি নিবিড় সমীক্ষার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সমীক্ষাগুলি থেকে ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদ সম্পর্কে আরও তথ্যসহ, খননযোগ্য গভীর ও অগভীর নলকূপের সংখ্যা, ক্ষমতা ও সম্ভাব্য আঞ্চলিক বণ্টন সম্পর্কেও জানা যাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। অবশ্য, আরও পর্যাপ্ত ও বিস্তারিত উপাত্ত যতদিন না পাওয়া যায় ততদিন ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদ উন্নয়নের বিষয়টি নিরাপত্তামূলক ব্যবধান বজায় রেখে ও সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণসহকারে অগ্রসর হওয়া উচিত যাতে এই বিষয়টি সুনিশ্চিত করা যায় যে, ভূগর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত ব্যবহার করার কারণে পানীয় জল, নৌ-পরিবহন ও মৎস্য চাষ ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। গভীর নলকূপগুলির প্রভাবাধীন এলাকার মধ্যে অবস্থিত সেচ ও পানীয় জলের জন্য বসানো হস্তচালিত টিউবওয়েল ও অগভীর নলকূপগুলি অচল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাছাড়া গভীর নলকূপগুলি প্রয়োজনীয় বাধধান রক্ষা না করে বসানো হলে সংশ্লিষ্ট এলাকার পুকুর, দীঘি, খাল, ছোট স্রোতস্বিনীতে তার প্রভাব পড়তে পারে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ

১০·১৩৬ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য কৃষি উৎপাদন, বিশেষ করে দানাজাতীয় খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা ১৯৭৯/৮০ সালের ভিত্তিস্তর ১০·৪ মিলিয়ন থেকে পরিকল্পনা মেয়াদের শেষ নাগাদ খাদ্যের উৎপাদন কমপক্ষে ১৭·৫ মিলিয়ন টন বৃদ্ধি করাই একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য।

১০·১৩৭ চাষবাদরীতি ও উৎপাদনশীলতায় দ্রুত পরিবর্তন আনার জন্য পানি সম্পদ উন্নয়ন, বিশেষ করে পানি সেচ, নিষ্কাশন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণই হবে প্রধান উপায়। খাদ্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তার জন্য পরিকল্পনা মেয়াদের পানি সম্পদ উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলি হচ্ছেঃ

(১) কমপক্ষে ১৭·৫ মিলিয়ন টন অবধি খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত সেচ নিষ্কাশন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা;

(২) বিভিন্ন ফসল চাষে উপযুক্ত বৈচিত্র এনে সম্ভাব্য সর্বাধিক ফসলের আবাদে সহায়তা করা;

(৩) দেশে ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদের ওপর যেসব জরীপ ও সমীক্ষা চলছে সেগুলির কাজ সম্পূর্ণ করা যাতে ঐ সম্পদের বিভিন্ন উৎস থেকে সেচের জন্য ও আরও বেশী এলাকার জন্য মোট কতটুকু পানি পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে আরও সঠিক তথ্য পাওয়া যায়;

(৪) পানি সম্পদের ওপর জরীপ, অনুসন্ধান ও সমীক্ষা অব্যাহত রাখা যাতে পানি সম্পদ উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত উপাত্ত ও তথ্য নিরবচ্ছিন্ন ভিত্তিতে সংরক্ষণ করা যায়;

(৫) উপকূল এলাকাগুলিকে লোনা পানির প্লাবন থেকে রক্ষা করা এবং বন্যা দুর্গত এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা;

(৬) দেশের সকল স্থানে পানি সম্পদের উন্নয়ন যাতে সকল অঞ্চলের সুষম উন্নতি ঘটে। অন্য কোন রকম প্রাকৃতিক অন্তরায় না থাকলে দেশের প্রতিটি অঞ্চলের আবাদযোগ্য এলাকার কমপক্ষে ২০ শতাংশ এলাকায় সেচ সুবিধে দেওয়ার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা

১০·১৩৮ খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৯/৮০ সালের ৩৪·৮৯ লাখ একরে সেচ ও ৪৭·৯০ লাখ একরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধের স্তরের তুলনায় ১৯৮৫ সালের জুন মাস নাগাদ কমপক্ষে ৭২ লাখ একর জমিতে সেচ সুবিধের সম্প্রসারণ এবং ৬৪·৭০ লাখ একর এলাকায়

বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সারণী ১০·১২-এ দ্বিতীয় পরিকল্পনা মেয়াদে সেচ নিষ্কাশন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের সূত্র ও লক্ষ্য প্রদর্শিত হয়েছে:

সারণী ১০·১২

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ কার্যক্রম

(আয়তন লাখ একরে)

ক্রমিক নং	সংস্থা/প্রতিষ্ঠান	জুন, ১৯৮০ প্রকৃত		দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা			
		যে কয়টি চালু	আয়তন	অতিরিক্ত		সর্বমোট	
				সংখ্যা	এলাকা	সংখ্যা	এলাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
(ক)	বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন বিডব্লিউডিবি	..	৪৭·৯০	..	১৬·৮০	..	৬৪·৭০
(খ)	পানি সেচ						
	(১) ভূনিম্নস্থ প্রবাহ বিডব্লিউডিবি	..	২·০৭	..	২·৯৩	..	৫·০০
	(২) লো-লিফট পাম্প	৩৮,৬০০	১৪·৪০	২১,৪০০	৩.৬০	৬০,০০০	১৮·০০
	—বিএডিসি	..	—	..	..	..	..
	১—কিউসেক	..	..	২৪,০০০	..	৩০,০০০	৬·০০
	২—কিউসেক	..	..	(—)২,৬০০	..	৩০,০০০	১২·০০
	(৩) অগভীর নলকূপ			..	..	..	..
	—বিএডিসি	২৩,৪৬০	২·২০	২২৬,৫৪০	২৯·০৫	২৫০,০০০	৩১·২৫
	—বিকেবি	১১,৭০০	১·৪০	১৭১,৩০০	২১·৪৭	১৮০,০০০	২২·৮৭
	—বিধি	১১,৭৬০	০·৮০	২৮,২৪০	৪·২০	৪০,০০০	৫·০০
	(৪) গভীর নলকূপ	..	..	২৭,০০০	৩·৩৮	২৭,০০০	৩·৩৮
	—বিএডিসি	৯,৭৯৫	৫·৮৮	৮,২০৫	৩·১২	১৮,০০০	৯·০০
	(৫) হস্তচালিত নলকূপ	১১০,০০০	০·৩৪	৩৪০,০০০	১·০১	৪৫০,০০০	১·৩৫
	বিএডিসি	২০,০০০	০·০৬	১৬০,০০০	০·৪৮	১৮০,০০০	০·৫৪
	—আইআরডিপি	৯০,০০০	০·২৮	১৮০,০০০	০·৫৩	২৭০,০০০	০·৮১
	(৬) প্রচলিত	..	১০·০০	..	২·৫০	..	৭·৫০
একসি এণ্ড ডিব্ল		..	৪৭·৯০	..	১৬·৮০	..	৬৪·৭০
আওতায় মোট আয়তন							
সেচের আওতায় মোট আয়তন		..	৩৪·৮০	..	৩৭·২১	..	৭২·১০

লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কৌশল

১০·১০৯ **স্বল্পমেয়াদী কৌশল:** পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নিম্নবর্ণিত স্বল্প-মেয়াদী কৌশল অনুসৃত হবে:

(১) পানি সম্পদের বর্তমান উৎসগুলি থেকে সর্বাধিক সুবিধে লাভের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাদির মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রকল্পের সংখ্যা এবং সেগুলির পরিচালনাগত ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে। বর্তমান ক্ষমতার বেশ কিছু অংশ অব্যবহৃত রয়েছে বলে প্রতিটি সেচ ব্যবস্থার আওতাধীন এলাকা বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পিত প্রয়াস চালানো হবে;

(২) সম্ভাব্য কম সময়ে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করার জন্য বাস্তবায়িত হতে কম সময় লাগে, দ্রুত ফল দেয় এবং অপেক্ষাকৃত লাভজনক প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের জন্য হাতে নেওয়া হবে। এ উদ্দেশ্যে লো-লিফট পাম্প, অগভীর নলকূপ, গভীর নলকূপ, হস্তচালিত নলকূপ, ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা, বন্যারোধ ও নিষ্কাশন প্রকল্পগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে;

(৩) বড় আকারের বিভক্ত করার উপযোগী প্রকল্পগুলির স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিটগুলি চিহ্নিত করা হবে এবং পর্যায়ক্রমে সেগুলি বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হবে। একইভাবে বড় বড় প্রকল্পগুলির বিভিন্ন পর্যায়কে অপেক্ষাকৃত পূর্বাহ্নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চিহ্নিত করা হবে যদিও গোটা প্রকল্প হয়ত পরিকল্পনা মেয়াদে সম্পূর্ণ করা যাবে না; এবং

(৪) সেচের পানির উপযুক্ত মূল্য নিরূপণ করা হবে। সাধারণতঃ বড় বড় প্রকল্পগুলিতেই ছোট ছোট প্রকল্পগুলির চেয়ে বেশী ভর্তুকী দেওয়া হয়। ক্রমান্বয়ে ভর্তুকী হ্রাস সরকারের অন্যতম নীতি। সেচের পানির একরকম ও বিচক্ষণসুলভ মূল্য নির্ধারণ করা না হলে এই মূল্যবান উপকরণের যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে না। এজন্য সরকারের নীতি লো-লিফট পাম্প ও গভীর নলকূপের ভাড়ার হার এবং অগভীর নলকূপ ও হস্তচালিত নলকূপের মূল্য ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে সেচের পানির ওপর ভর্তুকী হ্রাস। লো-লিফট পাম্প ও গভীর নলকূপ ও প্রথম দিকে ব্যবহারকারীদের কাছে ভর্তুকী মূল্যে বিক্রি করা হবে। পরে মূল্য বাড়িয়ে ক্রমান্বয়ে ভর্তুকীর হার হ্রাস করা হবে। Gravity সেচের নিমিত্ত পানির মূল্যও বর্ধিত করা হবে।

দীর্ঘমেয়াদী কৌশল

পরিকল্পনা মেয়াদে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রকল্পগুলির ব্যাপারে জোর দেওয়াই হবে পানি সম্পদ উন্নয়নের কৌশল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের পানি সম্পদ উন্নয়ন সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান মূলতঃ ভূপৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদের অব্যবহিকাভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের মাঝে নিহিত রয়েছে। এজন্য, অনুসন্ধান, জরীপ ও সমীক্ষা চলতে থাকবে যাতে বর্তমান ও পরবর্তী পরিকল্পনা মেয়াদে পানি সম্পদের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের এক সুষম কার্যক্রম বাস্তবায়িত হতে পারে। পরিকল্পনাকালের মধ্যে একটি জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ হাতে নেওয়া হবে। তিস্তা প্রকল্পের মত দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পের কাজ অব্যাহত থাকবে। অন্যদিকে অন্যান্য বড় নদীর বাঁধ প্রকল্পগুলি সেচ ও বন্যারোধের লক্ষ্যে ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেওয়া হবে। কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প, মনু নদী প্রকল্প ইত্যাদির বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলির মত মাঝারি ধরণের উপ-অববাহিকাভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প দ্বিতীয় পরিকল্পনা আমলে সম্পূর্ণ করা হবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যক্রম

১০·১৪১ পরিকল্পনা মেয়াদে ভৌত কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেওয়া হবে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্ন অনুচ্ছেদগুলিতে প্রদত্ত হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বিডব্লিউডিবি)

১০·১৪২ বিডব্লিউডিবি পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ৭২ লাখ একরের মধ্যে ৫·০০ লাখ একরে সেচের ব্যবস্থা করবে। এর অর্থ বিপিডব্লিউডিবিকে তার সেচের ক্ষেত্রে মোট অংশ ১৯৭৯/৮০ সালের ২·০৭ লাখ একর থেকে বাড়িয়ে ১৯৮০/৮৫ সালে ৫·০০ লাখ একর করতে হবে। এছাড়াও বিডব্লিউডিবি সর্বমোট ৬৪·৭০ লাখ একর অথবা অতিরিক্ত ১৬·৮০ লাখ একরে বন্যারোধ ও নিষ্কাশন সুবিধের ব্যবস্থা করবে।

১০·১৪৩ বিডব্লিউডিবির প্রধান কার্যক্রম/প্রকল্পগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

সারণী ১০·১৩

সেচ কার্যক্রম	১৯৮৪/৮৫ সালের উপকৃত এলাকা ('০০০' একর)
১। বরিশাল সেচ প্রকল্প ১ম পর্যায়	৮০
২। বরিশাল সেচ প্রকল্প ২য় পর্যায়	৩০
৩। কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প	৩০
৪। মনু নদী প্রকল্প	২০
৫। বরিশাল-পটুয়াখালী সেচ প্রকল্প	১০
৬। উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলির ডিডব্লিউবি, এল এলপি	৬১
৭। জিকে ১ম পর্যায়	৯০
৮। জিকে ২য় পর্যায়	৮০
৯। ডিএকসি-২	৯
১০। ডিএনডি প্রকল্প	১০
১১। বুড়ি-তিস্তা প্রকল্প	১০
১২। চাঁদপুর সেচ প্রকল্প	৭০
মোট	৫০০

১০·১৪৪ ১৯৭৯/৮০ সালে সারা দেশে স্থানীয় লোকদের নিয়ে স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে খাল খনন ও পুনঃখননের একটা কার্যক্রমের সূত্রপাত করা হয়। প্রায় ৬৭৫ মাইল খাল খনন ও পুনঃখনন করা হয়। অবশ্য, এই প্রকল্পগুলির প্রকৌশলিক পরিকল্পনা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনেক খালই শীঘ্র শুকিয়ে যায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এই খাল খনন কার্যক্রম চলতে থাকবে তবে তা হবে অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রকৌশলিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে। তাছাড়া খাল খনন প্রকল্পগুলিকে স্থানীয় পরিকল্পনার সঙ্গে সুসমন্বিত করা হবে। স্থায়ী পানি প্রবাহ নেই এমন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট খালে নিকটবর্তী নদী থেকে পাম্প করে পানি তোলা হবে। চাষীরা লো-লিফট পাম্প ব্যবহার করে অথবা বালতি বা অন্য কোন উপায় উঠিয়ে এইসব খালের পানি ব্যবহার করবে। স্থানীয় লোকদের উদ্যোগে স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে যেসব খাল খনন করা হবে তার মাধ্যমে বিস্তীর্ণ আবাদী জমি সেচের আওতায় আসবে বলে আশা করা যায়।

১০·১৪৫ রেগুলেটর, স্লুইস গেট ইত্যাদি হচ্ছে পানি নিয়ন্ত্রণের নানা কাঠামো, এইসব খালে ও সেই সঙ্গে উপযুক্ত স্থানসমূহে বর্তমান খালগুলিতেও এইসব কাঠামো স্থাপন করা হবে। এই কাঠামোগুলি নির্মাণ বা স্থাপনের ফলে সেচ নিষ্কাশন ও বন্যারোধের জন্য পানি সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের সুযোগ-সুবিধে সৃষ্টি হবে। এজন্য, পানির প্রাপ্যতা, সেচ এলাকা, সেচ পদ্ধতি ও অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়গুলি বিবেচনাক্রমে পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। পরিকল্পনা প্রণয়ন ও এসব কাঠামো নির্মাণকালে বিভিন্ন জেলা ও মহকুমার মধ্যে ন্যায্য বণ্টনের বিষয়টিও বিবেচনা করতে হবে।

১০·১৪৬ দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বিডব্লিউডিবির অন্যান্য কার্যক্রমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের চালু প্রকল্পসমূহ, নদীর ভাঙ্গনরোধক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী, পানিতাত্ত্বিক/হাইড্রোগ্রাফিক ও অন্যান্য জরীপ, উপাত্ত সংগ্রহ ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা (বিএডিসি)

১০·১৪৭ ১৯৭৯/৮০ মেয়াদের স্তর ২১·৭৪ লাখ একর থেকে সেচ কাজে বিএডিসি এর নিজ অংশকে ১৯৮৪/৮৫ মেয়াদে ৫০·৪১ লাখ একরে বৃদ্ধি করতে হবে। বিএডিসির প্রায় ৪৫ শতাংশ সেচ লক্ষ্যমাত্রা অগভীর নলকূপ, ১৮ শতাংশ গভীর নলকূপ এবং ৩৬ শতাংশ লো-লিফট পাম্পের মাধ্যমে অর্জিত হবে। হস্তচালিত নলকূপ দ্বারা সেচের পরিমাণও যথেষ্ট বাড়বে।

১০·১৪৭·১ **অগভীর নলকূপঃ** ভূপৃষ্ঠ থেকে অল্প নীচেই পানি পাওয়া যায়, তুলনামূলকভাবে ইউনিট ব্যয় কম, সহজ খনন পদ্ধতি, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রযুক্তির কারণে অগভীর নলকূপের সাহায্যে পানি সেচের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। সেচের আওতা এলাকা তুলনামূলকভাবে অনেক কম আর গুটিকয়েক পরিবার একটি অগভীর নলকূপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে বলে গভীর নলকূপের চেয়ে অগভীর নলকূপ সেচ ব্যবস্থায় সমস্যা অপেক্ষাকৃত কম। ১৯৮৪/৮৫ সাল নাগাদ মোট ২,৫০,০০০ অগভীর নলকূপ চালু করার পরিকল্পনা আছে। এর মধ্যে বিএডিসি ১,৮৩,০০০, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ৪০,০০০ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি প্রকল্পের আওতায় ২৭,০০০ অগভীর নলকূপ বেসরকারী খাতে খনন করা হবে।

১০·১৪৭·২ **লো-লিফট পাম্পঃ** ভূপৃষ্ঠ থেকে ৯০,০০০ কিউসেক পানি পাওয়ার নিমিত্ত এক কিউসেক-এর ৩০০০০ ও দুই কিউসেকের ৩০ হাজার মোট ৬০ হাজার লো-লিফট পাম্প ১৮ লাখ একর জমিতে পানি সেচের জন্য ১৯৮৪/৮৫ সাল নাগাদ চালু হবে। এ তুলনায় ১৯৭৯/৮০ সালে ৩৮,৬০০ লো-লিফট পাম্প চালু ছিল। এ থেকে দেখা যায়, অতিরিক্ত প্রায় ২১,৪০০ লো-লিফট পাম্প চালু হবে এবং অতিরিক্ত ৩·৬০ লাখ একর জমি সেচের আওতায় আসবে।

১০·১৪৭·৩ **গভীর নলকূপঃ** যেসব এলাকায় ভূপৃষ্ঠে কোন পর্যাপ্ত পানির উৎস নেই আবার অগভীর নলকূপ বা হাতে চালানো নলকূপ বসানোর জন্য উপযোগী পানির স্তরও মেলে না সেসব এলাকার জন্য গভীর নলকূপের সেচ একান্ত জরুরী। অন্যদিকে গভীর নলকূপ সেসব এলাকাতেই ফলদায়ক হতে পারে যেসব জায়গায় পানি সংরক্ষণের জন্য বড় রকমের জলাধারের সুবিধে আছে এবং পানির স্তরের ভাল সান্দ্রতার কারণে সহজে পানির ঘাটতি পূরণ হয় এমন স্তর আছে। ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদের সম্ভাবনা সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত পর্যাপ্ত ও বিস্তারিত উপাত্ত পাওয়া যায় না। ১৯৭৯/৮০ সালের ৯,৭৯৫টি গভীর নলকূপের তুলনায় ন্যূনতম ১৮,০০০ গভীর নলকূপ বসানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর ফলে, ১৯৭৯/৮০ সালের ৫·৮৮ লাখ একরের তুলনায় ১·০০ লাখ একরে জমি সেচ সম্ভব হবে।

১০·১৪৭·৪ সেচ সংক্রান্ত সকল যন্ত্রপাতির দৈনিক পরিচালন মেয়াদ তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাড়ানোর জন্য চেষ্টা চলবে এবং ঐ প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সময়মত প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সেবা সরবরাহও নিশ্চিত করা হবে।

১০·১৪৭·৫ **হস্তচালিত নলকূপঃ** হস্তচালিত নলকূপের সাহায্যে সেচ সম্প্রতিকালে প্রবর্তিত হয়েছে। এর স্বল্প দাম সহজ প্রযুক্তি ও সহজ পরিচালনার গুণের জন্য এই পানি সেচ পদ্ধতি জনসাধারণের মধ্যে বিপুল আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। সর্বোপরি, হস্তচালিত নলকূপ পরিচালনায় কোন সাংগঠনিক সমস্যা নেই। বিএডিসির আওতায় ১৯৮৪/৮৫ সালে ০·৫৪ লাখ একর জমিতে পানি সেচের জন্য ১,৮০,০০০ হস্তচালিত নলকূপ চালু করা হবে বলে ধরা হয়েছে। বেসরকারী পর্যায়ে আরও ২,৭০,০০০ অগভীর নলকূপ বসানো হবে।

বেসরকারী খাত

১০·১৪৮ বেসরকারী খাত পানি সম্পদ উন্নয়নে পরিকল্পনা মেয়াদে অতীতের চেয়ে বৃহত্তর ভূমিকা পালন করবে। এখন সরকারী সংস্থাগুলি সংগ্রহ, বিতরণ, স্থাপন, মেরামত, ধার ইত্যাদির আকারে উপকরণ ও সেবা সরবরাহ করে থাকে। অবশ্য এই সেবামূলক কাজগুলি পরিকল্পনা মেয়াদে ক্রমান্বয়ে বেসরকারী খাতে স্থানান্তরিত করা হবে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংক ও সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী-এর সাহায্যে বেসরকারী খাতে ৬৭,০০০ অগভীর নলকূপ ও ২,৭০,০০০ হস্তচালিত নলকূপ বসানোর কর্মসূচী আছে। এছাড়াও ১৯৮৪/৮৫ নাগাদ প্রচলিত পদ্ধতির মাধ্যমে ৭·৫০ লাখ একর জমিতে সেচ সুবিধে দেওয়া হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

আর্থিক কার্যক্রম

১০·১৪৯ পরিকল্পনা মেয়াদে পানি সম্পদ খাতে ১,৮৫০ কোটি টাকা (১৯৭৯/৮০ মূল্যে) বরাদ্দ করা হয়েছে (সারণী ১০·১৪)। পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য দায়িত্বশীল দুটি সংস্থার মধ্যে বিএডিসির সেচ কার্যক্রমের জন্য ৭৭৫ কোটি টাকা প্রয়োজন। সারণী ১০·১৪-এ কার্যক্রমভিত্তিক সেচ ব্যয় দ্রষ্টব্য। বিডব্লিউডিবির কার্যক্রম/প্রকল্পগুলি বাস্তবায়ন করার জন্য ১,০৪১ কোটি টাকার বরাদ্দ রয়েছে।

১০·১৫০ এছাড়াও ভর্তুকী হিসাবে বেসরকারী খাত কার্যক্রমের জন্য ১১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

উন্নয়ন বিষয়াবলী

১০·১৫১ **সেচ সুবিধের আওতাঃ** সেচের বিভিন্ন যন্ত্র তথা সরঞ্জামের ইউনিট প্রতি সেচ আওতা ও সুবিধে পরিকল্পনা মেয়াদের শেষ নাগাদ সেচের সামগ্রিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেসব সমীক্ষা চালানো হয়েছে তাতে দেখা যায়, সেচ সুবিধেগুলির সদ্ব্যবহারে ঘাটতি অর্থাৎ প্রতিটি সেচ সুবিধে ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে যে এলাকার জন্য পানি সেচের যে সুবিধে দিচ্ছে তা থেকে ঐ ব্যবস্থার উৎপাদন পর্যায়ে নির্ধারিত ক্ষমতার চেয়ে অনেক কম। অনুপযুক্ত জায়গায় পাম্প বা নলকূপগুলি বসানো হলে দৈনিক সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ঘন্টা থেকে কম সময়ের জন্য ঐ যান্ত্রিক ব্যবস্থা চলানো, যে পরিবার বা গোষ্ঠী সদস্যরূপে ঐ সেচ ব্যবস্থা স্থাপন করেছেন তাদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ সংঘাত, চুইয়ে পরা পানির অপচয়, অপেক্ষাকৃত অনুপযুক্ত পানি ব্যবস্থাপনা, উপকরণ ও সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে অনিয়ম ইত্যাদির বিষয়গুলির জন্যই ক্ষমতার পুরোপুরি ব্যবহার হয় না। অবশ্য, উল্লিখিত বিষয়গুলির উৎকর্ষসাধনপূর্বক সামান্য অতিরিক্ত ব্যয় করে সেচের আওতার তাৎপর্যপূর্ণ সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। সকল বিষয় বিবেচনার পর দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ নাগাদ লক্ষ্যমাত্রা ৭২·১০ একর ধরে ধরা হয়েছে।

সারণী ১০·১৪

আর্থিক ব্যয় সংক্ষেপ

(কোটি টাকায়)

সংস্থা/কার্যক্রম	আর্থিক ব্যয়				
	অনাবর্তক	আবর্তক	সর্বমোট (২+৩)	আদায়বাদে নীট মোট	বৈদেশিক
১	২	৩	৪	৫	৬
(ক) বিডব্লিউডিবি:					
(১) সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প	৩৭৫	..	৩৭৫	৩৭৫	১২৩
(২) ক্ষুদ্র ও মাঝারি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প।	৩৭৫	..	৩৭৫	৩৭৫	৯৬
(৩) প্রধান পানি সম্পদের উন্নয়ন বাঁধ প্রকল্প	১৩০	..	১৩০	১৩০	২০
(৪) শহর রক্ষী	৩০	..	৩০	৩০	১২
(৫) বিবিধ সার্ভে	২০	..	২০	২০	১২
(৬) (ক) জরীপ, অনুসন্ধান ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা।	৭৫	..	৭৫	৭৫	৩০
(খ) বাঁধসহ দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্পের সমীক্ষা ও ডিজাইন।	৩০	..	৩০	৩০	১২
(৭) আওতা এলাকার উন্নয়ন	৬	..	৬	৬	১
উপ-মোট (ক)	১০৪১	..	১০৪১	১০৪১	৩০৬

সংস্থা/কার্যক্রম	আর্থিক ব্যয়				
	অনাবর্তক	আবর্তক	সর্বমোট (২+৩)	আদায়বাদে নীট মোট	বৈদেশিক
১	২	৩	৪	৫	৬
(খ) বিএডিসি :					
(১) লো-লিফট পাম্প	২০০	৩৫৮	৫৫৮	২৪১	২২০
(২) অগভীর নলকূপ	৪৫৭	১১০	৫৬৭	১১৫	২০০
(৩) অগভীর নলকূপ	৩৫৫	৫৫	৪১০	৩২৬	২৪৬
(৪) হস্তচালিত নলকূপ	৫০	৬	৫৬	২২	১৪
(৫) আওতা এলাকায় উন্নয়ন	২০·১৪	৬	২৬·১৪	২৬·১৪	..
(৬) বেসরকারী ওয়ার্কশপ	০·৩০	..	০·৩০	০·৩০	..
(৭) আশুগঞ্জ সবুজ প্রকল্প	৪·৬৫	১	৫·৬৫	৫·৬৫	..
(৮) খাল খননের আওতায় পাম্প	৩৮·০০	..	৩৮·০০	৩৮·০০	২৬
(৯) কৃষি যন্ত্রপাতির উন্নয়ন	০·২৬	..	০·২৬	০·২৬	..
(১০) ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন	০·৬৫	..	০·৬৫	০·৬৫	..
উপ-মোট (খ)	১১২৬	৫৩৬	১৬৬২	৭৭৫	৭০৬
(গ) বেসরকারী :					
(১) বিকেবি—এসটিডব্লিউ	৯৩	..	৯৩	১৪	..
(২) বিবি—এসটিডব্লিউ	৮৪	..	৮৪	৫	..
(৩) আইআরডিপি—এইচটিডব্লিউ	২৪	..	২৪	..	..
উপ মোট (গ)	২০১	..	২০১	১৯	..
(ঘ) বিবিধ :					
বিবিধ প্রকল্পসমূহ	১৫	..	১৫	১৫	৫
মোট (ক+খ+গ+ঘ)	২৩৮৩	৫৩৬	২৯১৯	১৮৫০	১০১৭

১০·১৫২ সেচ ব্যয় পুনরুদ্ধার: বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশে বিভিন্ন সেচ পদ্ধতি থেকে আয় প্রাপ্তির হার অনেক বেশী। এতে প্রতীয়মান হয় যে, চাষীরা সামগ্রিকভাবে যথেষ্ট উদ্বৃত্ত পেয়ে থাকে। এ সত্ত্বেও চাষীরা সেচের মোট ব্যয়ের এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র বহন করে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থার ভাড়ার বিনিময়ে কৃষি সরঞ্জাম কার্যক্রমের আওতায় চাষীরা পেট্রোলিয়াম, রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ব্যবহৃত পিচ্ছিলকারক তেল এবং কৃষি সরঞ্জাম পরিচালনাকারী কর্মচারীদের ব্যয় পুরোপুরি বহন করলেও মূলধন খাতে বার্ষিক ব্যয়ের একটা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র বহন করে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা ও এর প্রকল্পগুলির পুরো ব্যয়ও সরকার বহন করেন। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রদত্ত পানি সেচ সুবিধাগুলির জন্যও চাষীরা নামমাত্র মূল্য প্রদান করেন। বিএডিসির ভাড়ার বিনিময়ে কৃষি সরঞ্জাম সরবরাহ কার্যক্রমের আওতায় ঐসব সরঞ্জাম ব্যবহারের জন্য সরঞ্জামের বিভিন্ন প্রকার ও ধরণভেদে চাষীরা সেচের বার্ষিক ব্যয়ের ৪০ থেকে ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত হারে চার্জ প্রদান করে থাকে। ছোট আকারের সেচ কাজের উপযোগী সকল যন্ত্রপাতি এই পরিকল্পনার শুরু থেকে ভর্তুকী মূল্যে চাষীদের কাছে সরাসরি বিক্রি করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এমনকি বর্তমানে কৃষি যন্ত্রপাতি ভাড়া দান কার্যক্রমের আওতায় যেসব যন্ত্রপাতি রয়েছে সেগুলিও চাষীদের কাছে অবচিত মূল্যে (depreciated price) বিক্রি করা হচ্ছে। এছাড়া কৃষি সরঞ্জামের মূল্যের

সমান করে ঐসব যন্ত্রপাতি চাষীদের কাছে বিক্রয় মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে ভর্তুকীও আস্তে আস্তে কমিয়ে আনা হচ্ছে। সরকারী খাতে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণমূলক সার্ভিস ন্যূনতম মূল্যে প্রদান চলবে। বেসরকারী খাতে এ ধরণের সুযোগ-সুবিধে পুরোপুরিভাবে গড়ে না ওঠা পর্যন্ত সরকারী খাতে উল্লিখিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সার্ভিস অব্যাহত থাকবে।

১০·১৫৩ **ব্যবস্থাপনা:** সেচ সুবিধেযুক্ত চাষাবাদে বর্ধিত ফসল লাভ খামার পর্যায়ে পানির দক্ষ ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভর করে। পরিকল্পনাকালে পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যগুলির মধ্যে রয়েছে সম্প্রসারণ সার্ভিসের সুসংহতি বিধান, চাষী ও কৃষি সরঞ্জাম পরিচালক কর্মী উভয় পক্ষের জন্য প্রশিক্ষণ ও সেচ-গোষ্ঠীগুলিকে শক্তিশালী করা ইত্যাদি যাতে করে ক্রমান্বয়ে সেচ সুবিধেগুলির একটা দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

সেচ সম্প্রসারণ ও পরিচালনা ব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ফলদায়ক সমন্বয়ের অভাবই বর্তমান ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ত্রুটি। এই ব্যবস্থার উন্নয়নের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলির নিজ নিজ নীতিরও তারতম্য রয়েছে। পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও সুদক্ষ ব্যবহার ও সেই সাথে দ্রুত সেচ সম্প্রসারণের স্বার্থে একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ উদ্যোগের লক্ষ্যে এসব তারতম্য দূর করা হবে।

১০·১৫৪ **উচ্চ জ্বালানী ব্যয়:** বর্তমানে লো-লিফট পাম্প ও অগভীর নলকূপ প্রধানতঃ ডিজেলে চলে। তবে ১৯৭০-এর দশকে আমদানী করা জ্বালানীর উচ্চ মূল্যের কারণে এই পাম্প ও নলকূপগুলি পরিচালনায় বিদ্যুৎ ব্যবহারের এক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। অবশ্য ১৯৮০ সালের জুন পর্যন্ত মাত্র ৪,৪০৬টি পাম্প ও নলকূপে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ পাম্প ও নলকূপ এখনও ডিজেলে চলে এবং দেশের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। কৃষি সরঞ্জাম পরিচালনায় বিদ্যুৎ সরবরাহের কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন। এই পরিকল্পনাকালে ১২,০০০ সেচ পাম্প ও নলকূপ বিদ্যুতায়িত করার কার্যক্রম রয়েছে।

১০·১৫৫ **কর্ম সংস্থানের ক্ষেত্রে প্রভাব:** বন্যারোধে সেচ ও পানি খাতে, বিশেষ করে নিষ্কাশন ও বাঁধ নির্মাণ কাজে জনশক্তি নিয়োগের অত্যন্ত বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণেও বিপুল শ্রমিক নিয়োগের প্রয়োজন হয়। এই পরিকল্পনা মেয়াদে আরও ৩৭·২১ লাখ একর জমিতে সেচ সুবিধে সম্প্রসারণের প্রস্তাব করা হয়েছে। এসব প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে অতিরিক্ত প্রায় ৭ লাখ লোকের পূর্ণকালীন প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। এছাড়াও প্রকল্পগুলি বিভিন্ন নির্মাণ পর্যায়ে বেশ অনেক লোকের খণ্ডকালীন কাজের ব্যবস্থা হবে।

আর্থিক বরাদ্দ

১০·১৫৬ পানি সম্পদ খাতের কার্যক্রমগুলি বাস্তবায়নের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে ১,৮৫০ কোটি টাকা (চলতি মূল্যে ২,৭০১ কোটি টাকা) বরাদ্দ করা হয়েছে। বড় বড় প্রতিষ্ঠানওয়ারী ভিত্তিতে চলতি ও স্থির মূল্যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ঐ মোট বরাদ্দের বার্ষিক পর্যায় বণ্টন সারণী ১০·১৫-এ দেখান হয়েছে।

সারণী ১০·১৫

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পানি সম্পদ খাতে বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

প্রতিষ্ঠানের নাম	১৯৮০-৮২		১৯৮২/৮৩		১৯৮৩/৮৪		১৯৮৪/৮৫		১৯৮০—৮৫	
	চলতি মূল্য	স্থির মূল্য	চলতি মূল্য	স্থির মূল্য	চলতি মূল্য	স্থির মূল্য	চলতি মূল্য	স্থির মূল্য	চলতি মূল্য	স্থির মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
(১) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।	৩৬৫	৩০৭	১৬৭	১১৯	৪২৮	২৭৩	৬০১	৩৪২	১৫৬১	১০৪১
(২) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা।	৩৮২	৩২৩	১৮০	১২৯	২৪০	১৬০	২৮৭	১৬৩	১০৮৯	৭৭৫
(৩) অন্যান্য	১০	৮	৩	২	২২	১৪	১৭	১০	৫২	৩৪
মোট ..	৭৫৭	৬৩৮	৩৫০	২৫০	৬৯০	৪৪৭	৯০৫	৫১৫	২৭০২	১৮৫০

গ। পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ

১০·১৫৭ দেশের ৮৭ শতাংশ লোক গ্রামে বসবাসকারী এবং প্রধানতঃ কৃষির ওপর নির্ভরশীল বলে বাংলাদেশ একান্তভাবেই গ্রাম প্রধান। দেশের পল্লী খাত অনুন্নত। দেশের এই পল্লী গ্রাম দারিদ্র্যের নিগড়ে বাঁধা। সেখানে কৃষি উৎপাদনের নীচু হার, কৃষি খাতের বাইরে একনাগাড়ে কর্মসংস্থানের অভাব, জনসমষ্টির ক্রমবর্ধমান চাপ, ভূমিহীনতা ও বেকারত্বের সমস্যা জেঁকে বসে আছে। মেয়েরা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫০ শতাংশ। তবু তাদের গৃহস্থালীর বাইরে তাদের কোন অর্থকরী কাজের সুযোগ-সুবিধে নেই বললেই চলে। গ্রামের দারিদ্র্য অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী। এছাড়াও, পাড়াগাঁয়ে রাস্তাঘাট, নিষ্কাশন ব্যবস্থা, হাটবাজার এবং স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা, শিক্ষা ও অন্যান্য সামাজিক সার্ভিসের মত অবকাঠামোমূলক সুযোগ-সুবিধের নিদারুণ অভাব রয়েছে।

১০·১৫৮ পূর্বের পরিকল্পনাগুলিতে পল্লী উন্নয়নের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছিল। তবে সেগুলির নীতি ও কৌশল অনুযায়ী প্রধানতঃ কৃষির ওপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। খাদ্য কর্মসংস্থান ও রপ্তানীর ক্ষেত্রে এই খাতের গুরুত্ব এবং সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে এর অবদান এই ক্ষেত্রের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার পাওয়ার দাবীদার করে তোলে। অন্যদিকে খামার বহির্ভূত খাতের বিকাশ নিম্ন পর্যায়ে রয়ে যায়। প্রধান প্রধান পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমগুলির মধ্যে রয়েছেঃ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম (আইআরডিপি সমবায়), পল্লী পূর্ত কার্যক্রম, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কার্যক্রম ও অন্যান্য পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম। এই কার্যক্রম ও প্রকল্পগুলি ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং উৎপাদন ক্ষমতা ও কর্মসংস্থান বাড়াতে সহায়তা করেছে। তবে এভাবে যেসব প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রম গড়ে উঠেছে তা প্রধানতঃ তাদেরই লাভবান করেছে যাদের হাতে সম্পদ ও প্রযুক্তি ছিল। ভূমিহীন বা গরীবরা উপান্তিক সুবিধে কিংবা নিরবচ্ছিন্ন কর্মসংস্থান ও আয়ের খুব কম সুবিধেই পেয়েছে।

১০·১৫৯ পল্লী উন্নয়নের উদ্দেশ্য হবে পল্লী অঞ্চলে বর্ধিত উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয় এবং সেগুলির মধ্য দিয়ে দারিদ্র্য হ্রাস। পল্লীর গরীব জনগোষ্ঠীর অবস্থার উন্নতির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার হবে। ঐ গরীব পল্লীবাসীদের জন্য খামার ও খামারের বাইরে উভয় ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন কর্মসংস্থান ও উপার্জনের সুযোগ-সুবিধে গড়ে তুলতে হবে। খামার বহির্ভূত খাতে এ রকম সুযোগ-সুবিধে গড়ে তোলার প্রচুর সুযোগ সুবিধে রয়েছে। এই গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পল্লী উন্নয়নের উদ্দেশ্যাবলী, নীতিকৌশল ও নীতিমালার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ও প্রকল্পগুলির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যক্রমসমূহ

১০·১৬০ সার্বিক পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমগুলিতে একদিকে উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয় সংশ্লিষ্ট উৎপাদন খাতের তৎপরতা এবং অন্যদিকে স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদির মত সমাজকল্যাণ খাত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সামাজিক খাতের কার্যক্রমগুলি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলির খাত কার্যক্রম হিসেবে চলতে থাকবে এবং পল্লী উন্নয়ন খাতে গ্রামীণ উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও উপার্জন বৃদ্ধির কার্যক্রমগুলি পরিচালিত হবে। এগুলিতে থাকবে (১) অবকাঠামো উন্নয়ন, (২) সেচযুক্ত কৃষি উন্নয়ন এবং (৩) বিশেষ করে গরীব পল্লীবাসীদের জন্য সরাসরি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কার্যক্রম। এগুলি মোটামুটি তিন শ্রেণীর কার্যক্রমে বিন্যস্ত করা হয়েছেঃ

(ক) পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ, (খ) পল্লী পূর্ত কার্যক্রম ও (গ) স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলির বিভিন্ন কার্যক্রম।

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

১০·১৬১ পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পগুলির এক জাতীয় কাঠামো ও কৌশল গড়ে তোলা হবে এবং ভবিষ্যতের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পগুলি ঐ কাঠামো ও কৌশলের মধ্যে তৈরী করতে হবে। দেশের ভৌগোলিক আয়তনের একটা বিস্তৃত এলাকা জুড়ে থাকবে এই পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পগুলি। এই প্রকল্পগুলি আবশ্যিকভাবেই এক বা একাধিক প্রশাসনিক জেলা জুড়ে থাকবে যাতে প্রায় দশকখানের মধ্যে ঐ উন্নয়ন তৎপরতা গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে। বেশী উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয়ের উদ্দেশ্য অর্জনে এই প্রকল্পের মূল উপাদানগুলি হবে নিম্নরূপঃ

(১) অবকাঠামো উন্নয়ন (যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাজার ও মজুত ব্যবস্থা)।

(২) সেচযন্ত্র কৃষি ক্ষুদ্রাকার নিষ্কাশন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ।

(৩) বিশেষতঃ গাঁয়ের গরীব লোকদের জন্য সরাসরি উৎপাদন/কর্মসংস্থান কার্যক্রম। (পল্লীবাসী গরীব জনগোষ্ঠী বলতে একেবারেই ভূমিহীন এবং যাদের জমির পরিমাণ ০·৫০ একরের কম তাদেরকে বোঝাবে)।

১০·১৬২ কৃষি হবে উন্নয়নের প্রধান এলাকা। তবে খামার বহির্ভূত খাতের উন্নয়নে বিশেষ জোর দেওয়া হবে যে খাতে আংশিক বেকার ও বেকার পল্লীবাসীরা কর্মসংস্থান ও আয়ের স্থায়ী উৎসের সন্ধান পাবেন। বিভিন্ন তৎপরতাকে বহুমুখী করে এই খাতের বিকাশ সাধনের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এগুলির কিছু কিছু তৎপরতা চলবে পল্লী ও কুটিরশিল্পগুলিতে (তাঁত, ছাপাই, কাতা-দাঁড়, বাঁশ ও বেতের কাজ, মৃৎশিল্পসহ) ছোট খাট সরঞ্জাম, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, মাছের চাষ, গবাদি ও হাঁস-মুরগী সম্পদ, রেশম শিল্প, ফল, সব্জি, মশলা ও গ্রামীণ বনজ সম্পদের উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে।

১০·১৬৩ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন-১, সিরাজগঞ্জ পল্লী উন্নয়ন ও নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ হবে এবং উল্লিখিত কৌশল অনুসারে নতুন নতুন প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রকল্পের সূচনা করা হবে। এই প্রকল্পগুলি একান্তভাবে সীমিত কিছু তৎপরতায় কেন্দ্রীভূত থাকবে যাতে সমন্বয়নের সমস্যাগুলি অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। এর আগে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পগুলিতে মূলধন বিনিয়োগের যে তিনটি উপাদানের উল্লেখ করা হয়েছে এগুলিতেও তা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

১০·১৬৪ চলতি পল্লী উন্নয়ন-১, সিরাজগঞ্জ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম (SIRDP) নোয়াখালী সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন (NIRDP) কার্যক্রম প্রকল্পগুলি পরিকল্পনায় বরাদ্দ ১০৩·৬ কোটি টাকায় সম্পূর্ণ হবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদে ফরিদপুর ও যশোর জেলার ৪৪টি থানায় দক্ষিণ-পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প নামে একটি নতুন পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হবে। পরিকল্পনায় এ প্রকল্পের জন্য ১৬·৯৮ কোটি টাকার বরাদ্দ রয়েছে। উত্তর-পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী উন্নয়ন-২ নামে আরও দুটি প্রকল্প বিস্তারিত মূল্যায়নের পর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বাস্তবায়নের জন্য হাতে নেওয়া হবে।

পল্লী পূর্ত কর্মসূচী (আরডব্লিউপি)

১০·১৬৫ পল্লী পূর্ত কার্যক্রমের উপাদানগুলি নিম্নরূপঃ

(ক) রাস্তা (সড়ক), বাঁধ, কালভার্ট ও সেতু নির্মাণের দিক দিয়ে পল্লী অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন;

(খ) পণ্যাগার নির্মাণসহ গ্রামের হাট বাজারের উন্নয়ন;

(গ) বন্যা রোধ ব্যবস্থাদি নির্মাণ, সেচ ও নিষ্কাশন খাল খনন, ছোট বাঁধ ও আনুষঙ্গিক কাঠামো নির্মাণ;

(ঘ) থানা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কমপ্লেক্সের মত পল্লী এলাকায় প্রশাসন ও পরিকল্পনা অবকাঠামো, সেগুলির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সামর্থ্য, টিআইপি ওয়ার্কশপ, কমিউনিটি সেন্টার এবং থানা কর্মকর্তাদের আবাস ইত্যাদি উন্নয়ন।

(ঙ) মজা পুকুর সংস্কার অথবা পুকুরে মৎস্য চাষ কার্যক্রম প্রণয়ন; এবং

(চ) বসতবাড়ীর পিছনে গাছপালা লাগিয়ে, রাস্তা বা বাঁধের ধারে বৃক্ষরোপণ করে গ্রামীণ বনজ সম্পদ উন্নয়ন

১০·১৬৬ নিম্নলিখিত চলতি প্রকল্পগুলির কাজ চলতে থাকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এগুলি সম্প্রসারিত করা হবেঃ

(১) সড়ক, বাঁধ, খাল ও নিষ্কাশন বাঁধ নির্মাণের ওপর জোর দিয়ে পল্লী অবকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে পল্লী পূর্ত কার্যক্রম বিশেষ বৈশিষ্ট্যে গড়ে উঠেছিল। যেসব স্থানে এসব তৎপরতা বাস্তবায়নের জন্য অন্য কার্যক্রম গৃহীত হয়নি সেইসব জায়গায় উল্লিখিত পল্লী পূর্ত কার্যক্রম চলতে থাকবে।

(২) যেসব হাট বাজারে বিপুল পরিমাণে বেচাকেনা চলে সেগুলির উন্নয়ন করা হবে।

(৩) ১০০টি বন্যা প্রবন ও দুর্গত থানায় নিবিড় পল্লী পূর্ত কার্যক্রম; এই কার্যক্রমের আওতায় বন্যা নিরোধ, নিষ্কাশন ও সেচ এবং সড়ক, কালভার্ট ও খালের মত যোগাযোগ সংযোগ, থানা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং থানা প্রশাসন ভবনসমূহের মত প্রশাসনিক দালান কোঠা এবং মাছের চাষের পুকুর উন্নয়ন, গ্রামীণ বনভূমি, গবাদি পশু পাখীর খামার, কুটিরশিল্প ইত্যাদির মত সরাসরি তৎপরতার জন্য অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে।

(৪) সর্বনিম্ন ব্যয়সাপেক্ষে ছোট আকারের সেচ ব্যবস্থা নির্মাণ ও পরিচালনাভিত্তিক ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ ছয়টি জেলায় (যেমন, চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর টাংগাইল) হাতে নেওয়া হবে। লো-লিফট পাম্প, নলকূপ, ছোট বাঁধ এবং পানি বহন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক নির্মাণের মাধ্যমে পানি সেচও এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

(৫) চারটি জেলায় বিশেষ গণপূর্ত কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা, সিলেট, রাজশাহী ও যশোর জেলায় জেলা ও থানা পর্যায়ে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সামর্থ্য গড়ে তোলা হবে এবং গণপূর্ত কার্য ও সড়ক, সেচ ব্যবস্থা, নিষ্কাশন খাল, বাঁধ, সেতু, কালভার্ট, থানা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, টিআইপি ওয়ার্কশপ, গুদাম, সমষ্টি উন্নয়ন কেন্দ্র, মাছের চাষের পুকুর ইত্যাদির মত ভৌত সুযোগ-সুবিধে গড়ে তোলার জন্য প্রকৌশল ও পরিচালন ম্যানুয়েল প্রণয়ন করা হবে।

(৬) সিলেট, ফরিদপুর ও রংপুর জেলায় জেলা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্নির্মাণ প্রকল্প; এর উদ্দেশ্য সহযোগকারী রাস্তাগুলির নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে জেলা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানিক সামর্থ্য গড়ে তোলা।

১০·১৬৭ বিশেষ পূর্ত কার্যক্রম, হাট বাজার ও অন্যান্য খাতের উন্নয়নসহ পল্লী পূর্ত কার্যক্রমের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৩০৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

সমবায়

১০·১৬৮ পল্লী খাতে সমবায় হবে প্রধান অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন। কৃষি ছাড়াও ভূমিহীন, গ্রামের গরীব জনসাধারণ ও সমস্যায় অসুবিধাগ্রস্ত মহিলাদের ক্ষেত্রেও সমবায়ের আওতা সম্প্রসারিত হবে। এই উদ্দেশ্যে এইসব লোকদেরকে অর্থকরী উদ্যোগের আওতায় সংগঠিত করার জন্য বিশেষ প্রয়াস চালানো হবে। এর জন্য প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো হবে বর্তমান থানা সমবায় ঋণ সমিতি কৃষক সমবায় সমিতির অনুরূপ দ্বিস্তরবিশিষ্ট সমবায় সংগঠন, প্রাথমিক পর্যায়ের সমিতি গ্রাম পর্যায়ে এবং থানা পর্যায়ে ঐ সমিতিগুলির ফেডারেশন নিয়ে ঐ দ্বিস্তর কাঠামো গঠিত হবে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড সমবায় সমিতিগুলির সংগঠন, বিকাশ ও উন্নয়নের এবং সমবায় বিভাগ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বগুলি পালন করবে।

১০·১৬৯ তিন ধরণের সমবায় বা ঘরোয়াগোষ্ঠী কিংবা গ্রাম সমবায় গড়ে তোলা হবে। এগুলি হবে চাষাবাদের জন্য কৃষক সমবায় সমিতি (KSS), বিত্তহীন সমবায় সমিতি (BSS) ভূমিহীন ও গরীবদের জন্য এবং মহিলাদের জন্য মহিলা সমবায় সমিতি (MSS)। প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রামভিত্তিক বিত্তহীন সমবায় সমিতি ও মহিলা সমবায় সমিতি যতদিন পর্যন্ত উচ্চতার স্তরে নিজ সংগঠন গড়ে তুলতে সক্ষম না হয় ততদিন থানা পর্যায়ে কৃষক সমবায় সমিতির (KSS) সঙ্গে একটা কেন্দ্রীয় সংগঠনের (TCCA) ফেডারেশন-ভুক্ত থাকবে। থানা সমবায় ঋণ সমিতি ও কৃষক সমবায় সমিতি (TCCA-KSS) সারা দেশে বিস্তৃত করা হবে এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য সমিতিও গড়ে তোলা হবে। বিত্তহীন সমবায় সমিতি ও মহিলা সমবায় সমিতি অপেক্ষাকৃত নতুন সংগঠন বলে গোড়াতে সীমিত পর্যায়ে এই সমিতিগুলি গঠন করা হবে। এছাড়াও, বিত্তহীন সমবায় সমিতি ও মহিলা সমবায় সমিতির প্রথম দিকের অর্থনৈতিক তৎপরতা এসব সমিতি বর্তমান দক্ষতার ওপর নির্ভর করেই চলবে তবে পরবর্তীকালে উন্নততর প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ দিয়ে ঐ দক্ষতার মান আরও উন্নত করা হবে। মহিলা সমবায় সমিতি তাদের অর্থনৈতিক তৎপরতার সঙ্গে সঙ্গে পরিবার পরিকল্পনা, পারিবারিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিশু পরিচর্যা সংক্রান্ত শিক্ষাকরণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

১০·১৭০ সমবায় উন্নয়ন প্রকল্পগুলিতে পরিকল্পনা মেয়াদে প্রায় ৫৯ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। এই বরাদ্দ কেবল উন্নয়নমূলক তৎপরতার জন্য। ঋণের মত উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক চাহিদা প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধের উৎস থেকে মেটানো হবে।

উন্নয়ন বোর্ডসমূহের কর্মসূচী

১০·১৭১ কার্যকর স্থানীয় সরকার সংস্থা দ্বারা স্থলাভিষিক্ত না হওয়া পর্যন্ত দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সংগঠিত বিভাগীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়ন বোর্ডগুলি চালু থাকবে। বর্তমানে এই বোর্ডগুলি কৃষি, উদ্যান কৃষি, মাছের চাষ গবাদি পশুপাখী পালন, সেচ, সড়ক নির্মাণ, শিক্ষা, খেলাধুলো ও সংস্কৃতি, সমাজকল্যাণ, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতামূলক ব্যবস্থা, পরিবার পরিকল্পনা ও চিত্তবিনোদনের মত সকল খাতে স্বল্পব্যয় সাপেক্ষ নানা প্রকল্পের কাজ হাত নিয়ে থাকে।

১০·১৭২ নীতিগত ব্যবস্থা অনুসারে এই বোর্ডগুলি জেলা ও মহকুমা সদরের মত শহরগুলে কোন নূতন কর্মতৎপরতা শুরু করবে না। এই বোর্ডগুলি সাধারণতঃ এমন প্রকল্পের কাজ হাতে নেবে যেগুলির কাজ এক বছরের মধ্যে শেষ করা যায়।

১০·১৭৩ ক্রমান্বয়ে, থানাভিত্তিক কর্মতৎপরতাগুলি নতুন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা চালু হওয়ার সংগে সংগে থানা পরিষদের কাছে স্থানান্তরিত হবে। একইভাবে জেলা পরিষদগুলি জেলাভিত্তিক কর্মতৎপরতার দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। বাস্তবিকপক্ষে থানা পরিষদের কর্মতৎপরতার পরিসর এমন বিস্তৃততর পর্যায়ে সম্প্রসারিত করা হবে যাতে ঐ পরিষদ থানা পরিকল্পনা অনুসারে বেশ মোটা অংকের তহবিল কাজে লাগাতে পারে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বহুখাত উন্নয়ন প্রকল্প

১০·১৭৪ পার্বত্য চট্টগ্রামের একক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ভূপ্রকৃতি ও সমাজে বিভিন্ন খাতে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেবার জন্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড স্থাপিত হয়। ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি, উদ্যান ও ফলের বাগান উন্নয়ন, অব্যবহৃত বনজ সম্পদ ব্যবহার, পাহাড়ের ঢাল চাষাগুলিতে বনভূমি সৃষ্টি, মৎস্য চাষাবাদ, গবাদি পশুপাখী পালন ও কুটিরশিল্পকে সহায়তা প্রদান, জুম চাষী পরিবারগুলি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদির সমন্বয়ে একটি বহুখাত উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ পার্বত্য চট্টগ্রামে হাতে নেওয়া হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, বিভিন্ন সরকারী বিভাগ ও প্রতিষ্ঠান প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করছে। প্রকল্পের উল্লিখিত বিভিন্ন তৎপরতার মধ্যে দুটি কার্যক্রম যথা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডকে শক্তিশালীকরণ এবং পার্বত্য ভূমিতে জনআবাসন পল্লী প্রতিষ্ঠান খাতে অন্তর্ভুক্ত এবং এজন্য পরিকল্পনায় ১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

থানা প্রশাসন উন্নয়ন

১০·১৭৫ স্থানীয় পর্যায়ে ফলপ্রসূ পরিকল্পনা প্রণয়ন, সম্পদ সমাবেশ ও উন্নয়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার জনগণের অংশগ্রহণের জন্য একটি বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনিক ও পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া অপরিহার্য। থানাগুলির মান উন্নয়ন এবং সেগুলির প্রশাসন ও পরিকল্পনা সামর্থ্য জোরদার করার মধ্য দিয়ে একটি নতুন বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসন প্রক্রিয়ার সূচনা হয়েছে। থানা (থানা পরিষদের) বিশেষজ্ঞদের সহায়তাক্রমে নির্বাচিত স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলি উন্নয়ন তৎপরতার পরিকল্পনা ও সমন্বয় বিধানের দায়িত্ব পালন করবে। এই সংস্থাগুলি সড়ক, স্থানীয় সেচ ব্যবস্থা, নিষ্কাশন সুবিধে, হাটবাজার, প্রাথমিক শিক্ষা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিচ্ছন্নতামূলক ব্যবস্থা, পানি সরবরাহ, পল্লী ধন সম্পদ উন্নয়ন ও অন্যান্য সামাজিক তৎপরতামূলক বিভিন্ন খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। একবিংশ অধ্যায়ে থানা উন্নয়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ ও গবেষণা

১০·১৭৬ পল্লী উন্নয়নের অগ্রগতিতে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, প্রশিক্ষণ তৎপরতাগুলি নিম্নরূপঃ

(ক) নিম্নতম পর্যায়ে সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ জোরদার করা হবে। সদস্য সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ যতদূর সম্ভব গ্রাম অবধি সম্প্রসারিত করা হবে।

(খ) ভূমিহীন, শিল্পীকারিগর, জেলে, তাঁতী ও মহিলাদের মত বৃত্তিধারী কর্মীগোষ্ঠী বা বিশেষ গোষ্ঠীগুলিতে তাদের সংগঠন ও দক্ষতা গড়ে তোলার জন্য গ্রাম পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

(গ) ইউনিয়ন, থানা ও জেলা পরিষদের সদস্য ও কর্মকর্তারা যাতে তাদের দায়িত্ব কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

(ঘ) সুযোগ-সুবিধের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বর্তমান শিক্ষাদানের সুযোগ-সুবিধা উন্নত করা হবে।

১০·১৭৭ স্থানীয় সরকার ও পৌরসভাগুলির সদস্য ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দানের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য ঢাকার বর্তমান স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউটসহ (LGI) অনুরূপ মোট চারটি ইন্সটিটিউট গড়ে তোলা হবে। বর্তমান অন্যান্য প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটগুলির ভৌত ও প্রশিক্ষণ সুবিধেও গড়ে তোলা হবে।

১০·১৭৮ কুমিল্লার বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (BARD) এবং বগুড়ার পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (RDA) তাদের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা জোরদার করবে। কার্য পরিচালনার খাতিরে পরিকল্পনা মেয়াদে শুধুমাত্র ন্যূনতম ভৌত সুবিধে গড়ে তোলা হবে।

১০·১৭৯ পরিকল্পনায় ৭ কোটি টাকার বরাদ্দে ঐ প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট গড়ে তোলা হবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আর্থিক বরাদ্দ

১০·১৮০ স্থির ও চলতি উভয় মূল্যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান খাতে বরাদ্দ নিম্নে প্রদত্ত হল।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বরাদ্দের বছরওয়ারী বণ্টন

[লক্ষ টাকায়]

	১৯৮০/৮১	১৯৮১/৮২	১৯৮২/৮৩	১৯৮৩/৮৪	১৯৮৪/৮৫	মোট (১৯৮০—৮৫)
(ক) বরাদ্দ-স্থির মূল্যে	৮৭·৩৩	৭৯·৯৬	৮৩·৭২	১,০৬·১৬	১,২৪·৮০	৪,৮২·০০
(খ) বরাদ্দ চলতি মূল্যে	৯৭·৮১	৯৯·৯৫	১,১৭·২১	১,৬৬·৬৭	২,১৯·০৬	৭,০১·০০

একাদশ অধ্যায়

শিল্প ও খনিজ সম্পদ

সার্বিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে শিল্প খাতের অবদান মাত্র ৮·৮ শতাংশ হলেও দেশের কৃষি ও অবকাঠামোর উন্নয়নে এই খাত জোর সহায়তামূলক ভূমিকা পালন করে। শিল্প খাতে দেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের প্রায় ৭০ শতাংশ ও অ-কৃষি কর্মসংস্থানের ৩০ শতাংশ নিশ্চিত হয় এবং বহু ধরণের প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশের মত মাথাপিছু খুব কম আয়সম্পন্ন কৃষি প্রধান ও ঘনবসতির দেশে কেবল শিল্পোৎপাদনের বিকাশই দারিদ্র্যের উপশম ঘটিয়ে একনাগাড়ে উঁচুমাত্রায় আয় বৃদ্ধির জন্য দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষাপটে আশার কারণ হতে পারে। বর্তমানে সম্পদের উপর চাপ ও সেই সাথে উৎপাদনশীলতার বিবেচনায় কৃষি খাতে প্রাথমিক গুরুত্ব প্রয়োজনীয় হলেও, শিল্পোৎপাদন খাতের উন্নয়নে অবহেলা করা চলবে না।

১৯৭৩—৮০ মেয়াদে সাফল্য

১১·২ দেশের শিল্প ভিত্তি খুব সুপরিসর ছিল না এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে এ খাতের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। শিল্প খাতকে তার স্বাধীনতাপূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার পরে প্রথম দিকের বছরগুলোর উন্নয়ন নীতি ও কার্যক্রমগুলো প্রধানতঃ মেরামত, পুনর্বাসন ও সুসংহত করার কাজে কেন্দ্রীভূত ছিল। এছাড়া, কৃষির সংগে শিল্পের একটা জোরদার সম্পর্ক গড়ে তুলবে এমন অগ্রাধিকারমূলক ক্ষেত্রে কিছু নতুন বিনিয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিলঃ জরুরী কৃষি উপকরণসমূহ অর্থাৎ সার, হাতিয়ার ও সাজসরঞ্জাম ইত্যাদির ব্যবস্থা, কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ, অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যপণ্য আমদানীর উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

১১·৩ আলোচ্য মেয়াদে শিল্প খাতে সামগ্রিক সাফল্য লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছুতে পারেনি। স্থিতিত মূল্যে ১৯৭২/৭৩ সালের ৩২১·৮০ কোটি টাকার নিম্নমাত্রা থেকে ১৯৭৯/৮০ সালে মাত্র ৫৩৬·৫০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। এতে উল্লেখিত মেয়াদে প্রবৃদ্ধি হার দাঁড়ায় ৭·২ শতাংশে। সরকারী খাতের তৎপরতার কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূচক (যেমন উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার, শ্রম উৎপাদনশীলতা ও বিনিয়োগ আয় ইত্যাদি) ১৯৬৯/৭০ সালের সংশ্লিষ্ট সূচকগুলোর তুলনায় অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পাট শিল্পে ১৯৬৯/৭০ সালের উৎপাদন স্তর এখনও অর্জিত হয়নি। সুতো, কলে তৈরী কাপড়, সিমেন্ট, ইস্পাত পিন্ড ও সার উৎপাদনে অবশ্য বেশ উন্নতি হয়েছে (সারণী ১১·১)।

১১·৪ বর্ধিত রপ্তানী আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির দিক থেকে শিল্প খাতে উৎসাহব্যঞ্জক প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। শিল্প পণ্য রপ্তানী থেকে বৈদেশিক মুদ্রা আয় ১৯৭৩/৭৪ সালের ১৯০ কোটি টাকা থেকে ১৯৭৯/৮০ সালে ৮০৪ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে; এ ক্ষেত্রে প্রকৃত হিসেবে প্রবৃদ্ধির বার্ষিক হার ১০ শতাংশ। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পরিমাণ ৩·২ শতাংশ। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রম উৎপাদনশীলতা বিসর্জন দিয়ে এই কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি ঘটেছে।

১১·৫ আগেই বলা হয়েছে, সামঞ্জস্য বিধান ও আধুনিকায়ন কার্যক্রম এবং কৃষি-শিল্প সংযোগ জোরদার করার মাধ্যমে বর্তমান শিল্প বুনিয়াদকে সুসংহত করাই ছিল বিনিয়োগ নীতির উদ্দেশ্য। এজন্য

সরকারী খাতে বিনিয়োগের এক বিরাট অংশ অর্থাৎ চলতি মূল্যে প্রায় ১,১৩৪·০০ কোটি টাকা রাসায়নিক ও সার উৎপাদন এবং সেই সংগে কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াকরণের নতুন ক্ষমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিনিয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে আর্থিক বরাদ্দসমূহ এবং বিভিন্ন উপ-খাতে এসব বরাদ্দের ব্যবহার ১১·২ সারণীতে দেখানো হয়েছেঃ

সারণী ১১·১

সরকারী খাতের অধীনে নির্বাচিত শিল্পে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য

ক্রমিক সংখ্যা	উৎপাদন	একক	স্থিতিমাত্রিক উৎপাদন		উৎপাদন	৪নং স্তম্ভ থেকে ৬নং স্তম্ভের পরিবর্তনের শতকরা হার
			১৯৬৯/৭০	১৯৭২/৭৩	১৯৭৯/৮০	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	পাটজাত শিল্প	লাখ টনে	৫·৬০	৪·৪৬	*৫·৩৮	৯৬·০৭
২	সুতা (৩২ কাউন্ট)	মিলিয়ন পাউন্ডে	১০৫·৬০	৮০·৯০	১১২·৮৭	১০৬·৮৮
৩	কলে তৈরী কাপড় (৫৪ গিন্স)	,, গজে	৫৯·৯০	৫৮·৪০	৯২·৪৩	১৫৪·৩১
৪	চিনি	'০০০' টনে	৯৩·৩৯	১৯·০০	৯৩·২২	৯৯·৮২
৫	সিমেন্ট	লাখ টনে	০·৫৩	০·৩২	৩·৪৩	৬৪৭·১৭
৬	ইস্পাত খন্ড	লাখ মেট্রিক টনে	০·৫৪	০·৬৮	১·৩৩	২৪৬·৩০
৭	জাহাজ নির্মাণ	ইস্পাতের টনে	৭,২৯৭	৩,৭৪৭	৫,৮৯০	৮০·৭২
৮	গাম	লাখ মেট্রিক টনে	১·০১	২·৭৭	৪·৪২	৪৩৭.৬২
৯	নিউজপ্রিন্টসহ কাগজ	'০০০' মেট্রিক টনে	৭৪·৪৮	৪৯·১৪	৪৮·১৫	৬৪·৬৫
১০	রেয়ন ও ভিসকোস	মেট্রিক টনে	২,৭৪৭	১,৯০০	২,৫৬৪	৯৩.৩৪
১১	চিংড়ি মাছ ও ব্যাঙের পা	লাখ পাউন্ডে	৩৮·০০	২৩·০০	৪৪·০৬	১১৫·৯৫

*বেসরকারী খাতে উৎপাদিত ১৫,০০০ টনসহ।

সারণী ১১·২

১৯৭৩—৮০ মেয়াদে সরকারী খাতে আর্থিক বরাদ্দ ও ব্যবহার

[কোটি টাকায়]

ক্রমিক নং	উপখাত	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে বরাদ্দ	জানুয়ারিক ব্যবহার (চলতি মূল্যে)
১	২	৩	৪
১	পাটজাত বস্ত্র	৯৭·৮৭	৭০·৭২
২	তুলাজাত বস্ত্র	১৬৪·৭৯	১৫০·৫৪
৩	প্রকৌশল এবং জাহাজ নির্মাণ	২৬৯·২৯	২২৬·৩৭
৪	রাসায়নিক এবং সার	৫৭৩·৬৩	৫৫০·৮৯
৫	চিনি এবং খাদ্য	৩২·৪৪	২২.৪৭
৬	ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্প	২৩·৫৭	২০·৬৪
৭	খনিজ শিল্প	২৩·৩৭	১৭·৩০
৮	বন শিল্প	৪১·৪১	৪৭·৫৭
৯	অন্যান্য	১৯·১২	১৬·০৬
	মোট ..	১,২৪৫·৪৯	১,১২২·৫৬

সরকারী খাতে ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য সমস্যা

১১·৬ ১৯৭২ সালের জাতীয়করণ আদেশবলে, সরকারী খাত স্বাধীনতার পর দেশের শিল্প সম্পদের বৃহত্তম অংশের মালিকানা লাভ করে। সরকারী খাতে নবগঠিত কর্পোরেশনগুলোর উপর এদেশ ত্যাগী বিদেশীদের শূন্য স্থানে সদ্য নিয়োজিত ব্যবস্থাপক ও অদক্ষ কর্মী নিয়ে বিপুল সংখ্যক ভিন্ন ধর্মী শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রশাসনের দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়। ফলে কারখানা পরিচালনা থেকে শুরু করে সম্পদ ব্যবস্থাপনা এসব কিছুর দায়িত্ব অদক্ষ হস্তে ন্যস্ত হয়। এই অবস্থা ও তৎসঙ্গে কাঁচামাল, খুচরো যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য ব্যবহার্য উপকরণের ঘাটতি এবং বারংবার বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ইত্যাদি উৎপাদন ক্ষমতার নিম্নমাত্রায় ব্যবহারের প্রত্যক্ষ কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া স্থানীয় পণ্য ক্রয়ে ক্রেতার অনীহার ফলে ক্ষুদ্রাকৃতির আভ্যন্তরীণ বাজারের সংকোচন, বৈদেশিক সাহায্যের অংশে বাছ-বিচারহীন আমদানী ও কোন কোন ক্ষেত্রে স্থানীয় উৎপাদকদের পণ্যের জন্য অপর্যাপ্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা; বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালনার জন্য কর্পোরেশনগুলোর প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা ও নমনীয়তার উপর সরকারী হস্তক্ষেপ এবং মুদ্রাস্ফীতির কারণে জনসাধারণের অধিকাংশের ক্রমহ্রাসমান ক্রয়ক্ষমতা সমস্যাকে আরো জটিল করে তোলে।

১১·৭ সরকারী শিল্প খাতের পরিচালনা ব্যবস্থার অবনতি রোধের জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩/৭৪ থেকে ১৯৭৭/৭৮) মেয়াদের শেষ দিকে কিছু প্রশাসনিক ব্যবস্থার সূচনা করা হয়। এসব ব্যবস্থার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণগুলো ছিলঃ (১) মন্ত্রণালয় পর্যায়ের কর্মতৎপরতাগুলোর পুনর্বিন্যাস; (২) কর্পোরেশনগুলোর কোন কোনটিকে অন্য একটির সংগে একত্রীকরণের মাধ্যমে এগুলোর পুনর্গঠন ও শক্তি সঞ্চার; (৩) স্বাধীনতার পর সরকারী বাহিনী নেয়া প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে পুঁজি প্রত্যাহার; (৪) আর্থিক কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ এবং (৫) মন্ত্রণালয়গুলোতে পরিকল্পনা তৎপরতার শক্তি বৃদ্ধি। শ্রম উৎপাদনশীলতা ও বস্তুবয়ন সামর্থ্যের উন্নতির জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বিকাশের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

বেসরকারী খাতের সম্পাদিত কার্যাদি

১১·৮ সঞ্চয়ের নিম্নহার, ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিল্পের সংকীর্ণ চৌহদ্দি এবং অবকাঠামোমূলক ও সেবা সুবিধের একান্ত অপ্রতুলতা ও অসম বণ্টন স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষায় সমর্থ একটি খাত হিসাবে বেসরকারী খাতের বিকাশে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। স্বাধীনতার পর সরকার সমাজতান্ত্রিক আদর্শ অনুসরণ করেন বলে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩—৭৮) বেসরকারী খাতকে তুলনামূলকভাবে গৌণ ভূমিকা প্রদান করা হয়। এছাড়া, শিল্প খাতে শ্রম বিশৃঙ্খলা, বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার অভাব এবং ব্যবসা বাণিজ্যে অপেক্ষাকৃত বেশী লাভজনক বিকল্পের লভ্যতা বেসরকারী খাতের প্রতিশ্রুতি নিরুৎসাহিত করার অনুকূলে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

১১·৯ ১৯৭৪ সালের উদার শিল্প নীতি এবং পরে আরো কয়েক দফা উন্নয়ন ব্যবস্থা বেসরকারী খাতে নীতি পরিবেশের ক্ষেত্রে উন্নতির সূচনা করে। পুঁজি বিনিয়োগ সীমার প্রকারান্তর বিলোপ, কর মওকুফের বর্ধিত মেয়াদ, যন্ত্রপাতির ওপর রেয়াতী আমদানী শুল্ক, সরকারী খাতে বিনিয়োগের জন্য সংরক্ষিত শিল্প তালিকার সংকোচন, পূর্ব-অনুমোদনের প্রয়োজনহীন শিল্পের একটি অবাধ তালিকা প্রবর্তন, বিদেশী বেসরকারী পুঁজি বিনিয়োগের বিকাশ ও সংরক্ষণের জন্য একটি আইন প্রণয়ন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জকে পুনরায় সক্রিয়করণ এবং জনসাধারণের মধ্যে ইস্যুকৃত শেয়ারের অধিকাংশ দায় গ্রহণ ও বেসরকারী শিল্প ইউনিটসমূহের জন্য সহায়ক অর্থ (bridge finance) জোগানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিনিয়োগ কর্পোরেশনের পুনরুজ্জীবন এসব ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। তবে স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় নেওয়া বিভিন্ন শিল্প ইউনিট থেকে ক্রমান্বয়ে পুঁজি প্রত্যাহারের সরকারী সিদ্ধান্তই সম্ভবতঃ এ ব্যাপারে সবচেয়ে শুভ ফলদায়ক হয়েছে। ১৯৭৩—৮০ সালের মেয়াদে সরকার মোট ২১·৫৮ কোটি টাকার বিক্রয় মূল্যে ১১৯টি শিল্প ইউনিট থেকে পুঁজি প্রত্যাহার করেছেন।

১১·১০ উল্লিখিত নীতিগুলো বাস্তবায়নের সংগে সংগে বিশেষ করে ক্ষুদ্র, কুটির ও গ্রামীণ শিল্পের ক্ষেত্রে জোরদার উন্নয়নমূলক উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ সকল শিল্প ইউনিট শিল্প খাতে নিয়োজিত মোট শ্রমিকের প্রায় ৭৫ শতাংশের কর্মসংস্থান করে থাকে এবং শিল্প খাতে মোট যোজিত মূল্যের প্রায় ৩৭ শতাংশ যোগান দেয়। উন্নয়নমূলক এসব ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছেঃ বিদ্যমান ২০টি শিল্প নগরীতে প্রয়োজনীয়

অবকাঠামোর সুবিধেসহ শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য প্লট বিক্রি এবং শিল্প সংক্রান্ত তথ্যমূলক বিবরণ ও ধারণা প্রদান, প্রশিক্ষণ, বাজার সুবিধে, উপকরণ সরবরাহ, পরিচালনা ও সংরক্ষণমূলক সমস্যাবলীর সমাধানে সহায়তা এবং বিশেষ বিশেষ কার্যক্রমের আওতায় উদার ঋণ দান প্রভৃতি সম্প্রসারণ ও উপদেশমূলক তৎপরতা।

১১·১১ উল্লিখিত উদারনীতি ও উন্নয়নমূলক ব্যবস্থাসমূহের প্রেক্ষিতে বেসরকারী খাতে অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া লক্ষ করা গেছে যার ফলশ্রুতিতে বিনিয়োগ মঞ্জুরী ১৯৭৩/৭৪ সালের প্রায় ৯ কোটি টাকা থেকে ১৯৭৯/৮০ সালে ৪০৪ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে। আলোচ্য মেয়াদে মোট বিনিয়োগ মঞ্জুরীর পরিমাণ ১০৩৬ কোটি টাকা এবং প্রকৃত বিনিয়োগ ৪৩০ কোটি টাকা বলে অনুমিত হয়েছে। ১১·৩ সারণীতে এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য মেয়াদে মঞ্জুরীকৃত ৪,০৫৯টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে ২,৩২৩টি ইউনিট চালু হয়েছিল, ৫৬৯টি ইউনিট যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ চলছিল এবং ১,১৬৭টি ইউনিট বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে ছিল।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০—৮৫)

১১·১২ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩—৭৮) এবং দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮—৮০) সম্পূর্ণ হওয়ার পর শিল্প খাত স্বাধীনতার যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে কাটিয়ে উঠেছে এবং কিছুটা সম্প্রসারিতও হয়েছে। ১৯৭০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে অর্জিত সাফল্যগুলো সুসংহত হওয়ার পর এবং মূলধন পণ্য উৎপাদনক্ষম কয়েকটি মৌলিক শিল্প স্থাপন সম্পূর্ণ হওয়ায় অব্যাহত শিল্প বিকাশের একটা বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১১·১৩ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার ফলে, শিল্প কার্যক্রমগুলো দেশের কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহায়তা যোগানোর উপযোগী করে প্রণীত হয়েছে। তবে সামগ্রিকভাবে সম্পদের অভাব শিল্প খাতে বিনিয়োগ সীমিত করবে এবং শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে অধিকতর যাছ-বিচার করতে হবে। সুতরাং এই পরিকল্পনা শিল্প খাতে মোটামুটি প্রবৃদ্ধি অনুমান করছে, যদিও অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোগত পরিবর্তনও অব্যাহত প্রবৃদ্ধির স্বার্থে এই খাতের দ্রুততর বিকাশ একান্ত বাঞ্ছনীয়। উল্লেখ্য যে, শিল্পের জন্য পরিকল্পিত প্রবৃদ্ধির হার মাত্র ৮·৩ শতাংশ।

পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ

১১·১৪ নিম্নবর্ণিত প্রধান লক্ষ্যগুলোর ভিত্তিতে শিল্প খাতে বিনিয়োগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত এবং বিনিয়োগের অগ্রাধিকার নির্ধারিত হবে:

(১) কৃষি সহায়তামূলক ও কৃষিভিত্তিক শিল্প ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে খাদ্য ও কৃষি খাতের দ্রুত সম্প্রসারণে সমর্থন দান;

(২) কাপড়, ঔষধপত্র ও উপভোগ পণ্যের মত জরুরী ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বাড়িয়ে জনসাধারণের মৌল চাহিদাগুলো মেটানো;

(৩) সর্বাধিক শ্রম ও দেশজ সম্পদ ব্যবহারের প্রতি সর্বাধিক খেয়ালসহ রপ্তানীমুখী ও আমদানীর বিকল্প পণ্য উৎপাদক শিল্পগুলোর দ্রুততর বিকাশের মাধ্যমে বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য পরিস্থিতির উন্নতি সাধন;

(৪) গ্রামীণ শিল্পোন্নতির মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে কর্মসংস্থানের প্রতি বিশেষ জোর দিয়ে কর্ম সংস্থানের সুযোগ-সুবিধে সৃষ্টি;

(৫) শিল্পগুলোকে যুক্তিসংগত ভিত্তিতে দেশের নানা স্থানে ছড়িয়ে দিয়ে একটা সুষম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ আঞ্চলিক উন্নয়ন; এবং

(৬) যেসব মূল শিল্প ইতিমধ্যেই স্থাপিত হয়েছে সেগুলোর ভিত্তি মজবুত করে তুলে অর্থনীতির সার্বিক বিকাশের বুনিয়াদ স্থাপন।

সারণী ১১·৩

বেসরকারী খাতে মঞ্জুরী এবং প্রকৃত বিনিয়োগ

(চলতি মূল্যে)

[কোটি টাকায়]

বছর	বিনিয়োগ শুরুসিলে ব্যয়		মঞ্জুরীকৃত বিনিয়োগ		আনুষাঙ্গিক বিনিয়োগ	
	মোট	বৈদেশিক মুদ্রা	মোট	বৈদেশিক মুদ্রা	মোট	বৈদেশিক মুদ্রা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৯৭৩/৭৪	৩০·০০	১৮·১৪	৮·৭৪	৩·৮৩	৮·২৪	৩·৭৬
১৯৭৪/৭৫	৭০·০০	৩২·৯১	১৫·০৫	৬·০৯	১৩·৩২	৫·৪১
১৯৭৫/৭৬			৭০·১২	৩৬·৪৫	১৯·৮০	৮·৯২
১৯৭৬/৭৭	১৪১·০০	১১২·৫০	৮০·৯৯	৩৮·২২	৬২·০০	২৮·২৯
১৯৭৭/৭৮			১০৯·১৪	৮৭·৮৩	৯৭·৫০	৩০·৪৪
১৯৭৮/৭৯	৪৬৮·০০	২৩২·৬০	২১৭·৯২	৯৩·১১	৯৮·২০	৩৬·৫০
১৯৭৯/৮০			৪৩৪·৩৩	১৬৫·১৩	১৩০·৬৭	৫০·৬৭
মোট ..	৭৩৯·০০	৩৯৬·২৪	১০৩৬·২৮	৪৩১·০০	৪২৯·৭৩	১৪৩·০৯

শিল্পোন্নয়নের নীতি কৌশলাদি

১১·১৫ বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় শিল্পনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো গুরুত্ব লাভ করেছে সেগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলোতে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলঃ

১১·১৬ গ্রামীণ শিল্পোন্নয়নঃ কৃষি কাজের বাইরে কর্মসংস্থান ও উপার্জনের সুযোগ-সুবিধে সৃষ্টি, সর্বনিম্ন পর্যায়ের প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র (Growth Centres)-গুলোতে শিল্প বিকাশ উন্নয়ন, মৌল চাহিদামূলক বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহের উদ্দেশ্যে শিল্পনীতির বিশেষ লক্ষ্য হবে পল্লী এলাকাগুলোতে মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের উন্নয়ন। এই শিল্পগুলোর বেশীর ভাগ হবে কৃষিভিত্তিক ও কৃষি সহায়তামূলক। এগুলো যতদূর সম্ভব বেশী করে স্থানীয় সম্পদ ও শ্রম প্রধান প্রযুক্তি ব্যবহারের অনুকূল হবে। পল্লী অঞ্চলে শিল্প স্থাপনের দায়িত্ব হবে মূলতঃ বেসরকারী শিল্প উদ্যোক্তাদের, তবে সরকার পল্লী অবকাঠামোর উন্নয়ন, উপযোগ সরবরাহ, দক্ষতা সৃষ্টির জন্য শিল্পী কারিগরদের প্রশিক্ষণ দান এবং সহায়ী ভিত্তিতে পণ্য উন্নয়নসহ ব্যাপক প্রেরণা দান, উন্নয়নমূলক তৎপরতা, উপদেশনা ও আনুষংগিক তৎপরতা গ্রহন করবেন। শিল্প ও সেবামূলক সুবিধা উন্নয়নে পল্লী এলাকায় ঋণ যোগানোর জন্য বিশেষ প্রয়াস চালানো হবে।

১১·১৭ স্বনির্ভরতা বিকাশঃ আমদানীর উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস ও স্বনির্ভরতার উন্নতি বর্ধনের লক্ষ্যে শিল্প সুনিয়ন্ত্রণকে বহুমুখী করে এবং ক্রমান্বয়ে অধিক কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরী, পাট, তুলা, চিনি চা ও চর্ম শিল্পের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ, বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের নানা অংশ মৌলিক ও

মাধ্যমিক রাসায়নিক দ্রব্যাদি ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। দেশে ইতিমধ্যেই ওয়ার্কশপের সাজসরঞ্জাম, ডিজেল ইঞ্জিন ও পাম্প ইত্যাদির উৎপাদন শুরু হয়েছে। পরিকল্পনাকালে এসবের উৎপাদনের আরও উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা হবে যাতে এগুলোর চাহিদা স্থানীয়ভাবেই মেটানো যায়। একইভাবে, যতটা সম্ভব মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পগুলোর যন্ত্রপাতির প্রয়োজন মেটানোর জন্য সেগুলো নির্মাণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

১১·১৮ রপ্তানী বিভিন্নমুখীকরণঃ আমদানী পণ্যের বিকল্প উৎপাদনের প্রতিই এ পর্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করার ফলে রপ্তানীযোগ্য শিল্প পণ্যের প্রসার এ দেশে খুবই সংকীর্ণ। পণ্য ব্যবহারকারীদের পছন্দ বদল, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান অক্ষুণ্ণ রাখার লক্ষ্যে পণ্যের উচ্চ গুণগত মান রক্ষার প্রয়োজনীয়তা, পুঁজি ও দক্ষতার ঘাটতি, অনুপযুক্ত উপকরণ ও উৎপাদনমূল্য এবং উদ্ভাবনী সামর্থ্যের অভাব ইত্যাদি রপ্তানীমূলক উৎপাদন বৃদ্ধিকে ব্যাহত করে। আমদানীর বিকল্প সৃষ্টির সুযোগ অবিরাম সংকোচন এবং বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধান সৃষ্টির ফলে ঐসব রপ্তানীমুখী পণ্য উৎপাদনে সম্প্রসারণ ও ভিন্নমুখী উন্নয়নে গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন যেসব পণ্য উৎপাদনে বাংলাদেশের তুলনামূলক সুবিধে রয়েছে। এ ক্ষেত্রে, বিশেষ করে স্থানীয় সম্পদভিত্তিক রপ্তানীমুখী শিল্প যেমন সার, নিউজপ্রিন্ট, চামড়া, প্রক্রিয়াজাত ফল ও শাকসব্জী, বিশেষ ধরণের সুতিবস্ত্র ও পাটজাত বস্ত্র, তৈরী পোশাক পরিচ্ছদ, হস্তশিল্প ও সৌখিন সামগ্রী ইত্যাদি শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে চেষ্টা চালানো হবে।

১১·১৯ উৎপাদন ক্ষমতা সদ্ব্যবহারের উন্নতিঃ সরকারী-বেসরকারী উভয় খাতের বর্তমান শিল্প ইউনিটগুলোর উৎপাদন ক্ষমতার সদ্ব্যবহারের উন্নতি বিধানই হচ্ছে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির আশু উপায়। প্রধানতঃ সময়মত ও চাহিদা অনুযায়ী কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ এবং পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে এটি নিশ্চিত করতে হবে। এতে খুব সামান্য বা প্রান্তিক বিনিয়োগের বদৌলতে উৎপাদনের পরিমাণ দ্রুত বাড়বে, উৎপাদনের ইউনিট ব্যয় কমবে, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর বিক্রয় ও মুনাফা বৃদ্ধি পাবে এবং আভ্যন্তরীণ সম্পদের আরও বেশী মাত্রায় সংগ্রহ সুনিশ্চিত হবে। ১৯৭৯/৮০ সালে শিল্প উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহারের হার ছিল যথাক্রমে পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনে ৬৮ শতাংশ, সুতো ৬৭ শতাংশ, ইউরিয়া ৮১ শতাংশ, টিএসপি ৪৭ শতাংশ, ইস্পাত পিন্ড ৫৩ শতাংশ এবং ডিজেল ইঞ্জিন ৩০ শতাংশ। এ থেকে দেখা যায়, উৎপাদন ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানো যায়।

১১·২০ যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিরূপিত উৎপাদন ক্ষমতার চেয়ে চলতি উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে কম এবং যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত শিফট পরিচালনা সম্ভব হচ্ছে না সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে উৎপাদন ক্ষমতা অকেজো অবস্থায় পড়ে থাকছে উল্লেখিত দুটি ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মাত্রায় উৎপাদন ক্ষমতা কাজে লাগাতে হলে ব্যবস্থাপনা সামর্থ্য বৃদ্ধিকরণ, উৎপাদনশীলতার সংগে সম্পর্কিত নানারকম উৎসাহ প্রদানমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন, কারখানার পরিবেশ উন্নয়ন, দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সর্বাংগীন প্রশিক্ষণ স্কীম বাস্তবায়ন এবং প্রয়োজনবোধে সামঞ্জস্য বিধান, আধুনিকায়ন ও পণ্য বহুমুখী-করণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১·২১ কারিগরী দক্ষতার উন্নয়নঃ দেশে বিদ্যমান প্রযুক্তি থেকে সর্বাধিক উপকৃত হবার জন্যে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক প্রয়াস চালানো হবে। একই সংগে প্রযুক্তিগত পরনির্ভরশীলতা হ্রাসের লক্ষ্যে একটি উপযুক্ত স্থানীয়-প্রযুক্তি বুনিয়াদ সৃষ্টির প্রয়াস চলবে। এই উদ্দেশ্যে, গবেষণা ও প্রযুক্তি উন্নয়ন তৎপরতায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলোর শক্তি বৃদ্ধি ছাড়াও (১) দেশের ধাতব শিল্পের ভিত্তি গড়ে তোলার বিশেষ লক্ষ্যে একটি ধাতুবিদ্যা ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা ও (২) বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিজাইন ও উৎপাদন প্রকৌশলে একটি বিশেষীকৃত স্নাতকোত্তর কোর্স প্রবর্তনের মত সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম এই পরিকল্পনা মেয়াদে হাতে নেয়া হবে।

কার্যক্রমসমূহের বিশেষ বিশেষ দিক

১১·২২ পাট বয়ন শিল্পঃ এটি বাংলাদেশের বৃহত্তম শিল্প এবং রপ্তানী খাতের মোট আয়ের ৫৩·৭ শতাংশ এই শিল্পেরই অবদান। বিগত কয়েক বছরে তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় কৃত্রিম তন্তুগুলোর তুলনায় পাটজাত পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানের উন্নতি হয়েছে তবে অত্যধিক মুদ্রাস্ফীতি ও সেই সংগে বিরাজমান বাণিজ্যিক মন্দাবস্থার জন্য পাট বয়ন শিল্পের বিশেষতঃ কার্পেটের চাহিদা কমে গেছে। এ কারণে, পাটজাত পণ্য উৎপাদন সম্প্রসারণের একটি মোটামুটি আকারের পরিকল্পনা করা হয়েছে যার আওতায় ১৯৭৯/৮০ মেয়াদের ৫·৩৮ লাখ টনের তুলনায় ১৯৮৪/৮৫ মেয়াদে ৬·৫০ লাখ টন পাটজাত

পণ্য উৎপাদন এবং ১৯৭৯/৮০ মেয়াদের ৪·৪০ লাখ টনের তুলনায় ৫·১০ লাখ টন পাটজাত পণ্য রপ্তানী করা হবে বলে ধরা হয়েছে। উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোর মধ্যে থাকবে শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য সর্বাংগীন প্রশিক্ষণ প্রকল্প, ব্যবস্থাপনা সামর্থ্য উন্নয়ন, প্রয়োজনমত যন্ত্রপাতির সুষমকরণ, পণ্য মানের উৎকর্ষ সাধন এবং নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবন। পাটের ভবিষ্যৎ নিরাপদ করার লক্ষ্যে পাট উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা উন্নয়নের চেষ্টা চলবে।

১১·২৩ **সুতীবস্ত্রঃ** খাদ্যের পরেই দেশে সুতী কাপড়ের চাহিদা সর্বাধিক। অন্যতম মৌলিক চাহিদা হিসাবে পরিকল্পনার শেষ বছর মাথাপিছু প্রায় ১০ গজ করে কাপড় সরবরাহের পরিকল্পনা করা হয়েছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও পল্লী উন্নয়নের চালিকা শক্তি হিসেবে বস্ত্র শিল্পকে কাজে লাগানো হবে। আধুনিক সুতাকলগুলো চাহিদা মত সুতো উৎপাদন করতে পারলে গোটা দেশে ছড়িয়ে থাকা তাঁতীদের জন্য কাজের ব্যবস্থা হবে। আঞ্চলিক উন্নয়নের প্রতি নজর রেখে নূতন সুতাকলগুলোকে এমনভাবে স্থাপন করা হবে যাতে ওগুলো দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকে। সে অনুযায়ী প্রায় ৯৮ কোটি গজ কাপড় উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে, যার মধ্যে ৮৭·৮ কোটি গজ প্রধানতঃ হস্তচালিত তাঁতে উৎপাদিত হবে। সুতো তৈরীর মোট ক্ষমতা ১৯৭৯/৮০ মেয়াদের ১০·৬২ লক্ষ টাকা থেকে ১৯৮৪/৮৫ মেয়াদ নাগাদ ১২·৬৯ টাকাতে দাঁড়াবে ও তার ফলে সুতোর উৎপাদন প্রায় সাত কোটি পাউন্ডে বৃদ্ধি পাবে। সরকারী খাতের উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোর মধ্যে থাকবে, ৩টি নতুন সুতাকল স্থাপন, ৩টি কাপড়ের কলের সুষমকরণ ও সম্প্রসারণ, ২২টি পুরনো কলের পুনর্বাসন, তুলা ও বীজ পৃথকীকরণ কারখানা ও একটি ক্ষুদ্রশিল্প উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন। তৈরী কাপড়, বিশেষ ধরণের বস্ত্র ও তৈরী পোশাক-পরিচ্ছদ শিল্প বেসরকারী খাতেই থাকবে। নতুন শিল্প নীতির আওতায় বেসরকারী খাতে সুতাকল স্থাপন করা হবে। সরকার ইতিমধ্যে কিছু সুতো ও কাপড়ের কল বেসরকারী মালিকানায় ছেড়ে দিয়েছেন। ইতিমধ্যে বেসরকারী খাতের জন্য ৭২টি সুতাকল বসানোর মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে। টেরী টাওয়েল, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, টেবিল ক্লথ, ন্যাপকিনের মত বিশেষ ধরণের বস্ত্র, হোসিয়ারী দ্রব্যাদি ও তৈরী জামা-কাপড়ের জন্য বিদেশে চাহিদা থাকায় এ ধরণের শিল্প সম্প্রসারণের ভাল সম্ভাবনা রয়েছে।

১১·২৪ হস্তচালিত তাঁতগুলোর জন্য সুতার সরবরাহ নিশ্চিত করা ছাড়াও তাঁতীদের উৎপাদন ও আয় বাড়ানোর জন্য অচল হয়ে থাকা তাঁতগুলোকে সচল করে তোলা ও হস্তচালিত তাঁতগুলোকে অর্ধ স্বয়ংক্রিয় তাঁতে রূপান্তরিত করার কাজ হাতে নেওয়া হবে। এছাড়া, উৎপাদন ও উৎপাদিত পণ্যের মানের উন্নতি, দক্ষ বিপণন ও বিতরণ সুবিধে নিশ্চিত করার জন্য তাঁতীদের সমবায় সংগঠন, গবেষণা ও প্রশিক্ষণের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১·২৫ বাংলাদেশে রেশম চাষ উন্নয়নের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। এই শিল্পের উন্নয়নের জন্য সরকারী খাতের সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলোর অগ্রাধিকার প্রধানতঃ তুঁত গাছের চারা সরবরাহ, উন্নত জাতের গুটিপোকার স্বাস্থ্যসম্মত চাষ, গুটিপোকা পালন সম্প্রসারণ এবং বেসরকারী উদ্যোক্তাদের সম্প্রসারণ সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে পাইলট রিলিং ইউনিট স্থাপন করা হবে।

১১·২৬ **ইস্পাতঃ** ইস্পাত আধুনিক শিল্পের মেরুদণ্ড। পৃথিবীতে বছরে মাথাপিছু গড় ইস্পাত দ্রব্য ব্যবহারের পরিমাণ ১৮৫ কিলোগ্রাম; সে তুলনায় বাংলাদেশে বর্তমানে বার্ষিক মাথাপিছু গড় ইস্পাত ব্যবহারের পরিমাণ বড়জোর ৪ কিলোগ্রাম। এটি বাংলাদেশের তুলনামূলক অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা ও শিল্পোন্নয়নের নিম্নমাত্রাকে প্রতিফলিত করে। বাংলাদেশে ২,৫০,০০০ টন উৎপাদন ক্ষমতার একটি ক্ষুদ্র ইস্পাত মিল রয়েছে। তবে প্রায়োগিক অসামা ও পরিচালনাগত অসুবিধের কারণে এই মিলের উৎপাদন ক্ষমতার অর্ধেক মাত্রাতেও উৎপাদন হয় কিনা সন্দেহ। এ কারণে নিরূপিত উৎপাদন ক্ষমতায় উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিতে চট্টগ্রাম ইস্পাত কারখানাকে সুষমকরণের কাজ হাতে নেওয়া হবে।

১১·২৭ দেশে লৌহ আকরিকের কোন খনি নেই এবং দেশের অভ্যন্তরে ভাংগা লোহালক্কড়ের বাজার এত সীমিত যে তা একটা আধুনিক ইস্পাত কারখানা চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন যোগাতে পারে না। এজন্য ইস্পাত শিল্প খাতের সম্প্রসারণের জন্য পুরোপুরি আমদানী করা কাঁচামাল ও বিলেটের মত মাধ্যমিক পণ্যের উপর নির্ভরশীল হতে হবে। দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের তুলনামূলক প্রাচুর্য আমদানী করা লৌহের আকরিক থেকে সরাসরি হ্রাস প্রক্রিয়ায় ইস্পাত তৈরীর সুবিধা প্রদান করেছে। সরাসরি হ্রাস প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক গ্যাসকে সরাসরি প্রক্রিয়ায় অংগ উপাদান হিসেবে এবং পরোক্ষভাবে জ্বালানী শক্তি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এভাবে উৎপাদিত স্পঞ্জ লোহা বিদেশে রপ্তানী করা যায় কিংবা ইস্পাত তৈরীতেও কাজে লাগানো যায়। এই প্রক্রিয়ার সুবিধাজনক দিক থেকে ফল লাভের জন্য একটি স্পঞ্জ লৌহ কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে বিশদ কারিগরী ও অর্থনৈতিক সমীক্ষার কাজ হাতে নেওয়া হবে।

১১·২৮ মূলধন পণ্য ও খুচরা যন্ত্রাংশ উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে বিশেষ ধরণের ইস্পাতের প্রয়োজন। এছাড়া, বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্য ল্যাটিস টাওয়ারের কাঠামো নির্মাণ এবং সেই সংগে টেলিগ্রাফ, রেডিও ও টেলিভিশন টাওয়ার নির্মাণের জন্য বিপুল পরিমাণ উচ্চমাত্রার প্রসারণ-সাধ্য ইস্পাতের প্রয়োজন হবে। অন্বেষণ ও গবেষণাগার সরঞ্জাম, ওয়ার্কশপের হাতিয়ার ও সাজসরঞ্জাম, হাতে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি ও কাটলারী প্রভৃতি উৎপাদনের জন্যও যথেষ্ট পরিমাণ বিশেষ ইস্পাত/স্টেনলেস স্টীলের প্রয়োজন হবে। বর্তমানে সকল রকমের বিশেষ ইস্পাত/স্টেনলেস স্টীল আমদানী করা হয়। এই পণ্যগুলোর বিকল্প উৎপাদনের জন্য, বছরে ৫০,০০০ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি এ্যালয় (সংকর) ইস্পাত কারখানা স্থাপন করা দরকার। এই কারখানাটি বেসরকারী খাতে হলে ভাল হয়।

১১·২৯ প্রকৌশলঃ পরিকল্পনায় খাদ্য ও কৃষি এবং পল্লী উন্নয়নের প্রতি মনোনিবেশ করলেও প্রকৌশল পণ্যের চাহিদা অনেক বাড়বে। কৃষি খাতে সেচ কার্যক্রমগুলোকে সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশ ডিজেল কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ার সংগে সংগে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির পরিপূর্ণ স্থানান্তরও ঘটবে। এছাড়া, বছরে ১০,০০০ লোহস-পাওয়ার ইঞ্জিন উৎপাদনের জন্য একটি নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা স্থাপন করা হবে।

১১·৩০ দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বর্তমান শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতিস্থাপনের চাহিদা অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে মেটানোর জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা হবে। এই উদ্দেশ্য সাধনে বস্ত্রশিল্প, ট্রানিকল, চা ফ্যাক্টরী, তুলোবীজ থেকে তুলো ছাড়ানোর কারখানা, চাউল কল, ময়দা কল, তৈল কল, হিমাগার, রেল ওয়াগন ইত্যাদির জন্য যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ উৎপাদনের লক্ষ্যে দেশের বর্তমান ঢালাই, ফোর্জিং, হীট ট্রিটমেন্ট মেটাল ওয়ার্কিং ও কাঠামো নির্মাণের ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করা হবে। পাট ও কাপড়ের কলের কিছু কলকব্জা ও যন্ত্রাংশ এর মধ্যেই দেশে উৎপাদিত হতে শুরু করেছে। এগুলোর বাড়তি চাহিদা মেটানোর জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় চট্টগ্রামের গুলফ্রা-হাবিব লিমিটেড-এর সম্প্রসারণের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরীতে এজন্য একটি নতুন উৎপাদন ব্যবস্থাও সৃষ্টি করা হবে।

১১·৩১ গৃহনির্মাণ, পানি সরবরাহ ও গ্যাস বিতরণ প্রভৃতি কাজে সাধারণ ও গ্যালভানাইজড্ এই উভয় প্রকার মাইল্ডস্টীল পাইপের চাহিদা পরিকল্পনা মেয়াদে যথেষ্ট বেড়ে যাবে। এজন্য, ন্যাশনাল টিউবস লিমিটেডের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো ছাড়াও ৪" বা তদূর্ধ্ব ব্যাসের পাইপ/টিউব উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত অবস্থানে নতুন উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টি করা হবে।

১১·৩২ পল্লী বৈদ্যুতিকীকরণ কার্যক্রমের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য চট্টগ্রাম ইস্টার্ণ কেবলস্ লিমিটেডের প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৯৪৪/৪৫ সাল নাগাদ বৈদ্যুতিক কেবল/কন্ডাকটরের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৯,০০০ টনে উন্নীত করা হবে।

১১·৩৩ পরিবহন খাতে বর্তমান চাহিদা মেটানোর জন্য খুলনা শিপইয়ার্ড ও নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড এ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস যথেষ্ট পরিমাণে আমদানীর বিকল্প ব্যবস্থা করার জন্য মৌযান, মাছ ধরার ট্রলার ও অন্যান্য জলযান উৎপাদনের জোরদার কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

১১·৩৪ পল্লী উন্নয়ন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল বিষয়। শহরকেন্দ্রীক অর্থনৈতিক উন্নয়নের "ছিটেফোঁটা প্রভাবের" (Trickle-down effect) অপর্যাপ্ততার স্বীকৃতি দিয়ে সরকার পল্লী উন্নয়নের অনুঘটক এজেন্ট হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হাটবাজারগুলিতে প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ কারণে, স্থানীয় ও জাতীয় চাহিদা মেটানোর জন্য ঐ প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রগুলির চতুর্দিকে নানাবিধ গ্রামীণ শিল্প স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। উন্নত ধরণের গরুর গাড়ী, সাইকেল, ভি-১৯মান, রিকশা ইত্যাদির মত গ্রামীণ যানবাহন, ধানভাংগা ও মাড়াইয়ে ব্যবহারযোগ্য সহজ যন্ত্রপাতি, তেল নিষ্কাশন যন্ত্র, কাপড় বোনার কল ইত্যাদি এসব শিল্পের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রয়োজনের প্রকৃতি ও চাহিদা অনুযায়ী এসব গ্রামীণ শিল্পগুলোর মেরুদন্ড হিসেবে ঢালাই ও মেরামত কারখানার মত কিছু মৌলিক সুযোগ-সুবিধে কেন্দ্রীয় স্থানে স্থাপন করতে হবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা মেয়াদে আনুমানিক এ রকম ৪০০ ছোট ঢালাই ও মেরামত কারখানা স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে। দৃষ্টান্তমূলক উদ্যোগ হিসেবে এর মধ্যে ২০০ ইউনিট সরকারীভাবে স্থাপন করা হবে, যাতে এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসার ব্যাপারে বেসরকারী খাতের দ্বিধাগ্রস্ততা কেটে যায়। আনুমানিক তিন বছরকাল সফল বাস্তবায়ন ও পরিচালনার পর এসব কারখানা আগ্রহী বেসরকারী উদ্যোক্তাদের হাতে ছেড়ে দেয়া হবে।

১১·৩৫ শহর বিদ্যুতায়নে স্বাভাবিক সম্প্রসারণ ও সেই সাথে পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের ফলে সকেট, প্লাগ, সুইচ, সিলিং রোজ, ফিউজ, ব্রেজ, কাটআউটস, ওআরস ও ব্যাবল, সুইচ গিয়ার, বৈদ্যুতিক বাল্ব, ট্রান্সফরমার, বিদ্যুতের মিটার, ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার, ডিস্ট্রিবিউশন বক্স ইত্যাদির মত বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও আনুষংগিক জিনিসপত্রের বিপুল চাহিদা দেখা দেবে এবং এ পরিস্থিতি মাঝারি ও ছোট আকারের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম কারখানায় বেসরকারী পুঁজি বিনিয়োগের জন্য এক ব্যাপক বুনিয়াদের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

১১·৩৬ বাংলাদেশের শিল্প, যানবাহন, যোগাযোগ, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার ও বাড়িঘরে ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের ব্যবহার ক্রমবর্ধমানভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ দেশে অল্প কয়েকটি ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ও সামগ্রী সংযোজন ইউনিট রয়েছে; কিন্তু এগুলোর মূল্য সংযোজনের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে নগণ্য। এজন্য কিছু সহজ ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ও মৌলিক উপাদান উৎপাদনের একটা কারখানা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়েছে। যেসব সাধারণ ইলেকট্রনিক উপকরণ উৎপাদন করা হবে সেগুলোর মধ্যে থাকবে বৈদ্যুতিকযোজক ট্রানজিস্টরস, ক্যাপাসিটরস, পাওয়ার প্যাক, রেগুলেটর, ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার, রেকটিফায়ার্স, ইন্টারমিডিয়েট ফ্রিকোয়েন্সী ট্রান্সফর্মারস, এমপ্লিফায়ারস, টিভি টিউনার্স, টিভি কয়েল, শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র, ব্যাটারী এলিমিনেটরস ইত্যাদি। উপকরণ উৎপাদনের এই কারখানা পল্লী এলাকার গৃহভিত্তিক শিল্পগুলোতে রেডিও, টিভি, ট্রানজিস্টর, এমপ্লিফায়ার, রেকর্ড প্লেয়ার ইত্যাদি সংযোজনের জন্য সাব-কন্ট্রাক্ট ভিত্তিতে উপকরণ সরবরাহ করবে।

১১·৩৭ সারঃ পরিকল্পনার শেষ বছরে রাসায়নিক সারের (ইউরিয়া, টিএসপি ও এমোনিয়াম সালফেট) উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১০·৩৭ লাখ টন, এর মধ্যে শুধুমাত্র ইউরিয়া উৎপাদনের পরিমাণই ৯·২৭ লাখ টন হবে বলে ধরা হয়েছে। পরিকল্পনার শেষ বছরে দেশে ইউরিয়ার মোট চাহিদার পরিমাণ হবে ৮·৩০ লাখ টন; ফলে রপ্তানীর জন্য সামান্য উদ্বৃত্ত থেকে যাবে। সার উপ-খাতের উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোর মধ্যে থাকবে আশুগঞ্জে নির্মীয়মান ইউরিয়া কারখানা সম্পূর্ণকরণ, ঘোড়াশালে বার্ষিক ১,০০,০০০ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি নতুন ইউরিয়া কারখানা নির্মাণ এবং ঘোড়াশাল (ইউরিয়া) ও চট্টগ্রামের (টিএসপি) সার কারখানাগুলোর পুনর্বাসন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদে প্রতিটিতে বার্ষিক মোট ৫,৬০,০০০ টন উৎপাদন ক্ষমতার আরও দুটি ইউরিয়া সার কারখানা বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেয়া হবে। এর মধ্যে একটি কারখানা সার রপ্তানীকল্পে বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগকারীদের সাথে যৌথভাবে প্রতিষ্ঠা করা হবে।

১১·৩৮ মন্ড ও কাগজঃ রপ্তানী করার মত বিপুল উদ্বৃত্ত উৎপাদনের জন্য মন্ড ও কাগজ শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতাকে আরও দক্ষতার সংগে কাজে লাগানো হবে। দেশজ কাঁচামাল সরবরাহ পরিস্থিতি ও রপ্তানীর সম্ভাবনা বিবেচনায় রেখে বিদেশী বাজারের জন্য মন্ড, নিউজপ্রিন্ট, ছাপা ও লেখার কাগজের উৎপাদন ক্ষমতা আরও বৃদ্ধির সম্ভাবনার বিষয়টি যাচাই করে দেখতে হবে।

১১·৩৯ ভেষজ ঔষধপত্রঃ দেশজ কাঁচামাল, শিল্পের নানা বর্জ্য পদার্থ ও সেই সংগে আমদানী করা মাধ্যমিক পণ্যের সাহায্যে মানব ও গবাদির ঔষধ তৈরীর লক্ষ্যে মৌলিক ভেষজ কাঁচামাল ও সূক্ষ্ম রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধে সৃষ্টি করা হবে। একই সংগে, অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর ভেষজ ও ঔষধপত্র উৎপাদন রহিত করার জন্যও ঔষধপত্র উৎপাদন ক্ষমতা যুক্তিসংগতভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হবে। এগুলোর অন্তর্ভুক্ত থাকবেঃ শ্বেতসার, গ্লুকোজ, ঔষধ শিল্পে ব্যবহার্য চিনি, গ্লিসারিন, সোর্বিটাল, সাইট্রিক এসিড, কিছু এন্টিবায়োটিক ও ভিটামিন, স্টেরয়ড্স ও হরমোনস।

১১·৪০ চিনিঃ ১৯৭৯/৮০ মেয়াদে দেশে অনুমিত ১·৫০ লাখ টন চিনি ব্যবহারের মধ্যে চিনি উৎপাদনের মোট পরিমাণ ছিল ০·৯৩ লাখ টন। আখ সরবরাহ বাড়ানোর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে, পরিকল্পনায় সীমিত আকারের চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। ১৯৮৪/৮৫ সালের জন্য ২·০ লাখ টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল। উন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ দুটি পুরোনো চিনিকল প্রতিস্থাপন করে সরকারী খাতে অতিরিক্ত চিনি উৎপাদন ক্ষমতা ৬০,০০০ টন বৃদ্ধি; বর্তমান চারটি চিনিকলের সম্প্রসারণ এবং বার্ষিক ১৫,০০০ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি নতুন চিনিকল স্থাপন। উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোতে একর প্রতি আখের ফলন বৃদ্ধি; অধিক পরিমাণ চিনি উপাদান সম্বলিত উন্নতজাতের আখের চাষ এবং ক্ষেত থেকে চিনিকলে আখ পরিবহনের উন্নততর ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

১১·৪১ সিমেন্টঃ নির্মাণ খাতে ক্রমবর্ধমান সিমেন্টের চাহিদা মেটানোর জন্য ছাতক সিমেন্ট কারখানার বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা (বার্ষিক ৯০,০০০ টন) প্রয়োজনীয় সুষমকরণ ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে বার্ষিক ১·৬৫ লাখ টনে উন্নীত করা হবে। তাছাড়াও সিমেন্টের ক্ষেত্রে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য

দ্বিতীয় পরিকল্পনা মেয়াদে জয়পুরহাট চুনাপাথর উত্তোলন ও সিমেন্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ সুচনা করা হবে। এই প্রকল্পে চুনাপাথর উত্তোলন ও সিমেন্ট উৎপাদনের বার্ষিক ক্ষমতা হবে যথাক্রমে ১৭·০০ লাখ টন ও ১০·০০ লাখ টন। বেসরকারী খাতেও বর্ধিত উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টিতে উৎসাহ দেয়া হবে।

শিল্পোন্নয়নে বিবেচ্য বিষয়াদি

১১·৪২ সরকারী খাতে ব্যবস্থাপনা দক্ষতার উন্নয়নঃ শিল্পে সরকারী খাতের প্রাধান্যের প্রেক্ষিতে এই খাতের ব্যবস্থাপনা দক্ষতার উন্নতি বিধান ও তা অব্যাহত রাখা জাতীয় অর্থনীতির সার্বিক উন্নতি নিশ্চিতকরণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যবস্থাপনা দক্ষতার বিষয়টি তাই নিরবচ্ছিন্ন পর্যালোচনাধীন থাকবে এবং সরকারী খাতের অগ্রগতিতে উদ্ভূত সমস্যাবলী সমাধানের জন্য বিরামহীন প্রয়াস চলবে। এ রকম কতকগুলো সুনির্দিষ্ট সমস্যা হচ্ছেঃ কর্মচারীদের মেধা, দক্ষতা ও উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী পুরস্কৃত করতে সরকারী খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলোর স্বাধীনতার অভাব, শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে বাস্তব অন্তরায়, এবং উৎপাদন পরিকল্পনা, ক্রয় ও ভাণ্ডার ব্যবস্থাপনা, আর্থিক পরিকল্পনা, বাজার গবেষণা ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমে অপ্রতুলতা ইত্যাদি। সরকার ও সংস্থাগুলোর (কর্পোরেশন) মধ্যকার সম্পর্ক, সংস্থাগুলোর অভ্যন্তরে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষীয় পদসোপানগুলোর মধ্যে কর্তব্য ও দায়িত্ব বণ্টন এবং বিভিন্ন কর্পোরেশন ও তাদের আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার সম্পর্ক বিশেষতঃ বিভিন্ন স্তরে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বণ্টনের পরিমাণ ও পরিসর প্রভৃতি বিষয় পরীক্ষা করে দেখা একান্ত জরুরী। ব্যবস্থাপনা দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত শর্তে ম্যানেজিং এজেন্ট নিয়োগসহ অন্যান্য সকল বিকল্প ব্যবস্থা সরকারকে বিবেচনা করতে হবে। বহু সরকারী সংস্থা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান মূলধন কাঠামোর অপর্যাপ্ততায় ভুগছে এবং সেগুলোর বেশীর ভাগই ঋণ ভারে জর্জরিত। এইসব সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে মূলধন সমঅংশীদারী ঋণের একটা সংগত অনুপাত নিশ্চিত করার জন্য পর্যায়ক্রমিকভাবে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মূলধন কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করা হবে যাতে সেগুলোকে ভর্তুকীর জন্য কিংবা এমনকি রক্ষণাবেক্ষণ, সুষমকরণ ও আধুনিকায়নের তহবিলের জন্যও সরকারের মুখাপেক্ষী না হতে হয় এবং স্বয়ংচালিত হতে পারে।

১১·৪৩ শ্রম সম্পর্কঃ সংগঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য শিল্পে শান্তি ও শৃংখলার পরিবেশ আবশ্যক। প্রকৃত মজুরীতে মুদ্রাস্ফীতির প্রতিকূল প্রভাব ও তা থেকে শ্রম অসন্তোষ গত দেড় দশকে শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনার মধ্যকার সম্পর্ককে পর্যায়ক্রমিকভাবে তিক্ত করে তুলে। ফলে, শিল্প উৎপাদন ও শ্রমের উৎপাদনশীলতা তাৎপর্যপূর্ণভাবে হ্রাস পায়। ১৯৬৯/৭০ মেয়াদের তুলনায় ১৯৭৯/৮০ মেয়াদে শ্রমিক পিছু উৎপাদনশীলতা পাটজাত পণ্যের ক্ষেত্রে ৫৬·৪ শতাংশ, সুতা বস্ত্রের ক্ষেত্রে ৩২·৭ শতাংশ এবং কাগজের ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ হ্রাস পায়। একই সময়ে শিল্প উৎপাদন খাতে প্রকৃত মজুরীও ৬৯·৬ শতাংশ কমে যায়। এতে দেখা যায়, শ্রম উৎপাদনশীলতা প্রকৃত মজুরীর চেয়েও দ্রুততর হারে হ্রাস পাওয়ায় দেশ মূল্যবান উৎপাদন থেকে এবং শ্রমিকরা কল্যাণ লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অনেকগুলো কারণে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হলেও এতে এই মূল সত্যটিও উদ্ঘাটিত হয়েছে যে, শ্রম উৎপাদনশীলতায় বৃদ্ধি না ঘটলে প্রকৃত মজুরীর দিক থেকে শ্রমিকদের কোন লাভ হতে পারে না। মজুরী বৃদ্ধি তাই উৎপাদনের সূচকের ভিত্তিতে নির্ধারিত হতে হবে এবং সেটা এমনভাবে করতে হবে যাতে প্রত্যেক শ্রমিক একটা সুনিশ্চিত মৌল মজুরীর উপর তার উৎপাদন বৃদ্ধির অনুপাতক্রমে নিজ আয় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাড়াতে সক্ষম হয়। ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশ গ্রহণ, কল্যাণমূলক সুযোগ-সুবিধা, দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ, কারখানার পরিবেশ ইত্যাদি অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে নিরবচ্ছিন্ন পর্যালোচনাধীন রাখা প্রয়োজন।

১১·৪৪ পণ্য বিপণন ও মূল্য নির্ধারণঃ সরকারী খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্তমান বিপণন ও বিতরণ ব্যবস্থা অত্যন্ত অসন্তোষজনক। এই ব্যবস্থা বৈষম্যমূলক হওয়ায় এতে অনেক দুর্নীতির উদ্ভব হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। পণ্য সরবরাহের স্বল্পতা এখনও অব্যাহত রয়েছে, ফলে বাজারের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি তুলে নেওয়া সমীচীন মনে হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র খুলে পণ্য বিতরণের যে ব্যবস্থা নিয়েছে তাতে সীমিত সাফল্য সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এই ব্যবস্থা সব রকমের পণ্য বিশেষতঃ যেসব পণ্যের জন্য দেশব্যাপী বিতরণ ব্যবস্থা প্রয়োজন সেসব পণ্যের ক্ষেত্রে কার্যকর নয়। এসব ক্ষেত্রে দেশের সকল অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুমোদিত বিক্রয় এজেন্ট থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রতিটি অঞ্চলের জন্য পণ্যের নির্ধারিত একটি কোটা নির্ণয় করা যেতে পারে এবং যেখানে সম্ভব ভোগ্যপণ্য সরবরাহ সংস্থার নেটওয়ার্ককে এ জন্যে কাজে লাগানো যেতে পারে। বড় বড় সংগঠনে প্রতিষ্ঠানিক ভিত্তিতে ব্যবহারকারীদের সমবায়ও গড়ে তোলা যেতে পারে। উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলোর বাজার পর্যবেক্ষণের একটি ব্যবস্থাও থাকতে হবে, যাতে বিভিন্ন অঞ্চল/জেলার জন্য পণ্যের নির্ধারিত কোটা গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো নিশ্চিত হয়।

১১'৪৫ সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর সরকারকে প্রায় ক্ষেত্রেই অত্যাবশ্যকীয় পণ্যগুলোর মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। সরকারী খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে একদিকে যেমন একচেটিয়া ব্যবসায়ের সুযোগ কিংবা অদক্ষ পরিচালনার কারণে উচ্চ উৎপাদন ব্যয়ের বোঝা সাধারণ ভোক্তার উপর চাপিয়ে দিতে দেয়া যায় না, অপরদিকে বিভিন্ন উপাদান বিশেষতঃ বিদেশ থেকে আমদানীকৃত উপাদানের মূল্য পরিবর্তিত হলে পণ্যের মূল্য নির্ধারণে ঐসব প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত স্বাধীনতা প্রদানের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। একটি প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক লক্ষ্যগুলো কর্মসংস্থান, আঞ্চলিক উন্নয়ন, আয়বণ্টন ইত্যাদির মত সামাজিক লক্ষ্যের সংগে সংগতিপূর্ণ হবেই এমন নয়। যেসব ক্ষেত্রে সরকার কৌশলগত কারণে কোন কোন প্রতিষ্ঠানের পণ্য অর্থনৈতিক বিচারে সংগত মূল্যের চেয়েও কম দামে বিক্রি করতে চান সেসব ক্ষেত্রে সরকারের সামাজিক লক্ষ্যের ব্যয় মেটানোর জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রকাশ্য ভর্তুকি দেয়া উচিত। এতে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা দক্ষতাই কেবল উন্নত হবে তাই নয়, ঐসব প্রতিষ্ঠানের লাভালাভের দিকটিও পরিষ্কার প্রতিফলিত হবে।

১১'৪৬ মজুরী ও পণ্যমূল্য পরস্পর সম্পর্কিত হলেও বাংলাদেশ সরকার এক একটা মেয়াদান্তে মজুরী নীতি নির্ধারণ করেন, কিন্তু সংগে সংগে পণ্য মূল্য নির্ধারণের বিষয়টির প্রতি কোন খেয়াল করা হয় না। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর লোকসান এড়ানোর জন্য পণ্য মূল্য নির্ধারণের একটা স্বয়ংচালিত ব্যবস্থা থাকা দরকার। শিল্প মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে একটা নির্দেশনার রূপরেখা দিতে পারেন।

১১'৪৭ **বেসরকারী খাতের ভূমিকা:** অর্থনীতিতে বেসরকারী খাতের ভূমিকা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শিল্প উন্নয়ন কার্যক্রমে অন্তর্নিহিত গুরুত্বপূর্ণ নিবেদ্য বিষয়গুলোর অন্যতম। দেশের বড় বড় শিল্পগুলোর জাতীয়করণ সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য প্রধানতঃ মিশ্র থেকে গেছে এবং বেসরকারী খাতকে ক্রমবর্ধমান হারে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু সংরক্ষিত তালিকায় বেসরকারী বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধে সীমাবদ্ধ করেছে। এর উপর বিনিয়োগ অনুমোদন মজুরী ইত্যাদির ব্যাপারে প্রশাসনিক জটিলতাও অন্তরায় এবং বিদেশী মুদ্রাসহ স্থানীয় অর্থের অপর্যাপ্ত যোগানেও বিনিয়োগের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাই শিল্পায়নে বেসরকারী খাতকে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হলে পরিকল্পনা মেয়াদে উল্লিখিত বিষয়গুলোর উপর জোর মনোনিবেশ করতে হবে।

১১'৪৮ নতুন নতুন বিনিয়োগ প্রস্তাবের উপর স্বাধীনভাবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা, ফিজিবিলিটী ও প্রকল্প প্রতিবেদন প্রণয়নে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান/বাণিজ্য সংস্থাগুলোকে তাদের সামর্থ্য উন্নত ও শক্তিশালী করতে উৎসাহ দিতে হবে। যেসব ক্ষেত্রে বিদেশী প্রতিষ্ঠানের উপদেশনা ও টিকা সার্ভিস অপরিহার্য সেসব ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতাক্রমে কাজ করতে বলতে হবে যাতে দ্রুত স্থানীয় পর্যায়ে সামর্থ্য গড়ে ওঠে।

১১'৪৯ বিদেশী প্রযুক্তি অর্জন ও আত্মস্থ করা এবং একই সংগে উপযোগী স্থানীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবনে স্থানীয় পর্যায়ের সামর্থ্য জোরদার করে তোলার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১'৫০ অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিল্প জনশক্তির নিরন্তর বিদেশগামী স্রোতের প্রেক্ষাপটে অভিজ্ঞ, দক্ষ ও কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে আকৃষ্ট করার ও ধরে রাখার জন্যে উপযুক্ত বেতন ও উৎসাহদান-মূলক নীতি প্রণয়ন করতে হবে। এ ছাড়া প্রতিভা পাচারের প্রতিকূল প্রভাব স্থানীয় পর্যায়ে পরিহার করার জন্য নিরবচ্ছিন্ন ও সামগ্রিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১১'৫১ দেশের পুরো চাহিদা মেটানোর জন্য স্থানীয় পর্যায়ে যেসব কলকব্জা, সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশ উৎপাদন করা হবে সেগুলোর আমদানী নিরুৎসাহিত করতে হবে। এ ধরণের যেসব পণ্য ইতিমধ্যে দেশে উৎপাদিত হচ্ছে বা যেগুলোর দেশে উৎপাদন সম্ভব সেগুলোর আমদানী নিয়ন্ত্রিত করার জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে।

১১'৫২ মাঝারি, ক্ষুদ্র, কুটির ও পল্লী শিল্পগুলোর আরও ফলদায়ক উন্নয়নের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে জোরদার করা প্রয়োজন।

বিদেশ থেকে বেসরকারী পর্যায়ে প্রেরিত অর্থের উৎপাদনমুখী ব্যবহার

১১'৫৩ ১৯৭৪/৭৫ সাল পর্যন্ত বেসরকারী খাতে বিদেশ থেকে উপার্জিত অর্থ প্রেরণের পরিমাণ প্রায় ২০ কোটি টাকা (২'২৫ কোটি ডলার) থেকে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বৎসরে (১৯৭৭/৭৮) ২২০'২৯ কোটি টাকায় (১৪'৫৭ কোটি ডলার) দাঁড়িয়েছিল। ১৯৭৯/৮০ সালে

দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনাকালের শেষে ঐ অর্থের পরিমাণ আরও বেড়ে ৪০৫·৯৮ কোটিতে (২৬·২৩ কোটি ডলারে) উন্নীত হয়। বিদেশ থেকে বেসরকারী পর্যায়ে প্রেরিত অর্থ বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য পরিস্থিতির উপর নিঃসন্দেহে সুদূর প্রভাব ফেলেছে এবং আভ্যন্তরীণ সম্পদের ঘাটতি পূরণে সহায়ক হয়েছে যদিও একই সংগে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা সৃষ্টিসহ অর্থনীতির উপর কিছু অবাঞ্ছিত চাপেরও সৃষ্টি করেছে। বিদেশ থেকে প্রেরিত কিছু অর্থ বিলাস সামগ্রী আমদানী, জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাপন, জমি ও দালান-কোঠা এবং স্বর্ণ ও গয়নাগাঁটির ন্যায় ইত্যাদি অনুৎপাদনশীল ব্যবহারে ব্যয়িত হয়ে থাকে। সরকার সম্প্রতি ওয়েজ আর্নারস ডেভেলপমেন্ট ফান্ড প্রবর্তন করেছেন। বিদেশ থেকে পাঠানো অর্থ বিভিন্ন উৎপাদনমুখী উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধে সৃষ্টি করতে হবে। এই সম্পদ যথার্থভাবে কাজে লাগানোর সম্ভাব্য উপায় হিসাবে ওভারসীজ ট্রাস্ট ফান্ড গঠন, বিশেষ ঋণপত্র প্রবর্তন এবং স্টার্লিং কোম্পানী প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তাভাবনা করা যায়।

বৈদেশিক বিনিয়োগ

১১·৫৪ বাংলাদেশের অর্থনীতি বৈদেশিক সহায়তার উপর খুব বেশী নির্ভরশীল। এই সহায়তার সিংহভাগ দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সরকারী সূত্র থেকে আসে। এ দেশে বেসরকারী বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ গোড়া থেকেই অতি নগণ্য ছিল এবং তা ঔষধপত্র, ইলেক্ট্রনিকলের মত গুটি কয়েক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রয়েছে। মোট বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ থেকে বেসরকারী খাতে দ্বিপাক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় সরকারী সাহায্যের পরিমাণ অনেক বেশী। কিন্তু বাংলাদেশের প্রয়োজনের সংগে তাল রেখে বৈদেশিক সাহায্য বৃদ্ধি না পেয়ে প্রকৃত অর্থে হ্রাস পাবার ফলে বৈদেশিক সাহায্যের চাহিদা এবং সরকারী পর্যায়ে এর প্রাপ্তির মধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধান বৈদেশিক বেসরকারী মূলধন দ্বারা কিছুটা পূরণ করা যেতে পারে, কারণ অন্য বিকল্পটি অর্থাৎ বাণিজ্যিক বাজার থেকে ঋণ গ্রহণ বাস্তবসম্মত নয়। এছাড়াও প্রযুক্তি স্থানান্তর, ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতার উন্নয়ন এবং রপ্তানী বাজারে প্রবেশের জন্য বিদেশী পুঁজি নিয়োগ বিশেষতঃ রপ্তানীমুখী ও উচ্চ প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পগুলোতে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ অবশ্যই উৎসাহিত করতে হবে। শুধুমাত্র বিরাট স্থানীয় বাজার ও সস্তা স্থানীয় শ্রমের সুবিধে নেওয়ার জন্য নয়, বরং প্রযুক্তির মাধ্যমে বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য পরিস্থিতির উন্নতি বিধানের জন্য বিদেশী পুঁজি বাজার, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্য পর্যায়ে পুঁজি নিয়োগকারীদের এ দেশে পুঁজি বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করতে হবে।

১১·৫৫ বিদেশী মূলধন আকর্ষণ করার জন্য মূলধনের প্রত্যাবাসন কর প্রদানের পর বিদেশে মুনাফা প্রেরণ, অনুমোদিত রয়্যালটি ও কারিগরী ফি প্রেরণ, পরিবার পরিজনের কাছে অর্থ প্রেরণ, বিদেশী ঋণের সুদের উপর কর মওকুফ ইত্যাদি সুবিধার আকারে ন্যায়সঙ্গত উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগ প্রক্রিয়া সহজ করার লক্ষ্যে সরকার বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগ (উন্নয়ন ও সংরক্ষণ) আইন, ১৯৮০ এবং রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৮০ জারী করেছেন।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও স্টক এক্সচেঞ্জের ভূমিকা

১১·৫৬ ইকুইটি মূলধনের জন্য অর্থ যোগানে পর্যাপ্ত সুবিধার অনুপস্থিতি বেসরকারী খাতে শিল্পোদ্যোগে প্রায়ই একটি অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান ছাড়াও বেসরকারী মূলধনের প্রাথমিক বাধা কাটিয়ে ওঠার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ইকুইটি মূলধনে অংশ গ্রহণ এবং ব্যবধান পূরণমূলক অর্থ সংস্থান করা উচিত। চূড়ান্ত পর্যায়ে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের অংশ নেয়ার সুযোগ করে দেয়ার লক্ষ্যে স্টক এক্সচেঞ্জ গড়ে তোলার ইকুইটি মূলধন কাজে লাগানো যেতে পারে। প্রশাসনিক ও আর্থিক বাধা বিঘ্ন অপসারণের জন্য ঋণ প্রদান পদ্ধতি সরল করতে হবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। ঋণ দান কার্যক্রমের আওতায় বেসরকারী খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর চলতি মূলধনের জন্য যুক্তিসংগত ব্যবস্থা করতে হবে।

১১·৫৭ বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ স্কীম ও বিশেষ ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ছোট আকারের ও কুটিরশিল্পের অর্থ সংস্থানের জন্য বর্তমানে যে ব্যবস্থা রয়েছে সেটি জোরদার ও সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্য সাধনে বাণিজ্যিক ব্যাংকসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নেটওয়ার্ক সুবিধে ব্যাপকভাবে কাজে লাগাতে হবে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, কুটিরশিল্প পরিচালনারত কিংবা নিজদের বাড়তি আয়ের জন্য কুটির-শিল্প চালাতে সক্ষম প্রান্তিক চাষী, যুবক ও মহিলাদেরকে ন্যায্য পর্যায়ে আঞ্চলিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করতে হবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

১১·৫৮ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সরকারী খাতের নির্ধারিত শিল্পগুলোতে পরিকল্পিত বিনিয়োগ থেকে আনুমানিক উৎপাদনের হিসেব ১১·৪ সারণীতে দেয়া হয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান উৎসগুলো ধরা হয়েছেঃ (১) স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার; (২) যেখানে সম্ভব কারখানায় একাধিক শিফ্‌ট পরিচালনা; (৩) শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও (৪) বাস্তবায়নের অনেকটা অগ্রসর পর্যায়ে স্থিত প্রকল্পগুলোকে বরাদ্দ বৃদ্ধির মাধ্যমে আরও আগে চালুকরণ। বিরল সম্পদ, বিশেষ করে, বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা যাতে অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বরাদ্দ না হয় সেজন্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে দেশের ও আন্তর্জাতিক বাজার উভয়ের গ্রহণ ক্ষমতাও সতর্কতার সংগে বিবেচনা করে দেখতে হবে। হিসেব করা হয়েছে যে, যোজিত মূল্য হিসেবে শিল্প উৎপাদন ১৯৭৯/৮০ সালের ১,৪২১ কোটি টাকা থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ২,১২৪ কোটি টাকায় উন্নীত হবে।

রপ্তানী আয়

১১·৫৯ পূর্বে বলা হয়েছে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পনীতি কৃষি ও রপ্তানীর উন্নয়ন উপর বিশেষ জোর দিচ্ছে। ১৯৮৪/৮৫ সালে দ্বিতীয় পরিকল্পনা মেয়াদের শেষ নাগাদ রপ্তানী খাতে ১,৬৯৮·০০ কোটি টাকা উপার্জিত হবে এবং এই আয়ের মধ্যে ১,৩৭৫·০০ কোটি টাকা শিল্প পণ্য রপ্তানী বাবদ পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। রপ্তানী আয়ে শিল্প পণ্যের ভাগ ১৯৭৯/৮০ সালের ৭৯ শতাংশ থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৮১ শতাংশে বৃদ্ধি পাবে। পাটজাত পণ্যই রপ্তানী খাতে সর্বাধিক উপার্জনকারী একক পণ্য হিসেবে নিজ স্থান অব্যাহত রাখবে। ১৯৮৪/৮৫ সালে পাট থেকে তৈরী কার্পেটসহ পাটজাত দ্রব্যাদি থেকে ৭৯৫·০০ কোটি টাকা আয় হবে বলে ধরা হয়েছে। পরবর্তী প্রধান রপ্তানী আয়কারক পণ্যগুলো হচ্ছেঃ চা, চিংড়ী ও ব্যাঙের পার মত খাদ্য ও সমজাতীয় পণ্য, যেগুলো রপ্তানী বাবদ ২২১·০০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে। এর পরে পাকা ও আধা পাকা চামড়ার স্থান। এগুলো রপ্তানী থেকে ১৯৮৪/৮৫ সালে ১৭৮·০০ কোটি টাকা আয় হবে।

কর্মসংস্থান

১১·৬০ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য। কৃষি খাতে প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণে শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি পেলেও তাতে শ্রম বাজারে বিপুল শ্রমিকের কর্মসংস্থানের চাহিদা মিটবে না। প্রকৃতপক্ষে, কৃষিকাজে কর্মসংস্থান সৃষ্টির হার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হার থেকে কম হবে; ফলে কৃষি সম্প্রসারণ বিশেষ করে খাদ্যশস্য উৎপাদনে চিরন্তন চাপ বজায় থাকবে। আধুনিক প্রযুক্তি বেশ শ্রম নিয়োজক হলেও কৃষিখাতে নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের জন্য কৃষিখাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে কর্মসংস্থান ও আয় সৃষ্টি সম্ভব হবে না বলে কৃষি বহির্ভূত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। শিল্প দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে স্থাপন এবং গ্রামীণ শিল্পগুলোর উপর জোর দিলে এ লক্ষ্য অর্জন সহায়ক হবে। প্রধানতঃ বেসরকারী খাতে মাঝারি, ছোট ও কুটিরশিল্পেই আনুমানিক সাড়ে চার লাখ শিল্প শ্রমিকের কর্মসংস্থান হবে।

সারণী ১১·৪
সরকারী খাতে নির্বাচিত কয়েকটি পণ্যের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা

বিষয়	একক	১৯৭৯/৮০ (প্রকৃত)	১৯৮৪/৮৫ (লক্ষ্যমাত্রা)
১। পাটজাত দ্রব্য	লাখ টন	*৫·২৫	*৬·৫০
২। বস্ত্র শিল্প			
(ক) সুতা	কোটি পাউণ্ড	৯·৫০	*১৮·৩০
(খ) সুতার কাপড় (কলে প্রস্তুত)	কোটি গজ	৯·২৪	*১৪·৮৬
৩। চুনাপাথর	লাখ টন	০·৬০	০·৮০
৪। সিমেন্ট	ঐ	৩·৪৩	৪·৫০
৫। সার	লাখ মেট্রিক টন	৪·৪২	১০·৩৭
(ক) ইউরিয়া	ঐ	৩·৬১	৯·২৭
(খ) এ্যামোনিয়াম সালফেট	ঐ	০·১০	০·১০
(গ) ট্রিপল সুপার ফসফেট	ঐ	০·৭১	১·০০
৬। কাগজ ..	'০০০' মেট্রিক টন	৩০·৬১	৪৫·০০
৭। নিউজপ্রিন্ট ও মেকানিক্যাল প্রিন্ট	ঐ	৪১·২৭	৪৮·০০
৮। বণ্ড	ঐ	১২·২৭	৩০·০০
৯। কাঁচের পাত (২ মিলিমিটার)	লাখ বর্গফুট	৯০·৪৮	২০০·০০
১০। ইস্পাত পিণ্ড ..	লাখ মেট্রিক টন	১·৩৩	২·২৫
১১। নৌ-পরিবহণ যান ..	'০০০' টন ইস্পাত	৫·৮৯	১২·৬০
১২। মোটর সাইকেল ..	'০০০' টি	২·৫৪	৪·৮৫
১৩। বাইসাইকেল ..	ঐ	২২·৬৪	২২৭·০০
১৪। বাস, ট্রাক এবং কার	ঐ	২·০৫	৫·০০
১৫। ডিজেল ইঞ্জিন ..	ঐ	২·৪১	২০·০০
১৬। পাম্প ..	ঐ	২·১১	১৮·১০
১৭। রেডিও ..	লাখটি	০·৫৩	২·৩৩
১৮। টেলিভিশন ..	'০০০' টি	১·৩০	৮·৮০
১৯। মাইল্ড স্টিল/গ্যালভানাইজড আয়রন পাইপ	'০০০' মেট্রিক টন	৮·৭২	৩০·০০
২০। বৈদ্যুতিক পাখা ..	লাখ টি	০·৩৯	১·০০
২১। ফ্লোরসেন্ট টিউব লাইট	ঐ	৫·৪১	১২·৬০
২২। সুপার এনামেলড কপার ওয়্যার এবং এইচ ডি বি সি	টন	৩২১	৭৫০
২৩। ওয়েলডিং ইলেকট্রোড	লাখ আর একটি	১৪৫	৩৪২
২৪। বৈদ্যুতিক কেবল/কণ্ডাক্টর	'০০০' টন	২·৩৬	৯·০০
২৫। চিনি ..	ঐ	৯৩·২২	২০০·০০

* বেসরকারী খাতসহ

আর্থিক বরাদ্দ :

১১·৬১ শিল্প খাতে কার্যক্রমগুলোর বাস্তবায়নে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৯/৮০ মূল্যে) সরকারী খাতে ১,৩৯০ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ ছাড়া বেসরকারী খাতে ১,৭৬৯ কোটি টাকা (১৯৭৯/৮০ মূল্যে) ব্যবহৃত হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। ১১·৫ ও ১১·৬ সারণীতে ১৯৭৯/৮০ মূল্যে ও চলতি মূল্য যথাক্রমে সরকারী খাতের ব্যয় ও প্রতিষ্ঠানওয়ারী বরাদ্দের পাঁচিক পর্যায় বন্টন দেখানো হয়েছে। সরকারী খাতের ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে চলতি প্রকল্পগুলোতে খরচ হবে ৬৪·৩ শতাংশ ও নতুন প্রকল্পগুলোতে ব্যয় হবে ৩৫·৭ শতাংশ। সর্বাধিক বরাদ্দ অর্থাৎ সরকারী খাতে মোট ব্যয়ের ৫২·৬ শতাংশ সার ও রাসায়নিক শিল্পগুলোর জন্য রাখা হয়েছে, কারণ এ ধরণের শিল্পগুলোর জন্য বাংলাদেশের পক্ষে কাঁচামাল সরবরাহের সুবিধে আছে। অন্যান্য উপখাতগুলোর অংশ হচ্ছে : ইস্পাত ও প্রকৌশল ১২ শতাংশ, তাঁত ও রেশমসহ কাপড় ১২·৪ শতাংশ এবং চিনি ও খাদ্য শিল্প ৫·৬ শতাংশ।

সারণী ১১·৫

সরকারী খাতে ব্যয়ের বছর ওয়ারী পর্যায় বন্টন।

[কোটি টাকায়]

বছর	দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বরাদ্দ	
	১৯৭৯/৮০ মূল্যে	চলতি মূল্যে
১৯৮০/৮১	২৪৭·৮৭	২৭৭·৬১
১৯৮১/৮২	২১৫·৯৭	২৬৯·৯৬
১৯৮২/৮৩	২২০·৪৫	৩০৮·৬৩
১৯৮৩/৮৪	২৯৬·৪০	৪৬৫·৪০
১৯৮৪/৮৫	৪০৯·৩১	৭২০·৪০
মোট ..	১,৩৯০·০০	২,০৪২·০০

সারণী ১১·৬

উপখাত/প্রতিষ্ঠানওয়ারী দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বরাদ্দ

[কোটি টাকায়]

উপখাত/প্রতিষ্ঠান		দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বরাদ্দ	
		১৯৭৯/৮০ মূল্যে	চলতি মূল্যে
১।	বাংলাদেশ জাহাজ নির্মাণ ও প্রকৌশল সংস্থা (BSEC)	১৬৬·৬৫	২৫০·০০
২।	বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা (BCIC)	৩৩৯·৬৮	৪৮৫·২০
৩।	জিয়া সার কারখানা	১৬০·৫৫	১৯১·৮০
৪।	চট্টগ্রাম ইউরিয়া সার	২৩০·৫৩	৪০১·৯১
৫।	বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা (BSFIC)	৭৮·৩৪	১১৫·০০
৬।	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (BSCIC)	৩৭·৯৫	৫৬·০০
৭।	বাংলাদেশ শিল্প কারিগরী সহায়তা কেন্দ্র (BITAC)	৯·৮৬	১৫·০০
৮।	বাংলাদেশ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কেন্দ্র (BMDC)	২·৫৬	৩·৭৫
৯।	বাংলাদেশ শিল্প উপদেশনা কেন্দ্র (IACB)	০·৫০	০·৭১
১০।	পরিকল্পনা সেল (শিল্প বিভাগ, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়)	০·২৭	০·৪০
১১।	রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (EPZ)	১৫·০৬	২২·০০
১২।	শিল্প দপ্তর	০·০৩	০·০৪
১৩।	বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প সংস্থা (BTMC)	১৫১·৮২	২০৮·০০
১৪।	তাঁত শিল্প বোর্ড	৮·৫৪	১৩·০০
১৫।	রেশম শিল্প বোর্ড	১১·২০	১৬·০০
১৬।	বস্ত্র পরিদপ্তর	২·০৭	৩·০৬
১৭।	বাংলাদেশ পাটকল সংস্থা (BJMC)	৩২·৯৫	৪৪·৫১
১৮।	পাট বিভাগ	২·২৮	৩·১৪
১৯।	বাংলাদেশ খনিজ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন সংস্থা (BMEDC)	৮৭·২৩	১৩৫·০৯
২০।	বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (BFIDC)	১২·১৩	১৭·৩৭
২১।	বি এফ এফ ডব্লিউ টি (BFFWT)	১২·৩২	১৬·৩২
২২।	চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা (FDC)	৯·৯৯	১৪·৬০
২৩।	মুদ্রণ ও ষ্টেশনারী দপ্তর	২·৯৮	৫·০০
২৪।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২·১৫	৩·০০
২৫।	রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো (EPB)	১·০০	১·৫০
২৬।	পরিকল্পনা কমিশন (শিল্প বিভাগ)	৮·২৬	১২·৮০
২৭।	ব্যবসা প্রশাসন ইন্সটিটিউট (IBA)	২·১৭	৩·৫০
২৮।	বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয় (BUET)	০·২৬	০·৩৬
২৯।	বহিঃ সম্পদ বিভাগ (ERD)	০·৬৭	০·৯৪
	মোট ..	১,৩৯০·০০	২,০৪২·০০

দ্বাদশ অধ্যায়

জ্বালানী ও প্রাকৃতিক সম্পদ

বাংলাদেশে মাথাপিছু বাণিজ্যিক জ্বালানী ব্যবহারের হার বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় সর্বনিম্ন। এখানে মাথাপিছু প্রায় ৩২ কিলোগ্রাম তেলের সমপরিমাণ জ্বালানী ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এত স্বল্প হারে জ্বালানী ব্যবহার সত্ত্বেও জনগণ ও অর্থনীতির মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত জ্বালানী সরবরাহ করতে বাংলাদেশকে হিমশিম খেতে হয়। সমস্যাটি মূলতঃ জ্বালানী সম্পদের অপর্যাপ্ত উন্নয়ন, আমদানী ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা হেতু অসংগতিপূর্ণ অভ্যন্তরীণ জ্বালানী সরবরাহ এবং জনসাধারণের অত্যন্ত কম ক্রয় ক্ষমতার কারণে হয়ে থাকে।

১২·২ বাংলাদেশের জনসাধারণ, বিশেষতঃ গ্রামীণ মানুষ এখনও গোবর, শাকসব্জীর পরিত্যক্ত অংশ এবং জ্বালানী কাঠের ন্যায় প্রচলিত জ্বালানীর উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। তবু বাণিজ্যিক জ্বালানীর চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৭২ থেকে ১৯৮০ সন পর্যন্ত মাথাপিছু বাণিজ্যিক জ্বালানীর ব্যবহার ২৪ কিলোগ্রাম তেলের সমপরিমাণের স্থলে ৩২ কিলোগ্রামে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৪/৮৫ সন নাগাদ এই পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেয়ে ৫১ কিলোগ্রাম তেলের সমপরিমাণে দাঁড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে। পর্যাপ্ত ও নির্ভরযোগ্য উপাত্তের অভাব হেতু প্রচলিত জ্বালানী ব্যবহারের প্রকৃতচিত্র তুলে ধরা অত্যন্ত দুরূহ। এসত্ত্বেও ধারণা করা যায় যে, বনভূমি ও বাস্তুভূমির বৃক্ষরাজি উজাড় হওয়ায় ফলে প্রচলিত জ্বালানীর ক্রমবর্ধমান চাহিদার তুলনায় সরবরাহ অনেক পিছনে পড়ে আছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে চলেছে।

১২·৩ বাংলাদেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে সুলভ্য দেশীয় বাণিজ্যিক জ্বালানী সম্পদ হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস। তাই জ্বালানী নীতিতে আমদানীকৃত তেলের বিকল্প হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার বৃদ্ধি ও জ্বালানীর দক্ষ ব্যবহারের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গ্যাস ক্ষেত্রগুলি বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় এবং যমুনা-পদ্মা নদীর উপর দিয়ে কোন গ্যাস পাইপ লাইন না থাকায় এই মুহূর্তে দেশব্যাপী গ্যাস গ্রিডওয়ার্ক গড়ে তোলার সম্ভাবনা অত্যন্ত সীমিত। এমতাবস্থায় বিদ্যুতের মাধ্যমে গ্যাসের প্রসার ঘটানোই হচ্ছে জ্বালানী নীতির কৌশলগত বিকল্প। এজন্য সাথে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে গ্যাস পাইপ লাইন সম্প্রসারণের কাজও চলছে। তৃতীয় দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় গ্যাসের ব্যবহারের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হবে। এর ফলে ১৯৮৪/৮৫ সন নাগাদ আমদানীকৃত জ্বালানীর শেয়ার যা বর্তমানে শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশী তা' প্রায় শতকরা ৩০ ভাগে নেমে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। সারণী ১২·১-এ বিষয়টি দেখানো হয়েছে:

সারণী ১২·১

বাণিজ্যিক জ্বালানীর বর্তমান ও প্রেক্ষিত ব্যবহার

	১৯৭৯/৮০			১৯৮৪/৮৫	
	ট্রেড ইউনিটে পরিমাণ	তেলের সমপরিমাণ হিসাবে (হাজার টন)	শতকরা হার	তেলের সমপরিমাণ হিসাবে (হাজার টন)	শতকরা হার
প্রাকৃতিক গ্যাস	৪৫·৪ বিলিয়ন ঘনফুট	১,০৪২	৩৭·৩	৩,৩৭৪	৬৮·০
পানি বিদ্যুৎ	৫৮৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা	৬২	২·২	৭৯	১·৬
পেট্রোলিয়াম	১·৫২ মিলিয়ন মেট্রিকটন	১,৫৫০	৫৫·৫	১,৩৪১	২৭·০
কয়লা	২,৪৭,০০০ মেট্রিক টন	১৩৯	৫·০	১৬৯	৩·৪
		২,৭৯৩	১০০	৪,৯৬৩	১০০

১২·৪ দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাধীন সময়ে বাণিজ্যিক জ্বালানী ব্যবহারের ক্ষেত্রে বার্ষিক শতকরা ১২·২ ভাগ প্রবৃদ্ধি ঘটবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তথাপি প্রচলিত জ্বালানীর ব্যবহারও সর্বমোট ব্যবহারের অর্ধেকেরও বেশী হবে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিকল্পনাধীন সময়ে প্রচলিত ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী সম্পদের বিকাশ এবং তাদের ব্যবহারিক দক্ষতার উন্নয়ন অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। দেশের উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া জৈব ও সৌর শক্তি উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ রচনা করেছে। বর্তমান এগুলো প্রাচীন ও অদক্ষ প্রযুক্তির দ্বারা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে আর এ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনারও অভাব রয়েছে। তাই এসব কারণে এ দিকটার অধিক নজর দেয়া অপরিহার্য।

১২·৫ দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে জ্বালানীর উন্নয়নের জন্য ১৯৭৯/৮০-র মূল্যমান অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমাণ হচ্ছে ২,০৫২·০০ কোটি টাকা (বর্তমান মূল্যে ৩০২১ কোটি টাকা)। এই পরিমাণ সরকারী খাতের সর্বমোট বরাদ্দের শতকরা ১৮·৫ ভাগ। প্রাপ্ত অর্থের মধ্যে বিদ্যুৎ খাতের বরাদ্দ সবচেয়ে বেশী (প্রায় ৭০ ভাগ); এর পরেই রয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদ খাত যেখানে বরাদ্দের পরিমাণ শতকরা প্রায় ২৯·৮ ভাগ। গ্রামীণ নবায়নযোগ্য জ্বালানী খাতে বরাদ্দের পরিমাণ অত্যন্ত কম। তবে এই খাতের জন্য বন ও বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তি গবেষণা খাতের অধীনেও অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। ১২·২ সারণীতে বিভিন্ন বছরে উপ-খাতওয়ারী বরাদ্দের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে

সারণী ১২·২

জ্বালানী খাত ও প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য আর্থিক বরাদ্দ

(কোটি টাকা হিসাবে)

বছর	বিদ্যুৎ		প্রাকৃতিক সম্পদ		নবায়নযোগ্য ও পল্লী জ্বালানী	
	বর্তমান মূল্য	১৯৭৯/৮০ সনের মূল্য	বর্তমান মূল্য	১৯৭৯/৮০ সনের মূল্য	বর্তমান মূল্য	১৯৭৯/৮০ সনের মূল্য
১৯৮০/৮২	৫২৭·৪৭	৪৪৩·০৩	২২২·২৯	১৮৭·৪৯	..	..
১৯৮২/৮৩	৩০৮·৮৭	২২০·৬২	১৮৩·৮৫	১৩১·৩২	..	..
১৯৮৩/৮৪	৫৬১·২১	৩৫৭·৪৬	২৯২·৬৫	১৮৬·৪০	১·০০	০·৬৪
১৯৮৪/৮৫	৭২৯·৮৬	৪১৪·৮৯	১৯২·২১	১০৯·৩০	১·৫৯	০·৮৫
মোট ..	২,১২৭·৪১	১,৪৩৬·০০	৮৯১·০০	৬১৪·৫১	২·৫৯	১·৪৯

ক—বিদ্যুৎ খাত

১২·৬ বাংলাদেশের বৈদ্যুতিক সিষ্টেমের উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ১৯৮০ সালের জুন মাসে চালু বিদ্যুৎ প্লান্টগুলিতে মোট প্রাপ্ত বিদ্যুৎ শক্তির পরিমাণ ছিল ৫৩৪ মেগাওয়াট। এ ছাড়াও বিভিন্ন শিল্পের মোট নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (ক্যাপটিভ ক্ষমতা) ছিল প্রায় ১৯০ মেগাওয়াট। ১৩২ কেভি ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সমিশন লাইনের সর্বমোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১৯০০ মাইল এবং নিম্ন ভোল্টেজ (৩৩ কেভি, ১১ কেভি এবং ০·৪ কেভি) লাইনের দৈর্ঘ্য প্রায় ১২,০০০ মাইল। বর্তমানে এই সব সুবিধা উপকূলীয় দ্বীপাঞ্চলের ছোট ছোট নিজস্ব বিদ্যুৎ কেন্দ্র ছাড়া পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের দুইটি প্রধান গ্রীডের অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রীড দুইটি যমুনা-পদ্মা নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন হলেও ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর নাগাদ একটি একক বিদ্যুৎ গ্রীডের মাধ্যমে সংযুক্ত করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

১২·৭ ১৯৭৯/৮০ সনে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের মোট পরিমাণ ছিল ২৩৫৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা। ঐ বছর তালিকাভুক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৫ লক্ষ ২২ হাজার। এদের অধিকাংশই ছিল শহরাঞ্চলের বাসিন্দা। মোট বিদ্যুৎ ব্যবহারের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগই ব্যবহৃত হয়েছে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনার তিনটি মহানগর এলাকায়। বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী হচ্ছে শিল্প খাত, যা মোট বিদ্যুৎ বিক্রয়ের অর্ধেকেরও বেশী গ্রহণ করে।

১২·৮ বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক দায়িত্বে বাংলাদেশ বিদ্যুত উন্নয়ন বোর্ড এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এই দুইটি সরকারী সংস্থা নিয়োজিত। বাংলাদেশের সকল বিদ্যুত কেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন, শহরাঞ্চলের সমগ্র বিতরণ ব্যবস্থা সহ সীমিত সংখ্যক পল্লী অঞ্চলের বিতরণ ব্যবস্থা এই বোর্ডের কর্তৃত্বাধীন /আওতাভুক্ত। (বিদ্যুত বোর্ডের সহিত সম্পর্কিত প্রকল্পসমূহকে সুষ্ঠু ও সার্বিক ভাবে সচল রাখাও এই বোর্ডের দায়িত্ব।) অপরদিকে এককালীন কভারেজের ভিত্তিতে ক্রেতাদের সমবায়ের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের বিতরণ ব্যবস্থাদির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড গঠন করা হয়। এই বোর্ডের অধীনে দেশে এ পর্যন্ত ১৩টি সমবায় সমিতি গড়ে তোলা হয়েছে এবং আরও কিছু গঠিত হচ্ছে। আশা করা হচ্ছে যে, ১৯৯৫ সন নাগাদ দেশের অধিকাংশ পল্লী এলাকাকে সমবায় বিদ্যুৎ উপযোগের আওতায় আনা যাবে।

১২·৯ বিদ্যুতের উৎপাদন ও বিতরন ক্ষমতার দ্রুত উন্নয়ন সাধন নিম্নোক্ত কারণে অপরিহার্য —(ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ভিত্তিক শক্তির ক্রম বর্ধমান ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানী ক্ষেত্রে অধিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং (খ) দেশের সকল অংশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম করা। অদ্যি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ খাতের সকল উন্নয়নই প্রধানতঃ শহর কেন্দ্রিক ছিল। ফলে এই উন্নয়নের দ্বারা বৃহৎ ও শহর ভিত্তিক শিল্প সমূহ এবং শহরবাসীরাই মূলতঃ উপকৃত হয়েছে। বিদ্যুৎ সুবিধার ব্যাপক বিস্তার ঘটিয়ে এই প্রবনতাকে এখন সংশোধন করা হচ্ছে। সরবরাহের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্যতার অভাব ও প্রচুর বিটন ঘাটতি দীর্ঘদিন যাবত প্রধান দুইটি সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। এই খাতের এবং অর্থনীতির সুস্থ প্রবৃদ্ধির স্বার্থে দ্রুত এসব সমস্যা সমাধান করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সমূহ :

১২·১০ বিদ্যুৎ পরিকল্পনা খাতের উদ্দেশ্যসমূহে উল্লেখিত অগ্রাধিকার গুলিরই প্রতিফলন ঘটেছে। এগুলি হচ্ছে :

(১) সারাদেশে উৎপাদনশীল খাতসমূহে বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান ও বিভিন্নমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নের পথ সুগম করা ;

(২) কারীগরী ও অর্থনৈতিকভাবে উপযোগী ক্ষেত্রগুলিতে দেশীয় জ্বালানী থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে আমদানীকৃত জ্বালানীর বিকল্প সৃষ্টি করা ;

(৩) বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্ভরযোগ্যতার উন্নতি সাধন;

(৪) বিদ্যুৎ ব্যবহার দক্ষ পরিচালন এবং পরিকল্পিত বিনিয়োগের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যয় হ্রাস করা; এবং

(৫) শিল্পের প্রসার ঘটানোর নিমিত্ত এবং পল্লী উন্নয়ন কাজে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য সেচ ব্যবস্থা বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে পল্লী এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্প্রসারিত করা।

১২·১১ এক্ষাত্রিক প্রকল্প ও নীতি ব্যবস্থার মাধ্যমে উপরে উল্লেখিত উদ্দেশ্য সমূহ বাস্তবায়িত করা হবে যার অধিকাংশ ইতিমধ্যেই হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রকল্প ও নীতি সমূহ প্রণয়ন ও উদ্ভাবনের নীতি, কৌশল ও অগ্রাধিকারগুলি নিম্নরূপ :

(১) গ্যাস থেকে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে স্থানীয় ও আঞ্চলিক বিদ্যুত ব্যবস্থার মধ্যে হাই ভোল্টেজে সমন্বয় সাধন।

(২) বিতরণ ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ, নক্সা প্রণয়ন ও নির্মাণ।

(৩) গ্রাহকের সংখ্যা বৃদ্ধি ও বিদ্যুৎ ব্যবহার দ্রুততর করা, বিশেষতঃ পল্লী এলাকায়।

(৪) বিদ্যুতের সিষ্টেম ঘাটতি ও চুরির সংখ্যা হ্রাস।

(৫) বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বর্তমান প্ল্যান্ট সমূহ ও সাজসরঞ্জামের পুনর্বাসন।

১২·১২ এ ছাড়া এমন অনেক বিষয় আছে যে গুলোকে এখন পর্যন্ত উপযুক্ত ভাবে বিবেচনা করা যায়নি ; যেমন-বিদ্যুতের মূল্য নির্ধারণ এবং স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষ বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ কর্মসূচী। তবে দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা কালে এগুলি যাতে বাস্তবায়ন করা যায় সে জন্য যথাযথ নীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে এই পরিকল্পনাকালীন সময়ে জরিপের কাজ হাতে নেয়া হবে। মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে সমীক্ষা চালানোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যৌলিক জ্বালানী সম্পদের অর্থনৈতিক মূল্য নির্ধারণ এবং বিভিন্ন ধরণের জ্বালানীর মূল্য নিরূপণের উদ্দেশ্য দীর্ঘ মেয়াদী প্রান্তিক ব্যয় নিরূপন। দীর্ঘ মেয়াদী প্রান্তিক ব্যয়কে নিম্নমুখী রাখা এবং কোন প্রকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভর্তুকি ছাড়াই বিদ্যুতের উপযোগীতা যাতে একটি বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানরূপে চলতে পারে সেজন্য স্বল্প ব্যয় ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন প্রয়োজন।

লোড প্রজেকশন

১২·১৩ বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা ষাটের দশকে বার্ষিক গড়ে শতকরা ১৬ ভাগ হারে বৃদ্ধি পায়। সত্তর দশকের প্রথমার্ধের পুরোটাই অতিবাহিত হয়েছে স্বাধীনতা যুদ্ধজনিত ক্ষয় ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার কাজে। ১৯৭৫/৭৬ থেকে ১৯৭৯/৮০ পর্যন্ত পাঁচ বছরে বিদ্যুতের চাহিদা গড়ে শতকরা ১১·৭ ভাগ হারে বৃদ্ধি পায়। এই ভাবে গত দুই দশকে বিদ্যুতের চাহিদা ক্রমবর্ধমান হারে কমে আসতে থাকে। এর প্রধান কারণ বিদ্যুৎ ব্যবস্থার অপর্যাপ্ত ক্ষমতা, অর্থনৈতিক স্থবিরতা, সরবরাহের উচ্চ ব্যয় এবং শহর ও শিল্প অঞ্চলের চিরাচরিত বাজারে চাহিদাতিরিক্ত সরবরাহ।

১২·১৪ সম্প্রতি ক্ষুদ্র শিল্প ও বানিজ্যিক ক্রেতাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উচ্চ প্রবৃদ্ধির হার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পল্লী এলাকায় বিদ্যুৎ সম্প্রসারণের দরুন ক্রেতাদের মধ্যেও প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। সুতরাং এটা আশা করা যায় যে, ক্ষুদ্র ক্রেতারা অদূর ভবিষ্যতে বিদ্যুতের বাজার সম্প্রসারণের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে পারবে। যা হোক, বৃহৎ ক্রেতামুখী কর্মসূচী অপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্রেতামুখী সম্প্রসারণ কর্মসূচীর জন্য অনেক বেশী বিনিয়োগের প্রয়োজন পড়ে। তাই লোডের প্রকৃত বৃদ্ধির পথে বিনিয়োগ তহবিল প্রাপ্তির বিষয়টি অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।

১২·১৫ ১৯৮০/৮১ এবং ১৯৮১/৮২ সনে রেকর্ডকৃত সর্বোচ্চ চাহিদা ছিল যথাক্রমে ৫৪৫ মেগাওয়াট ও ৬০১ মেগাওয়াট। এ ক্ষেত্রে পিবিএস এর শেয়ারের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫·৫ মেগাওয়াট ও ১০·৫ মেগাওয়াট, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের এক হিসাবে বলা হয় যে, ১৯৮৪/৮৫ সন নাগাদ পিবিএস- এর লোড বৃদ্ধি পেয়ে ৬৯ মেগাওয়াটে দাঁড়াবে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অধীন বিতরণ এলাকাসমূহে ১৯৮১/৮২ সনের ৫৯৪·৫ মেগাওয়াট হতে যদি বার্ষিক শতকরা ১৩ ভাগ হারে প্রবৃদ্ধি ধরা হয় তা' হলে ১৯৮৪/৮৫ সালে লোড দাঁড়াবে ৮৫৩ মেগাওয়াট।

১২·১৬ ১৯৮০ সনের জুলাই মাসের পর থেকে বার্ষিক মোট শতকরা ১৫ ভাগ প্রবৃদ্ধির হারে ঐ বছর দেশে সর্বমোট লোডের পরিমাণ দাঁড়াবে ৯২২ মেগাওয়াট। বার্ষিক লোডের বিস্তারিত বিবরণ সারণী ১২·৩-এ দেখানো হল:

সারণী ১২·৩

সর্বোচ্চ চাহিদার প্রবৃদ্ধির চিত্র

(মেগাওয়াট হিসাব)

বছর	পূর্বাঞ্চল			পশ্চিমাঞ্চল			গোটাদেশ		
	বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	মোট	বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	মোট	বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	মোট
১৯৭৯/৮০	৩৩৮	..	৩৩৮	১২৪	..	১২৪	৪৬২	..	৪৬২
১৯৮০/৮১	৩৯৬·৩	২·৫	৩৯৯	১৪৫	১·০	১৪৬	৫৪১·৫	৩·৫	৫৪৫
১৯৮১/৮২	৪৪২·৫	৬·৫	৪৪৯	১৪৮	৪·০	১৫২	৫৯৪·৫	১০·৫	৬০১
১৯৮২/৮৩	৫০২	১৩·০	৫১৪	১৬৭	১৩·০	১৮০	৬৬৮	২৬·৫	৬৯৪
১৯৮৩/৮৪	৫৬৬	২১·০	৫৮৭	১৮৯	২৩·০	২১২	৭৫৫	৪৪·০	৭৯৯
১৯৮৪/৮৫	৬৩৯	৩১·০	৬৭০	২১৪	৩৮·০	২৫২	৮৫৩	৬৯·০	৯২২

১২·১৭ বিদ্যুৎ ব্যবস্থার অন্যতম একটি অসন্তোষজনক ব্যাপার হচ্ছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সিস্টেম ঘাটতি। সুতরাং বিদ্যুৎ সিস্টেমের প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে এই ক্ষতিকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কমানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ১৯৭৯/৮০ সাল হতে ১৯৮৪/৮৫ সাল পর্যন্ত সিস্টেম ঘাটতি মোট উৎপাদনের শতকরা ৪০ ভাগ হতে ২৩ ভাগে কমানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। শতকরা ৫৫ ভাগ লোড ফ্যাক্টরে পরিকল্পিত সর্বোচ্চ চাহিদা অনুযায়ী মোট প্রায় ৩,৪৩৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা বিদ্যুৎ বিক্রি হবে বলে হিসাব করা হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৭৫—৮০ মেয়াদে ১১ শতাংশের তুলনায় দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার গোটা মেয়াদে বার্ষিক বিদ্যুতের গড় মিশ্র বিক্রি হবে ১৯·৫ শতাংশ।

দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা উন্নয়ন কর্মসূচী

ক-উৎপাদন

১২·১৮ ১৯৮২/৮৩ সনে পূর্ব পশ্চিম আন্তঃসংযোগের কাজ সম্পন্নের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে একটি মাত্র গ্রীডের আওতায় আনা হবে। এই একক গ্রীড ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদন ব্যয় কমানো এবং পশ্চিমাঞ্চলে নির্ভরযোগ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা উৎপাদন কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য। তদানুসারে এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত দুটি বিষয় অনুসরণ করা হয়েছে:

(ক) সংযুক্ত গ্রীডের ক্ষমতাকে অবশ্যই সর্বোচ্চ চাহিদা থেকে বেশী হতে হবে। এই ক্ষমতা বলতে বৃহত্তম এবং তৃতীয় বৃহৎ ইউনিটগুলি ব্যতিরেকে যাবতীয় ক্ষমতাকে বোঝায়।

(খ) পশ্চিম গ্রীডের মোট প্রাপ্ত ক্ষমতা ঐ গ্রীডের সর্বোচ্চ চাহিদার চেয়ে কম হবে না যাতে পূর্ব-পশ্চিম আন্তঃসংযোগের দীর্ঘকালীন বৈকল্যে বড় ধরনের লোড শেডিং অপরিহার্য না হয়ে পড়ে।

১২'১৯ সারণী ১২'৪-এ বর্তমানের ও নির্মাণাধীন প্লান্টগুলির বিভিন্ন বছরের সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেখানো হয়েছে। এই সারণী থেকে প্রতিয়মান হবে যে, বর্তমানের ডিরেটেড বিদ্যুৎ কেন্দ্র পুনর্বাসনের পর পূর্বাঞ্চলে ৯৬ মেগাওয়াট এবং পশ্চিমাঞ্চলে ৬১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। পক্ষান্তরে ২৮ মেগাওয়াট বিশিষ্ট পুরানো ডিজেল ইউনিটসমূহ সমগ্র সিস্টেম থেকে বাদ দেয়া হবে। এ ছাড়া সারণীতে পুরানো কতিপয় ইউনিটের ডিরেটিং-এর বিষয়টিকেও বিবেচনা করা হয়েছে। এই পরিকল্পনাকালীন সময়ে যে ক'টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করা হবে সেগুলির বাস্তবায়নের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এই পরিকল্পনার উৎপাদন কর্মসূচীর অন্তর্গত নূতন প্রকল্প-সমূহের মধ্যে রয়েছে, (১) ৯০ মেগাওয়াট বিশিষ্ট আশুগঞ্জ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার স্টেশন, (২) ২১০ মেগাওয়াট বিশিষ্ট ঘোড়াশাল কয়লা খনি, (৩) ৩০ মেগাওয়াট-এর বরিশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, (৪) পূর্ব জোনের জন্য ৬০ মেগাওয়াটের বার্জ মাউন্টেড বিদ্যুৎ কেন্দ্র, (৫) ৩০০ মেগাওয়াট আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্প্রসারণ, (৬) পশ্চিমাঞ্চলের জন্য ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র, এবং (৭) কাপ্তাইয়ের ৪র্থ ও ৫ম ইউনিট। শেষোক্ত তিনটি প্রকল্প এই পরিকল্পনার সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর চালু করা হবে।

সারণী ১২.৪

বর্তমান ও নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ প্ল্যান্টগুলির সর্বাধিক সামর্থ্য

(মেগাওয়াটে)

ষ্টেশন	১৯৭৯/৮০	১৯৮০/৮১	১৯৮১/৮২	১৯৮২/৮৩	১৯৮৩/৮৪	১৯৮৪/৮৫
ক। পূর্বাঞ্চল :						
১। কাপ্তাই পানিবিদ্যুৎ ষ্টেশন	৯২	৯২	১৪২	১৪২	১৪২	১৪২
২। আশুগঞ্জ ১২৮ মেগাওয়াট এসটিপিএস	১০০	১২৮	১২৮	১২৮	১২৮	১২৮
৩। ঘোড়াশাল ১১০ মেগাওয়াট এসটিপিএস	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০
৪। সিদ্ধিরগঞ্জ ৮০ মেগাওয়াট	৬৬	৭৪	৭৪	৭৪	৭৪	৭৪
৫। শাহজিবাজার ১০৮ মেগাওয়াট	৪০	৪০	৫৩	৯০	৯০	৯০
৬। চট্টগ্রাম টিজি ৭ জিটিপিএস	..	..	..	১০	১০	১০
৭। আশুগঞ্জ ৯০ মেগাওয়াট সিসিপিএস	..	..	..	৬০	৯০	৯০
৮। চট্টগ্রাম ৬০ মেগাওয়াট এসটিপিএস	..	..	..	৬০	৬০	৬০
৯। ঘোড়াশাল ২১০ মেগাওয়াট এসটিপিএস	..	..	..	..	..	২১০
১০। খুলনা থেকে ৫৬ মেগাওয়াট বিএমপিপি স্থানান্তর	..	..	..	..	৫৬	৫৬
১১। ৬০ মেগাওয়াট নতুন বিএমপিপি	..	..	..	..	৬০	৬০
মোট ক্ষমতা (ক)	৪০৮	৪৪৪	৫০৭	৬৭৪	৮২০	১০৩০
আঞ্চলিক সর্বোচ্চ চাহিদা (ক')	৩৩৮	৩৯৯	৪৪৯	৫১৪	৫৮৭	৬৭০

	১৯৭৯/৮০	১৯৮০/৮১	১৯৮১/৮২	১৯৮২/৮৩	১৯৮৩/৮৪	১৯৮৪/৮৫
খ। পশ্চিমাঞ্চল :						
১। খুলনা ৬০ মেগাওয়াট এসটিপিএস	৪৫	৪৫	৬০	৬০	৬০	৬০
২। খুলনা ১৬ মেগাওয়াট	৮	৮	১৬	১৬	১৬	১৬
৩। খুলনা ৮ মেগাওয়াট ডিজেল পিএস	৮	৪	৬	৬	—	—
৪। খুলনা টিজি-১৪ জিটি পিএস	১০	১০	১০	১০	১০	১০
৫। খুলনা টিজি ৩৫ জিটি পিএস	১০	১০	১০	১০	১০	১০
৬। বার্জে স্থাপিত ৫৬ মেগাওয়াট জিটিপিএস	..	৫৬	৫৬	৫৬	...	...
৭। ভেড়ামারা ৬০ মেগাওয়াট	৫৮	৫৮	৫৮	৫৮	৫৮	৫৮
৮। সৈয়দপুর ডিজেল পিএস	৭	১০	১০	১০	১০	১০
৯। ঠাকুরগাঁও ডিজেল পিএস	৪	৪	৮	৮	৮	৮
১০। বরিশাল পুরোনো ডিজেল পিএস	৩	৩	৬	৬	৬	...
১১। বরিশাল ২-৬ মেগাওয়াট ডিজেল পিএস	—	..	২·৬	২·৫	২·৫	২·৫
১২। বগুড়া টিজি ৭, জিটি পিএস	৪	৫	৫	৫	৫	৫
১৩। বগুড়া ডিজেল পিএস	...	৫	৬	৬	৬	..
১৪। রাজশাহী ,,	২·২	২·২	২·২	২	..	...
১৫। সিরাজগঞ্জ ,,	১·২	২·৪	২·৪	৪·০	...	...
১৬। খুলনা ১১০ মেগাওয়াট এসটিপিএস	..	..	..	১১০	১১০	১১০
১৭। বরিশাল জিটিপিএস	...	...	..	..	২০	২০
১৮। ক্ষুদ্র ডিজেল পিএস	..	...	৬·৩	৪·৫	২·৫	২·৫
মোট ক্ষমতা (খ)	১৪৬·৪	২২২·৬	২৬৪·৪	৩৭৪·২	৩২৪	৩১২
আঞ্চলিক সর্বোচ্চ চাহিদা (খ)	১২৪	১৪৬	১৫২	১৮০	২১২	২৫২
= সমন্বিত সিস্টেম ক্ষমতা (ক+খ)	..	—	..	১,০৪৮	১,১৪৪	১,৩৪২
= সিস্টেম ফার্ম ক্যাপাসিটি ..	..	..	..	৮৭৪	৯১০	১,০৬৮
= সিস্টেম সর্বোচ্চ চাহিদা (ক+খ)	..	—	...	৬৯৪	৭৯৯	৯২২

সারণী

বিদ্যুৎ উৎপাদন

বছর।	পূর্বাঞ্চল।				পরিকল্পিত নূতন বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট।
	পরিকল্পিত নূতন বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট।	সর্বোচ্চ ক্ষমতা।	সর্বোচ্চ চাহিদা।	*সর্বোচ্চ উৎপাদন-কালীন সময়ে পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্যুৎ স্থানান্তরের জন্য নির্ভরযোগ্য অবশেষ।	
১৯৭৯/৮০		৪০৮	৩০৮	..	
১৯৮০/৮১	পুনর্বাসন (৩৬)	৪৪৪	৩৯৯	..	বিএমপিপি (৫৬) পুনর্বাসন (২০·৪)
১৯৮১/৮২	কাপ্তাই (৫০) পুনর্বাসন (১৩)	৫০৭	৪৪৯	..	পুনর্বাসন ৩৯·৩ বরিশাল ডিজেল (২·৫)
১৯৮২/৮৩	আশুগঞ্জ সিসি (৬০) চট্টগ্রাম (৬০) পুনর্বাসন	৬৭৪	৫৪৪	৯৬	খুলনা (১১০) পুনর্বাসন (১·৬)
১৯৮৩/৮৪	আশুগঞ্জ সিসি (৩০) বিএমপিপি (৬০+৫৬)	৮২০	৫৮৭	১৬৯	বরিশাল (২০) বিএমপিপি(—৫৬)
১৯৮৪/৮৫	ঘোড়াশাল (২১০)	১০৩০	৬৭০	১৫০	..
১৯৮৫/৮৬	আশুগঞ্জ (১৫০)	১১৮০	৭৭০	২০০	..
১৯৮৬/৮৭	আশুগঞ্জ (১৫০)	১৩৩০	৮৮৬	২৩৪	(১০০)
১৯৮৭/৮৮	কাপ্তাই (১০০)	১৪৩০	১০১৯	২০১	..
১৯৮৮/৮৯	ঘোড়াশাল (২১০)	১৬৪০	১১৭২	২৫৮	..
১৯৮৯/৯০	(২০০)	১৮৪০	১৩৪৮	২৮২	(১০০)

* নির্ভরযোগ্য প্রান্তিক=

১২'৫

তফসিল ১৯৮০—৯০

(মেগাওয়াটে)

পশ্চিমাঞ্চল			সমগ্র সিস্টেম			
যে পরিমান ক্ষমতা বন্ধ করে দেওয়া হবে।	সর্বোচ্চ ক্ষমতা।	সর্বোচ্চ চাহিদা।	সর্বোচ্চ ক্ষমতা।	স্থির ক্ষমতা।	সর্বোচ্চ চাহিদা।	সর্বোচ্চ ক্ষমতার শতকরা হারে রিজার্ভ ক্ষমতা।
..	১৪৬'৪	১২৪				
..	২২২'৬	১৪৬	গ্রীডগুলিকে এখনও পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয় নাই।			
..	২৬৪'৪	১৫২				
১'৮	৩৭২'২	১৮০	১০৪৮	৮৭৪	৬৯৪	৩৪%
১৪'২	৩২৪	২১২	১১৪৪	৯৭০	৭৯৯	৩০%
১২	৩১২	২৫২	১৩৪২	১০৬৮	৯২২	৩১%
৩	৩০৯	২৯০	১৪৮৯	১১৬৯	১০৬০	২৯%
...	৪০৯	৩৩৩	১৭৩৯	১৩৭৯	১২১৯	৩০%
..	৪০৯	৩৮৩	১৮৩৯	১৪৭৯	১৪০২	২৪%
..	৪০৯	৪৪১	২০৪৯	১৬৮৯	১৬১৩	২১%
..	৫০৯	৫০৭	২৩৪৯	১৯৩৯	১৮৫৫	২১%

=সর্বোচ্চ ক্ষমতা-সর্বোচ্চ চাহিদা—বৃহত্তম প্ল্যান্টের ক্ষমতা।

খ-ট্রান্সমিশন

১২'২০ এই উপখাতের কার্যক্রমে ১৬টি ট্রান্সমিশন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এইসব ট্রান্সমিশন প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হলে দেশের প্রতিটি জেলাকে বিদ্যুৎ গ্রীড ব্যবস্থার সংগে সংযুক্ত করা হবে। কিছু সংখ্যক প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমান লাইন ও উপকেন্দ্রসমূহের ক্যাপাসিটিকে আরও বাড়ানো হবে। পরিকল্পনাকালীন সময়ে সর্বমোট ৪০২ মাইল ট্রান্সমিশন লাইন চালু করা হবে। এর মধ্যে ৭৯ মাইলের কাজ সম্পন্ন হবে বৃহত্তর ঢাকা, বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও বৃহত্তর রাজশাহী বিতরণ প্রকল্পের আওতায়। ট্রান্সমিশন প্রকল্পের অধীনে সম্পন্ন হবে ৯৪ মাইলের আন্তঃসংযোগসহ আরও ৩২৩ মাইলের কাজ। এ ছাড়াও, ট্রান্সমিশন খাতের কার্যক্রমে ১১০ মাইল দীর্ঘ গোয়ালপাড়া-ঈশ্বরদি দ্বিতীয় সার্কিট লাইনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। শুধুমাত্র আন্তঃসংযোগ ছাড়া আর সব লাইনই ১৩২ কে ভি সঞ্চালন লাইন।

গ-বিতরণ ঃ

১২·২১ বিতরণ উপ খাতের কার্যক্রম আংশিকভাবে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বাস্তবায়ন করবে। শহরাঞ্চলের এবং কতিপয় নির্বাচিত পল্লী এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের কর্মসূচীর আওতায় পড়বে। সকল ৩৩ কে ভি লাইন বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ব্যবস্থাধীনে এবং ৩৩ কে ভি'র সাব-ষ্টেশনগুলি ও সকল নিম্ন ভোল্টেজ সিস্টেম স্ব স্ব বিতরণ কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে থাকবে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ভৌত কার্যক্রমে ২০০০ মাইলের ৩৩ কে ভি লাইন, ৮৫০০ মাইলের নিম্ন ভোল্টেজ লাইন এবং প্রায় ৭৬টি থানায় ৫০০০ গ্রামকে বিদ্যুতায়িত করার বিষয় বিবেচনাধীন রাখা হয়েছে। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ১১৯টি থানায় প্রায় ১৮,০০০ গ্রামে প্রায় ৯,০০০ মাইল বিতরণ লাইন নির্মাণ করবে। পরিকল্পনার সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই দেশের সব থানায় বিদ্যুতের আওতাধীন আসবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

ঘ-বিবিধ প্রকল্পসমূহ

১২·২২ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ প্রকল্প ছাড়াও বিভিন্ন উদ্দেশ্য সম্বলিত আরও কয়েকটি প্রকল্পকে এই খাতওয়ারী কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে একাধিক হচ্ছে জরীপ বিষয়ক, আর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণটি হল জ্বালানী পরিকল্পনা প্রকল্প। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে ২০০০ সাল পর্যন্ত দেশের জ্বালানীর চাহিদা তুলে ধরা এবং এই সময়ের জন্য নীতি ও বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করা। এ ছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম জোনের জন্য যথাক্রমে দুটি প্রধান পুনর্বাসন প্রকল্প রয়েছে, এবং সিস্টেমের সুবিধার সহায়তা করার জন্য দুটি প্রকল্প যথাঃ লোড ডেসপাচ কেন্দ্র ও একটি যন্ত্রপাতি মেরামত কারখানাও রয়েছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে দক্ষ জনশক্তির তীব্র অভাব কাটিয়ে উঠার লক্ষে এই উন্নয়ন কার্যক্রমে একটি প্রশিক্ষণ প্রকল্পও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক বিনিয়োগ ঃ

১২·২৩ পাঁচ বছরের জন্য বিদ্যুৎ খাতে বরাদ্দের মোট পরিমাণ হচ্ছে ১৪৩৬ কোটি টাকা (১৯৭৯/৮০র মূল্য হিসাবে)। রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্প, বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন এবং জ্বালানী পরিকল্পনার জন্য পরিকল্পনা কমিশনকে খুব সামান্য বরাদ্দ রাখা ছাড়া তহবিলের বাকীটা বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়েছে। ১২·৫ সারণীতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে বিদ্যুৎ খাতে সংস্থা/কর্মসূচীওয়ারী বরাদ্দের হিসেব দেখানো হয়েছে।

সারণী ১২·৬

বিদ্যুৎ খাতে প্রতিষ্ঠান/কার্যক্রম ভিত্তিক বরাদ্দ

[কোটি টাকায়]

প্রতিষ্ঠান উপখাত	দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য মোট	
	১৯৭৯/৮০ মূল্যে	চলতি মূল্যে
(১) বিপিডিবি :		
(ক) বিদ্যুৎ উৎপাদন	৫৫৪·৩৫	৮৬৬·৯৫
(খ) সরবরাহ	২১০·৪৩	২৮৭·১৫
(গ) বিতরণ	৩৬৮·৫৮	২২৫·৩৪
(ঘ) বিবিধ	৯৮·৪৭	১৪৪·৬৬
মোট ..	১২৩১·৮৩	১,৮২৪·১০
(২) আরইবি	১৯৮·৯৫	২৯৪·৯০
(৩) বিএইসি	০·৫৭	০·৮২
(৪) পরিকল্পনা কমিশন	৪·৬৫	৭·৫৯
মোট ..	১,৪৩৬·০০	২,১২৭·৪১

সারণী ১২·৭

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য ভৌত লক্ষ্যমাত্রা

	১৯৭৯/৮০	১৯৮৪/৮৫
বিপিডিবি		
(১) বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (সর্বোচ্চ ক্ষমতা)	৫৫৪ মেগাওয়াট	১৩৪২ মেগাওয়াট
(২) সঞ্চরবাহ লাইন (২৩০,১৩২,৬৬ কিলোভোল্ট)	১০৯৪ মাইল	১৪৯৬ মাইল
(৩) ৩৩ কেভি লাইন	৩০১৫ মাইল	৫০১৫ মাইল
(৪) ১১ কেভিও এবং এলভি লাইন	৮৮৭৫ মাইল	১৭৩৭৫ মাইল
(৫) বিদ্যুতায়িত থানা	৩৫৭	৪৩৩
(৬) বিদ্যুতায়িত গ্রাম	২,১৮১	৭,১৮১
(৭) বিদ্যুতায়িত সেচ পাম্প (এল এলপি, ডিটিডব্লিউ, এটিডব্লিউ)	৪,৪০৬	১২,০০০
আর,ই,বি,		
(১) সঞ্চরবাহ লাইন (১১ কেভিও এর নীচু শক্তি সম্পন্ন)	৫০০ মাইল	৯,৫০০ মাইল
(২) কার্যরত পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	১	৩৩
(৩) বিদ্যুতায়িত থানা	৩	১১৯
(৪) বিদ্যুতায়িত গ্রাম	০	১৮,০০০

খ—প্রাকৃতিক সম্পদ খাত

১২·২৪ হাইড্রোকার্বন বাংলাদেশে প্রাপ্ত একমাত্র প্রাকৃতিক গ্যাস। তবে এর ব্যবহার এখনও সীমিত। এই গ্যাসের সর্বমোট মজুতের পরিমাণ ধরা হয়েছে ১১ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট; অর্থাৎ প্রায় ২৫০ মিলিয়ন টন তেলের সমপরিমাণ। পক্ষান্তরে বর্তমানে গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণ বাৎসরিক মাত্র ১·৬ মিলিয়ন টন তেলের সমপরিমাণ। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রগুলিতে গ্যাসের সঠিক পরিমাণ নির্ণীত হলে এই মজুদের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে পারে। এ ছাড়া নতুন নতুন গ্যাস ক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনাও অত্যন্ত উজ্জ্বল। দেশের অন্যান্য হাইড্রোকার্বন সম্পদের মধ্যে রয়েছে জামাল গঞ্জের কয়লা (৭০০ মিলিয়ন টন) এবং পিট (১৬৫ মিলিয়ন টন)। জ্বালানী খাতের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক গ্যাস উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিমালা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করবে। জ্বালানী বা জ্বালানী হিসাবে গ্যাসের সুসমন্বিত বিভিন্নমুখী ব্যবহার যেমন তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি), সংমর্দিত প্রাকৃতিক গ্যাস, জি এন জি, সার, পলিথিনাইল কম্পাউন্ড, পিভিসি ও গ্যাস রপ্তানীর সম্ভবনা ইহার উপযুক্ত মজুতের নিশ্চয়তা, ব্যবহারের বাস্তবোচিত বিকল্পসমূহ এবং বিভিন্ন বিকল্প থেকে প্রত্যাশিত ফলাফল ও তহবিল ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল।

১২·২৫ বাংলাদেশে পেট্রোলজাত দ্রব্যের বাজারজাত চাহিদা খুবই সীমিত (বার্ষিক প্রায় ১·৫ মিলিয়ন টন) যার প্রায় সব টুকুই আমদানী করা হয়। ১৯৭৯/৮০ সনে পেট্রোলিয়াম আমদানী বাবদ

বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় ছিল ৫১৬·০০ কোটি টাকা যা দেশের মোট রপ্তানী আয়ের শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশী। মোট পেট্রোলজাত দ্রব্যের শতকরা প্রায় ৩৩ ভাগ পরিবহণ খাতে, ২৮ ভাগ অভ্যন্তরীণ খাতে, ১৯ ভাগ শিল্প খাতে, ১৫ ভাগ বিদ্যুৎ খাতে এবং ৫ ভাগ কৃষি খাতে ব্যবহৃত হয়।

অতীত কাজের পর্যালোচনা

১২.২৬ **ভূতাত্ত্বিক জরীপ:** প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা কালীন সময়ে, ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিষয়ক আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানটিকে একটি জাতীয় সংস্থায় রূপান্তরের জন্য প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়। ভূতাত্ত্বিক তথ্যের জন্য ভূমি জরিপ ও মানচিত্র প্রণয়ন এবং ভৌত ও রাসায়নিক ভূতাত্ত্ববিদ্যা সংক্রান্ত উপাত্ত-সমূহের তুলনামূলক সমীক্ষার জন্য একটি অবাহত কর্মসূচী প্রণয়নই এর উদ্দেশ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনশক্তি ও অতীব প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তার অভাব থাকায় খুবই সীমিত আকারে এ কাজ সরেজমিনে সম্পন্ন হয়।

১২·২৭ **তেল ও গ্যাস:** দেশের হাইড্রোকার্বনের সম্ভাবনা এবাবৎ সীমিত খনন ও উত্তোলন কাজের দরুণ যথাযথ ভাবে নিরূপন করা যায়নি। যা হোক, বিশ্বের একটি অন্যতম বৃহৎ ব-দ্বীপ হিসেবে বংগীয় অববাহিকায় এই আপাতঃ প্রতীয়মান গ্যাস প্রধান দেশে তেল প্রাপ্তিরও ভাল সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাকালে 'উৎপাদনে অংশিদারিত্ব' চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলের অদূরবর্তী অঞ্চলে সাতটি কূপ খনন করা হয়। এরমধ্যে কুতুবদিয়ার নিকটবর্তী একটি মাত্র কূপে গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়। পেট্রোবাংলা তাদের উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় নিজস্ব রিগ ও ক্রুদের দ্বারা উপকূল অঞ্চলে শুধুমাত্র দু'টি কূপ খনন করে।

১২·২৮ **গ্যাসক্ষেত্রের উন্নয়ন:** অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য হাইড্রোকার্বন সম্পদ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। তাই প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রাকৃতিক গ্যাসের যথাযথ ও মিতব্যয়ী ব্যবহারের জরুরী প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ১৯৭৩ সনে অপরিশোধিত তেলের মূল্য আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমদানীকৃত তেলের বিকল্প সম্ভাব্য মজুত জ্বালানী ও কাঁচামাল হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার ত্বরান্বিত করার জন্য গ্যাস সরবরাহ ও বিতরণ প্রকল্পগুলিকে অগ্রাধিকার প্রদান অতীব প্রয়োজন হয়ে ওঠে। মোট ৪টি গ্যাস ক্ষেত্রে ১০টি কূপ থেকে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। এর মধ্যে ৫টি কূপ তিতাস ক্ষেত্রে, ২টি কূপ হবিগঞ্জে, ২টি কূপ সিলেটে ও একটি ছাতকে অবস্থিত। এই ১০টি কূপের মোট দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ২৫০ মিলিয়ন কিউবিক ফুট (MMCFD) এবং দৈনিক ব্যবহার প্রায় ২২৬ মিলিয়ন কিউবিক ফুটে (MMCFD)।

১২·২৯ **গ্যাস সঞ্চালন:** প্রধানতঃ তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন ও ডিষ্ট্রিবিউশন (TGTDC) এবং সম্প্রতি গঠিত জালালাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন সিষ্টেমের (TGDS) মাধ্যমেই গ্যাস বিতরণ করা হয়ে থাকে। তিতাস গ্যাস ১৯৮০ সনের জুনের হিসেব অনুযায়ী মোট ১,০৬৫ মাইল দীর্ঘ বিভিন্ন সাইজের লাইনের মাধ্যমে জয়দেবপুর, নারায়নগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আশুগঞ্জ, ভৈরব বাজার, নরসিংদী, ঘোড়াশাল ও সাভারসহ বৃহত্তর ঢাকায় গ্যাস সরবরাহ করে। জালালাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন সিষ্টেম ৮৫ মাইল দীর্ঘ পাইপ লাইনের মাধ্যমে সিলেট সহর ও তৎসংলগ্ন এলাকা এবং হবিগঞ্জের চা-উপত্যকায় গ্যাস সরবরাহ করে থাকে। বাখরাবাদ গ্যাস ক্ষেত্রের বিস্তারিত সম্ভাব্যতা জরীপ সম্পন্ন হয়েছে এবং এই প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেয়া হবে। আশুগঞ্জ সার কারখানার চাহিদা মেটানোর জন্য ১২ ইঞ্চি ব্যাসের ৩৫ মাইল দীর্ঘ পাইপ লাইনবিশিষ্ট হবিগঞ্জ-আশুগঞ্জ

প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ১২·৮ সারণীতে বর্তমান ও প্রস্তাবিত সংবরাহ পাইপ লাইনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

সারণী ১২·৮

বর্তমানে গ্যাস সরবরাহ লাইন

ক্রমিক নং।	পাইপ লাইন	ব্যাস (ইঞ্চিতে)	দৈর্ঘ্য (মাইল)	লাইনে প্রবাহ ক্ষমতা (এমএমসিএফডি)	ওয়ার্কিং প্রেসার (পিএসআইজি)
ইতিমধ্যে নির্মিত:					
১।	তিতাস-ঢাকা ..	১৪	৬০	১৭০	১০০০
২।	সিলেট-ফেঞ্চুগঞ্জ ..	৮	৩১	২৩	৬৫০
৩।	ছাতক সিমেন্ট ..	৪	১২	৯	৬৫০
৪।	হবিগঞ্জ-শাহজী বাজার ..	৮	১·৫	০৬	৪৫০
৫।	হবিগঞ্জ-আশুগঞ্জ নির্মীয়মাণ	১২	৩৫	৯০	১,০০০
৬।	বাখরাবাদ-চট্টগ্রাম ..	২৪	১১০	০৩৬	৯৬০
৭।	কৈলাশটিলা-সিলেট ..	৮	৮	৩০	৬৫০

১২·৩০ **প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন:** প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বছরে (১৯৭৭/৭৮), গ্যাসের প্রকৃত উৎপাদন ৩৪·০৯০ মিলিয়ন ঘনফুটের স্থলে দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার প্রান্তিক বৎসরে মোট গ্যাস উৎপাদনের লক্ষমাত্রা ছিল ৪১,১৬৫ মিলিয়ন ঘনফুট। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১৯৭৯/৮০ সনে ৪টি গ্যাস ক্ষেত্র থেকে মোট ৪৪,৯৭০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস (সারণী ১২·৯) উত্তোলন করা হয়। এতে দেখা যায় যে, প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার প্রান্তিক বছর থেকে গ্যাসের উৎপাদন শতকরা ৩২ ভাগ এবং দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বছরের লক্ষমাত্রা থেকে শতকরা ৯·২ ভাগ গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

অপরিশোধিত তেল প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং পেট্রোলিয়াম পদার্থের ব্যবহার

১২·৩১ বাংলাদেশের একমাত্র পেট্রোলিয়াম প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা ইস্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল) ১৯৬৮ সালে চালু করা হয়। এই শোধনাগারের প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্ষমতা হচ্ছে ১·৫ মিলিয়ন টন। এতে দুটো নতুন প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট সংযোজন করা হয়েছে। এ দুটোর নাম হলঃ একটি তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস রিকভারী ও ব্লেন্ডিং ইউনিট এবং একটি বিটুমিন কারখানা। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম সংস্থা (বিপিসি) ১৯৭৭ সালের জানুয়ারী মাসে স্থাপিত হয়। অপরিশোধিত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ তদারক এবং পিওএল পণ্যের বাজারজাতকরণের দায়িত্ব পেট্রোবাংলার পরিবর্তে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের ওপর ন্যস্ত করা হয়।

১২·৩২ পরিশোধিত পেট্রোলজাত সামগ্রীর অভ্যন্তরীণ বাজার কাঠামো থেকে মধ্যম ডিষ্টিলেট বিশেষতঃ ডিজেল ও কেরোসিনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা প্রতীয়মান হয়। ১৯৭৯/৮০ সালে পিওএল সামগ্রী ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ১৪·৬০ লক্ষ টন; অথচ অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ছিল মাত্র ১১·৭৪ লক্ষ টন।

১২·৯ সারণীতে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনাকালীন উৎপাদন ও ব্যবহারের পরিমাণ দেখানো হয়েছে :

সারণী ১২·৯
বাণিজ্যিক জ্বালানীর উৎপাদন ও ব্যবহার

বিষয়	ইউনিট	প্রকৃত উৎপাদন ও ব্যবহার ১৯৭৭/৭৮	লক্ষ্যমাত্রা ১৯৭৯/৮০	প্রকৃত উৎপাদন ও ব্যবহার ১৯৭৯/৮০
১। প্রাকৃতিক গ্যাস (উৎপাদন ও ব্যবহার)	এমএমসিএফ/বছর	৩৪,০৯০	৪১,১৬৫	৪৪,৯৭০
২। পিওএল উৎপাদন	'000' এম/টন	১,০২২	১,১৩৪	১,১৭৪
৩। পিওএল ব্যবহার	ঐ	১,২৮৬	১,২৩০	১,৪৬০
৪। আমদানী :				
(ক) অশোধিত তেল	ঐ	১,০৭৭	১,২০০	১,২৭৮
(খ) পিওএল পণ্য	ঐ	৩৬৯	২৮৩	৪৭৪
৫। রপ্তানী :				
(ক) ন্যাপথা	ঐ	৭,৯২১	৯৬	৭০
(খ) এ্যাসফল্ট বিটুমেন	ঐ	..	১৭·৫	..
(গ) তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস	ঐ	..	২	৩

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ

১২·৩৩ প্রাকৃতিক সম্পদের পরিকল্পিত অনুসন্ধান এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ :—

(১) প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাসের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং আমদানীকৃত তেলের বিকল্প সৃষ্টির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচানো।

(২) সুষ্ঠ পদ্ধতি মাফিক প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্রগুলির উন্নয়ন সাধন।

(৩) জ্বালানী সরবরাহের ক্ষেত্রে পরিমিত আঞ্চলিক ভারসাম্যরক্ষা।

(৪) হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও ডেটা প্রসেসিং এর ব্যাপারে স্থানীয় দক্ষতা এবং কারিগরী সামর্থ উন্নয়ন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা, কর্মচারীদের উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠানিক উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ ও উদ্যোগ গ্রহন করা হবে।

(৫) ভূতাত্ত্বিক জরিপের ব্যাপারে জাতীয় সামর্থ্য জোরদার এবং প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য সহায়ক সার্ভিস সৃষ্টি।

(৬) ক্রেতাদের বিশেষ করে সার ও বিদ্যুৎ খাতের ক্রেতাদের জন্য গ্যাস সরবরাহের নির্বিঘ্নতা, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতায় নিশ্চয়তা প্রদান :

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশলসমূহ

১২·৩৪ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদের প্রধান উন্নয়ন কৌশলসমূহ নিম্নরূপ :

(১) প্রাকৃতিক গ্যাসকে ব্রত আমদানীকৃত জ্বালানী তেলের বিকল্পরূপে প্রতিষ্ঠার জন্য গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের সব ক'টি প্রধান শিল্প, বাণিজ্যিক ও নগর অঞ্চলে গ্যাসের ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সঞ্চালন ও বিতরণ খাতে মোট অর্থ বরাদ্দের শতকরা ৪১ ভাগ বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

(২) সরবরাহ ও বিতরণের উদ্দেশ্যে পাইপ লাইন বসানোর কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য দ্বিমুখী ব্যবস্থা হাতে নেয়া হবে। প্রথমতঃ নতুন কূপ খননের মাধ্যমে বর্তমান গ্যাস সরবরাহ পরিস্থিতিকে স্থিতিশীল ও জোরদার করা। দ্বিতীয়তঃ অধিক সংখ্যক গ্যাস ব্যবহারকারীর কাছে গ্যাস পৌঁছানোর জন্য গ্যাস সরবরাহ নেট ওয়ার্কের উন্নয়ন সাধন।

(৩) শোধনাগারকে অপচিনাম ক্ষমতায় ব্যবহার করার জন্য বি, এম, আর, এর প্রয়োজনীয় সমীক্ষা হাতে নেওয়াসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ইষ্টার্ণ রিফাইনারীর সম্প্রসারণ।

(৪) পশ্চিমাঞ্চলে সম্ভাব্য গ্যাস সরবরাহের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই করা এবং গ্যাস থেকে এলপিজি মিশ্র নিষ্কাশন করার সম্ভাব্যতা পরিচালনার কাজও এগিয়ে নেয়া এবং পরিবহন সেক্টরে গ্যাসের বহুমুখী ব্যবহারের যাচাই করা।

(৫) বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চলে তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান ত্বরান্বিত করা।

গ্যাস তেলের চাহিদা ও সরবরাহ :

১২'৩৫ **প্রাকৃতিক গ্যাস :** পেট্রোলিয়ামের আমদানী ব্যাপকভাবে হ্রাস করে সেক্টরে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও তার উন্নয়নের উপর বাংলাদেশের জ্বালানীর ভবিষ্যৎ বহুলাংশে নির্ভরশীল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বছরে গ্যাসের বার্ষিক ব্যবহার দৈনিক ১,২৮,০০০ মিলিয়ন ঘনফুটে পৌঁছাবে বলে হিসাব করা হয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে ১৯৭৯/৮০ সালের দৈনিক ৪৪,৯৭০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস ব্যবহারের চেয়ে অনেক বেশী। বিদ্যুত সার ও উৎপাদন খাতে বর্ধিত হারে গ্যাসের ব্যবহারই এই বৃদ্ধির প্রধান কারণ। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বছর নাগাদ বার্ষিক গড় গ্যাস ব্যবহার বৃদ্ধির হার হবে ১৯৭৯/৮০ সালের গ্যাস ব্যবহারের তুলনায় ২৩ শতাংশ। সারণী ১২'১০এ ১৯৮০—৮৫ সালের জন্য প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদার আভাস দেওয়া হয়েছে।

সারণী ১২'১০

গ্যাসের চাহিদা ও সরবরাহের প্রকৃত ও পরিকল্পিত পরিস্থিতি

(মিলিয়ন কিউবিক ফুট/দিবস)

	১৯৭৯/৮০	১৯৮০/৮১	১৯৮১/৮২	১৯৮২/৮৩	১৯৮৩/৮৪	১৯৮৪/৮৫
ক। তিতাস সিস্টেম						
বিদ্যুৎ (আশুগঞ্জ, ঘোড়াশাল সিদ্ধিরগঞ্জ, শাহজি বাজার)	৫৬	৬৮	৭০	৯৬	১২০	১৫০
রাসায়নিক সার (আশুগঞ্জ, ঘোড়াশাল ও পলাশ)	৫২	৫২	৮০	৮৩	৯৩	১০০
অন্যান্য (শিল্প বাণিজ্যিক ও গৃহস্থালী)	১৯	৩৩	৬৩	৬৮	৭৮	১০০
চাহিদা (তিতাস সিস্টেম)	১২৭	১৫৩	২১৩	২৪৭	২৯১	৩৫০
সরবরাহ ঐ			২০০	২১০	২৫৪*	৩৭৪**
উদ্বৃত্ত (+)/ঘাটতি(—)			(—১৩)	(—৩৭)	(—৩৭)	(+২৪)

	১৯৭৯/৮০	১৯৮০/৮১	১৯৮১/৮২	১৯৮২/৮৩	১৯৮৩/৮৪	১৯৮৪/৮৫
জালালাবাদ সিস্টেম			২৮	২৮	৩০	৪৫
চাহিদা			২৮	২৮	৩০	৬০**
সরবরাহ						
উদ্বৃত্ত (+)/ঘাটতি(—)						(+১৫)
গ। বাঁধরাবাদ সিস্টেম					৩০	৫০
চাহিদা(সার, বিদ্যুৎ ইত্যাদি)						
সরবরাহ					১৫০	১৫০
উদ্বৃত্ত (+)/ঘাটতি(—)				(+১৫০)	(+১২০)	(+১০০)
মোট চাহিদা (ক+খ+গ)	১২৭	১৫৩	২৪১	২৭৫	৩৫১	৪৪৫

দ্রষ্টব্য : (১) মোট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি পরিস্থিতির তেমন বড় রকমের কোন তাৎপর্য নেই। কারণ, তিনটি গ্যাস সিস্টেম পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত নয়।

(২) স্থির কার্যক্রমের সরবরাহ পরিস্থিতি দেওয়া হয়েছে এবং এজন্য বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা সংস্থানের বিষয় চূড়ান্ত হয়েছে।

(৩) *তিতাসের ৬নং কূপ ও কামতার ১নং কূপ চালু করার জন্য এই বৃদ্ধি ঘটেছে।

(৪) **তিতাসের ৭নং, ৩৮নং কূপ এবং হবিগঞ্জের ২নং ও ৩নং কূপ চালুর জন্য এই বৃদ্ধি ঘটেছে।

১২·৩৬ **পেট্রোলজাত সামগ্রী :** আন্তঃ জ্বালানী মূল্য কাঠামোর পরিবর্তন হলে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানীকৃত তেলের একটি উল্লেখযোগ্য বিকল্পে রূপান্তরিত হবে বলে আশা করা যায়। একদিকে কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন ত্বরান্বিত হলে সেচ ও পরিবহণের জন্য ডিজেলের চাহিদা বৃদ্ধির প্রবনতা দেখা দেবে, অন্যদিকে, পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের উপর অধিক গুরুত্ব এর প্রতিবিধায়ক হিসাবে কাজ করবে। বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে এবং বিভিন্ন ধরনের জ্বালানীর ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণ ও আমদানীর বিকল্প সংক্রান্ত নীতি সমূহ অনুসৃত হবে ধরে নিয়ে হিসেব করে দেখা গেছে যে 'পিওএল' পণ্যসমূহের জন্য ১৯৮১/৮২ সালের চাহিদা ১৯৭৯/৮০ সালের ১·৩৯ মিলিয়ন টন চাহিদার তুলনায় ১·৪২ টনে বৃদ্ধি পাবে এবং পরবর্তীকালে অর্থাৎ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বছরে চাহিদা ১·৩২ টনে হ্রাস পাবে। সারণী ১২ ১১এ পরিকল্পনা মেয়াদে প্রধান পেট্রোলিয়াম পণ্যগুলির চাহিদা পরিস্থিতির চিত্র দেখানো হয়েছে :

সারণী ১২·১১

প্রধান পেট্রোলিয়াম পণ্য সামগ্রীর চাহিদা* ('০০০' মেট্রিক টন)

	প্রকৃত			পরিকল্পিত		
	১৯৭৯/৮০	১৯৮০/৮১	১৯৮১/৮২	১৯৮২/৮৩	১৯৮৩/৮৪	১৯৮৪/৮৫)
এইচ ও বিসি	৬·১৫	৬·৯৬	৬·৬৫	৬·৫০	৭·০০	৭·৭০
এম এস	৫৫·৬১	৪৯·৬৪	৪৭·৭৫	৩৬·০০	৩৬·০০	৩৬·০০
জেপি-১	৪৩·৬৫	৫০·৩২	৫৮·২৪	৬০·০০	৬০·০০	৬৫·০০
এস কে ও	৩৮৪·২২	৪৪৮·০৬	৪০২·৬৯	৩৬০·০০	৩৩০·০০	৩২০·০০
এইচ এস ডি	৪১৩·৫৪	৪১৩·৩১	৫১১·৬৪	৪৪০·০০	৪৭৫·০০	৪৭৫·০০
এলডিও	৩২·০২	৩৫·১৬	৩০·১৬	৩৫·০০	৩০·০০	৩০·০০
এফওএইচএস	৪২৫·১৮	৩৭১·২৩	৩৩১·৫০	৩৫০·০০	৩৫০·০০	৩২০·০০
জেবিও	৩৩·১৯	৩৫·২৩	৩২·৩২	৩৬·০০	৩২·০০	৩২·০০
মোট :	১,৩৯৩·৫৫	১,৪০৯·৯১	১,৪২০·৯৫	১,৩২৪·৫০	১,৩২০·০০	১,৩১৫·৭০

দ্রষ্টব্য : ন্যাপথা, এলপিজি, এমটিটি এবং এসবিপির মত ছোট খাট সামগ্রী বাদে, এগুলির মোট বার্ষিক ব্যবহারের পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাজার মেট্রিক টন।

সুপারিশকৃত নীতি

১২·৩৭ **বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগের (GSB) এর প্রতিষ্ঠানিক উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ :** বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগকে যথেষ্ট জনশক্তি, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য কারিগরী সুবিধে দিয়ে জোরদার করতে হবে। দেশের দীর্ঘমেয়াদী চাহিদা পূরণের জন্য দক্ষতা ও জনশক্তিকে পুনর্গঠিত করার লক্ষ্যে ব্যাপক ও পুংখানুপুংখ প্রশিক্ষণের কাজ হাতে নেয়া হবে। বাংলাদেশ ও দেশের বাইরে কারিগরী ও পেশাগতক্ষেত্রে এই ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ ব্যাপক এবং দীর্ঘমেয়াদী সুফল বয়ে আনবে।

জরিপ মানচিত্র প্রণয়ন ও অনুসন্ধানের মত ক্ষেত্রসমূহে স্থানীয় সামর্থ বৃদ্ধির জন্য জনশক্তির সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন অপরিহার্য।

১২·৩৮ **গ্যাসের সদ্ব্যবহার সর্বোচ্চকরণ :** প্রাকৃতিক গ্যাসের বর্ধিত ব্যবহারের জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের প্রয়োজন দেখা দেবে। আর এ জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার দরকার হবে। গ্যাস, প্রক্রিয়াজাতকৃত গ্যাস ও গ্যাস-ভিত্তিক সামগ্রী রপ্তানীর মাধ্যমে এই বৈদেশিক মুদ্রার এক অংশ আয় করা যেতে পারে। প্রস্তুত পণ্য হিসাবে গ্যাসের রপ্তানীর বিষয়টি সক্রিয়ভাবে অনুধাবন করে দেখা হবে।

১২·৩৯ **অশোধিত তেল আমদানী ও প্রক্রিয়াজাতকরণ :** দেশের দ্রব্য চাহিদার বিশ্লেষণ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, চট্টগ্রামের পেট্রোলিয়াম রিফাইনারীর ক্ষমতা যদি সর্বোচ্চ মাত্রায়ও ব্যবহার করা হয় তবুও ১৯৯০ সন পর্যন্ত বাংলাদেশকে কমপক্ষে দুটি প্রধান দ্রব্য (এইচ, এস, ডি, কেরোসিন) আমদানী করতে হবে। এই অসামঞ্জস্য হ্রাসের জন্য নিম্নোক্ত বিকল্প/সম্ভাবনাগুলির অর্থনৈতিক দিক পুংখানুপুংখরূপে পরীক্ষা করে দেখা হবে :

(ক) শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত নিম্নমধ্যচ্ছিন্ন উৎপাদন নিশ্চিত করা এবং নন্যাপ্থা ও যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে সময়পযোগী করার জন্য ইষ্টার্ণ অয়েল রিফাইনারীর সামঞ্জস্যবিধান, আধুনিকীকরণ ও বদলী ব্যবস্থাপনা।

(খ) উদ্বৃত্ত উৎপাদিতপণ্যের বিকল্প ব্যবহার যাচাই। কার্নেস তেলের মান উন্নত করে অপেক্ষাকৃত দামী পণ্যে পরিণত করা। এজন্য অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে 'ডিসপ্রোপোরশনিং প্রক্রিয়া' বিবেচনা করা হবে। এর উদ্দেশ্য হবে পাতন-ক্রিয়ার সমন্বয়ে ভাল পণ্যের ঘাটতি পূরণ।

(গ) আরও বেশী করে পাতন মধ্যকালীন পণ্য পাওয়ার জন্য উদ্বৃত্ত ন্যাপথা স্প্লিটিং এর সম্ভাবনা যাচাই।

পরিকল্পনাকালের স্তোত কর্মসূচী :

১২·৪০ **বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ (GSB) :** বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগের তৎপরতা ত্বরান্বিত করে জরিপ মানচিত্র প্রণয়ন এবং দেশের খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের দিকে চালিত করা হবে। বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরীপ বিভাগের বর্তমান চালু প্রকল্প এই সংস্থাকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ, বিশেষজ্ঞদের সার্ভিস লাভ, উপদেষ্টা সার্ভিস লাভ, সংস্থার কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, একটি ভূতাত্ত্বিক উপাত্ত কেন্দ্র স্থাপন এবং পাঠাগারটি সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করবে। কোন উন্নতদেশের একটি সুগঠিত ভূতাত্ত্বিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা হলে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরীপ বিভাগ

সংস্থাটির মান উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরীপ বিভাগের প্রধান ভৌত কার্যক্রমগুলি নিম্নে বর্ণিত হল :

(১) আঞ্চলিক ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র প্রণয়ন (১৫০,০০০ স্কেলে)	.. ..	১০,০০০ বর্গমাইল
চট্টগ্রাম বিভাগ (মেখলার পূর্বাঞ্চল)	.. ..	২,৫০০ ,,
ঢাকা, ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল	.. ..	২,৫০০ ,,
রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর	.. ..	২,৫০০ ,,
ফরিদপুর, যশোর, খুলনা	.. ..	২,৫০০ ,,
(২) আঞ্চলিক গ্র্যাভিটি, জরীপ	.. ..	২,০০০ ,,
(৩) আঞ্চলিক চৌম্বক জরীপ	.. ..	২,০০০ ,,
(৪) ভূকম্পন প্রতিফলন/রিফ্র্যাকশন জরীপ	.. ..	১০০ এল মাইল
(৫) ভূগর্ভস্থ পানি অনুসন্ধান	.. ..	২,০০০ বর্গমাইল উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলিতে
(৬) ভূ-কারিগরী সমীক্ষা	.. ..	৪০০ বর্গমাইল ৪টি শহর এলাকা ও আশেপাশে
(৭) পরীক্ষামূলক খনন (ড্রিলিং)		৭০,০০০ আর একটি

(৮) নির্মাণ উপযোগী শিলা ও কঠিন আলাদী উৎসসমূহের সন্ধান ও পরিমাণ নিরূপণ, ইট, হালকা জমাটবস্তু নির্মাণোপযোগী মাটি বা কাদার সমীক্ষা এবং ব্রহ্মপুত্র নদ ও এর শাখা প্রশাখা, উপনদীগুলির পলল বা জলাদি সমীক্ষা।

(৯) বৈদ্যুতিক পদ্ধতির মাধ্যমে রংপুর দিনাজপুর জেলায় কিছু নির্বাচিত এলাকায় ভূ-প্রাকৃতিক অনুসন্ধান, রংপুর ও দিনাজপুরের নির্বাচিত এলাকায় ভূকম্পন জরীপ (মধ্যপাড়ার সম্প্রসারিত এলাকাসহ)

(১০) ফসফেটের মত পাললিক সঞ্চয়ের সন্ধানে পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড়ী এলাকাগুলিতে ভূ-রাসায়নিক জরীপ

১২·৪১ **তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান :** গোটা দেশে বিশেষ করে পশ্চিম অঞ্চলে একদিকে যেমন একটী উপযোগী তেল গ্যাস ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণের জন্য জোর আরোপ করা হবে অন্যদিকে তেমনি উচ্চ প্রেশারজোন নির্ণয়ের লক্ষ্যে খননের উপরও জোর দেয়া হবে। দ্বিতীয়তঃ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সব গ্যাস ক্ষেত্র যেগুলির এখনও উন্নয়ন করা হয়নি সেগুলির প্রকৃত তথ্য ও মূল্যায়ন করা হবে। অনুসন্ধানের কাজে অধিকতর আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের জন্য পেট্রোবাংলার জনশক্তিকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

উৎপাদনে অংশিদারিত্ব চুক্তির অধীনে উপকূলবর্তী কয়েকটি এলাকায় অনুসন্ধানের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হবে। প্রধান প্রধান ভৌত কর্মসূচী নীচে বর্ণিত হল।

(ক) সম্পদের প্রাপ্যতা সাপেক্ষে বহুমুখী কূপ (১২টি গভীর পরীক্ষামূলক কূপ)

(খ) জরিপ

(১) ভূতাত্ত্বিক	দৈর্ঘ ১২৫০ কিলোমিটার, এলাকা ২০০০ বর্গ কিলোমিটার
(২) গ্রাভিটি	দৈর্ঘ ৬০০০ কিলোমিটার এলাকা ১৭,৫০০ বর্গ কিলোমিটারের সেমি ডিটেল্ড

(৩) ভূকম্পন (বহুমুখী)	দৈর্ঘ্য প্রোফাইল	১২৫০ কিলোমিটার আঞ্চলিক
	(প্রতিফলন)	৩৭৫০ কিলোমিটার ডিটেইল্ড
	এলাকা ডিটেইল্ড	৬০০০ বর্গ কিলোমিটার
	প্রোফাইলের দৈর্ঘ্য	৪৩৭৫ কিলোমিটার
	(প্রতিসরণ)	
(৪) লঘু ভূকম্পন প্রোফাইল		২০টি কূপ
	(ভিএসপি)	

১২·৪২ **গ্যাস কূপের উৎপাদন ও উন্নয়ন:** তিতাসভুক্ত এলাকায় গ্যাসের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে ঢাকা এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ যেমন ঘোড়াশাল, আশুগঞ্জ, জয়দেবপুর এবং টঙ্গিতে গ্যাস সরবরাহের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানকল্পে তিতাসে একটি এবং হবিগঞ্জে দু'টিসহ মোট আরও তিনটি উন্নয়ন কূপ খনন করা হবে। সিলেট ও ছাতকের কূপ দ্রুত নিঃশেষিত হচ্ছে ফলে সেখানকার কূপগুলিকে রিকনডিশনিং করা প্রয়োজন। কৈলাশটিলা গ্যাস ক্ষেত্র এই স্থানগুলির নিকটবর্তী হওয়ার এবং এই গ্যাস ক্ষেত্রের গ্যাস থেকে 'কনডেনসেট রিকভারীর' সম্ভাবনা অপেক্ষকৃত বেশী হওয়ায় একটি গ্যাস উৎপাদন কূপ নির্মাণের জন্য কৈলাশটিলাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রামের পথে বিভিন্ন এলাকায় প্রস্তাবিত চাহিদা পূরণের নিমিত্ত বাখরাবাদে পাঁচটি কূপ উন্নয়নের কাজ হাতে নেয়া হবে। পরিকল্পনাকালীন সময়ে এভাবে দশ থেকে বারোটি উন্নয়ন কূপ খনন করা হবে। দেশের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী একটি গ্যাস ব্যবস্থার সম্ভাব্যতা নিরূপণ এবং তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি), কমপ্রেস্‌ড প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) এবং গ্যাস (কনডেনসেটস) থেকে তরল হাইড্রোকার্বন প্রস্তুত হচ্ছে গ্যাস উৎপাদন ও উন্নয়নের সংগে সম্পর্কযুক্ত কতিপয় পর্যালোচনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

প্রধান প্রধান জৌত কর্মসূচী নিম্নে প্রদত্ত হল:

উন্নয়ন কূপ		কূপের সংখ্যা
(ক) তিতাস	..	৩ (৬, ৭ ও ৮ নং কূপ)
(খ) হবিগঞ্জ	..	২ (৩ ও ৪নং কূপ)
(গ) ছাতক	..	১ (পুনর্বাসন)
(ঘ) কৈলাশটিলা	..	১ (,,)
(ঙ) সিলেট	..	২ (,,)
(চ) বাখরাবাদ (১ম পর্যায়)	..	৫
(ছ) বিরানী বাজার	..	২
* সম্ভাব্যতা জরিপের উপর নির্ভরশীল	মোট	.. ১২(৪টি পুনর্বাসন কূপ বাদে)

১২·৪৩ **গ্যাস ট্রান্সমিশন এবং বিতরণ:** গ্যাস বর্তমানে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন, আবাসিক ও শিল্পে প্ররোগ এবং ইউরিয়া উৎপাদনের কাজ ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের জন্যও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ২৪ ইঞ্চি ১১০ মাইল দীর্ঘ বাখরাবাদ-চট্টগ্রাম গ্যাস পাইপ লাইনের কাজ সম্পন্ন হলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত ফার্নেস তেল ও ডিজেলের পরিবর্তে গ্যাস ব্যবহার সম্ভব হবে। উপরন্তু দুটি নয়া সার কারখানার জন্য ফিডস্টক-এর কাজও করবে।

১২·৪৪ তিতাস থেকে ঢাকা পর্যন্ত বর্তমানের সঞ্চালন লাইনের ক্ষমতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত হওয়ায় এডিবির অর্থানুকূল্যে নরসিংদী হয়ে তিতাস থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত একটি সমান্তরাল লাইনের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। কিন্তু বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে গ্যাসের ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিশেষ করে, পশ্চিম

অঞ্চলে বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর দরুন (পূর্ব-পশ্চিম বৈদ্যুতিক আন্তঃ সংযোগের মাধ্যমে সরবরাহকৃত) তিতাস ব্যবস্থায় গ্যাসের চাহিদা পূর্বাভাসের চেয়ে বেশী হবে। এছাড়াও অর্থনীতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলির গ্যাসের চাহিদা পূরণের জন্য ঢাকায় তিতাস গ্যাস সরবরাহের নিরাপত্তা ও নির্ভরশীলতা নিশ্চিত করার জরুরী প্রয়োজন রয়েছে। অন্যদিকে, বাখরাবাদ ব্যবস্থার বহুল পরিমাণ গ্যাস উদ্বৃত্ত হবে। তাই সঙ্গতভাবেই গ্যাস সরবরাহের নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতার নিশ্চয়তা বিধানপূর্বক তিতাস ব্যবস্থায় গ্যাস সরবরাহের অতিরিক্ত চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা এবং ডেমরা-ঢাকার বাখরাবাদ ও তিতাস ব্যবস্থার মধ্যে সংযোগস্থাপনকারী বাখরাবাদ-ডেমরা গ্যাস সরবরাহ প্রকল্পগুলি অগ্রাধিকার পাবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই সংযোগ স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া ১৯৮৫-৮৬ ও পরবর্তী বছরগুলিতে গ্যাসের পূর্বাভাসিত ঘাটতি পূরণের জন্য তিতাস ব্যবস্থার সংগে কৈলাশটিলা, বিয়ানীবাজার এবং রশিদপুরের আন্তঃ সংযোগ ও উন্নয়নের কাজ জরুরী ভিত্তিতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় হাতে নিতে হবে। কৈলাসটিলা ও বিয়ানীবাজারের গ্যাসে বেশ অনেক বেশী হারে কনডেনসেট (প্রতি মিলিয়ন ঘনফুটে যথাক্রমে ১০ বিবিএল ও ২০ বিবিএল)। এই গ্যাসক্ষেত্রগুলি থেকে গ্যাস উত্তোলন শুরু হলে তাতে প্রকল্পটি আরও লাভজনক হয়ে উঠবে এবং পি ও এল পণ্যাদির আমদানী হ্রাসে সহায়ক হবে। এজন্য এই প্রকল্পগুলি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে বাস্তবায়নের জন্য হাতে নেয়া হবে। সিলেটের চা বাগানগুলিতে গ্যাস সরবরাহ করার জন্য দুপর্যায়ে ৬০ মাইল দীর্ঘ পাইপ লাইন নির্মাণ করা হবে। এই লাইনের ব্যাস হবে ৬" থেকে ৪"। এছাড়া, বিকল্প সরবরাহ ব্যবস্থা হিসাবে ৬" ব্যাসের আরেকটি পাইপ লাইন নির্মাণ করা হবে। এই পাইপ লাইনটি কৈলাশটিলা ও ছাতকের সংগে সংযোগ সাধন করবে। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালি, ফেনী, চাঁদপুর, বৃহত্তর ঢাকা এলাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, ছাতক ও সুনামগঞ্জে বিতরণ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার কাজ হাতে নেওয়া হবে। প্রধান ভৌত পরিকল্পনাগুলি নিম্নরূপ:

ক। **সরবরাহ লাইন:**

(ক) বাখরাবাদ-চট্টগ্রাম (২৪" 'ওডি') ১১০ মাইল।

(খ) তিতাস থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত সমান্তরাল লাইন এবং/অথবা বাখরাবাদ থেকে ডেমরা পর্যন্ত একটি নতুন লাইন (১৪" বা ১৬") ৩০/৪০ মাইল।

(গ) সিলেট চা বাগান: হবিগঞ্জ-শমশেরনগর (৬") ৩০ মাইল।

(ঘ) কৈলাশটিলা থেকে সিলেট লাইন (৮")৮ মাইল।

(ঙ) ছাতক থেকে সুনামগঞ্জ (৪") লাইন ১২ মাইল।

(চ) কৈলাশটিলা থেকে ছাতক পর্যন্ত (৬") লাইন ২৬ মাইল।

(ছ) ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ জামালপুর।

(জ) বিয়ানীবাজার থেকে তিতাস ব্যবস্থা ৮০ মাইল (১৬" ব্যাস)।

খ। **বিতরণ লাইন:**

(ক) চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালি, ফেনী এলাকা	..	৬০০ মাইল
(খ) তিতাস ভুক্ত এলাকা (পর্যায়-১)	..	৩০০ মাইল
(গ) ময়মনসিংহ, জামালপুর এবং কিশোরগঞ্জ	..	২০০ মাইল
(ঘ) ছাতক ও সুনামগঞ্জ	..	২০ মাইল
(ঙ) সিলেট চা বাগান (পর্যায়-১)	..	১১৫ মাইল
(চ) সিলেট শহর গ্যাস সরবরাহ (পর্যায়-১)	..	৩৫ মাইল।

১২·৪৫ **পেট্রোলিয়াম প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিতরণ:** ইষ্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেড এর অতিরিক্ত ১৫,০০০ টন রিফর্ভারী ক্যাপাসিটি সম্প্রসারণের প্রস্তাব করা হয়েছে। এটা আমদানীকৃত কেরোসিনের উপর নির্ভরশীলতা আংশিক হ্রাসের সহায়ক হবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ইআরএল এর সামঞ্জস্যবিধান, আধুনিকীকরণ ও বদলীসহ ১,৪০,০০০ টনের লুব্রেকেটিং তেল বয়লারটিও স্থাপন করা হবে। ট্যাঙ্কারের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে। ভৌত কর্মসূচী নীচে দেওয়া হল:

অতিরিক্ত/নতুন ক্ষমতা সৃষ্টি

(১) তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস	..	১৫,০০০ টন/বছর
(২) লুব্রিকেটিং তেল	..	৪০,০০০ টন/বছর
(৩) ট্যাঙ্কার কোষ্টাল	..	৯,০০০ টন(৯ ট্যাঙ্কার)
শ্যালো	..	১,০০০ টন(১ ট্যাঙ্কার)
(৪) বেসরকারী খাতে প্রদত্ত ওয়েষ্ট অয়েল	..	৪,৫০০ টন/বছর (লুব্রিকেটিং তেলের)

১২·৪৬ **গবেষণা ও জরীপ:** বেশ কয়েকটি কারিগরী-অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা জরীপের কাজ হাতে নেয়া হবে যেমন (ক) যমুনা নদীর অপরপারে বাংলাদেশের পশ্চিম অংশে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ, (খ) কমপ্রেসড প্রাকৃতিক গ্যাস, (গ) প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে এলপিজি রিফর্ভারী এবং (ঘ) গ্যাস উন্নয়ন মাষ্টার পরিকল্পনার অধীনে দেশব্যাপী গ্যাস গ্রীড ব্যবস্থা। বাখরাবাদ থেকে তিতাস সিস্টেম পর্যন্ত ট্রান্সমিশন পাইপ লাইন সহযোগে বিয়ানীবাজার থেকে কামতা গ্যাস ক্ষেত্র পর্যন্ত প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহের সম্ভাব্যতা জরিপের কাজও হাতে নেওয়া হবে।

আর্থিক ব্যয় বরাদ্দ

১২·৪৭ প্রাকৃতিক সম্পদ খাত কর্মসূচী বাস্তবায়নকল্পে ১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যমানে ৬১৪·৫১ কোটি টাকা (বর্তমান মূল্যে ৮৯১·০০ কোটি টাকা) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বরাদ্দ করা হয়েছে। ১৯৭৯/৮০ সালের স্থীর ও চলতি উভয় মূল্যের ভিত্তিতে সংস্থাভিত্তিক বরাদ্দ নিম্নরূপ:

সারণী ১২·১২

সংস্থাওয়ারী বরাদ্দ

[কোটি টাকা হিসাবে]

সংস্থা	দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মোট বরাদ্দ	
	১৯৭৯/৮০ মূল্যমানে	বর্তমান মূল্যমানে
১। পেট্রোবাংলা	৫৮৩·৬০	৮৪৬·১৭
২। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম সংস্থা	১১·১৫	৯৬·১৭
৩। বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ	১৬·৭৫	২৪·৩০
৪। জ্বালানী মন্ত্রণালয় (পেট্রোলিয়াম ও খনিজ সম্পদ বিভাগ)	৩·০১	৪·৩৬
মোট ..	৬১৪·৫১	৮৯১·০০

খ। নবায়নযোগ্য ও পল্লী জ্বালানী

১২'৪৮ গোবর, তুষ, কুরা, গাছের পাতা, ছাল, জ্বালানী কাঠ ইত্যাদি ও সেই সঙ্গে সূর্য কিরণ ও বাতাসের মত প্রচলিত জ্বালানীর ওপর বহুল নির্ভরশীলতা বাংলাদেশের জ্বালানী ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশ এনার্জি ষ্টাডির সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশে ব্যবহৃত মোট শক্তির দুই তৃতীয়াংশ পাওয়া যায় প্রচলিত উৎসগুলি থেকে। এ থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রচলিত শক্তি উৎসগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কতখানি ব্যাপক তা উপলব্ধি করা যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনিত কারণে প্রচলিত শক্তির উৎসগুলির ওপর প্রবল চাপ পড়া সত্বেও পল্লী উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব প্রদানের ফলশ্রুতিতে প্রচলিত শক্তির উৎস গুলির গুরুত্ববৃদ্ধি পাবে। এই পরিকল্পনায় তাই, বনজঙ্গল ও অন্যান্য গাছপালা, জৈব গ্যাস, সৌর শক্তি ও গবাদি পশু শক্তি প্রভৃতি নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসগুলির উন্নয়নের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। পল্লী গ্রামে শক্তির চাহিদা এত বিপুল যে, পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমকেও বড় জোর পল্লী এলাকায় শক্তির উৎসগুলির উন্নয়নে সম্পূরক ব্যবস্থা হিসাবে গণ্য করা যাবে।

১২'৪৯ পল্লী জ্বালানীর ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা বিরাজ করছে। প্রথমতঃ উৎসগুলির বিভিন্নমুখীতা, প্রচলিত সনাতন প্রযুক্তি, গ্রামঞ্চলে বসতির ধরণ এবং পল্লী খাতে জ্বালানী তৎপরতার স্বল্পতা নবায়নযোগ্য জ্বালানী সরবরাহকে জটিলতর করেছে। দ্বিতীয়তঃ ব্যাপক ভাবে চাষ বাড়া সত্বেও উচ্চ ফলনশীল অথচ ছোট কান্ড বিশিষ্ট ধানের চাষ বাড়ার দরুন খড় প্রাপ্তির পরিমাণ সম্ভবতঃ বেশ কমে গেছে। তৃতীয়তঃ চাষাবাদের জন্য জমির ওপর চাপ বৃদ্ধির ফলে অন্যান্য কাজে প্রান্তিক জমির ব্যবহার কমেছে। এ কারনে জ্বালানী কাঠ একটি প্রতিযোগিতামূলক পণ্যে পরিণত হয়ে পড়বে এবং সে জন্য দ্রুত বর্ধনশীল জাতের গাছের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। সর্বোপরি, বিভিন্ন বিভাগ ও সংস্থার মধ্যে প্রায়শঃই সমন্বয়ের অভাব ও একে অপরের কাজ হস্তক্ষেপ ইত্যাদি কারণে জ্বালানী সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে। পরিকল্পনা কমিশন তাই নতুন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানীর উৎস সম্পর্কিত বিভিন্ন তৎপরতার মধ্যে এখন থেকে সমন্বয় সাধন করছে।

১২'৫০ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে, সরকারী গবেষণাগার ও প্রতিষ্টানসমূহে বর্তমানে বিভিন্ন গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলছে। বর্তমান প্রকল্পসমূহে প্রধানতঃ জৈবগ্যাস ও সৌর-তাপ প্রয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। জৈব গ্যাস গবেষণা ও প্রয়োগের ব্যাপারে জড়িত প্রতিষ্টানগুলি হচ্ছেঃ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও পরিবেশ দুষণ নিয়ন্ত্রন বোর্ড। সৌরশক্তি নিয়ে গবেষণা চলছে বাংলাদেশ বিজ্ঞান শিল্প গবেষণা পরিষদ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউটে। এ ছাড়া প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় উইন্ড মিলের উপর গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ হাতে নিয়েছে। বন পরিদপ্তর গ্রামাঞ্চলে নতুন ধরনের দ্রুত বর্ধনশীল জাতের বৃক্ষ রোপন বৃদ্ধির কাজে নিযুক্ত রয়েছে।

১২'৫১ নবায়নযোগ্য জ্বালানী উৎস সমূহ উন্নয়নের উদ্দেশ্যগুলি হচ্ছে নিম্নরূপ:

(ক) বায়ো-মাস, বায়োগ্যাস, সৌরশক্তি, বায়ু ইত্যাদি দেশীয় জ্বালানী সম্পদ ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতঃ কৃষি ও জ্বালানীর মধ্যে একটি ভারসাম্য অবস্থা অর্জন করা।

(খ) পল্লী এলাকায় জ্বালানীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটানোর উদ্দেশ্যে নতুন ও নবায়নযোগ্য উৎস সমূহের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি ও ব্যবহারের দক্ষতার উন্নতি বিধান করা।

(গ) বন সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখা।

(ঘ) নতুন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী উন্নয়নের উৎস সমূহের ক্ষেত্রে কারিগরী ক্ষমতা বৃদ্ধি।

১২·৫২ পল্লী জ্বালানীর বিষয়টি যে একটি জটিল ক্ষেত্র সে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উন্নতি বিধানের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা অপরিহার্য। পদক্ষেপগুলো হচ্ছে :

(১) নীতিমালা প্রণয়ন ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের তৎপরতার সমন্বয় সাধনে সহায়তার জন্য একটি যথাযথ প্রতিষ্ঠানিক বিন্যাস নিশ্চিত করা হবে।

(২) মৌলিক ও অভিযোজনমূলক গবেষণা এবং সেইসঙ্গে উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ সার্ভিসের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল সংগ্রহ করা হবে।

(৩) পল্লী জ্বালানী শিল্পে বিনিয়োগে বেসরকারী খাতকে উৎসাহিত করা হবে।

(৪) নতুন ও নবায়ন যোগ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সংগঠিত করা হবে।

(৫) পল্লী শক্তি পরিস্থিতি ও উৎসাদি সম্পর্কে জরীপ চালান হবে।

১২·৫৩ এই খাতের ভৌত কর্মসূচীটি মাত্র একটি সমন্বিত প্রকল্প নিয়ে গঠিত। পরিকল্পনা কমিশনের নবায়নযোগ্য জ্বালানী ও গবেষণা শাখা এটি বাস্তবায়িত করবে। এই প্রকল্পে নতুন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী উৎসের বিভিন্নদিক সম্পর্ক বহু উপাদান থাকবে। জ্বালানীর দৃষ্টি কোন থেকে গো-সম্পদ জরিপ হবে এ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান একটি উপাদান। মার্কিন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা আংশিকভাবে অর্থ জোগাবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাংক নতুন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী উৎসের কিছু কিছু ক্ষেত্রে উৎসাহ জোগাইতে পারে।

১২·৫৪ ১৯৭৯/৮০ সনের মূল্যমান অনুযায়ী এই প্রকল্পের জন্য ব্যয় হবে ১·৪৯ কোটি টাকা এবং ১৯৮৪/৮৫ সন নাগাদ এর কাজ সম্পন্ন হবে। স্থির ও চলতী উভয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রকল্পের পর্যায়কৃত ব্যয় দেখানো হল :

[কোটি টাকায়]

	১৯৮৩/৮৪ সনের জন্য বরাদ্দ	১৯৮৪/৮৫ সনের জন্য বরাদ্দ	দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য সর্বমোট
(ক) ১৯৭৯/৮০ মূল্যে	০·৬৪	০·৮৫	১·৪৯
(খ) চলতি মূল্যে	১·০০	১·৫৯	২·৫৯

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পরিবহণ ও যোগাযোগ

ক। পরিবহণ

বাংলাদেশের পরিবহন সর্বাপেক্ষা অনুন্নত অবকাঠামো। এখানে প্রতি ১০০ বর্গ মাইলের মাত্র ৮ মাইল পাকা রাস্তা ও ৩ মাইল রেলপথ আছে। এদেশের পূর্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্তের সর্বাধিক দূরত্ব মাত্র ৩৮৯ মাইল হওয়া সত্ত্বেও সড়ক পথে বন্দর নগরী খুলনা থেকে বন্দর নগরী চট্টগ্রামে পৌঁছাতে গড় সময় লাগে ২৩ ঘন্টা। দেশের ভূ-প্রকৃতি পরিবহন উন্নয়নে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। দেশের উপর দিয়ে অসংখ্য আঁকা-বাঁকা নদনদী প্রবাহিত, প্রতি বছর দেশের এক তৃতীয়াংশ অঞ্চল বন্যার পানিতে তলিয়ে যায় এবং বছরে চার মাসের অধিককাল প্রচন্ড বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। এ সবের দরুন সড়ক ও রেলপথ নির্মাণ দুঃসাধ্য ও ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে। কারণ, সড়ক ও রেলপথ নির্মাণের জন্য বেশ অনেকটা উঁচু করে কোথাও ঘন ঘন সেতুসহ ১৫ ফুট পর্যন্ত উঁচু বাঁধ নির্মাণ করতে হয়। নৌ পথই পরিবহণের অধিকাংশ সুযোগ সুবিধা প্রদান করে। তবে দেশের ভূগঠন ব-দ্বীপ সাদৃশ্য হওয়ায় নদী খাতগুলিতে প্রবল পলি পড়ে। সেজন্য অনবরত ও ব্যয় বহুল ড্রেজিং-এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

১৩·২ দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ব্যাপক ভাবে দেশের যানবাহনের ধরন ও প্রকার নিয়ন্ত্রণ করে। মধ্য ও দক্ষিনাঞ্চলে জল পথই প্রধানতঃ পরিবহনের কাজ সম্পন্ন করে, পক্ষান্তরে উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সড়ক পরিবহন ও রেলপথই বিশেষ উপযোগী দেশের প্রাকৃতিক নিষ্কাশন উত্তর থেকে দক্ষিণে হওয়ায়, উত্তর-দক্ষিণের তুলনায় পূর্ব-পশ্চিমে গমনকারী সড়ক ও রেলপথের নির্মাণকার্য অধিক ব্যয়-বহুল কারণ এ সব ক্ষেত্রে অনেক বেশী পারাপারের প্রয়োজন হয়। এ সব ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও আরও অনেক বিষয় আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থাকে ব্যয়বহুল করে তুলেছে। দেশের অর্থনৈতিক প্রকৃতি জীবন ধারণ পর্যায়ে থাকায় সুসংগঠিত খাতে পণ্য পরিবহনের প্রধান চাহিদা আমদানী ও রপ্তানী পণ্যের চলাচল থেকে উদ্ভব হয়েছে। রপ্তানী পণ্যের চেয়ে আমদানী পণ্যের পরিমাণ তিন গুনেরও বেশী। ফলে, দেশের দক্ষিণের বন্দরগুলি থেকে মালবোঝাই ট্রাকগুলি ফিরতি যাত্রায় বলতে গেলে একেবারে খালিই ফেরে। এ ছাড়া, বাণিজ্যিক জ্বালানীর বর্ধিত মূল্য আধুনিক পরিবহনকে বেশ ব্যয়বহুল করে তুলেছে।

অতীত উন্নয়ন প্রচেষ্টার পর্যালোচনা

১৩·৩ প্রধানতঃ উপনিবেশিক পটভূমিকায় বাংলাদেশের প্রথম দিকের পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে উঠে। পাট ও চায়ের মত কিছু প্রাথমিক পণ্য রপ্তানী এবং কলকাতার শিল্প এলাকায় পণ্য সরবরাহের জন্য রেলওয়ে ও বন্দরগুলো নির্মাণ করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় রেলপথ ও সড়ক গুলোকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সেগুলো প্রধানতঃ কোলকাতা সমুদ্র বন্দর অভিমুখী ছিল। ১৯৪৭—৭০ সময়াধীনে পরিবহন ব্যবস্থায় পুনঃবিন্যাসের প্রয়োজন দেখা দেয়। এর ফলশ্রুতিতে সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে। পাকা সড়কের পরিমাণ প্রায় ৩০০ মাইল থেকে প্রায় ২০০০ মাইলে বৃদ্ধি পায়। আভ্যন্তরীণ নদী বন্দর নির্মাণ করা হয় প্রধানতঃ পাট রপ্তানী করার জন্য।

চালনায় একটি নোঙ্গরগা স্থাপন করা হয়। দেশে আভ্যন্তরীণ বিমান পরিবহন সার্ভিস চালু করা হয়। পরিবহনের চাহিদার মোকাবেলা করার জন্য সড়ক পরিবহন সংস্থা ও আভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ কর্তৃপক্ষের মত নতুন নতুন সংগঠন স্থাপন করা হয়।

১৩·৪ কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধকালে পরিবহন ব্যবস্থার বিপুল ক্ষয় ক্ষতি হয়। রেলওয়ে সরঞ্জাম, সড়ক পরিবহন, নৌ পরিবহন সরঞ্জাম, রেল ও সড়ক সেতুর (২৯৯টি রেলসেতু এবং ২৭৪টি সড়ক সেতুর) ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটে। নিমজ্জিত জলযান ও ভগ্নাবশেষ সমুদ্রবন্দর ও আভ্যন্তরীণ জলপথ সমূহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এ জন্যে স্বাধীনতার পর পরিবহন ব্যবস্থার পুনর্বাসন, মেরামত পুনঃস্থাপন ও পুনঃনির্মাণের জন্য বিপুল পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ ছাড়াও বিমান পরিবহন, সামুদ্রিক জাহাজ চলাচল ও আভ্যন্তরীণ পরিবহনের জন্য নতুন জাতীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দেয়।

১৯৭৩—৮০ সালে উন্নয়ন

১৩·৫ প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩—৭৮) পরিবহণ খাতে বিনিয়োগ প্রাধান্য লাভ করে। উন্নয়ন খাতে পরিকল্পিত ব্যয়ের ১৬ শতাংশ (৬৯৯ কোটি টাকা) পরিবহন খাতে বরাদ্দ করা হয়। তবে সম্পদে ঘাটতি ও মুদ্রাস্ফীতির কারণে উপকরণাদির মূল্য বৃদ্ধির কারণে পরিকল্পিত লক্ষ্য মাত্রার তুলনায় প্রকৃত সাফল্য তুলনামূলক ভাবে অনেক কম অর্জিত হয়। আর্থিক ব্যয় পরিকল্পিত লক্ষ্য মাত্রার মাত্র ৬৩ শতাংশে দাঁড়ায়। পরিকল্পনার আওতায় পরিবহন খাতের কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য ছিল পরিবহন, পরিকল্পনা ব্যবস্থার পুনর্বাসন যার ফলে প্রাগ-স্বাধীনতা কালের পরিচালনা দক্ষতা পুনরুদ্ধার এবং পরিকল্পনা মেয়াদে বর্ধিত পরিবহন চলাচল মোকাবেলার জন্য ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়। পরিকল্পনা কালের প্রধান প্রকৃত সাফল্যগুলির মধ্যে রয়েছে সকল রেলসেতু ও প্রায় সব বড় সড়ক সেতু পুনঃনির্মাণ, আটটি নতুন বড় সড়ক সেতু নির্মাণ, প্রায় ৫০০ মাইল নতুন সড়ক পাকা করা, কুমিটোলা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও সৈয়দপুর বিমানবন্দর নির্মাণ, চালনা সমুদ্র বন্দরে পাঁচটি স্থায়ী জেটি ও পণ্যাগার নির্মাণ, চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে ছয়টি পুরাতন জেটির পুনঃ নির্মাণ, বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য রোলইঞ্জিন, বগী এবং ওয়াগন সংগ্রহ, শহরাঞ্চলে পরিবহন সার্ভিসের উন্নতির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থার জন্য পাঁচ শতাধিক বাস সংগ্রহ, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের জন্য ১৮টি সমুদ্রগামী জাহাজ সংগ্রহ, আন্তর্জাতিক গমন পথের সম্প্রসারণের জন্য বাংলাদেশ বিমানের তিনটি পুরোনো বোয়িং বিমান সংগ্রহ, আভ্যন্তরীণ জলপথে ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন সংস্থার ১০০টি নতুন নৌযান ক্রয় এবং বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষের পাঁচটি নতুন ড্রেজার ক্রয়।

১৩·৬ এসবই বিপুল পরিবহন চাহিদারই প্রতিফলন। ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৭৯ সালের মধ্যে যাত্রী চলাচল ৩৯ শতাংশ এবং পরিমাণের দিক থেকে পণ্য চলাচল ২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। রেলওয়েতে যাত্রী মাইল ১·৭ মিলিয়ন থেকে ৩·২ মিলিয়নে বেড়েছে। পরিবহনের উল্লিখিত বৃদ্ধির ধরণে দেখা যায়, বিভিন্ন প্রকার পরিবহনে যাত্রী ও পণ্য চলাচলে পরিবর্তন হয়েছে। জলপথ থেকে রেল ও সড়ক পথে পণ্য পরিবহনে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। অন্যদিকে, যাত্রী পরিবহনে জলপথের অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৩ সালে রেল ও সড়ক একত্রে প্রায় ৩৬ শতাংশ পণ্য পরিবহন করেছে, ১৯৭৯ সালে এটা বেড়ে প্রায় ৪৯ শতাংশে দাঁড়ায় তবে যাত্রী চলাচলে রেল ও সড়কের অংশ ১৯৭৩ সালের প্রায় ৮০ শতাংশ থেকে ১৯৭৯ সালে প্রায় ৭৫ শতাংশে হ্রাস

পায়। পণ্য ও যাত্রী চলাচলসহ ১৯৭৩ ও ১৯৭৯ সালে বিভিন্ন প্রকার পরিবহনে তুলনামূলক একটি চিত্র নীচের সারণী ১৩·১ এ দেখানো হলো :

সারণী ১৩·১

বিভিন্ন প্রকার যানে যাত্রী ও প্রধান প্রধান পণ্য চলাচলের বণ্টন বিন্যাস
(কেবলমাত্র যান্ত্রিক যান)

[লক্ষ টাকায়]

পরিবহনের প্রকার	১৯৭৩				১৯৭৯			
	পণ্য চলাচল		যাত্রী চলাচল		পণ্য চলাচল		যাত্রী চলাচল	
	টনে	%	সংখ্যা	%	টনে	%	সংখ্যা	%
রেল	১৩·০২	১৯·৬৩	৬৩৬·৫৫	২৪·৬৪	৩১·৮৪	২৮·০০	৮৯৭·৫৫	২৫·০১
সড়ক	১০·৭৫	১৬·২১	১৪৩০·০০	৫৫·৩৫	১৩·৭৬	২০·৪৯	১৭৮৮·০০	৪৯·৮৩
জলপথ	৪২·৫৩	৬৪·১২	৫১৩·০০	১৯·৮৬	৩৪·৫২	৫১·৫২	৮৯৭·৪০	২৫·০০
বিমান	০·০৩	০·০৪	৩·৮৪	০·১৫	০·০৬	০·০৯	৫·৬৭	০·১৬
মোট :	৬৬·৩৩	১০০·০০	২৫৮৩·৩৯	১০০·০০	৮০·১৮	১০০·০০	৩৫৮৮·৬২	১০০·০০

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রেক্ষিত

১৩·৭ পরিবহনের ওপর অর্থনীতির উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার চাহিদাটিকে এই পরিকল্পনায় শুধুমাত্র পরোক্ষ ধারণাতেই উন্নয়নে পরিবহনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটিকে স্বকৃতি দেয়া হয়নি বরং প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনাময় উৎপাদনশীল ও অর্থনৈতিক শক্তিগুলিকে ফলপ্রসূ করে তোলার মাধ্যমে অর্থ-নৈতিক উন্নয়নে পরিবহনের সক্রিয় ভূমিকায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পরিবহন খাতের পরি-কল্পনা প্রণয়নে এই উভয় ভূমিকার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কৃষি, শিল্প, বিতরণ, বাণিজ্য ও যাত্রী চলাচলের মত উৎপাদনশীল খাতগুলির উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই কার্যক্রমে পরিবহনের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধে উন্নয়নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই কার্যক্রমে অবশ্য পরিবহন খাতের সক্রিয় ভূমিকার ওপর সবচেয়ে বেশী জোর দেয়া হয়েছে। দ্রুত পল্লী উন্নয়নের স্বার্থে আর্থ-সামাজিক তৎপরতাসমূহের বিকেন্দ্রীকরণ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য। এই নতুন উন্নয়ন কৌশলে পরিবহন খাত অর্থনৈতিক কার্যকলাপের পরিকল্পিত বিকেন্দ্রীকরণ এবং দেশের বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত উন্নয়ন কেন্দ্রগুলিকে অর্থনৈতিক তৎপরতার প্রধান স্রোতের সহিত সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে পল্লী এলাকাগুলির উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অপরিসীম অবদান যোগাবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ

১৩·৮ পরিবহন উন্নয়নের মৌলভূমিকার কথা খেয়াল রেখে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবহন খাতের কার্যক্রমগুলির প্রধান লক্ষ্যগুলি নিম্নরূপ :

(ক) অর্থনীতির সকল খাতের উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রতি সমর্থন হিসাবে অর্থনীতির অঙ্গনে উৎপাদনশীল তৎপরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিবহনের সুযোগ সুবিধাদির ব্যবস্থা করা;

(খ) খানা, হাট ও বাজারসহ দেশের উন্নয়ন কেন্দ্রগুলিকে সংযোগসাধনকারী একটি অনুপূরক সড়ক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে পল্লী পরিবহন ব্যবস্থার একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এবং পল্লীর পরিবহন মাধ্যমগুলির ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি প্রবর্তন;

(গ) ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, যানবাহন চলাচল প্রকৌশল ও পরিবহন উন্নয়ন পরিকল্পনার নিবিড় সমন্বয়ের মাধ্যমে বড় বড় নগরগুলিতে পরিবহন সমস্যাবলীর সমাধানের প্রয়াস।

(ঘ) সম্পদ ও সরঞ্জামের রক্ষণাবেক্ষণ ও দক্ষ ব্যবস্থার এবং সেগুলি বাণিজ্যিক লাভালাভের মূল নীতি অনুসারে পরিচালনার মাধ্যমে সরকারী খাতের যানবাহনগুলির পরিচালনার দক্ষতার উৎকর্ষ সাধন; এবং

(ঙ) জ্বালানী ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে গবেষণা ও সমীক্ষা।

আর্থিক বরাদ্দ

১৩·৯ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আওতায় পরিবহন খাতের উন্নয়নের জন্য ১৯৭৯/৮০ মূল্যমানে ১,২৮৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়াও বেসরকারী খাতে ৯৭৬ কোটি টাকা (১৯৭৯/৮০ মূল্য মানে) কাজে লাগানো হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। সারণী ১৩-২ক এ দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী খাতে উপ-খাতসমূহে বরাদ্দ দেখানো হয়েছে:

সারণী ১৩·২-ক

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবহনখাতের উপ-খাতওয়ারী বরাদ্দ

[কোটি টাকায়]

উপ-খাত	দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ	
	১৯৭৯/৮০ মূল্যে	চলতি মূল্যে
১। **রেল পরিবহণ:**	৪১৩·৩৯	৫৫২·৯৭
(১) বাংলাদেশ রেলওয়ে	৪১৩·৩৯	৫৫২·৯৭
২। **সড়ক পরিবহণ:**	৪০৯·০২	৫৯৩·৪৩
(২) সড়ক ও মহা সড়ক	৩৮০·০০	৫৫৬·৮৬
(৩) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা	২৭·৭৭	৩৪·৭২
(৪) গ্রামীণ/শহর পরিবহন জরীপ	১·২৫	১·২৫
৩। **নৌ পরিবহণ:**	৩১৬·৮৭	৪৫৯·৫৬
(৫) আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন কর্তৃপক্ষ	৬৪·৯৪	৮৯·৮৪
(৬) আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন সংস্থা	৫১·৭৯	৭০·৭০
(৭) চট্টগ্রাম বন্দর	৬৩·৫৬	৯২·১৮
(৮) চালনা বন্দর	৫৪·৫৬	৭৯·২৬
(৯) বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন	৭০·৮০	১১১·৪১
(১০) মেরিন একডেমী	১০·৪০	১৫·১১
(১১) বাণিজ্যিক নৌ বিভাগ	০·০৬	০·০৮
(১২) জাহাজ চলাচল বিভাগ	০·৩২	০·৪৭
(১৩) বন্দর, জাহাজ চলাচল ও আভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ বিভাগ	০·৩৫	০·৫১
৪। **বিমান পরিবহন:**	১৪৭·১৮	২১৩·৪৫
(১৪) বেসামরিক বিমান চলাচল	১০২·৬২	১৪৮·৮৩
(১৫) বাংলাদেশ বিমান	৩৯·৩৫	৫৭·০৭
(১৬) বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিভাগ	৫·১৩	৭·৪৫
(১৭) বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন বিভাগ	০·০৮	০·১০
মোট (সরকারী খাত):	১২৮৭·০০	১৮১৯·৪১

সারণী ১৩·২-খ

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৮০—৮৫) বরাদ্দের বাৎসরিক গঠন
(কেবল সরকারী খাত)

(কোটি টাকায়)

মূল্যমানের স্তর	১৯৮০/৮২	১৯৮২/৮৩	১৯৮৩/৮৪	১৯৮৪/৮৫	মোট (১৯৮০—৮৫)
(ক) স্থির মূল্যে (১৯৭৯/৮০)	৬৬৬·৯২	২৬৮·২০	১৬৪·৩৭	১৮৭·৫১	১২৮৭·০০
(খ) চলতি মূল্যে	৮৫১·২০	৩৯১·২২	২৬৭·৫১	৩০৯·৪৮	১৮১৯·৪১

বাংলাদেশ রেলওয়ে

সমস্যাবলী

১৩·১০ বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য কোন উন্নয়ন কার্যক্রম প্রণয়ন খুব কঠিন কাজ বলে প্রমাণিত হয়েছে। একটা ব্যবস্থা হিসেবে রেলওয়ের তার নিজস্ব চাহিদা ভিত্তিক প্রয়োজন আছে। রেলওয়ে ব্যবস্থাকে বজায় রাখার খাতিরে ঐ প্রয়োজন অবশ্যই মেটাতে হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ের পুঞ্জিভূত সমস্যাবলী সাড়ে তিন দশক অবধি চলে আসছে যার মূলে রয়েছে ইতিহাসের নানা পট পরিবর্তন এবং সেই সঙ্গে রেল ব্যবস্থাপনার ঔদাসীন্য ও অবহেলা। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালে রেল পথ, সেতু সাজ-সরঞ্জাম (রোলিং ষ্টক) ইত্যাদি সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি গোটা ব্যবস্থাটিকে প্রায় পঙ্গু করে ফেলে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বাংলাদেশ এ ধরণের সমস্যাবলীরই মোকাবেলা করেছে। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রথমে পুনর্নির্মাণ কার্যক্রমের ও পরে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে রেলওয়ের উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করা সত্ত্বেও সমস্যার বিশালত্বের তুলনায় সম্পদ সীমাবদ্ধতা এবং আংশিকভাবে বিনিয়োগ অগ্রাধিকারের ভুল নিরূপনের জন্য রেলওয়ের পুনর্বাসন এখনও পুরোপুরিভাবে পূর্ণ হয়নি। বিনিয়োগ কার্যক্রমে সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হয়নি, পক্ষান্তরে উপকরণগত সম্পদ সংগ্রহের বিষয়টি আনুপাতিক অগ্রাধিকারেরও বেশী বিবেচনা লাভ করেছে। এসব কারণে রেলওয়ে পরিচালনা দক্ষতার অবনতি ঘটেছে যা নীচের সারণীতে দেখানো হয়েছে :

সারণী ১৩·৩

১৯৬৯/৭০ ও ১৯৭৮/৭৯ সালে বাংলাদেশ রেলওয়ের পরিচালনা দক্ষতা

		১৯৬৯/৭০	১৯৭৮/৭৯
ক পণ্যবাহী-ওয়াগন :			
(১) ওয়াগনের চলার সময় (দিন)	বিজি	১২·৫	১৫·০
	এমজি	১৪·৫	২১·৬
(২) লাইনের উপর ব্যবহারের জন্য লভ্য মোট ওয়াগনের শতকরা হার	বিজি	৯৩·৫	৮৫·৪
	এমজি	৯১·৯	৮৫·৮
(৩) লাইনে প্রতি ওয়াগণ দিবস ভিত্তিতে নীট টন মাইল	বিজি	১৪০·০	১২৫·০
	এমজি	১১৬·০	৮৭·০
(৪) ডিজেল মালবাহী ট্রেনের গড় গতি (ঘন্টা প্রতিমাইল)	বিজি	১১·৩	৯·৫
	এমজি	৮·৩	৭·২

খ যাত্রী বগী (ক্যারেজ) :			
(১) লাইনের উপর চলাচলের জন্য লভ্য মোট কোচের শতকরা হার	বিজি	৮৭·৪	৮৬·০
	এমজি	৮৬·৬	৮৪·২
(২) লাইনের উপর গাড়ি দিন প্রতি যাত্রী-মাইল	বিজি	১৭৩·০	১২০·০
	এমজি	১৫১·০	৯৬·০
গ ডিজেল ইঞ্জিন :			
(১) লাইনে সার্ভিসের জন্য লভ্য-মোট ইঞ্জিনের শতকরা হার	বিজি	৯১·৯	৮৫·৯
	এমজি	৮৪·৬	৭৪·০
(২) দৈনিক ইঞ্জিন-দিন প্রতি ইঞ্জিন-মাইল	বিজি	২৩৫·০	১৮১·০
	এ জি	১৩৩·০	১১৫·০
(৩) প্রতি ইঞ্জিন-দিবসে ব্যবহৃত ইঞ্জিন মাইল (কেবল চলাচল)	বিজি	১৯১·০	১৫২·০
	এমজি	১২৬·০	১০৭·০

সূত্র : রেলওয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রকল্প (এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থসংস্থান)

১৩·১১ ওয়াগনের নিম্নমানের রক্ষণাবেক্ষণ, ভ্যাকুয়াম ব্রেক না থাকা এবং পর্যাপ্ত টেলী-যোগাযোগ সুবিধাদির অভাব ইত্যাদির কারণে ওয়াগণের চলাচল পারস্থিতির অবনতি ঘটেছে। সৈয়দপুর ও পাহাড়তলি রেলওয়ে ওয়ার্কশপের উৎপাদনের মাত্রা কম হওয়ার কারণে ওয়াগন ও কোচের সরবাহও অত্যন্ত কম। শৃঙ্খলার অভাব, কোয়ম্যানদের অনভিজ্ঞতা, অনভিজ্ঞ ব্যবস্থাপনা, অপচয় এবং প্রধান প্রধান দ্রব্যসামগ্রীর অপচয় ও ঘাটতি ইত্যাদি কারণেই প্রধা তঃ রেলওয়ে ওয়ার্কশপগুলিতে উৎপাদনের মাত্রা কম। এগুলির বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ ও যথার্থ বিনিয়োগ অগ্রাধিকার জোরদার করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ ও কৌশল

১৩·১২ সমাস্যার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ ওপরে দেয়া হয়েছে তা থেকে বুঝা যায় যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রেলওয়ে উন্নয়ন কার্যক্রমের লক্ষ্য হবে (১) বর্তমান সম্পদগুলির পুনর্বাসন ও (২) সম্পদগুলির মূল চাহিদাগুলি মেটানো যাতে বাংলাদেশ রেলওয়ে পরিকল্পনাকালে মোট পণ্য ও যাত্রী চলাচলের দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে লাভজনকভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়। বলা বাহুল্য যে, সম্পদের বিনিয়োগ থেকে যাতে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সুবিধে আদায় করে নেয়া যায় সেজন্য সর্বাধিক যত্ন নিতে হবে। উল্লেখিত লক্ষ্যসমূহের বাস্তবায়ন ও বিনিয়োগের সঠিক কৌশলে উপনীত হবার জন্য বিনিয়োগের বিভিন্ন বিকল্পের মূল্যায়ন প্রয়োজন। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের এক সাম্প্রতিক জরীপে দেখা যায়, রেলওয়ের সাজসরাঞ্জাম সংগ্রহমূলক প্রকল্পগুলির চেয়ে রেললাইন ও পরিচালন প্রকল্পগুলি থেকেই তুলনামূলকভাবে লাভজনক হারে আয় হতে পারে। রেলওয়ের পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধির দক্ষতার জন্য বিনিয়োগ থেকেই সবচেয়ে বেশী সুফল পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে রেল লাইনের পুনর্বাসনের স্থান দ্বিতীয়। রেলওয়ের সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ক্রয় থেকে আয় হয় সবচেয়ে কম। আবার মালবহনের জন্য ওয়াগন ইত্যাদি সরঞ্জাম সংগ্রহে যে আয় হয় যাত্রী চলাচলের জন্য কোচ, বগী প্রভৃতি সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহের ফলে অর্জিত আয় তা থেকে অনেক কম। আয় গুলির বৈশিষ্ট্য থেকেই ভবিষ্যতে বিনিয়োগ কৌশল কী হবে তা নির্দেশনা পাওয়া যায়। রেলওয়ে চাহিদাগুলির নানা বাধ্যবাধকতার কারণে গৃহীত সবগুলি বিনিয়োগ প্রকল্পকেই সর্বাধিক আয় ভিত্তিক করা সম্ভব হবে না, তবু

নির্দেশিত লক্ষ্যসমূহের অনুধাবনের জন্য এমন একগুচ্ছ প্রকল্প বাছাই করা দরকার যেগুলি থেকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ লাভ পাওয়া যাবে। ১৩·৩ সারণীতে পরিচালন দক্ষতার প্রদত্ত সূচক-গুলি থেকে দেখা যায়, রেলওয়ের বর্তমানে যে সাজ-সাজ্ঞাম রয়েছে সেগুলি অনেকখানি কম ব্যবহার হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষতা সম্প্রসারণের চেয়ে বর্তমানে যে সাজ-সাজ্ঞাম মজুত আছে তার আরও সুষ্ঠু সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে পরিচালন দক্ষতা বাড়ানোর প্রয়োজনীতা প্রতিয়-মান হয়ে উঠে। উল্লেখিত বিনিয়োগ কৌশল গ্রহণে স্বাবী তার মাত্রার ওপর গুরুত্ব সাম্যবস্থতার আরোপ করেছে রেলওয়ের চালু প্রকল্পগুলি; কারণ, মাঝপথে এসে প্রকল্পগুলি বন্ধ করে দেয়া সম্ভব নয়। ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ কার্যক্রমে এই প্রকল্পগুলির অধিকাংশই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

রেলওয়ে পণ্য চলাচলের পূর্বাভাস

১৩·১৩ বিভিন্ন ধরণের যানবাহনে পরিবহনের তুলনামূলক লাভালাভ বিশ্লেষণ করে সাম্প্রতিক বহুো পণ্য চলাচলের পূর্বাভাসের উপর কয়েকটি সমীক্ষা চালানো হয়েছে। নিম্নের সারণীতে ১৯৮৪/৮৫ সালে বিভিন্ন দূরত্বের হিসেবে টন মাইল প্রতি পণ্যের ভাড়া বাবদ ব্যয় দেখানো হয়েছে :

সারণী ১৩·৪

১৯৮৪-৮৫ সালে টন মাইল (পূর্ণ লোড) প্রতি তুলনামূলক পণ্যভাড়া

মাইল	রেল (এমজি)	রেল (বিজি)	সড়ক	আভ্যন্তরীন নৌপরিবহন
৫০	৩·৩২—৩·৯৭	৩·৩৪—৪·২২	২·৯৯	৫·৫০
১০০	২·১৭—২·৬৬	২·২৮—২·৭৯	২·৫৪	২·৯৬
২০০	১·২৮—১·৭৭	১·৩২—২·০৪	২·৩১	১·৭৪

সূত্র : রেলওয়ে ডেভেলপমেন্ট প্লানিং প্রজেক্ট, খণ্ড ১, পৃঃ ৫১ (এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থ সংস্থান)।

তুলনামূলক ব্যয়ের অংকে ইঙ্গিত মেলে যে, রেলওয়ের উপর পরিবহনের বোঝা কী হওয়া উচিত। এতে দেখা যায় যে, দূরপথে পরিবহন অন্যান্য যানবাহনের চেয়ে রেলে তুলনামূলকভাবে সস্তা। এসব পণ্য পরিবহন অধিকাংশ আঞ্চলিক প্রকৃতির। এই পরিসংখ্যানগুলি থেকে দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের পরিবহনের স্বাভাবিক বোঝার মাত্রা হিসেব করা যায়। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক সমীক্ষায় দেখা যায় এর পরিমাণ ৭৫০ মিলিয়ন টন মাইল। দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের জন্য পণ্য চলাচল অনুক্রমগুলির (সিরিজ) নৈমিত্তিক সম্পর্ক ও সেই সঙ্গে প্রবণতার ভিত্তিতে হিসেব করা হয়েছে ৩,৮৪১ মিলিয়ন যাত্রী মাইল।

১৩·১৪ নানা কারণে, অতীত প্রবণতাগুলোর ভিত্তিতে যে পূর্বাভাস নির্ধারণ করা হয়েছে সেটিকে পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য নির্ভুল পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা সমীচিন হবেনা। এতে প্রচ্ছন্ন চাহিদা বা বাংলাদেশের বেলায় খুবই বেশী বলে পরিচিত বা মূল্য কাঠামোর পরিবর্তন আদৌ ধরা হয়নি। এজন্য পণ্য চলাচলের পরিমাণ সংক্রান্ত পূর্বাভাসের সামঞ্জস্যকৃত একটা হিসেব দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যক্রম প্রণয়নের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে। সংক্ষেপে বাংলাদেশ রেলওয়েকে ১৯৮৪/৮৫ সাল নাগাদ ৭,৫০৫ লাখ টন মাইলসহ ৪৮ লাখ টন পণ্য পরিবহন এবং ৩৮,৪১০ লাখ যাত্রী মাইলসহ ১১২০ লাখ যাত্রী বহন করতে হবে।

কার্যক্রম

১৩·১৫ উল্লিখিত পরিমাণ পণ্য ও যাত্রী দক্ষতার সংগে ও লাভজনকভাবে পরিবহনে সক্ষম করার লক্ষ্য রেখে বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে এবং অগ্রাধিকারের নিম্নলিখিত বিন্যাসে প্রকল্পসমূহের জন্য বিনিয়োগ তহবিল নির্ধারণ করা হয়েছে :

(ক) রেল লাইন ও সেতুসমূহের পুনর্বাসন এবং টেলিযোগাযোগ ও সিগন্যাল ব্যবস্থার উন্নয়ন/আধুনিকীকরণ,

(খ) সৈয়দপুর, পাহাড়তলী, ঈশ্বরদি, ঢাকা ও পার্বতীপুরের বর্তমান রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কারখানাগুলির মত পরিচালন প্রকল্পসমূহের উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ,

(গ) চালনা শক্তি (অর্থাৎ রেল ইঞ্জিন বহর বৃদ্ধি),

(ঘ) ওয়াগন ও কোচের সংখ্যা বৃদ্ধি, এবং

(ঙ) রেলকর্মীদের প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি।

বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৪১৩·৯৩ কোটি টাকা (১৯৭৯/৮০ মূল্যে) নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। এই বরাদ্দ দিয়ে রেল লাইনের গতি বৃদ্ধি, ওয়াগন ও যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির সংগে সম্পর্কিত জরুরী কাজগুলি হাতে নেয়া সম্ভব হবে। এগুলির অভাবে রেলওয়ের পরিচালনাগত দক্ষতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কার্যক্রমটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

(ক) **সেতু, টেলিযোগাযোগ, সিগন্যালিং পদ্ধতি ইত্যাদিসহ রেল লাইনের পুনর্বাসন :** রেল লাইনের অবস্থা এবং পণ্য ও যাত্রী চলাচলের বিবেচনায় গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে রেলওয়ে নিম্নলিখিত শাখাগুলিকে জরুরী বিবেচনা করা হয়েছে :

(১) ঢাকা-চট্টগ্রাম শাখা (মিটার গেজ)

(২) আখাউড়া-সিলেট শাখা (মিটার গেজ)

(৩) ভৈরব বাজার-ময়মনসিংহ শাখা (মিটার গেজ)

(৪) খুলনা-পার্বতীপুর শাখা (ব্রড গেজ)

এ ছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শাখায় রেল ও স্লিপার বদল এবং পাথর ফেলার কাজও করা হবে।

(খ) **বর্তমান মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সুযোগ-সুবিধা উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ :**

(১) রেলওয়ে সাজ-সরঞ্জামের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং সীমিত পর্যায়ে স্থানীয়ভাবে ওয়াগন ও বগী নির্মাণ ও সংযোজনের জন্য ওয়ার্কশপ ও লোকোশেডগুলির বর্তমান মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধেগুলির আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ।

(২) ভারী মেরামত ও বড় রকমের রেল ইঞ্জিন ওভারহলিং-এর জন্য একটি কেন্দ্রীয় ওয়ার্কশপ (ব্যাকশপ) স্থাপনের লক্ষ্যে বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও প্রাথমিক প্রকৌশল তৎপরতা শুরু করা।

(৩) কনক্রিট স্লিপার ও রেল লাইনের প্রয়োজনীয় ফিটিংস স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের জন্য একটি কারখানা স্থাপনের বিষয়ও কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

(গ) **চালনা শক্তি বর্দ্ধিতকরণ (রেল ইঞ্জিন) :** বর্তমান বাষ্পচালিত রেল ইঞ্জিনগুলির পরিবর্তে ডিজেল রেল ইঞ্জিন চালু করা হবে। চালনা শক্তির বর্তমান অবস্থাকে উন্নত করার জন্য কয়েকটি নতুন রেল ইঞ্জিন সংগ্রহ করা হবে। কার্যক্রমে নিম্নলিখিত রেল ইঞ্জিন সংগ্রহের পরিকল্পনা করা হয়েছে :

—প্রধান লাইনের জন্য রেল ইঞ্জিন ২৪ (ব্রডগেজ)+২৫ (মিটার গেজ) = ৪৯

—শান্টিং ইঞ্জিন ৫০ (মিটার গেজ) ৫০

৯৯

(ঘ) ওয়াগন ও বগীর (রোলিং স্টক) সংখ্যা বৃদ্ধি

(১) **মালবাহী ওয়াগন :** অনুমিত পরিমাণ পণ্য চলাচল ও অপ্রত্যাশিত চাহিদার (খাদ্য শস্য বিপুল পরিমাণে আমদানীকালে) পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে যে সংখ্যক ওয়াগন ও বগী রয়েছে সেগুলি ছাড়াও কিছু বিশেষ ধরণের ওয়াগনসহ ১,০৭৫টি ওয়াগন দরকার হবে বলে হিসেব করা হয়েছে। পরিকল্পনাকালে এগুলি সংগ্রহ করা হবে। এছাড়াও, জরাজীর্ণ ওয়াগনগুলি বদল করার জন্য ৬০০ ওয়াগনের পুনর্নির্মাণ এবং প্রায় ২৮৫টি ওয়াগণের স্থানীয়ভাবে নির্মাণ/সংযোজনের কাজ হাতে নেয়া হবে।

(২) **যাত্রী বগী ক্যারেজ :** যাত্রী চাপের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে যে সংখ্যক বগী আছে সেগুলি ছাড়াও মোট ৩০০ বগীর (ব্রডগেজ ১০০+মিটার গেজ ২০০) বগীর প্রয়োজন হবে বলে ধরা হয়েছে। কিন্তু সীমিত সম্পদের কারণে, পরিকল্পনাকালে মাত্র ১৬৪টি বগী (ব্রডগেজ ৪৪+মিটার ১২০) সংগ্রহ করা হবে এবং প্রায় ৯৪টি যাত্রীবাহী বগী স্থানীয়ভাবে নির্মাণ/সংযোজনের কাজ হাতে নেয়া হবে। এছাড়াও, পরীক্ষামূলক শহরতলী এলাকায় স্বল্প দূরত্বের ট্রেন সার্ভিসের প্রবর্তের জন্য তিনটি মিটার গেজ রেলকার ও ৬টি ট্রেলার সংগ্রহ করা হবে।

(ঙ) **কর্মী প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা :** রেলওয়ের ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন ও পরিচালনা দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অফিসার ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ অগ্রাধিকার লাভ করবে। কর্মচারীদের চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ, বিশেষ করে উন্নতর চালনা শক্তি ও অন্যান্য সম্পদের উন্নততর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য রেল ইঞ্জিনের তফশিল বিন্যাসে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। নির্মিয়মান রেলওয়ে অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমী পরিকল্পনা মেয়াদে চালু করা হবে। একাডেমী ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা উভয় স্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার দায়িত্ব পালন করবে।

১৩.১৬ কয়েকটি নীতি সংক্রান্ত বিষয়

(১) বাংলাদেশ রেলওয়ে যাত্রী পরিবহণের ক্ষেত্রে যে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে ; ক্রমান্বয়ে এই অগ্রাধিকার কমাতে হবে ; কারণ, এগুলিতে অর্থনৈতিক দিক থেকে তেমন লাভজনক নয়। বরং এখন থেকে পণ্য পরিবহনেই মনোনিবেশ কেন্দ্রীভূত করতে হবে কারণ তাতে আয় হয় তুলনামূলকভাবে বেশী। বর্তমানে কয়েকটি পণ্য বিনা মাশুলে বা ভর্তুকি ভাড়ায় পরিবহন করার রীতি রয়েছে। পারস্পরিক ভর্তুকি প্রক্রিয়ায় যতটুকু লোকসান পরিহার করা যায় বিনা মাশুল বা ভর্তুকি ভাড়ায় পণ্য পরিমাণ ঐ পরিমাণ অবধি সীমিত করে দিতে হবে।

(২) অব্যাহত মুদ্রাস্ফীতিও ক্রমবর্ধমান জ্বালানী মূল্যের প্রেক্ষিতে রেলের যাত্রী ভাড়া ও পণ্যের মাশুলের হার একটি মেয়াদান্তে পর্যালোচনা করে যুক্তিসঙ্গত করতে হবে।

(৩) রেলওয়েতে সর্বাধিক বিনিয়োগ প্রয়োজন, বিশেষ করে এজন্য রেল থেকে সর্বাধিক অর্থনৈতিক সুবিধে আদায়ের জন্য অন্য কোন সংগঠনের চেয়ে রেলওয়েতে দক্ষ ব্যবস্থাপনা বেশী জরুরী। বর্তমানে, বাংলাদেশ রেলওয়েতে ব্যবস্থাপনা সমস্যা বিশেষ করে রেল ওয়ার্কশপগুলিতে ব্যবস্থাপনা সমস্যা রয়েছে। ওয়ার্কসপগুলিতে পরিচালনাগত শৃঙ্খলার অভাব রয়েছে। রেলওয়ের সম্পদগুলির রক্ষণাবেক্ষণেও পর্যাপ্ত নজর দেয়া হয় না। ব্যবস্থাপনা সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য অবিলম্বে বাংলাদেশ রেলওয়ের আশু উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং শৃঙ্খলা, নির্ভরযোগ্যতা ও নিরাপত্তা জোরদার করা ও সাজ-সরঞ্জাম, খুচরো যন্ত্রাংশ ইত্যাদি চুরি হ্রাস করা সামর্থ্য নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

সড়ক ও জনপথ

১৩·১৭ বর্তমানে দেশে সড়ক ও জনপথ বিভাগের আওতায় বিভিন্ন পর্যায়ে নির্মাণাধীন প্রায় ৬০০ মাইল সড়ক পথ ছাড়াও ২,৫৫৪ মাইল পাকা সড়ক এবং ৫৪৬ মাইলের ইট/কাঁকর বিছানো রাস্তা রয়েছে। এছাড়াও বর্তমান সড়কগুলিতে ২১০,০০০ (rft) ফুট সেতুও কালভার্ট রয়েছে। ২৫৫৪ মাইল পাকা সড়কের আনুমানিক ৮২৩ মাইল এশীয় মহাসড়কের অংশে পড়েছে। সড়ক জনপথ বিভাগের সড়ক ছাড়াও দেশের গ্রামাঞ্চলে প্রায় ৮৬,০০০ মাইলের মত রাস্তা হয়েছে। এগুলি স্থানীয় সংস্থার নির্মিত এবং এসংস্থাগুলিই এসব রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। এর মধ্যে মাত্র ১,৭০০ মাইল রাস্তা পাকা। গ্রামের এসব রাস্তা নির্মাণের মান নীচু। ফলে এগুলি যান্ত্রিক/ভারী চাকাওয়ালা যানের চলাচলের উপযুক্ত নয়। দেশে মোট ৫২টি ফেরী ক্রসিং আছে। এর মধ্যে ১৫টি ফেরী ক্রসিং প্রধান সড়কগুলিতে। আর এসব ক্রসিং এ শক্তিচালিত ফেরী কাজ করছে। সংযোগ রক্ষাকারী যমুনা নদীর ফেরী পারাপার পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে অভ্যন্তরীণ জলপরিবহন সংস্থা। খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের সঙ্গে ঢাকা বিভাগের সড়ক ব্যবস্থার সুষ্ঠু উন্নয়নের জন্য দেশের সড়ক/মহাসড়কগুলিকে জাতীয়, আঞ্চলিক, জেলা, সংযোজক ও গ্রামীন সড়ক এই পাচ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। সড়ক/মহাসড়কের এই শ্রেণী বিভাগও সেই সঙ্গে ঐ সড়কগুলির নিজস্ব অর্থনীতি, অবস্থাগত গুরুত্ব, আঞ্চলিক বিবেচনা এবং যাত্রী ও পণ্য চলাচল ইত্যাদির ভিত্তিতে তাদের মান/স্পেসিফিকেশন সুপারিশ করা হয়েছে। উল্লিখিত শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী বর্তমান সড়ক/মহাসড়কগুলির মোট দৈর্ঘ্য সারণী ১৩·৫-এ দেখানো হয়েছে :

সারণী ১৩·৫
বর্তমান পাকা সড়কগুলির দৈর্ঘ্য

	(মাইলে)
জাতীয় মহাসড়ক	৮৫৪
আঞ্চলিক মহাসড়ক	৫৩৫
জেলা সড়ক	৪৬৫
সংযোগকারী সড়ক	৭০০
মোট ..	২,৫৫৪

মোট সড়কের ২০০ মাইল বিটুমিন কনক্রিটের রাস্তা এবং অবশিষ্ট ৫৫৪ মাইল রাস্তা সিমেন্ট কনক্রিট রাস্তা। উল্লিখিত সড়ক ছাড়াও জাতীয় ও আঞ্চলিক মহা সড়ক এবং জেলা/সংযোগ সড়ক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করার জন্য আরও ২,৭৫৮ মাইল নতুন সড়ক নির্মাণ প্রয়োজন হবে। সারণী ১৩·৬ এ বিস্তারিত প্রদত্ত হলো :

সারণী ১৩·৬
নতুন সড়কের দৈর্ঘ্য

	(মাইলে)
জাতীয় মহা সড়ক	২১৫
আঞ্চলিক মহা সড়ক	২০৮
জেলা সড়ক	২৩৫
সংযোগকারী সড়ক	২,১০০
মোট ..	২,৭৫৮

১৩·১৮ সড়ক জনপথ বিভাগ উল্লিখিত প্রথম তিন শ্রেণীর সড়কগুলির জন্য দায়িত্ব পালন করবে। সংযোগ সড়কগুলির (অংশবিশেষ) নির্মাণের দায়িত্ব স্থানীয় সংস্থাগুলি প্রয়োজনীয় জনশক্তি ও

অবকাঠামো সুবিধায় সজ্জিত হয়ে না ওঠা পর্যন্ত সাময়িকভাবে সড়ক ও জনপথ বিভাগের হাতে ন্যস্ত থাকবে। সংযোগ সড়কগুলির যতটুকু সড়ক ও জনপথের আওতাধীন ততটুকু ছাড়া সমস্ত সংযোগ সড়ক ও সকল পল্লী সড়ক স্থানীয় সংস্থাগুলির দায়িত্বে ন্যস্ত থাকবে। সড়ক ও জনপথ বিভাগের আওতাধীন পাকা সড়কগুলি বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্র এবং আর্থ-সামাজিক কৌশলগত ও প্রশাসনিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করবে। প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রগুলিসহ এই ধরনের সংযোগগুলির বর্তমান অবস্থা নিম্নের সারণীতে দেয়া হলো :

সারণী ১৩·৭

পাকা সড়ক সংযোগ

কেন্দ্রসমূহ	মোট	পাকা সড়ক দ্বারা সংযুক্ত কেন্দ্র	পাকা সড়কের সংযোগ-বিহীন কেন্দ্রসমূহ
(১) রাজশাহী বিভাগ :			
(ক) জেলা সদর	৫	৫	..
(খ) মহকুমা সদর	৯	৯	..
(গ) গ্রামীণ থানা	১০৯	৪৮	৬১
(ঘ) বড় হাট বাজার	৬২	১৬	৪৬
(ঙ) মাঝারি বাজার	৯৪	১২	৮২
	২৭৯	৯০	১৮৯
(২) খুলনা বিভাগ :			
(ক) জেলা সদর	৫	৪	১
(খ) মহকুমা সদর	১১	৭	৪
(গ) গ্রামীণ থানা	৭৪	২২	৫২
(ঘ) বড় বাজার	৩৯	১৬	২৩
(ঙ) মাঝারি বাজার	৯৭	২০	৭৭
	১৮৪	৬৪	১২০
(৩) ঢাকা বিভাগ :			
(ক) জেলা সদর	৫	৫	..
(খ) মহকুমা সদর	১২	৯	৩
(গ) গ্রামীণ থানা	৯৫	২৫	৭০
(ঘ) বড় হাট বাজার	৭০	২২	৪৮
(ঙ) মাঝারি বাজার	৯৭	২০	৭৭
	২৭৯	৮১	১৯৮
(৪) চট্টগ্রাম বিভাগ :			
(ক) জেলা সদর	৫	৫	..
(খ) মহকুমা সদর	১০	৯	১
(গ) গ্রামীণ থানা	৮৭	৪৩	৪৪
(ঘ) বড় হাট বাজার	৮৪	৩২	৫২
(ঙ) মাঝারি বাজার	১১৭	৩৭	৮০
	৩০৩	১২৬	১৭৭
মোট ..	১০৪৫	৩৬১	৬৮৪

সূত্র : পরিবহন জরীপ শাখা, পরিকল্পনা কমিশন, ১৯৭৭

১৩·১৯ উল্লেখিত সারণী থেকে দেখা যায় এ পর্যন্ত চিহ্নিত মোট ১০৪৫টি প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রের মধ্যে এ পর্যন্ত মাত্র ৩৬১ কেন্দ্র অর্থাৎ ৩৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রের সঙ্গে পাকা সড়ক যোগাযোগ আছে। তবে পল্লী অর্থনীতির উন্নতির স্বার্থে অবশিষ্ট পল্লী প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র ও পরবর্তীকালে যে কেন্দ্রগুলির চিহ্নিত হবে সেগুলির সঙ্গে জীপে চলাচলযোগ্য রাস্তার সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা দরকার হবে।

সড়ক ও মহাসড়কের লক্ষ্যসমূহ

১৩·২০ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সড়ক উপখাতের লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ:

(১) অর্থনীতির উৎপাদন ও বিতরণ খাতগুলির ক্রমবিস্তৃতি ও তৎপরতার সঙ্গে সঙ্গতিক্রমে সড়ক পরিবহন সুবিধার ব্যবস্থা; এবং

(২) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অর্থনৈতিক তৎপরতাগুলির বিকেন্দ্রীকরণের যে লক্ষ্য রয়েছে তার অন্যতম সমর্থনমূলক ব্যবস্থা হিসেবে মূল সড়কগুলির সঙ্গে প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রগুলির যোগাযোগ সাধনের উদ্দেশ্যে সংযোগ সড়কের একটি নেট ওয়ার্ক নির্মাণ।

১৩·২১ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সড়ক উন্নয়ন কার্যক্রমে নতুন সড়ক নির্মাণ এবং বর্তমান সড়কগুলির মান উন্নয়ন ও উন্নতিবিধান, সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ, ফেরী সার্ভিসের উন্নয়ন ও কিছু অবকাঠামোগত প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নতুন সড়ক নির্মাণ ও সড়ক প্রশস্ত করার কাজ পর্যায়ক্রমিক নির্মাণ (By Stage Construction) নীতি অনুসারে হাতে নেয়া হবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সড়ক শাখার কার্যক্রমগুলি নিম্নে বর্ণিত হয়েছে।

১৩·২২ **সড়ক/মহাসড়ক:** দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে নিম্নলিখিত সড়ক উন্নয়ন কার্যক্রমের কাজ হাতে নেয়া হবে:

সারণী ১৩·৮

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সড়ক উন্নয়ন কার্যক্রম

[মাইলে]

সড়কের শ্রেণী	পর্যায় ক্রমিক নতুন সড়ক নির্মাণ	প্রশস্তকরণ ও মজবুত করণ (পর্যায়ক্রমে)	শুধুমাত্র মজবুতকরণ/ উন্নয়ন	স্পেসিফিকেশন
(ক) জাতীয় মহাসড়ক	৭০	১১০	২৮০	কেষ্ট প্রশস্ত-৪০ ফুট পেভমেন্ট প্রশস্ত ২২ ফুট
খ) আঞ্চলিক মহাসড়ক	১১০	৪৫	৫০	কেষ্ট প্রশস্ত-৩৬ ফুট পেভমেন্ট প্রশস্ত-১৮ ফুট
(গ) জেলা সড়ক	৭৫	৫০	১০০	কেষ্ট প্রশস্ত ৩০ ফুট পেভমেন্ট প্রশস্ত-১২ ফুট
(ঘ) সংযোগ সড়ক	৯০০	..	১১০	কেষ্ট প্রশস্ত ২৪ ফুট পেভমেন্ট-১২ ফুট

দ্রষ্টব্য: পর্যায়-নির্মাণ, অর্থাৎ পণ্য ওয়ারী চলাচল যখন বৃদ্ধি পায় কিংবা যখন তহবিল পাওয়া যায় তখন সেই অনুযায়ী এক বা একাধিক পর্যায়ে রাস্তার বিভিন্ন ক্ষেত্র নির্মাণ বা উন্নয়ন।

যে সড়ক নেটওয়ার্ক বর্তমানে রয়েছে তার নিয়মমাফিক রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কাজ সড়ক/মহাসড়কগুলির পুনর্বাসন ও উন্নয়ন কাজের আগে ও পরে সড়ক ও জনপথ বিভাগের রাজস্ব বাজেটের অর্থে পরিকল্পিতভাবে ও সুষ্ঠুভিত্তিতে বাস্তবায়িত করা হবে।

১৩·২৩ **সেতু/কালভার্ট :** পুরোনো ও ক্ষতিগ্রস্ত সেতু/কালভার্টগুলির ওপর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং সেগুলির নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যক্রমে নিম্নলিখিত সেতু প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া কয়েকটি সেতু নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ে থাকবে :

	(আনুমানিক দৈর্ঘ্য) আর একটি
(ক) মেঘনা, গোমতি (দাউদকান্দি), সুরমা লামাকাজি ও গড়াই এর ৫টি গুরুত্ব পূর্ণ ও বড় আকারের সেতুর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা বিস্তারিত ডিজাইন প্রণয়ন ও নির্মাণ।	১০,০০০
(খ) জাতীয়/আঞ্চলিক/জেলাসড়কগুলির পুরোন/সংকীর্ণ সেতু/কালভার্ট গুলির নতুন করে নির্মাণ	১০,০০০
(গ) সংযোগ সড়কগুলির/ক্ষুদ্র/মাঝারি (৬০—৮০ ফুট) সেতু/কাল-ভার্টসমূহ নির্মাণ।	২০,০০০
মোট ..	৪০,০০০

১৩·২৪ **ফেরী সার্ভিস :** দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদে ফেরী সার্ভিস উন্নয়নের নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলি গ্রহণ করা হবে :

(ক) যমুনা নদীতে আরও দুটি এলাকায় অর্থাৎ সিরাজগঞ্জ, চর গাবসারা এবং মালারগঞ্জ ও সাবিয়া কান্দির মধ্যে দুটি নতুন ফেরী সার্ভিস প্রবর্তন,

(খ) নতুন কিছু ফেরী নির্মাণসহ বর্তমান ফেরী সার্ভিস ও ফেরীঘাটগুলির উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ ;

(গ) যাত্রী ও পণ্য চলাচলের চাপের মাত্রা অনুযায়ী প্রস্তাবিত নতুন সংযোগ সড়কগুলির যতগুলি জায়গায় সম্ভব ফেরী সার্ভিসের ব্যবস্থা।

সহায়তামূলক অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন

১৩·২৫ উল্লিখিত তালিকাভুক্ত প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য নিম্নলিখিত অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধের ব্যবস্থা করা হবে :

(ক) পাঁচটি কার্য সম্পাদনমূলক ডিভিশন প্রতিষ্ঠা করে কেন্দ্রীয়সড়ক গবেষণা ও পরীক্ষাগারকে শক্তিশালী করা হবে। এছাড়া সকল প্রকল্পের কার্যকরীখান নিয়ন্ত্রণের জন্য সড়ক ও জনপথ বিভাগের ফিল্ড অফিসগুলির সঙ্গে আঞ্চলিক/বিভাগীয় পরীক্ষাগার স্থাপন করা হবে।

(খ) সম্ভাব্য সর্বাধিক শ্রম প্রধান পদ্ধতি কাজে লাগাবার বিষয় খেয়াল রেখে সড়ক নির্মাণ সরঞ্জাম সংগ্রহ করা এবং সড়ক সংক্রান্ত সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি পুনর্বাসনের পদ্ধতি গৃহীত হবে।

(গ) সড়কগুলির গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে এবং বন্যার সময়ে জরুরী প্রয়োজন মেটানোর জন্য স্থানান্তরযোগ্য ইস্পাতের (বেইলী/এ্যাক্রো প্যানেল টাইপ) সেতু সংগ্রহ ও স্থাপন করা হবে।

(ঘ) প্রধান সড়কগুলির নেটওয়ার্কের কয়েকটি বিশেষ জায়গায় ওজনের ব্যবস্থা সম্বলিত সেতু স্থাপন করা হবে। এর উদ্দেশ্য হবে ট্রাক/বাসের এ্যাক্সেল লোড' এবং অতিরিক্ত যাত্রী ও পণ্য বোঝাই পরীক্ষা করা। এর ফলে অতিরিক্ত বোঝাই ট্রাকের ভারে সড়কে থাকা অংশ বা সেতু যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার নিশ্চয়তা বিধান সম্ভব হবে।

১৩·২৬ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সড়ক ও জনপথ বিভাগের জন্য ৩৮০·০০ কোটি টাকা (১৯৭৯/৮০ মূল্যে) বরাদ্দ করা হয়েছে। এই বরাদ্দ থানা প্রশাসনের উন্নীতকরণের জন্য বরাদ্দ থেকে সড়ক উন্নয়নের যে বিনিয়োগ হবে তা থেকে স্বতন্ত্র।

সড়ক উন্নয়নের কৌশল ও নীতি

১৩·২৭ সড়ক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত নির্দেশনা দেয়া হয়েছে:

(১) সীমিত সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে, সকল শ্রেণীর রাস্তা নির্মাণে, বিশেষ করে সংযোগ সড়ক নির্মাণের কাজ পর্যায়ক্রমে গ্রহণ করতে হবে এবং যেখানেই সম্ভব পর্যায়ক্রমিক নির্মাণ কৌশল প্রয়োগ করতে হবে।

(২) গোটা পল্লী উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে সংযোগ সড়কসমূহ নির্মাণের পরিকল্পনাও উন্নয়ন করতে হবে।

(৩) নতুন সংযোগ সড়ক নির্মাণে অতিরিক্ত জমি দখলের প্রয়োজন ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার জন্য সড়কের বর্তমান গতিপথের পরিসর (কাঁচা অবস্থায়) একান্ত প্রয়োজনে বাকগুলি সোজা করার ক্ষেত্র ছাড়া অপরিবর্তিত রাখতে হবে।

(৪) বর্তমান সড়ক, সাঁজ সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণে আগের চেয়ে আরও বেশী অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং সড়ক ব্যবস্থার উন্নতি বিধান ও পুনর্বাসনের জন্য যাতে পর্যাপ্ত তহবিল পাওয়া যায় তা নিশ্চিত করার জন্য নতুন সড়ক নির্মাণ বা সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য তহবিলের পরিমাণ যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্ধারণ করতে হবে।

(৫) সড়ক শ্রেণীবিভাগ ও সেগুলির সুপারিশকৃত মান যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে। রাস্তা পেভমেন্ট তৈরীর জন্য সড়ক ও জনপথ বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশন যৌথভাবে যে প্রকৌশলিক স্পেসিফিকেসন উদ্ভাবন করেছে তা যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করতে হবে।

(৬) সড়ক নির্মাণে মান-নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাদি অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে এবং এজন্য কেন্দ্রীয় সড়ক গবেষণা/পরীক্ষাগারকে জোরদার করা ও আঞ্চলিক গবেষণা পরীক্ষাগার-সমূহের প্রতিষ্ঠা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ করতে হবে।

(৭) রাস্তার বাঁধ নির্মাণের জন্য যে খালজাতীয় গর্ত খনন করা হয় তা এমনভাবে করতে হবে যাতে সেটি সেচখালের কাজ করতে পারে; রাস্তার ঐ বাঁধের দু'ধারে কাঠ ও ফলের গাছ লাগিয়ে ঐ বাঁধ রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৮) সড়ক/মহাসড়ক, সড়ক সরঞ্জাম ও অন্যান্য সামগ্রীর পরিকল্পনা, ডিজাইন প্রণয়ন, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জনশক্তির প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

(৯) সড়ক প্রকল্পগুলিকে এমনভাবে পর্যায় বিন্যস্ত করতে হবে যাতে বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত কোন প্রকল্প বাস্তবায়নে অন্ততঃ রাস্তাটিকে ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে ৫-৭ বছরের বেশী সময় না লাগে।

প্রতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক কাঠামো

১৩·২৮ নীতিগতভাবে কেবলমাত্র মূল সড়ক ও জাতীয় সড়কের নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপর ন্যস্ত করা উচিত। যা'হোক স্থানীয় সংস্থাগুলি চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী সংযোগ সড়ক নির্মাণ করলেও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সংযোগ সড়ক নির্মাণের দায়িত্ব সড়ক ও জনপথ বিভাগকেই দেয়া হয়েছে। স্থানীয় সংস্থাগুলি এই দায়িত্ব পালনের জন্য

কারিগরী জনশক্তি, প্রয়োগ কৌশল এবং অবকাঠামোমূলক সুবিধাদির দিক থেকে সুসজ্জিত নয় বলেই সংযোগ সড়ক নির্মাণে সড়ক ও জনপথ বিভাগকে জড়িত করার প্রয়োজন হয়েছে। অবশ্য ঐ দায়িত্ব একটা অস্থায়ী, অন্তর্বর্তীকালীণ ব্যবস্থা। আশা করা যায়, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের শেষনাগাদ সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে স্থানীয় সংস্থাগুলি সংগঠন, জনশক্তি, অবকাঠামো ইত্যাদি দিক থেকে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠবে। প্রকৃত পক্ষে জেলার সামগ্রিক পরিকল্পনায় সড়ক উন্নয়নের অগ্রাধিকার কী হওয়া উচিত সেটা নির্ধারণ ও শ্রম ও জমির স্বেচ্ছাদানের মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণকে এসব কাজে উদ্দীপনা যোগানোর ব্যাপারে স্থানীয় সংস্থাগুলি অধিকতর যোগ্যতার অধিকারী। সড়ক ও জনপথ একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন, যারপক্ষে এ ধরণের দায়িত্ব পালন কার্যত: অসম্ভব। তবে স্থানীয় সংস্থাগুলিকে উপদেশনা ও তত্ত্বাবধানমূলক সার্ভিসের আকারে এবং তুলনামূলকভাবে বড় বড় সেতু ও কালভার্ট নির্মাণের দায়িত্বের আকারে সড়ক ও জনপথ বিভাগের সংশ্লিষ্ট থাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সড়ক পরিবহণ

১৩·২৯ বাংলাদেশের সড়ক পরিবহণে সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতই জড়িত। পণ্য চলাচলের ৯৮ শতাংশ ও যাত্রী চলাচলের ৯০ শতাংশ পর্যন্ত পরিসেবিত হয়ে থাকে বেসরকারী খাতে। অতীত নীতির ঐতিহ্য হিসেবেই প্রধানত: যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে সরকারী খাতের অংশগ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। আর এটা চালু রয়েছে আর্থিক দিক থেকে লাভজনক নয় এমন সব পণ্য ও যাত্রী চলাচলের চাহিদার ক্ষেত্রে বেসরকারী পরিবহণের একটা বিকল্প হিসেবে। বেসরকারী খাতের ওপর একটা প্রতিযোগিতামূলক চাপ বজায় রাখার জন্যই দৃশ্যত: সরকরী খাতে পণ্য পরিবহণ পরিচালিত হচ্ছে। তবে এই উদ্দেশ্য কতদূর সাধিত হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। অবশ্য দুই খাতের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য আছে। সরকারী খাতের সড়ক পরিবহন যান্ত্রিক যানবাহনে সীমিত, অন্যদিকে বেসরকারী খাতে যান্ত্রিক ও প্রচলিত অ-যান্ত্রিক যানবাহনও চলে। ১৯৭৯ সালের নভেম্বর মাসে সড়কে চলাচলযোগ্য যান্ত্রিক যানবাহনের অবস্থা ১৩·৯ সারণীতে দেয়া হলো:

সারণী ১৩·৯

যান্ত্রিক সড়ক যান, নভেম্বর, ১৯৭৯

(যান সংখ্যা)

যানের প্রকার	রেজিস্ট্রিকৃত যানের সংখ্যা	সড়কে চলাচলকারী যান সংখ্যা
ট্রাক	২০,১৪৭	১৪,১০৩
বাস	১১,৮০২	৮,২৬১
প্রাইভেট কার	২৮,৩৫৫	১৯,৮৪৮
জীপ	১১,৩৯৪	৮,০২১
ট্যাক্সি	১,৮৫৪	১,১১৩
অন্যান্য চারচাকার যান	৬,২২২	৪,২৫৬
অটোরিক্সা	১৫,১৮৮	১০,৬৩২
মোটর সাইকেল	৪৮,৪৭২	৩৮,৭৭৪
মোট ..	১,৪৩,১৩৪	১,০৫,৩১২

সূত্র: বাংলাদেশ পরিবহন জরীপ, পরিকল্পনা কমিশন

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ সংস্থা (বিআরটিসি)

১৩·৩০ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ সংস্থা সরকারী খাতে সড়ক পরিবহণে নিয়োজিত একমাত্র সংস্থা। এই সংস্থার একটি বাস ও একটি ট্রাক ডিভিশন আছে। এই সংস্থা ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে বেশ বড় আকারে যাত্রী সার্ভিস পরিচালনা এবং ১০টি জেলায় মোট ১৬টি আন্তঃজেলা রুটে যাত্রী পরিবহন করে। নগর ও আন্তঃজেলা রুটগুলির বিভিন্ন উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত ৮টি ডিপো, ৯টি সাব-ডিপো ও ১১টি ষ্টেশন থেকে বিআরটিসির বাসগুলি চলাচল করে। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে বিআরটিসির বাস বহরের অবস্থা ছিল নিম্নরূপ :

সারণী ১৩·১০

বাংলাদেশ সড়ক পরিহণ সংস্থার বহর, ডিসেম্বর, ১৯৭৯

যানের ধরণ	মোট বহর	সড়ক চলাচলযোগ্য	মেরামতাধীন	সড়কে চলাচলকারী (গড়)
বাস	৬৭৫	৩৭৩	৩০২	২৩১
ট্রাক	১১০	৯৭	১৩	৯০
মোট	৭৮৫	৪৭০	৩১৫	৩২১

সারণী ১৩·১০-এ দেখা যায় মোট ৬৭৫টি বাসের মধ্যে মাত্র ২৩১টি অর্থাৎ প্রায় ৩৪ শতাংশ বাস প্রকৃত অর্থে রাস্তায় চলাচল করেছে। বাস চলাচল স্তরের এই অস্বাভাবিক নিম্ন মাত্রার কারণে বিআরটিসি ১৯৭৮/৭৯ সালে মোট মাত্র ৩৬৫ লাখ যাত্রী বহন করেছে।

বাস বহরের নিম্নমান চলাচলের দরুণ বিআরটিসি আর্থিক সঙ্কটে পড়েছে। প্রধানতঃ যথাসময়ে গাড়ীর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বাস যথোপযুক্ত পর্যায়ে চলাচল করতে পারেনি। মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ যথাসময়ে না হওয়ার মূলে রয়েছে খুচরা যন্ত্রাংশের অভাব ও ঘাটতি এবং ব্যবস্থাপনা ও পরিচালন স্তরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনশক্তির অভাব।

১৩·৩১ **বাংলাদেশ পরিবহন সংস্থার কার্যক্রম ও আর্থিক বরাদ্দ :** বেসরকারী খাতের সম্পূরক হিসেবে সড়ক পরিবহনে অংশগ্রহণ এবং যাত্রীদের জন্য পরিচালিত সার্ভিসে স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতার একটা ন্যূনতম মান নিশ্চিত করা এবং ট্রাক সার্ভিসের ক্ষেত্রে বেসরকারী খাতের ওপর একটা প্রতিযোগিতামূলক চাপ বজায় রাখাই বিআরটিসির উদ্দেশ্য। তবে এই উদ্দেশ্যগুলি দৃশ্যতঃ অর্জিত হয়নি। বরং বিআরটিসির তৎপরতা সরকারী কোষের জন্য দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব কারণেও বেসরকারী খাতে সড়ক পরিবহনের বর্দ্ধিত ক্ষমতার চাহিদার প্রায় সবটুকু মিটাতে সক্ষম হবে বলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আমলে বিআরটিসির কার্যক্রম একটা ক্ষুদ্র পরিসরে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। সরকারী পর্যায়ে সড়ক পরিবহনের সুযোগ সুবিধের উন্নয়নে বিআরটিসির জন্য ২৭·২৭ কোটি টাকার (১৯৭৯/৮০ মূল্যে) বরাদ্দ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে :

(১) বাস ও ট্রাক ডিভিশনের জন্য একটি সমন্বিত কেন্দ্রীয় ওয়ার্কশপ স্থাপন ;
(২) পুরোনো ও অকেজো যানবাহনের পরিবর্তে বাস/মিনিবাস ও ট্রাক সংগ্রহ ;
(৩) বিশেষতঃ ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে বিআরটিসির সার্ভিস সম্প্রসারণ ;
(৪) ড্রাইভার ও কারিগরদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ;
(৫) বর্তমান ডিপো/সাব-ডিপোগুলোর উন্নতিসাধন ;
(৬) ফুলবাড়িয়ায়, ঢাকা নগরী বাস টার্মিনাল নির্মাণ ; এবং
(৭) ঢাকা মহানগর পরিবহন ব্যবস্থার ওপর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। (পরিকল্পনা কমিশন এই সমীক্ষা চালাবেন)।

১৩·৩২ **কর্মকৌশল ও নীতিমালা :** নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা অনুসারে বিআরটিসির তৎপরতা পরিচালিত হবে :

(১) নতুন বাস সংগ্রহের মাধ্যমে অথবা শহর ও শহরতলী এলাকায় দিনিবাস সার্ভিস প্রবর্তনের জন্য অকেজো বাসের বহরের জরুরী প্রয়োজন ছাড়া সংস্থা যতদিন পর্যন্ত তার বর্তমান বাস বহর সন্তোষজনকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করতে পারবে এবং অচল হয়ে পড়া বাসের বহর পুনরায় সচল করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ না করতে পারবে ততদিন পর্যন্ত বিআরটিসির বহরের কোন সম্প্রসারণ করা চলবে না।

(২) বিআরটিসি তার যাত্রী সার্ভিস প্রধানতঃ ঢাকা ও চট্টগ্রামের শহর ও শহরতলী এলাকাগুলিতে সীমিত রাখবে এবং এর সার্ভিস অন্যান্য জেলা/আন্তঃজেলা রুটে সম্প্রসারিত করবেনা।

(৩) বিআরটিসি বাসের ভাড়ার হার এমনভাবে সংশোধন করা হবে যাতে কমপক্ষে বাস চলাচলের খরচ-পত্র সম্পূর্ণ সংকুলান হওয়ার পর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় মেটানো যায়।

(৪) বিআরটিসি ক্রমে ক্রমে ট্রাক সার্ভিস পরিচালনা পুরোপুরি বন্ধ করে দেবে।

আভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন

১৩·৩৩ বাংলাদেশে সকল প্রকার পরিবহনের মধ্যে আভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন সবচেয়ে কম ব্যয় বহুল ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রধান পণ্য চলাচলের প্রায় ৫০ শতাংশ এবং যাত্রী চলাচলের এক চতুর্থাংশ পরিবহন করে আভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন। আভ্যন্তরীণ নৌপথে মোট পণ্য ও যাত্রী চলাচলের মধ্যে সরকারী খাতে বাজ ১০ শতাংশ যাত্রী ও ৫০ শতাংশ পণ্য। তবে, নদীগুলির বহু জায়গায় ক্রমবর্ধমান হারে দ্রুত পলি পড়ার জন্য নৌ পরিবহন গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। কিছু ক্ষীণ ও অগভীর নদীতে সেচ ও মাছের চাষের জন্য প্রতিযোগিতামূলক হারে পানির চাহিদা বেড়ে যাওয়ার দরুণও চড়া পড়ে নদী অগভীর হওয়ার সমস্যার সঙ্গে জটিলতা বাড়ছে। সর্বোপরি সরকারী খাতের নৌযানগুলির অধিকাংশই অতি পুরোনো আর সেগুলির পরিচালন দক্ষতাও কম। নাব্য নদীপথের চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত হওয়ার রাতের বেলা নৌযান চালনা সাধারণতঃ বন্ধ থাকে। ফলে, নৌযানগুলির চলাচল হারও কম হয়। বহু আভ্যন্তরীণ নদী বন্দরে নৌযানসমূহ ভিড়বার আদর্শ ব্যবস্থা না থাকায় সমস্যার সৃষ্টি হয়, যাত্রীদের দুর্ভোগ হয়, পণ্য বোঝাই-খালাস বিঘ্নিত ও বিলম্বিত হয়। বন্দরে নৌযানের অবস্থানের মেয়াদ অযথা বেড়ে যায়।

১৩·৩৪ আভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহনের ক্ষেত্রে সরকারী খাতের দুটি সংগঠন কর্মতৎপর। সংগঠন দু'টি হচ্ছে : (ক) বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ), (খ) বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন সংস্থা (বিআইডব্লিউটিসি)। বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ আভ্যন্তরীণ নদী বন্দর নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, নৌপথগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে ; নৌযান চালনায় সহায়তা ও সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা বিধান করে এবং নৌযানসমূহের রেজিস্ট্রেশন ও নৌযান চালনায় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বিধানের মত পরিচালনাগত ভূমিকা পালন করে। বিআইডব্লিউটিএ সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতের নৌযানের ষ্টেক কর্মীদের প্রশিক্ষণ দান করে। স্বাধীনতার পর প্রধানতঃ বেসরকারী নৌপরিবহন কোম্পানী-গুলিকে একত্রিত করিয়া আভ্যন্তরীণ জলপরিবহন সংস্থা গঠিত হয়। এই সংস্থা বিভিন্ন বাণিজ্যিক নৌযানের মালিক ও সেগুলি পরিচালনা করে।

১৩·৩৫ **কৌশল :** আভ্যন্তরীণ নৌপরিবহনের সমস্যাবলীর কথা মনে রেখে ও সরকারী খাতের পরিচালনার উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য নিম্নবর্ণিত কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে :

(ক) নৌপথের অবস্থার উন্নতির জন্য নদীগুলির মৃত (শুষ্ক) ও মজিয়া যাওয়া অংশ-সমূহের ড্রেজিং এর কার্যক্রম আরও জোরদার করা হবে।

(খ) আভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহনে বেসরকারী খাতের যথেষ্ট অংশীদারীত্ব থাকায় এই উপখাতে সরকারী খাতের বিনিয়োগ প্রধানতঃ নৌচলাচল ও উপকূলীয় সুযোগ-সুবিধে বৃদ্ধি করাতেই নিয়োজিত থাকবে।

(গ) বাংলাদেশের যে সকল স্থায়ী নদীবন্দরে যান্ত্রিক নৌযান চলাচল সম্ভব সেসব নদীবন্দর-গুলিকে শ্রেণীবিন্যস্ত করে সেগুলিতে ন্যূনতম অবতরণ ও উপকূলীয় সুবিধাদি নিশ্চিত করা হবে। এই বন্দরগুলির টোল প্রথার ভিত্তিতে কাজ করা উচিত। এই টোল আদায় ও অপেক্ষকৃত ছোট বন্দরগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্থানীয় সংস্থাগুলির হাতে ন্যস্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা হবে।

(ঘ) নৌপথ চিহ্নিত করার ব্যবস্থাদি পর্যাপ্ত নয় বলে রাতে সাধারণতঃ নৌযান চলাচল করে না। এটাই নৌযানগুলির কম চলাচলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। রাতে নৌ-চলাচল উৎসাহিত করার জন্য নৌপথ চিহ্নিত করার সরঞ্জামের আধুনিকায়ণ করা হবে।

বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)

১৩·৩৬ দেশের নৌপথগুলি প্রাকৃতিক সম্পদ। ফলে মৌলিক সুবিধাগুলো নিশ্চিত করার জন্য গোড়ার দিকে তুলনামূলকভাবে কম মূলধনের প্রয়োজন হয়। তবে, নৌপথগুলি মাঝে মাঝে ড্রেজিং এবং নৌপথগুলি চিহ্নিত করার মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। এছাড়াও নদীবন্দরগুলিকে চালু রাখতে হয়। এগুলি বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে অবকাঠামোমূলক, তাই বিআইডব্লিউটিএকেই এসব দায়িত্ব পালন করতে হবে।

১৩·৩৭ এজন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বিআইডব্লিউটিএর বিনিয়োগ কার্যক্রম প্রধানতঃ এদুটি ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীভূত থাকবে। বর্তমান নৌপথগুলি সংরক্ষণ ও নতুন নৌপথ সৃষ্টির জন্য ড্রেজিং তৎপরতা জোরদার করা হবে। সকল নদী বন্দর ও ঘাটগুলিকে শ্রেণীবিন্যস্ত করা হবে এবং যাত্রী ও পণ্য চলাচল এবং অবস্থানগত গুরুত্ব অনুযায়ী সেগুলির জন্য পণ্য ও যাত্রী উঠা-নামার ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে সেগুলির মান নির্ধারণ করে দেয়া হবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বিআইডব্লিউটিএ'এ উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য ১৯৭৯/৮০ মূল্যে ৬৪·৯৪ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। প্রধান কার্যক্রমগুলি নিম্নরূপ :

(ক) নদীগুলির ছয়টি মজা অংশে ১২·০ মিলিয়ন ঘনগজ ড্রেজিং,

(খ) বাঘাবাড়ী, ভৈরববাজার, নরসিংদি ও আজমিরিগঞ্জে অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর নির্মাণ,

(গ) নারায়ণগঞ্জ ও খুলনার (মহেশ্বরপাশা) নদীবন্দরে পণ্য বোঝাই-খালাসী ব্যবস্থার আংশিক যান্ত্রিকীকরণ,

(ঘ) ৫০টি লঞ্চঘাটের উন্নয়ন,

(ঙ) তিনটি নৌ-চলাচলযোগ্য খাল খনন,

(চ) পানি তাত্ত্বিক জরীপের জন্য চারটি জল যান সংগ্রহ,

(ছ) একটি ক্ষুদ্র উদ্ধার ইউনিট সংগ্রহ, এবং

(জ) ভৈরব, লক্ষ্যা অববাহিকায় নৌচলাচল ব্যবস্থা উন্নয়ন, বরিশাল বন্দরে তীর ভাঙনের সমস্যা এবং চিলমারীতে নদীবন্দর নির্মাণের ব্যাপারে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ গ্রহণ। এই কার্যক্রমগুলি ছাড়াও বিআইডব্লিউটিএ তাহার পানি-প্রাত্তিক জরীপ পরিচালনা এবং প্রধান নৌপথ ও নদীবন্দরগুলি রক্ষণাবেক্ষণের মূল দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখবে। এর কিছু কাজের জন্য অর্থসংস্থান উন্নয়ন বাজেট থেকে করা হয়।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণ সংস্থা (বিআইডব্লিউটিসি)

১৩·৩৮ স্বাধীনতা যুদ্ধের পরেই BIWTC গঠনের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ জল পরিবহনে সরকার অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন ধরণ ও আকারের ৬৬৩টি নৌযানের সাহায্যে অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন সংস্থা এখন প্রধান পণ্য চলাচলের প্রায় ৫০ শতাংশ এবং প্রধান আন্তঃজেলা যাত্রী চলাচলের ১০ শতাংশ পরিবহন করে। অবশিষ্ট অংশ বেসরকারী খাতে পরিবাহিত হয়। ১৯৮০ সালের জুন মাসে বিআইডব্লিউটিসির নৌযান বহরের বিন্যাস নিম্নের সারণীতে দ্রষ্টব্য:

সারণী ১৩·১১

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন সংস্থার নৌযান সমাহার

(টনে প্রকাশিত পণ্য)

নৌযানের ধরন	সংখ্যা	স্থির ক্ষমতা
১। তৈলবাহী ট্যাঙ্কার	১৬	১৫,৯৩৬
২। পণ্যবাহী কোষ্টার	২৪	১৭,৫০৮
৩। উপসাগর পারাপারকারী ফ্ল্যাট/বার্জ ..	৬২	৩৪,৪৯৪
৪। উপসাগর পারাপারকারী টাগস্ ..	৭	..
৫। অভ্যন্তরীণ ফ্ল্যাট ও বার্জ ..	২৩৬	৯৯,১১৫
৬। পাটের নৌকাসমূহ ..	৭৭	৭,৪০০
৭। স্বয়ংচালিত বার্জ ..	৯	২,৭৮৭
৮। এইচ ডি লঞ্চ	১৯	...
৯। অভ্যন্তরীণ টাগ	৫৪	..
১০। অন্যান্য নৌযান	১২৯	২,৭৬০
মোট	৬৩৩	১,৮০,০০০

১৩·৩৯ **কার্যক্রমসমূহ:** উপরোল্লেখিত সারণীতে দেখান তালিকা অনুসারে ১৯৮০ সালের জুন মাসে সংস্থার মোট স্থির পরিবহণ ক্ষমতা ছিল ১·৮০ লাখ টন পণ্য। এই নৌবহরের এক চতুর্থাংশ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণমূলক কাজের জন্য অকেজো থাকে ধরে নিয়ে এরকম একটা অত্যন্ত নিম্নমাত্রার পরিচালনা দক্ষতা নিয়ে এবং মাসে গড়ে মাত্র তিনবার নৌযাত্রায় গেলেও ঐ স্থির সামর্থ্যেও BIWTC প্রায় ৪·৮৬ মিলিয়ন টন পণ্য বহনে সক্ষম হবে। ১৯৮৪/৮৫ সালে অভ্যন্তরীণ নৌযানে মূল পণ্য চলাচলের পরিমাণ ৫·৮৪ মিলিয়ন টন হবে বলে হিসেব করা হয়েছে। উল্লেখিত ৪·৮৬ টনের ধার্য ক্ষমতা নিয়ে BIWTC পণ্য চলাচলে পরিকল্পিত বর্দ্ধিত পরিমাণের আনুপাতিক অংশের চেয়েও বেশী পরিমাণ পণ্য বহন করতে সক্ষম হবে। এজন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে BIWTC চিরাচরিত নৌযানের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রশ্নই ওঠে না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, নৌ পরিবহনে বেসরকারী খাত সক্রিয়। কাজেই ঐ খাতে সরকারী খাতের তৎপরতা নীতিগতভাবে বর্তমান ক্ষমতার

বাইরে সম্প্রসারিত হওয়া উচিত নয়। অবশ্য BIWTCকে আশুগঞ্জ সার কারখানা থেকে সার পরিবহণ, খাদ্যশস্য পরিবহনের জন্য কম গভীরতা সম্পন্ন নৌযান এবং ঘূর্ণিঝড় প্রধান উপকূলীয় এলাকাগুলি থেকে যাত্রী বহণের জন্য অবতরণ যান ধরণের নৌযানের (Landing Craft Type) মত বিশেষ ধরণের কতকগুলি নৌযান সংগ্রহ করতে হবে। যুগজীর্ণ নৌযানগুলি বদল, পরিচালনা দক্ষতার উন্নতি এবং উল্লিখিত বিশেষ ধরণের নৌযান কেনার জন্য BIWTC-র বিনিয়োগ কার্যক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে BIWTC এর উন্নয়ন কার্যক্রমে অর্থসংস্থানের জন্য ১৯৭৯/৮০ মূল্যে ৫১·৭৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সংগ্রহজনিত কার্যক্রমের প্রধান উপাদানগুলো নিম্নে দেখানো হলো :

(ক) দুটি স্বয়ং চালিত অতি পুরোনো বার্জ বদল,
(খ) সার, খাদ্যশস্য ইত্যাদি পরিবহণের জন্য নতুন নৌযান সংগ্রহ,
(গ) ঘূর্ণিঝড় প্রধান এলাকাগুলির জন্য এলসিটি ধরণের নৌযান সংগ্রহ, এবং
(ঘ) বর্তমান নৌযানগুলিতে ডিজেল ইঞ্জিন প্রবর্তন, সংস্কার ও পুনর্বাসন।

সামুদ্রিক পরিবহন

১৩·৪০ সামুদ্রিক পরিবহনে সমুদ্র বন্দর নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সমুদ্রগামী জাহাজযোগে আন্তর্জাতিক পরিবহন পরিচালনা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। পরিবহনে এই পরিমণ্ডলে সরকারী খাতের তৎপরতা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়। এরকম কয়েকটি প্রতিষ্ঠান সরাসরি নৌযান চালনায় নিয়োজিত এবং অন্য কয়েকটি অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধে ও সমর্থন যোগায়।

১৩·৪১ গত দশকে, সামুদ্রিক পণ্য চলাচল তেমন বাড়েনি। দুইটি সমুদ্র বন্দরের একটি চট্টগ্রাম প্রধানতঃ আমদানী পণ্য এবং অন্যটি চালনা আমদানী-রপ্তানী দুই-ই করে থাকে, এই দুই সমুদ্র বন্দরের মৌলিক অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেনি। নিম্নের সারণী থেকে এগুলি প্রতীয়মান হয় :

সারণী ১৩.১২

সমুদ্র বন্দর ট্র্যাফিক, আমদানি ও রপ্তানি ('000' টনে)

বছর	মোট চলাচল	চট্টগ্রাম			চালনা		
		আমদানী	রপ্তানী	মোট	আমদানী	রপ্তানী	মোট
১৯৬৯/৭০	৭,০৭৫	৪,৪৬২	৫৭৩	৫,০৩৫	১,০৩৭	১,০০৩	২,০৪০
১৯৭০/৭১	৫,৭২১	৩,৭৫৫	৪১২	৪,১৬৭	৮৬১	৬৯৩	১,৫৫৪
১৯৭১/৭২	৩,৭৬০	২,৩০৬	২৫০	২,৫৫৬	৬৫৭	৫৪৭	১,২০৪
১৯৭২/৭৩	৬,৬৭৪	৪,৮৫০	২৮৩	৫,১৩৩	৮১৭	৭২৪	১,৫৪১
১৯৭৩/৭৪	৪,৯৬৭	৩,২৯৫	২৮৮	৩,৫৮৩	৭০১	৬৮৩	১,৩৮৪
১৯৭৪/৭৫	৬,০৩৪	৪,২৪১	২৫৮	৪,৪৯৯	১,০৪১	৪৯৪	১,৫৩৫
১৯৭৫/৭৬	৬,০০৭	৪,১১৫	৩৬৫	৪,৪৮০	৯০০	৬২৭	১,৫২৭
১৯৭৬/৭৭	৪,৫৭৩	২,৯৩৬	৫১১	৩,৪৪৭	৪০৪	৭২২	১,১২৬
১৯৭৭/৭৮	৬,৭০৫	৪,৬৯৫	৫৪৫	৫,২৪০	১,০৮১	৩৮৪	১,৪৬৫
১৯৭৮/৭৯	৬,২৩৮	৪,১৯০	৩৪৫	৪,৫৩৫	১,০২৬	৬৭৭	১,৭০৩
১৯৭৯/৮০	৮,৩৭৯	৫,৯০৪	৩২৯	৬,২৩৩	১,৪৭০	৬৭৬	২,১৪৬

১৩.৪২ উল্লিখিত সারণীতে দেখা যায়, দুটি বন্দরে ১৯৭৯/৮০ মেয়াদে একত্রে প্রায় ৮.৪ মিলিয়ন টন পণ্য ওঠা-নামা করেছে। খাদ্যশস্য আমদানী দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আমলে যথেষ্ট কমে যাবে এবং অন্যান্য পণ্য আমদানীও কম মাত্রায় বাড়বে ধরে নিলেও পণ্য ওঠা-নামার পরিমাণ হবে ৮.০ মিলিয়ন টন। এ সবের তুলনায়, চট্টগ্রাম বন্দর বর্তমানে ৬.০ মিলিয়ন টন পণ্য ও চালনা বন্দর ২.০ মিলিয়ন টন পণ্য অর্থাৎ দুটি বন্দর মোট ৮.০ মিলিয়ন টন পণ্য ওঠা-নামা করতে পারে। এ থেকে দেখা যায়, বন্দরগুলির বর্তমান সামর্থ্য বা ক্ষমতা ১৯৮৪/৮৫ মেয়াদের পণ্য চলচল চাহিদা মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত।

১৩.৪৩ অবশ্য উভয় সমুদ্র বন্দরেরই দক্ষতার সঙ্গে ও অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক ভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু ভৌত সমস্যা আছে। প্রথমতঃ চট্টগ্রাম কিংবা চালনা যে বন্দরই হোক না কেন কোন বন্দরেরই জেটিগুলির কাছে বড় বড় জাহাজ (১৫,০০০—২০,০০০ ডি ডব্লিউটি) ভিড়িবার মত উপযুক্ত গভীরতা নেই। অন্যদিকে সারা বিশ্ব জুড়ে বর্তমানে অর্থ-নৈতিক সাশ্রয়ের জন্য বড় বড় জাহাজ ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলাদেশের আমদানী/রপ্তানী পণ্যের প্রায় ৮০ শতাংশ বিদেশী জাহাজে পরিবাহিত হয়, কাজেই কি আকারের জাহাজ ব্যবহার হচ্ছে তার ওপর বাংলাদেশের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। ফলে বড় বড় জাহাজগুলিকে বন্দর থেকে বেশ দূরে অপেক্ষা করতে হয় এবং লাইটারেজ বা ছোট ছোট নৌযানের সাহায্যে ঐ জাহাজ থেকে পণ্য আনা-নেয়া করতে হয়। এতে পণ্য খালাস বা বোঝাই-এ বিলম্ব হয় এবং পণ্য খালাসের খরচও বৃদ্ধি পায়। বার্ষিক অতিরিক্ত প্রায় ৪০-৫০ কোটি টাকা লাগে। বন্দরের জেটিগুলির আশেপাশে ড্রেজিং অথবা গভীর পানিতে টারমিনাল নির্মাণ করে এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। চট্টগ্রাম বন্দরে কর্ণফুলী নদীর ড্রেজিং চললেও বড় জাহাজগুলি এখনও বন্দরের প্রবেশ পথের অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। তাই ড্রেজিং সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধান হবে কি না সন্দেহ আছে। তাই শেষ পর্যন্ত গভীর পানিতে বন্দর নির্মাণ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে। চালনা বন্দরে গভীরতার সঙ্কট আরও গুরুতর। এখানে জেটি বরাবর নদীর গভীরতা গত একদশকে এতটা কমে গেছে (প্রায় ১০ ফুট) যে মোটামুটি আকারের কোন সমুদ্রগামী জাহাজের পক্ষে জেটি বরাবর ভেড়া এখন আর সম্ভব নয়। গভীরতার সমস্যা লাঘব করার জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অনুসরন করা হচ্ছে। এই পর্যায়ে সমস্যার সমাধান বেশ সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার বলেই মনে হচ্ছে। গভীরতাজনিত পরিস্থিতির উন্নতি হবে ধরে নিলেও চালনা বন্দরের উন্নয়নের জন্য ইতিমধ্যেই যে ১২৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়ে গেছে তা থেকে মুনাফা হাসিল নিশ্চিত করতে হলে বন্দরে কিছু সহায়তামূলক সুযোগ-সুবিধা গড়ে তোলা আবশ্যক। এগুলির মধ্যে থাকবে পণ্যাগার ও ট্রানজিট শেড, অফিস ও আবাসিক বাড়িঘর নির্মাণ এবং সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা। দ্বিতীয়তঃ গভীরতার সমস্যার কথা ছেড়ে দিলেও কোন বন্দরেই কন্টেনার পণ্য খালাস ও বোঝাই এর ব্যবস্থা নেই। অথচ অধিকাংশ বিদেশী জাহাজে ব্যাপকভাবে পণ্য বহনের এই পদ্ধতিটি গ্রহণ করা হয়েছে। এই সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন।

বন্দর উন্নয়ন

১৩.৪৪ **চট্টগ্রাম বন্দর:** দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য ১৯৭৯/৮০ মূল্যে ৬৩.৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

কার্যক্রমের প্রধান উপাদানগুলো নিম্নরূপ:

(ক) এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এর অর্থ সংস্থানকৃত তিনটি স্কীম সম্পূর্ণকরণ: বন্দরের রেল লাইন পুনর্বাসন (৩৭ মাইল), একটি পণ্যাগার ও একটি ট্রানজিট শেড নির্মাণ এবং ১নং থেকে ৬নং জেটির পিছনে পাঁচটি ট্রানজিট শেড নির্মাণ এবং জাহাজ ও অন্যান্য নৌযান সংগ্রহ;

(খ) কন্টেনারের পণ্য ওঠানো-নামানোর জন্য সুযোগসুবিধের ব্যবস্থা এবং কন্টেনারের পণ্য ও সাধারণভাবে জাহাজের পণ্য খালাস ও বোঝাই এর যন্ত্রপাতি সংগ্রহ; এবং

(গ) কর্ণফুলী নদীর নৌলিক ড্রেজিং।

এ ছাড়া ওয়ার্কশপ ও স্লিপওয়ে প্রকল্প, সদরঘাট লাইটারেজ জেটি এবং বিস্ফোরক পণ্য জেটিসহ চালু প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণকরণ এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

১৩.৪৫ **চালনা বন্দর :** দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে চালনা বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রধান বিষয়গুলি হচ্ছে : নির্মিত পাঁচটি জেটির জন্য সহায়তামূলক ব্যবস্থাদি নির্মাণ এবং স্থায়ী বন্দর প্রকল্পের ১নং পর্যায়ের কাজ (ব্যয়ে, ১৪৫ কোটি টাকা) সম্পূর্ণকরণ। বড় ধরনের বিনিয়োগ ব্যয়ের অন্যান্য খাতগুলি হচ্ছে, বন্দরের বিভিন্ন নৌযান ও তরী, পানিতাত্ত্বিক অনুসন্ধান এবং নৌপথের উন্নয়ন। চালনা বন্দরের আটটি স্কীমের জন্য ১৯৭৯/৮০ মূল্যে ৫৪.৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই সব বিনিয়োগ ও খুলনা-মংলা সড়ক নির্মাণ সমাপ্ত হলে, ১৯৮৪/৮৫ সাল নাগাদ ১১,০০০ ডি ডব্লিউটির মত জাহাজগুলির পক্ষে জেটি ব্যবহার সম্ভব হবে।

সামুদ্রিক জাহাজ চলাচল

১৩.৪৬ দুটি সমুদ্র বন্দর এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূল ভাগে সমুদ্রচারী বিপুল নাবিক সম্প্রদায়ের বসবাস থাকায় সামুদ্রিক জাহাজ চলাচলের দ্রুত সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ নিজ জাহাজেই তার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আরও বেশী পণ্য পরিবহন, বেশী বৈদেশিক মুদ্রা আয় এবং ক্রমবর্ধমান জনশক্তির জন্য কর্মসংস্থান সক্ষম হবে। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের উন্নয়ন কার্যক্রমটি এই আলোকে বিবেচনা করা দরকার। বিগত আট বছরে দেশের মোট সামুদ্রিক পণ্য চলাচলের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নিজের সেই পরিবহনের অংশ ১৯৭২/৭৩ সালের সামান্য পরিমাণ থেকে ১৯৭৯/৮০ সালে ২২ শতাংশেরও বেশীতে উন্নীত হয়েছে। কনফারেন্স লাইনের অন্যতম সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ নিজ জাহাজে তার মোট রপ্তানী ও আমদানীর ৪০ শতাংশ পরিবহনের অধিকারী। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের উন্নয়ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য তার সামর্থ্য বাস্তবায়িত করা। অবশ্য, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সম্পদের অভাবের জন্য এই লক্ষ্যের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। সম্পদ পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে :

(ক) চারটি সমুদ্রগামী মালবাহী জাহাজ সংগ্রহ।

(খ) কর্পোরেশনের সাতটি সমুদ্রগামী মালবাহী জাহাজ অত্যন্ত পুরোনো ও ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। এই জাহাজগুলি বদল করার চেষ্টা চলবে।

(গ) পরিকল্পনাকালে কর্পোরেশনের তৈলবাহী ট্যাঙ্কারের (৯৫,০০০ ডিডব্লিউটি ওয়াটার ট্যাঙ্ক) কার্যকরী আয়ুকালের মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে। এর স্থলাভিষিক্ত হবে ১,২৫,০০০ ডিডব্লিউটি ওজনের ট্যাঙ্কার।

(ঘ) প্রথম পরিকল্পনাকালে দুটি পুরোনো লাইটারেজ ট্যাঙ্কার সংগ্রহ করা হয়েছিল; এ দুটি অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক আয়ুকালের মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা মেয়াদে এগুলির পরিবর্তে নতুন জাহাজ সংগ্রহ করা হবে।

কর্পোরেশনের সংশোধিত বহর সংক্রান্ত তথ্য নীচে প্রদত্ত হলো :

সারণী ১৩·১৩

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে উন্নয়ন কার্যক্রম (১৯৮০-৮৫)

ক্রমিক নং।	জাহাজের ধরণ	১৯৮০ সনের অবস্থা		দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের সংগ্রহ কার্যক্রম। পুনঃস্থাপন		সংগ্রহ		১৯৮৫ সালের অবস্থা	
		সংখ্যা	ডিডব্লিউটি	সংখ্যা	ডিডব্লিউটি	সংখ্যা	ডিডব্লিউটি	সংখ্যা	ডিডব্লিউটি
১।	সাধারণ মালবাহী জাহাজ	১৮	২,১৯,৩৬০	৭	১,০৫,০০০	৪	৬০,০০০	২২	২,৮৭,০৫১
২।	তৈলবাহী ট্যাঙ্কার	১	৯৫,০০০	১	১,২৫,০০০	..	..	১	১,২৫,০০০
৩।	লাইটারেজ ট্যাঙ্কার	২	৩৭,২৩০	২	৪,০০০০	..	..	২	৪০,০০০
৪।	কোষ্টার/লাইটার	৩	৫,১৫৪	..	..	..	..	৩	৫,১৫৪
৫।	হজ্জযাত্রীবাহী জাহাজ*	১	১২,০০০	..	..	..	..	—	—
	মোট	.. ২৫	৩,৬৮,৭৪৪	১০	২,৭০,০০০	৪	৬০,০০০	২৮	৪,৫৭,২০৫

* **দ্রষ্টব্য** জাহাজটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

১৩·৪৭ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক ব্যাংক, সরবরাহকারীর প্রদত্ত ঋণ, দ্বি-পাক্ষিক সাহায্য, বিশ্ব-ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহায়তার মত বিভিন্ন অর্থ সংস্থান ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন জাহাজ সংগ্রহ করে। উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলির আওতায় বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনকে জাহাজের মূল্যের শুধুমাত্র আংশিক মূল্য তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করতে হয়। পরিকল্পনা মেয়াদে কর্পোরেশনের প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মোট প্রায় ২৫৪·৬০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। পরিকল্পনা মেয়াদে তাৎক্ষণিক মূল্য পরিশোধ খাতে অর্থযোগানের জন্য ১৯৭৯/৮০ মূল্যে ৭০·৮০ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

মেরিন একাডেমী

১৩·৪৮ বাংলাদেশে সমুদ্রচারী/নাবিক হওয়ার উপযুক্ত সম্প্রদায় রয়েছে; তবে তাদের আধুনিক প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে। এজন্য ১৯৬২ সালে একটি মেরিন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয়। তবে একাডেমীর ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধে সীমিত। বর্তমানে একাডেমীতে একসঙ্গে নটিক্যাল ও প্রকৌশল বিভাগে মোট ৪৮ জন ক্যাডেটকে প্রশিক্ষণ দেয়া যায়। মেরিন একাডেমীর কোর্সগুলি প্রি-সী কোর্স। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন ও বিদেশী শিপিং কোম্পানীগুলিতে চাকুরী করতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে বর্দ্ধিত সংখ্যায় জাহাজের ক্রু সরবরাহের জন্য 'পোষ্ট সী কোর্স' প্রবর্তনের মাধ্যমে একাডেমীর প্রশিক্ষণ ক্ষমতা বাড়ানো দরকার। এই লক্ষ্য সামনে রেখে 'মেট', মাষ্টার, সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার ও চীফ ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতির 'পোষ্ট সী কোর্সে' শিক্ষাদানের একটি মহা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। পরিকল্পনা মেয়াদে একাডেমীর জন্য ১৯৭৯/৮০ মূল্যে ১০·৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

বাণিজ্যিক নৌ বিভাগ

১৩·৪৯ এই বিভাগ বাতিঘর নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং বয়া ও বীকনের মত নৌচালনার সহায়ক সরঞ্জাম পরিচালনার মাধ্যমে সমুদ্রগামী জাহাজগুলির জন্য নৌ চালনার সুযোগ সুবিধের ব্যবস্থা করে। পুরোণো বাতিঘরগুলি জীর্ণ ও সামুদ্রিক জাহাজ চলাচলের বর্ধিত চাহিদার জন্য বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণাঞ্চলে একটি নতুন বাতিঘর নির্মাণ এবং বিপর্যয়ে পতিত জাহাজগুলির ত্রাণ-কাজের জন্য একটি ত্রাণ ও জীবনরক্ষাকারী ইউনিটের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এজন্য পরিকল্পনায় ১৯৭৯/৮০ মূল্যমানে ০·০৬ কোটি টাকার একটি নামমাত্র বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

জাহাজ চলাচল বিভাগ

১৩·৫০ সওদাগরী জাহাজ চলাচল আইন প্রশাসন, আভ্যন্তরীণ বন্দর ও নৌপথের পরিবহনের সমন্বয়, নৌযানের পরিবহন ভাড়া সমীক্ষা এগুলি এই বিভাগের প্রধান কাজ। সওদাগরী জাহাজ চলাচল আইন প্রশাসনের আওতায় রয়েছে জাহাজগুলির রেজিস্ট্রেশন ও জরিপ, আভ্যন্তরীণ জাহাজগুলি পরিদর্শন ও নাবিক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করতে হয়। নিয়ামক ভূমিকা পালন ছাড়াও জাহাজ চলাচল বিভাগ নাবিক প্রশিক্ষণের এক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এই প্রশিক্ষণ দ্বিতীয় পরিকল্পনা মেয়াদ ধরে চালু থাকবে। এই প্রশিক্ষণ আমাদের অদক্ষ জনশক্তির জন্য উজ্জ্বল সম্ভাবনা গড়ে তুলবে। কারণ কয়েকমাসের এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের পর অদক্ষ জনশক্তি বিদেশী জাহাজগুলিতে আর্থিক দিক থেকে আকর্ষণীয় চাকুরী পাবেন। নাবিকদের প্রশিক্ষণ দান এবং পণ্যভাড়া সংক্রান্ত এক সমীক্ষা পরিচালনার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ১৯৭৯/৮০ মূল্যে ০·৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

বেসামরিক বিমান চলাচল

১৩·৫১ বিমান বন্দর নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, বিমান চলাচলের সুযোগ-সুবিধের ব্যবস্থা এবং বিমাণ পরিবহন পরিচালনা বেসামরিক বিমান চলাচল তৎপরতার অন্তর্ভুক্ত। বেসামরিক বিমান চলাচল উপখাতে উন্নয়ন তৎপরতার ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারী খাতের দুটি প্রতিষ্ঠানের ওপর ন্যস্ত। এগুলি হচ্ছে: (১) বেসামরিক বিমান চলাচল বিভাগ ও (২) বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন। বেসামরিক বিমান চলাচল বিভাগ বিমান বন্দর নির্মাণ, টার্মিনাল সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা, নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদি ও বিমান চালনার সমর্থনমূলক সুযোগ সুবিধে দান ও রক্ষণাবেক্ষণের মত অবকাঠামোমূলক কাজ করে থাকে। বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন বিমান পরিবহন পরিচালনা করে।

বেসামরিক বিমান চলাচল বিভাগ

১৩·৫২ বিমান বন্দর নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা এই বিভাগের মূল কাজ। নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের বড় আকারের ও প্রধান কাজগুলির জন্য এই বিভাগ সরকারী মালিকানাধীন লিমিটেড কোম্পানী বিমান বন্দর উন্নয়ন সংস্থার ওপর নির্ভরশীল ছিল; এই সংস্থা বর্তমান বেসামরিক বিমান চলাচল বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে আটটি বিমান বন্দর আছে। পণ্য ও যাত্রী চলাচল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই বিমান বন্দরগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের দায়িত্ব বেসামরিক বিমান চলাচল বিভাগ পালন করে থাকে। ১৯৭২, ১৯৭৭ ও ১৯৭৮ সালে এই বিমান বন্দরগুলিতে বার্ষিক ফ্লাইট পরিচালনার সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হল:

সারণী ১৩·১৪

বাংলাদেশের বিভিন্ন বন্দরে বার্ষিক ফ্লাইটের মোট সংখ্যা

ক্রমিক নং।	বিমান বন্দরের নাম	ফ্লাইট পরিচালনার সংখ্যা		
		১৯৭২	১৯৭৭	১৯৭৮
১।	ঢাকা	৩৩,৬৮১	৪২,৯৩৩	৩৯,২৩৯
২।	চট্টগ্রাম	৫,৪৪৯	৮,৭০০	১০,৭৮৬
৩।	সিলেট	২,১৫২	২,৪০৪	২,৫৮৯
৪।	ঈশ্বরদি	৭০১	৭৯৪	৭৯১
৫।	যশোর	৩০৬	৩,২৬১	৯,৩০২
৬।	কুমিল্লা	১,৩২৮	২৩০	২৪৮
৭।	ঠাকুরগাঁও	..	৩৪২	৪০৮
৮।	কক্সবাজার	..	৭৩০	৭৫৪

তেজগাঁও এর ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান বিমান চলাচল পরিচালনায় বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে, ১৯৬৫ সালে কুমিটোলায় একটি নতুন আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের নির্মাণ কাজ হাতে নেয়া হয়। এবং ১৯৭৯ সালে সেটি বিমান চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হয়। বিমান বন্দরটি দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে পুরোপুরি চালু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

২৩·৫৩ কৌশল ও কার্যক্রম : বিমানে চলাচলের সুযোগ গ্রহণকারী ব্যক্তিদের আয় বৃদ্ধির ধীর গতির মুখে অত্যন্ত দ্রুত বিমানের ভাড়া বৃদ্ধির ফলে সম্প্রতি কয়েক বছরে আভ্যন্তরীণ রুটে বিমানে যাত্রী ও পণ্য চলাচল কমে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক কারণে তাই, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আর কোন বিমান বন্দর নির্মাণের আবশ্যকতা নেই। আবশ্য, প্রাসঙ্গিক ও অন্যান্য কারণে, রাজশাহীতে একটি বিমান বন্দর নির্মাণ প্রয়োজন। চট্টগ্রাম ও সিলেট বিমান বন্দরে আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের কাজও সমাপ্ত করতে হবে। এ ছাড়া বিমান চলাচলের সহায়তামূলক সুযোগ-সুবিধে ব্যবস্থা সংক্রান্ত চালু প্রকল্পগুলির কাজ চলতে থাকবে। বেসামরিক বিমান চলাচল বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পগুলির জন্য ১৯৭৯/৮০ মূল্যে ১০২·৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই বিভাগের প্রধান কার্যক্রমগুলি হচ্ছে :

(ক) কুমিটোলা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর উন্নয়ন ;
(খ) চট্টগ্রাম বিমান বন্দর উন্নয়ন;
(গ) সিলেট বিমান বন্দর উন্নয়ন;
(ঘ) রাজশাহী বিমান বন্দর উন্নয়ন;
(ঙ) যোগাযোগ সরঞ্জাম ও বিমান চলাচলের সহায়তামূলক সরঞ্জাম সংগ্রহ;
(চ) সিরাপত্তা সার্ভিস ও মোটর যান সংগ্রহ; এবং
(ছ) বাংলাদেশ ফ্লাইং ক্লাবের জন্য প্রশিক্ষণ বিমান সংগ্রহ।

বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন (বিবিসি)

১৩·৫৪ জাতীয় পতাকাবাহী সংস্থা বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুটগুলিতে ফ্লাইট পরিচালনা করে। ঢাকার সংগে ১৯টি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের বিমানের সংযোগ রয়েছে। ছয়টি এফ-২৭ ফোকার ফ্রেন্ডশীপ বিমান ও চারটি বোয়িং-৭০৭ বিমানের বহর নিয়ে বিমান ১৯৭৯/৮০ সালে ০·৬৫ মিলিয়ন যাত্রী বহন করেছে। সাম্প্রতিক কয়েক বছরে আন্তর্জাতিক পথে বিমানের যাত্রী ও পণ্য চলাচল বেশ দ্রুত বেড়ে গেছে। অন্য দিকে অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক রুটে যাত্রী ও পণ্য চলাচল সঙ্কুচিত হয়েছে। সাম্প্রতিক কয়েক বছরে বাংলাদেশ বিমানের যাত্রী পরিবহন নীচে দেয়া হল :

সারণী ১৩·১৫

বাংলাদেশ বিমানের যাত্রী চলাচলের হিসাব

বছর	আভ্যন্তরীণ	আঞ্চলিক	আন্তর্জাতিক	মোট
১৯৭৩/৭৪	৪,০৫,৮৯৬	৭২,২৭৪	১৯,৬৬১	৪,৯৭,৮৩১
১৯৭৪/৭৫	৩,৬৭,৮৭৫	৪৯,০০৪	২৫,৯৬৬	৪,৪২,৮৪৫
১৯৭৫/৭৬	৩,৬৭,২৫১	৫০,২৬৯	৪০,৭৭২	৪,৫৮,২৯২
১৯৭৬/৭৭	৩,৭৩,৭১৬	৩৬,৫৮৩	৬৬,০৯০	৪,৭৬,৩৮৯
১৯৭৭/৭৮	৩,৫৬,৩৩৬	৪৪,০৪১	১,০৪,৪৫৪	৫,০৪,৮৩১
১৯৭৮/৭৯	৩,৬৪,৪৬৫	৪৯,১৬৭	১,৫৩,৭৪০	৫,৬৭,৩৭২
১৯৭৯/৮০	৩,৭৮,৫৫৩	৫৬,৩০৭	২,০৫,৯১৪	৬,৪০,৭৭৪

১৩·৫৫ কৌশল ও কার্যক্রমসমূহ : আন্তর্জাতিক পথে যাত্রী চলাচল বাড়ার প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে বিমান এর বহরের সম্প্রসারণ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিমান তার নিজ বিমানগুলির অবস্থা ও অন্যান্য এয়ারলাইনের ক্রমবর্ধমান তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে ; কেননা অন্যান্য কয়েকটি এয়ারলাইন আধুনিক ও বৃহদাকার বিমান পরিচালনা করবে। এ জন্যই বিমানের বৃহদাকার বিমান সংগ্রহ করা প্রয়োজন হবে। এছাড়াও আঞ্চলিক রুটগুলি জন্য বিমান এর মাঝারি পাল্লার দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট জেট বিমানেরও দরকার হবে। বাংলাদেশ বিমানের পরিচালনার জন্য উন্নততর গ্রাউন্ড রক্ষণাবেক্ষণ ও সহায়তামূলক সরঞ্জামের প্রয়োজন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে উন্নয়ন প্রকল্পগুলির জন্য ১৯৭৯/৮০ মূল্যে ৩৯·৩৫ কোটি টাকার বরাদ্দ করা হয়েছে। বিমানের প্রধান কার্যক্রমগুলি নিম্নরূপ :

(ক) দুটি সুপারসনিক ও দু'টি দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট জেট বিমান সংগ্রহ ;

(খ) সুপারসনিক বিমান ওঠানামার সহায়তার জন্য 'গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং' সরঞ্জাম সংগ্রহ ;

(গ) রক্ষণাবেক্ষণের সুযোগ সুবিধেসহ হ্যাঙ্গার কমপ্লেক্স নির্মাণ ;

(ঘ) ফ্লাইট ক্যাটারিং কেন্দ্র নির্মাণ ; এবং

(ঙ) যোগাযোগ সরঞ্জাম ও অপারেশনাল মোটর যান সংগ্রহ।

সারণী ১৩·১৬

পরিবহন খাতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য স্থিতিমাত্রা ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

ক্রমিক নং।	উপখাত	ইউনিট (একক)	১৯৭৩-এর অবস্থা	জুন ১৯৮০-তে অবস্থা	দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা			১৯৮৫ সালের প্রত্যাশিত অবস্থা।	শতকরা হার পরিবর্তন।
					অতিরিক্ত	বদল	মোট		
১।	**রেলওয়ে :**								
	(ক) ডিজেল ইঞ্জিন	সংখ্যা	১৬২	১৮০	৪৯	৫০	৯৯	২২৯	২৭·২
	(খ) ষ্টীম ইঞ্জিন	সংখ্যা	৩৩৮	২৩০	(ফেজ অফ) (—)	৩৬	..	১৯৪	(—)১৫·৬
	মোট রেল ইঞ্জিনের সংখ্যা		৫০০	৪১০	৪৯	৫০	৯৯	৪২৩	৩·২
	(গ) যাত্রী কোচ	সংখ্যা	১১৯৫	১২৯৩	১৬৪	..	১৬৪	১৪৫৭	১২·৭
	(ঘ) অন্যান্য কোচ	সংখ্যা	৪৭৯	৩৩৮	৬০	..	৬০	৩৯৮	১৭·৮
	(ঙ) মালবাহী ওয়াগন	সংখ্যা	১৬,১০০	১৬,৫২৯	১,৬৭৫	২৮৫	১,৯৬০	১৮,২০৪	১০·১
	(চ) রুট মাইল	মাইল	১,৭৮৬	১,৭৮৬	৫	..	৫	১,৭৯১	০·৩
	(ছ) লাইন বদল	মাইল	—	বিজি		১৯৫*	১৯৫*	..	..
				এমজি		১৬০*	১৬০*	..	..
২।	**সড়ক ও মহাসড়ক :**								
	(ক) পাকা (সড়ক ও জনপথ)	মাইল	২,০০০	২,৫৫৪	১,১২৫*	৭৪৫	১,৮৭০	৩,৬৭৯	৪৪·০
	(খ) সেতু ও কালভার্ট	রানিং ফিট	২০০,০০০	২১০,০০০	৩০,০০০**	১০,০০০	৪০,০০০	২,৪০,০০	১৪·৩
৩।	**সড়ক পরিবহন**								
	(ক) **বাস :**								
	(১) সরকারী (বিআরটিসি)	সংখ্যা	১৪০	৬৭৫	..	১৩০	১৩০	৬৭৫	..
	(২) বেসরকারী	সংখ্যা	৭,০৬০	১০,২৯৪	২,০০০**	..	২,০০০	১২,২৯৪	১৯·৪

সারণী ১৩·১৬ সমাপ্ত।

ক্রমিক নং।	উপখাত	ইউনিট (একক)	১৯৭৩-এর অবস্থা	জুন ১৮৮০-তে অবস্থা	দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা			১৯৮৫ সালের প্রত্যাশিত অবস্থা।	শতকরা হার পরিবর্তন।
					অতিরিক্ত	বদল	মোট		
	(খ) ট্রাক :								
	(১) সরকারী (বিআরটিসি)	সংখ্যা	১০	১১০	..	..	..	১১০	..
	(২) বেসরকারী	সংখ্যা	১১,০৯০	১৬,১১৮	২,৫০০**	..	২,৫০০	১৮,৬১৮	১৫·৫
	(গ) অটোরিকসা	সংখ্যা	৬,৫৩৬	১৫,১৮৮	৫,০০০**	৫,০০০	২০,১৮৮	৩২·৯	..
৪।	অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ :								
	(ক) প্রধান নদী পথগুলির উন্নয়ন	মাইল	৩,২০০	৩,২৪৫	২৫০	..	২৫০	৩,৪৯৫	৭·৭
	(গ) প্রধান ও গৌণ নদীবন্দরগুলির উন্নয়ন।	সংখ্যা	৭	২২	১২	..	১২	৩৪	৫৪·৫
	(গ) লঞ্চঘাট	সংখ্যা	১৫০	২০০	৫০	..	৫০	২৫০	২৫·০
	(ঘ) ড্রেজার	সংখ্যা	৩	৮	..	..	..	৮	..
	(ঙ) নৌযান	সংখ্যা	২২	১৭ (অরীপ নৌযান)	৭	..	৭	২৪	৪১·২
	(চ) প্রধান ফেরী ঘাটসমূহ	সংখ্যা	৫	৫	৩	..	৩	৮	৬০·০
৫।	অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন সংস্থা : (সরকারী ও বেসরকারী)								
	(ক) তেল ট্যাঙ্কার	সংখ্যা	২৩	২৩	৫	৩	৮	২৮	২১·৭
	(খ) কোষার	সংখ্যা	৪৭	৪৪	৫	..	৫	৪৯	১১·৪
	(গ) বার্জ/ফ্লাট/পাটের নৌকা	সংখ্যা	৮২৮	৯১৭	১০০	৮৫	১৮৫	১,০১৭	১০·৯
	(ঘ) স্বয়ংচালিত বার্জ	সংখ্যা	১৫১	২৫২	৫৫	৪০	৯৫	৩০৭	২১·৮
	(ঙ) টাগ	সংখ্যা	১২১	১৭৪	৪০	১৫	৫৫	২১৪	২৩·০
	(চ) এইচ এল লঞ্চ	সংখ্যা	৩১	১৮	..	..	..	১৮	..

(ছ) যাত্রী নৌযান	সংখ্যা	৬২০	৯১৮	২৫৫	৫০	৩০৫	১,১৭৩	২৭·৮
(জ) ফেরী	সংখ্যা	১০	১৭	৪	..	৪	২১	২৩·৫
৬। বন্দর :								
(ক) চট্টগ্রাম বন্দর	জেটি সংখ্যা	১১	১৭ (৪টি পন্টুন জেটিসহ)	..	..	..	১৭	..
(খ) চালনা বন্দর	জেটি সংখ্যা	৫	..	..	..	..	৫	..
৭। সামুদ্রিক জাহাজ চলাচল :								
(ক) মালবাহী জাহাজ	সংখ্যা	৭	১৮	৪	৭	১১	২২	২২·২
(খ) তেল ট্যাঙ্কার	সংখ্যা	..	৩	..	৩	৩	৩	..
(গ) কোষ্টার	সংখ্যা	..	৩	..	..	..	৩	..
(ঘ) যাত্রীবাহী জাহাজ	সংখ্যা	..	১	..	..	..	১	..
৮। বেসামরিক বিমান চলাচল :								
(ক) বিমান বন্দর	সংখ্যা	৮	৮	২	..	২	১০	২৫·০
(খ) বিমান	সংখ্যা	৬	৮	৫	১	৬	১০	৬২·৫

* স্থায়ীভাবে উৎপাদিতগাঁহ

** আনুমানিক রাশি

বেসরকারী বিনিয়োগ

১৩·৫৬ সড়ক ও অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহনের ক্ষেত্রে বেসরকারী খাতের ভূমিকাই প্রধান। বেসরকারী খাত অভ্যন্তরীণ নৌপথের মোট যাত্রী চলাচলের প্রায় ৯০ শতাংশ এবং সড়কে যাত্রী চলাচলের ৮০ শতাংশ পরিবহণ করে। পণ্য চলাচলের ক্ষেত্রে সড়ক পথে বেসরকারী মালিকানাধীন যানবাহন ৯৫ শতাংশ এবং অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন প্রায় ৫০ শতাংশ পরিবহন করে থাকে। সার্ভিসের মূল্য ও নিয়োজিত লোকজনের সংখ্যার দিক থেকেও গোটা পরিবহণ খাতে বেসরকারী খাতেরই প্রাধান্য। নিম্নের সারণীতে বিষয়টি দ্রষ্টব্য :

সারণী ১৩·১৭

১৯৭৯/৮০ সালে পরিবহন সার্ভিসের অনুমানকৃত মূল্য

সংগঠন	সার্ভিসের মূল্য (কোটি টাকায়)	বার্ষিক বেতন সুবিধাদি (কোটি টাকায়)	কর্ম সংস্থান (সংখ্যা)
সরকারী খাত :			
১। বাংলাদেশ রেলওয়ে	৮৭·৭৪	১৭·৮১	৫৮,৯৭৮
২। সড়ক ও জনপথ বিভাগ	—	২·৮০	৫,০০০
৩। বিআরটিসি (বাস ও ট্রাক)	৬·২৩	২·২৬	৪,২৫৭
৪। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন	৬৬·১৫	২·২৯	১,৭১২
৫। বিআইডব্লিউটিসি	১৬·১৯	৩·২৩	৭,৭২৮
৬। বিআইডব্লিউটিএ	৭·৭৬	১·৬৫	৪,৩৪৫
৭। চট্টগ্রাম বন্দর	১৭·৪	২·৬৩	৪,৪৮৮
৮। চালনা বন্দর	৩·৪০	০·৩৫	৬৫০
৯। বাংলাদেশ বিমান	৫৭·৯২	৫·৪৬	৩,৩৮১
উপ-মোট ..	২৬২·৪৩	৩৮·৪৮	৯০,৫৩৯
বেসরকারী খাত (যান্ত্রিক) :			
১। বাস	৬৯·৯৩	৫·০১	৯,৪৪০
২। ট্রাক	১৩২·৮৯	১০·৭৭	১৭,১০০
৩। যাত্রীবাহী লঞ্চ	২৭·৮৯	৭·০২	৮,০০০
৪। পণ্যবাহী নৌযান (কার্গো)	৬·১৮	১·৫৬	২,৭০০
৫। অটো রিকসা	২৭·৫৫	৮·৭৮	৭,৬৯৯
৬। ট্যাক্সি	২·৬৮	০·৪৫	৫০০
উপ-মোট ..	২৬৭·১২	৩৩·৫৯	৪৫,৪৩৯
অযান্ত্রিক ও গ্রামীণ :			
১। রিক্সা	১২৮·৬৩	৭২·০০	১,২০,০০০
২। ঠেলাগাড়ী	১৭·৯১	১১·২৮	১৫,০৪২
৩। দেশী নৌকা	১৫৬·৮৬	৭৯·০২	৩,৮৭,০০০
৪। গরুর গাড়ী	১৯·৪৩	৮·১৬	১৩,৩৫০
উপ-মোট ..	৩২২·৮৩	১৭০·৪৬	৫,৩৫,০৯২
সর্বমোট ..	৮৫২·৩৮	২৪২·৫৩	৬,৭১,০৭০

সূত্র : "ষ্টাডি অন ট্রান্সপোর্ট কনস্ট্রাকশন এ্যান্ড সার্ভিসেস" ১৯৭৮, পরিকল্পনা কমিশন

১৩·৫৭ ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত পরিবহন খাতে বড় আকারের বেসরকারী উদ্যোগ নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। তখন অভ্যন্তরীণ নৌযানের আকারের ভিত্তিতে বেসরকারী মালিকানায় বিধিনিষেধ ছিল। ফলে আলোচ্য সময়ে এই খাতে বেসরকারী পুঁজি বিনিয়োগ ছিল খুব সামান্য ১৯৭৫ সালের পর সড়ক ও নৌ-পরিবহনের বেসরকারী তৎপরতার প্রতি অনুসৃত নীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে। নৌযানের আকার ভিত্তিতে বেসরকারী মালিকানার ওপর যে বিধিনিষেধ ছিল তা ক্রমান্বয়ে উদার করা হয় এবং শেষাবধি মূলধন বিনিয়োগে নির্ধারিত আর্থিক সিলিং প্রত্যাহার করা হয়। সড়ক পরিবহনের বেলাতেও সমবায়ের মাধ্যমে মোটর যানের মালিকানার শর্তও তুলে দেয়া হয়েছে। সামুদ্রিক জাহাজের ক্ষেত্রটি এ পর্যন্ত বেসরকারী নিয়োগের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। এখন বেসরকারী খাতের জন্য ও সামুদ্রিক জাহাজের মালিকানা ও পরিচালনা উন্মুক্ত। এসব নীতি উদার করার সুফল মাত্র কিছুকাল ধরে বুঝা যেতে শুরু করেছে। গোড়ার দিকে বেসরকারী খাতে নৌ ও সড়ক পরিবহন তাৎপরতার ক্ষেত্রে আরোপিত নিয়মকানুন ও বিধি নিষেধের প্রতিক্রিয়া এবং পরবর্তীকালে নীতি পরিবর্তনের ফলাফল নিম্নবর্ণিত সারণীতে প্রদত্ত ১৯৭৩—৭৯ সালে বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ পরিস্থিতি থেকে বুঝা যাবে:

সারণী ১৩·১৮

সড়ক পরিবহন ও অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহনে বেসরকারী বিনিয়োগ

[কোটি টাকায়]

যানবাহনের প্রকার ভেদ	১৯৭৩/৭৪	১৯৭৪/৭৫	মোট	১৯৭৫/৭৬	১৯৭৬/৭৭	১৯৭৭/৭৮	১৯৭৮/৭৯	মোট
১। অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন	১·২	৩·৭	৪·৯	৯·৮	১০·৫	১১·৮	৩১·৭	৬৩·৮
২। সড়ক পরিবহন	২৩·৫	১৫·৩	৩৮·৮	২১·০	৩০·৮	৬২·০	৫২·৬	১৬৬·৪
মোট ..	২৪·৭	১৯·০	৪৩·৭	৩০·৮	৪১·৩	৭৩·৮	৮৪·৩	২৩০·২

সূত্র : বিটিএস আপডেটেড রিপোর্ট (পৃ: ৬৬, বালাম-২, খণ্ড-২)

১৩·৫৮ নৌ ও সড়ক পরিবহন সংক্রান্তের মালিকানার মধ্যেও বেসরকারী খাতের ভূমিকা প্রতিফলিত। ১৯৭৯ সালে ২০টি সাগরগামী দেবার উপযোগী পণ্যবাহী নৌযান, ৭টি তৈলবাহী ট্যাঙ্কার, ২৪৩টি আভ্যন্তরীণ পণ্যবাহী নৌযান, ৫৪১টি ডাম্বক্যাফট, ১১৩টি টাগবোট ইউনিট, ৪০টি দ্বিতল যাত্রীবাহী নৌযান, ১০,৩০০ বাস ও ১৬,১০০ ট্রাক প্রভৃতি যানবাহন বেসরকারী মালিকানাধীন ছিল।

দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রাসমূহ

১৩·৫৯ পুনঃস্থাপন, চলাচল বৃদ্ধি ও সরকারী যানবাহন পরিচালন নীতি ইত্যাদির ওপর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আমলে পরিবহণের ক্ষেত্রে বেসরকারী বিনিয়োগের পরিসর নির্ভর করবে। খাদ্য শস্য আমদানী কমবে বলে যে ধারণা করা হয়েছে তাতে পণ্য ভাড়া খাতে যে আয় হ্রাস পাবে তা খাদ্য উদ্বৃত্ত জেলাগুলি থেকে খাদ্য ঘাটতি জেলাগুলিতে অপেক্ষাকৃত কম দূরত্বের মধ্যে খাদ্য শস্যের পরিবহনের দরুণ তা পূরণ হয়ে যাবে। এ ছাড়াও, কৃষি উপকরণের বর্ধিত চলাচলের দরুণ বেসরকারী পরিবহনের চাহিদা অতিরিক্ত বাড়বে। পণ্য ও যাত্রী চলাচল সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বেসরকারী বিনিয়োগ ১৯৭৯/৮০ মূল্যে ৯৭৬ কোটি টাকা হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। অবশ্য বেসরকারী বিনিয়োগের প্রকৃত পরিমাণ প্রধানতঃ নীতিগত ব্যবস্থাদির মাধ্যমে বিনিয়োগ স্তর উৎসাহিত করার ওপর নির্ভর করবে।

সেগুলি হচ্ছে:

(ক) বেসরকারী খাতের বিনিয়োগ প্রধানতঃ সড়ক, বন্দর নৌপথ ও ঘাটসহ অবকাঠামোমূলক খাতে সরকারী বিনিয়োগের ওপর নির্ভরশীল। এজন্য সরকারী খাতের নির্মাণ কার্যক্রমগুলি যাতে সময়মত বাস্তবায়িত হয় সেজন্য যথোপযুক্ত মনোনিবেশ করতে হবে।

(খ) একটা আর্থিক সাশ্রয় মূল্যে মোটরযান ও খুচরা যন্ত্রাংশের সহজ প্রাপ্তির ওপরই প্রধানতঃ বেসরকারী খাতের সম্প্রসারণ বা গঠন নির্ভরশীল। সড়কের যানবাহনের জন্য প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ ও অভ্যন্তরীন নৌযানের জন্য শিপ ইয়ার্ড/ডকইয়ার্ডগুলিতে সম্ভাব্য অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর উপযোগী সকল সুযোগ সুবিধে দিয়ে সজ্জিত করতে হবে।

(গ) মোটর যানবাহন ও নৌযানের বন্ধকের ওপর বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি থেকে বর্তমানে ঋণ প্রদানের যে ব্যবস্থা আছে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালেও তা চালু রাখতে হবে।

(ঘ) পরিবহন সরঞ্জাম ও খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানীর প্রতিকূল রাজস্বগত বৈষম্য দূর করতে হবে।

(ঙ) বেসরকারী নৌ ও সড়ক যান পরিচালনার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র খেয়াল খুশি অনুযায়ী ভাড়া নির্ধারণ করা বন্ধ রাখার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পরও পরিচালনা খরচ ও সেই সাথে একটা ন্যায় সঙ্গত হারে মুনাফা স্থির করে যাতে ভাড়ার কাঠামো নির্ধারণ করা যায় সেজন্য যথেষ্ট নমনীয়তারও ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(চ) অটোমোবিলের ইঞ্জিন, নৌযানের ইঞ্জিন, খুচরো যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের স্থানীয়ভাবে উৎপাদন উৎসাহিত করতে হবে এবং অভ্যন্তরীণ সাজসরঞ্জাম কেনার জন্য পর্যাপ্ত ঋণ সুবিধে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য বিভিন্ন প্রকার যানবাহনের জন্য কিছুটা মান নির্ধারণেরও প্রয়োজন দেখা দেবে।

(ছ) সড়কে নিরাপত্তার জন্য বর্তমানে প্রচলিত ভারী ট্রাক ও ট্রেলারের পরিবর্তে মাল্টি এ্যাক্সেল মোটর ট্রেলার ইত্যাদি প্রবর্তন করতে হবে। এজন্য উপযুক্ত নীতি ব্যবস্থাদিও বিবেচনা করতে হবে।

(জ) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সড়ক নির্মাণে যথেষ্ট বিনিয়োগ করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে এই বিনিয়োগের আওতায় মহাসড়ক, রাস্তার ধারের রেষ্টহাউজ, রেস্তরা এবং পেট্রল পাম্প ও সার্ভিস ষ্টেশন উন্নয়নেও ব্যয় করা হবে।

(ঝ) বহু লঞ্চ ঘাট, বিশেষ করে শঙ্খনদী পাড়ে অবস্থিত লঞ্চঘাটগুলিতে যাত্রী ও পণ্য ওঠানামার ন্যূনতম সুযোগ সুবিধে বিধানের জন্য সেগুলির মান উন্নতিবিধান করতে হবে।

খ। যোগাযোগ

১৩.৬০ ডাক, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন সার্ভিস (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক), দেশের অভ্যন্তরে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সার্ভিসের ব্যবস্থা এবং বিদেশে বাংলাদেশ মিশনগুলির সঙ্গে বেতার যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার সাথে যোগাযোগ খাতের সম্পর্ক রয়েছে। ঐতিহাসিক দিক থেকে অন্যান্য সামাজিক সার্ভিসের চেয়ে এই খাত তুলনামূলকভাবে কম অগ্রাধিকার পেয়েছে। স্বাধীনতার পরই কেবল এই খাতটি জাতীয় গুরুত্ব সম্পন্ন খাত হিসেবে দেখা দিয়েছে এবং জাতীয় পরিকল্পনাগুলিতে এ খাতটিকে একটা বিশিষ্ট স্থান দেয়া হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্যগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য পর্যালোচনা

১৩.৬১ **টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন:** ১৯৭৩/৭৪ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সূচনাকালে দেশে টেলিফোন লাইনের মোট সংখ্যা ছিল ৬৬,০০০। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৭০,০০০ লাইন স্থাপনের

লক্ষ্য মাত্রা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ৩৭,০০০ লাইন বসানো সম্ভব হয়। ফলে লক্ষ্য মাত্রার মাত্র ৫৩ শতাংশ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে এই ঘাটতি হয়েছে প্রধানতঃ সম্পদের অপ্রতুলতা, মূল্য বৃদ্ধি ও নির্মাণ সামগ্রীর অভাব ইত্যাদি কারণে। দেশের অভ্যন্তরে দীর্ঘ দূরত্বের টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন নেটওয়ার্কের উন্নয়ন এবং টেলিভিশন অনুষ্ঠান সম্প্রচারের সুবিধে করে দিবার জন্য ঢাকা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সিলেট ও ঢাকা-টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ-রংপুর উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মাইক্রোওয়েভ যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্মাণ সম্পূর্ন করে সেগুলো চালু করা হয়। কয়েকটি জেলা সদর ও আশে পাশের মহকুমা শহরগুলির মধ্যে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মাইক্রোওয়েভ যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করার কাজ এগিয়ে চলছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দ্বিতীয় বছরের শেষ নাগাদ এটি সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা হয়েছিল। কয়েকটি জেলা ও মহকুমা শহরে স্পার সংযোগের কল্যাণে টেলিযোগাযোগ সুবিধে দেওয়ার কাজও চলছে। এই যোগাযোগের কিছু কিছু অংশ চালু হয়েছে এবং অবশিষ্ট অংশ দ্বিতীয় পরিকল্পনার দ্বিতীয় বছরে শেষ হবে বলে আশা করা হয়েছিল। বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে চট্টগ্রামের বেতবুনিয়াতে একটি ভূ-উপগ্রহ ষ্টেশন স্থাপন করা হয়। ভারত মহাসাগরের ওপর মহাকাশে স্থাপিত যোগাযোগ উপগ্রহের সঙ্গে এই ষ্টেশনটি কাজ করে। ১৯৭৫ সালে ষ্টেশনটি চালু করা হয়। গোটা প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও সেইসঙ্গে দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের সামগ্রিক সাফল্য পরিশিষ্ট ১-এ দেয়া হয়েছে।

১৩.৬২ **ডাকঘরঃ** ১৯৭৩/৭৪ সালের গোড়ার দিকে দেশে ৬,৬৮০টি ডাকঘর ছিল। ১৯৭৩-৭৮ মেয়াদে ৩,৭২৫টি নতুন ডাকঘর স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। কিন্তু বাস্তবে মাত্র ৪১২টি নতুন ডাকঘর চালু করার ফলে ১৯৭৭/৭৮ সালে ডাকঘরের মোট সংখ্যা ৭,০৯২ এ উন্নীত হয়। ডাক বিলি ও পরিবহনের জন্য মোট ৪৬টি মোটরযান কেনা হয় এবং কাজে লাগানো হয়। এছাড়া প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ৭৪টি নতুন ডাকঘর ভবন এবং ডাক কর্মচারীদের জন্য ১৬৪টি আবাসিক কোয়ার্টার নির্মাণ করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় ডাকঘর উপখাতে সামগ্রিক সাফল্যের বিবরণ পরিশিষ্ট—২ এ দেওয়া হয়েছে।

১৩.৬৩ **আবহাওয়াতত্ত্বঃ** আবহাওয়াতাত্ত্বিক সার্ভিসের জন্য প্রথম পরিকল্পনা মেয়াদে ৮টি প্রথম শ্রেণীর মানমন্দির, ২টি পাইলট বেলুন মানমন্দির (4 Rawin Sonde observatories) এবং ৪টি বিমান চলাচল সংক্রান্ত পূর্বাভাস রান কেন্দ্র এবং দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় ৯টি প্রথম শ্রেণীর মানমন্দির ও ৪টি পাইলট বেলুন মানমন্দির স্থাপন করা হয়। সারণী ১৩·২১এ এগুলির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

সারণী ১৩·২১

আবহাওয়াতাত্ত্বিক স্থাপনাসমূহ

স্থাপনার নাম	১৯৭২/৭৩ এর অবস্থা	প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য (সংখ্যা)	১৯৭৭/৭৮ এর অবস্থা	দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য	১৯৭৯/৮০ এর অবস্থা (সংখ্যা)
১। খন্ডকালীন মানমন্দির	১২	..	১২	(—)৩+৩	৬
২। প্রথম শ্রেণীর মানমন্দির	১১	৮	১৯	৭+৩	২৯
৩। পাইলট বেলুন মানমন্দির	৯	২	৮	৪	১২
৪। রাবিন সঁদ মানমন্দির	১	৪	৫	..	৫
৫। (ক) বায়ু সন্ধানী রাডার	১	১	১	১	২
(খ) আবহাওয়া রাডার	২	..	১	১	৩

স্থাপনার নাম	১৯৭২/৭৩ এর অবস্থা	প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরি-কল্পনারসাফল্য (সংখ্যা)	১৯৭৭/৭৮ এর অবস্থা	দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য	১৯৭৯/৮০ এর অবস্থা (সংখ্যা)
৬। ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র	১	..	১		১
৭। প্রথম আবহাওয়া অফিস	২	..	২		২
৮। অধীনস্থ আবহাওয়া অফিস	১	..	১	১	২
৯। সম্পূরক আবহাওয়া	১	..	১	৩	৪
১০। এ্যাগ্রোমেট মাপনির	৩	৪	৭	১	৮
১১। স্বয়ংক্রিয় চিত্র প্রেরণ (ভূ-প্রাথিক কেন্দ্র)	১	..	১		১
১২। দূর রেকর্ডিং	১	..	১		১
১৩। জোয়ার মাপনমন্দির	৩	..	৩		৩
১৪। ভূকম্পন মাপনমন্দির	১	..	১		১
১৫। ভূ-চৌম্বক মাপনমন্দির	১	..	১		১

১৩·৬৪ **পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ঃ** ৪০টি দেশে বাংলাদেশের ৪৫টি আবাসিক মিশন আছে। লন্ডন, নয়াদিল্লী ও কোলকাতা এই তিন মিশনের সঙ্গে সরাসরি টেলেক্স যোগাযোগ এবং ২৪টি মিশনের সঙ্গে কলবুকিং এর মাধ্যমে টেলেক্স সংযোগ আছে। বাকী ১৮টি মিশনের কোন টেলেক্স সংযোগ নেই। অবশ্য জরুরী পরিস্থিতিতে টেলেক্স যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্ভরযোগ্য নয়। সরাসরি বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থাই স্বাধীন, নিরাপদ, দ্রুত ও দক্ষ যোগাযোগের নিশ্চয়তা দেয়। এজন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যেই ঢাকা ও লন্ডনে দু'টি বেতার টেলিযোগাযোগ ষ্টেশন স্থাপনের কাজ হাতে নিয়েছে। দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় পিকিং, নয়াদিল্লী ও রেঙ্গুনে আরও তিনটি ষ্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।

১৩·৬৫ পরিশিষ্ট ৩-এ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনাকালের সাফল্য আর্থিক বিবরণের আকারে দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, কার্যক্রম ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

১৩·৬৬ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সংস্থা ওয়ারী উদ্দেশ্য লক্ষ্যমাত্রা ইত্যাদি নিম্নে বর্ণনা করা হয়েছে।

ক। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন

১৩·৬৭ দেশে বেশী সংখ্যক টেলিফোন থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও প্রতি একশত লোকের জন্য ০·১৩টি করে মাত্র টেলিফোন আছে। ১৯৭৯/৮০ সালে টেলিফোন এক্সচেন্জ লাইনের সংখ্যা ছিল ১,২০,০১৭টি। ১৯টি জেলা সদর ও ৩৭টি মহাকুমার সংক্রিয় এক্সচেন্জ রয়েছে। বাকী জেলা ও মহকুমাগুলিতে এখনও ম্যানুয়াল এক্সচেন্জ ব্যবস্থা রয়েগেছে। ১৯৭৯/৮০ মেয়াদের শেষ নাগাদ মোট ৪৭৩টি থানা, ৫৩০টি ইউনিয়ন পরিষদ এবং ১০০টি পল্লী প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র স্বয়ংক্রিয়, ম্যানুয়াল বা পিসিও ব্যবস্থা দ্বারা সংযুক্ত হয়েছে। ১৯৭৯/৮০ মেয়াদের শেষ নাগাদ দেশে ৪৮৮টি টেলিগ্রাফ অফিস, ১৮টি এসটিডি সংযোগ এবং ১৫,১৫৫টি পিবিএক্স/পিএবিএক্স লাইন এবং ৪১০টি টেলেক্স/জেনটেক্স লাইন হয়েছে। (পরিশিষ্ট ৪—এ বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে)। পল্লী অঞ্চলে টেলিফোনের ঘনত্ব দেশের মোট ক্ষমতার মাত্র ৮·৪১ শতাংশ। এই উপাত্ত দেশের সহরাঞ্চলে শত জন প্রতি ১·২২টি টেলিফোনের তুলনায় মাত্র ০·০১ শতাংশ। দেশের

টেলিগ্রাফ সার্ভিসও অত্যন্ত অপর্যাপ্ত। ১৯৭৯/৮০ সাল পর্যন্ত মাত্র ৪৮৮টি টেলিগ্রাফ অফিস ছিল। এগুলি ৩৬০টি আবার পল্লী এলাকায় অবস্থিত ট্রাঙ্ক, এসটিডি ও টেলিগ্রাফ সার্কিটসহ অভ্যন্তরীণ দীর্ঘ দূরত্বের সার্কিট সংখ্যা ১৯৭২/৭৩ সালের ৪৬৭ থেকে ১৯৭৯/৮০তে ১,৫৭০এ বৃদ্ধি পেয়েছে। উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর বিদেশের সংগে টেলিযোগাযোগের ও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এবং ১৯৭৯/৮০ সাল নাগাদ টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ও টেলেক্স সার্কিটের সংখ্যা যথাক্রমে ১,৮২৯ ও ১৯এ উন্নীত হয়েছে।

১৩·৬৮ উল্লিখিত পরিস্থিতির উন্নতি এবং অর্থনীতির সকল খাতে টেলিফোন সার্ভিসের তীব্র প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ৫৫,০০০ টেলিফোন লাইন বসানো হবে। এর ফলে শত জন প্রতি টেলিফোন ঘনত্ব ০·১৭-এ উন্নীত হবে এবং এতে পল্লী এলাকার অংশও তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেড়ে যাবে। সকল জেলা সদর, সকল মহাকুমা ও কয়েকটি থানায় স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ চালু হবে। অধিকাংশ জেলা ও কয়েকটি মহাকুমা সহর শক্তিশালী মাইক্রোওয়েভ অথবা ইউ এইচ এফ (আলট্রা হাই ফ্রিকোয়েন্সী) দ্বারা সংযুক্ত হবে এবং এসব টেলিযোগাযোগ সংযোগে চ্যানেলিং ক্ষমতা বাড়ানো হবে যাতে তা বর্দ্ধিত টেলিযোগাযোগের চাহিদা মেটাতে সমর্থ হয়। স্বয়ংক্রিয়, ম্যানুয়াল বা পিসিও ব্যবস্থা দ্বারা ৩০০ ইউনিয়ন পরিষদ ও ১০০ পল্লী প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রকে সংযুক্ত করা হবে। পল্লী এলাকাগুলি ২০০ পাবলিক কল অফিসে, বড় বড় শহরের বহু সংখ্যক কয়েক বক্স, ৩২টি স্থানে গোটা দেশভিত্তিক ট্রাঙ্ক ডায়ালিং সুযোগ-সুবিধে, ৫০০ দীর্ঘ দূরত্বের সার্কিট (আভ্যন্তরীণ), ৫০টি বৈদেশিক সার্কিট, ৫০টি টেলিগ্রাফ অফিস, ৫,০০০ পিবি এক্স/পিএবিএক্স লাইন এবং ৫০০ টেলেক্স/জেনটেক্স লাইনের ব্যবস্থা করা হবে এই পরিকল্পনা মেয়াদে। দেশের বর্তমান টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে ঢাকায় ৫,০০০ লাইনের ইলেকট্রনিক কনসেনট্রেটরসহ ১০,০০০ লাইনের ইলেকট্রনিক এক্সচেঞ্জ বসানো হবে এবং ধীরে ধীরে গোটা ব্যবস্থায় ইলেকট্রনিক সুইচিং প্রযুক্তি প্রবর্তন করা হবে। টেলিফোনের সুযোগ-সুবিধে বাড়ানোর ক্ষেত্রে পল্লী এলাকাগুলির কথাও বিশেষভাবে বিবেচিত হয়েছে। আরও বেশী এলাকাকে টেলিফোন সুবিধের আওতায় আনার প্রতি যথাযথ লক্ষ রেখে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে টেলিফোন সুবিধে নিয়ে যাওয়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। ৫৫,০০০ টেলিফোন লাইনের মধ্যে ৪৫,০০০ লাইন শহরাঞ্চলে এবং ১০,০০০ লাইন গ্রামাঞ্চলে বসানো হবে। এর ফলে পল্লী এলাকায় টেলিফোনের অংশ বর্তমানের ৮·৪১ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯৮৪/৮৫ সাল নাগাদ প্রায় ১২ শতাংশ হবে। পরিশিষ্ট ৪-এ বর্তমান পরিস্থিতি ও লক্ষমাত্রার বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে।

১৩·৬৯ স্বয়ংক্রিয় আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জ বসিয়ে ও ক্ষমতা বাড়িয়ে বৈদেশিক টেলিযোগাযোগ সার্ভিসের উন্নতি বিধান করা হবে। স্থানীয় টেলিফোনের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেশের সঙ্গে টেলিযোগাযোগ সার্কিটের চাহিদা বাড়বে। এজন্য, বেতবুনিয়ায় বর্তমান ভূ-উপগ্রহ যোগাযোগ ষ্টেশনের সম্প্রসারণ করা হবে এবং আরও বেশী দেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য আরও চ্যানেল যোগ করা হবে। ভারত মহাসাগরের উর্ধাকাশে ইনটেলস্যাট-৫ কৃত্রিম যোগাযোগ উপগ্রহ উৎক্ষেপণের পর এর সঙ্গে কাজ করার সুবিধের জন্য বেতবুনিয়া ভূকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংযোজন (Feed Modification) করা হবে। এছাড়াও ঢাকার কালিয়াকৈরে ২৪ চ্যানেল ক্ষমতার একটি আদর্শবি 'টাইপ' ভূ-কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এই ভূকেন্দ্রটি যেসব দেশে 'এ টাইপ' ষ্টেশন নেই তেমন কয়েকটি দেশের সঙ্গে 'এসসিপিসি' পদ্ধতির যোগাযোগ স্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গে জরুরী পরিস্থিতিতে প্রধান ষ্টেশনের বিকল্প হিসেবে কাজ করবে।

১৩·৭০ জটিল ও অত্যাধুনিক টেলিগ্রাফ ও টেলিগ্রাফ সরঞ্জামের উপযুক্ত ও দক্ষ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন কর্মচারীদের বর্তমানে যে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা রয়েছে তা পর্যাপ্ত নয়; প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের সংখ্যাও সীমিত। বর্তমানে ঢাকা ও খুলনায় দুটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে যেগুলি আংশিক সমাপ্ত। এগুলিতে কেবলমাত্র সীমিত সংখ্যক কর্মচারীর প্রশিক্ষণ সম্ভব। এই কেন্দ্র গুলিতে এমনকি, আগের কর্মচারীদেরকেও প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, কারণ, টেলিফোন সার্ভিসের সম্প্রসারণ ও গত কয়েক বছরে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অ-স্থানীয় ব্যক্তিদের ব্যাপকহারে দেশ ত্যাগের কারণে সৃষ্ট শূণ্যস্থান পূরণে নতুন অনেক কর্মচারী নিয়োগে চাপের সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বর্তমান প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটগুলির সম্প্রসারণ করা হবে এবং পরিস্থিতির উন্নতি সাধনের জন্য বগুড়ায় আরও একটি কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। প্রতি বছর অফিসারদের নিয়মিত ও রিফ্রেশার কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য একটি ষ্টাফ কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

টেলিযোগাযোগ কারখানাসমূহ

১৩·৭১ বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ডের চাহিদা মেটাতে উৎপাদন ব্যয়মূল্যে টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম ও কেব্‌ল সরবরাহের জন্য টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন উপখাতের অংশ হিসেবে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ডাক ও তার ডিভিশনের আওতায় দুটি কারখানা চালু রয়েছে। এই কারখানাগুলির বর্তমানে উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধে ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের উৎপাদন সূচী নিম্নে বর্ণিত হল :

১৩·৭২(১) **টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড :** এক শিফটে এই কারখানার নির্ধারিত বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ২০,০০০ লাইন এক্সচেঞ্জ ইউনিট ও ৩০,০০০ টেলিফোন সেট। সারণী ১৩·২৪তে এই কারখানা প্রতিষ্ঠার পর থেকে উৎপাদ দেখানো হয়েছে :

সারণী ১৩·২৪

টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড-এর উৎপাদন বিবরণী

বছর	টেলিফোন এক্সচেঞ্জ		টেলিফোন সেট	
	উৎপাদন (লাইন ইউনিট	২০ হাজার লাইনের নিরূপিত ক্ষমতার %	উৎপাদন নং	৩০,০০০ সেটের ক্ষমতার %
১৯৬৯/৭০	৩৯০	১·৯০	..	..
১৯৭০/৭১	২৭০০	১৩·৫০	..	..
১৯৭১/৭২	১৭০০	৮·৫০	..	..
১৯৭২/৭৩	১৮১৫	৯·০৪	..	..
১৯৭৩/৭৪	৪১০০	২০·৫০	৮৬০	২·৮৭
১৯৭৪/৭৫	৫২৫০	৭৬·২৫	৩৩৭৫	১১·২২
১৯৭৫/৭৬	১৩৭৪৯	৬৪·৭০	৬১৫০	২০·৫০
১৯৭৬/৭৭	১৪৬০০	৭৩·০০	১৪০০০	৪৬·৬৭
১৯৭৭/৭৮	১৬১৮০	৮০·৯০	২৪০০০	৮০·০০
১৯৭৮/৭৯	১৩৭০০	৬৪·৫০	১৭৯৪৩	৫৯·৮১
১৯৭৯/৮০	৯৪৬০	৪৭·৩০	১৩৭৯৫	৪৫·৯৮

১৩·৭৩ দেখা যায়, ১৯৭২/৭৩ সালের টেলিফোন এক্সচেঞ্জ উৎপাদন ক্ষমতা ৯·০৮ শতাংশ বেড়ে ১৯৭৭/৭৮ সালে ৮০·৯০ শতাংশ এবং ১৯৭৩/৭৪ সালের টেলিফোন সেট উৎপাদন ক্ষমতা ২·০৭ শতাংশ থেকে ১৯৭৭/৭৮ সালে ৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনাকালে কিছু সাংগঠনিক কারণে উৎপাদন হ্রাস পায়। তবে সে সমস্যা কেটে গেছে। এখন আশা করা যায়, ১৯৮০/৮১ সাল থেকে কারখানার সর্বাধিক উৎপাদন শুরু হবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উৎপাদন যথাসম্ভব বৃদ্ধি করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে কারখানার সম্প্রসারণ ও সামঞ্জস্য বিধানের একটি প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হবে। এর ফলে বর্তমানে বিদেশ থেকে আমদানী হচ্ছে এমনকিছু যন্ত্রাংশ, ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি এই কারখানায় উৎপাদন শুরু করা সম্ভব হবে। এ ছাড়াও স্বল্পমেয়াদী রোগ্য উপকরণ উৎপাদনের কাজও হাতে নেওয়া হবে। সুইচিং এর কন্ট্রোল পদ্ধতির দ্রুত উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান ইএমডি ইলেকট্রোমেকানিক্যাল পদ্ধতি অচল হয়ে পড়ছে বলে পল্লী ও ক্ষুদ্রতর ক্ষমতাসম্পন্ন এক্সচেঞ্জ এবং বর্তমান সংস্থাগুলির যন্ত্রাংশের চাহিদা পূরণের জন্য ইএমডি ইলেকট্রোমেকানিক্যাল সরঞ্জাম উৎপাদন অন্ততঃ কিছুকালের জন্য বজায় রাখার পাশাপাশি পরিকল্পনায় এই কারখানাটিকে ইলেকট্রনিক সুইচিং পদ্ধতির কারখানায় রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা রয়েছে। ইলেকট্রনিক কারখানায় একচেঞ্জ সরঞ্জাম উৎপাদনের এবং রেডিও, টেলিভিশন ও ইলেকট্রনিক গ্যাজেটের জন্য অন্যান্য স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যেও ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ উৎপাদিত হবে।

১৩·৭৪ (২) বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিমিটেড : কারখানার প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন ক্ষমতা বছরে ২,২৫,০০০ কণ্ডাক্টর কিলোমিটার। নিম্নের সারণীতে ১৩·২৫ এ শুরু থেকে এ পর্যন্ত উৎপাদনের হিসেব দেওয়া হয়েছে।

সারণী ১৩·২৫

টেলিফোন কেব্‌ল-এর উৎপাদন

বছর	উৎপাদনের পরিমাণ কণ্ডাক্টর কিলোমিটার	২,২৫,০০০ কণ্ডাক্টর কিলো-মিটারের নিরূপিত ক্ষমতার %
১৯৭১/৭২	৯,৯২৩	৪·৪১
১৯৭২/৭৩	৬৬,০৪৩	২৯·৩৫
১৯৭৩/৭৪	৬৯,১৪০	৩০·৭২
১৯৭৪/৭৫	১,২২,০০০	৫৪·২২
১৯৭৫/৭৬	১,৩৩,০০০	৫৯·১১
১৯৭৬/৭৭	১,৫৮,০০০	৭০·২২
১৯৭৭/৭৮	১,৯০,০০০	৮৪·৪৪
১৯৭৮/৭৯	২,০৩,০০০	৯০·২২
১৯৭৯/৮০	২,২৫,০০০	১০০·০০

১৩·৭৫ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম বছরে কারখানার সামঞ্জস্যবিধান ও আধুনিকীকরণ চালু প্রকল্প সম্পূর্ণ হবে। কারখানার সম্প্রসারণ ও বহুমুখীকরণের একটি নতুন প্রকল্প হাতে নেয়া হবে। এর লক্ষ্য, আড়াই শিফট কাজের ভিত্তিতে কারখানার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা

৩,৬৫,০০০ কণ্ডাক্টর কিলোমিটার এবং তিন শিফটের কাজের ভিত্তিতে ৪,০০,০০০ কণ্ডাক্টর কিলো-মিটারের উৎপাদন বৃদ্ধি। কারখানার এই সম্প্রসারণের ফলে দেশ শুধু বহিঃ ও আন্তঃ টেলিযোগাযোগ কেব্‌ল, জাংশন কেবল ও গ্যালভানাইজড লোহার তার উৎপাদনের স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে তাই নয়, কারখানা রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন করতে সক্ষম হবে।

খ। বাংলাদেশ ডাকঘর

১৩·৭৬ বর্তমানে প্রতি ১১,০০০ লোকের জন্য মাত্র একটি করে ডাকঘর আছে। আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী প্রতি ৬০০০ লোকের জন্য একটি করে ডাকঘর থাকা প্রয়োজন। এই পরিস্থিতির উন্নতির জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ডাকঘরের সংখ্যা আরোও ৭০০ বৃদ্ধির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে ৬৫০টি ডাকঘর পল্লী এলাকায় খোলা হবে।

বর্তমানে ৭,২৯২টি ডাকঘরের মধ্যে ১,১২০টি ডাকঘর ডাকবিভাগ সরাসরি পরিচালনা করে। আর বাকী ৬,১৭২টি ডাকঘর পল্লী এলাকার লোকজন পরিচালনা করে একটা নির্ধারিত ভাতার বিনিময়ে। অধিকাংশ ডাকঘর নির্ধারিত মান থেকে নিম্নমানের ভাড়া করা ঘরে অবস্থিত। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ডাকঘরের ৯৫টি ভবন এবং ৪০০টি আবাসিক কোয়ার্টার নির্মাণের ব্যবস্থা রয়েছে। এডাড়া, পরিকল্পনা-মেয়াদে ডাক বিলি ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন ধরণের ৫৫টি মোটর গাড়ী সংগ্রহ করা হবে। ডাক ব্যবস্থার যান্ত্রিকীকরণের জন্য বিভিন্ন ধরণের ১৫০টি মেশিনও কেনা হবে। ডাকঘরের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরণের সীলমোহর উৎপাদনের জন্য একটি ওয়ার্কশপ স্থাপনও এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। সারণী ১৩·২৬-তে বর্তমান পরিস্থিতি ও লক্ষ্য মাত্রাগুলি বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো:

সারণী ১৩·২৬

ডাকঘর উপখাতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বর্তমান অবস্থা ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বিবরণী

বিষয়	১৯৭৭/৭৮ এর পরিস্থিতি	১৯৭৯/৮০ এর পরিস্থিতি	দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য মাত্রা (১৯৮০-৮৫)	১৯৮৪/৮৫ সালে প্রস্তাবিত অবস্থা
১। পোষ্ট অফিস (সংখ্যা)	৭,০৯২	৭,২৯২	৭০০	৭,৯৯২
২। পোষ্ট অফিসের ভবন (সংখ্যা)	৪০১	৪৪৭	৯৫	৫৪২
৩। আবাসিক ভবন (সংখ্যা)	১,৪০০	১,৬০০	৪০০	২,০০০
৪। মোটর গাড়ী (সংখ্যা)	৮০	১২৪	৫৫	১৭৯
৫। বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি (সংখ্যা/সেট)	৪৯	১৫০	১৫০	৩০০

গ। আবহাওয়া বিভাগ

১৩·৭৭ আবহাওয়া বিভাগীয় তৎপরতা জোরদার করা ও উন্নয়ন সাধনের কার্যক্রমে পরিকল্পনা মেয়াদে নয়টি প্রথম শ্রেণীর মাপমন্দির এবং তিনটি পাইলট ষ্টেশন ও একটি পানিতাত্ত্বিক বাড়ারসহ

তোটি এগ্রোমেট মানমন্দির স্থাপন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সদর দপ্তর ভবনের নির্মাণ কাজও সম্পূর্ণ হবে। সারণী ১৩·২৭ এ বর্তমান অবস্থা ও লক্ষ্যসমূহ দেখানো হয়েছে ;

সারণী ১৩·২৭

আবহাওয়াতত্ত্ব উপখাতের বর্তমান সুবিধাদি ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা বিবরণী

স্থাপনাসমূহের নাম	১৯৭৭/৭৮ সালের অবস্থা	১৯৭৯/৮০ সালের অবস্থা	লক্ষ্যমাত্রা (১৯৮০-৮৫)	প্রস্তাবিত অবস্থা ১৯৮৪/৮৫
১। খণ্ডকালীন মানমন্দির	১২	৬	(—) ৬ (পূর্ণমানমন্দিরে রূপান্তরিত করা হবে)	..
২। ১ম শ্রেণীর মানমন্দির	২৯	২৯	৩+৬	৩৮
৩। পরীক্ষামূলক বেলুন মানমন্দির	৮	১২	৩	১৫
৪। রাডিন চাঁদ মানমন্দির	৫	৫	..	৫
৫। (ক) বাতাস গতি নির্ণায়ক রাডার	১	২	..	২
(খ) আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ রাডার	২	৩	..	৩
(গ) পানতাত্ত্বিক রাডার	..	..	..	১
৬। ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র	১	১	..	১
৭। প্রধান আবহাওয়া দপ্তর	২	২	..	২
৮। নির্ভরশীল আবহাওয়া দপ্তর	১	২	..	২
৯। সম্পূরক আবহাওয়া দপ্তর	১	৪	..	৪
১০। কৃষি আবহাওয়া মানমন্দির	৭	৮	..	৮
১১। স্বয়ংক্রিয় ছবি প্রেরণ (গ্রাংক ভূকেন্দ্র)	১	১	..	১
১২। দূর রেকর্ডিং	১	১	..	১
১৩। জোয়ার পরিমাপন মানমন্দির	৩	৩	..	৩
১৪। ভূকম্পন মানমন্দির	১	১	..	১
১৫। ভূচৌম্বক মানমন্দির	১	১	..	১

ঘ। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

১৩·৭৮ বিদেশে বাংলাদেশ মিশনগুলির সঙ্গে নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য পরিকল্পনা মেয়াদে ১০টি রেডিও টেলিযোগাযোগ ষ্টেশন স্থাপন করা হবে।

আর্থিক বরাদ্দ

১৩·৭৯ উল্লিখিত কার্যক্রম ও লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের জন্য যোগাযোগ খাতে ২৩৭·০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সারণী ১৩·২৮ এ মোট বরাদ্দের প্রতিষ্ঠানওয়ারী বন্টন দেখানো হয়েছে :

সারণী ১৩·২৮

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য আর্থিক বরাদ্দ

[লক্ষ টাকায়]

প্রতিষ্ঠানের নাম	দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ	
	১৯৭৯/৮০ মূল্যে	চলতি মূল্যে
(ক) ডাক, তার ও টেলিফোন মন্ত্রণালয়		
(১) টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন	২১১,৫৮·৮৪	৩০,৫৩১·৭৩
(২) ডাকঘর	১৬,১৪·১৫	২,১৭০·০০
(৩) ডাক, তার ও টেলিফোন মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা কোষ	১৩·৮১	২০·০০
(খ) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়		
(১) বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ	৭,১৬·৭৬	১০,১৩·০০
(২) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা কোষ	১·৮০	২·২৭
(গ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১,৯৪·৬৪	৩৬০·০০
মোট ..	২৩৭,০০·০০	৩৪০,৯৭·০০

১৩·৮০ সারণী ১৩·২৯ এ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দের বছরওয়ারী বিন্যাস দেখানো হয়েছে :

সারণী ১৩·২৯

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বছরওয়ারী বরাদ্দ বিন্যাস

বছর	১৯৭৯/৮০ স্থির মূল্যে	চলতি মূল্যে
১৯৮০/৮২	৮৩,৪১	৯৬,৩০
১৯৮২/৮৩	৪৪,৮৯	৬২,৮০
১৯৮৩/৮৪	৪৯,৬৮	৭৮,০০
১৯৮৪/৮৫	৫৯,০২	১০৩,৮৭
মোট ..	২৩৭,০০	৩৪০,৫৯

পরিশিষ্ট—১

১৯৭২/৭৩ থেকে ১৯৭৯/৮০ পর্যন্ত মেয়াদে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন উপখাতের সাফল্য

পরিশিষ্ট—৮

বিষয়	১৯৭২/৭৩ সালের অবস্থা	প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা			১৯৭৭/৮৮ সালের অবস্থা	দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা	
		লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য			সাফল্য (পরিমাণগত)	১৯৭৯/৮০ সালের অবস্থা
			পরিমাণ	শতকরা হার			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১। টেলিফোন ক্ষমতা (লাইনের সংখ্যা)	৬৬,০০০	৭০,০০০	৩৭,০০০	৫৩	১,০৩,০০০	১৭,০১৭	১,২০,০১৭
(ক) স্বয়ংক্রিয়	৫৫,০০০	৬০,০০০	৩০,০০০	৫০	৮৫,০০০	১৫,০১৭	১,০০,০১৭
(খ) হস্তচালিত	১১,০০০	১০,০০০	৭,০০০	৭০	১৮,০০০	২,০০০	২০,০০০
২। টেলিফোন এক্সচেঞ্জ (সংখ্যা)	২৩৭	৪৫০	১২৫	২৭	৩৬২	২০	৩৮২
(ক) স্বয়ংক্রিয়	২২	৫০	১৪	২৮	৩৬	৬	৪২
(খ) হস্তচালিত	২১৫	৪০০	১১১	২৭·৫	৩২৬	১৪	৩৪০
৩। আভ্যন্তরীণ দীর্ঘ দূরত্ব সার্কিটসমূহ (সংখ্যা)	৪৬৭	১,৬০০	৬৭৭	৪২·৩	১,১৪৪	৪২৬	১,৫৭০
(ক) ট্রাঙ্ক	২৮৬	..	৩৭২	...	৬৫৮	৯২	৭৫০
(খ) এসটিডি	৮২	..	১৮৮	...	২৭০	৩১০	৫৮০
(গ) টেলিগ্রাফ	৯৯	...	১১৭	..	২১৬	২৪	২৪০
৪। বৈদেশিক সার্কিটসমূহ (সংখ্যা)							
(ক) টেলিফোন	১০	২৫	১২	৭৬	২২	০৭	২৯
(খ) টেলিগ্রাফ	৭	..	৭	..	১৪	৪	১৮
(গ) টেলেক্স	৬	..	৮	...	১৪	৫	১৯
৫। এসটিডি সুবিধা (স্থানসমূহ)	৯	৮	৫	৬৩	১৪	৪	১৮
৬। পিবিএক্স/পিএবিএক্সসমূহ:							
(ক) ক্ষমতা (লাইন সংখ্যা)	৯,০০০	..	৪,০০০	..	১৩,০০০	২,১৫৫	১৫,১৫৫
(খ) মেশিন (সংখ্যা)	৩৮৪	..	২৪১	..	৬২৫	৪০	৬৬৫

৭।	পাবলিক কল অফিস (সংখ্যা)	৭০০	৫০০	১৫৩	৩০·৬	৮৫৩	২১	৮৭৪
	(ক) পল্লী	৬১০	৫০০	১০৫	২১	৭১৫	১৯	৭৩৪
	(খ) শহর	৯০	..	৪৮	..	১৩৮	২	১৪০
[৮।	টেলিগ্রাফ অফিস (সংখ্যা)	৪০০	২০০	৬৮	৩৪	৪৬৮	২০	৪৮৮
[৯।	পল্লী পিসিওসহ টেলিগ্রাফ স্টেশনসমূহ (সংখ্যা)	৮১০	৭০০	১৬৩	২৩·৩	৯৭৩	১৯	৯৯২
১০।	টেলেক্স সুবিধা :							
	(ক) ক্ষমতা (লাইনের সংখ্যা)	২৪০	..	১২০	..	৩৬০]	৫০	৪১০
	(খ) এক্সচেন্জ (সংখ্যা)	২	..	..	..	২	১	৩

পরিশিষ্ট-২

ডাকঘর উপখাতে ১৯৭২/৭৩ থেকে ১৯৭৯/৮০ মেয়াদে অর্জিত সাফল্য

বিষয়	১৯৭২/৭৩-এর অবস্থা	প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা			১৯৭৭/৭৮-এর অবস্থা	দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা	
		লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য			পরিমাণগত সাফল্য	১৯৭৯/৮০-এর অবস্থা
			পরিমাণ	% হার			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১। ডাকঘর (সংখ্যা)	৬,৬৮০	৩,৭২৫	৪১২	১১	৭,০৯২	২০০	৭,২৯২
২। ডাকঘর ভবন (সংখ্যা)	৩২৭	১০০	৭৪	৭৪	৪০১	৪৬	৪৪৭
৩। আবাসিক কোয়ার্টার (সংখ্যা)	১,২৩৬	২৫০	১৬৪	৬৬	১,৪০০	২০১	১,৬০০
৪। মোটর গাড়ী (সংখ্যা)	৩১	১০০	৪৬	৪৬	৮০	৪৪	১২৪
৫। বিভিন্ন ধরণের যন্ত্র (সংখ্যা/সেট)	..	..	৪৯	..	৪৯	১০১	১৫০

পরিশিষ্ট-৩

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার বরাদ্দ ও ব্যয়

(কোটি টাকায়)

প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা					দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা				
	মোট বরাদ্দ		মোট ব্যয় ১৯৭৩—৭৮		ব্যবহারের শতকরা হার (৪নং স্তম্ভ ২নং স্তম্ভের তুলনায়)	মোট বরাদ্দ		মোট ব্যয় ১৯৭৮-৮০		ব্যবহারের শতকরা হার (৯নং স্তম্ভ ৭নং স্তম্ভের তুলনায়)
	মোট	বৈদেশিক মুদ্রা	মোট	বৈদেশিক মুদ্রা		মোট	বৈদেশিক মুদ্রা	মোট	বৈদেশিক মুদ্রা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন	১১৫·৯২	৪২·০৫	৯৮·২১	৩৬·২১	৮৫	১০৩·৪৬	৪৪·৩১	৮৬·০৬	৩১·৪৬	৮৩
২। ডাকঘর	৯·৫৪	১·২৮	৬·৩৭	০·৩২	৬৭	৯·৯১	০·১৫	৫·৭৯	..	৫৮
৩। আবহাওয়া বিভাগ	৩·৬৪	১·১০	২·২৩	০·৫৫	৬১	২·৮৫	০·৮৩	২·৬২	০·৮৮	৯২
৪। মন্ত্রণালয়গুলির পরিকল্পনা সেল	..	..	০·৬	..	..	০·০৭	..	০·০৭	..	১০০
৫। বৈদেশিক মন্ত্রণালয়	..	..	..	..	..	..	..	০·৩৭	০·৩৭	..
মোট	১২৯·১০	৪৪·৪৩	১০৭·১৯	৩৭·০৮	৮৩	১১৬·২৯	৪৫·২৯	৯৪·৯১	৩২·৭১	৮২

পরিশিষ্ট-৪

টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের বর্তমান সুযোগ-সুবিধা ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা।

বিষয়	১৯৭৭/৭৮-এর অবস্থা	১৯৭৯/৮০-এর অবস্থা	লক্ষ্যমাত্রা (১৯৮০-৮৫)	১৯৮৪/৮৫ সালের প্রস্তাবিত অবস্থা
১	২	৩	৪	৫
১। টেলিফোন ক্ষমতা (লাইনের সংখ্যা)	১,০৩,০০০	১,২০,০১৭	৫৫,০০০	১,৭৫,০১৭
(ক) স্বয়ংক্রিয়	৮৫,০০০	১,০০,০১৭	৫৩,০০০	১,৫৩,০১৭
(খ) হস্তচালিত	১৮,০০০	২০,০০০	২,০০০	২২,০০০
(১) শহরাঞ্চল :				
(ক) স্বয়ংক্রিয়	৮৫,০০০	১,০০,০১৭	৪৭,০০০	১,৪৭,০১৭
(খ) হস্তচালিত	৯,৪০০	(—)৯,৪০০	২,০০০	৭,৪০০
মোট	৯৪,৪০০	১,০৯,৪১৭	৪৫,০০০	১,৫৪,৪১৭
(২) গ্রামীণ :				
(ক) স্বয়ংক্রিয়	..	..	৮,০০০	৮,০০০
(খ) হস্তচালিত	৮,৬০০	১০,৬০০	২,০০০	১২,৬০০
মোট	৮,৬০০	১০,৬০০	১০,০০০	২০,৬০০
২। প্রতি শতজনে টেলিফোনের সংখ্যা (ঘনত্ব) :	০·১২	০·১৩	..	০·১৭
(ক) শহরের টেলিফোনের %	৯১·৬৫	৯১·৫৯	৮০	৮৮
(খ) গ্রামীন টেলিফোনের %	৮·৩৫	৮·৪১	২০	১২
৩। টেলিফোন সম্বলিত এলাকা: (স্থান)				
(১) জেলা :				
(ক) স্বয়ংক্রিয়	১৬	১৯	৩	২২
(খ) হস্তচালিত	৬	৩	(—) ৩	..
মোট	২২	২২	..	২২
(২) মহকুমা :				
(ক) স্বয়ংক্রিয়	১৯	২৬	৪৬	৭২
(খ) হস্তচালিত	৫২	৪৬	(—) ৪৬	..
মোট	৭১	৭২	..	৭২

বিষয়	১৯৭৭/৭৮-এর অবস্থা	১৯৭৯/৮০-এর অবস্থা	লক্ষ্যমাত্রা (১৯৮০—৮৫)	১৯৮৪/৮৫ সালের প্রস্তাবিত অবস্থা
১	২	৩	৪	৫
(৩) স্বয়ংক্রিয়, হস্তচালিত বা পিসিও (সংখ্যা) সমুলিত পল্লী এলাকা				
(ক) থানা (মোট ৪৭৩)	৪৫০	৪৭৩	..	৪৭৩
(খ) ইউনিয়ন পরিষদ (মোট ৪৩৫০)	৪৮০	৫৩০	৩০০	৮৩০
(গ) পল্লী প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র (মোট ৯৭৪)	৯০	১০০	১০০	২০০
(৪) পিসিও (সংখ্যা)				
(ক) শহর (কয়েনবক্সসহ)	১৩৮	১৪০	১০০	২৪০
(খ) গ্রামীণ	৭১৫	৭৩৪	২০০	৯৩৪
মোট	৮৫৩	৮৭৪	৩০০	১,১৭৪
৪। টেলিগ্রাফ অফিস (সংখ্যা) :				
(ক) শহর	১২০	১২৮	১৫	১৪৩
(খ) গ্রাম	৩৪৮	৩৬০	৩৫	৩৯৫
মোট	৪৬৮	৪৮৮	৫০	৫৩৮
৫। এসটিডি সার্ভিসেস (স্থান)	১৪	১৮	৪	২২
৬। দেশভিত্তিক ট্রাঙ্কডায়ালিং (স্থান) :				
(ক) জেলা (মোট ২২)	..	..	২২	২২
(খ) মহকুমা (মোট ৭২)	..	..	১২	১২
৭। পি,বি,এক্স/পিএবিএক্স (লাইন)।	১৩,০০০	১৫,১৫৫	৫,০০০	২০,১৫৫
৮। টেলেক্স/জেনটেক্স (লাইন)	৩৯০	৪১০	৫০০	৯১০
৯। বৈদেশিক সার্কিট (সংখ্যা) :				
(ক) টেলিগ্রাফ	১৪	১৮	১০	২৮
(খ) টেলিফোন	২২	২৯	৩০	৫৯
(গ) টেলেক্স	১৪	১৯	১০	২৯

চতুর্দশ অধ্যায়

ভৌত পরিকল্পনা ও গৃহায়ণ

অর্থনীতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নগরায়ন স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে উঠেছে। ফলে জনসমষ্টির পুনর্বিন্যাস ঘটে, শহরে মানুষের ভীড় বাড়ে, নানা অনাসৃষ্টির উপদ্রব দেখা দেয়। শুধু তাই নয়, কৃষিভূমিও অ-কৃষি জমিতে রূপান্তরিত হয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক এই উভয় কারণে নগর উন্নয়ন ও জমি ব্যবহারের প্রশ্নে পরিকল্পিত পন্থায় অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। মূল্যবান জমি যতটা সম্ভব বাঁচানোর জন্য পরিকল্পিতভাবে নগর উন্নয়ন, বিভিন্ন জনগোষ্ঠির জন্য অফিস ও আবাসিক ভবন নির্মাণ, শহর ও পল্লী উভয় এলাকার জনসাধারণের জন্য পানি সরবরাহ ও পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা, পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও হোটেল নির্মাণ, অগ্নিকাণ্ড রোধ, বিকাশমুখী প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রগুলির মৌল অবকাঠামো ও সেবামূলক সুবিধের ভৌত পরিকল্পনা একটি জাতীয় কার্যক্রমের আওতায় সংহত করা প্রয়োজন।

অতীত উন্নয়ন

১৪·২ সম্পদের ঘাটতি ও কয়েকটি অগ্রাধিকারভিত্তিক খাতের প্রয়োজনের চাপে অতীতে এই খাতে ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর মত তহবিল বরাদ্দ করাও সম্ভব হয়নি। ফলে যতটুকু বরাদ্দ করা সম্ভব হয়েছিল বলতে গেলে তার প্রায় সবটুকুই অত্যাবশ্যকীয় চাকুরীতে নিয়োজিত সরকারী কর্মচারীদের গৃহসংস্থান, অফিস প্রতিষ্ঠানিক ভবন নির্মাণ ইত্যাদিতেই বরাদ্দ করা হয়েছে। এই খাতের প্রধান কাজ পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু ভিত্তিতে গোটা জনবসতির ব্যবস্থা করা। অথচ, উল্লিখিত কারণেই, এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট মনোনিবেশ করা সম্ভব হয়নি। পল্লী-পানি সরবরাহ, শহরের বস্তি পুনর্বাসন এবং আবাসিক কোয়ার্টার ও প্লটের উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে, ১৯৭৯/৮০ সাল অবধি ১,৫০,০০০ বস্তিবাসীকে অন্যত্র পুনর্বাসিত করা হয়েছে, ৩,০০,০০০ অগভীর নলকূপ খনন এবং ৮,৪৫৬টি আবাসিক ইউনিট ও ২,০০০ প্লটের উন্নয়ন করা হয়েছে।

১৪·৩ প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে প্রায় ২৮৭·০০ কোটি টাকা এবং দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের ২৫০ কোটি টাকা অর্থাৎ ১৯৭৩—৮০ মেয়াদে মোট ৫৩৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়। নির্মাণ সামগ্রীর দাম ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ার কারণে নির্মাণ খাতে বিনিয়োগের ফল তেমন লক্ষণীয় হয়ে উঠতে পারেনি। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় প্রাতিষ্ঠানিক ও সংগঠনগত পরিবর্তনেরও পরিকল্পনা করা হয়েছিল কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি।

১৪·৪ সামগ্রিক অবস্থা এখনও অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। ১০০টির মত শহর ও থানা শহরের পর্যায়ভুক্ত স্থানের মোট জনসমষ্টির মাত্র শতকরা ১০ ভাগ লোক বাসযোগ্য আশ্রয়, পাইপযোগে পানিসরবরাহ, পরিচ্ছন্নতামূলক ব্যবস্থা, স্থানীয় পরিবহন ও গোষ্ঠীভিত্তিক সুবিধাদির মত ন্যূনতম নাগরিক সুযোগ-সুবিধে পাচ্ছেন। পল্লী এলাকায় জনসমষ্টির শতকরা ৯০ জন বাস করলেও সেখানকার মানুষ পাইপযোগে পানির সরবরাহ পান না। দ্বিতীয়তঃ ঐতিহাসিক বিবর্তনের কারণে সুষ্ঠু আবাসিক ব্যবস্থা গড়ে উঠলে যতটুকু জায়গাজমির দরকার হ'ত, পল্লীর বসতবাড়ীগুলি তার চেয়ে অনেক বেশী জায়গা (মোট জমির প্রায় ১৫%) দখল করে আছে। অন্যদিকে, একান্নবর্তী পরিবার ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে অত্যন্ত উঁচুহারে বিক্ষিপ্তভাবে নতুন বসতবাড়ী গড়ে ওঠার গ্রামে আধুনিক সুযোগ-সুবিধে পৌঁছে দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। তৃতীয়তঃ শহরাঞ্চলে ২,০০,০০০-এর বেশী বস্তিবাসী রয়েছেন। তাঁদের সংখ্যা বাড়ছে। ফলে শহরে নোংরা, পুঁতি গন্ধময় পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। বিভিন্ন নগর উন্নয়ন

কর্তৃপক্ষ আর্থিক বিবেচনার কারণে আমদানিকৃতভাবে অবৈধ বসতী স্থাপনকারী, বিক্ষি বস্তিসমূহ ও অল্প আয়ের লোকের চাহিদা পুরণের ব্যবস্থা করতে পারেননি। এর কারণ তাঁদের নগর উন্নয়নের প্রকল্প-সমূহ বাস্তবায়ন করে তা থেকে লগ্নি অর্থ উঠিয়ে আনতে হয়। সর্বশেষ দেখে ৪,৬৫,০০০ সরকারী কর্মচারী আছেন যাঁদের জন্য মাত্র ২০,০০০ টি আবাসিক ইউনিট রয়েছে। এতে মাত্র প্রায় শতকরা ৪·৩ ভাগ কর্মচারীর আবাস সংস্থান হয়। বর্তমান ব্যয়ে নতুন বাড়ী ঘর নির্মাণ, খোলা বাজার থেকে ঋণ নিয়ে বাড়ী তৈরী করলে বিনিয়োজিত টাকা উঠে আসতে ১৫—২০ বছর সময় লাগে। লগ্নী উঠে আসার এই নীচু হারের কারণেই বেসরকারী খাতে গৃহনির্মাণ অত্যন্ত মন্থর।

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের উদ্দেশ্য, কৌশল ও মৌল-নীতি

১৪·৫ **ভৌত পরিকল্পনা:** সারাদেশে আর্থ-সামাজিক ও উন্নয়ন কার্যকলাপের বিকেন্দ্রীকরণ দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান উন্নয়ন কৌশল। গ্রামের মানুষের কাছাকাছি এলাকায় কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে পল্লী অঞ্চলের চিহ্নিত ১২০০টি প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র ও সেগুলির আশে পাশে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধে গড়ে তোলা হবে এবং কৃষি ভিত্তিক ও কৃষি সহায়ক শিল্প স্থাপন করা হবে। উন্নয়নের উল্লিখিত কৌশল অনুযায়ী, ভৌত-পরিকল্পনার লক্ষ্য হবে যেসব সুযোগ-সুবিধে দেয়ার জন্য পল্লী প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রগুলিকে গড়ে তোলা হবে সেগুলি নিশ্চিত করার সামর্থ্য সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ঐ প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রগুলির পূর্ণাঙ্গ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন। দ্বিতীয়তঃ পল্লী এলাকায় বর্তমানে শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ হারে বসতবাড়ী বাড়ছে। এর ফলে এই শতাব্দীর শেষে দেশে মোট জমির পরিমাণ আরও কমে যাবে। তাই, উপযুক্ত আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বর্তমানে বসতবাড়ীগুলি এখন যে পরিমাণ জায়গা নিয়ে আছে পল্লীতে ভবিষ্যতের নতুন বাড়ীঘরগুলি যাতে তার মধ্যেই সীমিত থাকে সে প্রয়াস চালানো হবে যাতে দেশের মূল্যবান জমির আয়তন আরও সংকুচিত হয়ে না পড়ে। মোট কাজে লাগানোর উপযোগী জমির শতকরা ১৫ ভাগ এলাকার পল্লীর সকল বসতবাড়ী রয়েছে। চূড়ান্ত লক্ষ্য হবে, এ এলাকার মধ্যেই পল্লীর সকল বসতবাড়ী নির্মাণ সীমিত রাখা।

১৪·৬ **গৃহায়ন:** বর্তমানে যে হারে সরকারী গৃহনির্মাণ চলছে এবং সরকারী কর্মচারী বাড়ী পেয়েছেন ও যাঁরা পাননি তাঁদের মধ্যে বৈষম্যের ব্যবধান যেভাবে গড়ে উঠেছে তাতে সকল সরকারী কর্মচারীর জন্য গৃহ সংস্থান করা অসম্ভব ব্যাপার। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী কর্মচারীদের গৃহ সংস্থানের সনাতন পদ্ধতি অনুসরণ যুক্তিসঙ্গত নয়। অবশ্য কোন কোন পরিস্থিতে এবং এলাকায় সরকারী কর্মচারীদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করতেই হবে। এ কথা মনে রেখে, গৃহ সংস্থানের প্রধান উদ্দেশ্য ও কৌশলগুলি নিম্নরূপ হবে:

(ক) বহু সংখ্যক স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষ আধাস্থায়ী আবাসিক ইউনিট নির্মাণ, যা নির্মাণে সময় ও সম্পদ লাগবে কম। সরকারী কর্মচারীদের গৃহ সংস্থানের ক্ষেত্রে যে ঘাটতি রয়েছে সেই সমস্যাও এতে অনেকটা সহজ হয়ে আসবে। সরকারী কর্মচারীদের জন্য নির্ধারিত উচ্চ মানের ও বিপুল ব্যয় সাপেক্ষ বহুতল ফ্ল্যাট নির্মাণের যে নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে তা পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। নগরগুলির অত্যন্ত মূল্যবান জমিতে বহুতল ফ্ল্যাট নির্মাণ করা চলতে পারে তবে অন্যান্য স্থানে অর্ধস্থায়ী আবাসিক ইউনিট নির্মাণ করতে হবে;

(খ) জমি ও আবাসিক সুবিধেগুলির উন্নয়ন ও সহজ শর্তে অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে;

(গ) লভ্য সম্পদ দিয়ে আরও বেশী আবাসিক সুবিধে দেয়ার জন্য বর্তমানে আবাসিক সুবিধে পাওয়ার ব্যাপারে যে সব অধিকার ও সুবিধে রয়েছে সেগুলি কমাতে হবে;

(ঘ) নতুন জেলা, মহকুমা ও থানা সদরে সরকারী কর্মচারীদের জন্য উপযুক্ত আবাসিক ব্যবস্থা নেই। ঐসব প্রশাসনিক অঞ্চলে আবাসিক ইউনিটের ব্যবস্থা করতে হবে ;

(ঙ) খরচ কমানোর জন্য নির্মাণ কাঠামো, সাজসরঞ্জাম ও নির্খুত সমাপ্তির প্রয়োজনীয় মান কমিয়ে ব্যয়ভার কমিয়ে আনার প্রস্তাব করতে হবে ;

(চ) মেয়াদী কিস্তির ভিত্তিতে সরকারী কর্মচারীদের জন্য প্রাণকেন্দ্রিক (নিউক্লিয়াস) আবাসিক ইউনিটসহ ছোট ছোট সার্ভিস প্লটের ব্যবস্থা ;

(ছ) সরকারী, আধা সরকারী-ও কর্পোরেশনের কর্মচারীরা যাতে নিজ নিজ বাড়ী নির্মাণ করতে পারেন সেই লক্ষ্যে তাঁদের জন্য উপযুক্ত জমি, সার্ভিস ও সুযোগ সুবিধে এবং সহজ শর্তে অর্থ সংস্থান ;

১৪·৭ **অফিসের আবাসিক সংস্থান ও প্রাতিষ্ঠানিক ভবন :** বিভিন্ন সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার জন্য বর্তমানে যে আবাসিক সংস্থান রয়েছে সেগুলির পরিসর, সুযোগ-সুবিধে ও নির্মাণ উৎকর্ষের মধ্যে ব্যাপক তারতম্য রয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা মেয়াদে সরকারের সজাগ নীতি হবে প্রতিটি স্তরে কাজের চাহিদা ও দেশের সম্পদের আলোকে ভবিষ্যতে অফিসের জন্য যেসব ভবন নির্মিত হবে সেগুলির মান নিশ্চিত করা। যেসব স্থানে কোনরকম ভবনের ব্যবস্থা নেই কেবল সেইসব স্থানেই নতুন অফিস ভবন নির্মাণ করা হবে। থানাগুলিতে অফিসের স্থান সংকুলানের জন্য বড় রকমের ভবন নির্মাণ কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে।

১৪·৮ **পল্লী এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য সম্মত ব্যবস্থাদি :** গ্রামের মানুষের বেশ একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অংশের পরিচ্ছন্নতামূলক অর্ধ আদিম অভ্যাস আচরণ এবং অস্বাস্থ্যকর জলাশয়ের পানি পান করার কারণেই গ্রামের মানুষ বর্তমানে বেশ উঁচুহারে পাকাশয়ীয় পীড়ায় আক্রান্ত। এ কারণে '৭০ এর দশকে পানি প্রবেশ নিবারণ ব্যবস্থা যুক্ত স্বাস্থ্য সম্মত, পল্লীতে ব্যবহার উপযোগী যে পায়খানা প্রবর্তন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল সেটিকে গ্রামে যথেষ্ট জনপ্রিয় করে তোলা এবং গ্রামাঞ্চলে আরও বেশী করে নলকূপের ব্যবস্থা করাই হবে নীতি। নলকূপ বসানো ও নলকূপ চালু রাখার খরচ অংশতঃ ব্যবহারকারীদের মধ্যে থেকে আদায় করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাও করা হবে।

১৪·৯ **শহরে পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য সম্মত পরিচ্ছন্নতামূলক ব্যবস্থা :** নগর বা শহরের চৌহদ্দি ও নতুন জনপদে পানি সরবরাহ ও দৈনিক স্বাস্থ্য সম্মত পরিচ্ছন্নতামূলক ব্যবস্থাদির উন্নতির ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। জেলা ও মহকুমা শহরগুলিতে কেবলমাত্র অত্যন্ত ঘনবসতি এলাকায় মনযোগে পানি সরবরাহ করা হবে।

১৪·১০ **নগর উন্নয়ন :** ঢাকা নগরের ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের জন্য গন্তব্য সর্বোচ্চ মাত্রার নীতি কৌশল প্রণয়ন ও অনুসরণ করা হবে। অন্যান্য বড় বড় নগরগুলির ক্ষেত্রেও একই পন্থা অনুসরণ করা হবে। নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষগুলিকে উঁচু আয়ের লোকদের জন্য নতুন নতুন আবাসিক অঞ্চল গড়ে তোলার পরিবর্তে জমির ইপ্সিত ব্যবহার ও তা বজায় রাখার দিকেই বেশী করে মনোনিবেশ করতে হবে।

১৪·১১ **পর্যটন উন্নয়ন :** অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যটনের পরিপূরক প্রকৃতি ও দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ উপযুক্ত সুবিধাদির ব্যবস্থার ভিত্তিতে পর্যটন ও বিনোদন সুবিধের উন্নয়ন নীতিমালা প্রণীত হবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য কার্যক্রমসমূহ

১৪·১২ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ভৌত পরিকল্পনা ও গৃহসংস্থান খাতে প্রধান কার্যক্রম সমূহ নিম্নে দেখানো হোল :

(ক) বর্তমান শহরাঞ্চলগুলির বাইরে থানা সদরগুলিসহ ১,২০০ প্রবৃদ্ধিকেন্দ্রের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সূচনা ;

(খ) আনুমানিক প্রতি ১৫০ জন পল্লীবাসীর জন্য একটি করে পানীয় জলের নলকূপের ব্যবস্থা ;

(গ) গড়ে প্রতিটি গ্রামে ৫টি করে পানির সাহায্যে উপরিভাগ বন্ধ রাখার পদ্ধতি বিশিষ্ট পায়খানা স্থাপন ;

(ঘ) প্রায় সকল মহকুমায় নলযোগে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা ;

(ঙ) আধা স্থায়ী ঘর ও ফ্ল্যাট সহ ৪,০০০ আবাসিক ইউনিট নির্মাণ ;

(চ) জাতীয় সংসদ ভবন ও সেগুনবাগিচায় ১২ তলা অফিস ভবন নির্মাণ সম্পূর্ণকরণ ;

(ছ) নতুন জেলা ও থানা সদরগুলিতে অফিস ও আবাসিক ভবন নির্মাণ ;

(জ) ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে পানি সরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ;

(ঝ) ঢাকা শহরে পাঁচতারা হোটেলের (সোনারগাঁও) নির্মাণ সমাপ্তি ; এবং

(ঞ) নাব্যারি ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠির জন্য গৃহ নির্মাণের জন্য বিশেষ গুরুত্ব প্রদান, গৃহসংস্থান ও পুনর্বাসন পরিদপ্তর ও নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষগুলির পক্ষ থেকে জমি ও সেবামূলক সুবিধাদি উন্নয়ন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য আর্থিক ব্যয় বরাদ্দ

১৪·১৩ উল্লিখিত কার্যক্রমগুলি ও এই খাতের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আওতায় ভৌত পরিকল্পনা ও গৃহায়ন খাতে মোট ৫৭৪ কোটি (১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যস্তর অনুযায়ে) টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এ ছাড়াও বেসরকারী খাতে ১,০৯৮ কোটি টাকার বিনোয়গ (১৯৭৯/৮০ এর মূল্য স্তর অনুসারে) ধরা হয়েছে। সারণী ১৪·১-এ সরকারী খাতের প্রধান প্রধান কর্মতৎপরতার ক্ষেত্রসমূহ দেখানো হয়েছে।

সারণী তালিকা ১৪·১

প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বরাদ্দ (১৯৭৯/৮০ সালের মূল্য অনুসারে)

[কোটি টাকায়]

ক্রমিক নং।	এলাকাসমূহ	দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বরাদ্দ
১।	গৃহ সংস্থান	৬৮·০০
২।	অফিস ও প্রাতিষ্ঠানিক	১১০·০০
৩।	নগর উন্নয়ন (নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহ, পৌর কার্পোরেশন ও নগর পূর্ত কার্যক্রম)। ..	৯৫·০০
৪।	ভৌত পরিকল্পনা	১০·০০
৫।	পল্লী পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য সম্মত পরিচ্ছন্নতা	৮৫·০০
৬।	শহরাঞ্চলে পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য সম্মত পরিচ্ছন্নতা	১৫২·০০
৭।	পর্যটন উন্নয়ন	২৮·০০
৮।	অগ্নি নিবারণ	১৪·৪০
৯।	বিবিধ	১১·১০
	মোট ..	৫৭৪·০০

১৪·১৪ এই খাতে বিভিন্ন প্রধান প্রধান কাজের ব্যবস্থাপনার ১৭টির মত প্রতিষ্ঠান যুক্ত রয়েছে। সারণী ১৪·২-এ ১৯৭৯/৮০ এবং চলতি উভয় মূল্য অনুসারে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও সারণী ১৪·৩-এ স্থির (CONSTANT) ও চলতি উভয় মূল্য অনুসারে সরকারী খাতে ব্যয়ের বার্ষিক বন্টন দেখানো হয়েছে।

সারণী ১৪·২

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সরকারী খাতে বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং।	প্রতিষ্ঠানসমূহ	দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা বরাদ্দ	
		১৯৭৯/৮০ মূল্যে	চলতি মূল্যে
১।	গণ পূর্ত পরিদপ্তর	১৩৮·০০	১৯৭·১৪
	(ক) সরকারী কর্মচারী গৃহ সংস্থান ..	২৮·০০	৪০·০০
	(খ) সরকারী অফিস ও প্রাতিষ্ঠানিক ভবন	৯১০·০০	১৫৭·১৪
২।	গৃহ সংস্থান ও পুনর্বাসন পরিদপ্তর (এইচ এন্ড এস)	৪০·০০	৫৭·১৪
৩।	নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহ ..	৩০·৫০	৪৩·৫৭
	(ক) ঢাকা উন্নয়ন ট্রাস্ট (ডি আই টি) ..	১৪·০০	২০·০০
	(খ) চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সি ডি এ)	৮·৫০	১২.১৪
	(গ) খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কে ডি এ) ..	৪·৫০	৬·৪৩
	(ঘ) রাজশাহী শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আর টি ডি এ)	৩·৫০	৫·০০
৪।	নগর উন্নয়ন পরিদপ্তর	১০·০০	১৪·২৯
৫।	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল পরিদপ্তর	১৩৫·০০	১৯২·৮৬
৬।	ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)।	৬৫·০০	৯২·৮৬
৭।	চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (চট্টগ্রাম ওয়াসা)।	৩৭·০০	৫২·৮৬
৮।	ঢাকা পৌর কর্পোরেশন	৪০·০০	৫৭·১৪
৯।	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (নগর পূর্ত কর্মসূচী)।	২৫·০০	৩৫·৭১
১০।	বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন (হোটেল ইন্টারন্যাশনাল লিঃসহ)।	২৮·০০	৪০·০০
১১।	অগ্নি নির্বাপণ পরিদপ্তর	১৪·৪০	২০·৫৭
১২।	আনসার পরিদপ্তর (আনসার প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট)	৭·৬৫	১০·৯৩
১৩।	পুলিশ পরিদপ্তর (সারদা পুলিশ প্রশিক্ষণ একাডেমী)	১·৩৫	১·৯৩
১৪।	পরিকল্পনা কমিশন (পিপি এ্যান্ড এইচ সেকশন)	২·১০	৩·০০
	নোট ..	৫৭৪·০০	৮২০·০০

সারণী ১৪·৩

সরকারী খাতে ব্যয়ের বার্ষিক বণ্টন

(কোটি টাকায়)

বছর	দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা বরাদ্দ	
	১৯৭৯/৮০ মূল্যে	চলতি মূল্যে
১৯৮০—৮২	২৪৯·০০	৩০২·৫০
১৯৮২/৮৩	৯৮·০০	১৩৭·৫০
১৯৮৩/৮৪	১০২·০০	১৬০·০০
১৯৮৪/৮৫	১২৫·০০	২২০·০০
মোট ..	৫৭৪·০০*	৮২০·০০*

টীকা : *উল্লেখিত বরাদ্দে উন্নীত থানা সদরগুলিতে অফিস ও আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় প্রতিষ্ঠানওয়ারী ভৌত কার্যক্রম

১৪·১৫। পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে প্রতিষ্ঠানওয়ারী যে সব ভৌত কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে তার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হোল :

গণপূর্ত পরিদপ্তর (পি ডব্লুউ ডি)

১৪·১৬ পি ডব্লিউ ডি সরকারী কর্মচারী গৃহ সংস্থান : বড় বড় শহরগুলিতে সরকারী কর্মচারীদের সরকারী বাসস্থান সুবিধের ব্যবস্থা করার জন্য অল্প খরচে অস্থায়ী ২,০০০ আবাসিক ইউনিট ও ২,০০০ বহুতল ফ্ল্যাট নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। নিজ নিজ সাংগঠনিক সামর্থ্যের ভিত্তিতে গণপূর্ত বিভাগ এবং গৃহ সংস্থান ও পুনর্বাসন পরিদপ্তর উপযুক্ত সংখ্যানুপাতে আবাসিক ইউনিটগুলি নির্মাণ করবে।

১৪·১৭ বেশ অনেকগুলি নতুন জেলা, মহকুমা ও থানা সদর সৃষ্টি করা হয়েছে। এসব স্থানে মূল প্রশাসনিক ও উন্নয়ন তৎপরতায় নিয়োজিত কর্মচারীদের আবাসিক সুবিধের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হবে। এ জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আধাস্থায়ী ও স্থায়ী নির্মাণ কাঠামো সম্বলিত বাড়ী উপযুক্ত অনুপাতে নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। থানাগুলিতে গৃহসংস্থানের ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দেয়া হবে।

১৪·১৮ পি ডব্লিউ ডি সরকারী অফিস ও প্রাতিষ্ঠানিক ভবনসমূহ : এই উপখাতের বড় কার্যক্রমগুলির মধ্যে রয়েছে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে সরকারী কেন্দ্রে বিভিন্ন অফিস ভবন নির্মাণ, স্মৃতিসৌধাদি এবং জাতীয় গুরুত্ব সম্পন্ন বিভিন্ন ভবন নির্মাণ। দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রথমোক্ত শ্রেণীর মধ্যে বাংলাদেশ সচিবালয়ের ভেতরে ২০ তলা অফিস ভবন, সেগুনবাগিচায় ১২ তলা বিশিষ্ট অফিস ভবন, বিভিন্ন জেলা মহকুমা সদরে অফিস ভবন কমপ্লেক্স এবং থানা সচিবালয়ের নির্মাণ ও মান উন্নয়নের কথা বলা যায়। শহীদ মিনার ও অজানা শহীদ স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। জাতীয় সংসদ ভবন এবং ফুলবাড়িয়ায় নাগরিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণের মত কাজ তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে।

১৪.১৯ ঢাকা শহরের সরকারী অফিসগুলির জন্য মোট প্রায় ১৪.০০ লাখ বর্গফুট বলে ১৯৭৩ হিসেব করা হয়েছিল। তারপর থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অফিসের স্থানসংকুলানের জন্য কিছুটা বাড়তি জায়গা তৈরী করা হয়েছে। গণপূর্ত পরিদপ্তর, গৃহসংস্থান ও পুনর্বাসন পরিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ পরিদপ্তর, শ্রম বিভাগ ও খাদ্য বিভাগ প্রভৃতির আলাদা পরিদপ্তর নির্মাণের কথা দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়। পূর্ত মন্ত্রণালয় প্রণীত এক সাম্প্রতিক হিসেবে দেখা যায়, বর্তমানে অফিসের জন্য ভাড়া করা বাড়ীর জায়গার পরিমাণ ৫,০০,০০০ বর্গফুট। অফিসের জন্য বর্তমানে স্থান সংকুলানের যে ব্যবস্থা রয়েছে তার অপর্যাপ্ততা এবং অফিসগুলির অবস্থান বিক্ষিপ্ত হওয়ায় অফিসের সুষ্ঠু কার্যপরিচালনা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। এ জন্য সচিবালয়ের ভেতরে ২০ তলা অফিস ভবন নির্মাণ ও সেগুনবাগিচার ১২ তলা জোড়া ব্লক নির্মাণ সম্পূর্ণ করার ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

১৪.২০ জেলা ও মহকুমা সদরে অফিসের স্থান সংকুলানের সমস্যা আরও তীব্র। যে সকল আদালত ও কালেকটরেট ভবন জেলা ও মহকুমা সদরগুলিতে রয়েছে সেগুলি বৃটিশ আমলে নির্মিত। এগুলির সম্প্রসারণ, সংস্কার ও রদবদল প্রয়োজন। একইভাবে জেলা ও মহকুমা সদর পর্যায়ে বিভিন্ন সংগঠনের অফিসের জায়গার চাহিদাও বেড়েছে। কিন্তু কোন বড় রকমের কার্যক্রম হাতে নেয়া সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই চাহিদা মেটানোর জন্য কয়েকটি স্কীম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১৪.২১ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বিভিন্ন স্মৃতিসৌধের বড় রকমের কাজগুলি সম্পূর্ণ করা হবে। সাভারে অজানা শহীদ স্মৃতিসৌধের চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজও হাতে নেয়া হবে।

১৪.২২ শের-এ-বাংলা নগরে জাতীয় সংসদ ভবনের নির্মাণ এই উপখাতে বৃহত্তম প্রকল্পগুলির একটি। '৬০-এর দশকের মাঝামাঝি এই প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয় তবে এই ভবন নির্মাণের কাজটি দ্রুত সম্পূর্ণ করা সম্ভব না হওয়ায় ব্যয় বহুগুণে বেড়ে গেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে এই ভবন নির্মাণ সম্পূর্ণ করার জন্য অন্যান্য কার্যক্রমের গতি মন্থর হবে। তবুও উল্লিখিত মেয়াদের মধ্যেই এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করতে হবে।

১৪.২৩ থানা পর্যায়ে বর্তমানে থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র ছাড়া তেমন বিশেষ অফিস ভবনাদির অস্তিত্ব নেই। জনসেবামূলক বিভিন্ন সুযোগ সুবিধে ও প্রশাসন ব্যবস্থা জনসাধারণের আরও কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার সরকারের অভিপ্রায়ের প্রেক্ষিতে স্বভাবতঃ ঐসব স্থানে অফিস ভবন ইত্যাদি আকারে বড় রকমের নির্মাণ কার্যক্রম প্রয়োজন। এ জন্যে থানা সদরগুলিতে অত্যাবশ্যকীয় নির্মাণ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

গৃহসংস্থান ও পুনর্বাসন পরিদপ্তর

১৪.২৪ এই পরিদপ্তর বর্তমানে প্রধানতঃ সেবামূলক সুবিধেযুক্ত আবাসিক প্লট উন্নয়ন ও বরাদ্দ দান এবং মাঝারি আকারের বহুতল ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজে নিয়োজিত। তবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে গৃহসংস্থান ও পুনর্বাসন পরিদপ্তরকে আরও অনেকগুলো দায়িত্ব নিতে হতে পারে। এর মধ্যে থাকবে প্রধানতঃ সরকারী কর্মচারীদের জন্য আধা স্থায়ী কম খরচের ২,০০০ আবাসিক ইউনিট, শহর বা আধা শহর হিসেবে প্রায় ২০টি থানা সদরের উন্নয়ন। এগুলিতে নিম্ন আয়ের লোকদের জন্য স্কীমগুলির জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও বিশ্বব্যাংক আর্থিক সাহায্য দেবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এ ছাড়া জেলা শহরগুলিতে 'হাউজিং এস্টেট' উন্নয়ন প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ হবে এবং যাঁরা বরাদ্দ পাবেন তাঁদের নিজেদের তরফ থেকে গৃহনির্মাণের জন্য বিভিন্ন মাধ্যমের ৬,০০০ প্লট বরাদ্দ করা হবে। এসব দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন সুনিশ্চিত করতে হবে, এই পরিদপ্তরের পুনর্গঠন দরকার হবে।

১৪·২৫ **পল্লী গৃহায়ণ:** চিরাচরিত রীতি অনুসারে গ্রামের ঘর বাড়ীর ব্যবস্থা গ্রামবাসীরাই করে থাকেন। বন্যা, ঘূর্ণিঝড় কিংবা জলোচ্ছাসে ক্ষতিগ্রস্ত কিছু এলাকায় বিক্ষিপ্ত ভাবে কিছু নির্মাণ সামগ্রী বিতরণ ছাড়া সরকার এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ আর কিছুই করে উঠতে পারেননি। অর্থনীতিতে কোনরকমে অস্তিত্বরক্ষামূলক বৈশিষ্ট্যের কারণে গ্রামের ঘরবাড়ীগুলিকে কার্যত: কেবল মাথা গোঁজার ঠাঁই বলা চলে। বৃষ্টি, ঝড়-বাতাস ও বন্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার মত উপযুক্ত ব্যবস্থা এতে নেই, স্বাস্থ্য সম্মত ব্যবস্থাদি অদিম ধরণের। অধিকাংশ বাড়ী পৌঁছার সরাসরি পথঘাট নেই।

১৪·২৬ গ্রামের বসতবাড়ীগুলি বর্তমানে অনেক বেশী জায়গা জুড়ে আছে। যদি গ্রামবাসীরা বসতবাড়ির আশেপাশে জমির ব্যবহার সুসংহত করতে পারতেন তাহ'লে বাস্তবিকপক্ষে বসতবাড়ির জন্য এত জায়গার আদৌ দরকার হ'তনা। এই পরিকল্পনাকালে উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে গ্রামের বসতবাড়ীর আয়তন আরও বৃদ্ধি বন্ধ করা একান্ত আবশ্যক। মালিক যে-ই-হোন চাষের জমি নষ্ট করা, বন্ধ করার লক্ষ্যেও সংশ্লিষ্ট গৃহনির্মাণে ইচ্ছুক ব্যাক্তর বসতবাড়ী এলাকার সকল পড়ে থাকা জমির সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করাই হবে এর উদ্দেশ্য। পূর্ত মন্ত্রণালয়, ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়কে এই নীতি বিশেষ-ভাবে প্রণয়ন করতে হবে এবং পরিকল্পনা কমিশন ঐ কাজে সমন্বয় বিধান করবে।

১৪·২৭ প্রচলিত গৃহ নির্মাণ সামগ্রী যেমন চালের খড় বা শণ, বাঁশ, কাঠ ইত্যাদির অভাব দিন দিন প্রকট হচ্ছে, ব্যয়বহুলও হয়ে উঠছে। গৃহ গবেষণাকেন্দ্র এ ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনসাধারণের কল্যাণে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এজন্য পরিকল্পনাকালে নতুন ধরনের নির্মাণ সামগ্রী উদ্ভাবনের জন্য গবেষণামূলক প্রয়াস জোরদার করা হবে।

১৪·২৮ নগর ভিত্তিক গৃহায়ন: অন্য অনেক দেশের মত বাংলাদেশেও শহরের আবাসিক পরিস্থিতি চিরকালই অসন্তোষজনক। কিন্তু বিগত কিছুকাল ধরে সমস্যাটি আশঙ্কাজনক হয়ে উঠছে। এই সমস্যার যথার্থ ও নির্ভুল প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে ধারণা নেয়ার মত সামগ্রিক পরিসংখ্যান ও উপাত্তের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। বড় বড় শহরগুলির ক্ষেত্রে কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায় এবং এগুলি দিয়ে সমস্যার বিশালতা কতখানি তা পরিস্ফুট করে তোলা যায়। ১৯৭৩ সালের গৃহ শুমারী থেকে দেখা যায়, ঢাকায় ৪৭,১৯৫টি, চট্টগ্রামে ৪,৬০৭টি এবং খুলনায় ৯,৫০০টি অসম্পূর্ণ বাড়ী রয়েছে। ১৯৭৩ সাল থেকে অনেক বাড়ী এসে যোগ হয়ে অসম্পন্ন বাড়ী ঘরের দলভারী করছে নগরায়নের চেয়েও দ্রুততর হারে। ফলে, শহরাঞ্চলে বস্তি ও অবৈধ বসতি বাড়ছে।

১৪·২৯ বড় শহরের বাড়ীগুলিতে গড় অধিবাস থেকেই আবাসিক ইউনিটের ঘাটতি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। চারটি বৃহত্তম শহরের নিম্নলিখিত উপাত্ত থেকে দেখা যায় সময়ের সাথে সাথে অধিবাস পরিস্থিতির ক্রমশ: অবনতি ঘটছে:

সারণী ১৪·৪

বড় বড় শহরে গৃহ অধিবাস

পৌরসভা	গড় অধিবাস	
	১৯৬০	১৯৭৩
ঢাকা	৫·৫০	৭·৬৫
নারায়ণগঞ্জ	৪·৮৯	৬·০৯
চট্টগ্রাম	৪·৯৯	৬·৪২
খুলনা	৫·৫১	৬·৬৮

১৪·৩০ ১৯৭৩ সালের গৃহ-শুমারিতে যেসব ধরনের বাড়ী ঘরের কথা প্রকাশ পেয়েছে উল্লিখিত উপাত্তগুলির সঙ্গে মিলিয়ে বিশ্লেষনাকালে দেখা যায় পরিমাণ ও উৎকর্ষ উভয় দিক থেকেই গৃহ সংস্থান পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। সারণী ১৪·৫ এ সমস্যার উৎকর্ষগত দিকটির একটা ছবি পাওয়া যায়:

সারণী ১৪·৫

বাড়ী-ঘরের প্রকারভেদ

পৌরসভা	পাকা	আধা পাকা	কাঁচা	ঝুপড়ি	অন্যান্য
ঢাকা	৩৬·৭৫	২৪·৩৩	২৭·২৫	১০·৯৬	০·৭১
নারায়ণগঞ্জ	২২·১৪	৪৪·৬৪	৩০·২৪	২·৪৬	··
চট্টগ্রাম	২৯·৬৩	২৫·০৭	৩৯·০২	৫·৯৫	০·৩০
খুলনা	২৮·৫৬	১১·৮৫	৫০·৯২	৬·৯৭	১·৬০

১৪·৩১ অপেক্ষাকৃত আরও সাম্প্রতিক এক জরিপে পরিস্থিতির মৌরাশ্যজনক ছবি পাওয়া যায়। তাতে দেখা যায়, ঢাকার শতকরা ৩৭ ভাগ, খুলনার শতকরা ৩৬ ভাগ ও চ গ্রামে শতকরা ১৬ ভাগের মত লোক শহরাঞ্চলের মধ্যে দীনহীনভাবে ঠাসাঠাসিভাবে বাস করে। এছাড়া দেখা যায় ঐ সব এলাকার বাড়ীঘরের অবস্থা অত্যন্ত হীনদশাগ্রস্ত তো বটেই, অবিশ্বাস্য ঘনবসতিও রয়েছে। এতে সাম্প্রতিক কয়েক বছরে পরিস্থিতির কতটুকু অবনতি হয়েছে তা টের পাওয়া যায়। ঢাকা ও চট্টগ্রামের কতকগুলি এলাকায় জনবসতি ঘনত্ব একর প্রতি ১০০০—২০০০ পর্যন্ত। এই পরিসংখ্যানগুলি থেকে দেখা যায় গৃহ চাহিদা এবং গৃহসম্পদের মধ্যে ক্রমশঃ ব্যবধান বেড়ে চলেছে। শহরাঞ্চলে গৃহসংস্থানের দায়িত্বশীল সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানগুলি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণদান তৎপরতা চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় সক্ষম হয়নি। এটা হয়নি প্রধানতঃ সম্পদের অভাবজনিত কারণে ও পদ্ধতিগত সমস্যার ফলে।

১৪·৩২ শহরাঞ্চলে গৃহনির্মাণ নীতি ও কৌশল: গৃহ নির্মাণের একটি জাতীয় কৌশল ও নীতি প্রণয়নের জন্য একটি জাতীয় গৃহনির্মাণ পরিষদ গঠন করতে হবে। গৃহ নির্মাণের জাতীয় কৌশল ও নীতি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়াদির ব্যাপারে দিক-নির্দেশ করবে:—

(১) যে সব শ্রেণীর জনসাধারণকে সুবিধে দেয়া হবে;

(২) বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য দেয় ভর্তুকি এবং ঐসব ভর্তুকির উৎসসমূহ;

(৩) সরকারী খাতের গৃহবিল এবং ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীগুলি থেকে ঋণ মুলধন বরাদ্দ;

(৪) জাতীয়, আঞ্চলিক ও নগরভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, পৌরসভা ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষগুলির সঙ্গে গৃহনির্মাণ কর্মসূচীর সমন্বয়ের প্রকৃতি; এবং

(৫) জরুরী নির্মাণ সামগ্রী আমদানীর শর্তাবলী ও অগ্রাধিকার;

১৪·৩৩ (১) জমি ও সেবামূলক সুবিধাদির উন্নয়ন; (২) জমি ও সেবামূলক সুবিধাদিসহ প্রাণকেন্দ্রিক (NUCLEUS) গৃহ; (৩) বিক্রীর জন্য ফ্ল্যাট নির্মাণ; (৪) একান্ত জরুরী নির্মাণ কাঠামো (SKELETAL) ভিত্তিক বাড়ী নির্মাণ; (৫) প্লট পুনর্বণ্টন স্কীম; (৬) বিদ্যমান গৃহ এলাকাগুলির পরিবেশগত উন্নয়ন ও (৭) পরিকল্পিত অস্থায়ী পুনর্বাসন ইত্যাদির কোনটি বা কোনগুলি বাস্তবায়ন-যোগ্য বিকল্প হতে পারে তা নির্ধারণের জন্য ঐ গুলির একটা সমন্বিত কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। এই কার্যক্রমগুলির মধ্যে দিয়ে যেসব কার্যক্রম ও গৃহ এস্টেট গড়ে উঠতে পারে সেইসব কার্যক্রম ও গৃহ এস্টেটগুলি পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত সেগুলির জন্য নিরবচ্ছিন্ন খবরদারী, পর্যালোচনা, উন্নয়নগত নিয়ন্ত্রণ এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন হবে। গৃহ সংস্থান ও পুনর্বাসন পরিদপ্তর ও এস্টেট

অফিসের মধ্যে নির্মাণ ও এস্টেট ব্যবস্থাপনামূলক দায়িত্ব বন্টনের বর্তমানে যে ব্যবস্থা রয়েছে তা অত্যন্ত অপর্যাপ্ত। পরিকল্পনাকালে একটি জাতীয় গৃহনির্মাণ কর্তৃপক্ষ বা একাধিক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার বিষয় বিবেচনা করা হবে। পরিকল্পনা, উন্নয়ন, অর্থ সংস্থান ও ভূসম্পত্তি ব্যবস্থাপনা হবে এই কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। জাতীয় গৃহায়ন পরিষদ গৃহ নির্মাণ কর্তৃপক্ষ/কর্তৃপক্ষগুলিকে নীতিগত নির্দেশনা প্রদান করবেন। তবে গৃহনির্মাণ কর্তৃপক্ষের দ্বিমুখী বৈশিষ্ট্য হবে একই সঙ্গে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মত পরিচালনাগত নমনীয়তা ও সরকারী খাতের কর্তৃপক্ষের মত জবাবদিহিতার সমন্বিত গুণ।

১৪·৩৪ এ ছাড়া বিভিন্ন বেসরকারী নির্মাণ প্রতিষ্ঠান যাতে গৃহ নির্মাণকে শিল্প হিসেবে গ্রহণ করে সেজন্য উৎসাহ দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। গৃহনির্মাণ উৎসাহিত করার জন্য সঞ্চয় ও গৃহনির্মাণ ঋণদান সমিতি স্থাপন করা হবে।

নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

১৪·৩৫ **কৌশল ও নীতিমালা:** ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা এই তিনটি বড় শহরে জমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে '৫০ দশকের গোড়ার দিকে ডিআইটি, সিডিএ (চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) ও কেডিএ (খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) নামে তিনটি নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়। উদ্দেশ্য, পরিকল্পিত আবাসিক সংস্থান এবং যথাস্থানে বিভিন্ন সেবামূলক ব্যবস্থা ও সুযোগ সুবিধে নিশ্চিত করা। দুর্ভাগ্য-জনকভাবে ঐ উদ্দেশ্য প্রধানতঃ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে; কারণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি উচ্চ আয়ের লোকেদের জন্য নতুন নতুন আবাসিক এলাকা, বিপণীকেন্দ্র ও শহর এলাকার কিছু রাস্তাঘাট নির্মাণে তাদের প্রয়াস কেন্দ্রীভূত করেছে। ফলে, এই তিনটি শহরে জনবসতি এলাকাগুলি এলোমেলোভাবে ও সমন্বিত জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধে ছাড়াই গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে এই অবস্থা প্রতিকারের প্রচেষ্টা নেয়া হবে। এই পরিকল্পনা মেয়াদে নগর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান দায়িত্ব হবে জমি ব্যবহারের বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরী। ইতিমধ্যেই অনভিপ্রেতভাবে ভূমি ব্যবহারের যে প্রবণতা গড়ে উঠেছে তা সংশোধন করার প্রয়াস। এই লক্ষ্যে বর্তমানে শহর উন্নয়ন আইন সংশোধন করতে হবে। জমি ব্যবহার পরিকল্পনা কড়াকড়িভাবে বলবৎ করার লক্ষ্যে এইসব প্রতিষ্ঠানের হাতে আইনের সংশোধন করে আরও শক্তিশালী হাতিয়ার তুলে দেবার জন্যই এটা করা দরকার।

১৪·৩৬ সম্প্রতি রাজশাহী শহরের জন্য "রাজশাহী শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ" নামে আরও একটি নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে। সদ্যগঠিত বলে দেশে আরও যে তিনটি নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আছে তাদের অভিজ্ঞতা থেকে এই সংস্থা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থাকবে।

১৪·৩৭ চারটি নগর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের জন্য ৩০·৫০ কোটি টাকা নিম্নবর্ণিতভাবে বরাদ্দ করা হয়েছে:

কর্তৃপক্ষ	(কোটি টাকায়)
ঢাকা উন্নয়ন ট্রাস্ট	১৪·০০
চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	৮·৫০
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	৪·৫০
রাজশাহী শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	৩·৫০
মোট	৩০·৫০

নগর উন্নয়ন পরিদপ্তর

১৪·৩৮ বাংলাদেশে প্রায় গোটা ভৌত পরিকল্পনাই বিক্ষিপ্ত ও অকার্যকর। জাতীয় পর্যায়ে নগর উন্নয়ন পরিদপ্তরের সাফল্য বড় জোর চলনসই বলা যায়। কিছু শহর এলাকার ও শিল্পাঞ্চলের কয়েকটি জমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনার বিষয়ে মাঝে মাঝে সরকারকে পরামর্শদানের মধ্যেই এই পরিদপ্তরের কার্যকলাপ সীমিত ছিল। জাতিসংঘ উন্নয়ন কার্যক্রমের সহায়তাযুক্ত প্রকল্পের আওতায় আরও ১০টি জেলা শহরের ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ এগিয়ে চলেছে। এই পরিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস বা কর্মতৎপরতা কোনটিই আশু প্রয়োজনীয় ভৌত পরিকল্পনার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য পর্যাপ্ত নয়।

১৪·৩৯ পল্লী এলাকার জমির উপর কোন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেই। তাই কার্যতঃ এই অধীন নীতির পরিস্থিতিতে জমির মালিকদের সনাতন ব্যবহার রীতি ও খেয়ালখুশীর উপরই জমির ব্যবহার নির্ভরশীল। কিছু কিছু জায়গায় একটা কিছু নিয়ন্ত্রণ প্রচলিত থাকলেও, অকার্যকর উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ এবং মান্ধাতার যুগের অট্টালিকা নির্মাণ প্রবিধানাদি জমি ব্যবহারের সুশৃঙ্খল বিকাশ এবং মিতব্যয়-ভিত্তিক হতে দেয় না। ভৌত পরিকল্পনার মাধ্যমে হস্তক্ষেপ করার ব্যবস্থা না করে নগরায়ন দ্রুতগতিতে সম্প্রসারিত হতে থাকলে শহরের এলাকাগুলির আভ্যন্তরীণ চেহারা ও কাঠামোর অবাঞ্ছিত আকার নেবে এবং বিভিন্ন এলাকার মধ্যে যে অসমতা দেখা দেবে সেগুলি পরবর্তীকালে সংশোধন করা খুবই কঠিন হবে।

১৪·৪০ তাই ভৌত পরিকল্পনা তৎপরতার (১) দীর্ঘ মেয়াদী প্রেক্ষাপটে জনসংখ্যা বণ্টনের কৌশল নির্ধারণ, (২) জমির সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন বা উপযুক্ত আইনের আওতায় বাস্তবায়িত হবে, (৩) পল্লী জনবসতিগুলি ক্রমানুয়ে কেন্দ্রীভূত করার নীতি ও পরিকল্পনাসমূহ, (৪) গ্রামীণ প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রগুলি এবং গুরুত্বপূর্ণ গ্রামগুলির উন্নয়নের জন্য নীতি ও পরিকল্পনা, (৫) মহানগর, পৌরসভা, জেলা ও থানা পরিকল্পনাগুলি প্রণয়ন এবং (৬) পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে এমন সকল এলাকার উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

১৪·৪১ নগর উন্নয়ন পরিদপ্তর তার বর্তমান আকৃতি ও সামর্থ্য নিয়ে প্রয়োজনীয় সকল ভৌত পরিকল্পনার কাজ করতে অক্ষম। সব কাজের দায়িত্বও এই সংস্থার ঘাড়ে চাপানো ঠিক নয়। তহবিলের যোগান ও প্রশিক্ষণ দিয়ে ভৌত পরিকল্পনার কাজ হাতে নেয়ার ব্যাপারে স্থানীয় সরকারগুলিকে ক্রমানুয়ে উৎসাহিত করতে হবে। এসব সংস্থা যতদিন পরিপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে না পারে কেন্দ্রীয় সরকারের সংগঠন তাদের পক্ষ থেকে পরিকল্পনাগুলি তৈরী করবে ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের কাজটি সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে ছেড়ে দেবে। অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজটি করার ও একটি সামগ্রীক পরিকল্পনা চাহিদাদির সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার জন্য এই পরিদপ্তরকে পুনর্গঠন ও শক্তিশালী করার প্রয়োজন হবে। একটি জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা পরিষদ গঠন করতে হবে। দেশের সকল ভৌত পরিকল্পনা তৎপরতার নিরবচ্ছিন্ন নির্দেশনা ও বিভিন্ন পর্যায়ে প্রণীত পরিকল্পনা অনুমোদন ও সংশোধন হবে এই পরিষদের কাজ। বর্তমান পরিদপ্তরকে "ভৌত পরিকল্পনা পরিদপ্তর" অথবা "শহর ও গ্রাম পরিকল্পনা পরিদপ্তর" নাম দেয়া হবে এবং এটি জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা পরিষদের সচিবালয় হিসেবে কাজ করবে।

১৪·৪২ জনসংখ্যার দীর্ঘমেয়াদী বণ্টন এবং জমির সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ব্যবহার সম্বন্ধিত নীতি ও কৌশল প্রণয়ন ছাড়া সম্ভাবনাময় প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র, সকল শহর এলাকা, সেইসঙ্গে আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক পরিকল্পনা প্রণয়ন হবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ঐ পরিদপ্তরের প্রধান কাজ। গৃহ নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে চলতি গবেষণা ও জরিপ কাজও চলতে থাকবে। পরিকল্পনায় পূর্বে আলোচিত উদ্দেশ্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল পরিদপ্তর

১৪.৪৩ এই পরিদপ্তরের কাজ হইল:

(ক) পল্লী পানি সরবরাহ।

(খ) পল্লী স্বাস্থ্য সম্মত পরিচ্ছন্নতা।

(গ) শহরে পানি সরবরাহ এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরের বাইরে স্বাস্থ্য সম্মত পরিচ্ছন্নতা।

১৪.৪৪ **পল্লী পানি সরবরাহ:** পল্লী অঞ্চলগুলিতে অগভীর ও গভীর নলকূপের মাধ্যমে নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহের বিষয়টি বাংলাদেশে মহামারী ও পানি পরিবাহিত রোগব্যাধি যথেষ্ট পরিমাণে কমানোর জন্য একটি একক সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এক্ষেত্রে 'ইউনিসেফ'-এর সহায়তা একটি বিরাট অবদান। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে আনুমানিক প্রতি ১৭৫ জনের জন্য একটি হিসেবে ৪.৬ লক্ষ সরকারী নলকূপ রয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে দ্রুতহারে নতুন নলকূপ খনন ও পুন: খননের মাধ্যমে প্রতি ১৫০ জন পল্লীবাসীর জন্য একটি করে সরকারী নলকূপের ব্যবস্থা করা হবে বলে ধরা হয়েছে। এইসব সরকারী নলকূপ ও সরকারী আওতা বহির্ভূত সংগঠনসমূহের পক্ষ থেকে বসানো নলকূপসহ ব্যক্তিগত মালিকানাধীন নলকূপগুলি মিলে দেশের গ্রামাঞ্চলে পানি সরবরাহের সমস্যা বহুলাংশে দূর করবে।

১৪.৪৫ পল্লী অঞ্চলে নলকূপের পানীয় জল সরবরাহে কিছু পরিচালনাগত সমস্যা রয়েছে। এগুলি হচ্ছে: (ক) নলকূপগুলির মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, (খ) সরকার ও ব্যবহারকারীদের মধ্যে নলকূপের ব্যয়বণ্টন, (গ) প্রতি বছর বহু সংখ্যক নলকূপ অকেজো হয়ে যাওয়া। উপযুক্ত সমাধান বের করার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল পরিদপ্তরকে দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা আমলে এইসব সমস্যার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। তবে, স্থানীয় সংস্থাগুলির কাছে এই দায়িত্ব অর্পণ করাই হবে সম্ভবত সমস্যার সর্বোত্তম সমাধান।

১৪.৪৬ **পল্লীর স্বাস্থ্য সম্মত পরিচ্ছন্নতা:** গ্রাম বাংলায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অনেকটাই আদিম ধরনের। একদিকে জনসাধারণ স্বাস্থ্যের ব্যাপারে যেমন সজাগ নয় তেমনি সরকারের হাতেও যথেষ্ট সম্পদ নেই। এগুলিই পল্লীর পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থায় উল্লিখিত পরিস্থিতির প্রধান কারণ। ৭০ এর দশকে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল পরিদপ্তর অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে গ্রামের জন্য তুলনামূলকভাবে সস্তা পানি দিয়ে উপরিভাগ বন্ধ রাখার পদ্ধতি সম্পন্ন পায়খানা উদ্ভাবন করে। এই পায়খানা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এই পরিদপ্তর পল্লী অঞ্চলে ভর্তুকি সাহায্যপুষ্ট রূপে এ ধরনের প্রায় ৩০,০০০ পায়খানা সরবরাহ করেছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল পরিদপ্তর দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাকালে ব্যাপক আকারে এই পায়খানা প্রবর্তনের পরিকল্পনা করেছে। এর আওতায় এ ধরণের প্রায় ৩,০০,০০০ পায়খানা বিতরণ করা হবে যাতে ১৯৮৫ সাল নাগাদ প্রতিটি গ্রামে গড়ে চারটি করে এই ধরনের পায়খানা থাকে। গ্রাম্য স্বাস্থ্য সম্মত পরিচ্ছন্নতা বিধানের এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে গ্রাম বাংলার পরিবেশগত ও জনস্বাস্থ্যের বিরাট উন্নয়ন সূচিত হবে।

১৪.৪৭ **শহরে পানি সরবরাহ ও পরিচ্ছন্নতা:** বাংলাদেশের ১৯৭৪ সালের আদমশুমারিতে ১০৯টি স্থানকে শহর কেন্দ্র হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে ৮০টি শহরে বর্তমানে পৌরসভা রয়েছে। এই ৮০টির মধ্যে শুধু ৪০টিতে নলবাহিত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে। শহরাঞ্চলে নলবাহিত পানি সরবরাহের বর্তমান ব্যবস্থাধীন শুধু ঢাকা ও চট্টগ্রামে পানি সরবরাহের জন্য নিয়মিত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ পানি ও পয়:নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ যথা, ঢাকা ও চট্টগ্রাম ওয়াসা রয়েছে। অন্যান্য শহরে পানি সরবরাহ ও পয়: নিষ্কাশনের জন্য কোন সাংগঠনিক সহায়তার অস্তিত্ব নেই। বিদ্যমান পৌরসভাগুলি পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য সম্মত পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালনে সমর্থ নয়। এই

অবস্থায়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল পরিদপ্তরকে শহরগুলিতে পানি সরবরাহের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট পৌরসভাগুলি যতদিন প্রয়োজনীয় সামর্থ্যের অধিকারী না হবে ততদিন ঐ দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। সকল শহরে পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য সম্মত পরিচ্ছন্নতা রক্ষার ব্যবস্থা করা সরকারের জন্য গুরুতর আর্থিক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারের হাতে বর্তমান যে সম্পদ আছে তাতে দেশের সকল শহরে পাইপযোগে আন্ত নলবাহিত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা সম্ভব হবে না। এ অবস্থায়, নলকূপই সম্ভাব্য সবচেয়ে সুবিবেচনাক সমাধান। শহরাঞ্চলে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল পরিদপ্তরের পানি সরবরাহ কার্যক্রম তাই অনুরূপ বিষয়গুলির প্রেক্ষাপটে নির্ধারিত হবে। আশা করা যায়, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে দেশের বাকী শহরগুলির প্রায় অর্ধেক শহরে পাইপযোগে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে।

১৪·৪৮ পল্লীতে ও শহরাঞ্চলে পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য সম্মত পরিচ্ছন্নতা রক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন স্কীমে অর্থ যোগানের জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল পরিদপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য ১৩৫·০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল পরিদপ্তরের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের বড় কার্যক্রম/স্কীমগুলি নিম্নরূপ:

(ক) ১,৮০,০০০টি অগভীর নলকূপ খনন;

(খ) ৫০,০০০টি অগভীর নলকূপ পুনঃ খনন/প্রতিস্থাপন;

(গ) লোনা অঞ্চল ও সুনামগঞ্জে ৬,০০০ গভীর নলকূপ খনন,

(ঘ) বরেন্দ্র এলাকা ও চট্টগ্রামে ডীপ সেট পাম্পসহ ৭,০০০টি টিউবওয়েল,

(ঙ) ৩,০০,০০০ পল্লী পারখানা স্থাপন অথবা গ্রাম প্রতি প্রায় ৫টি অনুরূপ পারখানা স্থাপন, এবং

(চ) অবশিষ্ট মহকুমা শহরগুলিতে পানি সরবরাহ।

ঢাকা ওয়াসা

১৪·৪৯ ১৯৭০ সাল থেকে ঢাকা নগরীর দ্রুত ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টির চাহিদার সঙ্গে পানি সরবরাহ তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমানে দিনে ৪ কোটি ৭০ লক্ষ গ্যালন পানি সরবরাহ করা হয়ে থাকে। যে অঞ্চলগুলি ওয়াসার আওতাভুক্ত সেগুলির চাহিদা একেবারে কোনক্রমেও মেটানো যায় না বলা যায়? পানির এই সীমিত সরবরাহ তো আছেই; সরবরাহ ব্যবস্থার অপচয় বহুল ফাঁকও আছে। পানির অবৈধ সংযোগ এবং রাস্তার পাশের ফলে সরবরাহকৃত পানির অপচয়জনক ব্যবহার মিটার বিহীন সংযোগ খাতে পানি ব্যবহারে অপচয় প্রভৃতি পানি সরবরাহ পরিস্থিতিকে আরও প্রকট করে তুলেছে। একটা সীমিত এলাকা থেকে অনেক দিন ধরে ভূগর্ভস্থ পানি অতিরিক্ত মাত্রায় পাম্প করে তোলা হলে ভূগর্ভে পানির স্তর নেমে যাওয়া ও জমি বসে যাওয়ার মত সমস্যা দেখা দেয়। সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী সমাধান হিসেবে ভবিষ্যতে পানি সরবরাহের প্রধান অংশ আসতে হবে ভূপৃষ্ঠস্থ কোন পানির উৎসসমূহ থেকে। এ কারণে দীর্ঘ মেয়াদী সমাধান হিসেবে ভূপৃষ্ঠস্থ পানি শোধণের যন্ত্র প্রয়োজন হবে। সম্পদ স্বল্পতার অপরিহার্য কারণে অবশ্য পানি সরবরাহে আশু চাহিদা নতুন নতুন নলকূপ খনন ও পানি বন্টন নেট ওয়ার্কের সম্প্রসারণের মাধ্যমে এটা করতে হবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ও স্বল্পমেয়াদী ভিত্তিতে। সেই-সাথে সমস্যার দীর্ঘ মেয়াদী সমাধানের প্রস্তুতিমূলক কাজ চলবে।

১৪·৫০ পরঃ নিষ্কাশন সার্ভিসের মাত্রা সেবা প্রাপ্ত ভোগী জনসমষ্টির অনুপাতে পানি সরবরাহের তুলনায় অনেক কম। আবর্জনা সংগ্রহ, পরিবহন ও প্রক্রিয়া করণের ব্যবস্থাও সীমিত। প্রধানতঃ পাম্পিং স্টেশনগুলি চালু না করা এবং বাড়ীতে পয়ঃ প্রণালীর সংযোগ নেবার ব্যাপারে জনসাধারণের উৎসাহ না থাকায় প্রথম আইডিএ প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১২০ মাইল লম্বা যে পয়ঃপ্রণালীটি নির্মিত

হয়েছে যেটির এখনও পুরোপুরি ব্যবহার হচ্ছে না। তৎসত্ত্বেও যদি ধরে নেয়া হয় যে, উল্লিখিত সমস্যাগুলি কাটিয়ে ওঠা যাবে তাহলে তার পরেও ময়লা প্রক্রিয়াকরণ প্লান্টের বর্তমান ক্ষমতায় গোটা শহরের ২০ ভাগের বেশী এলাকা আওতাধীন আনা যাবেনা। জালের মত (Reticulated) পয়ঃ প্রণালী নির্মাণের প্রাথমিক পর্যায়ে বিপুল মূলধন বিনিয়োগ করতে হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে পানি-সরবরাহ ও অত্যন্ত ব্যয়বহুল; এই চিরাচরিত পয়ঃ প্রক্রিয়াকরণ সুবিধাদির মধ্যে অগ্রাধিকার নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সম্পদ সংকটের পরিস্থিতিতে প্রকাশ্য নীতি হওয়া উচিত প্রথমে পানির চাহিদা মেটানো এবং পয়ঃ প্রক্রিয়াকরণের জন্য অপেক্ষাকৃত সস্তা প্রযুক্তির অনুসন্ধান ও গ্রহণ।

১৪·৫১ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ঢাকা ওয়াসার উন্নয়ন স্কীমের জন্য ৬৫·০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এতে ঢাকা ওয়াসা তার বর্তমান এলাকাগুলি ও নগরীর উপকণ্ঠ এলাকাগুলিতে পানি সরবরাহের পরিমাণ ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধে বাড়াতে পারবে। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে এই কার্যক্রমের আওতায় ৩৪টি ৮" ব্যাসের গভীর নলকূপ, ৮৭ মাইল দীর্ঘ পানির প্রধান সরবরাহ পাইপ, ২৫,০০০ নতুন পানির সংযোগ, ৬,৫০০ পয়ঃ প্রণালী সংযোগ, দু'লাখ গ্যালন পানি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন উঁচু পানি সংরক্ষণ ট্যাঙ্ক এবং ৫৬ মাইল দীর্ঘ দ্বিতীয় পর্যায়ের পয়ঃ প্রণালী লাইন নির্মাণের ব্যবস্থা রয়েছে। এই কার্যক্রমে ওয়ার্কশপ নির্মাণ, অফিস, গুদাম, কর্মচারী প্রশিক্ষণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়া, পরিকল্পনার শেষ বছরে ঢাকা ওয়াসার প্রস্তাবিত তৃতীয় প্রকল্পের কাজ শুরুর জন্যও অর্থের কিছু বরাদ্দ পাওয়া যাবে।

চট্টগ্রাম ওয়াসা

১৪·৫২ এই কর্তৃপক্ষের পানি সরবরাহ ব্যবস্থা থেকে চট্টগ্রাম শহরের প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ অধিবাসীকে পানি সরবরাহ করা হয়। চট্টগ্রাম ওয়াসার মোট পানি উৎপাদনের পরিমাণ দৈনিক ১·২৫ কোটি গ্যালন। এর সবটুকুই আসে ভূগর্ভস্থ পানির উৎস থেকে। মোট উৎপাদনের শতকরা ৪৬ ভাগ আবাসিক গৃহে, শতকরা ১৯ ভাগ শিল্প ও বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয় ও বাকী শতকরা ৩৫ ভাগ অপচয়, চুঁইয়ে পড়া, অবৈধ পানি সংযোগ ইত্যাদিতে নষ্ট হয়। বর্তমানে সরকারের সংযোগ মিলে মোট ৯,০০০ পানির সংযোগ আছে। চট্টগ্রাম শহরে কোন পয়ঃ প্রণালী নেই। বর্তমানে চট্টগ্রাম পৌর কর্পোরেশন সেপটিক ট্যাঙ্ক অথবা রাতে মল সংগ্রহ পদ্ধতির মাধ্যমে ময়লা সরানোর ব্যবস্থা করে।

১৪·৫৩ পরিকল্পনাকালে, চট্টগ্রাম ওয়াসার উন্নয়ন কার্যক্রম-এর জন্য ৩৭·০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রধান কার্যক্রমগুলি হচ্ছে নিম্নরূপ:

(১) ১৪,০০০ সার্ভিস সংযোগ।
(২) ৬টি গভীর নলকূপ খনন।
(৩) পানিকে লৌহমুক্ত করণ প্লান্টের ক্ষমতা দৈনিক ১ কোটি গ্যালন থেকে ১·৫ কোটি গ্যালনে বৃদ্ধি; এবং
(৪) হালদা নদীর তীরে মোহরায় ভূপৃষ্ঠস্থ পানি শোধনের জন্য দৈনিক ২ কোটি গ্যালন পানি উৎপাদনের ক্ষমতা সম্পন্ন একটি প্লান্ট নির্মাণ।

১৪·৫৪ দুই ওয়াসা'র বেশ কয়েকটি অভিন্ন ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক সমস্যা রয়েছে। প্রধান সমস্যাগুলি হচ্ছে:

(১) বর্তমানে করের যে হার প্রচলিত রয়েছে তা মূলধন ও পরিচালনা ব্যয়ের তুলনায় অনেক কম;
(২) পৌরসভা ও সরকারী এস্টেটগুলি থেকে কর পরিশোধ অনিয়মিত ও অপর্যাপ্ত;
(৩) পানির পাইপ ফেটে ও চুঁইয়ে এবং অবৈধ সংযোগের কারণে রাজস্বের প্রচুর ক্ষতি হয়, এ জন্য খবরদারী ও বন্ধের ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত; এবং
(৪) বিল করা ও রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থা অনিয়মিত।

এই সকল সমস্যাদি দূর করাই দুই ওয়ার্ডার সার্ভিস দানকে উন্নত করার পূর্ব শর্ত। আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় তাত্ত্যপর্য পূর্ণ উন্নতি সাধিত না হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘকাল ধরে চাহিদাও সরবরাহের মধ্যে তারসাম্য রক্ষা সম্ভব হবে না।

ঢাকা পৌরকর্পোরেশন

১৪·৫৫ স্বাধীনতার পর থেকে ঢাকানগরীর জনসংখ্যা অভূতপূর্বভাবে বেড়ে চলেছে এবং সেই সাথে পৌরসেবার চাহিদাও একই হারে বেড়েছে। সেবা এলাকাও অনেক বিস্তৃত হয়েছে। এই কর্পোরেশনের আর্থিক বুনিয়াদ তুলনামূলকভাবে অনেক দুর্বল। কর্পোরেশনের সেবার জন্য চাহিদা বেড়ে গেছে অনেক কিন্তু সেই সঙ্গে তাল মিলিয়ে আয় বাড়েনি। ফলে রাস্তাঘাট, নর্দমা, রাস্তার আলো, মল অপসারণের মত মৌলিক চাহিদা ও সেবাদানও অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেছে। সেবামূলক তৎপরতার অত্ত পরিমাণ ও উৎকর্ষগত অবনতি রোধ করার জন্য দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে একটি উন্নয়ন কার্যক্রমের উদ্যোগ নেওয়া হয়। পৌর সেবা চাহিদার ক্রমবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বড় আকারের উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেবার প্রয়োজন দেখা দেয়। একটি আধুনিক কসাইখানা, সমাজ কেন্দ্রসমূহ, রাস্তা ও নর্দমার পুনঃনির্মাণ ও মেরামত, রাস্তার আলোর ব্যবস্থা, মল নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি ও আধুনিকীকরণ, মশা নির্মূল প্রভৃতি ঐ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লিখিত কার্যক্রমগুলির জন্য মোট ৪০·০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (নগর পূর্ত কার্যক্রম)

১৪·৫৬ নগর পূর্ত কার্যক্রমের মধ্য দিয়েই সকল শহর এলাকার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য তহবিল যোগানো হয়। এই কার্যক্রমের জন্য প্রতি বছর একটা থোক বরাদ্দ করা হয়। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ঐ বরাদ্দ অর্থ বিভিন্ন শহরাঞ্চলের মধ্যে বন্টন করে। অতীতে এই কার্যক্রমের জন্য অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ছিল খুবই কম ফলে বহু শহরেই তেমন উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হতে পারেনি। অর্থের এই অপর্যাপ্ত বরাদ্দ ছাড়াও এই কার্যক্রমের প্রধান দুর্বলতা হচ্ছে এর বন্টনমূলক নীতি। সাধারণতঃ জনসংখ্যা (দুই তৃতীয়াংশ গুরুত্ব মূল্য) ও ভৌগোলিক আয়তনের (এক তৃতীয়াংশ) গুরুত্বমূল্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শহরাঞ্চলগুলির জন্য তহবিল বন্টন করা হয়। কোন শহর যদি কোন প্রকল্প বা কার্যক্রম গ্রহণ করে সেগুলির সামর্থ্যের ভিত্তিতে কিন্তু তহবিল বরাদ্দ করা হয় না। শহরাঞ্চলগুলিকে খাতে এই বরাদ্দ খরচাত হিসাবে প্রদত্ত ও গৃহীত না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য বন্টনের এই পদ্ধতি পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন।

১৪·৫৭ নির্বাচিত পল্লী প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রগুলিতে সেখানকার ভৌত অবকাঠামো, সার্ভিস ও অন্যান্য সুযোগসুবিধে উন্নয়নের তহবিল নগর পূর্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে দেয়া হবে বলে পেষোক্ত কার্যক্রম সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নগর পূর্ত কার্যক্রমের জন্য ২৫·০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন

১৪·৫৮ **পর্যটন ও বিনোদন :** বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরই, পুনর্নির্মান কার্যক্রমের আওতায় পর্যটন কর্পোরেশন ১৯৭৩ সালে কয়েকটি নির্বাচিত পর্যটন কেন্দ্রে পর্যটনমূলক সুযোগ-সুবিধে গড়ে তোলার এক কার্যক্রম হাতে নেয়। কক্সবাজার, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি, খুলনা ও সিলেটে কয়েকটি মোটেল, হোটেল ও রেস্টহাউস নির্মাণ ছিল এর অন্তর্ভুক্ত। এই সুযোগ সুবিধেগুলি কার্যতঃ বাংলাদেশে পর্যটন ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্রের রূপ নিয়েছে।

১৪·৫৯ পর্যটন শিল্পকে বিচ্ছিন্নভাবে বিকশিত করা সম্ভব নয়। পর্যটনের নিরবচ্ছিন্ন বিকাশ নিশ্চিত করতে হলে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টিকে অবশ্যই পর্যটন উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অংশীদার করতে হবে। পর্যটন মূলতঃ একটা মানব তৎপরতা। সারা দেশে পর্যটনের জন্য আকর্ষণীয় স্থান ও সুবিধাদির সৃষ্টি ও উন্নয়ন এবং সেগুলির ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য এই কার্যকলাপে জনসাধারণের অংশ গ্রহণ একান্ত জরুরী। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক নিসর্গ ও জীবজন্তু মনোরম হ্রদ, সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বর্ণাঢ্য উপজাতীয় জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে। পর্যটন উন্নয়ন এবং উপযুক্ত থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, যানবাহন ও চিত্তবিনোদনমূলক পর্যাপ্ত ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য এগুলি পূর্বশর্ত স্বরূপ। বিশেষ করে আভ্যন্তরীণ পর্যটনের দ্রুত উন্নতি সম্ভব। এই উদ্দেশ্যগুলি সামনে রেখে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে পর্যটন ও আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধের উন্নয়ন খাতে ২৮·০০ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এই বরাদ্দে সোনারগাঁও হোটেলের জন্যও বরাদ্দ অন্তর্ভুক্ত।

অগ্নিনির্বাপণ পরিদপ্তর

১৪·৬০ বাংলাদেশে বিভিন্ন শ্রেণীর মোট ১১৫টি অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র রয়েছে। কেন্দ্রগুলি প্রধান নগর ও শহর এবং গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রে অবস্থিত। তৎসত্ত্বেও, সকল মহকুমা শহর, বর্ধিষ্ণু বাণিজ্য কেন্দ্র ও নতুন নতুন শহরাঞ্চলে অগ্নিনির্বাপণ রোধ করার স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে স্থায়ী অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। এ জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১৪টি দ্বিতীয় ও ৬টি তৃতীয় শ্রেণীর অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র ও ১টি নৌ অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এম্বুলেন্স সার্ভিস এই পরিদপ্তরের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বর্তমানে শুধুমাত্র কয়েকটি বড় শহরেই এই সার্ভিস সীমিত রয়েছে। এই সার্ভিস সকল জেলা অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্রে ও যে সকল মহকুমা সদরে স্থায়ী অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র রয়েছে সে সকল কেন্দ্র সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ৫০টি এম্বুলেন্স ও স্পীড বোটের সংগ্রহ ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হচ্ছে: সরঞ্জাম সংগ্রহ, আঞ্চলিক ডিপো স্থাপন ও ঢাকায় অগ্নিনির্বাপণ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন। উল্লিখিত কার্যক্রম-এর জন্য দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় মোট ১৪·৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

আনসার পরিদপ্তর

১৪·৬১ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শফিপুরে আনসার প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৭·৬৫ কোটি টাকা।

পুলিশ পরিদপ্তর

১৪·৬২ সারদা পুলিস প্রশিক্ষণ একাডেমীতে প্রশিক্ষণ সুবিধের উৎকর্ষ বিধান ও উন্নয়নের জন্য ১·৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

পরিকল্পনা কমিশন (ভৌত পরিকল্পনা ও গৃহ সংস্থান শাখা)

১৪·৬৩ প্রধান কার্যক্রমগুলির মধ্যে রয়েছে: এডিবি/ইউএনডিপি আর্থিক সহায়তায় ঢাকা নগরীর সমন্বিত উন্নয়ন কৌশল সংক্রান্ত সমীক্ষা, নির্মাণ শিল্প সমীক্ষা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউটের পুনর্নির্মাণ। এছাড়াও, গৃহ নির্মাণের মান ও বিনির্দেশ প্রভৃতির উপর সমীক্ষা ও গবেষণা পরিচালনার ব্যবস্থা রয়েছে। উল্লিখিত কর্মসূচির জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২·১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

শিক্ষা, ধর্মীয় বিষয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগতগবেষণা

ক শিক্ষা

পটভূমি

সকল উন্নয়নের ক্ষেত্রেই মানব প্রয়াসের উৎকৃষ্ট প্রসন্তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক। আজকাল শিক্ষাকে শুধুমাত্র মৌলিক অধিকার হিসেবে দেখা হয় না বরং মানুষের বহুবিধ সামর্থ গড়ে তোলার একটা মৌলিক হাতিয়ার বলেও মনে করা হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষাপটে শিক্ষার ব্যবহারিক দিকটি ক্রমানুয়ে বেশী করে গুরুত্ব ও তাৎপর্য লাভ করছে।

১৫·২ অতীতে বাংলাদেশে শিক্ষা উন্নয়নের বিষয়টি প্রধানতঃ জরুরী তাগিদ মেটানোর জন্য প্রচলিত পদ্ধতির কিছু সম্প্রসারণ বুঝিয়েছে। এতে ঘাটতি-বাড়তির একটা আপাতঃ বিরোধী সমন্বয়ের সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে রয়েছে দক্ষ কর্মী বা শ্রমিকের অভাব অন্যদিকে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত-ব্যক্তিদের বিপুল সংখ্যাধিক্যের ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সঙ্কুচিত হচ্ছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩—৭৮) ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত (১৯৭৮—৮০) উন্নয়ন প্রয়াস এই ধারার মোড় পুরোপুরি ঘুরিয়ে দিতে পারেনি। এর পরিণামে, গ্রাম ও শহরের সনাতন ব্যবধান, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার তারতম্য, বিভিন্ন স্তরের মানুষের ও সর্বোপরি প্রতিটি স্তরের অভ্যন্তরে বৈষম্য রয়ে গেছে।

১৫·৩ বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরই শিক্ষা সংস্কার এবং শিক্ষার সব স্তরগুলি আর্থিক থেকে কম ব্যয় সাপেক্ষ করা ও সেই শিক্ষাকে বাস্তব আকারে জনসাধারণের আরও কাছে নেওয়ার ব্যবস্থাদির ওপর বড় রকমের গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অবশ্য, সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও খুঁটিনাটি বিস্তারিত বিষয়ে কার্যক্রম প্রস্তুতির অভাবে বেশীর ভাগ মৌলিক নীতির বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। সাক্ষরতার হার শতকরা ২৪ ভাগের মত হলেও প্রাথমিক শিক্ষা এখনও নামমাত্র বহাল রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনবয়সী শতকরা ৬৬ ভাগ শিশুর নাম স্কুলের খাতায় লেখানো হয়। ১ম শ্রেণী থেকে ২য় শ্রেণী এবং ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝপথে স্কুল ছাড়ার হার যথাক্রমে শতকরা ৬০ ও শতকরা ৮০ ভাগ। অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই নির্দেশনা, তত্ত্বাবধান ও সাজসরঞ্জামের অভাব। মাধ্যমিক ও উচ্চতর পর্যায়ের উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষকদের যোগ্যতার মান দারুণভাবে নেমে গেছে। সমান শ্রেণীর শিক্ষা কার্যক্রমের মত বিশেষ ও উচ্চতর কোর্স অনেক কলেজেই প্রবর্তন করা হয়েছে, কিন্তু এ জন্যে যথাযথ সুবিধাদির ব্যবস্থা করা হয়নি। এছাড়া, শিক্ষা খাতের উন্নতির ব্যাপারে পূর্বে কোন চিন্তাভাবনা বা প্রস্তুতি ছাড়াই প্রতি জেলায় কয়েকটি করে বেসরকারী মহাবিদ্যালয়ের জাতীয়করণ করা হয়েছে।

১৫·৪ বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা খুবই অনুন্নত ও একান্ত অবহেলিত। প্রথম পরিকল্পনায় বিজ্ঞান বিভাগের এস,এস,সি ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত শতকরা ৩৭ এ উন্নীত হবে বলে অনুমান করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৮০ সালে তা মাত্র শতকরা ২৮এ ও ১৯৮১ সালে কমে শতকরা ২৫এ গিয়ে ঠেকেছে। কারিগরী শিক্ষার অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়। অভ্যন্তরীণ বিরোধের জন্য প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়গুলি কয়েকবছর ধরে বন্ধ। কারিগরী শিক্ষক প্রশিক্ষণের একমাত্র শিক্ষায়তনটিকে আরেকটি প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়েছে। কারিগরী শিক্ষক প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা রাখা হয় নি। পলিটেকনিক ও মনোটেকনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ১৮ মাস পর তাদের প্রথম বর্ষের ছাত্রদের ক্লাস করার সুবিধে দিতে পারছে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের দু'বছরের কোর্সকে এক বছরের মধ্যে সীমিত করা হয়েছে। সর্বোপরি, আনুষ্ঠানিক পরীক্ষার পর ছাত্রদেরকে পরবর্তী উচ্চতর শ্রেণীতে পড়াশোনা শুরু করার জন্যেই কেবল এক থেকে দেড় বছর অপেক্ষা করতে হয়।

১৫·৫ বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ৯ কোটি ৪০ লাখ-এর(১৯৮২-৮৩) মধ্যে মাত্র ৩০,০০০ বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ এবং বড়জোর ১,০০, ০০০ দক্ষ কর্মী রয়েছে। প্রতি ১০,০০০ লোকের মধ্যে বাংলাদেশে বিজ্ঞানী, কৃতকৌশলী ও দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা ৪ জনেরও কম। অথচ প্রতিবেশী কয়েকটি দেশে এই সংখ্যা ২১ এরও বেশী। আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী প্রতিটি ডিগ্রীধারী প্রকৌশলীর জন্য ১৫ জন করে দক্ষ কর্মী ও পাঁচজন করে কারিগর প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশে এই অনুপাত হচ্ছে ২:৩:১। কারিগরী শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের অভাবে ও বিদেশের চাকুরীর কারণে দেশ যেখানে অচল হয়ে পড়েছে সেখানে ১২ বছর বা তারও বেশী মেয়াদ ধরে স্কুল এ পড়াশোনা থাকলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শতকরা ৪০ ভাগ বেকার রয়েছে। (১৯৮১ সালে ১২ বছর বা তারও অধিক স্কুলে লেখাপড়া করা বেকার লোকের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪২ লাখ)।

১৫·৬ সার্বিক জাতীয় উৎপাদন ও বার্ষিক বাজেট এই দুয়ের হিসেবে শিক্ষাখাতে ব্যয়ের শতকরা হার কয়েক বছর ধরে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৭৩—৮১ মেয়াদে শিক্ষা খাতে আবর্তক ব্যয় ক্রমাগতভাবে শতকরা ১৫·৫ ভাগথেকে কমে ১৩·১০ ভাগে উপনীত হয়েছে। সার্বিক জাতীয় উৎপাদনের হিসেবে শিক্ষা খাতে ১৯৮২-৮৩ সালে বাজেটকৃত ব্যয় শতকরা ১·৪ ভাগেরও কম। অথচ বাংলাদেশ সন্নিহিত অধিকাংশ দেশই শতকরা ৩ ভাগের মত ব্যয় করা হয়। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা এইক্ষেত্রে শতকরা ৭ ভাগ ব্যয়ের সুপারিশ করেছে। উন্নয়নের একই স্তরে অবস্থানকারী অন্য দেশগুলির তুলনায় মোট সরকারী ব্যয়ে শিক্ষাখাতের ভাগটিও একইভাবে কম। চলতি মূল্য অনুযায়ী, ১৯৮২-৮৩ সালে বাংলাদেশে শিক্ষা খাতে মাথাপিছু ব্যয় ছিল মাত্র ৩৮·৭৭ টাকা।

১৫·৭ শিক্ষার বিভিন্ন স্তরগুলিতে সরকারী ব্যয় বণ্টন অত্যন্ত বিষম। কারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি শিশু ও বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের আবর্তক খরচ যথাক্রমে ৭৬ টাকা ও ১০,৩৩৩·০০ টাকা। সরকারী মহাবিদ্যালয়ে একজন আণ্ডারগ্রাজুয়েটের গড় ব্যয় যেখানে ২,১০০ টাকা সেখানে বেসরকারী কলেজের একজন আণ্ডারগ্রাজুয়েটের গড় ব্যয় ২১০ টাকা। তাছাড়া শিক্ষা খাতে বিনিয়োগের শতকরা ৭০ ভাগের বেশী শহরাঞ্চলে ব্যয় হয় কারণ, শহরাঞ্চলেই অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী মহাবিদ্যালয় ও স্কুলগুলি অবস্থিত।

১৫·৮ বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যয় তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত বেশী হলেও উৎকর্ষ ও ফলাফলের হিসেবে সামগ্রিক অবস্থার অত্যন্ত শোচনীয়। বিএস,সি, বি, এ, ও বি, কম (সম্মান ও পাস) শ্রেণীতে পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়া ও অকৃতকার্যতার হার অত্যন্ত বেশী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত বৎসরের বি, এ বি,এস,সি ও বি, কম পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ৮৫·৩০ ও ৮৯·৪০ ভাগ। ১৯৮২ সালের এইচ,এস, সি পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার হার শতকরা ৭১·৬৬।

১৫·৯ দেশে মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় ২,৪৫০। ছাত্রের সংখ্যা ৪·৩০ লাখ। মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা আধুনিক যুগ প্রভাবের বাইরে রয়ে গেছে। মাদ্রাসাগুলির শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগপযোগী করার ও মাদ্রাসাই শিক্ষা কোর্সে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা প্রবর্তনের একনিষ্ঠ প্রয়াস কখনও করা হয়নি।

অগ্রগতি পর্যালোচনা (১৯৭৩—৮০)

১৫·১০ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষা খাতে মোট ৪৫৪,০০·৫২ লাখ টাকা বরাদ্দ ছিল। অপর দিকে এই মেয়াদে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় (১৯৭৩—৮০) মোট ২৮৯,৫২·৩৬ লাখ টাকা বরাদ্দ হয়ে ছিল, যাহা পরিকল্পনার বরাদ্দের শতকরা ৬৩·৭৭ ভাগ। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মোট বরাদ্দের মধ্যে ১৯৮০ সালের জুন মাস নাগাদ ২৫৮,৮৫·০০ লাখ টাকা খরচ হয়েছে, যাহা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার বরাদ্দের শতকরা ৮৯·৪১ ভাগ এবং পরিকল্পনা বরাদ্দের ৫৭·০২ ভাগ।

১৫·১১ **প্রাথমিক শিক্ষা:** ১৯৭৩ সালে দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩০,৪৪৬। ১৯৮০ সালে ঐ সংখ্যা ৪০,৪৪৫ এ উপনীত হয়। এই সময়ে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি ৬০ লাখ থেকে ৭০ লাখে বৃদ্ধি পায় (ছাত্রী ভর্তি ২০ লাখ থেকে ২২·৪০ লাখ) এবং প্রাথমিক শিক্ষক সংখ্যা ১২৪,১৪৬ থেকে ১৫৯,০০০ এ উন্নীত হয়।

১৫·১২ ১৯৭৩—৮০ মেয়াদে স্বাধীনতাযুদ্ধে বিধ্বস্ত ৮,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় পুর্নবাসনের কাজ হাতে নেওয়া হয়। এগুলির মধ্যে ৭,৭৩০টি পুণর্নিমিত হয়েছে। ২০ হাজার বিদ্যালয় উন্নয়নের কাজও হাতে নেওয়া হয় এগুলির মধ্যে ১০,০৩৩টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ৪৮৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারী ব্যবস্থাপনায় আনা হয়েছে।

১৫·১৩ **মাধ্যমিক শিক্ষা:** ১৯৭৩ সালে দেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল ৬,০০০। ১৯৮০ সালে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮,৩২৭এ। ছাত্র ভর্তি ১৭ লাখ থেকে ২০ লাখে এবং মাধ্যমিক শিক্ষক সংখ্যা ৬০,৫০০ থেকে ৭০,০০০ হয়েছে।

সারণী ১৫.১

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩—৮০) আমলের শিক্ষা খাতে উন্নয়ন ব্যয়।

লাখ টাকায়

উপখাত	পরিকল্পনা বরাদ্দ।	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পার বরাদ্দ।	প্রকৃত ব্যয়.	পরিকল্পনা বরাদ্দের শতকরা হার হিসেবে প্রকৃত ব্যয়।	বার্ষিক পরিকল্পনা বরাদ্দে শতকরা হিসেবে প্রকৃত ব্যয়।
১	২	৩	৪	৫	৬
প্রাথমিক শিক্ষা	৮০,০৩·৮৩	৩৬,৮০·৪৫	৩৪,১১·৩৮	৪২·৬২	৯২·৬৯
মাধ্যমিক শিক্ষা	৮৮,৬৪·৯৩	৩৫,০৫·২৮	৩০,১১·০৯	৩৩·৯৭	৮৫·৯০
কলেজ শিক্ষা	৩৮,৫৪·৯৩	১৭,১৭·৯২	১৪,৭৫·৩৯	৩৮·২৭	৮৫·৮৮
শিক্ষক প্রশিক্ষণ	২৮,২৩·৫৪	১০,১৮·১৩	৭,৯২·১৪	২৮·০৫	৭৭·৮০
শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্যান্য তৎপরতা	১৮,৫৪·৬৩	৪৯,৩৮·৩৯	৪৭,৯৯·৩৯	২৫৮·৭৮	৯৭·৯৯
কারিগরী শিক্ষা ..	৮৮,৬৩·৩০	৫৯,৫০·৫৬	৪৭,০৭·২৫	৫৩·১১	৭৯·১১
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ..	৫৭,১৫·৭২	৬৯,১০·৮৮	৬৮,৩০·৩৮	১১৯·৫০	৯৮·৮৪
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব স্কীমসমূহ	৫৪,১৯·৬৪	১২,৩০·৭৫	৮,৫৮·৪৮	১৫·৮৪	৬৯·৭৫
মোট ..	৪,৫৪,০০·৫২	২,৮৯,৫২·৩৬	২,৫৮,৮৫·৫০	৫৭·২০	৮৯·৪১

১৫·১৪ ১৯৭৩–৮০ সালে "থানা সদরের ৭০০ বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন" স্কীমের আওতায় ৪৬৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়। এগুলির মধ্যে ১৮১টি কাজ ১৯৮১ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে। ৩০টি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজসহ ঢাকা নগরীর তিনটি ক্যান্টনমেন্ট স্কুল, চারটি বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয় ও সৈয়দপুর কারিগরী উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজও সমাপ্ত হয়েছে।

১৫·১৫ **মহাবিদ্যালয় শিক্ষা:** ১৯৭৩এ মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৫০০। ১৯৮০ সালে তা ৫৮৯এ দাঁড়ায়। একই মেয়াদে ছাত্র ভর্তি ৩·২৮ লাখ থেকে (ছাত্রী ভর্তি ০·২৭ লাখ বা শতকরা ৮·৫ ভাগ থেকে ০·৫৩ লাখ বা শতকরা ১৩ ভাগ) বৃদ্ধি পায়।

১৫·১৬ আলোচ্য মেয়াদে ১৯১টি মহাবিদ্যালয়কে (১৭টি মহিলা মহাবিদ্যালয়সহ) উন্নয়নের আওতাভুক্ত করা হয়। এগুলির মধ্যে ১৭৪টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মহাবিদ্যালয়ের মধ্যে উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতাভুক্ত ৩৫টি সরকারী মহাবিদ্যালয়ের মধ্যে ৬টির কাজ এ পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে।

১৫·১৭ **শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ:** ১৯৭৩ সালে দেশের ৪৭টি প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে ৮,০০০ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেত; ১৯৮০ সালে ঐ সংখ্যা হয় ৯,২০০। শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি বাড়েনি; মূল সংখ্যা ২,৫০০ তেই স্থির হয়েছে। এই মেয়াদে ২৩টি প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট ও ঢাকার বাংলাদেশ শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত হয়।

১৫·১৮ **কারিগরী শিক্ষা:** তিনটি প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তির ক্ষমতা ১৯৭৩এর ১,২২০ থেকে ১৯৮০তে ২,১১০এ দাঁড়িয়েছে। পলিটেকনিক বাণিজ্যিক ও বৃত্তিমূলক পর্যায়ে ভর্তির সংখ্যা যথাক্রমে ১০,৯০০ থেকে ১২,৪২০, ২,৫৫০ থেকে ২,৭২০ এবং ৩,৭০০ থেকে বেড়ে ৬,৪২০ হয়েছে।

১৫·১৯ ১৯৭৩–৮০ মেয়াদে কারিগরী শিক্ষার মোট ৪৪টি প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়। এগুলির মধ্যে ১৫টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৪৫,৫১২ জন কারিগরী ছাত্রকে বৃত্তি ও ষ্টাইপেন্ড দেওয়া হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ৩৫১·৮৫ লাখ টাকা।

১৫·২০ **বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা:** ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি ১৯৭৩ সালে ২৩,৭২৬ থেকে ১৯৮০ সালে ৩৬,৫৩০তে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞান ও কলাবিভাগের ছাত্রদের অনুপাত ১৯৭৩ সালের ৩২:৬৮ থেকে ১৯৮০ সালে ৩৭:৬৩তে উন্নীত করার লক্ষ্য পরিকল্পনায় থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এ অনুপাত ২৮:৭২ এ নেমে গেছে।

১৫·২১ বর্তমান সুযোগ সুবিধাদি সুসংহত করা ও উৎকর্ষ উন্নয়নই ছিল বিশ্ববিদ্যালয় উপখাতের নীতি কৌশল। পরিকল্পনায় বরাদ্দ ছিল ৫৭,১৫·৭২ লাখ টাকা; প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৬৮,৩০·৩৮ লাখ টাকা শতকরা ১৯·৫ ভাগ বেশী। ২৫টি প্রকল্পের মধ্যে ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ ষ্টাডিজ এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত ৭টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিভিন্ন স্কীমের আওতায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে বিজ্ঞান ও ক্রীড়া সাজ–সরঞ্জাম দেওয়া হয়েছে।

১৫·২২ **অন্যান্য শিক্ষাগত তৎপরতা:** ১৯৭৩—৮০ মেয়াদে বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে অথবা সম্পন্ন হয়েছে এরকম অন্যান্য প্রকল্পের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলির কথা উল্লেখ করা যায় :

(ক) ১৫৭টি বেসরকারী মাদ্রাসার উন্নয়ন সমাপ্ত হয়েছে এবং দুটি সরকারী মাদ্রাসার উন্নয়ন কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

(খ) "খেলাধুলা" উন্নয়ন ও "শিক্ষা পুনর্বীক্ষণ কার্যক্রম" স্কীম দুটির কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(গ) শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে প্রায় ৩·৪০ লাখ ছাত্র বৃত্তি ও স্টাইপেণ্ডের সুবিধা পেয়েছেন।

(ঘ) ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এবং অডিও ভিজুয়্যাল শিক্ষা কেন্দ্রের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(ঙ) বাংলাদেশ ক্যাডেট কোর সম্প্রসারণের একটি স্কীম হাতে নেওয়া হয়েছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার পর্যালোচনা

১৫·২৩ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৮০) মেয়াদে অগ্রগতি ও সমস্যাসমূহের চুলচেরা ভালমন্দ বিচারে পরিকল্পনার লক্ষ্য ও বাস্তব অগ্রগতির মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। পরিকল্পনায় যে সব কার্যক্রম সন্নিবেশিত করা হয়েছিল সেগুলি থেকে লক্ষণীয় বিচ্যুতির কারণেই প্রধানতঃ এই ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। উন্নয়ন চিরাচরিত ধারায় সুযোগ-সুবিধের প্রান্তিক বিস্তৃতির নীচেই চলতে থাকে। শহরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী উচ্চতর শিক্ষার অনুকূলে তহবিল অন্যত্র থেকে স্থানান্তরের জন্য চাপ দেওয়ার কারণে বরাদ্দের পূর্ব পরিকল্পিত ধারা অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে প্রকৃতপক্ষে যাদের জন্য সবচেয়ে জরুরী তাদের কাছেই উন্নয়ন সুফল পৌঁছায়নি। শিক্ষা উন্নয়ন তাই পরিকল্পনা অনুযায়ী সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। ১৫·২ তালিকায় বিভিন্ন শিক্ষাস্তরে ছাত্র ভর্তি হিসেবে সাফল্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

সারণী ১৫.২

১৯৭৩-৮০ মেয়াদে ছাত্র ভর্তির বিবরণ

স্তর	১৯৭৩ সালের অবস্থা।	১৯৭৮ সালের লক্ষ্যমাত্রা।	১৯৭৮ সাল পর্যন্ত অর্জিত সাফল্য।	১৯৮০ সালের লক্ষ্যমাত্রা।	১৯৮০ সাল পর্যন্ত অর্জিত সাফল্য।
১। প্রাথমিক শিক্ষা (লাখে) ..	৬০·০০	৮৫·৯৪	৬৮·০০	৯০·০০	৭০·০০
২। মাধ্যমিক শিক্ষা (লাখে) ..	১৭·০০	২৬·৩২	১৯·৪৩	২২·০০	২০·০০
৩। কলেজ শিক্ষা (লাখে) ..	৩·২৮	৫·০০	৩.৮১	৪.৫০	৩·৯৬
৪। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ..	১০,০০০	২৫,০০০	১১,৫০০	১২,৫০০	১১,৭০০
৫। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ..	২৩,৭২৬	৩৯,০০০	২৯,২২৮	৩৫,০০০	৩০,০০০*
(ক) সাধারণ ..	১৯,২৮৭	৩৩,০০০	২৪,৯৩০	৩০,০০০	২৫,৬৮০
(১) বিজ্ঞান ..	৬,২৭৭	১২,২০০	৭,১০৪	৯,৫২৩	৭,২৯৪
(২) কলা ও অন্যান্য	১৩,০১০	২০,৮০০	১৭,৮২৬	২০,৪৭৭	১৮,৩৮৬
(খ) পেশাদারী ..	৪,৪৩৯	৬,০০০	৪,২৯৮	৫,০০০	৪,৩২০
(১) প্রকৌশল ..	১,৯৪৪	২,৫০০	১,৮৯০	২,১৮০	১,৯০০
(২) কৃষি ..	২,৪৯৫	৩,৫০০	২,৪০৮	২,৮২০	২,৪২০
৬। কারিগরী শিক্ষা					
(ক) প্রকৌশল ..	১,২২০	২,৭৪০	১,৬৯৪	২,১৬০	২,১১০
(খ) কারিগরী ..	১০,৯০০	১৪,৭৪০	১২,৪২০	১২,৪২০	১২,৪২০
(গ) বাণিজ্য ..	২,৫৫০	৫,২৩০	২,৫৮৯	২,৭২০	২,৭২০
(ঘ) বৃত্তিমূলক ..	৩,৭০০	৩০,০০০	৪,৫০০	৩,৯৬০	৬,৪২০
(ঙ) কারিগরী শিক্ষক প্রশিক্ষণ।	পাওয়া যায়নি	..	৫২	১৫০	১৫০

*বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের ১৯৮১ সালের বার্ষিক রিপোর্টে দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ১৯৮০ সালে ভর্তির সংখ্যা ছিল ৩৬,৫৩০।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ঃ

১৫-২৪ মোটামুটি বলতে গেলে মৌলিক দক্ষতা অর্জন করে পূর্ণবয়স্ক জীবনে সাফল্যে উপনীত হতে সাহায্য করাই হচ্ছে শিক্ষা উন্নয়নের লক্ষ্য। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দিয়ে শুরু করা যাক। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরকে যতদূর সম্ভব উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে অল্প খরচে কার্যোপযোগী শিক্ষা উন্নয়ন এই পরিকল্পনার লক্ষ্য। প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন, মাধ্যমিক শিক্ষার ভিত্তিকে বিস্তৃতকরণ, কর্মসংস্থানের সঙ্গে শিক্ষাকে সম্পর্কিতকরণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে শিক্ষা ব্যবস্থার উৎপাদনে পরিণত করা, নারী শিক্ষার উন্নয়নের গতি দ্রুততর করা এবং গ্রাম ও শহরের ব্যবধান হ্রাস করার প্রয়াস চালানো হবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলি হবে নিম্নরূপ ঃ

(ক) স্বীকৃত দক্ষতার উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্বসহকারে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন ;

(খ) শিক্ষার সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামাঞ্চলের ব্যবধান হ্রাস ;

(গ) কমিউনিটি বিদ্যালয় উন্নয়নসহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে বৃত্তিমূলক কোর্স প্রবর্তন ;

(ঘ) নারী-পুরুষের শিক্ষাগত ব্যবধান কমানোর জন্য নারী শিক্ষার সুবিধাদির দ্রুত সম্প্রসারণ ;

(ঙ) উচ্চতর শিক্ষায় বাছাই পদ্ধতি প্রবর্তন ;

(চ) শিক্ষার সকল স্তরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রাধান্য দান ও উচ্চতর স্তরে পেশাদারী কোর্সসমূহ প্রবর্তন ;

(ছ) শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে বিদ্যমান বৈষম্য দূরীকরণ ;

(জ) প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কারিগরী শিক্ষকদের চাকুরীকালীন ও প্রাক-চাকুরী প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধে সম্প্রসারণ ; এবং

(ঝ) শিক্ষা প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ ও পুনর্গঠন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার নীতি কৌশল

১৫·২৫ উল্লিখিত উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত নীতি কৌশলসমূহের প্রস্তাব করা হয়েছে ঃ

(ক) বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষারত সকল শিশুর জন্য ভৌত সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করা হবে। মোটামুটিভাবে, প্রতি ২০০০ লোক কিংবা দুই কিলোমিটারবর্গ এলাকার জন্য একটি করে বিদ্যালয় থাকবে। প্রথম পর্যায়ে বিদ্যালয়ে পাঁচ বছরের শিক্ষা গ্রহণ সার্বজনীন করা আশু লক্ষ্য হবে। পরবর্তী পর্যায়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের মেয়াদ আট বছরে উন্নীত করা হবে। এখন, এ মুহূর্তে ১৯৮৭ সাল নাগাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন বয়সী শিশুদের ৫০% যাতে বিদ্যালয়ে পাঁচ বছর মেয়াদের শিক্ষা পায় তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া জীবনের যাতে অপচয় না ঘটে বরং নিরবচ্ছিন্নতা থাকে সেদিকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া হবে।

(খ) স্কুল ছাড়া পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি ও তরুণ তরুণীদের দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কমিউনিটি বিদ্যালয়গুলিতে বৃত্তিশিক্ষামূলক বিভিন্ন কোর্সের ব্যবস্থা করা হবে।

(গ) প্রকৌশল স্নাতক, টেকনিশিয়ান ও দক্ষ কর্মীদের অনুপাত ১ ঃ ৫ ঃ ১৫ অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা হবে।

(ঘ) স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও নারী-পুরুষ ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদানের উদার ব্যবস্থা করা হবে।

(ঙ) একান্তভাবে মেয়েদের শিক্ষার যেসব সুবিধা রয়েছে সেগুলি ছাড়াও সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রী ভর্তিকে উৎসাহিত করা হবে।

(চ) ভাল শিক্ষকের অভাব কাটানোর জন্য এবং যে সকল ছাত্র-ছাত্রী স্কুল ছেড়ে দেয় তাদেরকে দ্বিতীয়বারের মত শিক্ষা লাভের সুযোগ দেওয়ার জন্য গণযোগাযোগ মাধ্যম-গুলিকে কাজে লাগানো হবে।

(ছ) উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বাছাই ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার জন্য উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুঁজি বিনিয়োগ যুক্তিসঙ্গত করে তোলা হবে।

(জ) পূর্বের পরিকল্পনাগুলিতে সকল স্তরে অর্জিত সাফল্যসমূহ সুসংহত করা হবে।

শিক্ষা পদ্ধতির যুক্তিসঙ্গতকরণ

১৫·২৬ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুক্তিসঙ্গত করে তোলা হবে। এটা করা হবে পাঠ্যক্রম সংস্কার এবং অধিক হারে ছাত্রছাত্রীদেরকে বৃত্তিমূলক ও কারিগরী শিক্ষার দিকে পরিচালিত করে।

১৫·২৭ পাঁচ বছরের বুনিয়াদী শিক্ষা বা প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে লোক কাহিনীর বীরদের সঙ্গে পরিচয় করে দেওয়ার মাধ্যমে শিশুদের মনোনীতি, সৌন্দর্য ও জাতীয় ঐক্যবোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করা হবে। তাদেরকে স্থানীয় অর্থনীতি ও উৎপাদনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে।

১৫·২৮ শিক্ষার প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ের (ষষ্ঠ—অষ্টম শ্রেণী) লক্ষ্য হবে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে নাগরিক ও সমাজ চেতনা গড়ে তোলা। ছেলেমেয়েদেরকে স্থানীয় নানা শিল্পকর্ম ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত করে তোলার জন্য সমষ্টি ও ব্যষ্টি পর্যায়ে প্রকল্প গড়ে তোলায় উৎসাহিত করা হবে। এই পর্যায়ে, কারিগরী ও ট্রেডের নানাক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের আগে পরিচিতিমূলক শিক্ষা দেওয়া হবে।

১৫·২৯ মাধ্যমিক শিক্ষা (নবম ও দশম শ্রেণী) অধিকাংশ ছাত্রের জন্য পরিসমাপ্তিমূলক করা হবে। এই পর্যায়ে সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তি ও শিক্ষানবিশীমূলক কার্যক্রমও প্রবর্তন করা হবে। সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রমে বিভিন্ন সমন্বিত কোর্সের ব্যবস্থা থাকবে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে এই কোর্সগুলির জন্য সার্বজনীন পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

১৫·৩০ কমিউনিটি বিদ্যালয় (Community School) প্রতিষ্ঠা মাধ্যমিক স্তরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হবে। এই বিদ্যালয়গুলির কাজ হবে কয়েকটি নির্বাচিত ট্রেডে পল্লী এলাকার শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বিকাশের জন্য সুযোগ-সুবিধে দেওয়া (পুরুষদের জন্য কৃষি, সিভিল ও মেকানিক্যাল ট্রেড এবং মহিলাদের জন্য বুনন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ/সংরক্ষণ)।

১৫·৩১ উচ্চ মাধ্যমিক (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী) ও পরবর্তী শিক্ষা স্তরগুলি অত্যন্ত বেশী রকম নির্বাচন বা বাছাইমূলক হবে। পেশাদারী চাকুরী ব্যতীত বেশীর ভাগ চাকুরীতে প্রবেশের জন্য উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট ন্যূনতম যোগ্যতা হবে। পেশাদারী চাকুরীর জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত চাহিদা হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী। মাধ্যমিক স্তরের পর দু'বছর মেয়াদী উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় থাকবে। এটির আবার কয়েকটি ধারা থাকবে কিংবা তিন বছর মেয়াদী কারিগরী শিক্ষার একটি কার্যক্রম থাকবে। উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে প্রস্তাবিত ধারাসমূহ ও ডিপ্লোমা কোর্সগুলি হবে নিম্নরূপ:

(ক) মানবিক

(খ) বিজ্ঞান

(গ) কৃষি

(ঘ) বাণিজ্য ও অফিস ব্যবস্থাপনা

(ঙ) প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ
(চ) কারিগরী দক্ষতা
(ছ) কর্ম প্রবৃত্তি
(জ) মুদ্রণ ও গ্রাফিক আর্টস

১৫·৩২ বিভিন্ন স্তরে বর্তমানে যেসব শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে সেগুলির সঙ্গে স্যান্ডউইচ কোর্স, খণ্ডকালীন কাজের সঙ্গে খণ্ডকালীন পড়াশোনা ও কোর্স স্কুলত্যাগকারীদের জন্য সুবিবেচনাকভাবে প্রবর্তন করা হবে। বৃত্তিমূলক ও কারিগরী কোর্সগুলির ক্ষেত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়া ও শিল্পের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার দিকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে এবং দ্রুতহারে দক্ষ কর্মীর সংখ্যা বাড়িয়ে কারিগরী শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের বৈষম্য অপসারণ করা হবে।

পরিকল্পনার অর্থ সংস্থান

১৫·৩৩ শিক্ষা ও ধর্মীয় বিষয়ে সরকারী খাতের বরাদ্দ ৪৮০·০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ধর্মীয় বিষয়ের জন্য ৯·৯৪ কোটি টাকাও অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট ৪৭০·০৬ কোটি টাকার মধ্যে ২২৭·৯৭ কোটি টাকা (৪৭·৫%) সার্বজনীন প্রাথমিক ও গণশিক্ষার জন্য নির্ধারিত। প্রধান কার্যক্রম-সমূহের ভিত্তিতে শিক্ষা ও ধর্মীয় খাতে বরাদ্দ এবং বরাদ্দের ১৯৭৯-৮০ সালেরও চলতি ও স্থির উভয় মূল্যস্তর অনুযায়ী বছরওয়ারী বণ্টন ১৫·৩ ও ১৫·৩ক সারণীতে দেখানো হয়েছে।

সারণী ১৫·৩

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় প্রধান কার্যক্রমভিত্তিক বরাদ্দ

(লাখ টাকায়)

কার্যক্রমসমূহ	দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বরাদ্দসমূহ		
	স্থির মূল্যে		
	টাকার অংকে	শতকরা হার	চলতি মূল্যে
ক: শিক্ষা			
১। প্রাথমিক শিক্ষা	২,২২,২০·৫৮	৪৬·২৯	৩,৩১,৬৭·৮৮
২। গণ শিক্ষা	৫,৭৬·৮১	১·২০	৬,৯৮·০২
৩। বৃত্তি	৩৫,২১·৬৬	৭·৩৪	৫০,০০·৪৬
৪। মাধ্যমিক শিক্ষা	৫৯,৩৯·৮৮	১২·৩৭	৮৬,৮৫·৭৬
৫। শিক্ষক প্রশিক্ষণ	৭,৮৫·৪৫	১·৬৪	৯,৫১·৭৯
৬। মাদ্রাসা শিক্ষা	১,৪৪·৩৬	০·৩০	২,১৭·৭৯
৭। কলেজ শিক্ষা	১৩,২৯·২০	২·৭৭	১৯,০৮·৫৮
৮। কারিগরী শিক্ষা	৫৮,৯২·৪০	১২·২৮	৮৮,১৭·৬০
৯। বিশ্ববিদ্যালয়	৩৪,৭৭·৯০	৭·২৫	৪৮,৮৫·৪৯
১০। শিক্ষা প্রবৃত্তি	১,১৬·৭৭	০·২৪	১,৭৮·০০
১১। পাঠ্যক্রম উন্নয়ন	৬৩·৫২	০·১৩	১,০০·০০
১২। শিক্ষা পরিকল্পনা, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা	১,১৮·১৯	০·২৫	১,৭৮·০২
১৩। শিক্ষা পরিসংখ্যান	৩৫·৭২	০·০৭	৪৫·৯০
১৪। ক্যাডেট কলেজ	১৪,৭৮·৭১	৩·০৮	২১,৯৫·৭৩
১৫। নতুন শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দ	১৩,০৫·০০	২·৭২	২২,০০·০০
মোট (ক)	৪,৭০,০৬·১৫	৯৭·৯৩	৬,৯২,৩১·০২
খ: ধর্মীয় বিষয়	৯,৯৩·৮৫	২·০৭	১৪,৬৮·৯৮
মোট (ক+খ)	৪,৮০,০০·০০	১,০০·০০	৭,০৭,০০·০০

সারণী ১৫·৩ ক

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা বরাদ্দের বছরওয়ারী বন্টন

(কোটি টাকায়)

	১৯৮০—৮২	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫	মোট (১৯৮০—৮৫)
ক। স্থির মূল্যে	১,৩১·৫৬	৭৬·৪৫	১,২১·০২	১,৫০·৯৭	৪,৮০·০০
খ। চলতি মূল্যে	১,৫৫·২৪	১,০৭·০৩	১,৮৬·৫৮	২,৫৮·১৫	৭,০৭·০০

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যক্রমসমূহ

১৫·৩৪ প্রাথমিক শিক্ষাঃ প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা ও কর্মীর বিষয়ে মোট বরাদ্দের ৪৬·২৯% প্রাথমিক শিক্ষা খাতের জন্য দেওয়া হয়েছে।

১৫·৩৫ যতশীঘ্র সম্ভব প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করা হবে এবং পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা করা হবে। এই উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি নেওয়া হয়েছে/নিতে হবেঃ

(ক) প্রাথমিক শিক্ষার পরিপূর্ণ ও একান্ত দায়িত্ব অর্পণ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর গঠন করা হয়েছে।

(খ) থানা পর্যায়ে প্রশাসন পুনর্গঠনের পর, থানা পরিষদই হবে সকল শিক্ষামূলক তৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব থানা শিক্ষা অফিসারদের হাতে ন্যস্ত করা হবে। থানা শিক্ষা অফিসাররা থানা পরিষদের নির্দেশনায় কাজ করবেন। থানা নির্বাহী অফিসার তাঁদের কাজের সমন্বয় বিধান করবেন। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমগুলি বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব পালন করবেন থানা নির্বাহী অফিসাররা। প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার/আঞ্চলিক প্রকল্প অফিসারের নির্দেশনায় তাঁরা কাজ করবেন।

(গ) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির কার্যকর তত্ত্বাবধায়নের জন্য ২,০০০ সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার নিয়োগ করা হবে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে (এ পর্যন্ত প্রায় ১,২০০ সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে)।

(ঘ) পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করা হবে এবং এক্ষেত্রে যোগ্য মহিলা প্রার্থীদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কালের মেয়াদ বাড়িয়ে দু বছর করা হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষকরা যেসব বিষয়ে শিক্ষা দেন সেই বিষয়গুলিতে তাঁদের দক্ষতা বাড়াবার জন্য চাকুরীকালীন সময়ে তাঁদের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম তৈরী করা হয়েছে।

(ঙ) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি তত্ত্বাবধানের জন্য স্থানীয় লোকজনদের নিয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটি-সমূহ গঠন করা হয়েছে।

(চ) প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের সুষ্ঠু বিকেন্দ্রীকরণ কার্যকর করা এবং স্থানীয় প্রাথমিক শিক্ষ কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী ও স্থানীয় সরকারগুলির কাজের সম্পর্ক নির্ধারণ করার জন্য উপযুক্ত আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(ছ) পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্যগুলির মধ্যে রয়েছে:

(১) ২,০০০ নতুন প্রাইমারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ;

(২) ১৬,৯৪০টি নতুন শ্রেণী কক্ষ নির্ধারণ ;

(৩) ১৪,৪৫৪টি অনুন্নত বিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক সংস্কার ;

(৪) প্রায় ২০,০০০ নলকূপ খনন ;

(৫) স্কুলগুলির শতকরা ৯৭টিতে পায়খানা প্রস্রাবখানা নির্মাণ ;

(৬) বিদ্যমান ৪৭টি প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের উন্নয়ন এবং তিনটি নতুন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ;

(৭) সকল বিদ্যালয়ের জন্য আসবাবপত্র ও শিক্ষা সহায়ক সরঞ্জাম (ব্ল্যাকবোর্ড, চার্ট, গ্লোব ও শিক্ষকদের ম্যানুয়াল ইত্যাদি) সকল স্কুলে সরবরাহের ব্যবস্থা ;

(৮) ১ কোটি ৩০ লাখের মত শিশুদের পাঠ্য বই বিনা মূল্যে সরবরাহ ;

(৯) প্রায় ৫০ লাখ মেয়ের জন্য বিনামূল্যে স্কুল ইউনিফরম সরবরাহ ; (অবশ্য সম্প্রতি এই ইউনিফর্ম বিলি করার নীতি পুনর্বিবেচনা করে দেখা হয়েছে এবং ইউনিফরমের জন্য বরাদ্দ অর্থ স্কুল উন্নয়নে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে)।

(জ) প্রতিটি স্কুলের মাসিক উপনির্মিত তহবিলের অর্থের পরিমাণ ১৫ টাকা থেকে ১২৫·০০ টাকা বৃদ্ধি করা ;

(ঝ) পিটিআই (প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট) শিক্ষার্থীদের ষ্টাইপেন্ডের পরিমাণ ৬০·০০ টাকা থেকে ১৫০·০০ টাকা বৃদ্ধি এবং মহিলা শিক্ষকদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ষ্টাইপেন্ড সংরক্ষণের ব্যবস্থা (ইহা ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে)।

(ঞ) নতুন পাঠ্যক্রমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য সংক্ষিপ্ত চাকুরীকালীন কোর্সের ব্যবস্থা করা হবে। প্রধান শিক্ষক, থানা শিক্ষা অফিসার ও সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারদেরকে প্রশাসন ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

১৫·৩৬ ১৯৮৫ সাল নাগাদ প্রথম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ১২৯ লাখ ছাত্র ছাত্রী ভর্তি সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য হিসাবে ধরা হয়েছে। এই সংখ্যা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন বয়সী (অর্থাৎ ৬—১১ বছর) শিশুদের মোট সংখ্যার ৯১ ভাগ হবে। পরিকল্পিত ছাত্র ভর্তি সংখ্যা (বছরওয়ারী ও শ্রেণীওয়ারী) ১৫·৪ ও ১৫·৫ তালিকায় দেখানো হয়েছে।

১৫·৩৭ স্কুলে শিশুদের পড়াশোনার ধারাবাহিকতা রক্ষার কারণে যে সুযোগজনিত স্বার্থত্যাগ করার দরকার হয় এবং পারিবারিক আয়ে অতিরিক্ত অর্থযোগানের জন্য যে কাজ করার আবশ্যকতা দেখা দেয় সেগুলি মূলত প্রাথমিক শিক্ষা বাধাতামূলক করার পথে অন্তরায়। এছাড়া, প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন করার জরুরী শর্ত হচ্ছে প্রাথমিকভাবে মেয়েদের স্কুলে এবং যারা ইতিমধ্যে স্কুলে যাচ্ছে তারা যাতে স্কুল ছেড়ে না দেয় তা নিশ্চিত করা। স্কুল ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে মেয়েদের ওপর সামাজিক চাপ রয়েছে।

১৫·৩৮ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সহায়ক ব্যবস্থা হিসেবে নির্বাচিত কতকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ঘিরে সমষ্টি শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য বিশেষ প্রয়াস চালানো হবে। এই কার্যক্রমে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর শিক্ষাগ্রহণের একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে। এতে প্রধানতঃ শিশুরাই

সারণী
প্রাথমিক শিক্ষা ঃ

বছর	ভর্তি			বালক ও বালিকাদের অনুপাত
	মোট	বালক	বালিকা	
১৯৮০	৭০·০০	৪৭·৬০	২২·৪০	৬৮:৩২
১৯৮১	৭৯·৮০	৫০·১৫	২৯·৬৫	৬৩:৩৭
১৯৮২	৯৩·৮০	৫৫·৫২	৩৮·২৮	৫৯:৪১
১৯৮৩	১০৮·০০	৬০·৯৬	৪৭·০৪	৫৬:৪৪
১৯৮৪	১২০·৬০	৬৫·৩১	৫৫·২৯	৫৪:৪৬
১৯৮৫	১২৯·৯০	৬৭·৫৫	৬২·৩৫	৫২:৪৮

সারণী
প্রাথমিক শিক্ষা:

বছর	১ম শ্রেণী			২য় শ্রেণী		
	মোট	বালক	বালিকা	মোট	বালক	বালিকা
১৯৮০	২১·০০	১৪·২৩	৬·৭৭	১৬·০০	১০·৪৪	৫·১২
১৯৮১	২৫·০০	১৩·৩৬	১২·৩৪	১৮·১০	১২·৩১	৫·৭৯
১৯৮২	২৬·৬০	১৩·৮৫	১২·৭৭	২৫·১০	১৩·০৫	১২·০৫
১৯৮৩	২৭·৪০	১৪·২৫	১৩·১৫	২৬·০০	১৩·৫২	১২·৪৮
১৯৮৪	২৮·০০	১৪·৫৬	১৩·৪৪	২৬·৮০	১৩·৯৪	১২·৮৬
১৯৮৫	২৮·৫০	১৪·৩২	১৩·৬৮	২৭·৫০	১৪·৩০	১৩·২০

টীকা:—উচ্চতর প্রাথমিক শ্রেণীসমূহের বালক বালিকাদের অনুপাত—৫২:৪৮

১৫·৪
পরিকল্পিত ছাত্র-ছাত্রীভর্তি

(লাখের অংকে)

বয়: গোষ্ঠি জনসংখ্যা (৫-১০ বৎসর)			বয়: গোষ্ঠি জনসংখ্যার % হিসাবে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি		
মোট	বালক	বালিকা	মোট	বালক	বালিকা
১২১	৬২	৫৯	৫৭·৮৫	৭৬·৭৭	৩৭·৯৭
১২৫	৬৪	৬১	৬৩·৮৪	৭৮·৩৬	৪৮·৬১
১২৯	৬৬	৬৩	৭২·৭১	৮৪·১২	৬০·৭৬
১৩৪	৬৯	৬৫	৮০·৬০	৮৮·৩৫	৭২·৩৭
১৩৮	৭১	৬৭	৮৭·৩৯	৯১·৯৯	৮২·৫২
১৪২	৭৩	৬৯	৯১·৪৮	৯২·৫৩	৯০·৩৬

১৫·৫
পরিকল্পিত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির শ্রেণী ভিত্তিক

(লাখের অংকে)

৩য় শ্রেণী			৪র্থ শ্রেণী			৫ম শ্রেণী		
মোট	বালক	বালিকা	মোট	বালক	বালিকা	মোট	বালক	বালিকা
১৩·০০	৮·৪৪	৪·১৬	১১·০০	৭·৪৮	৩·৫২	৯·০০	৬·১২	২·৮৮
১৪·৫০	৯·৮৬	৪·৬৪	১১·৫০	৭·৮২	৩·৬৮	১০·০০	৬·৮০	৩·২০
১৭·৭০	১২·০৪	৫·৬৬	১৩·২৩	৮·৯৮	৪·২২	১১·২০	৭·৬২	৩·৫৮
২৪·৬০	১২·৭৯	১১·৮১	১২·০০	১০·৬৩	৫·৪৭	১২·৯০	৮·৭৭	৪·১৩
২৫·৫০	১৩·২৬	১২·২৪	২৪·১০	১২·৫৩	১১·৫৭	১৬·২০	১১·০২	৫·১৮
২৬·৩০	১৩·৬৮	১২·৬২	২৫·০০	১৩·০০	১২·০০	২২·৬০	১১·৭৫	১০·৮৫

এবং অন্যান্য শ্রেণীর—৬৮:৩২

উপকৃত হবে। এই কার্যক্রম ছেলেমেয়ে ও বাবা মাকে নিয়ে গৃহকেন্দ্রিক কার্যাবলী যেমন, সবজি উৎপাদন ও ফলের গাছের চাষ, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ, হাঁস মুরগী পালন, ছোট খাট ব্যবসা-বাণিজ্য ও হাতের কাজে উৎসাহ বৃদ্ধি করবে। প্রতিটি কমিউনিটি শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য একটি করে বাবা মা ও শিক্ষকদের মিলিত সমিতি গঠিত হবে এবং ইহা বাস্তবায়নের দায়িত্ব থানা পরিষদকে দেওয়া হবে। বাবা-মায়েদের মনে শিক্ষার মূল্য সম্পর্কে চেতনা সৃষ্টি করে, ঐ চেতনা কল্যাণে বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি বৃদ্ধি ও প্রাথমিক শিক্ষাচক্র পূর্ণ করার জন্য ছাত্র ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে পড়াশোনার নিরবচ্ছিন্ন ধারা রক্ষা এই কার্যক্রমের অন্তর্নিহিত ধারণা। অচিরেই বিদ্যালয়ে যাবে এমন শিশুদের জন্য পাঠ্য উপকরণ উদ্ভাবনও হবে এ কার্যক্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য।

১৫·৩৯ **গণশিক্ষা:** কাজে লাগানোর মত অক্ষরজ্ঞান উন্নয়নের একটি জরুরী পূর্বশর্ত। এর পরিপ্রেক্ষিতে গণশিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল ১১–৪৫ বছর বয়ঃ গোষ্ঠির ৪ কোটি লোককে ১৯৮৫ সাল নাগাদ অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করে তোলা। ১৯৮০–৮২ সাল মেয়াদে এ জন্য ৬৫৩·০২ লাখ টাকা ব্যয় করা হয়। এই কার্যক্রমের মূল্যায়নের পর এ ক্ষেত্রে কৌশল পরিবর্তন করা হয়েছে। গণস্বাক্ষরতা ও বয়স্ক শিক্ষার নতুন নীতি কৌশল হচ্ছে স্বতন্ত্র গণশিক্ষা কার্যক্রমের কাজে হাত দেওয়ার পরিবর্তে সহায়তামূলক সার্ভিস হিসেবে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রতিষ্ঠানিক সুযোগ সুবিধের উন্নয়ন সাধন করা। মনে করা হয় পাঁচ বছরের বুনিয়াদী শিক্ষার দৃঢ়ভিত্তি তৈরী হলে অসময়ে স্কুলে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়া ছেলেমেয়েদের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাসের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি হবে যাতে আগামীতে পুরানো অক্ষর জ্ঞানহীন জনসমষ্টির দলে নতুন অশিক্ষিতরা ভীড় না বাড়ায়।

১৫·৪০ **মাধ্যমিক শিক্ষা:** সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পর মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে ভর্তির ওপর প্রচন্ড চাপ পড়ে। এ চাপ ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। কাজেই মাধ্যমিক স্তরে এটাই প্রধান সমস্যা। ফলে, মাধ্যমিক শিক্ষার মানের অপকর্ষ ঘটে, দুষ্প্রাপ্য সম্পদ আরও বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার কারণে শেষ অবধি তা ছিটেফোটায় আকার নেয়। অধিকন্তু, মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়া ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে বিদ্যমান বেকার সমস্যা আরও প্রকট হবে। এই পরিস্থিতিতে মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক কোর্স প্রবর্তন দ্বিতীয় পরিকল্পনা মেয়াদে অন্যতম প্রধান কাজ। এই স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য হবে সামাজিক পরিসরে উৎপাদনমূলক তৎপরতার প্রশিক্ষণের সুযোগ দেওয়া এবং বিভিন্ন পেশা ও দক্ষতা গড়ে তোলার মাধ্যমে প্রধানতঃ কৃষি ও কৃষি সম্পর্কিত কাজে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে নিয়োগযোগ্য করে তোলা। মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরকে এখন উচ্চতর শিক্ষার ভিত্তিভূমি বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু এই মাধ্যমিক স্তরকেই বেশ অনেক সংখ্যক ছাত্রের জন্য সমাপ্তিসূচক করে তোলা হবে।

১৫·৪১ শহর ও পল্লী অঞ্চলের মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ও উৎকর্ষের মাঝে একটা দুঃখজনক ব্যবধানের অস্তিত্ব রয়েছে। মোট ৮,৯৬০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ১৭৩টি সরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত। এগুলি আবার শহরাঞ্চলে অবস্থিত। বেসরকারী অধিকাংশ স্কুল গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত আর সেগুলি বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়। ফলশ্রুতিই গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলির অশেষ আর্থিক সংকট ও সমস্যার কারণে ঐ সব স্কুলের শিক্ষার মান নীচু। অনুরূপভাবে ছাত্র ও ছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সুবিধের মধ্যে বৈষম্য রয়েছে। শতকরা মাত্র ১ ভাগ স্কুল একান্তভাবে মেয়েদের জন্য আর ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির অনুপাত ৭৪ : ২৬।

১৫·৪২ ১৯৮০-৮১ সাল থেকে মোট ২,১৬৪·০০ লাখ টাকা ব্যয়ে (এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ১ কোটি ৩৫ লাখ ডলার ঋণসহ) ৪০০টি কমিউনিটি স্কুল উন্নয়নের একটা বড় রকমের কাজ এগিয়ে চলেছে এবং এ জন্য

২০৩টি স্কুল নির্বাচিত করা হয়েছে। প্রতিটি নির্বাচিত স্কুলকে প্রয়োজনীয় ওয়ার্কশপ ও সরঞ্জাম সরবরাহ করা হবে এবং নির্বাচিত ট্রেডের শিক্ষকদের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি সমষ্টি স্কুলে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু হয়েছে।

১৫·৪৩ মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের অধীনে ১৯৮৩ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে সমন্বিত বিজ্ঞান প্রবর্তন (পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা ইত্যাদির মত বিভিন্নমুখী কোর্সগুলির বিপরীত করা হয়েছে)। এই কার্যক্রম রূপায়িত করার জন্য ৬,৫০০ বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গবেষণাগার স্থাপন, বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জাম ও বই দেওয়া হবে। এজন্যে মোট ব্যয় হবে ৪,২৭৯·৩৮ লাখ টাকা (বেসরকারী খাতের ১,৬৮৭·০০ টাকাসহ) এ পর্যন্ত ৬,৫০০ জন বিজ্ঞান শিক্ষককে (প্রতিটি স্কুল থেকে একজন করে) নতুন বিজ্ঞান বইয়ের ব্যবহার সম্পর্কে পরিচিতিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে যা শ্রেণীকক্ষে পড়ানোর আগে শিক্ষকরা যাচাই করে দেখেছেন।

১৫·৪৪ মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র ভর্তি ১৯৭৯-৮০ সালের ২০ লাখ থেকে ১৯৮৪-৮৫ সালে ২৫ লাখে বৃদ্ধি পাবে। একই মেয়াদে ছাত্র ছাত্রীর অনুপাত ৭৪ : ২৬ থেকে ৬৮ : ৩২এ উন্নীত হবে। ১৫·৬ ও ১৫·৭ সারণীতে মাধ্যমিক শিক্ষার বছর ও শ্রেণীওয়ারী ছাত্র ভর্তির লক্ষ্য মাত্রাগুলি দেখানো হয়েছে।

সারণী ১৫·৬

মাধ্যমিক শিক্ষা: পরিকল্পিত

বছর	মোট	বালক	বালিকা	বালক ও বালিকার অনুপাত।
১৯৮০	২০·০০	১৪·৮০	৫·২০	৭৪:২৬
১৯৮১	২০·৪০	১৪·৯৭	৫·৪৩	৭৩:২৭
১৯৮২	২১·২০	১৫·২৭	৫·৯৩	৭২:২৮
১৯৮৩	২২·১৫	১৫·৭১	৬·৪৪	৭১:২৯
১৯৮৪	২৩·৪০	১৬·২৬	৭·১৪	৬৯:৩১
১৯৮৫	২৫·০০	১৭·০০	৮·০০	৬৮:৩২

সারণী ১৫·৭

মাধ্যমিক শিক্ষা: শ্রেণী ভিত্তিক

বছর	৬ষ্ঠ শ্রেণী			৭ম শ্রেণী		
	মোট	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা	মোট
১৯৮০	৫·৫০	৪·০৭	১·৪৩	৫·২০	৩·৮৫	১·৩৫
১৯৮১	৫·৭০	৪·১৬	১·৫৪	৫.৩২	৩·৮৮	১·৪৪
১৯৮২	৫·৯৫	৪·২৮	১·৬৭	৫·৫০	৩·৯৬	১·৫৪
১৯৮৩	৬·২৭	৪·৪৫	১·৮২	৫·৭৪	৪·০৭	১·৬৭
১৯৮৪	৬·৬৭	৪·৬৪	২·০৩	৬·০৫	৪·২০	১·৮৫
১৯৮৫	৭·১৬	৪·৮৭	২·২৯	৬·৪৪	৪·৩৮	২·০৬

ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি

(লাখের অংকে)

বয়সগোষ্ঠির জনসমষ্টি (১১—১৫ বছর)			বয়সগোষ্ঠির জন্য জনসমষ্টির % হিসাবে ছাত্র ছাত্রী ভর্তি		
মোট	বালক	বালিকা	মোট	বালক	বালিকা
..	..	..	..	..	..
১১০·০১	৫৭·০১	৫৩·০০	১৮·৬৩	২৬·২৬	১০·৪৩
১১১·৭৩	৫৭·৮১	৫৩·৯২	১৮·৯৭	২৬·৪১	১১·০০
১১৩·৯১	৫৮·৮৪	৫৫·০৭	১৯·৪৫	২৬·৭০	১১·৬৯
১১৬·৬০	৬০·১৫	৫৬·৪৫	২০·০৭	২৭·০৩	১২·৬৫
১১৯·৭৪	৬১·৬৮	৫৮·০৬	২০·৮৮	২৭·৫৬	১৩·৭৮

ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি

(লাখের অংকে)

৮ম শ্রেণী			৯ম শ্রেণী			১০ম শ্রেণী		
মোট	বালক	বালিকা	মোট	বালক	বালিকা	মোট	বালক	বালিকা
৪·৫০	৩·৩৩	১·১৭	২·৬০	১·৯২	০·৬৮	২·২০	১·৬৩	০·৫৭
৪·৬০	৩·৩৬	১·২৪	২·৬৫	১·৯৩	০·৭২	২·২৩	১·৬৪	০·৫৯
৪·৭৫	৩·৪২	১·৩৩	২·৭২	১·৯৬	০·৭৬	২·২৮	১·৬৫	০·৬৩
৪·৯৫	৩·৫১	১·৪৪	২·৮৩	২·০১	০·৮২	২·৩৬	১·৬৭	০·৬৯
৫·২১	৩·৬২	১·৫৯	২·৯৯	২·০৮	০·৯১	২·৪৮	১·৭২	০·৭৬
৫·৫৪	৩·৭৭	১·৭৭	৩·২১	২·১৮	১·০৩	২·৬৫	১·৮০	০·৮৫

১৫·৪৫ **শিক্ষক প্রশিক্ষণ:** ইহা ক্রমান্বয়ে অনুমিত হচ্ছে যে শিক্ষা ব্যবস্থার পদ্ধতি ও বিষয় উভয় ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনসহ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণের পদ্ধতিতে নতুন শক্তি সঞ্চার ও আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। প্রাথমিক স্তরে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক স্তরে নূতন পাঠ্যক্রম প্রবর্তন, বিদেশী ভাষা হিসেবে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ, বিজ্ঞান শিক্ষা, পরামর্শ দান ও নির্দেশনা প্রশাসন ও তত্ত্বাবধান এবং মৌল বিষয় হিসেবে জনসংখ্যা সংক্রান্ত শিক্ষা দানের বিষয়ের জন্য শিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষণ ও বিস্তৃত পরিসরে পূর্ণ প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন।

১৫·৪৬ শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমগুলি বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে/নিতে হবেঃ

(ক) বিদ্যমান প্রাইমারী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলি ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলির বার্ষিক শিক্ষার্থী গ্রহণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য চলতি স্কীমগুলি সম্পূর্ণ করা হবে।

(খ) তিনটি নতুন প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে।

(গ) প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষায়িত্রীদের হোস্টেল সুবিধে বৃদ্ধি করা হবে।

(ঘ) প্রতিটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে গবেষণাগার সুবিধে বাড়ানো হবে এবং প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হবে।

(ঙ) নতুন পাঠ্যক্রমগুলির সঙ্গে পরিচিতির জন্য সকল শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে জরুরী কার্যক্রম হিসেবে নানা সংক্ষিপ্ত কোর্সের আয়োজন করা হবে। সাথে সাথে ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে পাঠ্যক্রম পরিচিতি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে।

(চ) পাঠকক্ষ বা শ্রেণীতে পড়ানোর আগে নতুন পাঠ্য বইগুলি শিক্ষকদের সাহায্য নিয়ে প্রাক্ যাচাই করা হবে ও ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর ইংরেজী, বাংলা ও পাঠ্য বইগুলি ইতিমধ্যেই অনুরূপ প্রাক্ যাচাই করা হয়েছে।

(ছ) মৌলিক শিক্ষা একাডেমীতে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের শিক্ষক এবং প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার তত্ত্বাবধায়ক ও প্রশাসকদের চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

(জ) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ক্রমান্বয়ে 'পত্র যোগাযোগ কোর্স' এবং সান্ধ্য কোর্সের প্রবর্তন করা হবে। শ্রেণী কক্ষে শিক্ষাদানের উৎকর্ষ সাধনের জন্য বেতার ও টিভি কাজে লাগানো হবে।

(ঝ) প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের কার্যক্রমের সঙ্গে জনসংখ্যা শিক্ষা কার্যক্রমের প্রযুক্তিগত সংহতি সাধন করা হবে।

(ঞ) মাদ্রাসার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বিদ্যমান শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলিতে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধে গড়ে তোলা হবে।

(ট) শিক্ষা প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলিতে বিদেশী ভাষা হিসেবে ইংরেজী ভাষা শিক্ষাদানে উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিশেষ বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হবে। পাঠ্যসূচীগুলির আধুনিকীকরণ করা হবে এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজীর শিক্ষকদের জন্য সেমিনার ও প্রশিক্ষণ কোর্সেরও আয়োজন করা হবে।

(ঠ) প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলিতে 'সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন' কোর্সগুলির মেয়াদ এক থেকে দুই বছরে বৃদ্ধি করা হবে।

(ড) শিক্ষার ক্ষেত্রে গবেষণার কাজ ও নতুন সমীক্ষা কার্যক্রম হাতে নেবার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্প ও গবেষণা ইনস্টিটিউটকে আরও শক্তিশালী করা হবে।

১৫·৪৭ **মাদ্রাসা শিক্ষাঃ** ১৯৮১ সালে ২,৪৫০টি মাদ্রাসা ছিল (দাখিলঃ ১,৩৬১, আলীম ৪৫২, ফাজিল ৫৭৫, কামিল ৬২) এগুলির মধ্যে দুটি সরকারের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত। এই মাদ্রাসাগুলিতে ছাত্র ও শিক্ষকের মোট সংখ্যা যথাক্রমে ৪,৩০,০৬২ ও ২৬,৬৬২।

১৫·৪৮ অধিকাংশ মাদ্রাসা ভবনের অবস্থা ভাল নয়। আর সেগুলিতে আসবাবপত্র ও সাজ সরঞ্জামের অভাবও প্রকট। এছাড়া মাদ্রাসা পাঠ্যক্রমের আধুনিকীকরণ ও সর্বসাম্প্রতিক করে তোলা, বিশেষ করে বিভিন্ন বিজ্ঞান কোর্সের প্রবর্তন করা দরকার।

১৫·৪৯ মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে/নিতে হবেঃ

(ক) আলিম ও ফাজীল স্তরে ১৫০টি মাদ্রাসার বিজ্ঞান শিক্ষাদানের সুযোগ-সুবিধে দেওয়া হবে (আলীম ও ফাজিল স্তরে যথাক্রমে এসএসসি ও এইচএসসি স্তরে বিজ্ঞান কোর্সের প্রবর্তন করা হবে)।

(খ) জাতীয় পাঠ্যক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সহযোগিতায় পাঠ্যক্রমসমূহ সর্বসাম্প্রতিক করে তোলা হবে।

(গ) মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডকে স্বয়ম্ভর হওয়ার মত শক্তিশালী করে তোলা হবে। এই বোর্ডকে মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের দায়িত্ব দেওয়া হবে।

(ঘ) আরবী ভাষায় বলা ও লেখার দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে আরবী শিক্ষাদানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

(ঙ) পাঠ্যপুস্তকের উৎকর্ষ বিধান করা হবে।

(চ) কামিল পর্যায়ে ইসলামিয়াতের ঐতিহ্যবাহক দিকগুলির ওপর গবেষণায় গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

১৫·৫০ মহাবিদ্যালয় শিক্ষাঃ ১৯৭৩ সালে ৫০০ থেকে ১৯৮১ সালে দেশে মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা হয়েছে ৫৫৬ (উচ্চ মাধ্যমিকঃ ২১৩, ডিগ্রীঃ ৩৪৩)। ৫৫৬টি কলেজের মধ্যে ১০৮টি কলেজ (উচ্চ মাধ্যমিকঃ ৩, ডিগ্রী ১০৫) সরকারী ব্যবস্থাপনাধীন। বাকী ৪৪৮টি কলেজ বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় চলে। ৫৮টি মহিলা মহাবিদ্যালয় ছাড়াও অন্যান্য বেশীরভাগ কলেজেই সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

১৫·৫১ উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা ২·৭৭ লাখ (১৯৮০ সালে)। এর মধ্যে ১·৩৩ লাখ মানবিক, ০·৯৩ লাখ বিজ্ঞান এবং ০·৫১ লাখ বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী। ১৯৮৫ সাল নাগাদ এই স্তরে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি বৃদ্ধি পেয়ে ৩·৩৭ লাখে উন্নীত হবে এবং এই ছাত্র-ছাত্রীদের শতকরা ৪৫ ভাগ মানবিক বিভাগ, শতকরা ৩৫ ভাগ বিজ্ঞান বিভাগ ও শতকরা ২০ ভাগ বাণিজ্য বিভাগে হবে বলে ধরা হয়েছে।

১৫·৫২ স্নাতক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির পরিমাণ ১·১৯ লাখ (১৯৮০ সালে) হবে বলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে ০·৫৭ লাখ (৪৮ শতাংশ) ছাত্র-ছাত্রী মানবিক, ০·৪০ লাখ বিজ্ঞান এবং ০·২২ লাখ বাণিজ্য বিভাগে ভর্তি হবে। ১৯৮৫ সালে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি বেড়ে ১·৪৪ লাখে দাঁড়াবে। এর ৪৫ শতাংশ মানবিক, ৩৫ শতাংশ বিজ্ঞান ও ২০ শতাংশ বাণিজ্য বিভাগে ভর্তি হবে।

১৫·৫৩ অধিকাংশ বেসরকারী মহাবিদ্যালয় ও সেই সঙ্গে নতুন জাতীয়করণ মহাবিদ্যালয়গুলির কাজ ন্যূনতম মৌলিক সুযোগ-সুবিধে ছাড়াই চলবে। এই মহাবিদ্যালয়গুলির অধিকাংশেই (কলা ও বাণিজ্যে) চিরাচরিত উদার নৈতিক শিক্ষা কোর্সসমূহ প্রচলিত রয়েছে চাকুরী সংস্থানের বাজারে যে শিক্ষার চাহিদা খুবই নগণ্য।

১৫·৫৪ মহাবিদ্যালয় পর্যায়ে দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী হচ্ছে—

(ক) বিভিন্ন বিভাগ ও বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি যৌক্তিক মাত্রাভিত্তিক করে তোলা;

(খ) ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে বাছাই ব্যবস্থা প্রয়োগ;

(গ) বর্তমান সুযোগ-সুবিধার সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ব্যবহার সুসংহত করে তোলা;

(ঘ) জনশক্তির চাহিদা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গ্রাজুয়েট তৈরী করা;

নতুন ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী কলেজ প্রতিষ্ঠা নিরুৎসাহিত করাই হবে সাধারণ নীতি।

১৫·৫৫ কলেজ শিক্ষার নিম্নলিখিত কার্যক্রমের পরিকল্পনা করা হয়েছেঃ

(ক) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চলতি প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ করা হবে।

(খ) যেসব জেলা সদরে মহিলা মহাবিদ্যালয় নেই, সেইসব জেলার প্রতিটিতে একটি করে মহিলা মহাবিদ্যালয় গড়ে তোলা হবে।

(গ) নতুন জাতীয়কৃত কলেজগুলির উন্নয়ন সাধন করা হবে।

(ঘ) বিজ্ঞান শিক্ষাদানের সুযোগ-সুবিধের ব্যবস্থা করার জন্য নির্বাচিত বেসরকারী উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রী মহাবিদ্যালয়গুলিকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা হবে। (৩০টি বেসরকারী মহাবিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষাদানের একটি স্কীম বর্তমানে বাস্তবায়িত করা হচ্ছে।

১৫·৫৬ কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে রয়েছেঃ একটি প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয়; চারটি প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়, ১৭টি পলিটেকনিক, ৫৪টি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ১টি বৃত্তি শিক্ষাদানকারী, ১টি চর্ম প্রযুক্তিবিদ্যা মহাবিদ্যালয়, ১টি বস্ত্র প্রযুক্তিবিদ্যা কলেজ, ১টি কাঁচ ও সিরামিক ইনস্টিটিউট এবং একটি গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট।

১৫·৫৭ কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। এই সমীক্ষাগুলি থেকে নিম্নবর্ণিত ত্রুটিবিচ্যুতি ও ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছেঃ

(ক) বর্তমানে প্রশিক্ষণের যেসব সুযোগ-সুবিধে রয়েছে তার পুরোটা কাজে লাগানো হচ্ছে না;

(খ) দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার সঙ্গে পাঠক্রমগুলির সম্পর্কহীনতা;

(গ) শিল্পগুলির সঙ্গে অপর্যাপ্ত যোগাযোগ; এবং

(ঘ) কর্ম সংস্থানের অনিশ্চয়তা।

১৫·৫৮ দক্ষ কর্মী, কারিগর ও প্রকৌশলীর অনুপাত ১৫ ঃ ৫ ঃ ১ অর্জনের জন্য দক্ষ কর্মী ও কারিগর দ্রুত প্রশিক্ষিত করে তোলাই হবে কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য।

১৫·৫৯ নিম্নোক্ত কার্যক্রমগুলি হাতে নেওয়া হয়েছেঃ

(ক) যেসব বাস্তব সুযোগ-সুবিধের অস্তিত্ব রয়েছে সেগুলিকে কাজে লাগানোর জন্য কিছু প্রান্তিক সম্প্রসারণসহ সকল প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ের সুযোগ-সুবিধেগুলিকে সুসংহত করা।

(খ) কারিগরী শিক্ষা স্টাফ কলেজ ও প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ের কাজ সম্পূর্ণ করা;

(গ) বগুড়ায় বৃত্তি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও সকল বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের চলতি কাজ সম্পূর্ণ করা;

(ঘ) বস্ত্রশিল্প প্রযুক্তিবিদ্যা মহাবিদ্যালয়ের কাজের সমাপ্তি;

(ঙ) যেসব পলিটেকনিকে দ্বিতীয় শিফটে ট্রেডকোর্স নেই সেইসব প্রতিষ্ঠানে এই দ্বিতীয় শিফট্ তথা ট্রেড কোর্সের সুবিধে প্রবর্তন করা (ছাত্র ভর্তির সময় ও ক্লাশ শুরুর মধ্যে দীর্ঘ ১৮ মাসের যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে সেটা দূর করার জন্য সম্প্রতিককালে কিছু পলিটেকনিকে দ্বিতীয় শিফট চালু হয়েছে);

(চ) পাঁচটি কারিগরী ইনস্টিটিউটকে পলিটেকনিকে রূপান্তর এবং অবশিষ্ট ১২টি পলিটেকনিকের উন্নয়ন;

(ছ) কারিগরী শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি;

(জ) কারিগরী শিক্ষার পাঠক্রমসমূহ ও পাঠ্যপুস্তকের আধুনিকীকরণ;

(ক) মহিলাদের জন্য একটি পলিটেকনিক স্থাপন;

(গ) চর্ম প্রযুক্তিবিদ্যা ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যুক্ত চর্ম শিল্পের জন্য অভিন্ন ফিনিসিং কেন্দ্র স্থাপন; এবং

(ঘ) চর্ম প্রযুক্তিবিদ্যা ইনস্টিটিউটের মান উন্নয়ন ও উন্নয়ন (এই প্রতিষ্ঠান বর্তমান সার্টিফিকেট ও আর্টিজান কোর্স পরিচালনা ছাড়াও ডিগ্রী কোর্সের সমপ্রবর্তন করেছে)।

১৫·৬০ কারিগরী শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ছাত্র ভর্তির অভিক্ষেপ ১৫·৮ সারণীতে দেওয়া হয়েছে।

১৫·৬১ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাঃ গত তিন দশকে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ১৯৭৭ সালের ২৭,৩৬৯ থেকে ১৯৮১ সালে ৩৭,১০৮এ (পুরুষ ৩০,৪৭১, মহিলা ৬,৬৩৭) উন্নীত হয়েছে। আলোচ্য মেয়াদে শিক্ষকের সংখ্যা ২৬১ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২,৪০০ (পুরুষঃ ২,১৯১ ; মহিলাঃ ২০৯) হয়েছে। ১৯৮৫ সালে ৮,০০০ মহিলাসহ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ৪০,০০০ এ উঠতে পারে।

১৫·৬২ অর্থনীতির একান্ত চাহিদার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ বলেই মনে হয়। সমাজের জটিল সম্পর্কের ক্ষেত্রে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা উদ্ভাবনী ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। দেশে যে রকম উচ্চ শিক্ষা চলছে তাতে খুব সম্ভবতঃ অতি সরবরাহ জনিত কারণে বুদ্ধিজীবী অতিশয্যের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও এই শিক্ষা ব্যবস্থায় বাস্তবিক ও আর্থিক উভয় হিসাবেই বিপুল অপচয় ঘটে।

সারণী ১৫.৮

কারিগরী শিক্ষা : পরিকল্পিত ছাত্র ভর্তি

	স্থিতিমাত্রা (১৯৮০)		পরিকল্পিত (১৯৮৫)	
	বার্ষিক কতজন ভর্তি হতে পারে	ভর্তি	বার্ষিক কতজন ভর্তি হতে পারে	ভর্তি
১। প্রকৌশল :	৭৫০	২,১১০	৯০০	৩,৩৯০
(ক) প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় (চার বছর মেয়াদী কোর্স)	৭২০	২,০৮০	৭২০	২,৮৮০
(খ) কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং (তিন বছরের কোর্স)	..	..	১৫০	৪৫০
(গ) বরন বিদ্যা মহাবিদ্যালয় (২ বছর মেয়াদী কোর্স)	৩০	৩০	৩০	৩০
২। কারিগরী :				
(ক) পলেটেকনিক (তিন বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্স)	৪,২৪০	১১,৮৩৫	৫,৮০০	১৭,৫০০
(খ) মনো টেকনিক্স (তিন বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্স)	১৯৫	৫৮৫	২৫০	৭৫০
(গ) বানিজ্যিক (৩ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্স	১,৩৬০	২,৭২০	৫,০০০	১০,০০০
(ঘ) বৃত্তিমূলক (দক্ষ) (২ বছর মেয়াদী কোর্স)	৩,২১০	৬,৪২০	৫,০০০	১০,০০০

১৫·৬৩ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী ঃ

(ক) বর্তমান সুযোগ-সুবিধাগুলি সুসংহতকরণ;

(খ) অর্থনীতির অনুভূত চাহিদা অনুসারে বিজ্ঞান প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা, উদার কলা বিষয়ক বিভাগসমূহ ও সমাজ বিজ্ঞান ও পেশামূলক শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সংগতিবিধান;

(গ) ভর্তিকালীন বাছাই;

(ঘ) একই ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন বিশেষ করে বিজ্ঞানে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন মহিলা প্রার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার; এবং

(ঙ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় ছাত্র ভর্তি হার শতকরা ২৮ থেকে ৩২-এ বৃদ্ধি।

১৫·৬৪ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার নিম্নলিখিত কার্যক্রমের পরিকল্পনা রয়েছেঃ

(ক) বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে পুরোপুরি কার্যকর করার জন্য চলতি প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ করা হবে।

(খ) চারটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি বর্তমান পর্যায়ে স্থিতিশীল করা হবে ও যতটুকু বাড়তি সুযোগ-সৃষ্টি করা হয়েছে সেই অবধি ছাত্র ভর্তির প্রান্তিক বৃদ্ধি অনুমোদন করা হবে।

(গ) বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই প্রতিষ্ঠানে ২,০০০ পর্যন্ত ছাত্র ভর্তি করা যাবে। ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউটকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত করতে হবে (ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট ইতিমধ্যে ইসলামী বিশ্ব-বিদ্যালয়ভুক্ত করা হয়েছে)।

(ঙ) ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদ গড়ে তোলা হবে।

(চ) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে জোরদার করা হবে।

১৫·৬৫ বৃত্তিঃ বহুধা বিভক্ত গোষ্ঠী অধ্যুষিত সমাজের শিক্ষা পদ্ধতি সুযোগ-সুবিধের সমতার পরিবর্তে বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং সেই বৈষম্যকে কায়েমীও করে তোলে। শিক্ষার সুযোগ-সুবিধের বৈষম্য নানাভাবে সৃষ্টি হয়ে থাকে। এগুলির মধ্যে রয়েছেঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যতটা সম্ভব সারাটা দেশে সমানভাবে ছড়িয়ে নেই বরং কয়েকটি স্থানে কেন্দ্রভূত। জনগোষ্ঠির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশে দারিদ্র ও তুলনা-মূলকভাবে একটা ক্ষুদ্র অংশ বিত্তবান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উৎকর্ষগত ক্ষেত্রেও গৃহের পরিবেশ তারতম্য—এগুলির কারণেই এই অসাম্য দেখা দেয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও কিছু অসাম্যের অস্তিত্ব শুধু বাংলাদেশেই দেখা যায়। যেমন প্রথমেই বলা যায়, শিক্ষার সকল স্তরে ছেলেমেয়ের সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্যের অস্তিত্ব রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যেও শিক্ষা সুবিধের ক্ষেত্রে একই রকম ব্যাপক তারতম্য রয়েছে। তৃতীয়তঃ উৎকর্ষ সম্পন্ন শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রকট বৈষম্য বিদ্যমান।

১৫·৬৬ শিক্ষাগত সুযোগ-সুবিধের ক্ষেত্রে সমতাবিধানের একটা উপায় হিসেবে বৃত্তি প্রদান কার্যক্রমের উদ্দেশ্য প্রথমতঃ মেধাসম্পন্ন বালক-বালিকাদের শিক্ষা ও চূড়ান্তঃ পর্যায়ে উৎকর্ষ সম্পন্ন শিক্ষালাভের সুযোগ নিশ্চিত করা। এই কার্যক্রমের অন্যান্য উদ্দেশ্য হবে—নারী শিক্ষা ত্বরান্বিত করা এবং অনগ্রসর ও দারিদ্র জনগোষ্ঠির ছেলেমেয়েদের জন্য উদার বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করে শহর-গ্রামাঞ্চলের ব্যবধান কমানো।

১৫·৬৭ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

(ক) মেধা ও সম্পত্তির ভিত্তিতে সাধারণ বৃত্তি ও ষ্টাইপেন্ড ছাড়াও মেধাবী ছেলেমেয়েদের জন্য একটা "বৃত্তি ভান্ডার" গড়ে তোলা হবে। একেবারে নিম্নতম স্তর থেকে প্রতিভা খুঁজে তাদেরকে ওপরে উঠিয়ে আনার জন্য ৫ম ও ৮ম শ্রেণীর শিক্ষা শেষে বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং ইউনিয়ন ও থানা পরিষদের ভিত্তিতে বৃত্তি দেওয়া হবে।

(খ) উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের উপর মহকুমা ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

(গ) বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিতে স্নাতক ও সম্মান পরীক্ষার ফলাফল অনুসারে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

(ঘ) দাখিল, আলিম ও ফাজিল পরীক্ষার ফল অনুসারেও বৃত্তি প্রদান করা হবে।

(ঙ) তফসিলী জাতি, উপজাতীয় অনগ্রসর গোষ্ঠির ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এবং স্বীকৃত মেধার গ্রামের মেয়েদেরকে বিশেষ স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে।

(চ) বিভিন্ন স্তরের বৃত্তি ও স্টাইপেন্ডের পরিমাণ বাড়ানো হবে।

১৫·৬৮ এই কার্যক্রমগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য বর্তমানে দুটি স্কীম চালু রয়েছে। স্কীমগুলির আওতায় সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষার জন্য আভ্যন্তরীন পর্যায়ে বৃত্তি ও স্টাইপেন্ড প্রদান করা হয়। পাঁচ বছরে (১৯৮০—৮৫) এই দুই স্কীম খাতে মোট ব্যয় যথাক্রমে ৩৮·৮৪ কোটি টাকা ও ১১·৩৬ কোটি টাকা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ১৯৮০—৮২ মেয়াদে এই দুই স্কীমের আওতায় বৃত্তি ও স্টাইপেন্ড খাতে ১৬·৬২ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। একেবারে নিম্নস্তর থেকে প্রতিভা সন্ধানের আওতায় (৫ম শ্রেণী শেষে) বিভিন্ন স্তরে মেয়েদের জন্য বেশ কয়েকটি বৃত্তি সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বৃত্তি ও স্টাইপেন্ডের মূল্যমান ১৯৮০ সালের স্তর থেকে বাড়ানো হয়েছে এবং অনগ্রসর গোষ্ঠিগুলির ছেলেমেয়েদের জন্য স্টাইপেন্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৫·৬৯ **নারী শিক্ষা:** যদিও বাংলাদেশের জন সমষ্টির প্রায় অর্ধেকই নারী, নারী শিক্ষার হার পুরুষদের শতকরা ৩২·৯ ভাগের তুলনায় শতকরা ১৪·৩ ভাগ। নারীর অবস্থানগত মর্যাদাবৃদ্ধির সকল অতীত প্রয়াস সত্ত্বেও নারী পুরুষের শিক্ষায়তনে ভর্তি ও বিদ্যালয় ছাড়ার হারের মধ্যে অসমতা রয়ে গেছে। ছেলে ও মেয়েদের জন্য শিক্ষার সুযোগ-সুবিধের ক্ষেত্রেও বিরাট তারতম্য রয়েছে।

১৫·৭০ ভবিষ্যতে কার্যক্রম প্রণয়নের বেলায় গ্রামাঞ্চলের নারীদের চাহিদা মেটানোর প্রতি অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সুনির্দিষ্টভাবে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি নেওয়া হবে:

(ক) মেয়েদের জন্য বিভিন্ন স্তরে বেশ কিছু বৃত্তি সংরক্ষিত রাখা হবে।

(খ) প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের কার্যক্রমে সুবিধে থাকার শর্তে মহিলাদের জন্য শতকরা ৫০ ভাগ আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং বর্তমান প্রাইমারী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলিতে মহিলা প্রশিক্ষার্থীদের জন্য বাড়তি হোস্টেল সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে।

(গ) প্রাথমিক শিক্ষক বাছাইয়ে যোগ্য মহিলা প্রার্থীদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিভিন্ন অনুষদে মহিলা প্রার্থীদের জন্য কিছু আসনসংরক্ষিত রাখা হবে এবং গ্রামাঞ্চল থেকে আগত প্রতিভাময়ী মহিলাদেরকে নিয়মানুযায়ী বৃত্তি প্রদান ছাড়াও বিশেষ ভর্তুকির আকারে উৎসাহ দেওয়া হবে।

(ঙ) প্রতি জেলা সদরে একটি করে মহিলা মহাবিদ্যালয়ের উন্নয়ন করা হবে এবং মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মেয়েদের জন্য হোস্টেল সুবিধে বাড়ানো হবে (১৯৮০-৮১ সালে ১৭টি বেসরকারী মহিলা মহাবিদ্যালয় উন্নয়নের একটি স্কীমের বাস্তবায়ন সম্পূর্ণ হয়েছে)।

(চ) মহিলাদের জন্য একটি পলিটেকনিক স্থাপন করা হবে।

১৫·৭১ **শিক্ষামূলক প্রযুক্তি ও দূর শিক্ষা দান:** শিক্ষাদানমূলক প্রযুক্তি বলতে যে মাধ্যমগুলিকে শিক্ষাদান ও শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে কাজে লাগানোর সম্ভব সেগুলিকেই বোঝায়। আর দূর শিক্ষাদান বলতে যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানকে বোঝায়।

১৫·৭২ বাংলাদেশে দূরে শিক্ষাদানের ধারণাটি নতুন আর শিক্ষাদানমূলক প্রযুক্তি কার্যতঃ অডিও-ভিজুয়াল সাজসরঞ্জাম টিভি, ছায়াছবি ও চার্টের মধ্যেই সীমিত। যেহেতু দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পেয়েছে, সেজন্য শিক্ষাদানমূলক প্রযুক্তি ব্যাপক প্রয়োগের মাধ্যমে দূরে শিক্ষা দানের আয়োজন একান্ত জরুরী ও অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

১৫·৭৩ শিক্ষাদানমূলক প্রযুক্তি ও দূরে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যাবলী হবে নিম্নরূপঃ

(ক) যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে ভাল শিক্ষক ও বইপত্রের অভাব কাটানো;

(খ) শিক্ষার উৎকর্ষ বিধানে সুযোগ-সুবিধে দান;

(গ) শিক্ষাদানের সহায়ক জিনিষপত্র ও সরঞ্জামে সম্পূরক সরবরাহ;

(ঘ) শ্রেণীকক্ষে ব্যবহার উপযোগী স্থানীয়ভাবে শিক্ষাদানের সহায়ক সরঞ্জাম ও জিনিসপত্র উদ্ভাবনে শিক্ষকদেরকে উৎসাহদান; এবং

(ঙ) প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমর্থন।

১৫·৭৪ নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম স্থির করা হয়েছেঃ

(ক) 'দূরে শিক্ষাদান ইনস্টিটিউট' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। (১৯৮৩ সালের এপ্রিল মাসে অডিওভিজুয়াল এডুকেশান সেন্টারটিকে স্কুল সম্প্রচার কার্যক্রমের সঙ্গে একত্রীভূত করা হয়। পুনর্গঠিত এই প্রতিষ্ঠান এখন "ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনাল মিডিয়া ও টেকনোলজী" নামে পরিচিত হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই প্রতিষ্ঠান উন্নয়নের জন্য ১·৭৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে)।

(খ) শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে টিভি সেট, ভিডিও টেপ, ক্যাসেট, টেপ রেকর্ডার, ওভারহেড প্রজেক্টর ও স্লাইড প্রজেক্টর দেওয়া হবে।

(গ) যেসব মাধ্যমিক স্কুলে বিদ্যুতের সুবিধে রয়েছে সেগুলিকে রেডিও সেট, রেকর্ডিং সেট ও অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহ করা হবে।

(ঘ) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে চার্ট, পোস্টার, গ্লোব ও মানচিত্র ইত্যাদির মত অডিও-ভিজুয়াল সহায়ক সরঞ্জাম দেওয়া হবে।

(ঙ) দূরে শিক্ষাদানের জন্য বেতার ও টিভির দ্বিতীয় চ্যানেল ব্যবহারের সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখা হবে।

(চ) বাংলাদেশ শিক্ষামূলক সরঞ্জাম বোর্ডে শিক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনের জন্য একটি মোটা অঙ্ক বরাদ্দ করা হবে। আনুমানিক (১০·১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ শিক্ষামূলক সরঞ্জাম বোর্ডে শিক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনের একটি স্কীম ১৯৭৬ সাল থেকে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে)।

১৫·৭৫ পাঠক্রম উন্নয়নঃ পাঠক্রম যে কোন শিক্ষা কার্যক্রম-এর প্রাণ। শিক্ষাকে অর্থবহ, সম্পর্কিত ও কার্যকর হতে হলে পাঠক্রম উন্নয়ন একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া হওয়া দরকার।

১৫·৭৬ মাত্র কিছুদিন আগেও বাংলাদেশে পাঠক্রমগুলির ওপর নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন পরিচালনার জন্য কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান ছিল না। পাঠক্রম প্রণয়ন ও এর সাম্প্রতিকীকরণের কাজটি আশু ভিত্তিতে করার জন্য মাঝে মধ্যে বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা একটা বিকাশশীল ও গতিময় পদ্ধতির জন্য সুবিধাজনক বা সহায়ক হয়নি। সেজন্য শিক্ষক গবেষকদের তরফ থেকে পাঠক্রমের নিরবচ্ছিন্ন পর্যালোচনা, সংস্কার ও আধুনিকীকরণ একান্ত প্রয়োজন। পাঠক্রমকে সমাজের চাহিদার আলোকে আরও অর্থবহ ও সম্পর্কিত করে তোলার জন্যও এর প্রয়োজন।

১৫·৭৭ পাঠ্যক্রম কার্যক্রমে পাঠ্যক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র *প্রতিষ্ঠা, পাঠ্যক্রম বিকাশে ব্যতিক্রমধর্মী অবদানের জন্য পুরস্কার প্রবর্তন এবং শিক্ষকরা পাঠ্যক্রমের ব্যাপারে যেসব কাজ বা মৌলিক গবেষণা করবেন তার উভয়ের জন্য মঞ্জুরী অন্তর্ভুক্ত।

১৫·৭৮ পাঠ্যক্রম উন্নয়ন কেন্দ্রের কাজগুলি হবে নিম্নরূপঃ

(ক) জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনসমূহ চিহ্নিত করা এবং সেগুলি পাঠ্যক্রমের আকার বাস্তবায়িত করা;

(খ) শিক্ষা ব্যবস্থায় নিরবচ্ছিন্ন উৎকর্ষমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পাঠ্যক্রমের পরিকল্পনা ;

(গ) পাঠ্যসূচী, কাজের স্কীম ও শিক্ষকদের জন্য সার গ্রন্থ প্রণয়ন ;

(ঘ) নতুন পাঠ্যক্রমগুলি ও শিক্ষাদানের উপকরণগুলির কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনে পরিবর্তন সাধন;

(ঙ) কর্মশিবির, সেমিনার ও বুলেটিন ইত্যাদির মাধ্যমে পাঠক্রম, শিক্ষা উপকরণ (সরঞ্জাম) ও পদ্ধতিতে উদ্ভাবনমূলক রদবদল সংক্রান্ত তথ্য প্রচার;

(চ) তত্ত্বাবধায়ক, শিক্ষক ও উর্ধতন শিক্ষক কর্মকর্তাদের জন্য চাকুরীকালীন কোর্সের পরিকল্পনা ;

(ছ) পাঠ্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জরীপ পরিচালনা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন উদ্ভাবনমূলক বিকাশ ও শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে অবগতি।

১৫·৭৯ **পাঠ্যপুস্তকঃ** শিক্ষাদান ও গ্রহণ প্রক্রিয়ায় পাঠ্যবই মৌলিক উপকরণ। বর্তমানে বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শ্রেণীকক্ষে পাঠ্য বই ছাড়া কোন শিক্ষাদানমূলক উপকরণ বা সহায়ক সরঞ্জাম দেখতে পাওয়া যায় না। তাছাড়া পাঠ্যবইগুলিতে ইলাস্ট্রেশন জাতীয় যেসব নক্সা বা আঁকার হদিস পাওয়া যায় সেগুলি মানের দিক থেকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট। আরও একটি দুঃখজনক ব্যাপার এই যে, বইগুলি সময়মত ও পর্যাপ্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয় না। বিলিবণ্টনের ব্যবস্থাও সন্তোষজনক নয়।

১৫·৮০ পাঠ্য পুস্তক বোর্ড ও বেসরকারী প্রশাসকদের কার্যভূমিকার সংখ্যা সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মতান্ত্রিক করতে হবে। পাঠ্য বইয়ের ব্যবসায় সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত করা ও এর সংশ্লিষ্ট সমস্যাদির গোটা বিষয়টি পুনঃ পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির তত্ত্বাবধানে প্রতিযোগিতামূলক ভিত্তিতে বেসরকারী খাতকে ক্রমেই বেশী করে পাঠ্যবই উৎপাদন ও বণ্টনের কাজে লাগানো হচ্ছে (১৯৮৩ সালে ৯ম শ্রেণীর আটটি ও অষ্টম শ্রেণীর সব পাঠ্যবই বেসরকারী প্রকাশকরা প্রকাশ করেছেন)।

১৫·৮১ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্য পুস্তক প্রকাশকের দায়িত্ব বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের। উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ও বেসরকারী প্রকাশকরা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন ও উৎপাদন করে। এছাড়া, উচ্চতর শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনার দায়িত্ব বাংলা একাডেমী ও বেসরকারী প্রকাশকদের ওপর ন্যস্ত রয়েছে।

১৫·৮২ পাঠ্যবই উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যাবলীর কথা চিন্তা করা হয়েছেঃ

(ক) শিক্ষাবর্ষ শুরুর বেশ আগেই পাঠ্য বই প্রণয়ন, উৎপাদন ও সুষ্ঠু বিলিবণ্টন নিশ্চিত করার একটা উপযুক্ত প্রক্রিয়া উদ্ভাবন;

(খ) পাঠ্য বই প্রণয়ন, উৎপাদন ও বণ্টন কাজের জন্য কর্মচারী প্রশিক্ষণ ; এবং

(গ) প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তকের উৎকর্ষসাধন।

---

*পাঠ্যক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র ১৯৮০ সালে স্থাপন করা হয়েছে।

১৫·৮৩ ঐসব উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রম স্থির করা হয়েছেঃ

(ক) যথাক্রমে সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, উৎপাদন ও বণ্টনের উপযুক্ত করে বাংলাদেশ স্কুল পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে পুনর্গঠিত করা হবে;

(খ) ঢাকা ও দেশের অন্যান্য অঞ্চলে পাঠ্যবই ছাপানোর উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধে দেওয়া হবে;

(গ) পাঠ্যবই উৎপাদনে নিয়োজিত কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ সুবিধে নিশ্চিত করার জন্য গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট-এর সঙ্গে ব্যবস্থা করা হবে;

(ঘ) জাতীয় পাঠ্যক্রম উন্নয়ন কেন্দ্রকে পাঠ্যবই প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হবে এবং নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা কর্মেও নিয়োজিত থাকবে;

(ঙ) বাংলাদেশ স্কুল পাঠ্য পুস্তক বোর্ডের উপর চাপ কমানোর জন্য সারা দেশে বেসরকারী প্রকাশকদেরকে উৎকর্ষ সম্পন্ন পাঠ্য পুস্তক উৎপাদনে নানারকম উৎসাহ দেওয়া হবে;

(চ) কারিগরী শিক্ষা বোর্ড কারিগরী ও বৃত্তিমূলক বিষয়ে পাঠ্যবই প্রণয়ন ও প্রকাশনার দায়িত্ব নেবে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ইসলামী ফাউণ্ডেশনের সহযোগিতায় মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয় পাঠ্যবইয়ের প্রয়োজন মেটাবে।

১৫·৮৪ **শিক্ষা পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনঃ** বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্র সুষ্ঠু ও পরিপূর্ণ-ভাবে প্রশাসিত নয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর সংশ্লিষ্ট পরিদপ্তরগুলির আয়তন ও গঠনের পরিবর্তন হয়েছে অতি সামান্যই, যদিও শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা দ্রুত বেড়ে গিয়েছে। বর্তমানে ৫০ হাজারেরও বেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম দেখাশুনার জন্য মাত্র ৭৫০টি প্রশাসনিক ও তত্ত্বাবধায়ক পদ রয়েছে।

১৫·৮৫ প্রশাসনিক ও পরিকল্পনা কর্মচারীর অভাবে শিক্ষার উৎকর্ষ ও শিক্ষাপদ্ধতির আভ্যন্তরীণ দক্ষতা হ্রাস পেয়েছে। শিক্ষা পদ্ধতি অতি মাত্রায় কেন্দ্রীভূত হওয়ার ব্যাপারটি এই পদ্ধতির আরও একটি বড় দুর্বলতা। অতি সামান্য বিষয় অত্যন্ত উর্ধতন কর্মকর্তাদের গোচরে আনা হলেও সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যস্তর ও স্থানীয় কর্মকর্তাদেরকে সম্পর্কিত করা হয়নি।

১৫·৮৬ সমস্যার মূলে কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে শিক্ষা প্রশাসনকে যৌক্তিক করে তোলা এবং সকল স্তরে শিক্ষার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় গোটা সমষ্টির ব্যাপকতর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা দরকার।

১৫·৮৭ শিক্ষা পরিকল্পনা ও প্রশাসন ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার/করতে হবেঃ

(ক) জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ প্রতিষ্ঠা;

(খ) প্রতিষ্ঠাকরণঃ

(১) প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর,

(২) মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা পরিদপ্তর,

(৩) নিরিক্ষা ও পরিদর্শন পরিদপ্তর,

(৪) জাতীয় শিক্ষা প্রশাসন, সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা;

(গ) জাতীয় পাঠ্যক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র ও বাংলাদেশ স্কুল পাঠ্যপুস্তক বোর্ড একত্রীভূতকরণ;

(ঘ) প্রকল্প প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা ও পর্যবেক্ষণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা সেলকে জোরদার করা; এবং

(ঙ) থানা প্রশাসনের আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা।

১৫·৮৮ **শিক্ষাগত পরিসংখ্যান, মূল্যায়ন ও গবেষণা:** শিক্ষা পরিকল্পনা ও গবেষণার জন্য সর্বসাম্প্রতিক ও সঠিক উপাত্ত একান্ত জরুরী। শিক্ষাগত পরিসংখ্যানসমূহ সংগ্রহ, সংকলন ও প্রচারের জন্য যথোপযুক্ত প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাও অপরিহার্য।

১৫·৮৯ নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যাবলী অর্জন দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য:

(ক) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে সরাসরি প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ এবং ঐ সংগৃহীত উপাত্ত সংকলন, প্রকাশনা ও সমীক্ষার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা;

(খ) শিক্ষা প্রকল্পগুলি মূল্যায়নের একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন; এবং

(গ) কার্যক্রম ও মৌলিক গবেষণামূলক তৎপরতা সংগঠন।

১৫·৯০ দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ব্যয়বরাদ্দের জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলি প্রস্তাব করা হয়েছে:

(ক) বাংলাদেশ শিক্ষাগত তথ্য ও উপাত্ত ব্যুরোকে পুনর্গঠিত ও জোরদার করা হবে এবং শিক্ষা পরিসংখ্যান ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটার পদ্ধতি প্রবর্তনের চেষ্টা করা হবে।

(খ) দেশের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাগত মানচিত্র প্রণয়নের জন্য শিক্ষাগত মানচিত্র প্রণয়ন ও স্থান পরিকল্পনার কাজ হাতে নেওয়া হবে।

(গ) সকল সম্পূর্ণ প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে মূল্যায়নের একটি পদ্ধতি চালু করা হবে।

(ঘ) উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষকদেরকে বছরে অন্ততঃপক্ষে একটি করে গবেষণাপত্রও প্রকাশ করতে হবে।

(ঙ) শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের জন্য প্রশংসাজনক গবেষণা কর্মের জন্য জাতীয় পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র এবং মূল্যবান সমীক্ষার জন্য আর্থিক উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে।

১৫·৯১ **পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার:** পরীক্ষায় কৃতকার্যতার বৈধতা নির্ভরযোগ্যতা ও বস্তুমুখীনতার উন্নীত সাধনের জন্য পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কারের কাজ হাতে নেওয়া হবে এবং ছাত্রদের বোধশক্তি সহজাত সামর্থ্য ও বিদ্যালয়ে অর্জিত কৃতিত্ব নিরূপণের জন্য দশম শ্রেণীর পর একশ্রেণীর উদ্দেশ্যমূলক যাচাই বা পরীক্ষা ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা হবে।

১৫·৯২ **পরামর্শদান ও নির্দেশনা:** ছাত্ররা যাতে শিক্ষাজীবনে ও বৃত্তিমূলক পেশায় যথার্থটি বেছে নিতে পারে সে জন্য নির্দেশনা ও পরামর্শদানমূলক সেবা একান্ত আবশ্যক। এ ধরণের পরামর্শদান-মূলক সেবার অনুপস্থিতিতে বেশীরভাগ ছাত্রই আগে থেকে কোনরকম ভাবনা চিন্তা ছাড়াই কিংবা তাদের সামর্থ্য ও সহজাত প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য না করেই শুধু বাবা-মায়ের ইচ্ছে অনুযায়ী তাদের পড়াশোনা বা পেশায় ক্ষেত্র বেছে নেয়। এর পরিণামে পরীক্ষাগুলিতে বিপুল হারে ছাত্ররা ফেল করে সম্পদের বিপুল অপচয় ঘটায়। আর এর দরুণ ব্যাপক বেকারত্ব ও জনজীবনে হতাশা দেখা দেয়।

১৫·৯৩ দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ হবে:

(ক) নিজ নিজ সামর্থ্য ও সহজাত প্রবণতা অনুসারে ছাত্রদেরকে শিক্ষাগত ভবিষ্যত বেছে নিতে সহায়তা দান;

(খ) শিক্ষার যেসব কোর্সের জন্য চাকুরীর বাজারে মোটেও চাহিদা নেই সেইসব কোর্সে ভর্তির জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের অযথা ভীড় কমিয়ে সম্পদের অপচয় বন্ধ করা; এবং

(গ) বাজারে কর্ম সংস্থান পরিস্থিতির খবরাখবর প্রচার।

১৫·৯৪ উল্লিখিত উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রম স্থির করা হয়েছেঃ

(ক) ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে তাদের জন্য সঠিক কোর্স বেছে নিতে পারে সেজন্য প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক পর্যায় অবধি এবং বেকার তরুণ-তরুণীদের জন্য জাতীয় আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ে নির্দেশনা ও উপদেশমূলক সার্ভিস পৌঁছে দেওয়া হবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষককে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হবে।

(খ) শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলির কার্যক্রমে নির্দেশনা ও উপদেশনা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(গ) জাতীয় শিক্ষা প্রশাসন, সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে নির্দেশনা ও উপদেশনা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কোর্স প্রবর্তন করা হবে।

১৫·৯৫ **বাংলাদেশ জাতীয় ক্যাডেট কোরঃ** বাংলাদেশ জাতীয় ক্যাডেট কোরের লক্ষ্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদেরকে শৃঙ্খলা ও সামরিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া। এই সংস্থাটি প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যূহের মত কাজ করবে এবং জাতীয় উন্নয়ন কার্যক্রম ও দুর্যোগাদির সময় সুশৃঙ্খল স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করবে।

১৫·৯৬ এই খাতে যেসব কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে সেগুলি হল—পদাতিক শাখায় পাঁচটি রেজিমেন্ট, নৌ-শাখায় তিনটি ফ্লোটিলা এবং বিমান শাখায় তিনটি স্কোয়াড্রন গঠন।

১৫·৯৭ **ক্যাডেট কলেজঃ** ৬০-এর দশকে দেশে কয়েকটি আবাসিক মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল আরও বেশী সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে উৎকর্ষ সম্পন্ন শিক্ষাদান নিশ্চিত করা। কিন্তু ক্যাডেট কলেজগুলির মত এই বিদ্যালয়গুলি উৎকর্ষ সম্পন্ন শিক্ষাদানের শর্ত মেটাতে ব্যর্থ হয়েছে। যেসব ভৌত সুযোগ-সুবিধে এই বিদ্যালয়গুলির জন্য গড়ে তোলা হয়েছে তার বেশীর ভাগই অব্যবহৃত পড়ে আছে। আর অন্যদিকে, ক্যাডেট কলেজগুলিতে ছাত্রভর্তির চাপ বেড়ে গিয়েছে প্রচণ্ডভাবে।

১৫·৯৮ যেসব ভৌত সুযোগ-সুবিধে ইতিমধ্যেই গড়ে তোলা হয়েছে সেগুলির সদ্ব্যবহার এবং ক্যাডেট কলেজগুলির ওপর বর্ধিত চাপ কমানোর জন্য দেশের ছয়টি আবাসিক মডেল স্কুলকে (ময়মনসিংহে মেয়েদের জন্য আবাসিক মডেল স্কুলটিসহ) ক্যাডেট কলেজে রূপান্তরিত করা হবে। সিলেট ও রংপুরের আবাসিক মডেল স্কুলগুলিকে ইতিমধ্যেই ক্যাডেট কলেজে রূপান্তরিত করা হয়েছে। পাবনা, বরিশাল, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহের আবাসিক মডেল স্কুলগুলিকে এই পরিকল্পনা মেয়াদে ক্যাডেট কলেজে রূপান্তরিত করা হবে।

খ. ধর্মীয় বিষয়াবলী

১৫·৯৯ ধর্মীয় মূল্যবোধ মানুষের বিবেক স্পর্শ করে এবং মানব প্রকৃতিতে যে পরস্পর বিরোধী উপাদান আছে সেগুলিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে। সকল মহান সভ্যতার মূলেই ধর্মের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের জনসাধারণ অত্যন্ত গভীরভাবে ধর্মপ্রাণ, জনগণের দৈনন্দিন জীবনের পরতে পরতে ধর্ম ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এজন্য ধর্ম নৈতিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবু পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব ঐ মূল্যবোধের অনেক কিছুই গ্রাস করেছে ও নৈতিক অবনতি ঘটিয়েছে। এগুলি রোধ করা আবশ্যক।

১৫·১০০ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ধর্মের গুরুত্বের বিষয়টি সম্প্রতি বাংলাদেশে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং ১৯৭৯/৮০ সালের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ধর্মীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ধর্ম বিষয়ক কার্যক্রমগুলি বাস্তবায়নের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় ৯·১৪ কোটি টাকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

অগ্রগতি পর্যালোচনা

১৫·১০১ ১৯৭৯/৮০ সালে বিভাগীয় সদরগুলিতে ৪টি ইসলামী সংস্কৃতি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, ইসলামী ফাউণ্ডেশনের জন্য একটি ছাপাখানা স্থাপন, বায়তুল মোকাররম মসজিদের সৌন্দর্য বিধান, ইমাম প্রশিক্ষণ ও একটি ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী

১৫·১০২ দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ধর্মীয় বিষয়গুলির উদ্দেশ্যাবলী হবে নিম্নরূপঃ

(১) ধর্মীয় শিক্ষাদানের মাধ্যমে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ; এবং

(২) ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ব্যাপক ও নিবিড় গবেষণার বিকাশ।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নীতি কৌশল

১৫·১০৩ নিম্নলিখিত কৌশলগুলি গৃহীত হবেঃ

(১) মানবিক সমাজ কল্যাণমূলক কাজের জন্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির যেসব সুযোগ-সুবিধে রয়েছে সেগুলির সদ্ব্যবহার;

(২) সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের মত ধর্মীয় নেতাদের কাজে লাগানো হবে;

(৩) মসজিদগুলি সমষ্টি ও গণশিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এছাড়াও মসজিদকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক তৎপরতাও পরিচালিত হবে।

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার কার্যক্রমগুলি

১৫·১০৪ দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলি হাতে নেওয়া হবেঃ

(১) ইসলামী ফাউণ্ডেশনকে জোরদার করা হবে;

(২) ইসলামী সংস্কৃতি কেন্দ্রগুলিকে জেলা পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত করা হবে এবং কেন্দ্রগুলির সঙ্গে গ্রন্থাগার ও প্রশিক্ষণ সুবিধে থাকবে;

(৩) জনসাধারণের বর্ধিষ্ণু চাহিদা মেটানোর জন্য ধর্মীয় গ্রন্থাদির প্রকাশনা চলতে থাকবে। ইসলামী ফাউণ্ডেশনের ছাপাখানা স্থাপনের কাজ সম্পূর্ণ করা হবে;

(৪) ইমাম সাহেবদেরকে সমাজে পরিবর্তন আনয়নকারী একটি শক্তি হিসেবে সমাজ ও অর্থনীতি উন্নয়নে প্রশিক্ষণ দান চলতে থাকবে;

(৫) মসজিদে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হবে;

(৬) বায়তুল মোকাররম মসজিদকে আরও উন্নত করা হবে;

(৭) বাংলায় ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজ চলতে থাকবে;

(৮) জনগোষ্ঠিকে সমাজ উন্নয়নমূলক সেবাদানের জন্য ধর্মীয় সংগঠনগুলিকে কার্যক্রমের ভিত্তিতে সহায়তা দেওয়া হবে;

(৯) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির উপাসনাস্থল ও ধর্মস্থানগুলি রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্প্রসারণের কাজ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়িত করা হবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে সমাজ উন্নয়ন ও ধর্মীয় কাজে সহায়তা দেওয়া হবে। এই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ তহবিল গঠন করা হবে।

গ. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা

১৫·১০৫ সংখ্যাগরিষ্ঠ বিপুল মানুষের অভাব ও দুঃখ দারিদ্র্যের অবর্ণনীয় অবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহারের ওপর নির্ভরশীল হওয়া ছাড়া বাংলাদেশের তেমন কোন বিকল্প নেই বললেই চলে। বাংলাদেশের জন্য সম্পদের পরিমাণ সীমিত—একথা স্বীকৃত: সেচের খাদ্য বস্ত্র, গৃহ,

ওষুধপত্র, জ্বালানী ইত্যাদি জনসাধারণকে যোগানের ক্রমবর্ধমান প্রবল সমস্যা, পর্যাপ্ত কর্মসংস্থাপনের সুযোগের ব্যবস্থা করা, একটা যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে জীবনমানের উৎকর্ষ বিধান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার দায়িত্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সাহায্য ছাড়া নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

১৫·১০৬ কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন এবং সমাজের আর সকল চাহিদার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ না করে শুধুমাত্র উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতির ব্যবস্থায় ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। এর অর্থ বিজ্ঞানকে প্রযুক্তির বিকাশ ও প্রয়োগের সঙ্গে সমানভাবে এগুতে হবে। এ বাস্তবতা অনুভূত হয়েছে ঠিকই কিন্তু প্রয়োগ হয়নি। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান প্রধানতঃ সত্যানুসন্ধানে নিয়োজিত। তবে নতুন নতুন উদ্ভাবনের কাজেও বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে যাতে নতুন কিছু উদ্ভাবিত হয় ও প্রযুক্তির বিকাশ ঘটে। এর ফলে, আবিষ্কারগুলিকে গবেষণাগার থেকে বাহিরে এনে শিল্প কারখানায় নিয়ে বাণিজ্যিক উৎপাদনের মাধ্যমে ঐ আবিষ্কারগুলিকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বাজারে ছাড়া সম্ভব হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কতটা চমৎকারভাবে এটা করতে সক্ষম হবে তা নির্ভর করে গবেষণা ও উন্নয়ন-এর উৎকর্ষের উপর। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং গবেষণা ও উন্নয়নের ভিত্তি খুবই সংকীর্ণ ও ভাসা ভাসা। এগুলির ভিত্তি একান্তই দুর্বল।

১৫·১০৭ বাংলাদেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে গবেষণা সামর্থের ওপর পরিচালিত এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা যায়, এদেশে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী ৩০,০০০ বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ, ১,০০,০০০ এর বেশী নিম্নস্তরের বিজ্ঞানী ও টেকনিশিয়ান কর্মচারী এবং ৭,০০০ ডিগ্রীধারী প্রকৌশলী রয়েছে। দেশে ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে এবং বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়নে নিয়োজিত আছে। তবুও দেখা যায় দেশের আর্থ, সামাজিক উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অবদান খুব বেশী তাৎপর্যপূর্ণ নয়। অতীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে কখনও সঠিকভাবে কাজে লাগানোর বিজ্ঞানিক ও কারিগরী তৎপরতা নির্দেশনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির কোন সচেতন প্রয়াস ছিল না। আর সেগুলিকে জীবনের চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করার জন্যও সমন্বিত করা হয়নি। নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও পুরোনো চিরাচরিত প্রযুক্তির উন্নতি বিধানের প্রয়াসও কার্যতঃ অনুপস্থিত। ফলে, কখনও যদি গবেষণাগারের পরীক্ষায় কোন ভাল ফল করা সম্ভব হয়েও থাকে তা হলেও পরীক্ষামূলক উৎপাদন পর্যায় থেকে সেটিকে বাণিজ্যিকভাবে কাজে লাগানার ক্ষেত্রে নানা সমস্যা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানীরা একে অপর থেকে কার্যতঃ বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করেন। শুধু তাই নয়, তাদের গবেষণার সঙ্গে বাইরের পৃথিবীরও কোন সংযোগ থাকে না।

১৫·১০৮ গবেষণা চালানো যায় বাংলাদেশে এমন চার ধরণের প্রতিষ্ঠানে আছে। এগুলি হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে সরকারী শিল্পখাত ও বেসরকারী খাতের নিয়ন্ত্রণাধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি। বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পরিচালিত গবেষণা কাজগুলির অধিকাংশই অতিমাত্রায় পুঁথিগত ও তাত্ত্বিক এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলি আগে কোন শিক্ষকের ডক্টরেট করার কাজেরই সম্প্রসারণ বিশেষ মাত্র। সরকারী অর্থসংস্থান পুষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির বেশীরভাগের কাজকর্মই পুনরাবৃত্তিমূলক। অবশ্য কিছু কিছু চমৎকার ব্যতিক্রমও আছে। সরকারী গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিতে গবেষণাকর্ম দেশের অর্থনৈতিক তাৎক্ষণিক আশু প্রয়োজন দ্বারা নির্ধারিত হয় না। তাছাড়া, একই বিষয়ের উপর বিভিন্ন গোষ্ঠীর গবেষণা কর্মের ক্ষেত্রে সমন্বয়েরও অভাব আছে। জাতীয়করণ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে পণ্যের উৎকর্ষবিধান ও পণ্য বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে কোন উদ্ভাবন, গবেষণা ও উৎকর্ষ বিধানমূলক প্রয়াস নেই। বেসরকারী খাতে খুব সহজবোধ্য কারণে ও বিস্ময়করভাবে গবেষণা ও উন্নয়নধর্মী তৎপরতার অস্তিত্ব নেই। একই সময়ে আবার অর্থবহ গবেষণা ও উন্নয়নমূলক করার পথে বহু বাধাও আছে। এমনও অনেক দৃষ্টান্ত আছে যে অনেক সফল গবেষণার ফলকে কাজে লাগানো যায়নি কিংবা সম্ভাব্য ব্যবহারকারীর কাছে ঐ

গবেষণা লব্ধ মূল্যবান ফল অজ্ঞাত রয়ে গেছে। আগামীতে এক্ষেত্রে প্রধান কাজ হবে প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানিক আয়োজন ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে সুসমন্বিত গবেষণা কার্যক্রম অনুষ্ঠান ও সম্পাদন সম্ভব হয় । এই গবেষণা কার্যক্রমে বিদেশী প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হবে ও ইহা দেশের অর্থনীতির জন্য আশু উপকারী হবে। এব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি হ'লঃ এই গবেষণায় স্থানীয় প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদ ব্যবহার সম্ভাব্য সর্বোচ্চ করে তোলার লক্ষ্যে নতুন নতুন প্রযুক্তি বিকাশের সুযোগ গড়ে তোলা হবে। ইহা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়ন অভিমুখী করতে হবে এবং এমন একটা কার্যকর পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে যাতে স্থানীয় কারিগরী জ্ঞান ও কাঁচামালের ভিত্তিতে উৎপাদিত পণ্য আমদানী পণ্যের স্থলে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করবে।

১৫·১০৯ বলা হয়েছে যে, সরকারী খাতের ব্যবস্থাপনায় প্রায় ৬০টি প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত গবেষণায় নিয়োজিত আছে। তবে ইহা বোঝায় না যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা শুধু দেশের এই ক'টি প্রতিষ্ঠানেই সীমিত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গোটা পরিমণ্ডলে আরও অনেক সংগঠনের কাজ অন্তর্ভুক্ত। শুধু তাই নয়, যে গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়মমাফিক কাজের ধারায় ভিন্ন আকারে বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিষয়ে কাজ করে সেগুলিও এই পরিমণ্ডলভুক্ত। সেজন্য, বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাদানে নিয়োজিত সংগঠনগুলিও যেসব সংগঠন সংশ্লিষ্ট নানা বিষয় চর্চা করে সেগুলির কর্মতৎপরতা বাদ দিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হতে পারে না।

১৫·১১০ এমনকি যে চাষী বা মাঝি যাকে তার উৎপাদন বাড়ানোর জন্য নতুন প্রযুক্তি আয়ত্ত করতে হবে, গ্রামের যে কামারকে আরও ভাল হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি তৈরী শিখাতেই হবে কিংবা যে কুমারকে তার মৃৎপাত্রের মসৃনতা বাড়াতেই হবে—তাদের কাউকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনীতি প্রণয়নের বিবেচনার বাইরে রাখা যায় না। জনসম্পদ উন্নয়নমুখী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিকল্পনাকে অর্থবহ হতে হলে শুধু গবেষণায় নয়, প্রযুক্তির যথোপযুক্ত আত্মস্থকরণ ও বিস্তারের জন্য ডিজাইন, নির্মাণ, উৎপাদন পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য বহু তৎপরতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে। এই ধরণের নানা তৎপরতা অনেক মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ও এখতিয়ারে চূড়ান্ত পর্যায়ে বিস্তার লাভ করে। তাই ঐ সকল সংস্থার কাজকে একটি অভিন্ন লক্ষ্য সাধনে সমন্বিত করা এবং সবার কাজে গ্রহণযোগ্য পরিকল্পনা ও কার্যক্রম প্রণয়ন সহজ নয়।

১৫·১১১ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপারে নীতি নির্ধারকবিবৃতি ও রূপরেখা প্রণয়ন, সেগুলির বাস্তবায়নের পরবর্তী ব্যবস্থাদি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের স্বার্থ ও সামর্থ আছে ঐ ক্ষেত্রগুলির সমন্বয়ের দায়িত্ব বর্তায় সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ডিভিশনের ওপর। এই ডিভিশনকে নিজের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে গুটি কয়েক একাধিক বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট সংস্থার কাজেরও তত্ত্বাবধান করতে হয় যদিও ঐগুলি যে পরিমাণ গবেষণার কাজ করে তা হয়ত তাদের কর্মক্ষেত্রের আওতার বাইরে পরিচালিত গবেষণা তৎপরতার মোট পরিমাণ একটা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র।

১৫·১১২ এই ডিভিশন যাতে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলির সমন্বয় ও পরবর্তী ব্যবস্থাদির অপেক্ষাকৃত জটিল কাজের দায়িত্ব পালন করতে পারে সেজন্য জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ গঠন করা হয়। ঐ দায়িত্ব পালনে "বাস্তবোচিত ও সুসমন্বিত গবেষণার কাজ প্রণয়ন, কার্যক্রম ও নীতি নির্ধারণ এবং দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশের ঘোষিত উদ্দেশ্য সহকারে সহায়তা" করাও এই পরিষদের কাজ। তবে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ এখনও দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গতিধারার নির্দেশনা এবং অর্থনীতি বিকাশে ফলদায়ক অবদান রাখার মত কার্যকর হয়ে ওঠেনি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানা বিষয় যেগুলি নিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা কার্যরত সেগুলির কাজের মধ্যে অপচয়মূলক পুনরাবৃত্তি অথবা ক্রমবর্ধমান

ব্যবধান হ্রাস এবং সঠিক সমন্বয় সাধনের জন্য জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদকে পেশাদারী দক্ষতার বিভিন্ন বহুমুখী তৎপরতার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন এবং সেগুলিকে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কিত করে তোলার সামর্থ গড়ে তুলতে হবে। এজন্যে, একটা প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুলতে হবে এবং একটা পদ্ধতি চালু করতে হবে যার সাহায্য উপযুক্ত নির্দেশনা দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট নানা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত তৎপরতার সুদক্ষ মূল্যায়ন সম্ভব হয়। তবে, এত অসংখ্য সংস্থায় পরিচালিত গবেষণা ও সমজাতীয় কাজের ফল বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় উৎকর্ষ সম্পন্ন প্রতিভা ও প্রতিষ্ঠার জনসমষ্টি একটি মাত্র সংগঠনের ছত্রছায়া সমবেত করানোর ব্যাপারটি সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীরা যদি কোন কেন্দ্রীয় নির্দেশনাকে সাবলীল স্বাচ্ছন্দে মেনে না নিতে পারেন তবে অনুরূপ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ক্ষমতার দিক থেকে অত্যন্ত প্রতাপশালী শুধুমাত্র এ কারণেই বিজ্ঞানীরা কেন্দ্রীয় নির্দেশনাগুলি সব সময় সুষ্ঠু ও সর্বতোভাবে বাস্তবায়িত করবেন এমন কোন কথা নেই। আর বিজ্ঞানীরা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে নির্দেশনা গ্রহণ করবেন—এমন গ্যারান্টি আইন প্রয়োগ করেও সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিকে তাদের নিজ নিজ কাজের প্রয়োজনীয় মূল্যায়ন করতে দেওয়া এবং সেগুলি নির্ধারিত লক্ষ্যের সঙ্গে কতটা সরাসরি সম্পর্কিত তা স্থির করার দায়িত্বও তাদের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। এরপর, প্রশাসনিক দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ডিভিশন এবং পরিকল্পনা কমিশন যৌথভাবে পরিকল্পনা শৃঙ্খলা, বাজেট ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে তুলনামূলকভাবে অনেকটা সহজেই তাঁদের সমন্বয় সাধকের ভূমিকাটি পালন করতে পারেন। এভাবে বিজ্ঞানীরা স্বাভাবিকভাবেই পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার অঙ্গ হয়ে উঠবেন। এতে তাঁদের হাতে সিদ্ধান্তগুলি বিশ্বস্ততার সঙ্গে বাস্তবায়িত হওয়ার বিষয় নিশ্চিত হবে। অনিবার্য কারণেই এজন্য জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিপরিষদের আকার, গঠন ও কার্যপদ্ধতি এবং সরকারের সঙ্গে এই পরিষদের সাংগঠনিক সম্পর্কের কিছু কাঠামোগত পরিবর্তন দরকার হবে। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ডিভিশন একটি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি প্রণয়নে নিয়োজিত রয়েছে। এতে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদের প্রয়োজনীয় পুনর্গঠনের ব্যবস্থাও থাকবে।

প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যাবলীর পর্যালোচনা

প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩—৭৮)

১৫·১১৩ মুক্তিলাভে বাংলাদেশ উত্তরাধিকার সূত্রে গবেষণা ও উন্নয়ন তৎপরতা পরিচালনার জন্য হাতে গোনা কয়েকটি আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান পায়। কিন্তু সেগুলির বেশীর ভাগেই কর্মচারীর সংখ্যা ছিল অপর্যাপ্ত, কাজের সমন্বয় ছিল না, ভৌত সুযোগ-সুবিধেরও অভাব ছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটা সংহত প্রয়াসের প্রথম উদ্যোগ চলে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিকাশ এবং আমদানী করা প্রযুক্তি জ্ঞানের গ্রহণ ও অভিযোজনসহ দেশী প্রযুক্তি কলাকৌশল উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা পরিচালনার জন্য এই পরিকল্পনায় নীতি উদ্দেশ্যগুলি প্রদত্ত হয়।

১৫·১১৪ যেসব গবেষণার ফল থেকে কম সময়ে সব থেকে বেশী উপকার পাওয়া সম্ভব সেসব ক্ষেত্রে শক্তি ও প্রয়াস কেন্দ্রীভূত করার কৌশল গ্রহণ করা হয়। এই কৌশল অনুসারে বিজ্ঞান নীতি প্রণয়নে বিভিন্ন বিচিত্রমুখী গবেষণা সমস্যা ও অগ্রাধিকার ভিত্তিক ক্ষেত্রগুলিকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ক্ষেত্রগুলি হচ্ছেঃ বর্তমান গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির পুনর্গঠন বিজ্ঞান শিক্ষার মানোন্নয়ন ইত্যাদি। এর পরেও একথা উল্লেখ করতে হয় যে জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের স্তরে গবেষণা ও উন্নয়নে সর্বাত্মক মনোনিবেশের অভাব ছিল। দেশের সামগ্রিক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত তৎপরতার একটা অংশমাত্র (প্রায় ২০%) পরিকল্পনা কমিশনের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত গবেষণার সঙ্গে সম্পর্কিত। বলতে গেলে প্রায় সব তৎপরতা এখনও অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে ছড়িয়ে আছে আর এ ধরণের অধিকাংশ গবেষণা পরিচালনা করে থাকে ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠানগুলি। গবেষণার ক্ষেত্রে নীতিমালা প্রণয়ন ও উন্নয়ন তৎপরতার নির্দেশনা ও সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে প্রথম পরিকল্পনার মাঝামাঝি সময়ে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ গঠন করা হয়।

১৫·১১৫ **আর্থিক বাস্তবায়নঃ** প্রাথমিকভাবে পরিকল্পনায় ৫,৫৪·০০ লাখ টাকার বৈদেশিক মুদ্রার সংস্থানসহ ১৭,৮৫·০০ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়। সংশোধিত বরাদ্দ (হার্ড-কোর ও প্রথম দু'বছরের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার বরাদ্দ) দাঁড়ায় ২৩,২৬·৭৬ লাখ টাকা (বৈদেশিক মুদ্রার অংশ ৬০৯·৭৩ লাখ টাকা)। এর তুলনায় পাঁচ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে ১৬,১৮·০৪ লাখ টাকার সংশোধিত বরাদ্দ (বৈদেশিক মুদ্রার অংশ ৭,৬২·৪৯ লাখ টাকা) দেওয়া হয়। এর মধ্যে ব্যবহৃত হয় ১৪,১৫·৪৫ লাখ টাকা (বৈদেশিক মুদ্রার অংশ ২৭৬·৫৭ লাখ টাকা) সংশোধিত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বরাদ্দের প্রেক্ষাপটে তহবিল কাজে লাগানোর শতকরা হার ছিল যথাক্রমে ৬১ ও ৮৭·৫ ভাগ।

১৫·১১৬ **ভৌত অগ্রগতিঃ** সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ডিভিশনের আওতায় প্রধানতঃ দুটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তৎপরতা পরিচলনা করে। এ দুটি প্রতিষ্ঠানের নামঃ বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ ও বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন। প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যাবলী নিম্নে আলোচিত হলঃ

১৫·১১৭ **বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনঃ** কমিশনের কার্যক্রম প্রধানতঃ পারমাণবিক শক্তি, পারমাণবিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ইলেকট্রনিকস ও ফলিত মহাশূণ্য গবেষণা, পারমাণবিক জৈব বিজ্ঞান, তেজস্ক্রিয় ও ভারী খনিজ অনুসন্ধান ও আহরণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত। ভৌত কার্যক্রমগুলি হচ্ছে উল্লিখিত কার্যক্রমগুলি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ। এই লক্ষ্য অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন কয়েকটি প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছে। এ প্রকল্পগুলির মধ্যে শুধু মাত্র ময়মনসিংহের পারমাণবিক কৃষি ইনস্টিটিউট ও কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে বালু অনুসন্ধান প্রকল্পের কাজ কিছুটা এগিয়েছে। ময়মনসিংহের পারমাণবিক কৃষি ইনস্টিটিউট উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান, পাট ও গমের বীজ উদ্ভাবন করেছে। সমুদ্র সৈকতে বালু উত্তোলন প্রকল্পের কাজ থেকে ঐসব বালুবেলায় লিমেনাইট, রুটাইল, জিরকন প্রভৃতি ভারী খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই ভারী খনিজগুলির সঞ্চয় নিরূপণসহ এর কারিগরী অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা নিরূপণের জন্য পাইলট পরিকল্পনা সমীক্ষার কাজ সমাপ্ত হয়। সাভার আণবিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের আওতায় পাঁচটি ইনস্টিটিউটের মধ্যে মাত্র একটি বিকীরণ ও কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ ইনস্টিটিউটের কাজ কিছুটা অগ্রসর হয়েছে। রূপপুরে পারমাণবিক শক্তি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

১৫·১১৮ **বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদঃ** আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও কাঁচামাল কাজে লাগানোর জন্য শিল্প প্রযুক্তির (প্রক্রিয়া/পণ্য) উন্নয়নেই প্রধানতঃ এই পরিষদের কার্যক্রমগুলি কেন্দ্রীভূত। খাদ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, জ্বালানী ও ইন্ধন শক্তি, কাঁচ ও সিরামিকস, চামড়া ও জীবজন্তুর উপজাত দ্রব্যাদি, প্রাকৃতিক ভেষজ ও পাইলট প্ল্যান্ট এবং প্রক্রিয়া উন্নয়ন কেন্দ্রের মত ব্যাপক পরিসরে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজই ঐসব কার্যক্রমের ক্ষেত্র। পরিকল্পনা মেয়াদে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে ১০৩টি প্রক্রিয়া/পণ্য পেটেন্ট করেছে। বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য মোট ২৬টি শিল্পমূলক প্রক্রিয়া বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ইজারা দেওয়া হয়েছে এবং ৪৮টি প্রক্রিয়া ইজারা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। ২৯টি গবেষণাধীন প্রক্রিয়া বুনিয়াদী গবেষণায় সফল প্রমাণিত হবার পর পাইলট প্ল্যান্ট পরীক্ষার অপেক্ষায় আছে।

১৫·১১৯ **ভূমি গবেষণা প্রযুক্তি উপগ্রহ (ল্যান্ডস্যাট) কার্যক্রমঃ** বাংলাদেশ ভূমি গবেষণা প্রযুক্তি উপগ্রহ (ল্যান্ডস্যাট) কার্যক্রমে অংশ নিয়েছে এবং ভূমি গবেষণা প্রযুক্তি উপগ্রহ কার্যক্রম পর্যায় প্রকল্পের কাজ গ্রহণ করা হয়েছে। সম্পদ জরীপ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ পূর্বাভাসদানের জন্য দেশে দূর অনুধাবন প্রযুক্তির প্রয়োগ সামর্থ গড়ে তোলা এই প্রকল্পের লক্ষ্য। এই পরিকল্পনা আমলে ভূমি গবেষণা প্রযুক্তি উপগ্রহ কার্যক্রম বাংলাদেশের ভূখণ্ড বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত বাংলাদেশ উপকূলের প্রাকৃতিক

মানচিত্র প্রণয়ন, কর্ণফুলী জলাধার ও এর জলবিভাজিকা সমীক্ষা, পরীক্ষাধীন এলাকাগুলির বোরো ধান উৎপাদনের সম্ভাব্য পরিমাণ জরিপ, সুন্দর বন ও ঢাকা বনাঞ্চলের বনজ সম্পদ জরিপ ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত থাকবে।

১৫·১২০ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘরঃ দেশে বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞান প্রয়োগের প্রতি চেতনা সৃষ্টির জন্য ১৯৭৭-৭৮ সালে প্রথমবারের মত একটা পূর্ণাঙ্গ যাদুঘর স্কীমের কথা স্থির করা হয়। বিজ্ঞান কমপ্লেক্সের অংশবিশেষ হিসেবে এই স্কীমের স্থান হবে শেরেবাংলা নগরে। এজন্য জমির দখল নেওয়া হয়েছে, স্থাপত্য সংক্রান্ত ডিজাইন তৈরী করা হয়েছে এবং প্রকল্পটি একান্তই প্রাথমিক স্তরে রয়েছে। যাদুঘরটি এখন একটি ভাড়া করা ভবনে অস্থায়ীভাবে চালু রয়েছে।

দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮—৮০)

১৫·১২১ উদ্দেশ্যবলী ও নীতিকৌশলঃ প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা আমলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে খুব বেশী অগ্রগতি সম্ভব হয়নি। সম্পদ ও দক্ষ জনশক্তির অভাবে বেশীর ভাগ প্রতিষ্ঠানিক উন্নয়নের জন্য আঞ্চলিক সংগঠনগুলিকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা জরুরী হলেও সে কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় এ কারণেই চলতি প্রকল্পগুলির কাজ শেষ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা খাতে প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হলঃ (১) দেশীয় গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও কাঁচামালগুলিকে সম্ভাব্য সর্বাধিক কাজে লাগানোর জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির স্থানীয় বুনিয়াদ আরও সংহত, শক্তিশালী ও উন্নত করে তোলা এবং আমদানী করা প্রযুক্তির ফলদায়ক স্থানান্তর ও প্রয়োগের সামর্থ বৃদ্ধি করা; এবং (২) বাংলাদেশ ও উন্নতদেশগুলির মধ্যে উন্নততর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য ও যোগাযোগের যে ব্যবধান রয়েছে তা কমানোর জন্য চেষ্টা করা।

১৫·১২২ আর্থিক সম্পাদনাঃ দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় ৩৪১৩ লাখ টাকার বৈদেশিক মুদ্রায় অংশসহ ৩৯১৭ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার বরাদ্দের তুলনায় এই বরাদ্দ অনেক বেশী। এই বরাদ্দ থেকে দুই বছরে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে মোট ২৬৫৪ লাখ টাকার (বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ৮৩০ লাখ টাকা) দেওয়া হলেও মোটামুটি ২৪৯৭ লাখ টাকা (বৈদেশিক মুদ্রায় পরিমাণ ৭০৭ লাখ টাকা) কাজে লাগানো হয়।

১৫·১২৩ ভৌত সম্পাদনাঃ অপেক্ষাকৃত বেশী সম্পদ বরাদ্দ ও সেই সম্পদের উন্নততর ব্যবহারের ফলে দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ৬টি প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়, এই প্রকল্পগুলি প্রধানতঃ শিল্প গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ফলে প্রকল্পগুলি দেশের শিল্প উন্নয়নে বিশেষভাবে সহায়ক হবে। দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়। জুটন নামে একটি নয়া তন্তু সৃষ্টির লক্ষ্যে তুলা ও পাটকে কাজে লাগিয়ে একটি পাইলট প্ল্যান্ট নির্মাণ করে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। এই পাইলট প্ল্যান্টটি যদি বাণিজ্যিক দিক থেকে প্রতিশ্রুতিশীল হয় তাহলে আমদানী করা তুলার ওপর দেশের একান্ত নির্ভরশীলতা বেশ কমে যাবে। পাইলট কারখানাটি এখন বসানোর কাজ চলছে। আণবিক শক্তি কমিশন সিলেট ও দিনাজপুরে আণবিক মেডিক্যাল কেন্দ্রগুলো সামাজিক পরিসরে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এছাড়া, কক্সবাজারের সৈকতে বালু আহরণ কেন্দ্রের কাজেও বেশ অগ্রগতি হয়েছে। আণবিক শক্তি কমিশনের সামর্থ বাড়ানোর জন্য একটি ৩ মেগাওয়াট পারমাণবিক চুল্লী (ট্রিগা মার্ক-II) সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় চুক্তিও স্বাক্ষর করা হয়েছে। পারমাণবিক প্রযুক্তিবিদ্যা ইনস্টিটিউটে এ পারমাণবিক চুল্লীটি বসানো হবে। মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন সংস্থা বা 'স্পারসো' কার্যক্রমের আওতায় কক্ষপথে স্থাপিত বিভিন্ন উপগ্রহ পদ্ধতিতে একটি অন্তবর্তীকালীন অত্যাধুনিক আবহাওয়াতাত্ত্বিক ভূস্টেশন আবহাওয়া তাত্ত্বিক উপাত্ত ও ছবি পাঠাবে।

পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত সমস্যাবলী

১৫·১২৪ গত দু'বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কিছুটা উন্নতি ও কিছু নতুন সুযোগ-সুবিধের সৃষ্টি হলেও বহু সমস্যা এখনও অর্থনীতির সেবায় প্রযুক্তি বুনিয়াদ গড়ার কাজে বাধার সৃষ্টি করে চলেছে। প্রধান সমস্যাটি গবেষণা সংগঠনগুলিতে কারিগরী সুযোগ-সুবিধের উন্নয়ন, দক্ষ জনশক্তি সরবরাহ ও সর্বোপরি, গবেষণামূলক কাজগুলির সমন্বয় সাধনের সঙ্গে সম্পর্কিত। এগুলি নিম্নে আলোচনা করা হয়েছেঃ

১৫·১২৫ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের বিকাশের ধারায় দুর্বলতা সংযোগ সূত্রটি হচ্ছে খোদ প্রযুক্তির পশ্চাদপদতা যা গবেষণাগারে লব্ধ ফলগুলিকে বাণিজ্যিক পর্যায়ে চলনসই বাস্তবতায় সফল রূপান্তরে প্রচণ্ড বাধা দেয়। এর একটা জ্বলন্ত নজীর হিসেবে 'জুটনের' কথা বলা হয়। 'জুটন' তৈরীর প্রক্রিয়াটি গবেষণাগারের মানদণ্ডে সাফল্যের প্রান্তদেশে পৌঁছলেও প্রযুক্তিগত পশ্চাদপদতা এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রকৌশলী ও প্রযুক্তি বিশারদের অভাবের কারণে সেটিকে বাণিজ্যিক পর্যায়ে সফল উৎপাদনের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এর পরের অগ্রগতির জন্য এভাবেই বিদেশী কারিগরী সহায়তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়েছে। জুটনের মত বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ উদ্ভাবিত আরও অনেক প্রক্রিয়া এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য কার্যকর প্রযুক্তি কৌশলে রূপান্তরিত হওয়ার অপেক্ষায় পড়ে আছে। পরিষদ গবেষণাগারের মানদণ্ডে উন্নীত প্রক্রিয়াগুলিকে পাইলট প্ল্যান্ট পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে নিজ সামর্থ গড়ে তোলার জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সঙ্গে সহায়তার জন্য আলাদা আলোচনা শুরু করেছে। লোহালক্কড়ের সরঞ্জামের স্থানীয় ডিজাইন ও নির্মাণের পথে একটা গুরুত্বপূর্ণ বাধা রয়েছে। সেটি হচ্ছে কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশী লোহালক্কড়ের সরঞ্জাম কেনার বাড়তি ও বিরল সুবিধা যা সহজে দেশে মেলা সম্ভব নয়। এ কারণে স্থানীয় প্রযুক্তি গড়ে তোলার জন্য সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি আমদানীর ব্যাপারে বাছাইমূলক সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।

১৫·১২৬ **সমন্বয় ও যোগাযোগের অভাবঃ** আজকের গবেষণা ও উন্নয়ন প্রয়াসে জাতীয় নীতি ও ব্যবসায় বাণিজ্যের উভয় পর্যায়েই সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। জাতীয় নীতি নির্ধারক অগ্রাধিকারগুলি আশু ফললাভের ক্ষেত্রে খুবই বিভ্রান্তিকর। নীতিমালার ক্ষেত্রে বৈচিত্রের কারণে দক্ষ জনশক্তিসহ নানা সম্পদ অত্যন্ত অনেক বেশী প্রকল্পের মধ্যে ভাগাভাগির দরুন ঐসব সম্পদের অস্তিত্বই ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। এর অন্যতম ফলশ্রুতি হিসেবে অনেক প্রকল্পে সুফলের জোরালো সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সেইসব প্রকল্প আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন গবেষণা সংগঠনগুলির মধ্যে কাজের পুনরাবৃত্তির মধ্যে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক তৎপরতার সমন্বয়ের অভাব লক্ষ্যণীয়। বহু প্রতিষ্ঠানই একই সমস্যাবলী নিয়ে নিয়োজিত—এমন অনেক নজীর আছে। প্রসঙ্গতঃ জৈব গ্যাস ও সৌর শক্তির কথা বলা যায়। সবার শেষে ও সবথেকে গুরুতর বিষয়টি হল এই যে, গবেষণা সংগঠনের লব্ধ ফল যাঁরা বা যেসব সংগঠন ব্যবহার করেন তাদের মধ্যে কোন রকম কার্যকর সম্পর্ক থাকে না। ইহা ও সেই সাথে প্রযুক্তিগত সমস্যাগুলি গবেষণা লব্ধ বস্তুর বাণিজ্যিক উৎপাদনকে মন্থর করে তোলে।

১৫·১২৭ **দক্ষ জনশক্তি গড়ার সমস্যাঃ** সমস্যাটি শিক্ষা পদ্ধতির গভীরে শিকড় গেড়ে আছে। দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার ওপর উপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়ার অভাব রয়েছে। স্কুল ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার জন্য মৌলিক অবকাঠামো গড়ে তোলার ব্যাপারে অত্যন্ত অবহেলা করা হয়েছে। এছাড়া, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অপর্যাপ্ত স্নাতকোত্তর ও ডক্টরেট পরবর্তী গবেষণা কার্যক্রমগুলি অপর্যাপ্ত। এসব বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দুর্বলতম অস্তিত্বের পরিচায়ক। অথচ সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই গবেষণার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। বাংলাদেশে দুর্ভাগ্যজনকভাবেই এটা ঘটেনি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে উপযুক্ত যোগসূত্রের কোন নিশ্চয়তাবিধান না করেই সরকারী খাতের গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপিত হয়েছে। উচ্চতর ডিগ্রীর জন্য গবেষণা কর্মে

নিয়োজিত একজন ছাত্রের উদ্যম সকল গবেষণা কার্যক্রমে বাঞ্ছিত গতি নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু অদ্যাবধি এ ধরণের উদ্যম কাজে লাগানো হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কার্যতঃ ডিগ্রী প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত হয়েছে। এগুলি থেকে ছাত্ররা ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে যায়—তার তারপর হয়তো অন্য কোথাও গিয়ে সরকারী ও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় নিয়োজিত হয়। একথা অবশ্যই মনে রাখা দরকার। ছাত্ররা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দিতে কোন অর্থপূর্ণ গবেষণা না করে তাহলে তাদের জন্য কোথাও তেমন গবেষণা কর্মে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাও আর তেমন থাকে না। দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য এ কারণে স্কুল ও কলেজের মৌলিক বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার পর্যাপ্ত ভৌত অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য মনোযোগী ও সম্পদ নিয়োজিত করা একান্ত জরুরী। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা বিকশিত হওয়া উচিত। উন্নয়ন কার্যাবলীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত সমস্যাবলীকে কেন্দ্র করে এবং বিভিন্ন খাতের গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ঐ শিক্ষা ব্যবস্থার যথোপযুক্ত যোগসূত্র থাকা উচিত। প্রতিভা পাচার জনশক্তি সংশ্লিষ্ট অন্যতম সমস্যা। এই প্রতিভা পাচারের ফলে বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরী প্রতিষ্ঠানগুলিতে আজ প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নেই। এই অবস্থার প্রতিবিধান করার জন্য অবিলম্বে গবেষণা কর্মীদের যথোপযুক্ত আর্থিক উৎসাহ দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার।

১৫·১২৮ অপর্যাপ্ত আর্থিক সমর্থন: গত সাত বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের ব্যয় তাৎপর্যপূর্ণভাবে দ্রুত বেড়ে গেছে, বেড়েছে প্রতিষ্ঠানিক সংগঠনগুলির উন্নয়নের গতি। কিন্তু প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উন্নত ও অনুন্নত বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে প্রযুক্তিগত ব্যবধানের প্রেক্ষাপটে ঐ ব্যয় এখনও হতাশাব্যঞ্জকভাবেই খুবই কম, ফলে প্রযুক্তি বিজ্ঞানের দিগন্ত প্রসারের জন্য যে মৌলিক সুবিধেগুলি একান্ত প্রয়োজন সেগুলি আজও গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না।

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০—৮৫)

১৫·১২৯ উদ্দেশ্য ও কৌশল: দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান উদ্দেশ্য হবে: আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতি জোরদার করার কাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ। তাই, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত বড় বড় কার্যক্রমের সঙ্গে অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলির উৎপাদনমূলক তৎপরতার সম্পর্ক থাকা উচিত। এছাড়া জাতিকে স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে দক্ষতা অর্জনের সঙ্গেও এসব কার্যক্রমের সম্পর্ক থাকতে হবে।

১৫·১৩০ জাতীয় গুরুত্ব সম্পন্ন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যগুলির অভিমুখী করে গবেষণা তৎপরতাগুলিকে পুনর্বিন্যস্ত করা কৌশলগত বিবেচনা একান্ত আশু প্রয়োজন। মৌলিক গবেষণা কর্ম যার ফলাফল অনিশ্চিত তা থেকে আশু প্রাপ্তি যোগ আছে এমন ধরণের গবেষণাতেই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। অন্য কথায় আমদানী করা কাঁচামালের বিকল্পে স্থানীয় কাঁচামালের ব্যবস্থা করার মত ব্যবহারিক সমস্যাবলীতেই গবেষণা তৎপরতা নিয়োজিত হওয়া উচিত—মূলধন প্রধান আমদানী করা বিদেশী প্রযুক্তির পরিবর্তে নূতন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হওয়া উচিত। বস্তুতঃ পক্ষে, জাতীয় পরিকল্পনার বাস্তবতা ও প্রধান উদ্দেশ্যগুলির সঙ্গেও ইহা সঙ্গতিপূর্ণ। বাস্তবিক পক্ষে, আধুনিক প্রযুক্তি এখন তিনটি বিষয় যেমন বিজ্ঞান সংক্রান্ত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন এবং প্রকৌশল শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। এ কারণে গবেষণা ও উন্নয়নের ওপর গুরুত্বসহ কারিগরী দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিপূরক বিনিয়োগ করার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সাফল্যের সঙ্গে নূতন প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়।

১৫·১৩১ সীমিত উপকরণ ও আর্থিক সম্পদের ক্রমাগত বরাদ্দ এবং সেই সঙ্গে দক্ষতার ঘাটতি জনিত সমস্যা পরিহারের জন্য শুরুতেই অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলিকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে। গবেষণা ও উন্নয়নমূলক তৎপরতার উৎস অবশ্যই জাতীয় পরিকল্পনার উৎস থেকে পরিস্ফুটিত হতে হবে।

খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ বৃদ্ধি, কাগজ, ওষুধ, নিত্যব্যবহার্য পণ্য ইত্যাদির জন্য জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের সঙ্গে সম্পর্ক, শিল্পের যন্ত্রপাতি ও কৃষি প্রসম্ভার উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সমর্থন লাভ। দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্গত থাকবে।

১৫·১০২ **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত জাতীয় নীতিঃ** অর্থনীতির সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বহু বিভিন্নমুখী প্রয়োগ প্রয়োজন। উল্লিখিত উদ্দেশ্য সাধনে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সংহত জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি উদ্ভাবনের জন্য সীমিত সম্পদের প্রেক্ষাপটে একটা সমন্বিত দৃষ্টি ভঙ্গি গ্রহণ একান্ত আবশ্যক. অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতির বিচার্য বিষয় হবেঃ

(১) স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চাহিদা;

(২) আন্তঃ খাত ও অন্তর্খাত অগ্রাধিকারসমূহ;

(৩) আমদানী করা (বিদেশী) প্রযুক্তি সংগ্রহের নির্দেশনাসমূহ এবং প্রচলিত প্রযুক্তিগুলির উৎকর্ষসাধনসহ দেশী প্রযুক্তির বিকাশ;

(৪) কার্যকর বিজ্ঞানিক ও কারিগরী জনশক্তির উন্নয়ন এবং শিক্ষাও প্রশিক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্তন;

(৫) স্থানীয়ভাবে ডিজাইন-প্রণয়ন, প্রকৌশল ও পরামর্শক সামর্থের বিকাশ;

(৬) প্রযুক্তির ব্যবহারকারী ও উৎপাদকের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন;

(৭) বাজেট প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা, সমন্বয় নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি।

১৫·১০৩ **গবেষণা ও উন্নয়নমূলক তৎপরতার সমন্বয়ঃ** দেশে গবেষণা ও উন্নয়ন তৎপরতাগুলিকে সুষ্ঠুতর করার একান্ত প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বর্তমানে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজগুলি বহু সংখ্যক গবেষণা প্রতিষ্ঠান/সংগঠন করে থাকে; এই সংগঠনগুলির মধ্যকার যোগাযোগ সূত্র খুবই ক্ষীণ। ফলে এগুলির কাজের মধ্যে প্রয়াসের অযথা পুনরাবৃত্তি ও সীমিত সম্পদের অপচয় ঘটে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে এগুলির সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী করে অনুভূত হবে এবং সেজন্য এই উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদকে কার্যক্ষম করে তুলতে হবে। সকল মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠান এবং সেই সঙ্গে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে এই পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো ও ক্রিয়াগত সম্পর্কের বিশদ খুটিনাটি উল্লিখিত লক্ষ্য সামনে রেখে সরকারকে পুনর্বিবেচনা করে দেখতে হবে।

১৫·১০৪ **গবেষণা ও উন্নয়ন তৎপরতাঃ** গবেষণা কার্যক্রম প্রণয়নে সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে গবেষণা কার্যক্রমগুলির সঙ্গে আমাদের প্রয়োজন ও অগ্রাধিকারগুলির সুসামঞ্জস্য থাকে। মৌলিক গবেষণাগুলি প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং গবেষণা তৎপরতায় উদ্দেশ্য বাস্তবায়না-ভিসারী ও সমস্যা প্রতিবিধায়ক ফলিত গবেষণায় নিয়োজিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রয়োজনীয় সমর্থন দিয়ে যাবে।

১৫·১০৫ কৃষি, শিল্প, ওষুধপত্র, ইন্ধন শক্তি ও অগ্রাধিকারযুক্ত উপকরণ ও সাজ-সরঞ্জাম, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াদির উদ্ভাবন ও উৎপাদন হবে প্রযুক্তি উন্নয়ন কার্যক্রমের লক্ষ্য। উপকরণ ও সম্পদের ভিত্তিতে সহজ, অল্প ব্যয় সাপেক্ষ ও হস্তকৌশলমূলক স্থানীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবন যাতে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ উপকৃত হতে পারে অল্প সময়ে ও সহজেই এরকম প্রযুক্তির উদ্ভাবনে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হবে। বর্তমান শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে উৎপাদন ও দক্ষতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিচালনাগত গবেষণায় ওপরও জোর দিতে হবে।

১৫·১০৬ অতীতে সকল প্রয়াস প্রক্রিয়া ও পণ্য প্রযুক্তিতে সন্নিবেশিত ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেও ঐ ধরণের প্রয়াসের উপযোগিতা ও গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অব্যাহত থাকবে। তবে জরুরী ভিত্তিতে অতীতে অবহেলিত উন্নয়ন প্রযুক্তির প্রকৌশল সংক্রান্ত দিক, আমদানী করা প্রযুক্তিবিদ্যার উপযোগীকরণ এবং নির্মাণের সুযোগ-সুবিধের দিকে মনোনিবেশ করা হবে।

১৫·১৩৭ **গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রাধিকার এলাকাসমূহ:** উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদী প্রেক্ষাপটে ও দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় চিহ্নিত অগ্রাধিকারগুলির ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে গবেষণা ও উন্নয়ন তৎপরতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে:

(ক) **কৃষি, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা**—চাল ও গম ছাড়াও উচ্চ ফলনশীল জাতের ডাল, ভোজ্য তেলবীজ, পাট, তুলো, তুঁত ফলের বীজ ও চারা উদ্ভাবনে মনোনিবেশ আবশ্যক। সমন্বিত কীটপতঙ্গ ও চাষাবাদ পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। জমিতে কৃত্রিম সার প্রয়োগ জনিত অনুপুষ্টিকারকের প্রভাব, মৃত্তিকা পানি ব্যবস্থাপনা, সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মাত্রার সেচের পানির চাহিদা এবং উন্নত ধরণে কায়িক পানি উত্তোলন ব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক গবেষণা কাজ চালাতে হবে।

(খ) **প্রকৌশল ও ধাতব শিল্পসহ বৃহদায়তন শিল্পসমূহ**—মধ্যবর্তী স্তরের পণ্য ও কাঁচামাল, ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য যন্ত্রপাতি, পণ্যের জন্য মূল উপকরণাদি, ইস্পাত ও সংকর ধাতুর দ্রব্যাদি। মানুষ ও পশুর জন্য মৌলিক রাসায়নিক ও ভেষজ দ্রব্য, প্লাস্টিক ও কৃত্রিম তন্তু, যন্ত্রপাতি ও ধাতবপণ্য ইত্যাদির জন্য মৌলিক উপকরণের অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক উৎপাদনের দিকে বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক।

(গ) **ক্ষুদ্র ও পল্লী শিল্প**—চিরাচরিত কুটির শিল্প ও অন্যান্য ক্ষুদ্র শিল্প, কৃষি উন্নয়ন ও কৃষিজাত ফসল প্রক্রিয়া জাত করার জন্য সহায়ক ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রাংশ ও উপকরণ যথিহার্য জিনিসপত্র ইত্যাদির প্রযুক্তি ও ডিজাইন উন্নয়নের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। গ্রামের শিল্পী, কারিগর, কামার-কুমার ও তাঁতীদের মত কারিগরদের দক্ষতা ও উৎপাদন ক্ষমতার উন্নতির জন্যও গবেষণা প্রয়োজন।

(ঘ) **জ্বালানী শক্তি**—প্রাকৃতিক গ্যাস, জলবিদ্যুৎ ও কয়লার মত স্থানীয় পর্যায়ের ইন্ধনশক্তিগুলির আহরণ ও সেগুলির সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করা আমদানী বিকল্পের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। পল্লী অঞ্চলের ইন্ধনশক্তির চাহিদা মেটানো ও পরিবেশ বিশৃংখলা এড়ানোর জন্য 'শর্ট সাইকেল' শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র ব্যাপক আকারে স্থাপন করার ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। সৌর ও বায়ু এবং জৈবস্তুপ থেকে প্রাপ্ত শক্তি ব্যবহার বাস্তবায়িত করার উপযোগী কৌশল বের করার জন্য অভিযোজনমূলক গবেষণা পরিচালনা প্রয়োজন। অনুরূপভাবে বাণিজ্যিক ও বাতিক্রমধর্মী শক্তি উভয় প্রকার শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বাধিক দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্যেও গবেষণা প্রয়োজন।

(ঙ) **পরিবহন**—যানবাহন ও সড়ক নির্মাণ এবং আভ্যন্তরীণ নদীপথে চলাচলকারী নৌযানগুলির নির্মাণ উৎকর্ষ ও সাশ্রয় নিশ্চিত করা প্রয়োজন, এছাড়া যান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও জ্বালানী ব্যবহারে স্বস্তি ও আরাম ইত্যাদিও আবশ্যক।

(চ) **গৃহ সংস্থান, পরিচ্ছন্নতা, গণপূর্ত ও পল্লী পূর্ত**—স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে এবং স্থানীয় উপকরণ সর্বাধিক ব্যবহার করে আর্থিক সাশ্রয় ভিত্তিক পূর্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

১৫·১৩৮ **জনশক্তি ও প্রশিক্ষণ:** বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত কর্মতৎপরতার সকল স্তরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ জনশক্তির প্রাপ্যতার ওপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রয়োগ নির্ভর করে। জনশক্তি বলতে (ক) পল্লী অঞ্চলের চাহিদা মেটানোর জন্য দক্ষ ও অর্ধ দক্ষ কর্মী; (খ) উৎপাদন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নিয়োগের জন্য মধ্যম স্তরের কারিগর; (গ) গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে গবেষণা ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য উদ্ভাবনী কাজ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য উচ্চ উৎকর্ষ ও কর্ম পরিচালনার উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী কর্মী এবং (ঘ) প্রযুক্তি প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের জন্য উঁচু স্তরের পেশাদার ব্যক্তি, ব্যবস্থাপক ও উদ্যোক্তাদেরকে বোঝায়।

বর্তমানে আমাদের সংখ্যা ও উৎকর্ষতা উভয় বিবেচনাতেই আমাদের বৈজ্ঞানিক কর্মীর অভাব রয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক ও দক্ষ কর্মীদের শ্রেণী ভিত্তিতেও সংখ্যাগত অসমতা আছে। প্রযুক্তি ও ডিজাইনের ক্ষেত্রে জনশক্তির নিদারুণ ঘাটতি রয়েছে। ফলে, বাণিজ্যিক পর্যায়ে উৎপাদনের প্রয়াস দূরের কথা, গবেষণাগারের পরীক্ষায় সম্ভাবনাময় ফল পাওয়া গেলেও তা পাইলট প্ল্যান্টে যাচাই করা পর্যন্ত সম্ভব হয় না। একদিকে, দেশের বর্তমান শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতির নিষ্ফলতা ও অন্যদিকে দেশে বৈজ্ঞানিক জনশক্তি পরিকল্পনার অভাব এ জন্য দায়ী। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা উপনিবেশিক আমলের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। ফলে, পরিবর্তিত প্রযুক্তি কৌশলের পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো এবং নতুন নতুন চাহিদা মেটানোর জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় খুব একটা সংশোধন বা পরিবর্তন করা হয়নি। এজন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে এবং তারপরেও শিক্ষাকে চাহিদা মেটানোর জন্য ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন করে তোলার জন্য বর্তমান শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে যথোপযুক্ত করে সংস্কার করতে হবে। সকল স্তরে বর্তমান শিক্ষার বিষয় ও শিক্ষাদান পদ্ধতিতে আগাগোড়া ঢেলে সাজাতে হবে।

১৫·১৩৯ গবেষণা মননের অধিকারী বিজ্ঞানী সম্প্রদায় সৃষ্টির প্রয়াস অবশ্যই ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাথমিক শিক্ষা স্তর থেকে শুরু হতে হবে। পাঠ্যক্রম ও শিক্ষার পদ্ধতি এমন হতে হবে যাতে কোমলমতি ছেলেমেয়েদের মনে জানার পরিপূর্ণ আগ্রহ উদ্ভাবিত হয়, তার চারদিকের জীবনযাত্রার মৌলিক জিনিষগুলির ব্যাপারে বিভিন্ন প্রশ্ন ও রহস্যভেদ করতে শেখে, অন্বেষা তথা জেনে নেবার আকাঙ্ক্ষা মনে জন্মায়; নিজ যুক্তি প্রয়োগের গুণে অনেক কিছুর জবাব খুঁজে পায় আর মোটামুটিভাবে বিজ্ঞানের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত হয়ে ওঠে। মাধ্যমিক স্তরের বিজ্ঞান পাঠ্যক্রমের বিষয়গুলির উপযুক্ত সংস্কারেরও অনুরূপ প্রয়োজন রয়েছে। পাঠ্য বইগুলি এমন হওয়া উচিত যাতে বিজ্ঞান ঘোঁয়াটে, অস্বচ্ছ ও ছাত্রদের কাছে শক্ত বিষয় না হয়ে ওঠে—বিভিন্ন জিনিষকে ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখতে পারে এবং গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে আস্থাবান ও সুপরিচিত হয়ে উঠতে পারে।

১৫·১৪০ উচ্চতর শিক্ষার পরিমণ্ডলে শিক্ষাদানকে বিজ্ঞানের অগ্রগতির মূল স্রোতধারায় আরও নিয়ে যেতে হবে এবং অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার অভাব পূরণ করতে হবে। স্থানীয় চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কিত করার জন্য পাঠ্যক্রমে পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে। শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাতের উন্নতি সাধন করতে ও যোগ্য শিক্ষকের ব্যবস্থা করতে হবে। মৌলিক ধরণের গবেষণা ছাড়াও আমাদের আশু জাতীয় সমস্যাগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ফলিত গবেষণার কাজ হাতে নিতে হবে। অবশ্য একথাও অনস্বীকার্য যে জ্ঞানের সীমানা উদার ও সংখ্যাগরিষ্ট করার লক্ষ্যে মৌলিক গবেষণাও জরুরী। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্ররা উন্নয়ন কাজে অংশ নিলে তাতে দেশের চাহিদা সম্পর্কে তারা আরও বেশী করে উপলব্ধি করবেন। আমাদের দেশের কারিগরী শিক্ষা, বিশেষ মধ্যম স্তরের কারিগরদের জন্য যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে তাতে বড় রকমের পরিবর্তন দরকার। প্রকৌশলী ও কারিগরদের কাজের মধ্যে যথোপযুক্ত শ্রম বিভাজনের কথা বিবেচনায় রেখে সংশ্লিষ্ট পাঠ্যক্রম ঢেলে সাজাতে হবে। তাত্ত্বিক শিক্ষা দেওয়ার তুলনায় ব্যবহারিক কাজের ওপর আরও বেশী গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের লক্ষ্য হবে বিশেষ ধরণের যন্ত্র বা যন্ত্রপাতি চালানোর দক্ষতা কিংবা কোন নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া সম্পাদনের লক্ষ্যে সামর্থ গড়ে তোলা।

১৫·১৪১ কারিগরী শিক্ষার উচ্চতর পর্যায় অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিং স্নাতক স্তরেও কিছুটা রদবদল প্রয়োজন; বিশেষ করে ধাতব বিদ্যার প্রক্রিয়া, প্রকৌশল ডিজাইন, উৎপাদন পরিকল্পনা, যন্ত্রপাতি তৈরী, মান নিয়ন্ত্রণ ও প্রক্রিয়া পরিকল্পনায় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের মধ্যে যে ব্যবধান থেকে যায় তা দূর করার জন্যেই এটা প্রয়োজন। প্রকৌশলে স্নাতকোত্তর যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের গ্রহণ যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াতে হবে। এরা প্রকৌশলিক ও পরিচালন গবেষণা, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ব্যর্থতার সমীক্ষা এবং সাধারণ সমস্যাবলীর সমাধান প্রভৃতির জন্য নিজেদেরকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলবেন।

১৫·১৪২ চাহিদাভিত্তিক সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায় উচ্চতর অধ্যয়ন ও চর্চাকে উৎসাহিত করতে হবে, তবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ডক্টরেট অবধি উচ্চতর শিক্ষার জন্য বেশী করে সুযোগ-সুবিধে সৃষ্টি করতে হবে, এতে আমাদের বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীরা জাতীয় সমস্যাবলীর ওপর গবেষণা পরিচালনা করতে পারেন ও সেই সাথে সীমিত সুযোগ-সুবিধের পরিবেশেও কাজ করার অভিজ্ঞানও হবে।

১৫·১৪৩ বৈজ্ঞানিক গবেষণা যাতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে যোগ্য প্রতিভা ও মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে এবং মেধা পাচার বন্ধ হয় সেজন্য প্রতিভাধরদেরকে গবেষণামূলক জীবন বৃত্তির দিকে টানতে যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ দিতে হবে।

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় আর্থিক বরাদ্দ

১৫·১৪৪ গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের আর্থিক চাহিদা নিরূপণের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রয়াস চালানো হয়েছে। প্রকল্পগুলির অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন খাত ও ডিভিশনের মধ্যে মোট তহবিল বরাদ্দ করা হয়। হিসেব করা হয়েছে যে, গবেষণা, ইঞ্জিনিয়ারিং উন্নয়ন এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিসার্ভিস সমর্থনের জন্য বিভিন্ন খাতে (১৯৭৯-৮০ মূল্যে) ৪০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী খাতে মোট বিনিয়োগের এটি শতকরা প্রায় ৩·৭ ভাগ। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি গবেষণা ছাড়া অন্য সকল খাতে গবেষণা ও উন্নয়নের মোট আনুমানিক আর্থিক ব্যয় ১৫·৯ সারণীতে দেখানো হয়েছে।

সারণী ১৫·৯

(কোটি টাকায়)

খাতের নাম	দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় প্রাক্কলিত বরাদ্দ (১৯৭৯/৮০ মূল্য মানে)
১। কৃষি	১১৪·৮০
(ক) ফসল	৬৭·৮০
(খ) বনজ সম্পদ	৮·০০
(গ) মৎস্য সম্পদ	২৭·০০
(ঘ) গবাদি সম্পদ	১২·০০
২। শিল্প	৭০·০০
৩। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদ	৭০·০০
৪। পরিবহন ও যোগাযোগ	০·৫০
৫। স্বাস্থ্য	২০·০০
৬। শিক্ষা	১·৫০
৭। প্রাকৃতিক সম্পদ	২০·০০
৮। শক্তি (বিদ্যুৎ)	০·৮০
৯। জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা	৬·০০
১০। ভৌত পরিকল্পনা ও গৃহ সংস্থান	৫·০০
মোট ..	৩০৮·৬০

এই খাতওয়ারী বরাদ্দ ছাড়াও বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি গবেষণা খাতে ১৯৭৯-৮০ সালের মূল্যানুযায়ী ৯২·০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি গবেষণা খাতে সকল ক্ষেত্রে গবেষণাই অন্তর্ভুক্ত। পরিকল্পনা কমিশনের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি গবেষণার আওতাধীন প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য আর্থিক বরাদ্দের বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে করা হ'ল। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গবেষণা ক্ষেত্রে দশটি প্রতিষ্ঠান নিয়োজিতঃ

(১) বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন;
(২) বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ;
(৩) মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন সংস্থা (স্পারসো) ;
(৪) জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণাগার;
(৫) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ডিভিশন ;
(৬) পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ;
(৭) গৃহনির্মাণ গবেষণা ইনস্টিটিউট ;
(৮) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউট;
(৯) কেন্দ্রীয় পরীক্ষা গবেষণাগার (সেন্ট্রাল টেষ্টিং ল্যাবোরেটরীজ);
(১০) বাংলাদেশ মেডিক্যাল গবেষণা কাউন্সিল।

১৫·১৪৫ ৩০টি চলতি প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ করা এবং অর্থনীতির চাহিদার ভিত্তিতে কয়েকটি নতুন প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়ার জন্যে দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণা খাতে ১৯৭৯-৮০ সালের মূল্য অনুযায়ী মোট ৯২·০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এই বরাদ্দ দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সরকারী খাতের মোট ব্যয় বরাদ্দের শতকরা প্রায় ০·৮৪ ভাগ হবে। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণা খাতে প্রতিষ্ঠানওয়ারী বরাদ্দ (১৯৭৯-৮০ সালের মূল্যমানে) ১৫·১০ সারণীতে দেখানো হয়েছেঃ

সারণী ১৫·১০

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় প্রতিষ্ঠানওয়ারী বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

	প্রতিষ্ঠান	১৯৭৯/৮০ মূল্যে বরাদ্দ	চলতি মূল্য বরাদ্দ
১।	বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন	৩৪·১৩	৪৮·৬৪
২।	বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা	১১·৮৬	১৫·৪৬
৩।	মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন সংস্থা	৩৫·৮২	৪৯·৫৫
৪।	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘর	০·৬৩	০·৭২
৫।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ডিভিশন	১·২৫	১·৯৯
৬।	পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ	২·১১	২·৭৯
৭।	গৃহনির্মাণ গবেষণা ইন্সটিটিউট	০·৪৭	০·৫৬
৮।	বাংলাদেশ ষ্ট্যান্ডার্ড ইন্সটিটিউট	১·১২	১·৮০
৯।	সেন্ট্রাল টেষ্টিং ল্যাবরেটরী	১·৩৯	২·২৪
১০।	নতুন প্রকল্পসমূহের জন্য থোক বরাদ্দ	৩·২২	৫·২৫
	মোট ...	৯২·০০	১২৯·০০

১৫·১৪৬ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণা খাতে দ্বিতীয় পরিকল্পনার বছর ওয়ারী বরাদ্দঃ

সারণী ১৫·১১

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার বছরওয়ারী বরাদ্দ বণ্টন

(কোটি টাকায়)

	১৯৮০/৮১	১৯৮১/৮২	১৯৮২/৮৩	১৯৮৩/৮৪	১৯৮৪/৮৫	মোট
১। স্থির মূল্যে	১৮·৩৫	২০·৭৯	২০·৫৪	১৪·৮৭	১৭·৪৫	৯২·০০
২। চলতি মূল্যে	২০·৫৫	২৫·৯৯	২৮·৭৬	২৩·৩৪	৩০·৩৬	১২৯·০০

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়ন কার্যক্রম

১৫·১৪৭ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি গবেষণার আওতায় গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহঃ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণার আওতায় গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ নিম্নে আলোচিত হ'লঃ

১৫·১৪৮ বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনঃ শান্তিপূর্ণ কাজে আণবিক শক্তি উন্নয়ন ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির উন্নয়নকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনের বৃহৎ আকারের কার্যক্রমগুলি রচিত হয়েছে। গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রধান কার্যক্রমগুলি নিম্নরূপঃ

(১) **পারমাণবিক প্রযুক্তি গবেষণা**—রেডিও আইসোটোপ উৎপাদনের জন্য এই উদ্দেশ্যে দেশের প্রথম ৩ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন পারমাণবিক গবেষণাচুল্লী দ্বিতীয় পরিকল্পনা মেয়াদে স্থাপন করা হবে। কৃষি, ওষুধপত্র, পানিবিজ্ঞান ইত্যাদির ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম করার জন্য ইহা একান্ত জরুরী।

(২) **কৃষিতে পারমাণবিক প্রযুক্তি প্রয়োগ**—চাল, গম ও পাটের মত জরুরী ফসলের অধিক ফলনশীল ও রোগ প্রতিরোধক জাতের বীজ উদ্ভাবন পারমাণবিক প্রযুক্তির সাহায্যে গুণগত উৎকর্ষ বিধান কৃত্রিম সারের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ব্যবহারের এবং সঞ্চিত খাদ্যশস্য, পচনশীল খাদ্যদ্রব্য, ফল ও সব্জীর তাজা অবস্থায় সংরক্ষণের কাজে তৎপরতা চালান হবে।

(৩) **স্বাস্থ্য পরিচর্যায় পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার**—দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ক্যান্সার এবং ফুসফুস ও হৃদপেশীর ব্যাধি ও অন্যান্য দুষ্ট ব্যাধি নির্ণয় ও চিকিৎসায় পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধে বাড়ানো হবে।

(৪) **পারমাণবিক পদার্থ** ও উপকারণাদির এবং সৈকতের বালি থেকে ভারী খনিজের অনুসন্ধান ও উন্নয়ন চলবে।

১৫·১৪৯ বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদঃ স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার এবং বিভিন্ন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনকে বাণিজ্যিক পর্যায়ে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে প্রক্রিয়া ও পণ্যাদির নতুন প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্য বৈজ্ঞানিক ও শিল্পগত গবেষণা পরিচালনাই এই পরিষদের প্রধান কাজ। শিল্প গবেষণার ক্ষেত্রেই শিল্প কারখানার যন্ত্রপাতির ডিজাইন নির্মাণ কাঠামো গড়ার সামর্থ উন্নয়নেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া হবে। এর উদ্দেশ্য হবে আবিষ্কারগুলিকে বাস্তবতার আকারে রূপান্তরিত করা। গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমগুলি হচ্ছেঃ

(১) কৃত্রিম তন্তুসহ অন্যান্য আঁশের সংমিশ্রণে পাটের বহুমুখী ব্যবহার প্রচলনের উদ্দেশ্যে 'জটুন' উদ্ভাবন।

(২) ফল, মাছ ও মাংস ইত্যাদি সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে প্রযুক্তি প্রয়োগে অত্যন্ত পুষ্টিকর উপাদান সমৃদ্ধ ফর্মুলায় খাদ্য তৈরী।

(৩) জৈব গ্যাস, সৌর শক্তি ইত্যাদি জ্বালানী শক্তির বিকল্প কাজে লাগানোর জন্য প্রযুক্তি উন্নয়ন।

(৪) চামড়া, সিরামিকস, কাঁচ দ্রব্য ও চীনামাটি জাতীয় মৃৎশিল্প পণ্যের উৎকর্ষ বিধানমূলক প্রক্রিয়ার উন্নয়ন। রসায়ন গবেষণা, তন্তু ও পলিমার, নৌতাত্ত্বিক গবেষণা, সামুদ্রিক সম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদির মত জাতীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সম্ভাব্য চাহিদা সংশ্লিষ্ট এমন গবেষণা ও উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোগুলির শূন্যতা পূরণেরও চেষ্টা চলবে।

১৫·১৫০ **মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন সংগঠন:** দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় এই সংগঠনের কার্যক্রম প্রধানতঃ মহাকাশের কক্ষপথে সংস্থাপিত বিভিন্ন কৃত্রিম উপগ্রহ যেমন জাপানের জি-এম-এস, যুক্তরাষ্ট্রের টাইরোস এন ও 'নোয়া' এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের মিটিওর ইত্যাদি থেকে ছবি ও তথ্য সংগ্রহের জন্য আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধেসহ অত্যাধুনিক বহুমুখী পূর্ণাঙ্গ ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন, প্রাকৃতিক সম্পদ জরীপ, দুর্যোগ পূর্বাভাস, পরিবেশগত অবস্থা পর্যবেক্ষণ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনশক্তি উন্নয়ন ইত্যাদির জন্য তথ্যাদির প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষন ও প্রচার। ফ্রান্সের প্রদত্ত সহায়তায় স্পট/ল্যান্ডস্যাট ডি থেকে ছবি সংগ্রহের জন্য একটি ভূকেন্দ্র স্থাপিত হবে।

১৫·১৫১ **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘর:** দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘর স্কীমের প্রথম পর্যায় বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেওয়া হবে। এর আওতায় প্রধান কাজগুলি হবে: একটি স্থাপত্য ডিজাইন সম্পূর্ণকরণ; মূলভবনের পূর্তকাজ বাস্তবায়ন, প্রদর্শনী সামগ্রী সংগ্রহ, বিজ্ঞান মেলা ও ভ্রাম্যমান মেলা আয়োজন।

১৫·১৫২ **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ডিভিশন:** বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ডিভিশনের তত্ত্বাবধানে দুটি স্কীমের কাজ চলছে। এই দুটি স্কীমের একটি দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সম্ভাবনা জরীপ এবং দ্বিতীয়টি জাতীয় বিজ্ঞান গ্রন্থাগার। দ্বিতীয় পরিকল্পনা আমলে এই স্কীম দুটির কাজ সম্পূর্ণ হবে। জাতীয় বিজ্ঞান গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী প্রযুক্তি বিশারদ ও গবেষকদের পাঠাগ্রহ; সহায়ক গ্রন্থাদি ও সাময়িকীর প্রয়োজন মেটাবে।

১৫·১৫৩ **পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ:** নদী, কৃত্রিমনালা ও ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের যোগ্যতার নিশ্চয়তাবিধানের জন্য উৎসগুলির পানির বিশুদ্ধতা রক্ষা এবং পানি, বাতাস, আওয়াজ জনিত সমস্যা ও শিল্প দূষণের প্রকৃতি ও ব্যাপকতা নির্ধারণসহ পরিবেশদূষণ নিয়ন্ত্রণ সংস্থার প্রধান দায়িত্ব। দ্বিতীয় পরিকল্পনা আমলে উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলিতে তৎপরতা জোরদার করা হবে। পল্লী অঞ্চলে জ্বালানীর তীব্র অভাব আংশিকভাবে দূর করার লক্ষ্যে ২৫০টি জৈব গ্যাস প্ল্যান্ট নির্মাণের একটি পাইলট স্কীম বাস্তবায়িত করা হবে।

১৫·১৫৪ **গৃহনির্মাণ গবেষণা ইনস্টিটিউট:** নির্মাণ সামগ্রীর অভাব ও দুর্মূল্য জনিত সমস্যাবলীর সমাধানে, এই ইনস্টিটিউটের সুযোগ-সুবিধেগুলি নিম্নোক্ত বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য জোরদার করা হবে:

(১) সাধারণভাবে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীগুলির আরও দক্ষ ও উন্নততর ব্যবহার;

(২) নির্মাণের পরিকল্পনা ও ডিজাইন পদ্ধতি এবং রক্ষণাবেক্ষণের উন্নতিবিধান; এবং

(৩) পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে সস্তা ও নতুন নির্মাণ সামগ্রী ও প্রযুক্তি উন্নয়ন।

১৫·১৫৫ **বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউট:** দেশে মান নির্ণয় (Standardization), মান নিয়ন্ত্রণ ও প্রত্যয়ন পদ্ধতি কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধে গড়ে তোলা হবে। ১৯৮২ সালের জুলাই মাস থেকে দেশে মেট্রিক পদ্ধতি প্রবর্তন করা হবে। ইনস্টিটিউট এই পরিমাপ ব্যবস্থা প্রবর্তন ও প্রচারণার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৫·১৫৬ **কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার:** নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালনে সক্ষম করে তোলার জন্য ঢাকার কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারটিকে জাতীয় রেফারেন্স সংস্থা ও পরীক্ষাগারের মর্যাদায় পুনর্গঠিত ও উন্নীত করা হবে।

১৫·১৫৭ **বাংলাদেশ মেডিক্যাল গবেষণা কাউন্সিল:** এটি দেশে জৈব মেডিক্যাল গবেষণার ক্ষেত্রে কেন্দ্রবিন্দু পরিগণিত, এই কাউন্সিলকে বিভিন্ন রোগ ব্যাধিতে ভেষজ ওষুধপত্রের ক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণায় হাত দিতে বলা হবে। এই গবেষণায় গাছগাছড়া ও ভেষজ থেকে নতুন নতুন ওষুধ উদ্ভাবিত হবে।

নীতি সুপারিশসমূহ

১৫·১৫৮ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নের উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশদ ও গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখা হবে:

১৫·১৫৯ **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি প্রণয়ন ও সমন্বয়:** একটি সংহত ও পূর্ণাঙ্গ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি প্রণয়ন এবং গবেষণা ও উন্নয়ন তৎপরতার সমন্বয় ও মূল্যায়নের জন্য বর্তমান জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদের গবেষণা ও মূল্যায়নের সমন্বয়মূলক তৎপরতা আরও জোরদার ও কার্যকর করে তুলতে হবে।

১৫·১৬০ **শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ:**

(১) বিজ্ঞান, টেকনিক্যাল ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিষয়াবলী এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহারিক প্রাধান্য আরোপ করার জন্য ঐগুলিকে ঢেলে সাজাতে হবে।

(২) স্কুল ও কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য আরও ভৌত সুযোগ-সুবিধে দিতে হবে।

(৩) আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে দক্ষতা ও নৈপুণ্য বৃদ্ধির প্রতি জোর দিতে হবে।

(৪) বর্তমান পলিটেকনিক/বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলিকে রূপান্তরিত করে অথবা নতুন নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে প্রকৌশলী প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত দক্ষ টেকনিশিয়ান সৃষ্টির জন্য নিবিড় প্রশিক্ষণ (intensive course) কোর্স প্রবর্তন করতে হবে যাতে এসব প্রতিষ্ঠান থেকে বহির্গত কর্মীদেরকে অবিলম্বে কাজে লাগানো যায়।

(৫) বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদগণ যাতে আরও ব্যাপক ও সুস্পষ্ট কর্মক্ষেত্রে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাজ হাতে নিতে পারে সেজন্য তাদেরকে ব্যবস্থাপনা প্রশাসন ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এতে করে তাঁরা জাতীয় গুরুত্ব অনুযায়ী কার্যক্রম বাছাই করতে পারবেন।

১৫·১৬১ **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত অবকাঠামো গঠন:**

(১) পল্লী উন্নয়ন ও গ্রামের শিল্পায়নে সহায়তা করার জন্য চিরাচরিত প্রযুক্তির উন্নতি ও নতুন প্রযুক্তি গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত কেন্দ্র বা একাধিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(২) বিকল্প শক্তির উৎস গড়ে তোলা ও সেগুলির বণ্টন ব্যবস্থা এবং পরিচিত ইন্ধন শক্তির আরও উন্নত ব্যবহারের লক্ষ্যে উপযুক্ত কেন্দ্র বা একাধিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(৩) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা ও সেইসাথে গবেষণাগার ও গ্রন্থাগার সুবিধের উন্নয়নে আরও বেশী মনোযোগী হতে হবে।

(৪) প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানেরই উপযুক্ত কর্মবর্গ সম্বলিত ডিজাইন দপ্তর ও গবেষণাকোষ থাকতে হবে। এগুলির কাজ হবে পণ্যসামগ্রীর প্রচলিত ডিজাইনগুলি দরকার মতো পরিবর্তন ও উন্নত করা, প্রযুক্তি পদ্ধতির উৎকর্ষ বিধান করা এবং এভাবে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োগিক গবেষণা পরিচালনা।

১৫·১৬২ প্রযুক্তির উৎপাদক ও ব্যবহারকারীদের মধ্যে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা:

(১) দেশজ প্রযুক্তি প্রয়োগের স্বার্থে উদ্যোগ সামর্থের উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

(২) আমদানী করা তথা বিদেশী উপদেষ্টামূলক সেবার চেয়ে স্থানীয় উপদেষ্টা সার্ভিসকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

১৫·১৬৩ বিজ্ঞানী/প্রকৌশলীদের জন্য উৎসাহদানমূলক ব্যবস্থা:

(১) বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী ও অন্যান্য পেশাদার ব্যক্তিদের জীবন বৃত্তি পরিকল্পনার দিকে এবং তাদের কর্মগত উন্নতি, বেতন, মর্যাদা প্রভৃতি ও সেইসাথে অন্যান্য সুবিধের দিকে নজর দিতে হবে।

(২) দেশের পেশামূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের কাজের মানোন্নতির জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক ও নৈতিক সমর্থন দিতে হবে।

১৫·১৬৪ প্রযুক্তি নিরূপণ ও বদলী: যেসব পণ্য স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করা যায় সেগুলি যাতে কোন প্রতিষ্ঠান আমদানী না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য উপযুক্ত মনিটরিং/নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে।

১৫·১৬৫ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করতে হবে যাতে অন্যান্য দেশের অর্জিত অগ্রগতি থেকে দেশ উপকৃত হতে পারে।

ষোড়শ অধ্যায়

স্বাস্থ্য

জীবন মানের উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্য অন্যতম নৈতিক শর্ত। একটি জাতির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যান সংশ্লিষ্ট দেশবাসীর স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন না করে কোন ভাবেই এসব ক্ষেত্রে আকাংখিত অগ্রগতি সাধন করা যায় না।

১৬.২ স্বাস্থ্য রক্ষার যে ব্যবস্থা বাংলাদেশে প্রচলিত আছে চিরাচরিতভাবে নিরাময়মুখী ও নগরকেন্দ্রিক। স্বাধীনতার পরপর বাংলাদেশ সরকার স্বাস্থ্য পরিচর্যা সুযোগ-সুবিধের অপর্যাপ্ততা এবং শহর ও গ্রামের মধ্যে ঐ সুযোগ-সুবিধের বিষম বন্টন লক্ষ্য করে পল্লী অঞ্চলে স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করার এবং নিবারণ ও উন্নয়নমূলক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিচর্যামূলক সেবা ব্যবস্থার অবকাঠামোমূলক সুযোগ-সুবিধের একটা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় কয়েকটি কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সংকার সম্প্রতি "২০০০ সাল নাগাদ সকলের জন্য স্বাস্থ্য"কে জাতীয় লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

১৬.৩ সকলের জন্য নূন্যতম চিকিৎসা আশু লক্ষ্য। আর ২০০০ সাল নাগাদ সকলের জন্য স্বাস্থ্য বৃহত্তর জাতীয় লক্ষ্য, এই লক্ষ্য অর্জনের মূল বিষয় হিসেবে স্বাস্থ্য খাতিরের প্রধান বিষয় প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যাকে গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০০ সাল নাগাদ সকলের জন্য যুক্তিসম্মত পর্যায়ে স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্ভব করে তোলার পথে দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা একটা অগ্রবর্তী পদক্ষেপ বিশেষ।

প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার পর্যালোচনা

১৬.৪ পল্লী স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য এ দুটি পরিকল্পনা তহবিল বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে এবং সামাজিক ও নিবারণমূলক চিকিৎসার প্রতি স্বাস্থ্যকর্মীদের ধারনা বদল করে দিয়েছে।

১৬.৫ **থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ঃ** প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার শুরুতে প্রতিটি পল্লী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ছয়টি করে শয্যার হিসেবে মোট ৯০০টি শয্যা নিয়ে ১৫০টি পল্লী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চালু ছিল, ১৯৮০ সালের জুন মাস নাগাদ ২৯০টি থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স (১৫০টি রূপান্তরিত পল্লী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ) ৩,৮০০টি শয্যা (পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ১০০টি শয্যা সহ) চালু করা, যদিও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল প্রতিটি থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৩১টি শয্যা হিসেবে ১১৩৬ শয্যা সম্বলিত ৩৫৬টি থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চালু করা।

১৬.৬ **হাসপাতাল ও ক্লিনিক ঃ** প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় ১৫,৯৯১টি অতিরিক্ত শয্যার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ১৯৮০ সালের জুন মাস নাগাদ প্রকৃতপক্ষে অতিরিক্ত শয্যা সংযোজিত হয়েছে ৭,২৬১টি। ফলে লক্ষ্য মাত্রা থেকে ঘাটতি থেকে গেছে ৮,৭৩০টি শয্যা।

১৬.৭ **জনশক্তি উন্নয়ন কার্যক্রম ঃ** জনশক্তি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের বেশীর ভাগই নির্মাণ প্রধান, আর এ কারণে নানা বাধা বিঘ্নের দরুন সেগুলির কাজ সম্পূর্ণ করা যায়নি। অবশ্যই, এই প্রতিষ্ঠান গুলিকে যতটুকু সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় তা দিয়েই চালু করা হয়েছে।

১৬.৮ সীমিত সুযোগ-সুবিধের নিয়মিত নার্সিং কোর্স ছাড়াও নার্স প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জেলা হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজগুলিতে এ জন্যে জরুরী ভিত্তিক কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। বছরে নার্স তৈরীর পরিমাণ ১৫০ থেকে ৪০০ হয়েছে। সিনিয়র নার্সদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি নার্সিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

১৬·৯ "মেডিক্যাল এ্যাসিষ্ট্যেন্ট" নামধেয় মধ্যস্তরের চিকিৎসা জনশক্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে আটটি স্কুল চালু রয়েছে। এ ছাড়া সর্বনিম্ন পর্যায়ে পল্লী চিকিৎসক নামধারী স্বাস্থ্যকর্মীদের এক নতুন ক্যাডার প্রবর্তন করা হয়েছে। থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সংলগ্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে এ পর্যন্ত ৫,৫৭৬ জন পল্লী চিকিৎসককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

১৬·১০ **ঔষধপত্র ও টীকা সরবরাহঃ** ঔষধপত্র ও টীকার উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহ ব্যবস্থা অত্যন্ত অপর্যাপ্ত।

১৬·১১ **আর্থিক সাফল্যঃ** দুই পরিকল্পনায় আর্থিক বরাদ্দের মোট পরিমাণ ২৬৫·৪৩ কোটি টাকা (প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার ১৪৭·৭৮ কোটি টাকা ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় ১১৭·৬৫ কোটি টাকা) এর মধ্যে মোট ২৪৭·৭৫ কোটি টাকা (প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় ১৩৩·১৮ কোটি ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় ১১৪·৫৭ কোটি টাকা) ব্যবহৃত হয়। এতে দেখা যায় তহবিল ব্যবহারের পরিমাণ শতকরা ৯৩ ভাগ। এর মধ্যে মেডিক্যাল চিকিৎসা উপখাতে তহবিল ব্যবহারের পরিমাণ সর্বোচ্চ (১০৩%) এবং মেরামত ও পুনর্নির্মাণ কার্যক্রম খাতে সর্বনিম্ন (৫১%)। থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহ প্রতিষ্ঠার তহবিল ব্যবহার ছিল বরাদ্দ অর্থের প্রায় শতকরা ৯৪ ভাগ।

বর্তমান পরিস্থিতি

১৬·১২ **স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রধান সূচকসমূহঃ** দেশের বর্তমান মোট জনসংখ্যা ৮৯·৫৪ মিলিয়ন। গড় জন্মহার ৪৩·২৫% অন্যদিক গড় মৃত্যু হার ১৬·৭৫। এ থেকে দেখা যায় জনসংখ্যার বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হার হচ্ছে শতকরা প্রায় ২.৬ ভাগ। বর্তমান শিশু মৃত্যু হার প্রতি হাজার জীবন্ত শিশুতে ১৪০ অন্যদিক প্রতি হাজার শিশুতে মারা যায় (১-৪ বছর বয়সের) গড়ে ২৬৫টি শিশু। সকল মৃত্যুর শতকরা ৩৯ ভাগই শিশু মৃত্যু। মাতৃমৃত্যুর হার হিসেব করা হয়েছে প্রতি হাজার শিশুর জীবন্ত ভূমিষ্ট লাভের ক্ষেত্রে ৭ এবং একই কারণে ১৫—৪৫ বছর বয়স্কা মেয়েদের মৃত্যুর হার সকল মাতৃত্বজনিত মৃত্যুর শতকরা ২৭ ভাগ। বর্তমানে গড় আয়ুষ্কাল হিসেব করা হয়েছে ৪৮·১ বছর।

১৬·১৩ **রোগ ব্যাধিঃ** দেশে সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ আগের মতই চলছে। উদরাময়, ডিপথিরিয়া, ধনুষ্টংকার, কাশি হুপিং, কাশি যক্ষা, হাম, ম্যালেরিয়া, খোসপাঁচড়া, কৃমি জাতির প্রভৃতি সংক্রামক রোগের প্রকোপই এ দেশে সবচেয়ে বেশী।

১৬·১৪ পেপটিক আলসার, হৃদ রক্তবাহ ব্যাধি, ক্যান্সার ও মানসীক ভারসাম্যহীনতার মত সংক্রামক ব্যাধির কারণেও বহুলোক পঙ্গু হয়ে পড়ে ও মারা যায়।

১৬·১৫ **অপুষ্টিঃ** জনসাধারণের মধ্যে অপুষ্টি, বিশেষ করে, গ্রামের মানুষ ও ভবঘুরে দল যেমন মা ও শিশুদের মধ্যে অপুষ্টি দশা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। হিসেব করে দেখা গেছে মাথা পিছু পুষ্টি গ্রহণের গড় পরিমাণ ২৩০১ ক্যালরী (১৯৬৪) থেকে ২০৯৪ ক্যালরীতে (১৯৭৬) নেমে গেছে।

১৬·১৬ শিশুদের মধ্যে প্রোটিন জনিত অপুষ্টি সবচেয়ে ব্যাপক জটিল ও দীর্ঘকালের পুষ্টি ঘাটতি শেষ পর্যন্ত প্রোটিনজনিত অপুষ্টিতে পরিণত হয় এবং তা কোয়াশিয়রকর ও মেরাসমাস রোগের আকারে প্রকাশ পায়। ১ থেকে ৪ বৎসর বয়সের শিশুরাই প্রধানতঃ এইসব অপুষ্টিজনিত রোগের শিকার। অনুর্ধ ৫ বছরে বয়সের এক কোটিরও বেশী শিশু প্রোটিন অপুষ্টিতে ভুগছে। ফলে শিশুগুলির শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বিঘ্নিত হচ্ছে। হিসেবে দেখা গেছে, শিশুদের মধ্যে তৃতীয় ও দ্বিতীয় মাত্রার অপুষ্টির হার ৮·৩ শতাংশ আর প্রথম মাত্রার অপুষ্টির হার ৩৬·১ শতাংশ এরমত। তৃতীয় মাত্রার অপুষ্টি ও সেই সাথে সংক্রমণও উদরাময়ঃ সবচেয়ে বেশী মৃত্যুর কারণ, অনুর্ধ ৬ বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভিটামিন 'এ' জনিত অপুষ্টি সবচেয়ে বেশী। প্রতি বছর প্রায় ৫০,০০০ শিশু এই অপুষ্টির শিকার হয় এবং এদের এক তৃতীয়াংশ অন্ধ হয়ে যায়।

১৬·১৭ **স্বাস্থ্য অবকাঠামো, জনশক্তি ও সার্ভিসঃ** পরিকল্পনা স্বয়ের সময়ে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অবকাঠামো ও জনশক্তি অনেক বাড়লেও সংখ্যাগরিষ্ঠের এক বিরাট অংশের কাছে, বিশেষ করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে আজও ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিচর্যা তথা চিকিৎসা সুবিধে পৌছায়নি। দেশে বর্তমান ৮,৫০০ ডাক্তার আছেন, এদের শতকরা ১০ ভাগেরও কম গ্রামে থাকেন। হাসপাতালের ১৫,৩৪৩টি শয্যার মধ্যে পল্লী অঞ্চলে মাত্র ৩,৮০০ শয্যা (শতকরা ২৪·৭৬ ভাগ) আছে। মেডিক্যাল এ্যাসিষ্ট্যান্ট, নার্স, প্যারামেডিকস্ এর অভাব, বিশেষ করে পল্লী এলাকায় এইসব স্বাস্থ্য কর্মীদের অভাবে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটায়। তাই দেখা যায়, সংখ্যাগরিষ্ঠ পল্লীবাসীর জন্য আধুনিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুযোগ সুবিধে অত্যন্ত সীমিত।

১৬·১৮ গ্রামঞ্চলে স্বাস্থ্য সুবিধার যেটুকু এখন পাওয়া যায় সেটুকুও পর্যন্ত ব্যবহৃত হয় না। থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স শয্যা ব্যবহারের হার শহরাঞ্চলগুলির শতকরা ১০০ ভাগের তুলনায় মাত্র ৩০। পল্লী অঞ্চলে অপেক্ষকৃত কম ব্যাধিগ্রস্তত্বের কারণেই এটা ঘটে তা নয় বরং নিকৃষ্ট ব্যবস্থাপনা, প্রয়োগ কৌশলে দক্ষতার অভাব, ওষুধ পত্র ও অন্যান্য চিকিৎসা উপকরণ সরবরাহে একান্ত অপর্যাপ্ততা জনিত চিকিৎসা পরিচর্যা সুবিধের নিকৃষ্টতার একটা সার্বিক ছবিই ফুটে ওঠে। এছাড়াও, পল্লী অঞ্চলের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর স্থানীয় জনগণের পরিপূর্ণ আস্থা না থাকার ফলে দেখা যায়, জনসাধারণ এবং প্রতিষ্ঠানে না এসে শহরের হাসপাতালগুলিতে ভীড় জমাচ্ছে।

১৬·১৯ **প্রধান প্রতিবন্ধকতা সমূহ:** উল্লিখিত দুটো পরিকল্পনা সাফল্য পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে, নিম্নলিখিত প্রধান অন্তরায়গুলি পরিলক্ষিত হয়েছে:

(১) জনসাধারণের কাছে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সার্ভিস সমূহ সরবরাহ কার্যকর হয়নি। এ ক্ষেত্রে সার্ভিসগুলি যৌথ আকারে দেয়া উচিত ছিল। কারণ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সংগঠনের দ্বিধাবিভক্তিতে এ দুইয়ের মধ্যে সহযোগিতার অভাব ছিল:

(২) পল্লী অঞ্চলের প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রের গুদামের অভাব;

(৩) মধ্যস্তরের স্বাস্থ্যকর্মীর অভাব এবং উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার প্রায় কাছাকাছি হলেও (অর্থাৎ পল্লী অঞ্চলে নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসকের সংখ্যা) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে জনশক্তি নিয়োগে ব্যর্থতা;

(৪) স্বাস্থ্য পরিচর্যা সার্ভিস দক্ষতার সাথে প্রদানের জন্য সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করার পরিচালনা পদ্ধতি ও প্রশাসনিক কাঠামোর অপর্যাপ্ততা;

(৫) পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, নজরদারী, মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ সম্পন্ন জনশক্তির অভাব; এবং

(৫) আনুপাতিক হারে বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন সামর্থ বৃদ্ধির ছাড়া বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পরিকল্পনা অগ্রাধিকারের সঙ্গে সঙ্গতিহীন পরিকল্পনা বহির্ভূত বহু প্রকল্প যোগ।

দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ

১৬·২০ দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যবলী নিম্নরূপ:

(১) সকলের ন্যূনতম চিকিৎসা সুবিধে দেওয়ার জন্য পল্লী ও শহরের ব্যবধান লোপ, সাধারণভাবে উৎকর্ষ বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা সার্ভিসের ব্যবস্থা;

(২) পরিবারের কল্যাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্যাকেজ হিসেবে ঐ পরিবারের কাছে উন্নততর স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সার্ভিস পৌছে দেওয়া;

(৩) একটা সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রধান সংক্রামক ব্যাধিগুলির কার্যকর নিয়ন্ত্রণ এবং নিবারণ ও উন্নয়নমূলক ব্যবস্থাদির সম্প্রসারণ; এবং

(৪) দেশজ ও হোমিও প্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতিকে উন্নত করে সেগুলিকে স্বাস্থ্য পরিচর্যা সার্ভিসের সঙ্গে যুক্ত করা।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্ম কৌশল

১৬.২১ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত কর্ম কৌশলগুলি গৃহিত হবে:

(১) থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রগুলির কাজ দ্রুত সমাপ্তি, উপযুক্ত জনশক্তি নিয়োগ করে সার্ভিসের উৎকর্ষ বিধান এবং মেডিক্যাল ও শল্য চিকিৎসার প্রয়োজনীয় সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সার্ভিস সমূহ সম্প্রসারিত করা হবে।

(২) (ক) বাড়ী বাড়ী সেবা পৌছে দেবার জন্য কর্মী জনসংখ্যার অনুপাত হ্রাস, (খ) নির্দিষ্ট মহিলা জনসমষ্টির কাছে সেবা পৌছানোর জন্য মহিলা কর্মীদের সংখ্যা বৃদ্ধি, (গ) গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর লিপিবদ্ধকরণ ও রিপোর্ট করা এবং (ঘ) মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পুষ্টি, অনাক্রম্যতা বিধান, পরিবার পরিকল্পনা, নিবারক ও উন্নয়নমূলক স্বাস্থ্য শিক্ষা ইত্যাদি প্যাকেজ আকারে একটি পরিবারের কাছে পৌছে দেওয়ার মাধ্যমে গ্রামীণ পরিবারগুলিকে উন্নততর সেবা সুবিধে দেওয়ার লক্ষ্যে থানা পর্যায়ে ও আরও নিম্ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সার্ভিসকে সমন্বিত করা হবে।

(৩) পরবর্তী চিকিৎসা, পরীক্ষাগার ও মহামারী তাত্ত্বিক সুবিধেগুলির ওপর বিশেষ জোর দিয়ে সারা দেশে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। পরিশেষে, গোটা স্বাস্থ্য পরিচর্যা পদ্ধতি একটা অঞ্চল ভিত্তিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ইউনিট হিসাবে নিমিতি লাভ করবে, আর এই ব্যবস্থায় সহায়তা যোগাবে 'রেফারাল' পদ্ধতির একটি নেটওয়ার্ক যার আওতায় শহরের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলির পরবর্তী চিকিৎসা স্থল হিসেবে গ্রামীণ মানুষের সেবা করবে।

(৪) অনাক্রম্যতা বিধান ও অন্যান্য কার্যক্রমকে সংক্রামক ব্যাধিগুলি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আরও সম্প্রসারিত ও জোরদার করা হবে।

(৫) উপযুক্ত শিক্ষাদান, প্রশিক্ষণ ও নিরবচ্ছিন্ন পরিস্থিতির মধ্য দিয়া স্বাস্থ্য জনশক্তি গড়ে তোলা হবে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হবে মেডিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট নিম্নতর পর্যায়ের নার্সসহ সকল নার্স ও পল্লী চিকিৎসকদের নিয়ে মধ্য ও নিম্নতম স্তরের জনশক্তি তৈরীর কাজে। ডাক্তাররা যাতে তাঁদের সময়, শক্তি ও মনোযোগ অধিকতর বিশেষজ্ঞসুলভ দক্ষতার প্রয়োজন এমন সব কাজে নিয়োজিত করতে পারেন সেই মান উন্নয়নে মেডিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট, প্যারামেডিক্যাল ও পল্লী চিকিৎসকদের উপর যতটা সম্ভব নিবারণ ও নিরাময়মূলক কাজের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হবে।

(৬) আধুনিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা পদ্ধতিতে দেশজ ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থাকে উন্নয়ন ও সমন্বয় সাধনের জন্যে হাসপাতাল ও গবেষণা সুবিধাদিসহ ডিপ্লোমা ও ডিগ্রী দানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ সরকারী খাতে স্থাপন করা হবে এবং বেসরকারী খাতে বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি সমর্থন বাড়ানো হবে।

(৭) নুতন শিল্প প্রতিষ্ঠানটি গড়ার মাধ্যমে জরুরী ঔষধপত্র, টিকা, সিরাপ, রিহাইড্রেশন কুইট ইত্যাদির সরবরাহে উৎপাদন বৃদ্ধি করা হবে। মৌলিক ভেষজ ঔষধপত্র সরবরাহের ব্যাপারে অতীতে দেশে অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার দরুন যেসব প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে বিভন্ন সরবরাহ ডিপো ও উপ-ডিপো স্থাপন এবং বণ্টন ব্যবস্থা সুবিন্যস্ত করার মাধ্যমে তা' দুর করা হবে।

(৮) স্বাস্থ্য সার্ভিস প্রদান ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য স্বাস্থ্যান্নোয়ন ও জৈব মেডিক্যাল রিসার্চের সুবিধে সম্প্রসারিত করা হবে।

(৯) পরিকল্পনা প্রণয়ন ব্যবস্থাপনা, তদারকীকরণ, মূল্যায়ন ও দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্য সার্ভিস কাঠামো পুনঃগঠিত করতে হবে। এই পুর্বগঠন, নির্ধারিত প্রকল্পগুলোর দক্ষ বিন্যাসের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং যুগপৎ আনুপাতিক বরাদ্দ বৃদ্ধি ছাড়া নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্তিকে নিরুৎসাহিত করতে হবে।

(১০) সকল স্বাস্থ্য পরিচর্যামূলক প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় জনসাধারণ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশগ্রহণ এবং উন্নততর তদারকীকরণ ও সার্ভিসের মান উন্নতি নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য পরিচর্যা সুবিধেগুলো বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিবারক ও উন্নয়নমূলক স্বাস্থ্য শিক্ষা দান ও স্থানীয় সম্পদ নিয়োগের উপর স্ববিশেষ উৎসাহ প্রদান করা হবে।

আর্থিক ব্যয়

১৬·২২ উদ্দেশ্যাবলী ও কর্ম কৌশলের পরিপ্রেক্ষিতে, স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন কার্যক্রম গুলো ১৯৭৯/৮০ সালের স্থিরমূল্যে মোট ব্যয় হিসেব করা হয়েছে ২৮৮·০০ কোটি টাকা, যার পরিমাণ চলতি মূল্যে প্রায় ৪১৩·০০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার বছরের বছরওয়ারী ব্যয়ের স্থির ও চলতি মূল্য ১৬·১ সারনীতে নিম্নে প্রদর্শিত হয়েছে:

সারণী ১৬·১

পরিকল্পিত মোট আর্থিক ব্যয়ের বছরওয়ারী বন্টন

[কোটি টাকায়]

	১৯৮০/৮২	১৯৮২/৮৩	১৯৮৩/৮৪	১৯৮৪/৮৫	মোট (১৯৮০—৮৫)
(১) স্থির মূল্য	১০৯·৯২	৫৫·৮৯	৫৬·২০	৬৫·৯৯	২৮৮·০০
(২) চলতি মূল্য ..	১৩০·৪০	৭৮·২৪	৮৮·২৩	১১৬·১৩	৪১৩·০০

স্বাস্থ্য খাতে নানা কার্যক্রমের মধ্যে অগ্রাধিকার পেয়েছে:

(১) প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা;

(২) সংক্রামক রোগব্যাধি নিয়ন্ত্রণ;

(৩) জুনিয়র মার্সের একটি নতুন ক্যাডার সৃষ্টিসহ মধ্যম ও নিম্নস্তর স্তরের স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন;

(৪) গচরাচর ব্যবহৃত ভেষজ ঔষধ ও জৈব দ্রব্যাদি উৎপাদন;

(৫) জনস্বাস্থ্য পরীক্ষাগার সার্ভিস;

এ ছাড়া, গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে নিম্নের কর্যক্রমের উপর:

(১) সকল শ্রেণীর স্বাস্থ্যকর্মীর উপযুক্ত ও কর্মাত্মক প্রশিক্ষণ ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ;

(২) একটা সাবগ্রীক 'রেফারাল' পদ্ধতি উন্নয়ন; এবং

(৩) হাসপাতাল ও অন্যান্য বিশেষ প্রতিষ্ঠানের উন্নতর ব্যবহার।

সরকারী খাতে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ

১৬·২৩ **প্রাথমিক স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা ঃ** প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সুবিধে পৌঁছে দেবার প্রধান মাধ্যম হিসেবে প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার পল্লী অঞ্চলের প্রতিটি থানায় ৩১ শয্যার (২৫টি সাধারণ ও ৬টি পরিবার পরিকল্পনার শয্যা) একটি করে থানা কমপ্লেক্স এবং ইউনিয়ন ও থানা পর্যায়ে তত্ত্বাবধায়কের অধীনে প্রতি চার হাজার লোকের জন্য একজন বহু উদ্দেশ্যসাধিক স্বাস্থ্য কর্মীর মাধ্যমে আবাসিক স্বাস্থ্য সার্ভিসের পাশাপাশি প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র/উপকেন্দ্র/পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপনের কথা বলা হয়েছে।

১৬·২৪ **আবাসিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ঃ** সংক্রামক রোগব্যাধির নজর রাখা ও সেগুলো নিয়ন্ত্রণ মাতৃ মংগল ও শিশু স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা, ছোটখাট ধরনের অসুখ বিসুখ ও জখম, পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতা, নিরাপদ পানীয় জল, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা, খাদ্য পুষ্টি ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের জন্য সক্রিয় গোষ্ঠি সহায়তা লাভ এতে অন্তর্ভুক্ত।

প্রতি ৬০০০ লোকের জন্য প্রান্তিক কর্ম বাহিনী গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে পল্লী চিকিৎসকদের মত একটা সহায়ক চিকিৎসা ক্যাডার গড়ে তোলা হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় একজন ম্যাট্রিক পাশ বালক বা বালিকা কিংবা এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় নিম্নোক্ত যোগ্যতাবিহীন ডাক্তার, হোমিওপ্যাথিক বা দেশজ চিকিৎসা পদ্ধতির একজন চিকিৎসকের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য গ্রাম থেকে নির্বাচিত করা হবে। এই কার্যক্রমের মেয়াদি মূল্যায়ন করা হবে।

১৬·২৫ **স্থায়ী পরিচর্যা ঃ পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র**—দেশের ৪,৩৬৫টি ইউনিয়নের প্রতিটিতে একটি করে পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র থাকবে। এর মধ্যে ৩৬৫টি থানা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সও অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে মোট ৩,১৫০ টি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র চালু হবে বলে আশা করা যায় (জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ডিভিশন ১,৫০০, আগে নির্মিত ২৩০ আই আর ডিপি-৩৫, নেদারল্যাণ্ডের সহায়তায় ৮৬, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার সহায়তায়-২৪, স্বাস্থ্য বিভাগ ১,২৭৫-বর্তমান পল্লী ডিসপেনসারী গুলো)। প্রতিটি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ১৮,০০০ থেকে ২০,০০০ লোকের সেবা দান করবে এবং কেন্দ্রগুলোর পরিচালনায় পর্যায়ক্রমে থাকবে একজন মেডিক্যাল অফিসার/মেডিক্যাল এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা, একজন ফার্মাসিষ্ট এবং একজন ল্যাবরেটরী টেকনিশিয়ন।

১৬·২৬ **স্থায়ী পরিচর্যা ঃ থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স**—এ পর্যন্ত ৩৫৬টি থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মধ্যে ২৯০টি থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চালু হয়েছে এবং এগুলোতে হাসপাতালের কিছু সুযোগ সুবিধেসহ আউটডোর রোগী-দের চিকিৎসা সুবিধে পাওয়া যাবে। পূর্ণাংগ থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স গড়তে এ গুলোর অধিকাংশরই আরো নির্মাণের দরকার। অবশিষ্ট ৬৬টি থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বাস্তবায়নের নানা পর্যায়ে রয়েছে। এবং এ পরিকল্পনার মেয়াদে তাদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবে। এই থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রগুলো হবে লক্ষ্য লক্ষ্য পল্লীবাসীর কাছে চিকিৎসা সুবিধে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম।

১৬·২৭ **সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ ঃ** সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রনের জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলোর তৎ-পরতা আরও সম্প্রসারিত ও শক্তিশালি করা হবে :

(১) যক্ষ্মা, ধনুষ্টংকার, ডিপথিরিয়া, পলিমায়েলাইটিস, হুপিং কাশি, টাইফয়েড, ও কলেরা সংক্রামক বিরোধী অনাক্রম্যতা সৃষ্টি;

(২) ডিপথিরিয়া, হুপিং কফ ও ধনুষ্টংকার রোগ প্রতিরোধক টীকা ও টকসিড উৎপাদন;

(৩) উদরাময় জাতীয় রোগ, ব্যাধির জন্য মুখে খাওয়ানোর উপযোগী রিহাইড্রেশন;

(৪) ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ;

(৫) মহামারী তাত্ত্বিক সার্ভিসের জন্য জনস্বাস্থ্য পরীক্ষাগার ; এবং

(৬) স্বাস্থ্য শিক্ষাদান।

১৬.২৮ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কার্যক্রমের আওতায় সংক্রামক ব্যাধিগুলির নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাও জোরদার করা হবে। এবং সেইসাথে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের মত অন্য সব প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত প্রয়াস এ ব্যাপারে প্রয়োজন। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ বিশেষ করে পল্লী এলাকায় নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ ও মলমূত্র নিষ্কাশনের স্বাস্থ্য সম্মত ব্যবস্থার জন্য বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়িত করছে। এই প্রকল্পগুলো কলেরার, অন্যান্য উদরাময়ের মত ব্যাধি ও জীবাণু সংক্রামকমূলক রোগের প্রাদুর্ভাব নিবারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংক্রামক রোগগুলির ধরণ ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ নিম্নরূপঃ

সারণী ১৬·২

সংক্রামক ব্যাধিগুলির ধরণ ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

ব্যাধি	সূচক	১৯৮০ স্তর	লক্ষ্যমাত্রা ১৯৮০—৮৫
১। কলেরা	প্রকোপ হার	০·২/১০০০	৫০% হ্রাস
২। উদরাময়/আমাশয়	প্রকোপ হার	১৬·৫/১০০০	১৫% হ্রাস
৩। যক্ষ্মা	ব্যাপকতার হার	২৫/১০০০	(ক) ১০০% অনাক্রম্যতাসৃষ্টি (খ) রোগ নির্ণয় ও সকল রোগ চিকিৎসা।
৪। ম্যালেরিয়া	প্রকোপের হার	১·৪/১০০০	৫০% হ্রাস
৫। হাম	প্রকোপের হার	৭/১০০০	১০% হ্রাস
৬। কৃমি	প্রকোপের হার	৩৬/১০০	৩০% হ্রাস
	ব্যাপকতার হার	অনূর্ধ ১৫ বছরের ৮০% শিশু	অনূর্ধ ১৫ বছরের শিশুদের ছয়মাস অন্তর কৃমি মুক্তকরণ
৭। ধনুষ্টংকার	অনূর্ধ এক বছর বয়সে প্রকোপের হার	২৭·১/১০০০	শূন্যমাত্রায় হ্রাস
	অনূর্ধ পাঁচ বছর বয়সে মৃত্যু হার	৮·৬/১০০০	৫০% হ্রাস
৮। ডিপথেরিয়া	প্রকোপের হার	০·১১/১০০০	অনূর্ধ ৫ বছরের ছেলে-মেয়ের অনাক্রম্যতা বিধান
৯। হুপিং কাশি	প্রকোপের হার	১৮/১০০০	ঐ
১০। পলিওমাইয়েলাইটিস	ব্যাপকতার হার	০·৮/১০০০	ঐ
১১। কুষ্ঠ	ব্যাপকতার হার	০·২২/১০০০	৪০ রোগ নির্ণয় ও সকল রোগীর চিকিৎসা
১২। খোস-পাচড়া	ব্যাপকতার হার	৫·৯৫/১০০০	২৫% হ্রাস

১৬.২৯ **হাসপাতাল ও ক্লিনিকঃ সাধারণ হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহ**–থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৩১টি শয্যা ছাড়াও মহকুমা পর্যায়ে কমপক্ষে ৫০টি শয্যা থেকে পরে ১৫০ শয্যায় বর্ধিত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হবে। যে জেলাগুলিতে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার কোন পরিকল্পনা নেই সেইসব জেলার জেলা হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ১০০ থেকে বাড়িয়ে একইভাবে ১৫০টি করা হবে। থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলিসহ এইসব হাসপাতালের কিছু শয্যা শিশুদের জন্য ও পরিবার পরিকল্পনামূলক কাজের জন্য সংরক্ষিত রাখা হবে। সদর ও মহকুমা হাসপাতালগুলিতে বিশেষ ধরণের চিকিৎসা সুবিধে থাকবে যাতে এগুলি পরবর্তী চিকিৎসামূলক হাসপাতাল হিসাবে কাজ করতে পারে। এসব সুযোগ সুবিধে ছাড়াও যেসব জায়গায় কন্টাইও মিলিটারী হাসপাতাল আছে সেসব জায়গায় এই হাসপাতালগুলিতে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যবর্গ ও তাঁহাদের আত্মীয় পরিজনের চিকিৎসা ছাড়াও বেসামরিক ব্যক্তিদের জন্য কয়েকটি শয্যা থাকবে।

১৬.৩০ **হাসপাতাল ও ক্লিনিক ঃ বিশেষ হাসপাতালসমূহ**—পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত উন্নয়ন কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে :

(ক) ঢাকায় শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল কমপ্লেক্সে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট কার্ডিওভাসকুলার ইনষ্টিটিউট ও অপথ্যালমোলজী ইনষ্টিটিউটের কাজ সম্পূর্ণ করণ ;

(খ) ঢাকা শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল কমপ্লেক্সে ১০০ শয্যা সম্বলিত ক্যান্সার গবেষণা ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা;

(গ) শিল্প শ্রমিকদের জন্য আদমজীনগর, টঙ্গী, বাড়বকুণ্ড নওয়াপাড়া ও বগুড়ায় পাঁচটি ৫০ শয্যার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা।

১৬.৩১ স্বাস্থ্য ডিভিশনের আওতায় পরিকল্পনাকালে মোট শয্যা সংখ্যা ১৫,৩৪৩ হইতে ২৫,৩৮২তে উন্নীত করা হবে। এই শয্যাগুলির ১১,১৩৪টি হবে পল্লী এলাকার জন্য। এছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে মোট ৫,৫৮৩টি হাসপাতল শয্যা পাওয়া যাবে যেমন—জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ডিভিশন (—)৬৯৮ (প্রসূতি শয্যা), পুলিশ (—)৭৬২, জেল (—)৯৫৩, রেলওয়ে-৪৬৭ ও বেসরকারী (—)২৭০৩। এভাবে বর্তমানে মোট শয্যা সংখ্যা হচ্ছে ২০,৯২৬টি।

১৬.৩২ বেসরকারী খাতে ১,৫০০টি শয্যা (বেসরকারী গৃহ নার্সিং প্রকল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে) এবং সরকারী খাতে ১০,০৩৯ টি শয্যা বৃদ্ধি পাবে ধরে নিলে পরিকল্পনা মেয়াদের শেষে মোট শয্যা সংখ্যা দাঁড়াবে ৩২,৪৬৫। শয্যা ও জনসমষ্টির অনুপাত ১:৪,২৭৯ থেকে ১:৩,০১৮ দাঁড়াবে।

১৬.৩৩ দেশজ ও হোমিও পদ্ধতি ঔষধ ঃ বহুকাল থেকেই দেশজ (ইউনানী ও আয়ুর্বেদী) ও হোমিওপ্যাথি পদ্ধতি চিকিৎসা বেশ প্রতিষ্ঠিত। ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসামতে বহু চিকিৎসক রয়েছেন আর আমাদের জনসমষ্টির একটা বিরাট অংশ এসব পদ্ধতিতে চিকিৎসিত হচ্ছেন। দেশজ/টিগাচরিত পদ্ধতির ওষুধপত্র স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত অশোধিত ভেষজ ও প্রধানতঃ বনজ গাছপালা দিয়ে তৈরী বাংলাদেশ ওষুধ জাতীয় বনজ গাছগাছড়া ও লতাপাতায় সমৃদ্ধ, কয়েকটি ব্যাধি নিরাময়ে এ ধরনের ভেষজ ও গাছ পাছড়ার কার্যকারিতা বহুল স্বীকৃত হলেও সুষ্ঠপদ্ধতি ও বিজ্ঞান সম্মত ভিত্তিতে এই সম্পদ কাজে লাগানোর জন্য কোন প্রয়াসই এ পর্যন্ত চালানো হয় নাই। একইভাবে, হোমিওপ্যাথি পদ্ধতির চিকিৎসা ও অত্যন্ত জনপ্রিয়, এ চিকিৎসা খুবই প্রচলিত এবং জনসংখ্যার অনেকাংশ তার আওতাধীন। এই দুই পদ্ধতির আওতায় বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যা বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলের লোকদের চিকিৎসা ও স্বাস্থ রক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে।

১৬.৩৪ এই চিকিৎসা পদ্ধতিগুলি দেশে বহু প্রচলিত। তাই এগুলিকে যথাযথ বিজ্ঞান সম্মতভাবে বিকশিত করা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বিত করা দরকার। সম্পর্কিত সকল বিষয়ে পরীক্ষা

নীরিক্ষা করে দেখার পর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য বিভাগে একটা উপযুক্ত মেশিনারী প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই চিকিৎসা পদ্ধতিগুলি উন্নয়নের জন্য প্রধান কার্যক্রমগুলি হচ্ছে:

(ক) ডিগ্রি কোর্সে শিক্ষা প্রদান ও গবেষণা কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে প্রতিটি চিকিৎসা পদ্ধতির জন্য ঢাকায় ১০০ শয্যার হাসপাতাল সম্বলিত একটি করে ইনষ্টীটিউট স্থাপন করা হবে। এছাড়াও বেসরকারী খাতে এধরণের যেসব ইনষ্টীটিউটের অস্তিত্ব রয়েছে সেগুলিকে একটা নির্দিষ্ট মান-ভিত্তিক করার জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট মহাবিদ্যালয় বা ইনষ্টীটিউটগুলি যেসব বিষয়ে গবেষণা তৎপরতা পরিচালনা করবে তার মধ্যে থাকবে:

(১) সাধারণ রোগব্যাধির চিকিৎসার ঐতিহ্যগত ও হোমিও প্যাথি চিকিৎসার ফলপ্রসূতা সংক্রান্ত যেসব বৈজ্ঞানিক উপাত্তাদি পাওয়া যায় সেগুলি পর্যালোচনা;

(২) এই পদ্ধতিতে যেসব রোগব্যাধির নিরাপদ ও কার্যকর, এমনকি এলোপ্যাথি পদ্ধতির চেয়ে সন্তোষজনক চিকিৎসা সম্ভব সেইসব রোগব্যাধি চিহ্নিত করা;

(খ) সিলেট সরকারী তিব্বিয়া কলেজের আরও উন্নয়ন।

১৬.৩৫ **পুষ্টি কার্যক্রম:** দেশে ব্যাপক অপুষ্টিজনিত সমস্যাবলীর গুরুত্ব ও ঐ সমস্যার কারণে জন-গোষ্টির স্বাস্থ্য ও কল্যাণের ক্ষেত্রে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া বলার অপেক্ষা রাখে না। জনস্বাস্থ্য পুষ্টি, পথ্য ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনষ্টীটিউটের মত স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়ের আওতাধীন কয়েকটি প্রতিষ্ঠানসহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান অপুষ্টিরোধমূলক তৎপরতায় নিয়োজিত। ১৯৭৪ সালে জাতীয় পুষ্টি পরিষদ গঠিত হয়। তবে সাংগঠনিক বিন্যাসে কিছু সহজাত বিচ্যুতির জন্য এটি কার্যকর হয়ে উঠতে পারেনি।

১৬.৩৬ পুষ্টি পরিকল্পনা পরিসরের দিক থেকে বহু খাতমূলক। তাই পুষ্টি পরিস্থিতি ও নীতির পর নিরবচ্ছিন্ন রাখার প্রায়াসে সমন্বয় আবশ্যক। এ কারণে জাতীয় পুষ্টি পরিষদকে পুনর্জীবিত ও শক্তিশালী করা হচ্ছে। এই সাথে অন্যান্য খাতে পুষ্টি ও পুষ্টি সংক্রান্ত কার্যক্রমের সম্পূরক ব্যবস্থা হিসেবে দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত পুষ্টি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

(ক) পরিকল্পনা কমিশন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পুষ্টি ইউনিট গঠন;

(খ) নিম্নলিখিত অংশগুলি সমন্বয়ে ফলিত জনস্বাস্থ্য কার্যক্রম গ্রহণ;

(১) রোগ প্রকাশসহ তৃতীয় মাত্রার অপুষ্টির শিকার শিশুদের ক্লিনিক ব্যবস্থাসহ চিকিৎসার জন্য থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলিতে শিশু পুষ্টি ইউনিট গঠন, ১২ বছর পর্যন্ত শিশুদের পুষ্টি পর্যবেক্ষণ ও দেশের বড় হাসপাতালগুলিতে পথ্য বিদের (ডায়েটিশিয়ান) পদ সৃষ্টি;

(২) অপুষ্টিতে পড়ার মত জনগোষ্টির অপুষ্টিবোধ এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থায় পুষ্টি উপা-দানের কার্যকর প্রবর্তনের জন্য ফলিত জনস্বাস্থ্য পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে হাসপাতালের ডায়েটিশিয়ানসহ ক্ষেত্র স্বাস্থ্য কর্মী এবং ক্ষেত্র কর্মীদের প্রাক-চাকুরী ও চাকুরি-কালীন প্রশিক্ষণ দান;

(৩) গণপুষ্টি শিক্ষা কার্যক্রম;

(৪) প্রাথমিক পর্যায়েই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুষ্টি বিবেচনায় 'ঝুঁকি জরিত' গোষ্টি ও দুর্বল এলাকা চিহ্নিত করার জন্য "জাতীয় পুষ্টি পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি" গঠন;

(৫) স্বাবলম্বন ও সমষ্টি সাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনসাধারণের পুষ্টিতে পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষ্যে কয়েকটি নির্বাচিত গ্রামে পাইলট ভিত্তিতে সমন্বিত সার্বিক ফলিত পুষ্টি কার্যক্রম গ্রহণ;

(৬) বছরে দু'বার উচ্চ পোটেন্সির এ' ভিটামিন অমুর্ব ৬ বছরের শিশুদের অন্ধত্ব প্রতিরোধ প্রকল্প অব্যাহত রাখা ;

(৭) দেশের প্রাদুর্ভাব পীড়িত অঞ্চলগুলিতে মহামারী জাতীয় গলগণ্ড ও ম্যালাইনিজম রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা উদ্ভাবন ; এবং

(৮) গর্ভবতী ও স্তন্যদানরতা মাতা এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাত্রার অপুষ্ট পীড়িত শিশুদের জন্য প্রাপ্তব্য স্বাস্থ্য অবকাঠামো ও সমষ্টি সংগঠনের মাধ্যমে সম্পূরক ও মায়ের দুধের বিকল্প খাদ্য দ্রব্য বিতরণ।

জনশক্তি উন্নয়ন

১৬·৩৭ দেশের সকল স্তরে স্বাস্থ্য জনশক্তির গুরুতর ঘাটতি রয়েছে। পর্যাপ্ত সংখ্যক জনশক্তি পাওয়ার জন্য, এই পরিকল্পনার এই কার্যক্রমগুলি অন্তর্ভুক্ত :

(১) **পল্লী চিকিৎসক :** নিম্নস্তরে মৌলিক স্বাস্থ্য চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কর্মী প্রশিক্ষণ দানের জন্য এই কার্যক্রম চলতে থাকবে।

(২) **মেডিক্যাল এসিষ্টান্ট :** ৮টি মেডিক্যাল এসিষ্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল সম্পূর্ণ করা এবং আরও এ ধরণের স্কুল প্রতিষ্ঠা। মেডিক্যাল এসিষ্ট্যান্টদের সংখ্যা ৪৫০ থেকে ৩,২৪০ এ উন্নীত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

(৩) **নার্স :** নার্স প্রশিক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নেওয়া হবে :

(ক) জেলা হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজগুলির সঙ্গে সংলগ্ন সিনিয়র নার্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি সম্পূর্ণ করা এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও ময়মনসিংহের বর্তমান সেবিকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির সুযোগ সুবিধে সম্প্রসারণ ;

(খ) ইন্সটিটিউট অব পোষ্ট গ্রাজুয়েট মেডিসিন এ্যান্ড রিচার্চে সেবিকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ স্থাপন ;

(গ) প্রত্যন্ত মহকুমাগুলির হাসপাতাল সংলগ্ন সিনিয়র নার্সদের জন্য ১৮টি কেন্দ্র স্থাপন; এবং

(ঘ) জুনিয়র নার্সদের প্রস্তাবিত ক্যাডারের প্রশিক্ষণের জন্য থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও মহকুমায় ৪০টি কেন্দ্র স্থাপন।

(৪) **প্যারা মেডিক্স :** ঢাকা প্যারামেডিকস্ ইন্সটিটিউটে ও দেশের উপযুক্ত মেডিক্যাল ইন্সটিটিউটে ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন।

(৫) **মেডিক্যাল গ্রাজুয়েট :** গ্রাজুয়েট ডাক্তারদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রম হাতে নেওয়া হবে :

(ক) রংপুর, সিলেট, বরিশাল ও ঢাকায় স্যার সলিমুল্লাহ কলেজের চলতি প্রকল্পগুলো সম্পন্ন;

(খ) ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের আরও উন্নয়ন; এবং

(গ) চাহিদা, ব্যবহার ও ভৌত সুযোগ সুবিধের আলোকে মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ছাত্র ভর্তির বিষয়টির পুনর্বিবেচনা ও যুক্তিকতা বিবেচনা করা হবে। ডাক্তারদের সংখ্যা ১১,০০০ থেকে ১৭,০০০ করা হবে। এতে ডাক্তার জনগোষ্টির অনুপাত দাঁড়াবে ১:৮,০০০ থেকে ১:৫,৮৮২তে।

(৬) **দাঁতের গ্রাজুয়েট** : ঢাকা দন্ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের আরও উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হবে।

(৭) **স্নাতকোত্তর ডাক্তার/বিশেষজ্ঞ** : পোষ্ট গ্রাজুয়েট মেডিসিন এ্যান্ড রিসার্চ, ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব প্রিভেনটিভ এন্ড সোসাল মেডিসিন ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রকল্পগুলোর সমাপন। সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধে আছে এমন কতকগুলি মেডিক্যাল কলেজে স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণ সুবিধে সম্প্রসারিত করা হবে।

(৮) **নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ** : প্রাথমিক চাকুরিকালীন ও প্রাক-পদোন্নতি প্রশিক্ষণ, রিফ্রেশার ট্রেনিং এবং স্বাস্থ্য জনশক্তির সকল শ্রেণীর কর্মীর নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষাদান ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য একটি সার্বিক প্রকল্প গ্রহণ।

(৯) **বৃত্তি ও ষ্টাইপেন্ড** : বিভিন্ন মেডিক্যাল ও নার্সিং প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের বৃত্তি ও ষ্টাইপেন্ড দেওয়ার বর্তমান রীতি অব্যাহত রাখা এবং উপযুক্ত ছাত্রদেরকে পরিশোধের ভিত্তিতে অর্থ আগাম দেওয়ার উপায় উদ্ভাবন করা।

১৬·৩৮ স্বাস্থ্য জনশক্তির উন্নয়ন ও সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ব্যবহার সম্পর্কিত সমস্যাবলীর ব্যাপারে যেসব উপযুক্ত ব্যবস্থা দেওয়া দরকার সেগুলি নীচে সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে :

(১) মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ক্লিনিক্যাল এসিষ্ট্যান্টের আকর্ষণীয় পদগুলিতে নিয়োগ, দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য বাছাই, বিদেশে চাকুরী গ্রহণের অনুমতি, পরবর্তী উচু পদে পদোন্নতি এবং যেসব ডাক্তার তিন বছরের স্বাভাবিক চাকুরী মেয়াদের পুরোটুকু চাকুরী করেছেন রুটিন মাফিক তাঁদের শহর এলাকায় নিয়োগ এবং একই মেয়াদে রোগ প্রতিষেধকমূলক ক্ষেত্রে কাজ করেছেন তাঁদেরকে ক্লিনিক্যাল ক্ষেত্রে কাজ করার সুযোগ দানের পূর্বশর্ত হিসাবে গ্রামাঞ্চলে কমপক্ষে দু বছরের চাকুরী বাধ্যতামূলক করে পল্লী অঞ্চলে ডাক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধি।

(২) কার্যকর স্বাস্থ্য সার্ভিস প্রদানের জন্য স্বাস্থ্যজনশক্তির শিক্ষাদান মানোন্নয়নের পূর্বশর্ত। শিক্ষকের অভাব, ক্লিনিক্যাল শিক্ষকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস এবং মেডিক্যাল শিক্ষাদানের সহায়ক সরঞ্জামের অপর্যাপ্ততার মত নানা কারণে মেডিক্যাল শিক্ষা বিশেষ করে মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষা দারুনভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এ কারণে প্রস্তাব করা হয়েছে যে, শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিষয়টি ব্যাপক আকারে হাতে নিতে হবে। চিকিৎসক শিক্ষকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমিত করে দিতে হবে অথবা প্রাইভেট প্রাকটিস বন্ধ করার বিকল্প হিসেবে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ভাতা দিতে হবে এবং মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অডিও-ভিজুয়াল সরঞ্জাম, ভিডিও ক্যাসেট রেকর্ডার ও অন্যান্য সরঞ্জামের মত শিক্ষামূলক সহায়ক সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারের স্বাস্থ্য কর্মীদের লম্বিক পদোন্নতি (Vertical career mobilty) এবং ন্যূনতম একাডেমিক যোগ্যতার মেধাবী ও দক্ষ কর্মীদের সম্পর্কিত সংরক্ষিত উচ্চতর ক্যাডার পদে পদোন্নতির ব্যবস্থা। যেমন, একজন যোগ্যতাসম্পন্ন মেডিক্যাল এসিষ্ট্যান্টের ডাক্তার পদে পৌছুতে পারা উচিত।

(৪) চিকিৎসা বিজ্ঞানে ডিগ্রীর প্রয়োজন নেই এমন সব পদ থেকে ক্রমান্বয়ে যোগ্যতা সম্পন্ন চিকিৎসকদের তুলে নিয়ে সেইসব পদে অন্যান্য স্বাস্থ্য ক্যাডারের কর্মী নিয়োগ কিংবা বন্ধ মেডিক্যাল কর্মীর একটা নতুন ক্যাডার সৃষ্টি করে, তাদের উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে ঐসব পদে স্থলাভিষিক্তকরণ। উল্লেখ্য, হাসপাতাল প্রশাসন, টীকা উৎপাদন, মেডিক্যাল ষ্টোর ও সরবরাহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়ভাবে চিকিৎসকদের নিয়োগ করার নজীর রয়েছে।

ঔষধপত্র ও টীকার উৎপাদন এবং সরবরাহ

১৬·৩৯। বর্তমানে বাংলাদেশে বছরে প্রায় ১০০ কোটি টাকা মূল্যের ভেষজ ও ঔষধপত্র ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ দেশে তৈরী করা হয় এবং বাকী ২০ ভাগ সম্পূর্ণ প্রস্তুত আকারে আমদানী করা হয়। মোট ব্যবহৃত ভেষজ ও ঔষধপত্রের ১৫ ভাগ সরবরাহ আসে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলির মারফত (স্বাস্থ্য ডিভিশনের ভেষজ ও ঔষুধপত্র খাতে রাজস্ব বাজেট ১৫ কোটি টাকা)। স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশেষ করে, থানা পর্যায়ের বা এর নিম্নপর্যায়ের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঔষুধপত্র সরবরাহ ইউনিসেফের ডিডিএস কিটস প্রদানের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এভাবে সরবরাহকৃত ঔষুধপত্রের আর্থিক মূল্য ১·৫০ কোটি টাকা। ডিডিএস কিটস ২১ প্রকার জরুরী ঔষুধপত্র সরবরাহের মাধ্যমে অত্যন্ত মূল্যবান সহায়তা করছে। তবে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিষয়টিকে খুব ফলপ্রসু করে তুলতে হলে ৩১ প্রকার ঔষুধপত্রের উপযুক্ত সরবরাহ নিশ্চিত হওয়া দরকার। সরকারী ও বেসরকারী খাতে শিল্প ডিভিশনের কার্যক্রমের আওতায় এই সব ঔষুধপত্রের উৎপাদনবৃদ্ধির ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্বাস্থ্য খাতে জরুরী ঔষুধ তৈরীর বর্তমান ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ঔষুধ প্রস্তুতকারী বর্তমান ইউনিটগুলির উন্নয়ন ও সম্ভাবনাকে পুরো কাজে লাগানোর জন্য অতিরিক্ত আরও কয়েকটি ঔষুধ উৎপাদনের কাজ হাতে নেওয়ার কার্যক্রম রয়েছে। এ ছাড়াও, জরুরী ঔষুধপত্রের উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য রাজশাহী বিভাগে আরও একটি ঔষুধপ্রস্তুতকারী ইউনিট স্থাপন করা হবে।

১৬·৪০ পরিকল্পনায় ডিপিটি উৎপাদন, আইডি ফ্লুইড ইউনিটের সম্প্রসারণ এবং মহাখালীস্থ জনস্বাস্থ্য ইন্সটিটিউটের অভিন্ন চত্বর থেকে বসন্ত্রংকার ও ডিপথিরিয়ার জন্য এ্যান্টিটক্সিন ও এ্যান্টিসেরা উৎপাদনের লক্ষ্যে একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার চলতি প্রকল্পের কাজ শেষ করার কার্যক্রম রয়েছে।

১৬·৪১ সরবরাহ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গৃহীত কার্যক্রমে খুলনায় মেডিক্যাল সাব-ডিপো এবং সাব-ডিপো নেই এমন সব জেলায় ১৬টি রিজার্ভ ষ্টোর স্থাপন করা হবে।

স্বাস্থ্য গবেষণাগার

১৬·৪২ প্রতিরোধক, উন্নয়নমূলক ও নিরাময়মূলকসহ সকল স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য পরীক্ষাগার সার্ভিস অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলেও, প্রাপ্য সুযোগ সুবিধে অত্যন্ত সীমিত এবং এগুলো পদ্ধতি মাফিক কাজও করছে না। এই ক্ষেত্রে ব্যবস্থাদি সম্প্রসারিত ও জোরদার করার জন্য নিম্নলিখিত কার্যাবলী স্থির করা হয়েছে:

(১) ঢাকা মহাখালীস্থ জনস্বাস্থ্য গবেষণাগারকে সম্প্রসারিত করে শীর্ষ সংগঠন হিসেবে একটি জাতীয় স্বাস্থ্য গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা; এবং জেলা, মহকুমা, থানা (স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স) এবং যতদূর সম্ভব ইউনিয়ন পর্যায়েও ঐ পরীক্ষাগারের সুবিধে সম্প্রসারিত করা যাতে সেগুলি একটি নেটওয়ার্ক হিসেবে সূক্ষ্ম ও জটিলতার স্তরবিন্যাস হিসাবে-নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করে, ফলে প্রতিষ্ঠানিক আকৃতি হিসেবে সেগুলির ওপর ক্রমান্বয়ে বৃহত্তর দায়িত্ব অর্পিত হবে; এবং

(২) ক্ষেত্র পর্যায়ের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের কাজে সহায়তা যোগানোর জন্য মেডিক্যাল কলেজ, জেলা ও মহকুমা হাসপাতালগুলির পরীক্ষাগারগুলির ক্লিনিক্যাল পরীক্ষাগারের পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য গবেষণাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

এই ব্যবস্থার লক্ষ্য হ'বে ঔষুধপত্রের মান নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে চারটি বিভাগের চারটি পরীক্ষা ও গবেষণাগারের জন্য অতিরিক্ত কাজের ব্যবস্থা করা।

প্রাইভেট নার্সিং হোম

১৬.৪৩ ১৯৭৭ সালে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাইভেট নার্সিং হোম প্রতিষ্ঠার একটি প্রকল্প নেওয়া হয়। এই স্কীমের কাজ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদেও চলবে। এই কার্যক্রমে রয়েছে: (১) ২৫—৫০ শয্যার পলিক্লিনিক, (২) আবাসিক ক্লিনিক এবং (খ) বিশেষ নার্সিং হোম প্রতিষ্ঠা।

ভৌত লক্ষ্যসমূহ

১৬.৪৪ ১৯৮০ সালের প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদি ও প্রাপ্য হাসপাতাল শয্যা এবং ১৯৮৫ সালের লক্ষ্যগুলির বিবরণ ১৬.৩ সারণীতে দেয়া হয়েছে। ১৯৮০ সালে প্রাপ্ত আরও বিভিন্ন শ্রেণীর জনশক্তি এবং ১৯৮৫ সাল নাগাদ ধার্য লক্ষ্য মাত্রা ১৬.৪ সারণীতে দেখানো হয়েছে:

সারণী ১৬.৩

১৯৮৫ সাল নাগাদ প্রতিষ্ঠানিক সুবিধা ও হাসপাতাল শয্যার লক্ষ্যসমূহ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের শ্রেণী	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		শয্যা সংখ্যা	
		১৯৮০ সালের অবস্থা	১৯৮৫ লক্ষ্যমাত্রা	১৯৮০ সালের অবস্থা	১৯৮৫ লক্ষ্যমাত্রা
১	মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল ..	৮	৮	৫৩৫৩	৫৭৫৩
২	ডেন্টাল কলেজ	১	১	২০	২০
৩	সদর হাসপাতাল	১২	১৩	১১২৪	১১২৪
৪	মহকুমা হাসপাতাল	৩৫	৪৫	২০৯০	৩৬৫০
৫	শহীদ সরোওয়ার্দী হাসপাতাল ..	১	১	৭৫	৭৫
৬	পোষ্ট গ্রাজুয়েট প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য বিশেষ হাসপাতাল				
	(১) আইপিজি এম এ্যান্ড আর ..	১	১	২৫০	৫০০
	(২) আই ডিসি এইচ	১	১	৫০০	৫০০
	(৩) নিপসম	১	১	..	..
	(৪) ইন্সটিটিউট অব অপথালমোলজী ..	১	১	৩০	১০০
	(৫) হৃদ রোগ ইন্সটিটিউট ..	১	১	১০০	১০০
	(৬) ইন্সটিটিউট অব ক্যান্সার ..	..	১	..	১০০

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের শ্রেণী	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		শয্যা সংখ্যা	
		১৯৮০ সালের অবস্থা	১৯৮৫ লক্ষ্যমাত্রা	১৯৮০ সালের অবস্থা	১৯৮৫ লক্ষ্যমাত্রা
	(৭) যক্ষ্মা	৪+৮ (পৃথকীকরণ)	৪+৮ (পৃথকীকরণ)	৫৬৬	৫৬৬
	(৮) কুষ্ঠ	৩	৩	১৩০	১৩০
	(৯) শিশু	১	১	৩০০	৩০০
	(১০) অর্থোপেডিক	১	১	৩২৫	৩২৫
	(১১) মানসিক	১	১	৪০০	৪০০
	(১২) সংক্রামক ব্যাধি	৫	৫	১৮০	১৮০
	(১৩) যক্ষ্মা ক্লিনিক	৪৪	৪৪	..	..
	(১৪) হোমিও প্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থা	..	১	..	১০০
	(১৫) দেশজ চিকিৎসা পদ্ধতি ..	১	১	..	১০০
	(১৬) জখম	১	১	১০০	১০০
৭	কলেজ অব নার্সিং	১	১	..	..
৮	সেবিকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১৩	৩৩	..	..
৯	জুনিয়র নার্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ..	..	৪০	..	..
১০	মেডিক্যাল এসিষ্ট্যান্ট প্রশিক্ষণ স্কুল ..	৮	৮	..	..
১১	প্যারামেডিক্যাল ইন্সটিটিউট ..	২	২	..	..
১২	গ্রাম্য স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	২৯০	৩৫৬	৩,৮০০	১১,১৩৪
১৩	শিল্প শ্রমিক হাসপাতাল	২	..	..	১২৫
১৪	ঔষধ উৎপাদন ইউনিট	১	২	..	..
১৫	জেলা রিজার্ভ ষ্টোর	৩	২০	..	..
১৬	স্বাস্থ্য পরীক্ষাগার/গবেষণাগার ..	২	৬৩	..	..
১৭	ইলেকট্রো মেডিক্যাল সরঞ্জাম মেরামত কারখানা	..	১	..	..
১৮	যানবাহন মেরামত কারখানা ..	১	১	..	..
	মোট	..	..	১৫,৩৪৩	২৫,৩৮২

সারণী ১৬.৪

জনশক্তি উন্নয়ন : প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার প্রান্তিক বছরের অবস্থাএবং দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার প্রান্তিক বছরের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য মাত্রা:

ক্রমিক নং	শ্রেণী	আসল অবস্থা			১৯৮৪/৮৫ সালের লক্ষ্যমাত্রা
		১৯৭২/৭৩	১৯৭৭/৭৮	১৯৭৯/৮০	
১	গ্রাজুয়েট ডাক্তার	৭,০০০	৯,৬০০	১১,০০০	১৭,০০০
২	পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডাক্তার	২৫৯	৫৬০	৬৩১	১,৭০৫
৩	দাঁতের গ্রাজুয়েট ডাক্তার	৩১০	৪০৭	৪৫৭	৫৮২
৪	বেসিক নার্স	৭০০	১,৮০০	১,৫০০	৩,৭৮৪
৫	পোষ্ট বেসিক নার্স	..	১৯০	২৮০	৫৪০
৬	জনস্বাস্থ্য নার্স	..	..	..	১০০
৭	জুনিয়র নার্স	..	..	..	১,২৪০
৮	নার্সিং এ্যাটেন্ডেন্ট	১,২০০	১,২০০	১,২০০	১,২০০
৯	মেডিক্যাল এ্যাসিসটেন্ট	..	১৯২	৪৫০	৩,২৪০
১০	চিকিৎসা প্রযুক্তিবিদ (পরীক্ষাগার) ..	..	..	..	৪০
১১	চিকিৎসা প্রযুক্তিবিদ (সাজ সরঞ্জাম) ..	..	..	..	৪০
১২	পেশাগত রোগের ফিজিওথেরাপিষ্ট ..	..	..	..	৪০
১৩	সেনিটারী ইন্সপেক্টর	৯৮০	১,১২৫	১,২১০	১,৬০০
১৪	স্বাস্থ্য পরিদর্শক ..	..	১,১৯২	১,১৯২	১,১৯২
১৫	সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক ..	..	৩,৪৭৫	৩,৪৭৫	৩,৪৭৫
১৬	ফার্মাসিষ্ট/কম্পাউন্ডার	১,৫০০	২,০৫০	২,৩০০	৬,৮০০
১৭	পরীক্ষাগার টেকনিশিয়ান	২৭০	৬৩০	৭৪০	১,৬৩০
১৮	রেডিও গ্রাফার/এক্সরে টেকনিশিয়ান ..	১৩০	১৬০	১৯০	৫৫৫
১৯	রেডিও থেরাপি টেকনিশিয়ান ..	১০	৬৮	৬৮	১২৮
২০	ফিজিওথেরাপি টেকনিশিয়ান ..	২০	৭০	৪৫	১০০
২১	ব্লাড ব্যাংক টেকনিশিয়ান ..	২০	৩৮	৪০	৩০০
২২	দাঁতের টেকনিশিয়ান	২০	৫৮	৮০	৫০০
২৩	বহু উদ্দেশ্য সাধক স্বাস্থ্যকর্মী ..	..	১,১০০	১৩,৫০০	১৩,৫০০
২৪	পল্লী চিকিৎসক	..	..	৫,৫৭৬	৬৫,০০০

প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রদান ব্যবস্থা

১৬.৪৫ বিভিন্ন স্তরের সার্ভিস সম্বলিত স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থাকে মোটামুটি (১) প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, (২) মাধ্যমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, (৩) তৃতীয় স্তর স্বাস্থ্য পরিচর্যা, এবং (৪) অতি বিশেষ স্বাস্থ্য পরিচর্যা এভাবে শ্রেণী বিন্যস্ত করা যেতে পারে :

(ক) প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থার কেন্দ্র বিন্দু। এতে সাধারণ রোগব্যাধি ছোট-খাট অস্ত্রোপচার ও সেই সঙ্গে গ্রাম থেকে থানা পর্যায় অবধি প্রতিরোধক ও উন্নয়নমূলক স্বাস্থ্য পরিচর্যা অন্তর্ভুক্ত।

(খ) মহকুমা ও জেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থার যথাক্রমে ৫০ ও ১০০ শয্যার হাসপাতাল এবং সেইসঙ্গে ঔষধপত্র অস্ত্রোপচার, স্ত্রীরোগচিকিৎসা, ক্লিনিক্যাল প্যাথলজি, রক্ত পরিসঞ্চালন, ও জনস্বাস্থ্য পরীক্ষাগার সুবিধের মত বেশ কয়েকটি সুবিধে দেওয়া হবে এবং থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের রেফারেল প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করবে।

(গ) আঞ্চলিক পর্যায়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও জাতীয় স্তরে পোষ্ট গ্রাজুয়েট মেডিসিন ইন্সটিটিউটে তৃতীয় স্তরের স্বাস্থ্য পরিচর্যা সুবিধে পাওয়া যাবে। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে জটিল ও কঠিন রোগব্যাধির চিকিৎসা ও বড় আকারের গবেষণা সুবিধে পাওয়া যাবে। এই হাসপাতালগুলি জেলা ও মহকুমা হাসপাতালগুলির পরবর্তী চিকিৎসামূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করবে।

(ঘ) মেডিক্যাল কলেজগুলি সংলগ্ন হাসপাতাল, ডেন্টাল কলেজ ও ইন্সটিটিউট অব পোষ্ট মেডিসিনে যে সব জায়গায় ইতিমধ্যেই কার্ডিওলজি, নেফরোলজি, নিউরোসার্জারী, কার্ডিয়াক সার্জারী, চক্ষু-রোগতত্ত্ব, দন্তরোগতত্ত্ব, ইত্যাদির বিশেষ ইউনিট আছে, না হয় আগামীতে উন্নীত হবে সেখানে অতি বিশেষ পর্যায়ের স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থার সুবিধে পাওয়া যাবে। এছাড়া, চক্ষুরোগতত্ত্ব বক্ষব্যাধি ইত্যাদির জন্যে স্নাতকোত্তর ইন্সটিটিউট এবং মানসিক,যক্ষ্মা, বহুমূত্র, অর্থোপেডিক্স ও ক্যান্সার হাসপাতালের মত আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানেও এ ধরনের চিকিৎসা সুবিধে পাওয়া যাবে। এই ইন্সটিটিউট গুলি মেডিক্যাল কলেজ ও অন্যান্য হাসপাতালগুলির পরবর্তীস্তরের চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করবে।

১৬.৪৬ একটা আঞ্চলিকীকৃত স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র হিসাবে গোটা স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থাকে গড়ে তোলা হবে এবং প্রত্যেক অঞ্চলে এই ব্যবস্থার শীর্ষে থাকবে একটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। এই কেন্দ্রে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও তৃতীয় স্তরের চিকিৎসার ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে এবং আঞ্চলিকীকৃত স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্রের অনুরূপ সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হবে। এই অঞ্চলগুলি আবার জাতীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থার উপরও কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন হৃদ রক্তবাহ রোগ ও চক্ষুরোগ চিকিৎসার জন্য ঢাকা, মানসিক রোগের জন্য পাবনা এবং যক্ষ্মা রোগের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীর যক্ষ্মা হাসপাতাল-গুলোর মত অঞ্চলগুলির উপর নির্ভরশীল হবে। এই অঞ্চল পদ্ধতিতে মহকুমা ও জেলা হাসপাতালগুলোর খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। এ গুলো দূরবর্তী মহকুমা ও সদর এলাকার থানা স্বাস্থ্য কম-প্লেক্সকে রেফারাল সার্ভিস দিতে হবে। তাদের নানা প্রয়োজনীয় উপকরণ যোগান দিতে হবে এবং মাধ্যমিক স্বাস্থ্য, জনশক্তির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। অতীতে আরও বেশী শয্যা, জনশক্তি ও বিশেষ ব্যবস্থা প্রদান করে জেলা হাসপাতালগুলো গড়ে তোলা হয়েছে এবং এক্ষণে প্রস্তাবিত মেডিক্যাল কলেজগুলো জেলা সদর দপ্তর স্থাপিত হচ্ছে—এই পরিপ্রেক্ষিতে মহকুমা হাসপাতালগুলোকে থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং সদর এলাকার বহুলোকের প্রয়োজন মেটাতে হবে তাই মহকুমা হাসপাতাল গুলোকে জেলা হাসপাতালগুলোর সমান পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে।

১৬.৪৭ স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রতিষ্ঠানে পরবর্তী চিকিৎসা তথা রেফারাল পদ্ধতির সংজ্ঞা যেমন সুনির্দিষ্ট নয় তেমনি অতীতে ঐসব প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে যথাযথভাবে কাজও করেনি। প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রদান ব্যবস্থায় রেফারাল পদ্ধতি লক্ষ লক্ষ গ্রামের মানুষকে উৎকর্ষ সম্পন্ন চিকিৎসা সুবিধে দিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। নিম্নোক্ত ব্যবস্থাবলীর মাধ্যমে সর্তকতার সাথে রেফারেল পদ্ধতি কার্যকর করতে হবে :

(ক) বিশেষ জাতীয় ইন্সটিটিউট ও আঞ্চলিক মেডিক্যাল কলেজগুলির সংগে মহকুমা/জেলা হাসপাতাল গুলোর একটা সুষ্ঠ সংযোগ থাকতে হবে যাতে করে পল্লী এলাকার সাধারণ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চিকিৎসাপ্রাপ্ত গ্রামের রোগীদের যথাযথ পরিচর্যা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বিধান করা যায়।

(খ) মহকুমা/জেলা হাসপাতালগুলো পল্লী এলাকার যেসব রোগীকে পরবর্তী চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল কলেজ ও বিশেষ ইন্সটিটিউটগুলোতে পাঠায় ঐ সব রোগীকে ভর্তির ব্যাপারে শেষোক্ত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলোর সরাসরি নিজ নিজ এলাকার রোগীদের চেয়ে অবশ্যই অগ্রাধিকার পাবে।

(গ) এই ব্যবস্থাটি হবে এক দ্বিমুখী প্রক্রিয়া বিশেষ। এর অধিনে পল্লী অঞ্চলের রোগীদের উচ্চতর চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হবে, আবার একই সংগে নিয়মিত ভাবে মেডিক্যাল কলেজগুলো থেকে না হলেও মহকুমা/জেলা হাসপাতাল গুলো থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল সরেজমিনে উন্নত চিকিৎসা সুবিধে ইত্যাদি দেয়ার জন্য নিয়মিত ভাবে থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে যাবেন।

১৬.৪৮ পরীক্ষাগারের সুযোগ-সুবিধে, ঔষধ সরবরাহ ও প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে প্রচলিত উপ-পদ্ধতি একদিকে যেমন পর্যাপ্ত নয় তেমনি আবার স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রদান পদ্ধতির সংগে সমন্বিত নয়, এই উপ-পদ্ধতিকে শক্তিশালী করা হইবে। থানাসহ সকল স্তরে উপযুক্ত পরীক্ষাগার সুবিধে ও জেলা পর্যায়ে সরবরাহের জন্য সংরক্ষিত ষ্টোর প্রতিষ্ঠা করা হবে। মহকুমা হাসপাতালগুলিতে মেডিক্যাল এসিস্টান্ট ও সিনিয়ার নার্সদের প্রশিক্ষণ এবং থানা পর্যায়ে জুনিয়র নার্স ও পল্লী চিকিৎসক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

১৬.৪৯ স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিতরণ পদ্ধতির পরিচালনার অধিকতর উন্নতির বিধানের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীসূচীর আওতায় এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাও করা হয়েছে:

(ক) জনশক্তি উন্নয়নের জন্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম,

(খ) স্বাস্থ্য জনশক্তির সকল পর্যায়ে শিরবচিছন্ন শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা,

(গ) জরুরী ঔষধপত্র ও টীকার বার্ষিক উৎপাদন সরবরাহ,

(ঘ) চিকিৎসা পদ্ধতি, সরঞ্জাম ব্যবহার ও ঔষধপত্র উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সংহতি রেখে উপযুক্ত প্রযুক্তি কৌশলের উন্নয়ন,

(ঙ) উন্নত চিকিৎসা ও সার্ভিসের প্রেক্ষাপটে চিকিৎসার দায়দায়িত্ব নির্ধারণের জন্য একটা কার্যকর পদ্ধতি নিশ্চিত করার জন্য একটি মেডিক্যাল অডিট টিম গঠন এবং চিকিৎসা প্রার্থীদের অভিযোগ পদ্ধতি সুষ্ঠু ও কার্যকর করে তোলা।

(চ) পদোন্নতি, অধিকতর শিক্ষা ও বিদেশে নিয়োগ প্রভৃতির মধ্যে যথাযথ সংযোগ সাধনের মাধ্যমে পল্লী এলাকায় তাদের ন্যূনতম সময় নিযুক্ত রাখার ব্যবস্থা করে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান সমূহে ডাক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, এবং

(ছ) উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং পদ সংরক্ষণ করার ব্যবস্থাদির মাধ্যমে নিম্ন শ্রেণীর স্বাস্থ্য কর্মীদের পেশাগত পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি।

১৬.৫০ এ কথা জোর দিয়ে বলা হয়ে থাকে যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা যে কোন জাতির আর্ত সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংগ। তাই একটা পদ্ধতির ব্যাপক পরিধির মধ্যে জাতীয় মাধ্যমিক ও সমষ্টিগত অথবা স্থানীয় স্তরে স্বাস্থ্য তৎপরতার সংগে শিক্ষা, কৃষি, পশুপালন, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, গৃহসংস্থান, গণপূর্ত, যোগাযোগ ও শিক্ষাসহ অন্যান্য আর্থ-সামাজিক খাতের কার্যকলাপের অবশ্যই সমন্বয় থাকতে হবে।

১৬.৫১ জনসাধারণকে সংগঠিত করা এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা কার্যক্রম গুলোর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন এবং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনায় জনগণের সক্রিয় অংশ গ্রহণ, বিশেষ করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, এই ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলের ব্যক্তিবর্গ, পরিবার ও কমিউনিটির স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধা করে। নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদির মাধ্যমে সমাজের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা যাবে :

(ক) স্থানীয় প্রকল্প কমিটিসমূহের মাধ্যমে পল্লী এলাকার প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন;

(খ) পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন ও পরিচালনার জন্য নগদ অর্থ ও বিভিন্ন উপকরণ গ্রহণের মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহ;

(গ) সকল স্থিতিশীল স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতিষ্ঠা এবং এই কমিটিগুলোর হাতে প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্য পদ্ধতি তত্ত্বাবধানের উপযোগী যথেষ্ট ক্ষমতা থাকিবে;

(ঘ) পল্লী চিকিৎসকের যথাযথ কর্মতৎপরতার জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থনমূলক সহায়তা দেওয়া;

(ঙ) নিজ নিজ সামাজিক চৌহদ্দির মধ্যে কাজ করার জন্য, স্বেচ্ছা সেবী স্বাস্থ্যকর্মী গড়ে তোলা; এবং

(চ) ব্যক্তি ও সমাজ কে মৌলিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত শিক্ষাদান করা।

১৬.৫২ দক্ষ ও কার্যকর স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রদানের জন্য স্বাস্থ্য প্রশাসনের বর্তমান কাঠামো ও ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি পর্যাপ্ত নয়। এই কাঠামোর পুনর্গঠন ও যথোপযুক্ত শক্তিশালী করে তোলা একান্ত জরুরী। এই পুনর্গঠনের সংগে, আর্থিক, প্রশাসনিক সার্ভিস প্রদান কর্তৃত্ব বিভিন্ন কর্মস্তরে ন্যস্ত করতে হবে। স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে একটা নূতন হিসাব পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে যাতে গ্রাহকদের দায়দায়িত্ব নির্ধারণের লক্ষ্যে সহজেই বিভিন্ন সার্ভিসের ইউনিট মূল্য নিরূপন সম্ভব হয়।

১৬.৫৩ আমাদের মত গরীব দেশে গোটা জনসংখ্যার জন্য একটা পূর্ণাঙ্গ আকারের স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থা গড়ে তোলার মত পর্যাপ্ত সম্পদ যোগাড় প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। সম্পদের ঘাটতির কারণেই স্বাস্থ্য পরিচর্যা সুবিধে মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ২৫ ভাগেই সীমিত আছে এবং ঔষুধপত্রের নিদারুন ঘাটতির কারণে সার্ভিসের মান ক্ষুন্ন হচ্ছে। এই ব্যবস্থায় একটা স্ববৈপরিত্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তা হল স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রাথ সমুদয় সেবাই বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে। অন্যদিকে, ওষুধপত্রের যে সীমিত সরবরাহের ব্যবস্থা আছে (দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় ১৫ কোটি টাকার ঔষধপত্রের ব্যবস্থা আছে যা মোট চাহিদার মাত্র এক চতুর্থাংশ) সেগুলির সুবিধে যাতে একান্তভাবেই যাদের প্রাপ্য তারা পায় তার জন্য বলতে গেলে কোন ব্যবস্থাই নেই। এজন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদির প্রস্তাব করা হয়েছে :

(ক) প্রতিরোধক ও উন্নয়নমূলক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থার জন্য পুরাপুরিভাবেই সরকারী অর্থ সংস্থান অব্যাহত রাখতে হবে,

(খ) থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ছাড়া অন্যান্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যের শয্যা সংখ্যা কমাতে হবে,

(গ) প্রাপ্ত ঔষধপত্র এবং এক্সরে ফিল্মসহ অন্যান্য ব্যবহারযোগ্য উপকরণসমূহ কেবলমাত্র একান্ত গরীব শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বিনা মূল্যে দিতে হইবে, এবং

(ঘ) হাসপাতাল ও ক্লিনিক গুলিতে বহিঃবিভাগ রোগীদের টিকিটে মাসুল ধার্য করতে হবে এবং এর থেকে প্রাপ্ত অর্থ স্থানীয়ভাবে সদ্ব্যবহার করতে হবে।

উপসংহার

১৬.৫৪ উল্লেখিত রূপরেখা অনুসারে কার্যকরভাবে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা হলে আশা করা যায় যে মৃত্যু ও পঙ্গুত্বের হার অনেক কমে যাবে, মৃত্যু হার প্রতি হাজার লোকে ১৬.৭৫ থেকে ১৩.৭৮, শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজার জীবন্ত ভূমিষ্ঠ শিশুর ক্ষেত্রে ১৪০ থেকে ১০০-তে, মৃত্যুর হার জীবন্ত বাচ্চা প্রসবের ক্ষেত্রে প্রতি হাজারে ৭ থেকে ৪-এ কমে যাবে এবং গড় আয়ুকাল ৪৮·১ বছর থেকে ৫২ বছরে বাড়বে।

সপ্তদশ অধ্যায়

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা

১৭.১ গত দুই দশকে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করেছে। ১৯৫১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ৪.২১ কোটি, যা পরবর্তী ২৭ বছরে দ্বিগুণ হয়ে গেছে। ১৯৮০-তে প্রাপ্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার শতকরা ২.৭ ভাগ অব্যাহত থাকলে চলতি শতকের শেষ নাগাদ বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৫.০০ কোটিতে গিয়ে উপনীত হবে। জনসংখ্যার এই অভূতপূর্ব বৃদ্ধি নানা রকমের সংকট সৃষ্টি করবে। প্রথমতঃ প্রতি বর্গমাইলে ১৬৭৫ জনের লোক-বসতি দ্বিগুণ হয়ে জনসংখ্যা ও জমির বর্তমানের ০.৩৮ একরের অনুপাত যা পৃথিবীর অন্যতম সর্বনিম্ন, আরো সংকীর্ণ করে তুলবে। দ্বিতীয়তঃ বিদ্যমান জনসংখ্যার প্রতিকূল বয়স-কাঠামো একদিকে বর্তমানের জন্য নির্ভরশীলতার বোঝা বাড়িয়ে দিয়েছে এবং অপরদিকে ভবিষ্যতের জন্য ব্যাপক জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। তৃতীয়তঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হারের ফলে পরিকল্পনাকালে অধিক খাদ্য-উৎপাদনের জন্য বিপুল অর্থ নিয়োগ করে যেটুকু সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা, তার অনেকটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। চতুর্থঃ বর্তমানে বিদ্যালয় গমন-বয়সী শিশুর সংখ্যা হচ্ছে ২.৩৭ কোটি। সন্তান প্রজননের অপরিবর্তিত হারে এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ বিদ্যালয় গমন-বয়সী শিশুর সংখ্যা বর্তমান সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাবে। শিক্ষার বর্তমান হার অক্ষুন্ন রাখতে হলেও শিক্ষার বিদ্যমান সুযোগগুলোকে দ্বিগুণ করতে হবে। পঞ্চমতঃ বর্তমানের শিশুরা ভবিষ্যতের বছরগুলোতে যখন শ্রমশক্তিতে যোগ দেবে তখন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা সত্ত্বেও বেকারত্ব ও আধা-বেকারত্বের বর্তমান স্তর (শতকরা ৩০ ভাগ) আরো মন্দ অবস্থায় পতিত হবে এবং ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীল জনসংখ্যার সামাজিক সাধারণ ব্যয় মেটাতে গিয়ে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের জন্য উদ্বৃত্ত খুব সামান্যই থাকবে। সবশেষে, এমনি সর্বসাকুল্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে এবং গ্রাম থেকে শহরে বসতি পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান হারের ফলশ্রুতিতে ১৯৮০ সালে শহরবাসী জনসংখ্যার বর্তমান আয়তন ৮৭.২ লক্ষকে (মোট জনসংখ্যার ১০% ভাগ) থেকে বেড়ে ২০০০ সালে ৩১৭.৪ লক্ষে (মোট জনসংখ্যার ২৭.৬% ভাগ) উপনীত হবে এবং তাতে শহরের গৃহায়ন, যানবাহন, চাকুরী, শিক্ষা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিদ্যমান সমস্যাগুলো আরো প্রকট আকার ধারণ করবে।

জনসংখ্যার সম্ভাব্য ভবিষ্যত চিত্র

১৭.২ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে জনসংখ্যা সমস্যায় হস্তক্ষেপের জন্য প্রজনন হ্রাসের তিনটি বিকল্প—মাঝারী, ব্যাপক ও আমূল—ব্যবস্থা বিবেচনা করা হয়েছে। মাঝারী ব্যবস্থায় ২০০০ সালের পর, ব্যাপক ব্যবস্থায় ২০০০ সালের মধ্যে এবং আমূল ব্যবস্থায় ১৯৯০ সাল নাগাদ এন আর আর (NRR)১-এ উপনীত হওয়া সম্ভব হবে। এই তিন ব্যবস্থায় ২০০০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জনসংখ্যা যথাক্রমে ১৩.২ কোটি, ১২.৭ কোটি ও ১১.৫ কোটিতে পৌঁছাবে। এ অবস্থায় ১৯৯০ সালে এন আর আর (NRR) -১-এ উপনীত হওয়ার লক্ষ্যই হবে একমাত্র অর্থপূর্ণ জাতীয় নীতি। আমাদের ক্ষেত্রে কতকগুলো বিশেষ পরিস্থিতি একটি ব্যাপক ও সফল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এগুলো হচ্ছে:

(১) শক্তিশালী রাজনৈতিক সমর্থন এবং জাতীয় এক নম্বর সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যাবলীর জন্য সরকারের প্রয়োজনীয় আর্থিক দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি;

(২) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে ও জনসাধারণকে একটি আন্দোলনের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যাবলীতে জড়িত করার নীতি;

(৩) দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন ও ছোট পরিবারকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণে জনগণের প্রস্তুতি, যার সাক্ষ্য বহন করে পরিবার পরিকল্পনা উপকরণ সরবরাহের শতকরা ৩০ থেকে ৩৫ ভাগ অপূর্ণ চাহিদা; এবং

(৪) কৃষি-উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও শিক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা ও মাতৃমঙ্গলের সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পল্লী-উন্নয়নের প্রতি সরকারের ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ।

জনসংখ্যা নীতির দৃষ্টিভংগী

১৭.৩ সরকার ১৯৭৬ সালের জুন মাসে একটি ব্যাপক-ভিত্তিক জনসংখ্যা নীতি গ্রহণ করেন এবং তাতে উন্নয়ন কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। প্রধানতঃ তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে এবং পরিবার পরিকল্পনামূলক সেবা বিতরণের দ্বারা জনসংখ্যার গতি প্রভাবিত করার জন্য এতে বিশেষ নির্দেশ প্রদান করা হয়। তাছাড়া এই নীতিতে কর্ম-সংস্থান, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন, মা ও শিশুর মৃত্যু-হার হ্রাস, শ্রমশক্তিতে মহিলাদের অংশ গ্রহণ ইত্যাদিকে প্রজনন হ্রাসের অনুকূলে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

১৭.৪ জনসাধারণের মধ্যে ছোট পরিবার গড়ে তোলার মনোভাব সৃষ্টির উপযোগী আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিকাশের জন্য নিম্নোক্ত সহায়ক ও সুবিধা বৃদ্ধিমূলক ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করতে হবে:

(১) বিলম্বে বিবাহ, বিরতি দিয়ে ও পরিকল্পনা করে সন্তান উৎপাদন, ছোট পরিবার গঠন এবং জননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদির অনুকূলে সামাজিকভাবে জনগণকে আন্দোলনভুক্তকরণ;

(২) উপযুক্ত শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে মেয়েদের আর্থ-সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি;

(৩) ছোট পরিবার গঠনের অনুকূল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং উৎসাহ ও নিরুৎসাহ প্রদানের একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা;

(৪) স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কর্মসূচীর উন্নয়ন সাধন এবং শিশু ও মায়ের মৃত্যু হার হ্রাসকরণ;

(৫) মৌলিক শিক্ষা ও সাক্ষরতার প্রতি জোর দিয়ে দেশের শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন;

(৬) দেশীয় চিকিৎসক ও ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে নিয়োজিত বেসরকারী চিকিৎসক ও চিকিৎসাকার্যে সহায়ক শ্রেণীকে (প্যারামেডিক), মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ এবং পরিবার পরিকল্পনার কাজে ব্যবহার;

(৭) জাতীয় কর্মসূচীর সম্পূরক ভূমিকা পালনে স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহ প্রদান: এবং

(৮) জাতির এক নম্বর এই সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় সরকারের সমস্ত প্রশাসন যন্ত্রের সমর্থন অর্জন।

অগ্রগতির পর্যালোচনা

১৭.৫ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সারা দেশের জন্য (১৯৭৩—৭৮) আনুমানিক ৭০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ের একটি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। পরে হার্ড কোর (Hard Core) পরিকল্পনা (১৯৭৫—৭৮) তৈরীর সময় ব্যয়ের এই আনুমানিক পরিমাণ সংশোধন করে ৯০.০০ কোটি টাকা ধার্য করা হয়। দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৮—৮০) এই কর্মসূচীর জন্য ১০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ

করা হয়। এই দুইটি পরিকল্পনাকালে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর জন্য অর্থবরাদ্দ ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নের সারণীতে দেখান হয়েছে।

সারণী ১৭.১

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা খাতে বার্ষিক অর্থ বরাদ্দ ও সদ্ব্যবহারের পরিমাণ (১৯৭৩—৮০)

(লক্ষ টাকায়)

বছর	বরাদ্দ	ব্যয়	শতকরা হার
১৯৭৩-৭৪	৭০০.০০	৪০০.০০	৫৭.১
১৯৭৪-৭৫	৭৭৪.০০	৬১৬.০০	৭৯.৬
১৯৭৫-৭৬	১,৯৫৯.০০	১,৬২৩.৮২	৮২.৯
১৯৭৬-৭৭	২,১৬৪.০০	১,৯৩৮.৪৩	৮৯.৭
১৯৭৭-৭৮	৩,১২৮.০০	২,৬৪৬.৫৩	৮৪.৬
১৯৭৮-৭৯	৪,৬৭৪.০০	৩,৪১০.৮৬	৭২.৯
১৯৭৯-৮০	৫,৯২৭.০০	৫,০০৯.১৮	৮৪.৫
মোট	১৯,৩২৬.০০	১৫,৬৪৪.৮২	৮০.৯

১৭.৬ ক্রমাগত রাজনৈতিক গোলযোগ, স্বাধীনতা যুদ্ধ ও স্বাধীনতা-উত্তর কালের অনিশ্চিত কর্মসূচীর জন্য ১৯৬৯ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত সময়ে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর বাস্তবায়ন কার্যতঃ স্থগিত ছিল। পরবর্তী দু'বছরে উন্নয়নের পুনর্বিন্যাস পর্যায় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগকে নিয়ে পরিব্যাপ্ত থাকার কারণে এ খাতে তেমন কিছু অগ্রগতি সাধিত হয়নি। ১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যে বেঠো তৎপরতা সম্পন্ন ও দেশব্যাপী একটি জাতীয় কাঠামোসহ স্বতন্ত্র জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ স্থাপিত হয়। ১৯৭৫ সালে বিশ্বব্যাংকের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, জাতিসংঘের জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ও অন্যান্য সাহায্যদাতার কাছ থেকে আর্থিক সমর্থন নিয়ে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর বিকাশ ও বাস্তবায়নের সূচনা হয়।

১৭.৭ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৮ সালের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের ১৯,৪৫১ জন মাঠকর্মী—২,৭২২ পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক, ৪,৩৯২ পরিবার পরিকল্পনা সহকারী এবং ১২,৩৩৭ জন পরিবার কল্যাণ সহকারী নিয়োগ করে তাদের প্রশিক্ষণ দান করে ও বিভিন্ন এলাকায় কাজের জন্য প্রেরণ করে। এই সময় ৯৩টি মাতৃমঙ্গল ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রসহ ৯৫০টি পল্লী ও শহর আরোগ্যনিকেতন (ক্লিনিক) এবং হাসপাতাল থেকে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এবং পরিবার পরিকল্পনামূলক সেবা বিতরণ করা হয়।

১৭.৮ ২৪টি উপ-কেন্দ্রসহ ৮টি থানা মাঠকর্মী প্রশিক্ষণ ইউনিট, ৪টি পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ৪৫০টি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, দু'টি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত দুটি আদর্শ আরোগ্যনিকেতন (ক্লিনিক) এবং ঢাকার অপর একটি আদর্শ আরোগ্যনিকেতন (ক্লিনিক) নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

১৭.৯ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সহায়ক কর্মপন্থা হিসাবে বহুমুখী খাতের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও গ্রহণকারীদের সংগ্রহের জন্য সংগঠন স্থাপন করা হয়েছে। তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় একটি সুসজ্জিত চলচ্চিত্র গবেষণাগার স্থাপন করেছে, জনসংখ্যা বিষয়ক ১৬টি চলচ্চিত্র তৈরী করেছে, ১৬টি চলচ্চিত্র প্রদর্শন (সিনেমা ভ্যান) সংগ্রহ করেছে এবং বাংলাদেশ বেতারে একটি জনসংখ্যা কোষ স্থাপন করেছে। সমাজ কল্যাণ পরিদপ্তর পল্লী এলাকায় ৭৬০টি মাতৃকেন্দ্র স্থাপন করেছে। সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী ৭৪৩টি মহিলা সমবায় সংগঠিত করেছে এবং মহিলা পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউণ্ডেশন ৪০টি মহিলা জীবীকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। পরিবার পরিকল্পনার সেবা ও উপকরণ সরবরাহের জন্য শ্রম পরিদপ্তর ৮টি শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্রকে শক্তিশালী করে তুলেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় জনসংখ্যা বিষয়ক শিক্ষা দানের জন্য উপযুক্ত পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাপকরণ তৈরী করেছে এবং চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ মান পর্যন্ত এই শিক্ষা দান প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজে শিক্ষকদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় জনসংখ্যা বিষয়ক শিক্ষায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

১৭.১০ মাঠকর্মী থেকে উচ্চ পর্যায়ের ব্যাবস্থাপক পর্যন্ত পরিবার পরিকল্পনার সকল শ্রেণীর কর্মকর্তার কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দানের জন্য কর্মসূচী অনুযায়ী জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জাতীয় ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) ৮টি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের ৮টি আদর্শ ক্লিনিক, ১২টি পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও ১৯টি জেলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সংগঠন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১৫,৯৫৮ জন জন্ম-পরিচর্যাকারীকে (TBA) তালিকাভুক্ত করা হয়েছে ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তদুপরি ২৪১ জন লাডার, ৪৫০ জন চিকিৎসা সহকারী ও ৫,০০০ পল্লী চিকিৎসককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

১৭.১১ জনসংখ্যা সমীক্ষা কেন্দ্র, পরিকল্পনা কমিশনের জনসংখ্যা শাখার বহিঃমূল্যায়ন ইউনিট, নিপোর্ট (বাংলাদেশ ফার্টিলিটি রিসার্চ প্রোগ্রামসহ), জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের ব্যবস্থাপনা তথ্য ইউনিট (Management Information System), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসা প্রশাসন ইনস্টিটিউটের জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা গবেষণা কেন্দ্র এই পাঁচটি প্রধান সংগঠন স্থাপন করা হয়েছে এবং এগুলোতে জনসংখ্যা বিষয়ক গবেষণা ও মূল্যায়নের কাজ অব্যাহত রয়েছে। পরিসংখ্যান গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ISRT) এবং উদরাময় রোগ গবেষণার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র (ICDDR) প্রভৃতিতেও জনসংখ্যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা হয়েছে। "বাংলাদেশ প্রজনন-ক্ষমতা জরিপ" এবং "বাংলাদেশে বংশবৃদ্ধিজনিত আচরণ নির্ণায়ক সমীক্ষা" শীর্ষক দুইটি বড় আকারের জনসংখ্যা বিষয়ক জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন খাতের জনসংখ্যা কার্যক্রমগুলো নিজেদের আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে।

১৭.১২ জনসংখ্যা পরিকল্পনার কর্মসূচীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণার্থে জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগের একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। সংসদের সকল মহিলা সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদেরও ২৫,০০০ চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্য এবং স্বনির্ভর কর্মীদের পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে পরিচিতিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

১৭.১৩ জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীগুলোর প্রতি যথেষ্ট রাজনৈতিক সমর্থন আদায় করতে সাফল্য লাভ করেছে।

১৭·১৪ নেতৃস্থানীয় বর্ষীয় সংগঠন, যুব সংগঠন, মহিলা সংগঠন, স্বনির্ভর আন্দোলন, স্থানীয় গণবাধ এবং বেশ কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান পরিবার পরিকল্পনা আন্দোলনের কার্যাবলীর প্রতি সমর্থন দান করেছে।

১৭·১৫ গত কয়েক বছরে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতির অগ্রগতির ধারায় কাঠামোগত পরিবর্তন সারনী ১৭·২-এ দেখা যেতে পারে।

সারণী ১৭.২

১৯৭৩-৭৪ ও ১৯৭৯-৮০ সালে গর্ভনিরোধের পদ্ধতিগত সাফল্য

(শতকরা হিসাব)

পদ্ধতি	১৯৭৩-৭৪	১৯৭৯-৮০
জরায়ুতে স্থাপন পদ্ধতি (আই ইউ ডি)	২৬·৫	৬·০
বন্ধ্যাকরণ	১৪·০	১৯·০
খাবার বড়ি	২৩·৫	৪০·০
কনডম	৩৪·৫	৩৪·০
অন্যান্য পদ্ধতি	১·৫	১·০
মোট ..	১০০.০	১০০.০

দুইটি জরিপের ফলাফল ১৯৭৫ ও ১৯৭৯ সালে জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতির প্রকৃত ব্যবহারের প্রবণতা নির্দেশ করে।

সারণী ১৭·২ (ক)

১৯৭৫ ও ১৯৭৯ সালে গর্ভনিরোধের পদ্ধতিগত ব্যবহার

(শতকরা হিসাব)

পদ্ধতি	১৯৭৫	১৯৭৯
জরায়ুতে স্থাপন পদ্ধতি (আই ইউ ডি)	৬.৩	২·০
বন্ধ্যাকরণ	১০·৫	২৪.২
খাবার বড়ি	৩৫·৮	৩৫·৩
কনডম	৯·৬	১০·৪
অন্যান্য পদ্ধতি	৩৭·৮	২৮·২
মোট ..	১০০·০	১০০·০

১৭.১৬ সক্ষম দম্পতিদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণকারীর সংখ্যা যদিও ১৯৭৫ সালের শতকরা ৯.৬ ভাগ থেকে ১৯৭৯-৮০ সালে প্রায় শতকরা ১৪ ভাগে উন্নীত হয়েছে, তথাপি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় এই সংখ্যাকে শতকরা ২২ ভাগে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নিম্নোক্ত সীমাবদ্ধতার জন্য অর্জিত হতে পারেনি :

(১) স্বাস্থ্য কর্মী ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের বিশেষ করে নিম্ন পর্যায়ের কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতার অভাব,

(২) মাঠ কর্মীদের প্রশিক্ষণের অপর্যাপ্ততা এবং কার্যক্রমের দায়িত্ব পালনরত বিভিন্ন স্তরে উপযুক্ত প্রতিবেদন প্রেরণ, তদারকী ও তত্ত্বাবধানের অভাব ;

(৩) গোষ্ঠী-সামাজিক সমর্থনের অভাব ;

(৪) বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে গঠিত সমন্বয় কমিটিগুলোর অকার্যকর ভূমিকা পালন ; এবং

(৫) নিম্ন পর্যায়ে কর্মী-জনসংখ্যা অনুপাত এবং গ্রাম পর্যায়ে পুরুষ কর্মীর অনুপস্থিতি।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য

১৭.১৭ জনসংখ্যা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রজনন ক্ষমতা আমূলভাবে হ্রাস করে ১৯৯০ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বিষয়ক লক্ষ্য হিসাবে নীট জন্মহার (এন আর আর)-১ অর্জন করা, ২০০০ সাল নাগাদ লোকসংখ্যায় আরতন ১১.৫ কোটিতে সীমাবদ্ধ রাখা এবং চূড়ান্তভাবে একবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জনসংখ্যা ১৭.৫ কোটিতে স্থিতিশীল রাখা। এই দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য সামনে রেখে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে জনসংখ্যা বিষয়ক লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে তা হচ্ছে, ১৯৮৫ সাল নাগাদ বর্তমান সার্বিক প্রজননহার (Total fertility rate)-কে ৫.৮৫ থেকে ৪.১০-এ হ্রাস করা এবং ঐ সময়ের মধ্যে স্থূল জন্ম-হার (Crude birth rate) প্রতি হাজারে ৪৩.২৫ থেকে ৩১.৫৬-এ নামিয়ে আনা।

১৭.১৮ উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির নিয়মিত ব্যবহারকারী সক্ষম দম্পতির সংখ্যা শতকরা ১৪ ভাগ থেকে বৃদ্ধি করে ৩৭.৫ ভাগে উন্নীত করতে হবে। সংখ্যা-ভিত্তিক হিসাবে ১৯৮৫ সালের মধ্যে নিয়মিত পরিবার পরিকল্পনা ব্যবহার কারীদের বর্তমান সংখ্যাকে ২৩ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৭১ লক্ষে উন্নীত করতে হবে।

১৭.১৯ গর্ভ-নিরোধ পদ্ধতি ব্যবহারের আনুপাতিক হার : নানা ধরণের গর্ভ-নিরোধ পদ্ধতির মধ্য থেকে ব্যবহারকারীকে যে কোন একটি পছন্দ করে নেওয়ার সুবিধা দান করা হবে। কর্মসূচীতে বন্ধ্যাকরণের (sterilisation) সুবিধাদি আশানুরূপ সম্প্রসারণের পূর্বাভাস লক্ষ্য করে ক্রমেই বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতির আপেক্ষিক গুরুত্ব বাড়িয়ে দেওয়া হবে। তবে, প্রথম গর্ভাবস্থা বিলম্বিতকরণ ও দুইটি গর্ভাবস্থার মধ্যকার সময় ব্যবধিতকরণের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে, অস্থায়ী পদ্ধতিগুলোর ভূমিকাতেও পর্যাপ্ত গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। তদনুসারে সংশ্লিষ্ট খাতের পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলীর আওতায় গর্ভনিরোধ পদ্ধতি ব্যবহারের নিম্নরূপ অনুপাত নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণী ১৭' ৩

১৯৮০—৮৫ সালে গর্ভ-নিরোধ পদ্ধতি ব্যবহারের আনুপাতিক হার

(শতকরা হিসাবে)

পদ্ধতি	১৯৭৯-৮০ (ভিত্তি বছর)	১৯৮০-৮১	১৯৮১-৮২	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫ (প্রাক্কলিত বছর)
বন্ধ্যাকরণ ..	১৯	২৫	৩০	৩৫	৩৯	৪৩
ধাবার বড়ি ..	৪০	৩৭	৩৪	৩১	২৮	২৫
কনডম ..	২৫	২৪	২৩	২১	২০	১৮
জরায়ুতে স্থাপন পদ্ধতি (আই,ইউ,ডি)	৬	৬	৭	৭	৭	৮
*অন্যান্য গর্ভনিরোধ পদ্ধতি	১০	৮	৬	৬	৬	৬
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

*অন্যান্যের মধ্যে আয়ুল, ছন্দপূর্ণ সম্ভোগ (রিদম), মধ্যচ্ছদা (ডায়াফ্রাম), ঝিল্লি প্রভৃতি গতানুগতিক পদ্ধতি এবং মাসিক প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণ, পিচকিরি দ্বারা প্রবিষ্ট করানো (ইনজেকটেবল্স), ফেনিল রাসায়নিক (ফোম) প্রভৃতি আধুনিক পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত।

১৭' ২০ গর্ভ-নিরোধ পদ্ধতি ব্যবহারের উপরোক্ত আনুপাতিক হার ১৯৮০—৮৫ সালের মধ্যে অর্জন করতে হলে, বাৎসরিক নতুন গ্রহণকারীদের আনুমানিক সংখ্যা (০০০ ভিত্তিতে) ১৭' ৪ সারণীতে প্রদর্শিত অংকের অনুরূপ হতে হবে।

সারণী

১৯৮০—৮৫ সালে নিয়মিত নতুন গরিষার পরিকল্পনা

পদ্ধতি	১৯৮০-৮১			১৯৮১-৮২		
	নিঃ	পুরাঃ	নঃ	নিঃ	পুরাঃ	নঃ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতি	৭৯৭	৪০০	৩৯৭	১২৩৪	৭১৭	৫১৭
খাবার বড়ি পদ্ধতি	১১৮০	৪৬৮	৭১২	১৩৯৮	৫৯০	৮০৮
কনডম পদ্ধতি	৭৬৬	২৯৩	৪৭৩	৯৪৬	৩৮৩	৫৬৩
জরায়ুতে স্থাপন পদ্ধতি (আই ইউ ডি) ..	১৯১	৯৪	৯৭	২৮৮	১২৮	১৬০
অন্যান্য	২৫৫	১১৭	১৩৮	২৪৭	১২৮	১৯৯
মোট	৩১৮৯	১৩৭২	১৮১৭	৪১১৩	১৯৪৬	২১৬৭

বিশেষদ্রষ্টব্য : নি = (মোট) নিয়মিত ব্যবহারকারী, পুরা = পূর্ববর্তী বৎসরগুলির পুরাতন ব্যবহারকারী, নঃ = নতুন
জরায়ুতে স্থাপন পদ্ধতি (আই ইউ ডি)

৯৭.৪

গ্রহণকারীর পদ্ধতি-ওয়ারী সংখ্যা

(০০০ এর অংকে)

১৯৮২-৮৩			১৯৮৩-৮৪			১৯৮৪-৮৫		
নিঃ	পুরাঃ	নঃ	নিঃ	পুরাঃ	নঃ	নিঃ	পুরাঃ	নঃ
৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১৭৭৫	১১১১	৬৬৪	২৩৬৩	১৫৯৮	৭৬৫	৩০৪৪	২১২৬	৯১৮
১৫৭২	৬৯৯	৮৭৩	১৬৯৭	৭৮৬	৯১১	১৭৭০	৮৪৮	৯২২
১০৬৫	৪৭৩	৫৯২	১২১২	৫৩৩	৬৭৯	১২৭৪	৬০৬	৬৬৮
৩৫৫	১৯৩	১৬২	৪২৪	২৩৮	১৮৬	৫৬৬	২৮৪	২৮২
৩০৪	১২৪	১৮০	৩৬৩	১৫২	২১১	৪২৫	১৮১	২৪৪
৫০৭১	২৬০০	২৪৭১	৬০৫৯	৩৩০৭	২৭৫২	৭০৭৯	৪০৪৫	৩০৩৪

গ্রহণকারী। বাৎসরিক হিসাব থেকে বাদ দেওয়া হয় বন্ধ্যাকরণ ১০%, খাবার বড়ি ও কনডম ৫০%, ৩৩% এবং অন্যান্য পদ্ধতি ৫০%।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মকৌশল

১৭.২১ জনসংখ্যা নীতির সার্বিক কাঠামো ও জনসংখ্যা পরিকল্পনা অভিগমনের আওতায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে কর্মসূচী বিকাশের জন্য নিম্নোক্ত কর্ম-কৌশলগুলোর প্রস্তাব করা হচ্ছে:

(১) জনসংখ্যা কার্যক্রমে জনসাধারণের পূর্ণ ও সক্রিয় সমর্থন এবং অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরকে প্রত্যক্ষভাবে জড়িতকরণ এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তব্যমূলক সমন্বয় সাধনকে চলমান করণ ;

(২) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি প্রতিযোগিতার ভাব সঞ্চার এবং সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ গোষ্ঠি-ভিত্তিক উদ্দীপনামূলক একটি ব্যবস্থা প্রবর্তন;

(৩) কর্মী-জনসংখ্যা অনুপাত হ্রাসকল্পে গ্রহণকারীদের দিক থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার একটি সমন্বিত সেবা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এবং কর্মসূচী বাস্তবায়নের বিভিন্ন স্তরে আরও কার্যকর ও সুবিন্যস্ত তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে থানা এবং তার নিম্ন পর্যায়ের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সংগঠনগুলকে সম্পূর্ণরূপে একত্রীভূতকরণ;

(৪) ছোট পরিবারের আদর্শকে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলার লক্ষ্যে জনগণের স্বাস্থ্য ও কল্যাণই শুধু নয় শিশুর জীবনধার সম্ভাবনাতে উন্নতির বিধানের জন্য পর্যাপ্ত সেবা প্রদানের মাধ্যমে মা ও শিশুর মৃত্যুর হার হ্রাসকরণ;

(৫) সরকারী ও বেসরকারী ডাক্তারদের পূর্ণ সমর্থনে উন্নততর হাসপাতাল সেবা ও অনুগামী যত্নের মাধ্যমে স্বেচ্ছামূলক বন্ধ্যাকরণ কর্মসূচীকে জনপ্রিয় করে তোলা;

(৬) বিধি সামাজিক ও আইনগত উপায় প্রচলন, উৎসাহবর্ধক ও নিরুৎসাহমূলক ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং এ সব ব্যবস্থার প্রতি সামাজিক সমর্থনকে সক্রিয় করণ;

(৭) ছোট পরিবারের আদর্শ ও নিম্নতর প্রজনন ক্ষমতার অনুকূল একটি পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন খাতের নীতিমালা ও কর্মসূচীকে জনসাধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণ, পরিবারের কল্যাণ বৃদ্ধি, শিশুদের আয়ু বৃদ্ধি এবং মায়ের মৃত্যুহার ও অপুষ্টি হ্রাসকল্পে বলিষ্ঠতর ভাবে অন্যান্য রাখা;

(৮) ব্যক্তিগত ব্যবসায় নিয়োজিত সকল চিকিৎসা গ্রাহকদের নাম স্থানীয় পরিবার পরিকল্পনা সংগঠনে তালিকাভুক্ত করা, তাঁদের প্রয়োজনানুগ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা, এবং ক্ষতিপূরণমূলক ফী প্রদান করে তাঁদের কাছ থেকে চিকিৎসানুষংগিক সেবা গ্রহণ;

(৯) আরো দক্ষ তদারকী ও কর্তব্য সম্পাদনে জবাবদিহি ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য জনসংখ্যা কার্যক্রমে নিয়োজিত সকল কর্মচারীকে বিশেষতঃ থানা ও তার নিম্নস্তরে নিয়োজিত কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করা;

(১০) উন্নয়ন কার্যে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থার খাত-ভিত্তিক নীতি ও কর্মসূচীকে জাতীয় জনসংখ্যা বিষয়ক লক্ষ্যের সংগে একীভূত করার উদ্যোগ নেওয়া; এবং

(১১) তদারকী ও মূল্যায়ণ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গ্রাম পর্যায়সহ সকল পর্যায়ের কার্য সম্পাদনের মাসিক পর্যালোচনা করা। জাতীয় পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি প্রতি তিন মাসে একবার এবং জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ প্রতি ছয় মাসে একবার কর্মসূচীর কার্য সম্পাদন পর্যালোচনা করবেন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসূচী

১৭·২২ জনসংখ্যা কার্যক্রমকে মোটামুটি পাঁচটি প্রধান এলাকায় বিভক্ত করা যায়: (ক) মাতৃমংগল ও শিশু কল্যাণ এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান, (খ) তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ (আই ই এ), (গ) প্রশিক্ষণ, (ঘ) গবেষণা ও মূল্যায়ন; এবং (ঙ) নীতি, পরিকল্পনা ও সমন্বয়।

সেবা বিতরণ

১৭·২৩ **মাতৃমংগল ও শিশুস্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান :** প্রতি হাজার জীবন্ত জন্মে মা ও শিশুর বর্তমান মৃত্যুহার যথাক্রমে ৭ ও ১৪০। ১৯৮৫ সালে প্রতি হাজার জীবন্ত জন্মে মায়েদের মৃত্যুহার ৭ থেকে ৪-এ এবং শিশু মৃত্যু হার ১৪০ থেকে ১০০-তে হ্রাসকল্পে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মাতৃমংগল ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থার উন্নতি বিধান করা হবে।

১৭·২৪ বাসস্থান পর্যায়ে প্রতিরোধক ও মাসোনুয়ক মাতৃমংগল ও শিশুস্বাস্থ্য কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঐতিহ্যগত জন্ম পরিচর্যাকারীদের মাধ্যমে গৃহে নিরাপদ প্রসব ও শিশুযত্ন সেবা-ব্যবস্থা এবং প্রতিষ্ঠানিক পর্যায়ে পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, মাতৃমংগল ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, পল্লী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং মাতৃমংগল ও শিশু কল্যাণ ইউনিট এবং অন্যান্য পরামর্শদানকারী হাসপাতালে মা ও শিশুর যত্নমূলক সেবার ব্যবস্থা করে উপরিউক্ত উদ্দেশ্যসমূহ সাধনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৭·২৫ যেহেতু অপুষ্টি মা ও শিশু মৃত্যুর এবং জনস্বাস্থ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ, তাই বাসস্থান বা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে পুষ্টি শিক্ষা ও সেবা ব্যবস্থা মাতৃমংগল ও শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচীর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হবে।

১৭·২৬ ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রয়োজনে পরিবার পরিকল্পনামূলক সেবা বিতরণ আরো ব্যাপক ভিত্তিক ও পর্যাপ্ত হওয়া দরকার। ব্যবহারকারীর সন্তুষ্টি, উচ্চহারে নিয়মিত ব্যবহার এবং অংশ গ্রহণে ব্যাপ্তিলাভ নিশ্চিত করার জন্য সেবার উচ্চমানকে অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সেবা বিতরণের মৌলিক উপাদানগুলো নিম্নরূপ হবে:

(১) প্রচলিত গর্ভ-নিরোধ উপকরণ মাঠকর্মীরা নামমাত্র মূল্যে বাড়ী বাড়ী পৌঁছে দেবেন এবং ক্লিনিকগুলোতে এগুলো বিনা মূল্যে সরবরাহ করা হবে। এগুলো সামাজিক বাজারজাত-করণ কর্মসূচীর মাধ্যমেও বিতরণ করা হবে এবং বেসরকারী খাতে ভর্তুকীমূল্যে বিক্রয় করা হবে।

(২) প্রতিটি কেন্দ্রে একজন চিকিৎসা সহকারী, একজন পরিবারকল্যাণ পরিদর্শক ও একজন ফার্মাসিষ্টকে নিয়ে পল্লী এলাকায় মোট ১৫০০টি পরিবার কল্যাণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। এসব আরোগ্যনিকেতন ছাড়াও ৪৮টি স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্র ও ১,২৭৫টি পল্লী সাস্থ্য চিকিৎসালয় ব্যবহার করে বিদ্যমান ৯৩টি মাতৃমংগল ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ৮৫৭টি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের পরিবার পরিকল্পনা, মাতৃমংগল ও শিশুকল্যাণ অনুগামী ব্যবস্থা এবং মহিলাদের প্রশিক্ষণ কার্যাবলী সম্পর্কীয় প্রচেষ্টাকে জোরদার করা হবে।

(৩) সরকারী ও বেসরকারী চিকিৎসকরা বন্ধ্যাত্বকরণ সেবা প্রদান করবেন। সেবার মানোন্নয়ন, উপযুক্ত কারিগরী তদারকী ও অন্তর্দ্র তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে বন্ধ্যাত্বকরণকে জনগণের নিকট আরো গ্রহণযোগ্য ও নিরাপদ করে তোলা হবে।

(৪) দশকময়ের আয়তন ও বৈশিষ্ট পরিবর্তনের সংগে সংগে শহর এলাকায় মাতৃমংগল ও শিশুকল্যাণ এবং পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনকে পুনর্নির্ধারণ করা হবে এবং তদানুযায়ী সেবামূলক কার্যকলাপকে শক্তিশালী ও পুনর্গঠিত করা হবে।

১৭·২৭ **সেবা বিতরণের একীভূত উদ্যোগ :** থানা ও তার নিম্ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা-মূলক সেবা বিতরণের জন্য একটি একীভূত ব্যবস্থা প্রচলন করা হবে। এই উদ্দেশ্যে বর্তমান থানা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা সংগঠনগুলোকে একীভূত করা হবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়নে থানা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার, থানা স্বাস্থ্য প্রশাসকের প্রধান সহায়ক হবেন। এ উদ্দেশ্যে বর্তমান ১৩,৫০০ পরিবার কল্যাণ কর্মী, তৎসহ ৪,৫০০ পরিবার পরিকল্পনা সহকারী ও ১৩,৫০০ পরিবার কল্যাণ সহকারী সেবাকে কাজে লাগানো হবে। সাধারণতঃ একজন মহিলা ও একজন পুরুষ কর্মী সমবায়ে গঠিত এক একটি দলকে এক একটি ওয়ার্ডের দায়িত্বে নিয়োজিত করা হবে। তবে, ১৮,০০০ বা তদূর্ধ্ব সংখ্যক (১৯৭৪ সালের আদম শুমারী) জনসংখ্যা নিয়ে গঠিত বড় ইউনিয়নগুলোর বেলায় একজন মহিলা ও দুইজন পুরুষকে নিয়ে গঠিত এক একটি দলের উপর এক একটি ওয়ার্ডের দায়িত্ব প্রদান করা হবে। এই ব্যবস্থায় কর্মী জনসংখ্যা অনুপাতে আরও হ্রাস পেয়ে গড়ে ১:২৭০০তে উপনীত হবে। এতে করে জনসাধারণ স্থানীয়ভাবে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা এই উভয় কর্মসূচী থেকে অধিকতর সেবা পাবেন।

১৭·২৮ থানা স্বাস্থ্য প্রশাসক জনসংখ্যা কর্মসূচীর ব্যাপারে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর উপ-পরিচালকের নিকট এবং স্বাস্থ্য কর্মসূচীর জন্য সিভিল সার্জনের নিকট দায়ী থাকবেন।

১৭·২৯ উৎস পর্যায়ে (Grass-root) কর্মরত কর্মীদের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা বিতরণ-মূলক সকল বিষয়ের জন্য ও তার সাথে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য লিপিবদ্ধ করার জন্য দায়ী থাকবেন। ইউনিয়ন পর্যায়ের তত্ত্বাবধায়ককে অবশ্য ইউনিয়ন পরিষদের তত্ত্বাবধানে ও ঘনিষ্ঠ সহযোগীতায় কর্তব্য পালন করতে হবে।

১৭·৩০ সকল সক্ষম দম্পতিকে গ্রাম পর্যায়ে তালিকাভুক্ত করা হবে। তাদের কর্মীদল স্ব স্ব এলাকায় নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও উপকরণ পৌঁছে দেয়া নিশ্চিত করবেন এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় ঘটনা রেকর্ড করবেন। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর মাসিক অগ্রগতি এবং মাঠকর্মী ও অন্যান্যদের দ্বারা সরবরাহকৃত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর পর্যালোচনা করবেন। যদি কোথাও কোন দোষ-ত্রুটি ধরা পড়ে তবে তাঁরা তা দুর করে লক্ষ্য অর্জনের উপায় উদ্ভাবন করবেন।

১৭·৩১ **সেবা বিতরণের অন্যান্য ব্যবস্থা : :** ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে নিয়োজিত যোগ্য চিকিৎসকদের তালিকা-ভুক্তির মাধ্যমে এবং তাঁদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে ও তাদের ক্লিনিকগুলোকে সুসজ্জিত করার জন্য ঋণদানের সুবিধাসহ প্রয়োজনীয় সমর্থনের মাধ্যমে অতিরিক্ত ক্লিনিক্যাল সার্ভিসের ব্যবস্থা করা হবে, যাতে অন্তরায়ুতে স্থাপন পদ্ধতি (আই ইউ ডি), সূচি প্রয়োগ (Injectibles) এবং বন্ধ্যাকরণের সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

১৭·৩২ পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক, পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, হাসপাতাল প্রভৃতির মাধ্যমে ঋতুস্রাব নিয়ন্ত্রণের সুবিধাদি প্রদান করা হবে।

১৭·৩৩ দেশে গর্ভ-নিরোধ উপকরণ শিল্প স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে স্থানীয়ভাবে থাবার বড়ি ও কনডম প্রস্তুতের সম্ভাব্যতার সমীক্ষা চালানো হবে।

১৭·৩৪ সকল শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র, বন্দর হাসপাতাল, রেলওয়ে হাসপাতাল, সংগঠিত শিল্প ও বৃক্ষাদি আবাদী খাতের (Plantation) হাসপাতাল/ক্লিনিক এবং সশস্ত্র বাহিনী, বাংলাদেশ রাইফেলস্ ও পুলিশ হাসপাতালগুলোর মাধ্যমে সেবা বিতরণের ব্যবস্থা করা হবে।

১৭.৩৫ যে সব দম্পতির ২টি বা ৩টি শিশু আছে, তাদের বন্ধ্যাকরণের জন্য "বও-স্কীম" চালু করা হবে।

১৭.৩৬ **তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ :** পরিকল্পনাকালে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ আরো জোরদার করা হবে ও তৎপরতা বাড়ান হবে। এই কর্মসূচী আন্তঃব্যক্তি যোগাযোগ এবং সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও লক্ষ্যভুক্ত জনসংখ্যার সাথে মাঠকর্মীদের বৈঠকের উপর পূর্ণ মনোযোগ দেবে। মাঠকর্মীদের তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ প্রচেষ্টাসমূহকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর বিভাগীয় ও জেলা কর্মকর্তাদের সাথে যুক্ত হামমান ইউনিট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জোরদার করা হবে। কেন্দ্রীয় তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ কেন্দ্রে প্রমাণ্য চিত্র, পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা সমন্বয়ে একটি যোগাযোগ সম্পদ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।

১৭.৩৭ তথ্য শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ ইউনিট সামগ্রিকী ও অন্যান্য উপাদান যেমন প্রচারপত্র, ফ্ল্যানেল গ্রাফ প্রভৃতির প্রকাশনা অব্যাহত রাখবে এবং জনসংখ্যা তথ্য পরিবেশনে পল্লী মাধ্যমসহ দেশীয় মাধ্যমকে ব্যবহার করবে। একটি মুদ্রণালয়, গবেষণাগার প্রভৃতিসহ একটি প্রযোজনা ইউনিট স্থাপন করা হবে।

১৭.৩৮ তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ ইউনিট জনসংখ্যা কার্যক্রমের সংগে জড়িত বিভিন্ন খাতের সংস্থা ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে সমর্থন দান করবে এবং তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে।

১৭.৩৯ বিভিন্ন খাতের কর্মসূচীতে তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ সম্পর্কীয় কার্যাবলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে বিদ্যালয়কে জনসংখ্যা বিষয়ক শিক্ষা দান, বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্য প্রচার, সিনেমা হলে ও স্থানে প্রদর্শন উপযোগী জনসংখ্যা বিষয়ক চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, সদস্য, শ্রমিক ইউনিয়ন নেতৃবর্গ এবং এ জাতীয় ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে পরিবর্তনে সহায়ক তথ্যাভিজ্ঞ জনগোষ্ঠি তৈরী।

১৭.৪০ **প্রশিক্ষন:** পরিমাণগত ও গুণগত লক্ষ্য অর্জনের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য প্রশিক্ষণ ও কর্মচারী উন্নয়ন একটি মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়। এ উদ্দেশ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের অধীনস্থ সকল প্রতিষ্ঠান যথা: (১) নিপোর্ট (NIPORT), (২) ১২টি পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক প্রশিক্ষণ ইনষ্টীটিউট ও (৩) ২৪টি জেলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনস্থ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যেমন (১) নিপসম (NIPSOM), (২) প্যারামেডিক্যাল ইন্সটিটিউট, (৩) সেবিকা কলেজ, (৪) জনস্বাস্থ্য পুষ্টি ইন্সটিটিউট ও (৫) চিকিৎসা-সহকারী বিদ্যালয়গুলোকে সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর অধীনে পুনর্গঠিত করতে হবে। এই সংগে একটি জনশক্তি নীতি প্রণয়ন করতে হবে। এতদুদ্দেশ্যে একটি জনশক্তি উন্নয়ন নীতি উদ্ভাবন করতে হবে যেন প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।

১৭.৪১ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ দান ছাড়াও, অনানুষ্ঠানিক ও কাজের মাধ্যমে বিশেষ করে মাঠকর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমানে দেশে ১৫,৯৫৩ জন ঐতিহ্যগত জন্ম পরিচর্যাকারী (TBA), ৮,০০০ জন দাই, ১২,৩৩৭ জন পরিবার কল্যাণ সহকারী, ৪,৩৯১ জন পরিবার পরিকল্পনা সহকারী, ২,৭২২ জন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক ও ১৩,৫০০ জন পরিবার কল্যাণ কর্মী রয়েছেন। এসব শ্রেণীভুক্ত সকলের প্রশিক্ষণ ও পুনঃপ্রশিক্ষণের প্রয়োজন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ নাগাদ সর্বমোট ১,০০০ চিকিৎসা সহকারী ও ৪,৬৬৪ পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক প্রস্তুত হবেন। এসব কর্মচারীদের জন্যও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হবে। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে যে সব প্রশিক্ষক রয়েছেন তাঁদের প্রশিক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে পুনঃপ্রশিক্ষণের প্রয়োজন হবে। তাই বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা দরকার এবং প্রয়োজনবোধে বিদেশেও এরূপ ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১৭.৪২ জনসংখ্যা কর্মসূচীর থানা, মহকুমা ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দানের দায়িত্ব 'নিপোর্ট'কে গ্রহণ করতে হবে। প্রশিক্ষণ দানের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের একদল ভাল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক থাকতে হবে।

১৭.৪৩ **গবেষণা ও মূল্যায়ন :** জনসংখ্যা পরিকল্পনার একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হিসাবে গবেষণা ও মূল্যায়নের গুরুত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ এবং অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গবেষণা প্রয়োজনের পাঁচটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে, যথা—

(১) জনসংখ্যা বিষয়ক গবেষণা ও সামাজিক গবেষণা;

(২) মানব প্রজনন ও গর্ভনিরোধ প্রবৃত্তি বিষয়ক গবেষণা;

(৩) সক্রিয় কার্যক্রম গবেষণা;

(৪) গবেষণা ও প্রশিক্ষণ;

(৫) মূল্যায়ন বিষয়ক গবেষণা।

১৭.৪৪ এ সকল প্রয়োজনের ভিত্তিতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংগঠনকে নিম্নোক্ত কার্যাবলী অর্পণের প্রস্তাব করা হচ্ছে :

(১) আমাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন গর্ভ-নিরোধ পদ্ধতিসমূহে নিরাপত্তা, কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতার প্রতি খেয়াল রেখে মানব প্রজনন ও গর্ভ-নিরোধ প্রবৃত্তি বিষয়ক গবেষণা এবং গর্ভ-নিরোধ পদ্ধতি ব্যবহার, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর ব্যবস্থাপনা, গর্ভ-নিরোধ উপকরণ বিতরণ ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার দায়িত্ব 'নিপোর্ট'কে পালন করতে হবে। ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট গবেষণা 'নিপোর্ট' সরাসরি পরিচালনা করতে পারে কিংবা ব্যবস্থাপনা প্রশাসন ইন্সটিটিউটের জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র অপরাপর গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সংগে মিলিতভাবে পরিচালনা করতে পারে।

(২) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের "ব্যবস্থাপনা তথ্য ব্যবস্থা" (MIS) ইউনিটকে আরো জোরদার করতে হবে এবং কর্মসূচীর ব্যবস্থাপনা, তদারকী ও আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের প্রয়োজনে অপরিহার্য সেবা-বিতরণ, উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য একটি পর্যাপ্ত ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে হবে।

(৩) আমাদের জনসংখ্যা নীতি ও কর্মসূচীর প্রয়োজনের আলোকে জনসংখ্যা সমীক্ষা কেন্দ্রের অভীষ্ট লক্ষ্য সমূহের পর্যালোচনার ভিত্তিতে এই কেন্দ্রকে একটি কার্যকর ও উপযোগী গবেষণা প্রতিষ্ঠানরূপে বিকশিত করতে হবে।

(৪) পরিকল্পনা কমিশনের 'জনসংখ্যা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা ইউনিট' জনসংখ্যা ও উন্নয়নের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের উপর গবেষণা পরিচালনা করবে, জনসংখ্যা সম্পর্কীয় একটি উপাত্ত-ভাণ্ডার গড়ে তুলবে এবং নীতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দান করবে।

(৫) পরিসংখ্যান বিভাগকে আদমশুমারী, নমুনাজরিপ, আন্তঃশুমারী সমীক্ষা ও অত্যাবশ্যকীয় ঘটনা সংগ্রহ পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। এই বিভাগের কম্পিউটার ব্যবহারের সুবিধাগুলোকে আরো জোরদার করতে হবে, যাতে জনসংখ্যা বিষয়ক গবেষণা ও মূল্যায়ন ইউনিটগুলো তাদের নিজ নিজ অফিসে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের জন্য কম্পিউটার টারমিনালের সুবিধা পেতে পারে।

(৬) বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, তাদের বিভিন্ন বিভাগ ও ইন্সটিটিউট, যেমন, পরিসংখ্যান গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, সমাজকল্যাণ ইন্সটিটিউটে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেমন স্নাতকোত্তর চিকিৎসা গবেষণা ইন্সটিটিউট, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় প্রভৃতি সামাজিক জনসংখ্যা বিষয়ক ও জীব-চিকিৎসা সম্পর্কীয় গবেষণা পরিচালনা করতে পারে।

(৭) তদারকীর জন্য বিভিন্ন খাতের প্রকল্পসহ প্রতিটি জনসংখ্যা কর্মসূচীতে এর স্বাভাবিক অংগ স্বরূপ গবেষণা ও মূল্যায়ন উপাদান থাকা উচিত। জনসংখ্যা খাতের কর্মসূচীগুলোর অধিকতর কার্যকর মূল্যায়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের জনসংখ্যা পরিকল্পনা শাখার মূল্যায়ন ইউনিটটিকে আরো সক্রিয় করে তুলতে হবে।

নীতি, পরিকল্পনা ও সমন্বয়

১৭·৪৫ **নীতি:** ১৯৭৬ সালের জুন মাসে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ঘোষণার পর থেকে সরকার পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক অবস্থায় প্রতিক্রিয়ান্বিত হয়ে এই নীতির প্রতি বাস্তববাদী দৃষ্টিভংগী রক্ষা করেছেন। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গৃহীত হয়েছে। এ কর্মসূচীর দৃষ্টিভংগী বহুমুখী এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ এই কর্মসূচী বাস্তবায়নে হাসপাতাল-সুবিধার জন্য স্বাস্থ্য অবকাঠামোর সংগে যোগাযোগ রক্ষা করবে। কর্মসূচীটি মাতৃমংগল ও শিশু কল্যাণ এবং পুষ্টি উন্নয়নের সংগে একীভূত এবং গোষ্টি-ভিত্তিক। এতে জনগনের দ্বারপ্রান্তে সেবা বিতরণের জন্য ঝুড়িতে পরিবেশন কৌশল বা "কাফেটারিয়া এ্যাপ্রোচ" অবলম্বন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সবরকমের পরিবার পরিকল্পনা উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। সার্বিক নীতিগত লক্ষ্য ঠিক রেখে নতুন কর্ম-কৌশল ও দৃষ্টিভংগীর পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনার প্রচলিত নীতি সংশোধনের ব্যবস্থা রয়েছে। এভাবে সংশোধন, বর্তমানের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবর্তন ও যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে জনসংখ্যা নীতিকে উন্নয়ন মন্ত্রণালয়সমূহের নীতি ও কর্মসূচীর সাথে সমন্বিত করে নেয়া হবে যাতে জনসংখ্যা বিষয়ক জাতীয় লক্ষ্য অর্জন সহজতর হয়।

১৭·৪৬ **পরিকল্পনা:** প্রকল্প ও ও কর্মসূচী পরিকল্পনা ব্যবস্থার বেশ যুক্তিযুক্ত পুনর্বিন্যাস ও উন্নতি বিধানের প্রয়োজন রয়েছে। পরিকল্পনাকালের মধ্যে প্রজনন ক্ষমতা আমূল হ্রাসের লক্ষ্য অর্জন করতে হলে পরিকল্পনা কমিশনের জনসংখ্যা পরিকল্পনা শাখার পরিপূরক ভূমিকাকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের ভূমিকার সংগে আরো অন্তরংগ করে তুলতে হবে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের পরিকল্পনা কোষ, প্রকল্প অর্থ কোষ এবং কর্মসূচী বিকাশ ইউনিটগুলো বিশেষ করে তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ ইউনিট এবং পরিবার পরিকল্পনা, মাতৃমংগল ও শিশু কল্যাণ ইউনিটগুলোকে যথেষ্ট পরিমাণে কার্যক্ষম ও সজ্জিত করে তুলতে হবে। একইভাবে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর সংগে যে সব মন্ত্রণালয় জড়িত সেসব মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা ইউনিটকে নিজ নিজ এলাকায় জনসংখ্যা সমস্যার উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী কর্মসূচী উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশ প্রদান করা হবে। প্রকল্প তদারকী ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন কার্যাবলী সম্পাদনে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগকে আরো কার্যকর হতে হবে। কল্পিত লক্ষ্যমাত্রা, সম্পদের প্রয়োজনীয়তা ও সময়সীমা সহকারে স্পষ্টভাবে বর্ণিত প্রায়োগিক পরিকল্পনা বিষয়ে এরূপ তদারকী পরিচালনা করতে হবে। দৃশ্যমান ফল লাভের উদ্দেশ্যে তদারকী নির্ভরযোগ্য ও নির্দিষ্ট ভিত্তি ও প্রেক্ষিত সৃষ্টির জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় একটি মধ্যবর্তীকালীন বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

১৭·৪৭ **সমন্বয়:** বিভিন্ন স্তরে তদারকী ও কর্মসূচীর প্রতি জনগনের সমর্থন আদায়ের জন্য সমন্বয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জেলা ও থানা পর্যায়ে যথাক্রমে ডেপুটি কমিশনার ও এসডিও/টি এনও'র নেতৃত্বে গঠিত জেলা ও থানা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কমিটিগুলো এই সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব পালন করবে। নিজ নিজ স্তরে একীভূত স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর কার্যকর তদারকী ও সমন্বয় সাধনে

সম্প্রসারিত ভূমিকা পালনের জন্য এসব কমিটির কার্যাবলীতে প্রাণ-সঞ্চার করতে হবে। জেলার লক্ষ্যমাত্রা সাবনে জেলা ও থানা পর্যায়ের জনসংখ্যা কর্মসূচীর অধীনস্থ কর্মচারীদেরকে এসব কমিটির নিকট জবাবদিহি করতে হবে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির সাথে জেলা পর্যায়ে কমিটিগুলো তাদের কাজের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখবে। কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করণের জন্য বিভিন্ন খাতের সংস্থাগুলো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও কার্য সম্পাদন প্রতিবেদন এবং আর্থিক বিবরণ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগে নিয়মিতভাবে পেশ করবে এবং পরিকল্পনা কমিশনের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগে নিয়মিতভাবে পেশ করবে এবং পরিকল্পনা কমিশনের জনসংখ্যা পরিকল্পনা শাখায় এগুলোর প্রতিলিপি প্রদান করবে।

১৭.৪৮ **বাস্তব সুবিধাদিঃ** দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ১৫০০টি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ১০টি পরিবার পরিকল্পনা সহকারী এবং পরিবার কল্যাণ সহকারী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও একটি জনসংখ্যা ভবন নির্মাণ করা হবে। এ ছাড়া, ১২৭৫টি পল্লী দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংস্কার ও পুনর্নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হবে। চারটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত ৪টি আদর্শ ক্লিনিক এবং ৮টি পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হবে। ভাড়াকৃত বাড়ীর উপর অব্যাহত নির্ভরশীলতা হ্রাস করে, ক্লিনিক্যাল সার্ভিসসহ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কাঠামোর স্থান সংস্থানের জন্য এই কর্মসূচীর অধীনে ভবন নির্মাণের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে নিজস্ব বাস্তব সুবিধাদি সৃষ্টির কথা বিবেচনা করা হবে। এসব নির্মাণকার্যে কোনরূপ বিলম্ব এই কর্মসূচীর জন্য খুব ক্ষতিকর হবে বলে, বিলম্ব পরিহারের উপায় হিসাবে গণপূর্ত বিভাগের কাজের স্বাভাবিক আওতায় বাইরে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ নির্মাণকার্য সরাসরি হাতে নিতে পারে এরূপ একটি ব্যবস্থা উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা করা হবে।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা

১৭.৪৯ কর্মসূচীর মৌলিক কর্ম-কৌশলের আওতায় বিভিন্ন খাতের সংস্থাগুলোকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সার্বিক সমন্বয়ের আওতায় নিম্নোক্ত দায়ীত্বগুলো পালন করতে হবে :

(১) **স্বাস্থ্য বিভাগঃ** পরিবার পরিকল্পনার জন্য ক্লিনিক্যাল সার্ভিস বিশেষতঃ বন্ধ্যাকরণ, রক্তস্রাব নিয়ন্ত্রণ (ধর্ম,মাস) ও ক্লিনিক্যাল গর্ভ-নিরোধ ব্যবস্থাদি থেকে উদ্ভূত কোন জটিলতা নিরসনে চিকিৎসকসহ প্রতিষ্ঠানিক স্বাস্থ্য সুবিধাদি প্রদানের জন্য স্বাস্থ্য বিভাগ দায়ী থাকবে। স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যার সমন্বিত কর্মসূচী বাস্তবায়নে এই বিভাগ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিশ্চিত করবে। সকল হাসপাতাল ও থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বন্ধ্যাকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শয্যা সংরক্ষিত রাখতে হবে।

(২) **অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ঃ** এই মন্ত্রণালয় জনসংখ্যা পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন, জনসংখ্যা বিষয়ক চল (ভেরিয়েবলস) নিরূপণ, জনসংখ্যা কর্মসূচীর বাস্তবায়ন, জনসংখ্যা বিষয়ক সমীক্ষা, উন্নয়নের প্রেক্ষিতে জনসংখ্যা সমীক্ষা, আদমশুমারী ও গুরুত্বপূর্ণ উপাত্তসংগ্রহের জন্য দায়ী থাকবে।

(৩) **স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ঃ** এই মন্ত্রণালয় মহিলা সমবায় প্রকল্প এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাভুক্ত জনসংখ্যা কর্মসূচীর সম্পূরক অপর কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে।

(৪) **শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ঃ** আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার জনসংখ্যা শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত সম্পর্কীয় জনসংখ্যা শিক্ষা প্রকল্পটি সমাপ্ত করবে এবং জনসংখ্যা শিক্ষা ক্ষেত্রে উপযুক্ত গবেষণা কার্যের উদ্যোগ নিবে। এই মন্ত্রণালয় ইমাম, মাদ্রাসা শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জনসংখ্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণের কর্মসূচী প্রণয়ন করবে।

(৫) **কৃষি মন্ত্রণালয়ঃ** এই মন্ত্রণালয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচীর সহযোগিতায় 'পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি শিক্ষা' বিষয়ক চালু প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে।

(৬) **তথ্য মন্ত্রণালয়ঃ** এই মন্ত্রণালয় বেতার, টেলিভিশন, গণ-সংযোগ ও চলচ্চিত্র বিভাগ এবং অন্যান্য গণ-মাধ্যম সংস্থার জনসংখ্যা বিষয়ক চালু প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করবে।

(৭) **সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ঃ** এই মন্ত্রণালয় "মাদারস্ ক্লাব" নামক চালু প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। মহিলা পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউণ্ডেশন এবং অন্যান্য মহিলা সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত কর্মসূচীও এই মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করবে। দ্রব্যের উন্নততর নমুনা (ডিজাইন) তৈরী ও বাজারজাত করণের জন্য মহিলা সংগঠনগুলোকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সহযোগিতায় এই মন্ত্রণালয় পরিপূরক সেবা প্রদান করবে।

(৮) **শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ঃ** এই মন্ত্রণালয় শ্রমিক-কল্যাণ কেন্দ্রের চালু পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করবে এবং সংগঠিত শিল্পসমূহে ও চা বাগান ও বৃক্ষ-আবাদী এলাকায় নতুন নতুন কর্মসূচী উদ্ভাবন করবে।

১৭.৫০ তাছাড়া প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পূর্ত মন্ত্রণালয়, রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় সেবা বিতরণ ও তৎসংগে উদ্বুদ্ধকরণ, মাতৃমংগল ও শিশু-কল্যাণ এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে। মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার জন্য একটি বিশেষ মাতৃমংগল ও শিশু কল্যাণ কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

সামাজিক ব্যবস্থাসমূহ

১৭.৫১ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনার সমর্থনে নিম্নে কতিপয় সামাজিক ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হচ্ছেঃ

(১) পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর ব্যাপক প্রসারের জন্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মী এবং পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণকারীদের মর্যাদার প্রশ্নটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণকারীদের বিশেষতঃ যারা স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন বা কমপক্ষে পাঁচ বছর যাবত নিয়মিত পরিবার পরিকল্পনা অনুসরণ করে আসছেন তাঁদের সকল সরকারী সুবিধা যেমন বাসস্থান বরাদ্দ, চিকিৎসা-যত্ন, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। পরিবার পরিকল্পনা গ্রহনকারীদের 'ফাদারস ক্লাব' এবং 'মাদারস্ ক্লাব' গঠনে উৎসাহিত করতে হবে। এসব ক্লাবে মাতাপিতার দায়িত্বজ্ঞান বৃদ্ধি করবে, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণকারীদের পৃষ্ঠপোষক জনগোষ্ঠি হিসাবে কাজ করবে, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে এবং আয় বৃদ্ধিকারী কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা করবে।

(২) মহিলাদের উচ্চ সামাজিক মর্যাদা পরিবার পরিকল্পনার জন্যে অনুকূল। শিক্ষা ও আয় বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রধানতঃ মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারে। সুতরাং মহিলাদের জন্য বর্তমানে যেসব কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে তার সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং তাদের অধিকতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক (অষ্টম শ্রেণী ও তার উর্দ্ধে) পর্যায়ে গরীব ঘরে যেসব মেয়েরা পড়াশুনা করে, তাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তা দিয়ে তাদের স্কুল বেতন, বই, কাগজপত্র ও পোশাকের খরচ সংকুলান হয়ে যায়। মহিলাদের উচ্চ শিক্ষা তথা বিলম্বে বিবাহ উৎসাহিত করার জন্য প্রতিভাসম্পন্ন দরিদ্র ছাত্রীদের এই শর্তে আর্থিক সমর্থন দেওয়া উচিত যেন তারা

পড়াশুনা শেষ করে বিয়ে করে। মহিলাদের বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের জীবিকামূলক প্রশিক্ষণ দান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উদার আর্থিক সমর্থন যোগাতে হবে। অবিবাহিত ও ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেয়েদের চাকুরী পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিভিন্ন শ্রেণীর চাকুরীতে মহিলাদের জন্য একটি ন্যূনতম কোটা বাঁধা থাকতে হবে। কোন কোন শ্রেণীর চাকুরীতে যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের শুন্য পদের শতকরা ১০০ ভাগই মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকতে পারে।

(৩) বিলম্বে বিবাহ এবং জন্ম-হারিতকরণের কর্মসূচীর গোষ্ঠিগতভাবে অনুসরণের উপযুক্ত উৎসাহ সৃষ্টির একটি পদ্ধতি প্রচলন করতে হবে। শহর ও গ্রাম অঞ্চলে মেয়েদের বিয়ের বয়স যথাক্রমে ২৩ ও ২১-এ উন্নীত করা সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনের লক্ষ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এ ধরণের আন্দোলনকে প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত। নেতৃস্থানীয় মহিলা সংগঠনগুলোকে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

(৪) পারিবারিক জীবনে ধর্ম একটি চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করে থাকে। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে বিশেষতঃ মাদ্রাসা, মসজিদ ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে পরিবার পরিকল্পনার পরিপূরক কর্মকাণ্ডের সংগে জড়িত করতে হবে।

(৫) জনসংখ্যা বিস্ফোরণ সমস্যার বিরাটত্ব এতই যে এর সমাধানের জন্য সকল সামাজিক রাজনৈতিক গোষ্ঠির পূর্ণ সমর্থন প্রয়োজন। সুতরাং পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর প্রধান প্রেক্ষিত-গুলোকে এরূপভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যেন এই কর্মসূচী সব গোষ্ঠির সমর্থনকে সক্রিয় করে তুলতে পারে।

(৬) পরিবার পরিকল্পনার স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণকারীদের জন্য বণ্ড, বীমা অথবা পেন্সনের মাধ্যমে বার্ধক্যে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

(৭) জনসংখ্যা বিষয়ক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ব্যক্তিগত, গোষ্ঠিগত ও সম্প্রদায়গত পুরস্কার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। একইভাবে পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রীদের মধ্যে যাঁরা অসাধারণ সাফল্য লাভ করবে তাঁদের জন্য উপযুক্ত পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে।

আইনগত ব্যবস্থাদি

১৭.৫২ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনার পরিপূরক ব্যবস্থা হিসাবে নিম্নোক্ত আইনগত ব্যবস্থাগুলোর প্রস্তাব করা যাচ্ছেঃ

(ক) **বিবাহের বয়স ও গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান ঃ** বিবাহের সর্বনিম্ন বয়সসীমা মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৬ থেকে বাড়িয়ে ১৮-তে এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২১এ উন্নীত করতে হবে এবং এই বিধান বলবৎ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জন্ম-মৃত্যুর তালিকাভুক্তি এবং বিবাহ ও অন্যান্য প্রয়োজনে যেমন বিদ্যালয়ে ভর্তি, সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ, পাসপোর্ট প্রদান প্রভৃতি ক্ষেত্রে বয়স নির্ধারণের জন্য জন্ম প্রত্যয়ন পত্রের প্রয়োজনীয়তা বিধান করে গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধন আইনে প্রস্তাবিত সংশোধনী যুক্ত করতে হবে। আইনগত বিষয় বিশেষতঃ উত্তরাধিকারের প্রশ্ন নিষ্পত্তিতে মৃত্যু প্রত্যয়ন-পত্রের বিধান করতে হবে।

(খ) **প্রসূতি সুবিধা সংক্রান্ত আইন ঃ** পূর্বের দুই সন্তান জীবিত থাকলে তৃতীয় সন্তান পর্যন্ত এই সুবিধা সীমিত করে প্রসূতি সুবিধা আইনকে সংশোধন করতে হবে।

(গ) **উৎসাহ দান ও নিরুৎসাহিত করণ ঃ** উৎসাহ ও নিরুৎসাহমূলক নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলোর সুপারিশ করা হচ্ছেঃ

(১) **আয়কর** ঃ সংশোধনী জারী হওয়ার পূর্বে তিন সন্তান ও সংশোধনী জারীর পর দুই সন্তান পর্যন্ত সুবিধা দানের লক্ষ্যে আয়কর আইনের ১৫ নং ধারা সংশোধন করতে হবে।

(২) **রেশন কার্ড** ঃ বিধিবদ্ধ ও সংশোধিত উভয়বিধ খাদ্য বিতরণ এলাকায় দুই সন্তান ও সর্বোচ্চ পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের মধ্যে এই সুবিধা সীমিত রাখা যেতে পারে।

(৩) **সংরক্ষণ কর** ঃ একটি বাসস্থানে (হোল্ডিং)-এ কত লোক বাস করে তার ভিত্তিতে এই কর ধার্য হওয়া উচিত।

(৪) **বিদেশে বদলী** ঃ ছোট পরিবার সম্পন্ন সরকারী কর্মচারীকে বিদেশে বদলীযোগে নিয়োগের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত।

(৫) **সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ** ঃ সকল সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোতে নিয়োগের ব্যাপারে সাধারণতঃ বিবাহিত প্রার্থী অপেক্ষা অবিবাহিত প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত।

(৬) **সরকারী বাসস্থান বরাদ্দ** ঃ সরকারী বাসস্থান বরাদ্দে বৃহৎ পরিবারের দাবী বিবেচনা না করে বরং ক্ষুদ্র পরিবারকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত।

(৭) **প্রসূতি সেবার ব্যয়** ঃ দ্বিতীয় সন্তানের পর তৃতীয় বা তৎপরবর্তী সন্তান প্রসবকালে ক্রমবর্ধমান হারে খরচ প্রদানের বিধান করা যেতে পারে এবং তদরূপ দ্বিতীয় সন্তানের পরে প্রসূতিকালীন পূর্ণ বেতনের ছুটি দেয়া রদ করা যেতে পারে।

(৮) **কতিপয় অবস্থায় চিকিৎসাভিত্তিতে গর্ভপাত দ্বারা মায়ের স্বাস্থ্য রক্ষা** ঃ শিশু বিকলাংগ হয়ে জন্ম গ্রহণের আশংকা থাকলে বা কতিপয় আর্থ-সামাজিক অবস্থায় যেমন বলাৎকার বা অবৈধ সম্পর্কের ফলে গর্ভসঞ্চার হয়ে থাকলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ডাক্তার বা চিকিৎসা-সহায়ক (প্যারা-মেডিক) দ্বারা ১৬ সপ্তাহের মধ্যে গর্ভপাতের বিধান করা যেতে পারে।

আর্থিক বরাদ্দ

১৭.৫৩ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা খাতের কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে ১৯৭৯-৮০ এর স্থিরমূল্যে ৩১০·০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই বরাদ্দের মধ্যে আনুমানিক ৩৫·০০ কোটি টাকা বহুমুখী খাতের কর্মসূচীর জন্য প্রয়োজন হবে। এই খাতের ব্যয় বরাদ্দের পর্যায়ক্রমিক বিভাজন ১৯৭৯-৮০ সালের স্থিরমূল্যে ও বর্তমান মূল্যে নিম্নের সারণীতে দেখান হল:

সারণী ১৭.৫

আর্থিক বরাদ্দের বার্ষিক পর্যায়ক্রমিক ব্যয় বিভাজন

[কোটি টাকায়]

মূল্য	১৯৮০-৮২	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫	মোট (১৯৮০—৮৫)
স্থির মূল্য	৮০·১৪	৭২·৫৮	৭৪·৮৪	৮২·৪৪	৩১০·০০
চলতি মূল্য	৮৬·৫৫	৮৫·৬৫	৯২·৮০	১০৩·০০	৩৬৮·০০

অষ্টাদশ অধ্যায়

আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো

ক—সমাজ কল্যাণ

১৮.১ সমাজ কল্যাণ কর্মসূচী এ যাবৎ ঐতিহ্যগতভাবে শারীরিক প্রতিবন্ধী বা পংগু, ভবঘুরে, নিঃস্ব ও অপরাধ প্রবণদের মত বিপন্ন শ্রেণীর মানুষের জন্যে সীমাবদ্ধ সাহায্য ও সহায়তা প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এসব সেবা মূলতঃ দান ও ত্রাণমূলক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তদুপরি সাংগঠনিক পর্যায়ের এ জাতীয় কল্যাণমূলক কর্মসূচী প্রধানতঃ শহরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। ইদানিংকালে, সমাজ কল্যাণের দৃষ্টিভংগীর আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। সমাজ কল্যাণ কর্মসূচীর চলতি দৃষ্টিভংগী কেবল যে অভাব গ্রস্তদের সরাসরি উপকার সাধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে তাই নয়, বরং সামাজিক কাঠামোর যে-সব মৌলিক উপাদান তাদের বঞ্চনা ও শোষণের জন্যে দায়ী সেগুলোর পরিবর্তন সাধনের প্রতিও যথাযথঃ গুরুত্ব আরোপ করেছে। বাংলাদেশের ন্যায় একটি উন্নয়নমুখী দেশে যেখানে নিদারুণ দারিদ্র্য, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব এবং নিম্নমানের কর্মনিয়োগ প্রভৃতি জটিল আর্থ-সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে সামাজিক কাঠামোর মূল ভিত্তিকে বিপন্ন করেছে সেখানে এ ধরণের দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

১৮.২ সমাজ কল্যাণের পরিবর্তিত দর্শনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জনসংখ্যার উপেক্ষিত অংশের অর্থপূর্ণ পুনর্বাসনের সীমা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমাজ কল্যাণ কর্মসূচীর পরিধি প্রসারিত করা হয়েছে। পংগু ও প্রতিবন্ধীদেরকে আত্মনির্ভরশীলতা কর্মসূচীর অধীনে আনয়ন করা হবে এবং ভিক্ষুক, সম্বলহীন এবং সামাজিকভাবে অবহেলিত ও বঞ্চিত জনসংখ্যার পুনর্বাসনের প্রচেষ্টা চালানো হবে। যেহেতু জনসংখ্যার বেশীরভাগ অংশই গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে, তাই গ্রামভিত্তিক কর্মসূচীর উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার পর্যালোচনা

১৮.৩ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মোট ১৩২১·৭২ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয় এবং তন্মধ্যে ১২২৭·২৫ লাখ টাকা ব্যয় হয়। দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রথম বছর ১৯৭৮/৭৯ সালে এ উপখাতে ৪৩৫·০০ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, যা থেকে ৩৮০·৭৬ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছিল। এ ব্যয় মোট বরাদ্দের ৮৮ শতাংশ। ১৯৭৯/৮০ সালে ৮৬৪·২৬ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয় এবং ৭৫৫·২৮ লাখ টাকা ব্যয় হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য

১৮.৪ দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ :—

(১) নৈতিক, সামাজিক এবং আর্থিকভাবে বিপন্ন ব্যক্তিদের আত্মনির্ভরশীল ও উৎপাদনক্ষম নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ব্যাপারে সাহায্য করা;

(২) ভূমিহীন পরিবার, শিক্ষাংগনের বাইরের শিশুদের এবং সম্বলহীন মহিলাদের সুযোগ-সুবিধা, প্রবঞ্চিত গোষ্ঠির জন্যে ব্যক্তিগত ও পেশাগত ব্যুৎপত্তির জন্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের মারফৎ উপার্জনমূলক কার্যাদিতে সক্ষম করে তোলার জন্যে ব্যাপক পল্লী উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

(৩) নগরবাসী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন কল্পে সম্প্রদায় ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

(৪) অযত্নে লালিত শিশুদের উপযোগী ও উৎপাদনক্ষম করে গড়ে তোলার জন্যে যত্ন, সুরক্ষণ ও শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা;

(৫) প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে সমাজে পুনর্বাসনের জন্যে যত্নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(৬) ভবঘুরেদের সমস্যা সমাধানের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে, ভবঘুরে ও ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনের জন্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া; এবং

(৭) স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ সংগঠনসমূহকে আর্থিক সাহায্য প্রদান।

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার কর্মকৌশল

১৮.৫ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ যত অর্থপূর্ণই হোক না কেন, ক্ষুধার্ত মানবকে তা পুনর্বাসনে উদ্বুদ্ধ করতে কার্যকর হয়নি। তাই, জাতীয় মান অনুসারে যাঁরা দারিদ্র্য সীমার নিম্নে অবস্থান করছেন তাঁদেরকে সক্রিয় নাগরিকরূপে পুনর্বাসনে অধিকতর সাহায্য গ্রহণের উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে তাঁদের জন্যে কিছু আয়ের ব্যবস্থা রাখা হবে। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে যে সকল ব্যক্তি জীবিকা নির্বাহের সংকটাপন্ন পর্যায়ে রয়েছেন তাঁদের জরিপের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হবে ও তাঁদের অবস্থান নির্ণয় করা হবে এবং অধিকতর আয়ের জন্যে তাঁদেরকে সংগঠিত ও উদ্বুদ্ধ করতে হবে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অধিকতর দক্ষতা অর্জনের জন্যে এবং স্বাবলম্বনের দ্বারা অন্যান্য মৌলিক সামাজিক প্রয়োজনীয়তা-সমূহের চাহিদা পূরণ করার ব্যবস্থা নেয়ার সম্পর্কে তাঁদেরকে সাহায্য করা হবে।

১৮.৬ লক্ষ্য করা গেছে যে, এতিমখানাও অসহায়-আশ্রমের মাধ্যমে সহায়-সম্বলহীন ও পিতৃমাতৃহীন শিশুদেরকে যে সব সাহায্য-সহায়তা প্রদান করা হয় তা সামাজিক কলংকের ছাপ বহন করে এবং ফলশ্রুতিতে এতিমখানা ও অসহায়-আশ্রমে লালিত-পালিত শিশুরা সমাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। তাই, প্রচলিত অবমাননাকর এই প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা শিশু তত্ত্বাবধানের একটি অধিকতর সম্মানজনক নতুন পন্থা দ্বারা প্রতিস্থাপন করা দরকার। এতিমখানা ও অসহায়-আশ্রমসমূহকে শিশু সদনে রূপান্তর করে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এতিমখানার ও অসহায়-আশ্রমের শিশুদেরকে এই পন্থায় পারিপার্শ্বিক সমাজ গোষ্ঠীর সাথে সমন্বিতভাবে বেড়ে ওঠায় উৎসাহিত করবে।

১৮.৭ ভিক্ষাবৃত্তি গভীর-মূল ভিত্তিক একটি আর্থ-সামাজিক সমস্যা যা সমাজ অত্যন্ত ঘৃণার সাথে দেখে। ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরে সমস্যার প্রতি সহানুভূতিশীলতা ও সমঝোতার মনোভাব নিয়ে দেশের অর্থ-নৈতিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে মোকাবেলা করতে হবে। প্রতিকারমূলক কল্যাণ, পুনর্বাসন ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদেরকে উপযোগী মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এ উদ্দেশ্যে কিছু কিছু বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ তথা পুনর্বাসন কেন্দ্র (বিশেষতঃ যে সব এলাকায় ভবঘুরে আইন বলবত রয়েছে সেখানে) স্থাপন করা হবে যেন এগুলোতে ভবঘুরেদেরকে নিজস্ব জীবিকা অর্জনের এবং সমাজের স্বাভাবিক নাগরিকরূপে পুনর্বাসিত হওয়ার লক্ষ্যে উপযুক্ত বৃত্তি বা পেশার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে।

১৮.৮ সমাজ কল্যাণের পুরো দৃষ্টিভংগী সমাজের দরিদ্র এবং সুযোগ-সুবিধাহীন জনগোষ্ঠীকে সমাজের

মূল্যবান সদস্যরূপে গড়ে তোলার ধারণার উপর ভিত্তি করেই তৈরী করা হয়েছে, দয়া মিশ্রিত সহানুভূতি সম্পন্ন মনোভাব থেকে নয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান প্রধান কর্মসূচীসমূহ

১৮·৯ **পল্লী উন্নয়ন সার্ভিস ও গোষ্ঠি ভিত্তিক উন্নয়ন :** শিক্ষালয়ের আওতাবহির্ভূত যুবশ্রেণী ও শিশু, মহিলা ও ভূমিহীনদের ন্যায় সমাজের সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠিকে সুসংগঠিত করা ও তাদের সামাজিক স্বাভাবিক ক্রিয়ামূলক, আর্থিক এবং উৎপাদনমুখী কর্মক্ষমতা সৃষ্টি ও বিকাশের জন্যে সাহায্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপসহ পল্লী ও শহরের ব্যাপক উন্নয়ন মানসপটে রেখে এই কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচীর অধীনে ৬৫টি গ্রাম্য থানা ও মহকুমা শহরে অবস্থিত আরও ১২টি গোষ্ঠি কেন্দ্র এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা ভাবনা করা হয়েছে।

১৮·১০ **শিশুদের জন্যে সেবামূলক ব্যবস্থা :** পরিকল্পনাকালে ভাসমান শিশু, দৈনাগ্রস্ত ও অভাবগ্রস্ত শিশুদের বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরী শিক্ষা প্রদানকল্পে প্রতিপালন ও আশ্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।

১৮·১১ **প্রতিবন্ধীদের জন্যে সমাজ কল্যাণ :** এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হচ্ছে, দৈহিকভাবে পঙ্গুদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং অর্থপূর্ণ পুনর্বাসন। এই কর্মসূচীর অধীনে পল্লী এলাকার চারটি থানায় শাখাসহ ইংগীতে একটি সম্মিলিত কর্মশালা ও কারখানা স্থাপন করা হবে। অন্ধ ও বধির শিশুদের সমাজে পুনঃ-প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের বৃত্তিমূলক উৎকর্ষ বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টির জন্যে বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

১৮·১২ **বহুমূত্র রোগীদের সামাজিক পুনর্বাসন ও চিকিৎসা :** এই কর্মসূচীর অধীনে ১৫০টি শাখা বিশিষ্ট বহুমূত্র ইনস্টিটিউটে চিকিৎসা ও সেবা-যত্নের ব্যবস্থা নেয়া হবে। বহুমূত্র মেলিটাসের এবং এর সাথে সম্পর্কযুক্ত রোগ থেকে আক্রান্ত প্রতিহত ও নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থাসহ বহুমূত্র রোগীদের শিক্ষা, বৃত্তি-মূলক এবং সামাজিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এ কর্মসূচীতে রয়েছে।

১৮·১৩ **ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন :** দেশ থেকে গোষ্ঠীসংগঠনের মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তি দূর করার এটি একটি নতুন ভাবধারা ও পন্থা। এই কর্মসূচীর অধীনে অসংগঠিতভাবে ভিক্ষাদানের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করে ও সুসংগঠিত দানের মাধ্যমে জনগোষ্ঠিকে তাঁদের অসমর্থ সদস্যদের দায়িত্ব গ্রহণ করাকে উৎসাহিত করে ক্রমান্বয়ে ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরের সমস্যা দূর করার প্রচেষ্টা চালানো হবে। দৈহিক সামর্থ্য সম্পন্ন ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদেরকে কার্যকর ও উপযোগী পেশায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং সমাজে পুনর্বাসিত করা হবে।

১৮·১৪ **স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহ কর্তৃক সমাজ কল্যাণমূলক সেবাদি :** বিশ্বের কোথাও সমাজ সেবা মূলক কার্যক্রম সরকারের একার দায়িত্ব নয়। এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে এবং সমাজে তাদের প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে আর্থিক সাহায্য দেয়া হবে। এই সাহায্য বিশেষভাবে যথার্থ পরামর্শ, নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রসহ দক্ষতা উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক বিকাশের কর্মসূচীতে প্রদান করা হবে।

আর্থিক ব্যয় বরাদ্দ

১৮·১৫ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সমাজ কল্যাণ উপখাতের কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্যে ১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যমান অনুসারে ৪১·০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কর্মসূচী ভিত্তিক বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা নিম্নে বিধৃত হল :

সারণী ১৮.১

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার ভৌত লক্ষ্য ও কর্মসূচী ভিত্তিক বরাদ্দ

(লক্ষ টাকায়)

কর্মসূচী	ভৌত লক্ষ্য	আর্থিক বরাদ্দ (১৯৭৯/৮০ সালের মূল্য মানে)।
১। পল্লী সমাজসেবা ও গোষ্ঠি উন্নয়ন	৬৭ একক	১৫৫১·২৬
২। শিশুদের জন্যে সমাজসেবা	১৪ একক	২০৩·২৩
৩। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের সমাজ কল্যাণ সেবা	১২ একক	৪১৩·৯৭
৪। ভিক্ষাবৃত্তি উচ্ছেদের জন্যে ভবঘুরেদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের কর্মসূচী	১৪ একক	১৯৩·৪৭
৫। অনাথ, নিঃস্ব ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্যে সমাজ-কল্যাণ সেবা।	৭০ একক	৬০০·৭৯
৬। বহুমূত্র রোগীদের সামাজিক পুনর্বাসন ও চিকিৎসা ব্যবস্থার কর্মসূচী ..	১ একক	১১৩৭·২৮
মোট ..		৪১০০·০০

সারণী ১৮.২

বরাদ্দের বৎসর ভিত্তিক পর্যায়ক্রমিক ধাপ নির্ণয়

(লক্ষ টাকায়)

	১৯৮০—৮২	১৯৮২/৮৩	১৯৮৩/৮৪	১৯৮৪/৮৫	মোট
(১) স্থির মূল্যে ..	১৪৬১·৯১	৬৪৬·৩৫	৮৭১·২৬	১১২০·৪৮	৪১০০·০০
(২) চলতি মূল্যে ..	১৭২৯·৬২	৯০৪·৯০	১৩৬৭·৮৮	১৮৯৭·৬০	৫৯০০·০০

ঘ—মহিলা বিষয়ক

১৮.১৬ সামগ্রিক জনসংখ্যার অর্ধেকই মহিলা। বাংলাদেশের মহিলাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলী বহুবিধ। ঐতিহ্যগতভাবে মহিলাগণ উন্নয়ন তৎপরতার মূল ধারার বাইরে অবস্থান করছেন। বর্তমানে তাঁরা এমন একটি সামাজিক সীমাবদ্ধতার বেড়াজালের মধ্যে আবদ্ধ যা তাঁদের সামগ্রিক জীবনকে প্রভাবিত করছে। তাঁদের নিঃস্ব অসহায় অবস্থা পরিস্থিতিকে আরও জটিলতর করে তুলছে। সামাজিক নিষেধাজ্ঞা, শিক্ষার অভাব, প্রশিক্ষণের অভাব তথা কর্মসুযোগের অভাব তাঁদেরকে পরনির্ভরশীলতার একটি প্রকট অনিশ্চয়তার ভিতর ঠেলে দিয়েছে।

১৮.১৭ জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ পুরুষ শিক্ষিতের তুলনায় মহিলা জনসংখ্যায় শিক্ষিতার হার মাত্র ১৩·৭ শতাংশ। ৭০ লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের এবং ৪০ লক্ষ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে যথাক্রমে ২৭ লাখ ও ৭ লাখ মহিলা। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবধান আরও প্রকট। মহিলাদের আয় সৃষ্টিকারী কর্মতৎপরতায় অংশ গ্রহণের ভূমিকা একই প্রকারে শোচনীয়। সর্বমোট শ্রমশক্তি ২.৫২ কোটির মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা ০·৬০ কোটি। বাংলাদেশের ন্যায় একটি সনাতনী সমাজে উন্নয়ন সমস্যাসমূহ এত ব্যাপকভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ জটিলতায় ভরা এবং পরিব্যাপ্ত যে দেশের সুষম আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে মহিলাদের পূর্ণ অংশ গ্রহণ একটি আবশ্যকীয় প্রয়োজন।

১৮.১৮ কিন্তু কিছুকাল পূর্বেও মহিলাদের কোনও বিশেষ ভূমিকার কথা ধ্যান ধারণা বহির্ভূত ছিল। যদিও প্রথম পরিকল্পনার শেষের দিকে তাঁদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্যে কিছু কর্মসূচীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, তবুও সামগ্রিক অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অর্থপূর্ণ অংশ গ্রহণের জন্যে আরও অধিকতর বেগবান ও ভিন্নমুখী কর্মসূচীর যে প্রয়োজন রয়েছে তা এখন চিন্তা-ভাবনায় এসেছে।

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ

১৮.১৯ দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ হল :

(১) উন্নয়ন তৎপরতায় ব্যাপকভাবে মহিলাদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সামাজিক মনস্তত্ত্বের একটি পারিপার্শ্বিকতা গড়ে তোলা;

(২) পরিবর্তনের অগ্রদূত হিসেবে সমাজে তাঁদের ভূমিকার স্তর ঊর্ধমুখী করার উদ্দেশ্যে শিক্ষার সুযোগসমূহ ও বিশেষ প্রশিক্ষণাদি ব্যাপকতর করা ;

(৩) দক্ষতা সৃষ্টির সুযোগাদি বৃদ্ধি ও আয় উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে মহিলাদের ব্যাপকতর অংশ গ্রহণের জন্যে কৃতিত্ব প্রদান;

(৪) শিশুদের দেখাশুনা ও রক্ষণা-বেক্ষণের অধিকতর ব্যবস্থাদি সুনিশ্চিত করা।

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার কর্মকৌশলাদি

১৮.২০ দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্যে গৃহীত কৌশলাদি :

(১) মহিলাদের জাতি গঠনমূলক তৎপরতায় অধিকতর সংখ্যায় নিয়োগের উদ্দেশ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং কর্ম বিনিয়োগ ক্ষেত্রসমূহ সম্বলিত করে একটি সম্মিলিত বহু খাত বিশিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

(২) সম্মিলিত প্রশিক্ষণ এবং উৎপাদন ভিত্তিক সকল কর্মসূচীতে স্বাক্ষরতা প্রদান, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি সম্প্রসারণ এবং আয়নির্ভরশীলতা সম্বলিত অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার অঙ্গ থাকবে।

(৩) মহিলাদের জন্যে আয় উৎপাদনকারী কর্মকাণ্ডের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে এবং মহিলাদের যে সব ঐতিহ্যগত দক্ষতা ক্ষয়িষ্ণু আর পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে নতুন প্রযুক্তি বিকাশের রূপরেখা তৈরীর কর্মসূচী প্রণয়ন করা হবে।

(৪) কর্মসূচীগুলি এরূপভাবে রূপায়িত হবে যাতে গৃহকে উৎপাদনের মৌলিক একক হিসেবে গড়ে তোলা যায় এবং এই লক্ষ্যে পরিবার ভিত্তিক বা এলাকা ভিত্তিক কুটির শিল্পের বিকাশ

হয়। শহর এবং অন্য যে সকল এলাকায় মহিলাদের জন্যে ঘরের বাইরে কর্ম সংস্থান রয়েছে সে সব জায়গায় শিশুদের জন্যে দিবা-যত্ন-কেন্দ্রসমূহ এবং কর্মজীবী মহিলাদের জন্যে হোস্টেল প্রতিষ্ঠা করা হবে।

(৫) পল্লী ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে মহিলাদের জন্যে সহজলভ্য ঋণের ব্যবস্থাদির বন্দোবস্ত করা হবে। মহিলাগণ ও মহিলা সমবায় কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ের সেবা-মূলক শিল্পের অর্থ যোগানোর জন্যে একটি বিশেষ ঋণ যোজনা চালু করা হবে।

(৬) স্থানীয় সরকার সংস্থাদি, পল্লী সমবায় কমিটি এবং বেসরকারী সংগঠনাদির মত বিশেষ প্রতি-ষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে মহিলা সংগঠনসমূহের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা হবে।

(৭) বিভিন্ন মহিলা সংগঠনগুলোর কর্মকাণ্ডের সমন্বয়ার্থে এবং মহিলাদের সার্বিক উন্নয়ন এবং তাঁদের আর্থিক ও আইনগত মর্যাদার মানোন্নয়নের জন্যে জাতীয় কৌশলনীতির রূপরেখা তৈরীর জন্যে একটি জাতীয় পরিষদ গঠন করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী

১৮.২১ মহিলাদের জন্যে দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ এবং উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ :

(১) দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো ২৫০ টিতে উন্নীত করা হবে এবং এর মধ্যে একটির বেশী কোনও জেলার ইউনিয়নে পরিচালিত হবে না। এ সকল কেন্দ্রে প্রতি বৎসর প্রায় ৩৭,৫০০ জন মহিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন এবং পরিকল্পনা কাল শেষে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের সংখ্যা ১,৮৭,৫০০তে উন্নীত হবে বলে আশা করা যায়। হাঁস-মুরগী পালন, পশুপালন ও দুগ্ধ উৎপাদন, পোশাক তৈরী করা, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবার পরিকল্পনা, পুষ্টি, মৌলিক স্বাস্থ্য রক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা এবং সমবায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা জোরদার করা হবে।

(২) দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে প্রাথমিক শিক্ষকদের ভবিষ্যৎ শূন্য পদের ৫০ শতাংশ শিক্ষিকাদের দ্বারা পুরণ করার উদ্দেশ্যে শিক্ষিকা প্রশিক্ষণের একটি অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মসূচী সংগঠন করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষকদের মহিলা কোটা পূরণ করার জন্যে পরিকল্পনাকালে প্রতিষ্ঠিত ৪৭টি প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে (পি,টি, আই) এ প্রায় ২০,০০০ শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

(৩) হাঁস-মুরগী প্রতিপালনের জন্যে এবং গবাদি ও দুগ্ধ উৎপাদনের জন্যে পল্লী মহিলাদের লাভ-জনক ভাবে নিযুক্ত করার উদ্দেশ্যে মহিলাদের পরিচালনাধীন এবং ব্যবস্থাপনাধীন একাধিক খামার প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

(৪) কর্মজীবী মহিলাদের প্রকট বাসস্থান সমস্যা বিবেচনা করে, পরিকল্পনাকালে চারটি কর্ম-জীবী মহিলাদের হোস্টেল স্থাপন করা হবে। উপরন্তু চারটি নিঃস্ব সদন এবং কর্মপ্রার্থী মহিলাদের জন্যে চারটি স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষ হোস্টেলও নির্মাণ করা হবে।

(৫) মহিলাদের মর্যাদা এবং আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে তাঁদের ভূমিকা সম্পর্কিত তথ্যাদি অত্যন্ত অপ্রতুল। সাংস্কৃতিক এবং সনাতন রীতিনীতি বিশ্বাস পদ্ধতি যা মহিলাদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রভাবান্বিত করে, তার অত্যন্ত ক্ষুদ্রাংশই বোধগম্য হয় এবং ফলশ্রুতিতে সামাজিক পদ্ধতি

সম্পর্কে তাঁদের সচেতনতাকেও প্রভাবান্বিত করে। সত্যিকারভাবে, সনাতনী সমাজের পরিবর্তন বিমুখতা পারিবারিক ব্যবস্থাকে এত কঠোরভাবে প্রভাবিত করে রেখেছে, যার কবলমুক্ত হতে মহিলা সমাজের দিকে ব্যাপকতর গবেষণা তৎপরতা প্রসারিত করতে হবে। মহিলাদের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিশেষ গবেষণা কর্মসূচীসমূহ হাতে নেয়া হবে।

(৬) মহিলাদের কর্ম সংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পোশাক তৈরী কারখানা, ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি মেরামতের দোকানাদি ইত্যাদি জাতীয় বিশেষ বিশেষ ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করা হবে। স্থাপিত শিল্প কারখানাগুলোতে মহিলাদের জন্যে কর্মসুযোগ সংরক্ষণ করা হবে।

(৭) চারটি বিভাগীয় সদর দপ্তরে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, পেশাগত নৈপুণ্য বৃদ্ধি এবং নেতৃত্ব প্রশিক্ষণের জন্যে চারটি একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হবে। মহিলাদের পেশাগত নৈপুণ্য বৃদ্ধির জন্যে প্রতিষ্ঠিত প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটসমূহের সুযোগ-সুবিধে ব্যবহার করা হবে।

১৮.২২ **শিশুদের কর্মসূচীসমূহ :** সঠিক শারীরিক ও মানসিক উন্নতি ও বিকাশ সাধনে শিশুদের সর্বনিম্ন মৌলিক চাহিদা প্রদানের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনায় পারিবারিক কল্যাণ, পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং দিবা-যত্ন সেবাশ্রম (ডে-কেয়ার সার্ভিসেস) এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এতদ্ভিন্ন স্বল্প মজুরীর কর্মজীবী মায়েদের সন্তানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে যে-সব জেলা শহরের শিল্প এলাকায় মহিলা মজুরদের সমাবেশ (আধিক্য) রয়েছে সে-সব স্থানে বিশটি দিবা-যত্ন ও দিবা-সেবাশ্রম খোলা হবে। শিশুদের দৈহিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ সাধনের জন্যে জেলা পর্যায়ে বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর একুশটি শাখা খোলা হবে।

আর্থিক বরাদ্দ

১৮.২৩ দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে এই খাতের প্রকল্পসমূহের জন্যে ২২.০০ কোটি টাকা ১৯৭৯/৮০ সালের মূল্যে) বরাদ্দ করা হয়েছে :

সারণী ১৮.৩

বরাদ্দের বৎসরওয়ারী পর্যায় ক্রমিক ধারা নির্ণয়

[লক্ষ টাকায়]

	১৯৮০—৮২	১৯৮২/৮৩	১৯৮৩/৮৪	১৯৮৪/৮৫	মোট (১৯৮০—৮৫)
(১) স্থির মূল্যে ..	৯,৫৬.৬৫	৩,৪১.১১	৪,১৫.০৩	৪,৮৭.২১	২২,০০.০০
(২) চলতি মূল্যে ..	১১,২৬.৮০	৪,৭৭.৫৬	৬,৫১.৫৯	৮,৪৪.০৫	৩১,০০.০০

গ—যুব উন্নয়ন

১৮.২৪ যুব সম্প্রদায় দেশের সর্বোৎকৃষ্ট সম্ভাবনাময় এবং কর্মোপযোগী মানব সম্পদ এবং এ শ্রেণীর জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৫—৩০ বয়োসীমার যুবকরা সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় ২৫% এবং এদের ৯০% পল্লী অঞ্চলে বসবাস করে এবং এদের বেশীর ভাগই কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হয় না অথবা উৎপাদনশীল কর্মতৎপরতায় ব্রতী হওয়ার জন্যে পেশাগত দক্ষতা অর্জনের বিশেষ কোনও

সুযোগ সুবিধে পায় না। যুব সম্প্রদায়ের একটি বিরাট অংশই দেশের উন্নয়ন ক্রিয়া কাণ্ডের মূলধারার বাইরে রয়ে গেছে। এদের মধ্যে অনেকেই নিদারুণ দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করছে। ফলে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ পশ্চাদমুখী, এবং সেদিন খুব দূরে নয় যখন তারা সমাজ ব্যবস্থার প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। অপর দিকে, যুব সম্প্রদায়ের আছে জীবনীশক্তি ও প্রাণবন্ততা; যদি সঠিকভাবে সংগঠিত এবং পরিচালিত হয় তবে তারা একটি বিরাট উৎপাদনশীল শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। যুব সম্প্রদায়ের জন্যে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, তাদের নৈতিক, দৈহিক, মানসিক, সামাজিক এবং আর্থিক বিকাশ সাধনের জন্যে সংগঠিত কর্মকাণ্ডে তাদের অংশ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া এবং সঠিক পথ নির্দেশের প্রতি সচেতন করে তোলা।

১৮.২৫ সুশৃংখল, সুবিন্যস্তভাবে সংগঠিত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন যুবক দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করতে পারে এবং তার নিজস্ব অবদান রাখতে পারে। আমাদের মত দেশে যথার্থ মূল্যবোধ এবং মানবিক দৃষ্টিভংগীর চর্চা করিয়ে জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন সাধন দ্বারা যুবশক্তির সম্ভাবনাকে আয়ত্বে এনে এবং ব্যবহার করে সুদৃঢ় অর্থনৈতিক অগ্রগতি লাভ করা যায়।

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ

১৮.২৬ দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে যুব উন্নয়ন কর্মসূচীর লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ :

(১) যুব জনসংখ্যাকে সচল করে তোলা এবং তাদের মধ্যে আত্ম পরিচয় ও আত্ম উপলব্ধির চেতনার সৃষ্টি করা যাতে তাদের নিজেদের এবং জাতীয় উন্নয়নের একীভূত পথ নির্দেশ বিদ্যমান থাকবে;

(২) যুব সম্প্রদায়কে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এবং সামাজিক সেবার জন্যে সংগঠিত করা এবং তাদের নিজ নিজ এলাকার উন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়নে জড়িত রাখা;

(৩) যুব শক্তিকে কৃষি, পশুপালন, হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্য চাষ ও সমবায়ে প্রশিক্ষণ দেয়া, যেন তারা অর্থপূর্ণ ভাবে নিজেদেরকে কর্মনিযুক্ত করতে পারে; এবং

(৪) দেশে ও বিদেশে কর্ম নিয়োগের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়কে পেশাগত বৃত্তিতে, সচিবালয় বিজ্ঞান এবং অন্যান্য দক্ষ পেশায় প্রশিক্ষণ দান করতে হবে।

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার কর্মকৌশল

১৮.২৭ উপরে বর্ণিত লক্ষ্যসমূহ অর্জন করার জন্যে নিম্নোক্ত কর্ম কৌশলাদি অনুসরণ করা হবে:

(১) দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যুব শক্তির সর্বাধিক অবদান সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগানো হবে;

(২) পল্লী খামার, হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু সম্পদ পালন এবং মৎস্যোন্নয়নে যুব শক্তিকে শরীক করা হবে;

(৩) উন্নয়ন তৎপরতায় নিয়োজিত করার জন্যে যুব সমাজকে একটি সক্রিয় শক্তিতে রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে অনানুষ্ঠানিক এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর অধিকতর নির্ভরতা স্থাপন করা হবে যেন তাদের অনুভূত প্রয়োজনীয়তা মেটানো যায়; এবং

(৪) সমস্যার মূল কেন্দ্রে আঘাত হানার জন্যে যুব উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল ভিত্তি হবে যুব সমাজকে পল্লী জীবনের সাথে পরিচিত করা।

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য কর্মসূচীসমূহ

১৮.২৮ নিম্নোক্ত কর্মসূচী তৎপরতা প্রধান ক্ষেত্রসমূহ পরিকল্পনাকালে নির্ধারণ করা হয়েছে :

(১) **যুব সম্প্রদায়ের জন্যে আর্থ-সামাজিক কর্মসূচী :** বেকার ও অর্ধ-বেকার যুবকদের জন্যে স্থানীয় কাঁচামালের উপর ভিত্তি করে এবং বাজারজাতকরণের সুবিধাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রচলিত ও অপ্রচলিত পেশা ও বৃত্তিতে প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে কর্ম নিয়োগের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা হবে। বিশেষভাবে পল্লী এলাকায় যৎসামান্য নৈপুণ্য ও প্রযুক্তির প্রয়োজন সম্বলিত কুটির শিল্পজাত উৎপাদন কর্মসূচী এবং স্বল্প মেয়াদী পরিচিতি প্রশিক্ষণ ধারা সংগঠিত করা হবে।

(২) **স্বনিযুক্ত কর্মীদের জন্যে সহায়তা কর্মসূচী :** যুব সম্প্রদায়ের জন্যে স্বনিযুক্ত কর্মে ব্যাপৃত হওয়ার সুযোগ সুবিধাও সৃষ্টি করা হবে। এই উদ্দেশ্যে যুব সম্প্রদায়ের একটি বিরাট অংশকে কৃষি কাজে পশু পালন ও হাঁস-মুরগীর খামার পরিচালনায়, মৎস্যোৎপাদনে, ট্রলার মেরামতে, বাহিক শকট মেরামতের পেশায় ও বিজলী সংশ্লিষ্ট বৃত্তিতে এবং অন্যান্য পেশায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

আর্থিক বরাদ্দ

১৮.২৯ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এই খাতের প্রকল্পসমূহের জন্যে ১৯.০০ কোটি টাকা (১৯৭৯/৮০ মূল্যমান অনুসারে) বরাদ্দ করা হয়েছে।

সারণী ১৮.৪

বরাদ্দের বৎসর ভিত্তিক পর্যায়ক্রমিক ধাপ নির্ণয়

(লক্ষ টাকায়)

	১৯৮০—৮২	১৯৮২/৮৩	১৯৮৩/৮৪	১৯৮৪/৮৫	মোট (১৯৮০—৮৫)
(১) স্থির মূল্যে ..	১১৫৩·১৪	..	৩৩৬·০০	৪১০·৮৬	১৯০০·০০
(২) চলতি মূল্যে ..	১৩৫৬·৭৬	..	৫২৭·৫২	৭১৫·৭২	২৬০০·০০

ঘ—ক্রীড়া ও সংস্কৃতিক

১৮.৩০ ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নয়ন সামগ্রিক উন্নয়নের একটি প্রয়োজনীয় অংশ, কারন একটি জাতির শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য এ' দু'টির সমন্বয়ে গঠিত। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপাদান সমূহের উন্নয়ন ভিত্তি স্থাপন করে এবং দেশের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করে। দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্রীড়া ও সংস্কৃতিতে গুনগত উন্নতি সাধন করা এবং ভৌত সুযোগ সুবিধা সমূহের বিস্তারের ব্যবস্থা করা যেন এর প্রয়োজনীয়তা মেটাতে পারে। এই উপখাতের প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনায় ৪৩.০০ কোটি টাকা (১৯৭৯-৮০ সালের মূল্যে) বরাদ্দ করা হয়েছে। এই উপখাতের বার্ষিক পর্যায় ক্রমিক বরাদ্দ নিম্নরূপ :

সারণী ১৮.৫

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার বরাদ্দের বৎসর ভিত্তিক পর্যায় ক্রমিক ধাপ

[কোটি টাকায়]

	১৯৮০—৮২	১৯৮২/৮৩	১৯৮৩/৮৪	১৯৮৪/৮৫	মোট
(১) স্থির মূল্যে	২০.৭৫	৫.৭০	৭.৫৩	৯.০২	৪৩.০০
(২) চলতি মূল্যে	২৪.২২	৫.৯৩	১১.৮২	১৫.৮৭	৫৯.৮৪

(১) ক্রীড়া

১৯৭৬—৮০ সালে অগ্রগতির পর্যালোচনা

১৮.৩১ বিশেষ দক্ষতা ও মেধা সম্পন্ন ক্রীড়াবিদ এবং এ্যাথলিটদের প্রশিক্ষণের জন্যে ক্রীড়া তৎপরতা সংগঠিত হয় কিন্তু খোলার মাঠ, সুইমিংপুল এবং জিমনাসিয়াম জাতীয় প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামোর অভাব অত্যন্ত প্রকটভাবে অনুভূত হয়। এই পরিকল্পনাকালে যে সকল ভৌত অবকাঠামো তৈরী করা হয় তন্মধ্যে ছিল সকল জেলায় এবং কিছু কিছু মহকুমায় স্টেডিয়াম উন্নয়ন, ১৩৩টি থানা বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ উন্নয়ন, হকি, বক্সিং ও ভারোত্তলনের সুযোগ সুবিধাসহ ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়াম যৌগিকের উন্নয়ন, জাতীয় ক্রীড়া প্রশিক্ষণ ও কোচিং কেন্দ্র সম্প্রসারণ, ঢাকা স্টেডিয়াম সুইমিংপুলের গ্যালারী মেরামত ও নির্মাণ, এবং ঢাকাতে একটি ক্রিকেট স্টেডিয়াম ও মহিলাদের একটি ক্রীড়া কেন্দ্র নির্মাণ। তাছাড়া চারটি আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপনসহ একটি ক্রীড়া যৌগিক স্থাপনের কথা ছিল কিন্তু এ ব্যাপারে অত্যন্ত সীমিত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এ খাতে নির্বাচিত কয়েকটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সাজ-সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়েছে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে পল্লী ভিত্তিক ক্রীড়াদি সংগঠিত করা হয়। এ ছাড়া, স্কাউট তৎপরতা বিবেচ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য সমূহ

১৮.৩২ প্রধান প্রধান লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ :

(১) ক্রীড়া তৎপরতায় অধিক সংখ্যায় পুরুষ ও মহিলাদের আকর্ষণ ও ব্যাপৃত করে রাখা ;

(২) ক্রীড়া ও খেলাধুলার মান উন্নত করা ;

(৩) এ বিষয়ে দেশের ভাবমূর্তি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে-এ ক্ষেত্রে গড়ব্য সর্বশ্রেষ্ঠ দক্ষদের সমাবেশ ঘটানো ;

(৪) ব্যয় বহুল খেলাধুলা ও বিশেষভাবে দেশের খেলাধুলাকে দেশের পল্লী জনগোষ্ঠীর মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলা ; এবং

(৫) যুবকদের অতিরিক্ত শক্তি তাদের মন ও শরীর গড়ে তোলার জন্যে ব্যবহার করা।

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার কর্মকৌশলাদি

১৮.৩৩ উপরোক্ত লক্ষ্য সমূহ অর্জনের জন্যে নিম্নোক্ত কর্মকৌশলাদি গ্রহন করা হবে:

(১) বিভিন্ন সুবকাঠামোর ব্যবস্থা করে এবং ক্রীড়ার সাজ-সরঞ্জাম বিতরণ করে ক্রীড়ার সুযোগ সুবিধাকে উন্নয়ন করা হবে।

(২) জাতীয় ক্রীড়াবিদগনকে, কোচদেরকে, আম্পায়ারদেরকে এবং অন্যান্যদেরকে নিবিড় প্রশিক্ষণ দ্বারা প্রদান করা হবে এবং কর্মশালা সমূহ সংগঠিত করা হবে।

(৩) সমগ্র দেশব্যাপী পুরুষ মহিলা এবং শিশুদের জন্যে বিভিন্ন খেলাধুলা ও ক্রীড়ার প্রতিযোগিতা সংগঠিত করা হবে।

(৪) বয়-স্কাউট ও গার্লস গাইড তৎপরতা উন্নয়নে আরও অধিক আঞ্চলী ও শিবিরের সংগঠিত করা হবে এবং এগুলোতে সদস্যভুক্তি বৃদ্ধি করা হবে।

(৫) জাতীয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের বিদ্যমান সাংগঠনিক আওতা থানা-পর্যায় পর্যন্ত বর্ধিত করা হবে এবং একে আরও শক্তিশালী করা হবে।

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসূচীসমূহ

১৮.৩৪ জাতীয়, আঞ্চলিক, জেলা, মহকুমা ও থানা পর্যায়ে যে সব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করার প্রস্তাব করা হয়েছে তার মধ্যে অন্ততঃপক্ষে এমন একটি খেলার মাঠ থাকবে যা সারাবছর ব্যাপী ফুটবল, হকি, কাবাডি, ভলিবল, এবং এথলেটিক অনুষ্ঠান সমাবেশের জন্য ব্যবহার করা যায়। জাতীয় স্টেডিয়াম যৌগিকটির আরও উন্নয়ন করা হবে। বিভাগ, জেলা এবং মহকুমা পর্যায়ে স্টেডিয়াম গড়ে তোলা হবে যাতে ক্রীড়া তৎপরতা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতাসমূহ সংগঠন করা যায়।

১৮.৩৫ রাজশাহীর শারিরীক শিক্ষা কলেজটি চালু করা হবে। জেলা পর্যায়ে জিমনাসিয়াম তৈরী করা হবে। ক্রীড়া জগতে পারদর্শীদের চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে ৭টি নির্বাচিত খেলায় বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। খেলাধুলা ও ক্রীড়ায় উৎকৃষ্টমানে পৌছানোর লক্ষ্যে কোচদের ও জাতীয় দলগুলির খেলোয়াড়দের জন্য প্রশিক্ষণের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে এবং সেমিনার/কর্মশালা সংগঠন করা হবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে খেলার সাজ-সরঞ্জাম দেয়া হবে। বয়-স্কাউট ও গার্লস গাইডদের উন্নয়ন তৎপরতার জন্যে একটি কর্মসূচী গ্রহন করা হবে। বয়-স্কাউটদের জন্যে একটি বহুতল অট্টালিকা নির্মাণ কাজ দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সম্পন্ন হবে। আভ্যন্তরীন ক্রীড়াদির অনুশীলনের জন্যে সুযোগ সুবিধা সারা বৎসর ব্যাপী থাকা প্রয়োজন এবং ঢাকায় এ জন্যে একটি আভ্যন্তরিন স্টেডিয়াম নির্মান করা হবে। আঙ্গিনা টেনিস যৌগিক, স্কোয়াশ যৌগিক, জাতীয় স্টেডিয়াম যৌগিক উন্নয়নের জন্যে একটি কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে এবং জাতীয় ক্রীড়া প্রশিক্ষণ এবংকোচিং কেন্দ্র (এনএসটিসি) অট্টালিকার সম্প্রসারণ করা হবে।

আর্থিক বরাদ্দ

১৮.৩৬ এই লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্যে এবং উপরে বিবৃত কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়নের জন্য এই পরিকল্পণায় ২৪.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

(২) সংস্কৃতি

অগ্রগতি পর্যালোচনা ১৯৭৩—৮০

১৮.৩৭ ক. **পাঠাগার উন্নয়ন :** ঢাকায় কেন্দ্রীয় গণ-গ্রন্থাগার ও রাজশাহী গণ-গ্রন্থাগারের কাজ এ সময়ে সম্পন্ন হয়। পনেরটি বেসরকারী গ্রন্থাগারের আংশিক উন্নয়ন করা হয়। ঢাকায় জাতীয় গ্রন্থাগারের কাজের বিশেষ অগ্রগতি হয়নি। গ্রন্থাগার প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটটি যা প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে স্থাপিত হয়েছিল তা চালু রয়েছে।

১৮.৩৭ খ. **প্রকাশনা ও সাংস্কৃতিক তৎপরতা :** বাংলা একাডেমী বেশ কিছু সংখ্যক পুস্তক সাময়িকী এবং পত্রিকা প্রকাশ করেছে। শিল্পকলা একাডেমীর যাত্রা (অপেরা) এবং দেশীয় গান ও বাজনা পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সোনারগাঁও-এ একটি লোক শিল্প ও কারুশিল্প প্রতিষ্ঠান (ফক আর্টস ও ক্রাফটস্ ফাউণ্ডেশন) প্রতিষ্ঠা করা হয়, এ বিষয়ের উপর সেমিনার সংগঠন ও প্রতিনিধি বিনিময় করা হয় এবং বেশ কয়েকটি লোকশিল্পের ও সংস্কৃতির নিদর্শন যোগাড় করা হয়। আমাদের জাতীয় নেতৃবর্গের স্মৃতি সংরক্ষনার্থে একটি স্মৃতি সৌধ নির্মান শুরু হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ

১৮.৩৮ দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার বিবেচ্য প্রধান প্রধান লক্ষ্য নিম্নরূপ :

(১) উচ্চতর শিক্ষার জন্য বাংলা পুস্তকাদি তৈরী ও প্রকাশনার উপর বিশেষ গুরুত্ব সহ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করা ;

(২) গ্রন্থাগার সেবা দেশের সর্বত্র সম্প্রসারন করা ;

(৩) দেশের চারুকলা ও অভিনয় শিল্প (পারফর্মিং আর্টস্) উন্নয়ন ও পৃষ্ঠপোষকতা ; এবং

(৪) জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং জাতীয় নেতৃবর্গের স্মৃতি সংরক্ষণ।

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার কর্মকৌশল

১৮.৩৯ উপরে বর্ণিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত কর্মকৌশল অবলম্বন করা হবে :

(১) বাংলা একাডেমীর স্বাভাবিক কর্মধারার অতিরিক্ত হিসেবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আরও উন্নতি সাধনের জন্যে প্রয়োজনীয় পৃথক প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাদি রাখা হবে ;

(২) জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা, মহকুমা ও থানা পর্যায়ে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হবে।

(৩) জাতীয় ও আঞ্চলিক সংস্কৃতি তুলে ধরার জন্যে এবং জাতীয় কলাকুশলী দল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিল্প কলা একাডেমী এবং অভিনয় শিল্প একাডেমী (পারফর্মিং আর্টস্ একাডেমী) বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অঙ্গনে কর্মসূচী সংগঠন করবে।

(৪) জাতীয় যাদুঘর নির্মান সম্পন্ন হবে এবং জাতীয় ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য যাদুঘরে রাখার মত দ্রব্যাদি ও নিদর্শনাদি আহরণ করা হবে।

(৫) প্রয়াত জাতীয় নেতৃবর্গের জন্যে স্মৃতিসৌধ নির্মান করা হবে।

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসূচী

১৮·৪০ দ্বিতীয় পরিকল্পনার সাংস্কৃতিক কর্মসূচীতে নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান অঙ্গ থাকবে :

(১) **ভাষা ও সাহিত্য :** বাংলা সাহিত্যের আরও উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে প্রাথ প্রতিষ্ঠানিক সুযোগ সুবিধাদি যুক্তিযুক্ত করা হবে এবং অতিরিক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। বাংলা একাডেমীর দায়িত্ব হবে :

(ক) বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে গবেষণা, প্রকাশনা, সংকলন ইত্যাদি এবং ;

(খ) উচ্চতর শিক্ষার জন্যে বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুতকরণ; উৎপাদন ও বিতরণ। সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রে পুস্তক ব্যবসায়ের প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় সাধনের কাজ পুস্তকাদির পৃষ্ঠপোষকতার কাজে নিয়োজিত জাতীয় পুস্তক কেন্দ্রের হাতে থাকবে। এ সংগঠনটি শেষ পর্যন্ত একটি অর্থনৈতিক ভাবে স্বয়ম্ভর প্রতিষ্ঠানে পরিনত হবে।

(২) **গ্রন্থাগার ও মহাফেজখানা :** এই কর্মসূচীর অধীনে থাকবে ঢাকায় কেন্দ্রীয় গন-গ্রন্থাগার বিভাগীয় গ্রন্থাগার সমূহ, নির্বাচিত জেলা, মহকুমা, ও থানা পর্যায়ের গ্রন্থাগার সমূহ উন্নয়ন এবং গ্রন্থাগারিকদের জন্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং সকল গ্রন্থাগারের জন্যে পুস্তক। দেশের সর্ব বৃহৎ পুস্তক ও সাময়িকীর ভাণ্ডার হিসেবে জাতীয় গ্রন্থাগারকে উন্নীত করা হবে। ইহা গ্রন্থাগার বিষয়ক কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে উঠবে। জাতীয় গ্রন্থাগার এবং জাতীয় মহাফেজখানা জনজ তথ্যী সংগঠন হিসেবে সাধারন সুযোগ-সুবিধার অংশীদার হবে।

(৩) **চারুকলা ও অভিনয় শিল্প :** ক্রীড়া ও সাংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগ শিল্প কলা একাডেমীর বর্তমান অবস্থানে একটি কমপ্লেক্স নির্মানের পরিকল্পনা প্রণ্ডত করবে। এ যৌগিকে বাংলাদেশ শিল্প কলা একাডেমী (যার সাথে অভিনয় শিল্পের জাতীয় একাডেমী একীভূত করা হবে), শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন যাদুঘর এবং নজরুল ইনস্টিটিউট অবস্থিত হবে। শিল্প কলা একাডেমী কলা ও সাংস্কৃতি বেড়ে ওঠার ব্যাপারে উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করবে। একাডেমী জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত আঞ্চলিক শিল্প কলা পরিষদের উন্নতি বর্ধনের কার্যক্রম গ্রহণ করবে এবং প্রতিযোগিতা সংগঠনের কর্মসূচী গ্রহণ করবে, বিশেষভাবে পল্লী অঞ্চলের জনপ্রিয় চারু কলা ক্ষেত্রে। নজরুল ভবনটি নজরুল ইনস্টিটিউট হিসেবে নামাঙ্কিত হবে এবং নজরুল গীতি এবং তাঁর অন্যান্য কার্যাবলী সংরক্ষণ এবং সেগুলোর উপর গবেষনা চালানোর জন্যে দৃঢ়-সংকল্পবদ্ধ প্রচেষ্টা চালান হবে।

(৪) **যাদুঘর ও পবিত্র স্থান সমূহের উন্নয়ন :** উত্তরাধিকারসূত্রে বাংলাদেশ যে সাংস্কৃতিক সম্পদসমূহের প্রাচুর্য পেয়েছে তা সংরক্ষণ করা অত্যাবশ্যক। ঢাকার জাতীয় যাদুঘর নির্মান সম্পন্ন করা যাদুঘরের জন্যে নিদর্শনাদি যোগাড় করা এবং লোক চারুকলা ও কারুকলা শিল্প প্রতিষ্ঠান (ফোক আর্টস্ ও ক্রাফট্স্ ফাউণ্ডেশন) উন্নয়নের জন্যে কর্মসূচী গ্রহন করা হবে প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর পরিদপ্তর দেশের যে সকল সম্পদ পাওয়া গেছে বা পাওয়া যাবে তার সংরক্ষণ অব্যাহত রাখবে। কর্মসূচীতে থাকবে প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান ও পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনাবলীর জরিপ, প্রত্নতাত্ত্বিক পরীক্ষাগার উন্নয়ন, প্রত্নতাত্ত্বিক পুরাতন স্মৃতি সৌধাদির মেরামত এবং যে সকল জাতীর নেতৃবৃন্দের সমাধির উপর স্মৃতি সৌধ নির্মান শুরু হয়েছিল তা সম্পন্ন করা।

আর্থিক বরাদ্দ

১৮·৪১ দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় সংস্কৃতি উপখাতের লক্ষ্য অর্জনের এবং কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্যে ১৯/০০ কোটি টাকা (১৯৭৯ ৮০ সালের মূল্যে) বরাদ্দ করা হয়েছে।

৬-গণযোগাযোগ মাধ্যম

১৮.৪২ প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের এবং উন্নয়ন পদ্ধতির ব্যাপকতার সাথে সাথে জাতীয় গণসংযোগ যথা বেতার ও টেলিভিশন মাধ্যমসমূহ জনসাধারণ এবং সরকারের মধ্যে টি,ভি, ও বেতার প্রচার সূচীর মাধ্যমে এবং তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য প্রকল্পের মারফৎ একটি কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনের ব্যাপারে বৃহত্তর ভূমিকা পালন করবে।

পর্যালোচনা (১৯৭৩—৮০)

১৮.৪৩ **টেলিভিশন:** টেলিভিশন জনসাধারণকে জাতি গঠনমূলক কার্যকলাপে উদ্বুদ্ধ করার একটি সর্বশ্রেষ্ঠ গণসংযোগ মাধ্যম এবং তৎসহ অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারেরও এর মাধ্যম, পরিকল্পিত কর্মসূচীতে রয়েছে ঢাকা কেন্দ্রীয় প্রচার ভবনের সুযোগ সুবিধাদি বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশকে টিভি প্রদর্শনীর আওতাভুক্ত করার উদ্দেশ্যে নাটোর, সিলেট, চট্টগ্রাম ও খুলনায় চারটি সম্প্রচার কেন্দ্র স্থাপন। প্রথম পরিকল্পনাকালে ঢাকা কেন্দ্রীয় প্রচার ভবন যা ঢাকা উন্নয়ন ট্রাষ্ট ভবনে ছিল তা ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রামপুরায় নবনির্মিত টি,ভি, প্রচার ভবনে স্থানান্তরিত হয় এবং নাটোর, চট্টগ্রাম, সিলেট ও খুলনায় অবস্থিত চারটি সম্প্রচার কেন্দ্রই চালু করা হয়। দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনাধীনে রংপুর ও নয়নসিংহের প্রচার কেন্দ্রদ্বয় চালু করা হয় এবং এর ফলে প্রচারের আওতাভুক্ত জনসংখ্যা ৮৫ শতাংশে উন্নীত হয়। এতদ্ভিন্ন, "রামপুরায় ঢাকা টেলিভিশন" প্রকল্পের সকল আনুষংগিক কার্যাদি প্রায় সম্পন্ন হয় এবং পল্লী উন্নয়ন ভিত্তিক বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রচারসূচী প্রস্তুতকরণ ও সম্প্রচারের জন্যে বিদ্যমান ঢাকা কেন্দ্রীয় টেলিভিশন ভবনে দ্বিতীয় প্রচার মাধ্যমটি (চ্যানেল) স্থাপনের প্রকল্পটি আংশিক সম্পন্ন হয়।

১৮.৪৪ **বেতার:** প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে রেডিও বাংলাদেশের ঢাকা জেলার নয়ারহাটে অবস্থিত ১০০০ কিলোওয়াট মাধ্যম তরঙ্গ প্রেরক যন্ত্র এবং খুলনায় অবস্থিত ১০ কিলোওয়াট মধ্যম তরঙ্গ প্রেরক যন্ত্র চালু করা হয় এবং ফলশ্রুতিতে ১৯৭২/৭৩ সালের ৩৫৫.৫ কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন প্রেরণ ক্ষমতা ১৯৭৭/৭৮ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৬৫.৫ কিলোওয়াটে উন্নীত হয়। দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনাধীন সিলেটে একটি ২০ কিলোওয়াট মধ্যম তরঙ্গ প্রেরক যন্ত্র স্থাপন করে প্রেরণ ক্ষমতা ১৩৬৫.৫ কিলোওয়াট থেকে ১৩৮০ কিলোওয়াট উন্নীত করা হয় (ঢাকার মীরপুরে অবস্থিত ৫ কিলোওয়াট মধ্যম তরঙ্গ প্রেরক যন্ত্রের প্রতিস্থাপন হিসেবের অন্তর্ভুক্ত নয়)। ১৯৭৭/৭৮ সালে সারা দেশে ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেটেড প্রেরক যন্ত্র ছিল ৯টি এবং মোট ১৩.৫ কিলোওয়াট ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ছিল এবং তা ১৯৭৯/৮০ সালে মোট ১৩.৮ কিলোওয়াট ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ১১টি প্রেরক যন্ত্রে উন্নীত হয়। বিশদ বিবরণ পরিশিষ্ট সারণী ১৮.১-এ প্রদত্ত হোল।

১৮.৪৫ **গণসংযোগ:** টি,ভি, ও বেতার সম্প্রচারের মাধ্যমে গণসংযোগ স্থাপনের জন্যে ১,২১০টি টেলিভিশন সেট (৬১০টি বিনামূল্যে এবং ৫৯৫টি ৫০ শতাংশ ভর্তুকী দরে) এবং ৪,৫০০টি বেতার সেট (বিনামূল্যে) প্রথম পরিকল্পনাকালে বিতরণ করা হয়। দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনাকালে আরও ৪,৩৪০টি টি,ভি, সেট বিতরণ করা হয় (৮০০টি সেট বিনামূল্যে এবং বাকী ৩,৫৪০টি সেট ৫০ শতাংশ ভর্তুকী দরে)।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ

১৮.৪৬ **বাংলাদেশ টেলিভিশন:** বাংলাদেশ টেলিভিশনের ৭টি কেন্দ্র আছে। তন্মধ্যে ঢাকা মূল কেন্দ্র এবং নাটোর, সিলেট, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর এবং নয়নসিংহ মিলিয়ে মোট ৬টি সম্প্রচার কেন্দ্র। কেন্দ্রগুলি দেশের ৮৫ শতাংশ জনসংখ্যা সম্প্রচারের আওতাধীন করেছে। ১০০ শতাংশ জনসংখ্যা আওতাভুক্ত করা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আরও পাঁচটি পূর্ণসম্প্রচার কেন্দ্র স্থাপনের কর্মসূচী

অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ১৯৮০/৮১ সালে পল্লী উন্নয়নমুখী বিশেষ ধরণের প্রচারসূচীসমূহ, যথা প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন, পরিবার পরিকল্পনা, আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক এবং বয়স্ক শিক্ষা এবং খামার বিষয়ক সম্প্রচার বিদ্যমান ঢাকা কেন্দ্রীয় টেলিভিশন ভবনের দ্বিতীয় মাধ্যম (চ্যানেল) পর্যায়-১ এর মারফৎ শুরু হয় এবং ষ্টুডিও নির্মাণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল কার্যাদি (পর্যায়-২) দ্বিতীয় পরিকল্পনা মেয়াদে সম্পন্ন হবে। রঙ্গীন সম্প্রচার উপস্থাপন এবং পুরোনো ও ক্ষয়ে যাওয়া টি,ভি, যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান এ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বর্তমান অবস্থা এবং প্রস্তাবিত লক্ষ্যসমূহের বিশদ বিবরণ পরিশিষ্ট সারণী ১৮.২-এ বর্ণিত হোল।

১৮'৪৭ **রেডিও বাংলাদেশ:** বর্তমান মোট ১,১৬৩ কিলোওয়াট প্রেরণ ক্ষমতাসম্পন্ন ৯টি মধ্যম তরঙ্গ প্রেরক যন্ত্র রয়েছে (বিশদ বিবরণ পরিশিষ্ট সারণী ১৮'৩-এ দেখান হোল)। এ দ্বারা ৮০ শতাংশ জনসংখ্যার নিকট প্রথম শ্রেণীর সংকেত প্রেরণ করা যায়। রাত্রিকালীন সময়ে সম্প্রচার আওতা আয়ন মণ্ডলের তারতম্যহেতু, মুক্তিকার বহন যোগ্যতাহেতু, সম মাধ্যমের প্রতিবন্ধকতার দরুন, প্রতিবেশী দেশ সমূহের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সম্প্রচার হেতু লক্ষণীয়ভাবে সংকুচিত হয়ে আসে। এ অবস্থার উন্নতিকল্পে এবং সমগ্র জনসংখ্যার নিকট একটি প্রথম শ্রেণীর সংকেত সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে তিনটি মধ্যম তরঙ্গ প্রেরক যন্ত্র যথা খুলনায় ১০০ কিলোওয়াট, বগুড়ায় ১০০ কিলোওয়াট, রংপুর ২০ কিলোওয়াট মধ্যম তরঙ্গ এবং চারটি স্বল্প শক্তিসম্পন্ন মধ্যম তরঙ্গ প্রেরক যন্ত্র বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হয়। স্বল্প শক্তিসম্পন্ন প্রেরক যন্ত্রগুলো স্থানীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত হবে। এইরূপে দেশে সর্বমোট মধ্যম তরঙ্গ প্রেরণ ক্ষমতা সাতটি স্থানের ৯টি প্রেরক যন্ত্র যার মোট ধারণ ক্ষমতা ১৯৭৯/৮০ ছিল ১,১৬৩ কিলোওয়াট, তা থেকে ১৯৮৪/৮৫-এ মোট ধারণ ক্ষমতা ১,৪১২ কিলোওয়াট সম্পন্ন ১০টি প্রচার কেন্দ্রে ১৪টি প্রেরক যন্ত্রে উন্নীত হবে। বর্তমানে ৪টি ক্ষুদ্র তরঙ্গ প্রেরক যন্ত্র, যার ধারণ ক্ষমতা ২১৭·৫ কিলোওয়াট (প্রতিটি ১০০ কিলোওয়াট সম্পন্ন মোট দুইটি সাভারে, নীলফামারীতে একটি ১০ কিলোওয়াট ও অপরটি ৭·৫ কিলোওয়াট), চালু রয়েছে এবং দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে প্রত্যেকটি ২৫০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি ক্ষুদ্র তরঙ্গ প্রেরক যন্ত্র স্থাপন করা হবে এবং এইভাবে মোট ক্ষুদ্র তরঙ্গ প্রেরক যন্ত্রের সংখ্যা ৬-এ উন্নীত হবে এবং এর মোট ধারণ ক্ষমতা হবে ৭১৭·৫ কিলোওয়াট। পরিশিষ্ট সারণী ১৮.৩-এ বর্তমানে অবস্থা এবং পরিকল্পিত লক্ষ্য বিশদভাবে বিধৃত হোল। বর্তমানে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট ও খুলনায় পাঁচটি সম্প্রচার ভবন রয়েছে। রংপুর ও বগুড়ার নতুন সম্প্রচার ভবন এবং ঢাকার জাতীয় সম্প্রচার ভবন এই পরিকল্পনা মেয়াদে প্রতিষ্ঠিত হবে।

১৮'৪৮ **গণ-সংযোগ পরিদফতর:** এই সংস্থার অধীনে কর্মসূচীতে রয়েছে (ক) প্রাথমিক স্তরের স্থানীয় সরকারের নিকট এবং অন্যান্য যে-সকল সংগঠন সমাজের বিভিন্ন স্তরে উন্নয়ন কর্মতৎপরতায় নিয়োজিত রয়েছে তাদের মধ্যে ভর্তুকি প্রদত্ত টি,ভি, সেট বিতরণ। টি,ভি, বিতরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা এবং জনসাধারণকে সকল প্রকার জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে অনুপ্রাণিত করা। এ কর্মসূচী বিনোদন ও শিক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে, বিশেষ করে কৃষি, পুষ্টি, স্বাস্থ্যরক্ষা এবং পরিবার পরিকল্পনার সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁদেরকে ধারণা দেবে যেন তাঁরা তা সঠিক প্রয়োগ করতে পারেন। দূর থেকে শিক্ষা গ্রহণের পদ্ধতিতেও টেলিভিশন একটি প্রধান ভূমিকা নিতে পারে। এ উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে পরিকল্পনা মেয়াদে ৩৪,৭০০টি টেলিভিশন সেট বিতরণের একটি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

১৮'৪৯ **তথ্য মন্ত্রণালয়:** বেতার ও টেলিভিশন এই উভয় বিভাগের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্যে ঢাকায় একটি সম্মিলিত প্রশিক্ষণ একাডেমী স্থাপন সম্পন্ন করা হবে। এই পরিকল্পনাকালে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের দলিল সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ সম্পন্ন করা হবে। তদুপরি, পরিকল্পনাকালে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা পরিদফতর, গণ মাধ্যম তথ্য পরিদফতর (পি,আই,ডি), চলচ্চিত্র ইন্সটিটিউট ও মহাফেজখানা,

চলচ্চিত্র নির্বাচন পর্ষৎ (ফিল্ম সেন্সর বোর্ড), বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বি,এস,এস,) এবং বাংলাদেশের সাংবাদিকতা ইন্সটিটিউট (পি,আই,বি,) সম্প্রসারণ করা হবে এবং এদের শক্তি বৃদ্ধি করা হবে।

আর্থিক ব্যয় বরাদ্দ

১৮·৫০ এই উপখাতে সর্বমোট বরাদ্দ ৭৭.০০ কোটি টাকা (১৯৭৯/৮০ সনের মূল্যে)। স্থির এবং চলতিমূল্যে এই বরাদ্দের বৎসর ওয়ারী পর্যায়ক্রমিক ধাপ নিম্নরূপ:

সারণী ১৮·৬

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় বার্ষিক পর্যায়ক্রমিক ধাপ নির্ণয়।

(কোটি টাকায়)

	১৯৮০—৮২	১৯৮২/৮৩	১৯৮৩/৮৪	১৯৮৪/৮৫	মোট
(১) স্থির মূল্যে ..	৪১·৩৪	১৭·৩০	৭·৫৭	১০·৭৫	৭৭·০০
(২) চলতি মূল্যে ..	৪৯·২৬	২৪·২২	১১·৮৭	১৮·৮১	১০৪·১৬

পরিশিষ্ট ১৮'১

রেডিও বাংলাদেশ

বেতার প্রেরক যন্ত্রের ১৯৭৯/৮০ পর্যন্ত অবস্থা

	১৯৭২/৭৩ সালের অবস্থা (কিলোওয়াট)	১৯৭৭/৭৮ সালের অবস্থা (কিলোওয়াট)	১৯৭৯/৮০ সালের অবস্থা (কিলোওয়াট)
মধ্যম তরংগ :			
সরাবগাছের মধ্যম তরংগ প্রেরক যন্ত্র (১টি)	..	১০০০	১০০০
সাতারের মধ্যম তরংগ প্রেরক যন্ত্র (১টি)	১০০	১০০	১০০
নীলফামারীর মধ্যম তরংগ প্রেরক যন্ত্র (১টি)	৫	৫	২ (প্রত্যাহারিত)
প্রতিটি ১০ কিলোওয়াটের মধ্যম তরংগ প্রেরক যন্ত্র (৩টি)	৩০ (চট্টগ্রাম, রংপুর ও রাজশাহী)	৩০ (খুলনায় ১০ কিলোওয়াটসহ)	৩০
খুলনার মধ্যম তরংগ প্রেরক যন্ত্র (১টি)	১	১১* (*১ কিলোওয়াট রাংগামাটিতে স্থানান্তরিত)	১০
সিলেটের মধ্যম তরংগ প্রেরক যন্ত্র (১টি)	২	২* (*নীলফামারীতে স্থানান্তরিত)	১০ (নতুন)
রাংগামাটির মধ্যম তরংগ প্রেরক যন্ত্র (১টি)	..	..	১
মোট মধ্যম তরংগ :	১০৮ কিলোওয়াট (৭টি প্রেরক যন্ত্র)	১১৪৮ কিলোওয়াট (৯টি প্রেরক যন্ত্র)	১১৬৩ কিলোওয়াট (৯টি প্রেরক যন্ত্র)
ক্ষুদ্র তরংগ :			
সাতারের প্রতিটি ১০০ কিলোওয়াট বিশিষ্ট ক্ষুদ্র তরংগ প্রেরক যন্ত্র (২টি)	২০০	২০০	২০০
নীলফামারীর ক্ষুদ্র তরংগ প্রেরক যন্ত্র (১টি)	১০	১০	১০
নীলফামারীর ক্ষুদ্র তরংগ প্রেরক যন্ত্র (১টি)	৭'৫	৭'৫	৭'৫
মোট ক্ষুদ্র তরংগ :	২১৭'৫ কিলোওয়াট (৪টি প্রেরক যন্ত্র)	২১৭'৫ কিলোওয়াট (৪টি প্রেরক যন্ত্র)	২১৭'৫ কিলোওয়াট (৪টি প্রেরক যন্ত্র)
মোট বাহক ক্ষমতা :	৩৫৫'৫ কিলোওয়াট (১১টি প্রেরক যন্ত্র)	১,৩৬৫'৫ কিলোওয়াট (১৩টি প্রেরক যন্ত্র)	১,৩৮০'৫ কিলোওয়াট (১৩টি প্রেরক যন্ত্র)
এফ, এম, প্রেরক যন্ত্র	..	১৩'৫ কিলোওয়াট (৯টি প্রেরক যন্ত্র)	১৩'৮ কিলোওয়াট (১১টি প্রেরক যন্ত্র)

পরিশিষ্ট ১৮·২

বাংলাদেশ টেলিভিশন

টিভির বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত সুযোগ-সুবিধাদি

ক্রম	১৯৭৭/৭৮ এর অবস্থা	১৯৭৯/৮০ এর অবস্থা	প্রস্তাবিত লক্ষ্য ১৯৮৩ —৮৫	১৯৮৪/৮৫ এর প্রস্তাবিত অবস্থা
১। মূল প্রেষণ কেন্দ্র (প্রযোজনা সুবিধাদি)	১ (রামপুরার একটি চ্যানেল)	১+১ (দ্বিতীয় চ্যানেলের প্রথম পর্যায় চালু হওয়ায়)	ঢাকার দ্বিতীয় চ্যানেলের দ্বিতীয় পর্যায়	২টি চ্যানেল সমাপ্ত
২। সম্প্রচার ও পুনঃপ্রচার কেন্দ্র সমূহ	৬ (নাটোর, সিলেট চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও ময়মনসিংহ)	৬	১টি সম্প্রচার কেন্দ্র ও ৫টি পুনঃপ্রচার কেন্দ্র	১২
৩। দ্বিতীয় চ্যানেল প্রচার সুবিধাদি	..	(ঢাকার চলতি কেন্দ্র)	..	১
৪। টিভির আওতা (জনসংখ্যার %)	৮০%	৮৫%	৯৫%	১০০%

পরিশিষ্ট ১৮ ও

রেডিও বাংলাদেশ

বিদ্যমান প্রেরক যন্ত্র এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা

স্থান	১৯৭৭/৭৮ এর অবস্থা		১৯৭৯/৮০ এর অবস্থা		১৯৮০-৮৫ এর লক্ষ্যমাত্রা		১৯৮৪/৮৫ এর অবস্থা	
	প্রেরক যন্ত্রের সংখ্যা	ক্ষমতা (কিলো-ওয়াট)	প্রেরক যন্ত্রের সংখ্যা	ক্ষমতা (কিলো-ওয়াট)	প্রেরক যন্ত্রের সংখ্যা	ক্ষমতা (কিলো-ওয়াট)	প্রেরক যন্ত্রের সংখ্যা	ক্ষমতা (কিলো-ওয়াট)
মধ্যম তরংগ								
(১) নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা ..	১	১০০০	১	১০০০	..	..	১	১০০০
(২) সাভার, ঢাকা ..	১	১০০	১	১০০	..	..	১	১০০
(৩) মীরপুর, ঢাকা ..	১	৫	১	২	..	..	১	২
(৪) চট্টগ্রাম ..	১	১০	১	১০	..	..	১	১০
(৫) খুলনা ..	২	১১	১	১০	১	১০০	২	১১০
(৬) রাজশাহী ..	১	১০	১	১০	..	..	১	১০
(৭) রংপুর ..	১	১০	১	১০*	১	২০	১	২০
(৮) সিলেট ..	১	২*	১	২০	..	..	১	২০
	(*চাকায় স্থানান্তরিত)							
(৯) পার্বত্য চট্টগ্রাম	..	..	১	১*	১	১০	১	১০
			(*খুলনা থেকে স্থানান্তরিত)					
(১০) বগুড়া	..	..	..	..	১	১০০	১	১০০
(১১) কুমিল্লা	..	..	..	..	১	১০	১	১০
(১২) ঠাকুরগাঁও	..	..	..	..	১	১০	১	১০
(১৩) কক্সবাজার	..	..	..	..	১	১০	১	১০
মোট মধ্যম তরংগ ..	৯ (৬টি কেন্দ্র)	১১৪৮	৯ (৭টি কেন্দ্র)	১১৬৩	৭ (৭টি কেন্দ্র)	২৬০	১৪ (১০টি কেন্দ্র)	১৪১২

স্থান	১৯৭৭/৭৮ এর অবস্থা		১৯৭৯/৮০ এর অবস্থা		১৯৮০/৮৫ এর লক্ষ্যমাত্রা		১৯৮৪-৮৫ এর অবস্থা	
	প্রেরক যন্ত্রের সংখ্যা	ক্ষমতা (কিলো-ওয়াট)	প্রেরক যন্ত্রের সংখ্যা	ক্ষমতা (কিলো-ওয়াট)	প্রেরক যন্ত্রের সংখ্যা	ক্ষমতা (কিলো-ওয়াট)	প্রেরক যন্ত্রের সংখ্যা	ক্ষমতা (কিলো-ওয়াট)
ক্ষুদ্র তরংগ :								
গাজীপুর, ঢাকা	২	২০০	২	২০০	..	..	২	২০০
শ্রীপুর, ঢাকা	২	১৭.৫	২	১৭.৫	..	..	২	১৭.৫
কুষ্টিয়াপুর, ঢাকা	..	..	..	..	২	৫০০	২	৫০০
মোট ক্ষুদ্র তরংগ	৪	২১৭.৫	৪	২১৭.৫	২	৫০০	৬	৭১৭.৫
সর্বমোট (মধ্যম তরংগ ও ক্ষুদ্র তরংগ)	১৩	১৩৬৫.৫	১৩	১৩৮০.৫	৯	৭৬০	২০	২১২৯.৫
এক এম ট্রান্সমিটার সংখ্যা	৯	১৩.৫	১১	১৩.৮	৪	০.৬	১৫	১৪.৪
প্রচার ভবন (সংখ্যা)		৩ (ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম)		৫ (খুলনা, সিলেটসহ)		২ (রংপুর ও ঢাকা জাতীয় প্রচার ভবন)		৭

*১০ কিলোওয়াট রংপুরে, এক কিলোওয়াট রাংগামাটিতে ১৯৮০—৮৫ এর মধ্যে অকেজো হয়ে যাবে।

উনবিংশ অধ্যায়

জনশক্তি ও শ্রম

১৯.১ কারিগরী দক্ষতা বিকাশ ও তার সর্বাধিক ব্যবহার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও আয় সৃষ্টির অন্যতম মৌলিক উপাদান। উন্নয়ন ক্ষেত্রে সমপরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে কর্ম সংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি। তৎসত্ত্বেও প্রক্রিয়ায় এরূপ সুযোগ ক্রমবর্ধমানভাবে গভীরতর ও ব্যাপকতর মানের দক্ষতার উপর নির্ভরশীল। লাভ জনক কর্মনিয়োগে ব্যাপৃত হয়ে জনসাধারণ তাঁদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করে প্রবৃদ্ধির এই সুফল ভোগের পথে প্রবেশ করতে পারেন। কর্মসংস্থানের যে সব সুযোগ বর্তমানে দেশের বাইরে থেকে পাওয়া যাচ্ছে তা আমাদের দেশের বাণিজ্য বিনিময় লেনদেনের জাতীয় ভারসাম্যের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। তদুপরি, সংগঠিত খাতে শ্রম উৎপাদন এবং কর্ম সম্পাদনের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য বিষয়ও আছে। এগুলো পেশাগত স্বাস্থ্যবিধি এবং নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও শান্তিবিনোদন মূলক সুযোগ সুবিধাদি, কাজের পরিবেশ এবং শ্রম সম্পর্ক বিষয়ক। এ সবই একজন কর্মীর মনোবল এ পেশাগত আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সর্বশেষে, শ্রম উৎপাদন এবং কর্ম-সংস্থানের উপর কার্যকরভাবে সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখার বা নিরীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যে জন্যে উন্নয়ন যন্ত্র সৃষ্টির সাহায্যার্থে উপযুক্ত গবেষণা কাঠামো তৈরী করতে হবে। উপরে বর্ণিত উন্নয়নের এলাকাগুলো জনশক্তি ও শ্রম খাতে অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার পর্যালোচনা

১৯.২ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পূর্বে বাংলাদেশে জনশক্তি ও শ্রম খাত অতি ক্ষুদ্র পরিসর ছিল এবং কেবল একটি শিল্প সম্পর্ক ইন্সটিটিউট (আই আর আই), ১৮টি শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র (শ্রীমঙ্গলে চা বাগান শ্রমিকদের জন্য একটি সহ), ৫টি চাকুরী বিনিয়োগ বিনিময় কেন্দ্র, ৪টি বৃত্তিমূলক নির্দেশক ও যুব কর্ম-সংস্থান ইউনিট, একটি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কেন্দ্র এবং ৫টি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র জনশক্তি ও শ্রম খাতের অঙ্গীভূত অংশ হিসাবে ছিল। এ সকল সুযোগ সুবিধা এবং শিক্ষণীয় প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনাদি আর্থিক ও জনশক্তি সম্পদের প্রচণ্ড অনটনের প্রেক্ষাপটে সজ্জিত এবং পরিচালিত। এই পটভূমির প্রেক্ষিতে, প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় ২৭.৬৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় এবং এর লক্ষ্য ছিল প্রকৌশল কারিগরদের জন্য প্রশিক্ষণ সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, বিভিন্ন কর্মে নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি, শ্রমিক-কল্যাণ বিষয়ক সুযোগ সুবিধাদির উৎকর্ষ সাধন এবং সুস্থ শ্রম-সম্পর্ক গড়ে তোলা। পরবর্তীকালে আর্থিক অনটনের কারণে প্রানকেন্দ্রিক কর্মসূচীতে (হার্ড কোর প্রোগ্রাম) বরাদ্দ কমিয়ে ১২.০০ কোটি টাকাতে নামিয়ে আনা হয় এবং তা সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে আরও কমিয়ে আনা হয়। তথাপিও এই খাতে দীর্ঘকাল ধরে অপ্রতুল বরাদ্দের ফলে বাস্তবায়নকারী সংস্থা সমূহের গ্রহণক্ষমতা সংকুচিত হয়ে আসে এবং এজন্য বরাদ্দকৃত তহবিল পুরোমাত্রায় ব্যবহার করা যায় নি। ইহা সারণী ১৯.১এ দেখানো হোল।

সারণী ১৯.১

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনাধীন আর্থিক কর্মতৎপরতা

(লক্ষ টাকায়)

বৎসর	বরাদ্দ		ব্যয়
	মূল বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী	সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী	
১। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা			
১৯৭৩/৭৪	১৬০.০০	২৮.০০	২১.৩৯
১৯৭৪/৭৫	১৪০.০০	১২৮.০০	২২.৫৯
১৯৭৫/৭৬	৩০০.০০	১৬০.০০	৩৩.১৫
১৯৭৬/৭৭	৪২৪.০০	২০১.২০	১৬০.০০
১৯৭৭/৭৮	৪৬৮.৫০	৩৯৬.৫০	২৬৫.৮৫
অংশ যোগ ..	১৪০২.৫০	৯১৪.৪০	৫০২.৯৩
২। দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা			
১৯৭৮/৭৯	৭৩৫.০০	৬৯৩.০০	৪৬৮.৬৮
১৯৭৯/৮০	১১৩২.০০	৯৬৯.০২	৪৯৯.৮৩
অংশ যোগ ..	১৮৬৭.০০	১৬৬২.০২	৯৬৮.৫১
সর্বমোট ..	৩৩৬৯.৫০	২৫৭৬.৪২	১৪৭১.৪৪

১৯.৩ আর্থিক তৎপরতা যেমন পেছনে পড়ে ছিল তেমনি বাস্তব অগ্রগতিও অসন্তোষজনক ছিল। মোদ্দা কথায়, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাশেষে যে সব লক্ষ্য বস্তু অসম্পূর্ণ থেকে যায় সেগুলোর লক্ষ্য অর্জন চিহ্নিত করাই ছিল দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার, কর্মসূচীর কিছু জের আবার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার এসে শেষ হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বাস্তব লক্ষ্য অর্জনের চিত্র নিম্নরূপ:

কারিগরী প্রশিক্ষণ

১৯.৪ এই উপখাতের অধিনে মূলরূপরেখার অন্তর্ভুক্ত অসম্পন্ন কার্যাদি যথা, চালু ৫টি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বার দু'টি চাকায়, কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বীরপুর নামে একটি এবং বাংলাদেশ জাহাজীপন কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নামে অতিরিক্ত অপরটি এবং রাজশাহী ও চট্টগ্রামে একটি করে মোট দু'টি এবং নারায়নগঞ্জস্থ নদীগামী যান্ত্রিক যানের ডিজেল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শুরুর কয়েক বছর ধরে অগ্রগতি করতে থাকে এবং জুন ১৯৭৬ এ এদের স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়। পৃথক প্রকল্পের মাধ্যমে

উপরে বর্ণিত পাঁচটি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সম্প্রসারণ কাজ হাতে নেয়া হয় যেন এগুলোর মোট প্রশিক্ষণ ক্ষমতা ঐ সময় বিদ্যমান ১৬৬৭ থেকে ২৮৮০ এ বৃদ্ধি করা যায় যাতে অতিরিক্ত ১২১৩টি আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যে বাস্তব কর্মসূচীর ধারণা করা হয়েছিল ১৯৭৮ সাল নাগাদ তার ৫০ শতাংশের কাছাকাছি প্রকৃত লক্ষ্য অর্জন করা গিয়েছিল। যাহোক, দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে লক্ষ্যমাত্রা পরিপূর্ণভাবে অর্জিত হয়েছিল।

১৯.৫ এতদ্ব্যতীত, বগুড়া, বরিশাল, ফরিদপুর, কুমিল্লা, নরসিংদি, খুলনা, ও রাঙ্গামাটিতে মোট ২১৮৪ জনের প্রশিক্ষণ ধারণ-ক্ষমতা সম্পন্ন ৭টি নতুন কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করার কাজ হাতে নেয়া হয়। এগুলোর মধ্যে, খুলনা কেন্দ্রটির নির্মাণ কাজ আংশিকভাবে শুরু হয় এবং বাকী ৬টি কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ ১৯৭৬/৭৭ এ শুরু করার ব্যবস্থা চূড়ান্ত হয়। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত বাস্তব লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ২০ থেকে ২৫ শতাংশ কাজ এ সকল প্রকল্পে ১৯৭৮ সাল নাগাদ সম্পন্ন হয়। দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনাশেষে লক্ষ্য মাত্রার প্রায় অর্ধাংশ সম্পন্ন হয়। এ ছাড়া পরিকল্পনাকালে প্রাথমিক বছরগুলোতে চট্টগ্রাম ও খুলনার শিক্ষানবিসি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবশিষ্টকার্যাদি যেমন আসবাবপত্র সংগ্রহ এবং বৈদ্যুতিকীকরণ শেষ করে এ দু'টোকে পুরাপুরি চালু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

১৯.৬ তদুপরি, ১৯৭৭/৭৮ সালে দ্রুত সুফলদায়ক কর্মসূচীর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্রে হাতে কলমে (অন দি প্লান্ট) প্রশিক্ষণ দিয়ে বিদ্যুতের বিভিন্ন শাখা-কারিগর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বাস্তব সুবিধাদি প্রদান ও আবর্তক ব্যয় মিটানর উদ্দেশে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে রাজস্ব বাজেট থেকে ৬০.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছিল। ঐ বৎসর ২৫০ জন মিস্ত্রী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেন।

১৯.৭ এতদভিন্ন, দ্রুত সুফলদায়ক কর্মসূচীর মারফৎ উৎপাদন যন্ত্রে প্রশিক্ষণের আরও কিছু কর্মসূচী বিভাগীয় সংস্থা সমূহে/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়িত হয়। এগুলো সারণী ১৯.২ এ দেখানো হোল।

সারণী ১৯.২

দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে দ্রুত সফলদায়ক উৎপাদন যন্ত্রে (অনদি প্লান্ট) প্রশিক্ষণের কর্মসূচী

প্রতিষ্ঠান	১৯৭৮/৭৯ (রাজস্ব বাজেটাধীন)		১৯৭৯/৮০ (উন্নয়ন বাজেটাধীন)	
	ব্যয়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারিগরের সংখ্যা	ব্যয়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারিগরের সংখ্যা
(১) বাংলাদেশ পাটকল সংস্থা ..	৫.০৪	৫১০	..	..
(২) বাংলাদেশ বস্ত্রকল সংস্থা ..	৩৮.১৬	১,৪৪০	..	..
(৩) কারিগরী শিক্ষা পরিদপ্তর ..	৩৩.১৬	১,৪০০	..	..
(৪) বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল সংস্থা ..	৩০.৭২	১,২০০	২১.০০	৭১০
(৫) বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা ..	১৪.৩০	৮৩২	..	..
(৬) বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা ..	১৫.১৪	৭০০	২৫.০০	৮৫০
(৭) বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ..	৩৬.০৬	২৫০	২৯.০০	৪৫০
মোট ..	১৭২.৫৮	৮,৩৩২	৭৫.০০	২,০১০

কর্ম-সংস্থানের পরিধি বর্ধন

১৯.৮ এই উপ-খাতে পরিকল্পনার শুরুর বছরে বিদ্যমান চারটি বৃত্তিমূলক নির্দেশনা এবং যুব বিনিয়োগ কেন্দ্রের অবশিষ্ট ছোট খাটো কাজ সম্পন্ন হয় এবং পরবর্তীকালে প্রকল্পটি রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর এবং সিলেটে, বিদ্যমান বিনিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রসমূহকে কর্মচারী সংখ্যা বৃদ্ধি দ্বারা বলীয়ান করে এবং বাস্তব সুযোগ সুবিধাদি শক্তিশালী করে বেকার সমস্যা মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে সরকারের প্রচেষ্টা জোরদার করার জন্যে একটি রেখাচিত্র সূত্রবদ্ধ করা হয়। সূত্রবদ্ধ এই রেখাচিত্রে (ক) মহিলা চাকুরী-সন্ধান প্রার্থীদের রেজিষ্ট্রেশন এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে মহিলাদের জন্য একটি ডেস্ক খোলা, (খ) বিদেশে বিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি করা, এবং (গ) স্থানিযুক্ত কর্ম-সংস্থান কর্মসূচীর উদ্যোগ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে বরিশাল, ময়মনসিংহ, রাজশাহী ও নোয়াখালীতে নতুন শাখা এবং বগুড়ায় একটি শাখা কার্যালয় খোলা অন্তর্ভুক্ত। সঠিক বাস্তবায়নের ব্যাপার বিবেচনান্তে দেখা যায় যে, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনার তিনটি মহিলা ডেস্ক খোলা হয় এবং প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা সমাপ্তিকালে, সকল বিনিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রের ভৌত ও কর্মচারী সংখ্যা বৃদ্ধির প্রায় ২৫ শতাংশ সম্পন্ন হয়। দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনাশেষে নতুন বিনিয়োগ বিনিময় কেন্দ্র সমূহের স্থাপনকার্য সম্পন্ন এবং কিছু স্থানিযুক্ত কর্ম-সংস্থান কর্মসূচী শুরু করা হয়।

১৯.৯ জনশক্তি, কর্ম-সংস্থান এবং প্রশিক্ষণ ব্যুরো সকলকী প্রশিক্ষণ ও মনিটরিং এবং দেশে ও বিদেশে কর্ম বিনিয়োগ বৃদ্ধির ব্যাপারে সুষ্ঠুতর ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে ১৯৭৬ সালের প্রথম দিকে স্থাপিত হয়।

শিল্প সম্পর্ক ও শ্রম কল্যাণ

১৯.১০ এই উপ-খাতের অধীনে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে তিনটি নতুন শিল্প সম্পর্ক ইনস্টিটিউট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং ঢাকাস্থ টঙ্গীস্থটির সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়। এগুলোর মধ্যে যখন টঙ্গী ও চট্টগ্রামের ইন্সটিটিউটগুলোর নির্মাণ কাজে কিছু অগ্রগতি সাধিত হয়, তখন খুলনা ও রাজশাহীর দু'টি ইন্সটিটিউটের প্রাথমিক কার্যাদি যথা নকশা ও প্রাক্কলন কাজ অব্যাহত থাকে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে প্রায় ৩০ শতাংশ ভৌত কর্ম বা বাস্তব কাজ সম্পন্ন হয়। তিনটি পৃথক প্রকল্পের অধীনে টঙ্গী, চাষাড়া, নারায়নগঞ্জ, বন্দর, কালুরঘাট, বরিশাল, রূপসা, কুষ্টিয়া, পাবনাবান্ধা, সিরাজগঞ্জ রাজশাহী, বগুড়া, তেজগাঁও, সলিমাবাড়ী, আশুগঞ্জ, চাঁদপুর, ঘোলশহর এবং খালিশপুরে অবস্থিত ১৭টি ভেপ্রপ্রায় শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের সম্প্রসারণ এবং বোড়াশাল, মংলা, নরসিংদী এবং সৈয়দপুরে ৪টি নতুন কেন্দ্র স্থাপনের কাজ হাতে নেয়া হয়। প্রথম পরিকল্পনাকাল শেষে এ সকল প্রকল্পের প্রায় ৫০ শতাংশ বাস্তব কার্যাদি সম্পন্ন হয়। দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনাশেষে প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার ৯৫ শতাংশের কাছাকাছি অর্জিত হয়।

১৯.১১ আর্থিক ও বাস্তব কার্য সম্পাদনের অগ্রগতুলতার কারণ ছিল: (১) নির্মাণ সামগ্রী, শ্রমিক ইত্যাদির মূল্যবৃদ্ধি জনিত কারণে চলতি প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যয় বৃদ্ধি, (২) চলতি ও নতুন প্রকল্প সমূহের প্রণয়ন, সংশোধন, প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রিতা, (৩) যথাপূর্ত বিভাগ কর্তৃক নকশা বানানো, প্রাক্কলন তৈরী এবং প্রকৃত নির্মাণকার্য শুরুর ব্যাপারে দীর্ঘসূত্রিতা।

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সমূহ/কর্মকৌশলাদি

১৯.১২ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ/নীতিনির্ধারণী পন্থাদি নিম্নরূপ:

(১) কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমূহে নিয়োগ-পূর্ব আনুষ্ঠানিক কোর্সে ভর্তির বার্ষিক ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির সামর্থ্য গড়ে তোলা এবং চাকুরীকালীন কর্মীদের মানোন্নয়ন কোর্স প্রবর্তন করার উদ্দেশ্যে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের পক্ষপুটে দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণের আওতা সম্প্রসারণ;

(২) বিভিন্ন খাতের অধীন সংস্থাসমূহে এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানাদিতে উৎপাদনকারী যন্ত্রে (অন দি প্লান্ট)/শিক্ষানবিসি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর একটি পদ্ধতি সংগঠন করা;

(৩) উপযুক্ত সম্পূরক প্রশিক্ষণ এবং পরিচিতি-জ্ঞান বৃদ্ধি দ্বারা শ্রমশক্তির বার্ষিক রক্ষতানী প্রচুর পরিমাণে সম্প্রসারণ;

(৪) দেশের বৃহত্তর কর্মবিনিয়োগ বৃদ্ধির অংশ হিসেবে স্বনিযুক্ত কর্মের সুযোগ সৃষ্টি বৃদ্ধি বিশেষ-ভাবে কারিগরী খাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের স্বনিযুক্ত কর্মে নিয়োগ;

(৫) একটি জাতীয় বিনিয়োগ বিনিময় সার্ভিস স্থাপন করা যা চাকুরী প্রার্থী ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষা প্রশাসন এবং জনসাধারণকে বিনিয়োগ-তথ্যাদি, পেশাগত নির্দেশনা এবং পরামর্শ প্রদান করবে এবং প্রশিক্ষণ ব্যাপারে প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করার কারিগরী প্রশিক্ষণ পদ্ধতিকে সাহায্য করবে;

(৬) সুষ্ঠু শ্রমিক ব্যবস্থাপনা এবং সরকারের মধ্যে একটি নিয়মিত যোগাযোগ সূত্র প্রতিষ্ঠা করা ;

(৭) ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবর্গের এবং সরকারী, আধা-সরকারী এবং বেসরকারী সংগঠনসমূহের শ্রম-বিষয়ক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী জোরদার করা ;

(৮) সাধারণ শ্রমিকদের প্রেরণা সৃষ্টিকারী শিক্ষার একটি ব্যাপক ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা;

(৯) আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিল্প-নিরাপত্তা-ব্যবস্থা এবং পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে একটি জাতীয় নিয়মাবলী প্রবর্তন করা;

(১০) শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রসমূহের ব্যাপক শক্তি বৃদ্ধি এবং বিস্তৃতি ঘটিয়ে শিল্প-শ্রমিকদের চিকিৎসা, বিনোদন এবং প্রেরণামূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্যকভাবে পরিবেশন করা; এবং

(১১) নিয়মিতভাবে অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে কর্মবিনিয়োগ এবং শ্রম-উৎপাদনের নিরীক্ষণের জন্যে একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা ;

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভৌত কর্মসূচীসমূহ

১৯.১৩ কর্মসূচীর তৎপরতার প্রধান প্রধান এলাকা নিম্নরূপ :

১। **নিয়োক্ত পদ্ধতিতে কারিগর প্রশিক্ষণ :**

(১) কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে দক্ষ কারিগরী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিক সামগ্রিক বিনিয়োগ-পূর্ব প্রশিক্ষণ;

(২) আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আসা ব্যক্তিদের শিল্প-শিক্ষানবিসির মাধ্যমে বিনিয়োগ-পূর্ব উৎপাদন-যন্ত্রে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ;

(৩) আধা-দক্ষ এবং অদক্ষ কর্মীদের জন্যে উৎপাদন-যন্ত্রে শিক্ষানবীসি পদ্ধতির অধীনে আনুষ্ঠানিক স্বাভাবিক ক্রিয়াদি সম্পন্নোপযোগী বিনিয়োগ-পূর্ব প্রশিক্ষণ ;

(৪) (ক) কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে ফোরম্যান, সুপারভাইজার এবং উর্দ্ধতন ক্রাফটস ম্যানদের এবং (খ) উৎপাদন-যন্ত্র পর্যায়ে নবীন ও মধ্যম পর্যায়ভুক্ত কারিগরদের জন্যে চাকুরীকালীন দক্ষতা উন্নয়নমূলক বিরামহীন প্রশিক্ষণ; এবং

(৫) প্রশিক্ষণের মান নিরূপণ, উৎকর্ষ নির্ধারণ এবং প্রত্যয়ন রীতির পদ্ধতি প্রবর্তন।

২। **কর্মসংস্থানের পরিসীমা বর্ধন :**

(১) বৈদেশিক কর্মবিনিয়োগ ;
(২) স্বনিযুক্ত কর্মসংস্থান।

৩। **কেন্দ্রীয় কর্মবিনিয়োগ মনিটরিং :**

(১) কর্মবিনিয়োগ গবেষণা ইনস্টিটিউট;
(২) জেলা পর্যায়ে জনশক্তি উন্নয়ন এবং বিনিয়োগ সার্ভিস।

৪। **শ্রম উৎপাদনশীলতা মনিটরিং :**

(১) সরকারী খাতে উৎপাদনশীলতা মনিটরিং
(২) বেসরকারী খাতে উৎপাদনশীলতা মনিটরিং

৫। **শ্রমিক সম্পর্ক :**

(১) শিল্প সম্পর্কিত যোগাযোগ, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা;
(২) উৎপাদন-যন্ত্রে সাধারণ কর্মীদের প্রেরণাদানকারী শিক্ষা।

৬। **শ্রমিক কল্যাণ :**

(১) শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে বিনোদনমূলক, চিকিৎসা সংক্রান্ত এবং প্রেরণা দানকারী শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা।

৭। **বিবিধ :**

(১) পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কোষসমূহ;
(২) সুনির্দিষ্ট গবেষণা সমীক্ষাসমূহ।

খাত-ভিত্তিক কর্মসূচী

১৯.১৪ **কারিগরী প্রশিক্ষণ :** এ দেশে বেশিনিষ্ট, টার্নার, খামার-মিস্ত্রী, ডিজেল-মিস্ত্রী, যান্ত্রিক শক্তি মিস্ত্রী, বিজলীচালিত পাম্প টেকনিশিয়ান, বিজলী মিস্ত্রী, কর্মকার ইত্যাদি জাতীয় প্রকৌশল কারিগরদের একটি তীব্র এবং স্থায়ী ঘাটতি রয়েছে। পণ্য উৎপাদন, পানি উন্নয়ন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সড়ক উন্নয়ন ও পরিবহন, জল পরিবহন, বিমান পরিবহন, তার যোগাযোগ, কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংগঠনসমূহে, নির্মাণকার্যে, পানি সরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালী এবং অন্যান্য জন-উপযোগমূলক কার্যাদিরক্ষেত্রে এই কারিগরদের বিরাট চাহিদা রয়েছে। সকল উন্নয়ন খাতের প্রকল্পের উত্তরোত্তর কর্মবাও ওর হওয়ার সাথে দক্ষ কারিগরদের চাহিদা বিরামহীনভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। প্রকৌশল-কারিগরী পদ্ধতিতে শিক্ষিতদের বাজার আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ ক্ষেত্রেও বেশ রয়েছে। তদুপরি, শিক্ষিত জনশক্তির যে গুটি কয়েক শ্রেণী রয়েছে যাঁরা স্বনিযুক্ত কর্মে অনুপ্রাণিত ও সংগঠিত হতে পারে প্রকৌশল কারিগরগণ সে শ্রেণীর অন্তর্গত।

১৯.১৫ দু'টি চালুর, একটি করে নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে এই পাঁচটি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টি টি সি) দ্বিতীয় পরিকল্পনার পূর্বে চালু ছিল। নারায়ণগঞ্জের টি ছাড়া সবগুলিই অনুমোদিত চলতি প্রকল্পের অধীনে সম্প্রসারিত হচ্ছে। খুলনা, বগুড়া, কুমিল্লা, ফরিদপুর, বরিশাল, রাঙ্গামাটি ও ময়মনসিংহে একটি করে মোট সাতটি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের বার্ষিক প্রশিক্ষণ প্রার্থীর ভর্তির আসন সংখ্যা পরিকল্পনাকালে ১৯৮০ থেকে ১১,৯২৩টিতে উন্নীত হবে।

১৯.১৬ দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার প্রারম্ভে কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে, বৃত্তিমূলক ইন্সটিটিউট-গুলোতে এবং বহুমুখী কারিগরী বিদ্যালয়ে (পলিটেকনিক) দ্বিতীয় পালায় (শিফ্‌ট) নবম শ্রেণীর পর্যায়ে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাধীন আসন সংখ্যা ছিল ২.৭০ লক্ষ। বিগত সাত বছরের প্রবণতা এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা বিবেচনা করে এই আসন সংখ্যা ১৯৮৫ সালে ৩.৫০ লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। হালে নবম শ্রেণী পর্যায়ের ০.৭৩ শতাংশ কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি হয়। লক্ষ্য করা গেছে যে, যখন প্রয়োজনীয় সংখ্যায় দক্ষ কারিগর না পাওয়া যায়, তখন আধা-দক্ষ, কম-দক্ষ, কম-যোগ্যতার অধিকারী, এমন কি সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণহীন কর্মী দ্বারা বেমানানভাবে অধিষ্ঠানের মাধ্যমে পূরণ করা হয়। যতদূর সম্ভব এ প্রকার পরিস্থিতি বর্জন করা উচিত। তদুপরি, মাধ্যমিক শিক্ষায় নবম শ্রেণী পর্যায়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ধারার ব্যাপক সম্প্রসারণ প্রয়োজন। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার নবম শ্রেণী পর্যায়ে ছাত্র ভর্তির ৬ শতাংশ কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে মোট বার্ষিক প্রশিক্ষণ প্রার্থী ভর্তির সহজসাধ্য লক্ষ্যে উন্নীত হতে পারবে বলে মনে হয়। এর অর্থ দাঁড়াবে যে কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের বার্ষিক আসন সংখ্যা ১৯৮৫ সালের জুনে, ২১,০০০-এ উন্নীত হতে হবে। পরিস্থিতিটি সারণী ১৯.৩-এ মোটামুটিভাবে বর্ণিত হোল।

সারণী ১৯.৩

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের আসন সংখ্যার প্রস্তাবিত সম্প্রসারণ

সাল	নবম শ্রেণীতে মোট আসন সংখ্যা।	কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-সমূহের অংশ।	
		সংখ্যা	দ্বিতীয় কলামের শতাংশ।
১	২	৩	৪
১৯৮০	২.৭০ লক্ষ	১৯৮০	০.৭৩
১৯৮৫	৩.৫০ লক্ষ	২১,০০০	৬.০০

১৯.১৭ সে জন্যে, ১০০০ অতিরিক্ত আসনের ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রা যে সকল জেলায় এখনো কোনও কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়নি সে সকল জেলা সদরে নতুন কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে অর্জিত হতে পারে। এসব জেলাগুলো হোল টাংগাইল, জামালপুর, যশোহর, কুষ্টিয়া, পটুয়াখালী, রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, নোয়াখালী, সিলেট ও বান্দরবন। প্রথম পর্যায়ে দু'টো নতুন কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ হাতে নেয়া যেতে পারে এবং তা দ্রুত চালু করা যেতে পারে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীনে পরিকল্পনাকালে যেন প্রশিক্ষণ তৎপরতা শুরু করা যায় সে জন্যে যতদূর সম্ভব ন্যূন আয়তনের শ্রেণীকক্ষ অট্টালিকা, কর্মশালা এবং প্রশাসনিক চত্বর সৃষ্টি করা যেতে পারে। কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের বাসস্থান এবং অন্যান্য সহায়ক সুযোগ সুবিধাদির জের হিসেবে তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় নিয়ে নেয়া যাবে।

১৯.১৮ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সমিতি (আই ডি এ) এর সাহায্যপুষ্টতায় একটি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রকল্পের অধীনে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের জাতীয় পরিষদ স্থাপন এবং এর একটি সদর কার্যালয় ও তিনটি আন্তর্জাতিক আঞ্চলিক কার্যালয় নির্মাণ এবং দ্রুত দক্ষতা সৃজনশীল প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ব্যবস্থা করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে খুলনা, বগুড়া, বরিশাল, কুমিল্লা এবং ময়মনসিংহে নির্মাণাধীন পাঁচটি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণ সম্পন্ন করার জন্যে সামর্থ প্রদান করা হবে এবং বিদ্যমান চারটি

কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যার দু'টো ঢাকায় এবং অন্যগুলোর একটি করে চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে আছে তাদেরকে অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধাদি দিয়ে শক্তিশালী এবং উন্নীত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষকদের এবং দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের জাতীয় পরিষদ (এনসিএসডিটি) এর সচিবালয়ের পেশাগত কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং সে সাথেই সংস্থাসমূহে উৎপাদনশীল যন্ত্রের (অন দি প্লান্ট) সাহায্যে দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণের, তৎসহ তত্ত্বাবধায়কদের প্রশিক্ষণের ব্যাপক বন্দোবস্তও করা হবে। এই প্রকল্পে পাঠ্যসূচী উন্নয়ন, বিভিন্ন বৃত্তির জন্যে পাঠ্যধারার রূপরেখা, প্রশিক্ষণ সাহায্যার্থে প্রয়োজন জিনিস-পত্র/উপকরণ সামগ্রীর উন্নয়ন এবং অবিরাম উন্নয়ন প্রক্রিয়া চালু রাখার লক্ষ্যে এই কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সংবাদাদি সংগ্রহের (ফীড্-ব্যাক) এবং মূল্যায়নের একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করা এই প্রকল্পের মানসপটে রয়েছে। এতদ্ভিন্ন, বৃত্তিমূলক উপদেশ দানের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন, বৃত্তি ও পেশার মান নির্ণয় করার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, এবং বৃত্তি ও পেশার গুণগত মান সম্পর্কে প্রত্যয়ন করার জন্যে একটি জাতীয় কাঠামো-স্থাপন এই প্রকল্পে প্রস্তাবিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই প্রকল্পের তৎপরতাসমূহের মধ্যে থাকবে, প্রতিষ্ঠানিক এবং শিল্পসংশ্লিষ্ট এই উভয় ক্ষেত্রেই দক্ষতা সৃষ্টিকারী প্রশিক্ষণের নীতি সূত্রবদ্ধ করা ব্যাপকভাবে দক্ষতা সৃষ্টিকারী প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় করা এবং পঞ্চ-বার্ষিক ও বার্ষিক দক্ষতা উন্নয়ন/প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার জন্যে সূত্রবদ্ধ নীতিমালা প্রস্তুতকরণ।

১৯.১৯ **শিক্ষানবিসি/উৎপাদন যন্ত্রে (ইন প্লান্ট) প্রশিক্ষণ:** জনশক্তি, বিনিয়োগ এবং প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বি এম ই টি) বিভিন্ন স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে/সংস্থাসমূহে, বিদ্যুৎ, যান্ত্রিক, প্রকৌশল এবং নির্মাণ বৃত্তিতে প্রয়োজন দালান কোঠা, কর্মশালা, হাতিয়ার ও সাজ সরঞ্জামাদি এবং শিক্ষানবিসি/উৎপাদনযন্ত্রে প্রশিক্ষণের জন্যে প্রয়োজন প্রশিক্ষণ উপকরণাদি বিষয়ক যৌথিক প্রশিক্ষণ সুবিধাদি প্রবর্তন, নিরীক্ষণ (মনিটর) এবং সৃষ্টির ব্যবস্থা করবে। তদুপরি, বিদ্যমান বৃত্তিমূলক বহুমুখী শিক্ষা জ্ঞান (পলিটেকনিক), বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এবং কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটগুলোতে প্রাপ্ত ভৌত সুবিধাদি ব্যবহার করে দেশের ও বিদেশের চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে বিশেষ পাঠ্যধারা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বন্দোবস্ত করা হবে। এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদির বন্দোবস্ত একাধিক স্থানে একই প্রকার পরিহার করার উদ্দেশ্যে এবং বিদ্যমান প্রশিক্ষণ ক্ষমতার নিবিড় ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্যে বিদ্যমান সুবিধাদির সঠিক পরিস্থিতি নির্ণয়ার্থে একটি ব্যাপক ভিত্তিক জরীপ চালানো প্রয়োজন। এই মজুত জরিপের উপর নির্ভর করে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে উৎপাদনযন্ত্রে/শিক্ষানবিসি প্রশিক্ষণের একটি বিরাট কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, শিল্পে অথবা অন্য যে কোনও পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যে কোনও বৃত্তিধারী কারিগর-মিস্ত্রীর প্রতি প্রযোজ্য একটি ব্যাপকজাতীয়ভিত্তিক পরীক্ষা ও অভিজ্ঞান পত্র প্রদান পদ্ধতি প্রবর্তনের পর্যায়ে রয়েছে এবং সঠিক সময়ে তা এনসিএসডিটি কর্তৃক অনুমোদন পেয়ে পরীক্ষা ও প্রত্যয়ন পদ্ধতির জাতীয় পদ্ধতি হিসেবে গণ্য হবে।

১৯.২০ **বৈদেশিক কর্মসংস্থান:** বাংলাদেশ দক্ষ-জনশক্তি বিদেশে পাচারের ফলে তার জাতীয় পর্যায়ের প্রচেষ্টাসমূহের ভোগান্তি হতে দিতে পারে না। বৈদেশিক বাণিজ্যে লেনদেনের অব্যাহত প্রতিকূলতার পরিস্থিতিতে জনশক্তি রফতানীর মারফৎ বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সম্ভাবনাকে কাজে না লাগানোর বিলাসিতার সামর্থ্যও এ দেশের নেই। বর্তমান সংকটাপন্ন বেকারত্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে জাতীয় চাকুরীর বাজারে সৃষ্ট চাপ লঘু করার একটি সম্ভাবনাময় উৎসকে স্তিমিত করা এ দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। জাতীয় জনশক্তি রফতানীর নীতি এই তিনটি সম-গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করতে হবে।

১৯.২১ বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের দক্ষ জনশক্তির যে সব দিকে দেশে ঘাটতি রয়েছে এবং অর্থনৈতিক খাতের সার্বিকাঠিতে প্রয়োজনীয় কৌশলগত পেশা পরিচালনার্থে যাঁদের প্রয়োজন তাঁদেরকে বিদেশের চাকুরীর জন্যে ছেড়ে দেয়া যায় না। তৎসত্ত্বেও, এদেশের যেখানে দেশের মূল বৈশিষ্ট্যই হল শ্রমিকাধিক্য, সে দেশে (১) অদক্ষ

শ্রমিক যাঁদের অবাধ সরবরাহ রয়েছে, (২) যে সকল আধা-দক্ষ শ্রমিক যাঁদের স্থান পূরণের জন্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের সময় ও ব্যয় অত্যন্ত কম, এবং (৩) দেশের অভ্যন্তরে যে শিক্ষিত জনশক্তির যে অংশটি চাহিদার তুলনায় প্রচুর উদবৃত্ত, তাঁদের বিদেশ গমনে দেশ কিছুই হারায় না।

১৯·২২ বাংলাদেশের বেসামরিক শ্রমশক্তির মাত্র ৫ শতাংশ প্রবেশিকা উত্তীর্ণ বা ততোধিক শিক্ষিত এবং তাই এদেশের আধুনিক শিল্পের ভিত্তি অতি সংকীর্ণ। শিক্ষিত শ্রমশক্তির ৪০ শতাংশ বেকার নিয়ে প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা শুরু করা হয়। প্রথম পরিকল্পনার শেষ ভাগে এ পরিস্থিতির কিছুটা অবনতি ঘটে। যাই হোক, শিক্ষিতদের কর্ম-বিনিয়োগ পরিস্থিতির এমন একটি অবস্থা বাংলাদেশে বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও একটি স্বল্প পরিসর শ্রমশক্তি রফতানীর উপর চাপের সৃষ্টি করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনার তিনটি প্রকৌশল কলেজ শিক্ষকের অভাবে শিক্ষা প্রদানে প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। শিক্ষারতন নয় এমন সব সংগঠন থেকে দেশ মাঝারি পর্যায়ের প্রকৌশলী হারাচ্ছে। এ সব প্রকৌশলী যে কোনও প্রকল্পের লোকবলের মেরুদণ্ড হিসেবে অভিহিত। ফলশ্রুতিতে এসব সংগঠনে থেকে যাচ্ছেন অত্যন্ত প্রবীণ বয়স্ক নবীন প্রকৌশলীগণ। এরা মাঝারি পদমর্যাদার সমর্থন ব্যতীত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিশেষ কোনও অবদান রাখতে পারেন না। স্নাতকোত্তর চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের দেশত্যাগ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়গুলোতে একটি বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পায়ন, পল্লী বিদ্যুতায়ন এবং নির্মাণের যে সব বিরাট কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে, তা যদি বাস্তবায়ন করতে হয়, পরিকল্পনার আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যসমূহ যদি অর্জন করতে হয় তাহলে উন্নয়ন কর্মসূচীসমূহ উন্নয়নের জন্যে যে সব সুনির্দিষ্ট দক্ষ শ্রমশক্তির প্রয়োজন তা চিহ্নিত করার জন্যে সুস্পষ্ট কৌশলনীতি দেশকে গ্রহণ করতে হবে এবং এরূপ পেশাদার শ্রমশক্তির বিদেশ গমন সীমাবদ্ধ করতে হবে। কর্মসংস্থান গবেষণা ইন্সটিটিউট এই সনাক্ত করণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং প্রতিষ্ঠানটি কর্ম-সংস্থান পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ সম্পর্কিত নিজস্ব সামগ্রিক বাস্তিত্বের অংশ হিসেবে প্রতিনিয়ত প্রয়োজনীয় শূন্যতা পূরণের হারের সাথে বহির্গমনের পরিমান যাচাই করবে এবং জনশক্তি রফতানী প্রক্রিয়া পেশাগত দক্ষতার বিন্যাসানুসারে এবং অর্থনৈতিক খাত অনুযায়ী (১) পরিবর্তিত বৈদেশিক চাহিদা মোকাবেলার উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাসের এবং (২) জাতীয় অর্থনীতিতে ব্যত্যয় হলে জনশক্তি রফতানীকারী সংগঠন তার লেনদেন নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করতে পারে, এরূপ ইংগিতবাহী পর্যালোচনাদি সদা সর্বদা চালিয়ে যাবে এবং তা সার্বক্ষণিক ভাবে হালনাগাদ রাখবে।

১৯·২৩ পাকিস্তান, ভারত, ফিলিপাইন, সিংগাপুর ও থাইল্যাণ্ডের তুলনায় বাংলাদেশ জনশক্তি রফতানীর ক্ষেত্র সমূহের সম্ভাবনার পূর্ণ সুযোগ এখনো সদ্ব্যবহার করতে পারে নি। নিম্নলিখিত কারণগুলো এই অসন্তোষজনক ক্রিয়াকলাপের জন্যে প্রধানতঃ দায়ী :(১) মধ্যপ্রাচ্যে নির্মাণকার্য এবং যে সব প্রকল্পে নির্মাণ সামগ্রীসহ সকল কার্যাদি সম্পন্নের দায়িত্ব নিয়ে সম্পন্ন করতে হয় (টার্ন-কী), এমন সব কাজের উপযুক্ত কোনও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে সংখ্যায় খুবই কম, (২) বেসরকারী নিয়োগকারী এজেন্টগণ/ভ্রমণ সহায়ক দালালগণ অন্যান্য দেশের জনশক্তি রফতানীকারী সংস্থ সমূহ এবং বৃহদায়তন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে প্রতিযোগিতা করে শূন্য পদের বড় অংশ কবজা করতে পারে না; এবং (৩) জনশক্তিরফতানীর বিশেষজ্ঞ কোনও সংগঠন বাংলাদেশের নেই (যা মধ্যপ্রাচ্যে পূর্ণাংগ মেগা-কার্যালয় সহ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত হতে পারে)। বাংলাদেশের কতক দূতাবাসে অবস্থিত তার ক্ষুদ্রকায় শ্রম-এটাচি কোষসমূহ দ্বারা পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত জনশক্তি বিনিয়োগ ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোটি একটি স্বাভাবিক সরকারী কার্যালয় বা ব্যবসা ভিত্তিক কর্ম-প্রচেষ্টা পরিচালনার জন্যে উপযুক্তভাবে সৃষ্ট নয়।

১৯·২৪ কর্ম-বিনিয়োগ সুযোগসমূহ প্রধানতঃ বৃহৎ বৃহৎ বহুজাতিক বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, কানাডার, পশ্চিম ইউরোপের এবং কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানসমূহে গড়ে উঠবে। এসব বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে কর্ম-বিনিয়োগ কার্যাদেশ আদায় করার কাজটি প্রদর্শনোপযোগী অতি উচু দরের

প্রতিযোগিতামূলক বিক্রয় দক্ষতার প্রয়োজন, বা কোনও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় প্রতিনিধির কাজের সমতুল্য। বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্ম-বিনিয়োগ প্রয়োজনীয়তার পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে, প্রতিযোগিতাকারী দেশগুলোর প্রদত্ত শর্তাদি জানতে হবে এবং সেগুলোর চেয়েও বেশী সুবিধাজনক শর্তাদির প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। এই কাজটি সরকারী কার্যালয়ের পরিবর্তে কোনও বাণিজ্যিক সংগঠন কর্তৃক সর্বোৎকৃষ্টভাবে সম্পন্ন হতে পারে।

১৯·২৫ আই বিদেশে জনশক্তির বাজার দখল করার জন্যে প্রয়োজনীয় সকল বাণিজ্যিক উপাদান সহ একটি বৈদেশিক বিনিয়োগ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হবে। বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্যে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাময় দেশসমূহে এই প্রতিষ্ঠান শ্রমশক্তি বিক্রয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করবে। নির্মাণ, স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং কৃষি বিষয়ক ক্ষুদ্রায়তন ও স্বল্পাধুনিক প্রকৃতির প্রকল্পাদির ভার স্বল্পোন্নীত দেশ সমূহের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোই নিতে পারে। বাংলাদেশ তার বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোকে সংগঠিত করবে, শক্তিশালী করবে এবং মধ্যপ্রাচ্যে তিন ধরণের চুক্তিভিত্তিক কাজের জন্যে প্রেরণ করবে, যথা, (১) মূল চুক্তি, (২) উপ-চুক্তি (সাব-কন্ট্রাক্ট), এবং (৩) যৌথ-উদ্যোগ। মধ্যপ্রাচ্যে যেসব প্রকল্পের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রী সরবরাহ, উৎপাদন ও নির্মাণ প্রয়োজন (টার্ণ-কী), এরূপ কাজের জন্যে সুসজ্জিত করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় কয়েকটি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সমবায় (কন্সর্টিয়াম) সংগঠন যুক্তিযুক্ত ও বিবেচ্য। কয়েকটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সমবায় গঠন করে তা নির্মাণ/স্থাপন প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যুক্ত করে দিলে তাও বেশ প্রয়োজনানুগ হবে। বৈদেশিক কর্ম-বিনিয়োগ সংগঠনটি বৈদেশিক সরকার/বিনিয়োগকারীদের এবং সম্ভাবনাময় স্থানীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানের সমবায়ের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট যোগসূত্র হতে পারে।

১৯·২৬ যেখানে প্রতি বছর একটি বিরাট সংখ্যায় পেশাজীবি, দক্ষ অর্ধ-দক্ষ এবং অদক্ষ কর্মী চাকরী নিয়ে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে তেমন একটি পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্যে ১৯২২ সালের দেশান্তরী আইন (এমিগ্রেশন অ্যাক্ট) তৈরী হয় নি, সেরূপ অবস্থার প্রেক্ষিতে, আজুনা সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে এই অপ্রচলিত আইনটি বাতিল ঘোষিত হবে এবং তদস্থলে দেশান্তরী অধ্যাদেশ, ১৯৮২ জারী করা হবে। এই নতুন আইন ও তদধীন প্রণীতব্য বিধি, জনশক্তির অধিকহারে বহির্গমনের সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং একই সাথে শোষণমূলক প্রথাদি হ্রাস করবে এমন একটি পদ্ধতির সূত্রপাতের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। বৈদেশিক নিয়োগকারীদের কাছ থেকে বৈধ ফরমায়েশ/চাকরীর অনুমতিপত্র থাকলে বহির্গমনের ছাড়পত্র প্রদান করা হবে। তবে সেক্ষেত্রেও সরকার জনস্বার্থের প্রয়োজনে যে কোন ব্যক্তির বা যে কোন শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের বহির্গমন নিষিদ্ধ করতে পারে। সরকারের অনুমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা সংগঠন বিদেশে চাকুরীর উদ্দেশ্যে কোনও সংগ্রহ শুরু করতে পারবেন না বা এ উদ্দেশ্যে কোনও বিজ্ঞাপন প্রদান করতে পারবেন না। অনুমতিপ্রাপ্ত এজেন্ট চয়নের প্রক্রিয়া প্রস্তাবিত আইনের অধীনে নিয়ম-নির্দিষ্ট করার সময় বৃত্তিগত পরীক্ষার সাহায্যে সঠিক কাজের জন্যে সঠিক ব্যক্তি নির্বাচনের ব্যবস্থাও প্রচলন করা হবে। বেআইনী কার্যকলাপ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত আইনে ভীতিপ্রদ শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। জাতীয় কর্ম-সংস্থান পরিস্থিতির উপর কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না করে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির ব্যবস্থা প্রস্তাবিত আইনে রাখা হয়েছে। উপরোক্ত বিষয়াদি মানসপটে রেখে, সংকটজনক পেশা এবং বৃত্তিধারীদের সরবরাহ বৃদ্ধির কর্মসূচী প্রবর্তন করা হবে। বিধিসমূহ এবং অন্যান্য দলিল বা এই অধ্যাদেশের অধীনে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিস্তারিত ব্যবস্থাদি সম্বলিত বিধিসমূহ ও অন্যান্য দলিলের খসড়া প্রণয়নের কাজে হালে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় ব্যাপৃত রয়েছে।

১৯·২৭ একটি সুবিন্যস্ত পদ্ধতির অধীনে, সরকারী মাধ্যমের প্রচেষ্টায়, নিবন্ধিত এজেন্টদের উদ্যোগে এবং ব্যক্তি বিশেষ এ সবের সমষ্টিগত ও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জনশক্তি রফতানীর মাসিক অভীষ্ট লক্ষ্য ১০'০০০ পর্যন্ত অর্জন করা যেতে পারে। এই উৎস থেকে মাসে ১০০ কোটী টাকার বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আমদানীর আশা পোষণ করা যায়।

১৯·২৮ **স্বনিযুক্ত কর্মসংস্থান :** উন্নয়নশীল দেশসমূহে আনুষ্ঠানিক খাতগুলোর মাসোহারা/মজুরী ভিত্তিক কর্মসংস্থান বিরাট সংখ্যার বেকারদের কর্ম-সংস্থানের দায়িত্ব গ্রহণ করার মত বৃহদাকারের নয়। এই সমস্যার একটী সম্ভাব্য সমাধান এই যে, সাধারণ শিক্ষাই হোক আর কারিগরী শিক্ষাই হোক, শিক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের বৃত্তিভাবী হবে সমাসতর্ক উদ্যোক্তামনা এবং তাঁরা স্বনিযুক্ত কর্মে ব্রতী হওয়ার আদর্শে হবেন দীক্ষিত। এই প্রক্রিয়া আরম্ভ করার প্রবর্তক-ভূমিকা প্রাগ্রোগিক বিদ্যাবিশারদগণের নিতে হবে। তাঁদের সফলতা তাঁদের সাথী প্রাগ্রোগিক বিজ্ঞজন এবং একাধিক বিষয়ে পারঙ্গম বিদগ্ধজনদেরকে অধিকতর বহুৎ হারে এবং অধিকতর সৃজনধর্মী প্রণালীতে স্বনিযুক্ত ব্যবস্থাপনে সমভাবে উৎসাহিত করবে।

১৯·২৯ আনুষ্ঠানিক খাতসমূহে আধুনিক প্রকৌশলী-বৃত্তিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্যে মাসো-হারা ভিত্তিক কর্মে নিয়োগের প্রত্যাশাপূর্ণ ঐতিহ্যবাহী একটি ধারণা সমাজের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। আধুনিক প্রকৌশলী-বৃত্তিতে প্রশিক্ষিত ব্যক্তিদের জন্যে স্বনিযুক্ত কর্ম-সংস্থানের লাভজনক সম্ভাবনা সম্পর্কে সমাজ পরিজ্ঞাত নয়। প্রাতিষ্ঠানিক সূত্রে বা উৎপাদন-শক্তে হাতে কলমে প্রদত্ত জ্ঞানের মারফৎ প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত আধুনিক প্রকৌশলী-বৃত্তিতে দক্ষতা অর্জনকারীদেরকে ধারে যন্ত্রপাতির যোগান প্রদান করে এবং পরামর্শ-সহায়তা দিয়ে জনশক্তি ব্যুরো তাঁদের মধ্যে স্বনিযুক্ত কর্মসংস্থান জনপ্রিয় করে তুলবে। স্বনিযুক্ত কর্মসংস্থা-নের জন্যে কোনও ব্যক্তিকে সজ্জিত করার খরচ উক্ত ব্যক্তি যে নির্দিষ্ট পেশার ব্রতী তার উপর নির্ভর করে, ৫০০০ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকা-এর মধ্যে উঠা-নামা করে।

১৯·৩০ কর্ম-সংস্থানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সকল সম্ভাবনা সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তা প্রশিক্ষণ, ঋণ প্রদান, পরামর্শমূলক সাহায্য এবং সর্বোপরি উদ্যোগ এবং সাংগঠনিক প্রচেষ্টা দ্বারা একটী বৃহৎ সমষ্টিতে অংগীভূত করা যেতে পারে। তাই, সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সমাজ কৃষ্টি ইন্সটিটিউট (বি এস সি আই), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বি আর ডি বি), বাংলাদেশ ব্যাংক, শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় ইত্যাদি প্রাসংগিক প্রশাসনগুলো যেখানে যথোচিত ভূমিকা পালন করে, তার সামগ্রিক মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনার অখণ্ড অংশ হিসেবে স্বনিযুক্ত কর্মসংস্থানের কর্মসূচী আর্থ-সামাজিক প্রশাসনরূপে রচিত হতে হবে। তৎসত্ত্বেও, কোনও একটি প্রশাখার কর্মতৎপরতা অন্যটির মত হুবহু এক নয়। উদাহরণ-স্বরূপ, স্বনির্ভর কর্মসংস্থান বৃদ্ধিমূলক পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচীগুলো, এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প সংস্থার উদ্যোগে স্বনির্ভর আন্দোলন তথা কুটীর শিল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জনশক্তি ও কর্মসংস্থাপন প্রশিক্ষণ ব্যুরোর কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্যে স্বনিযুক্ত কর্মসংস্থান, সমাজকল্যাণ পরিদফতরের পেশাগত পুনর্বাসন কর্মসূচী, এসব তাদের নিজস্ব চারিত্রিক স্বকীয়তা রয়েছে, রয়েছে নিজস্ব কেন্দ্রীভূত বিন্দু এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ঝোঁক এবং একীভূত জাতীয় মূলনীতির কাঠামোর অধীনে কর্মসূচীগুলোর স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রাখা ও নিজ নিজ প্রাসংগিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পরিচালিত হওয়া অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। জেলা জনশক্তি কার্যালয় জনশক্তি পরিকল্পনা কেন্দ্রের নীতি-নির্দেশের পটভূমিতে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করতে পারে এবং এ ব্যাপারে কলপ্রসূ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। ঐ সকল প্রচেষ্টার সম্পূরক হিসেবে, জেলা জনশক্তি কার্যালয়গুলো তাদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে সাধারণ বেকারদের জন্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির নিজস্ব কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে। কেবলমাত্র উন্নয়ন তহবিলের উপর নির্ভর না করে, ব্যাংক বিষয়ক এবং ঋণদান সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে বন্দোবস্তের পদক্ষেপ গ্রহণও অত্যাবশ্যক। এই পদক্ষেপ পরিণামে সমাজে স্বনিযুক্ত কর্মসংস্থান ব্যবস্থাকে একটি অর্থনৈতিক বিধান হিসেবে স্থাপিত করবে।

১৯·৩১ **কর্মসংস্থানের উপযোগিতা বৃদ্ধির জন্যে পুর্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী :** এ দেশে সাধারণ শিক্ষা-প্রাপ্ত বেকারগণ, বিশেষ করে, উচ্চ বিদ্যালয় ত্যাগী, প্রবেশিকা-উত্তীর্ণ এবং উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণরা বিরাটাকারে জমা হয়েছেন। পূর্বপ্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে, ন্যূনপক্ষে এর একটি অংশকে কোনও লাভ জনক পেশায় নিযুক্ত করা যেতে পারে। বৃত্তি মঞ্জুর করে, বিদ্যমান সরকারী ও বেসরকারী খাতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ সুবিধা ব্যবহার করে এদেরকে সংগঠিত করা এবং বিভিন্ন লাভজনক কর্মের জন্যে

প্রশিক্ষিত করা সম্ভব। এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রশাসনিক অংগ হিসেবে জনশক্তি ব্যুরোকে নিয়োগ করা যেতে পারে। যথাযোগ্য জীবন ধারণ ভাতা এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ বিদ্যা সরবরাহ করে এই পরিকল্পনা কালে ছ'মাসের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ১০টি দলে বিভক্ত করে ২,৫০০ প্রশিক্ষণার্থীর জন্যে ছ'মাস ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

১৯'৩২ **কেন্দ্রীয় কর্ম সংস্থানের মনিটরিং :** দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কর্ম নিয়োগ সংক্রান্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের তদারকী ব্যবস্থা প্রধান্য পাবে। এমন একটি প্রণালী গড়ে তোলা হবে যার অধীনে জনশক্তি মন্ত্রণালয় কর্মবিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়াদির কেন্দ্রীয় তদারকী পরিচালনা করতে পারবে। এতে তিনটি কাজের ভার বিজড়িত হবে :

(১) জনশক্তি মন্ত্রণালয় আর্থিক বছরব্যাপী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং চাকরী প্রার্থীদের বার্ষিক খতিয়ান বা স্থিতিপত্র প্রস্তুত করবে। এই স্থিতি পত্রের একদিকে প্রতিটি আর্থিক উপখাতে পেশার পর্যায় অনুসারে শিক্ষা/প্রশিক্ষণের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী স্থিরীকৃত অদক্ষ, অর্ধ দক্ষ এবং সুদক্ষ শ্রেণী বিন্যাসকৃত নতুন চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টির সংখ্যা থাকবে। এর অপরদিকে থাকবে ক্রমসম্প্রসারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারণে চাকুরীর বাজারে নিক্ষিপ্ত নতুন কর্মসংস্থানান্বেষীদের সংখ্যা এবং শিক্ষার পর্যায় ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শিক্ষা/প্রশিক্ষণ পদ্ধতি। বার্ষিক উন্নয়নের ফলশ্রুতিতে নীট সামগ্রিক পুঞ্জিত রাশির পুরোপুরি অবস্থাও একই সাথে প্রতিভাত হবে।

(২) জনশক্তি মন্ত্রণালয় প্রতিটি আর্থিক উপখাতের প্রত্যেকটি থেকে দক্ষতার স্তর ও শ্রেণ অনুযায়ী জনশক্তির রফতানীর হাল-নাগাদ হিসেব রাখবে এবং অর্থনীতির প্রতিটি শাখার উৎপাদনের উপর এই রফতানীর প্রতিক্রিয়া নিরূপণ করবে। এই হিসেব আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক চাহিদানুসারে শিক্ষিত/প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের শিক্ষা/প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার যে প্রকার পুঁবিন্যাস করতে হবে তার ইংগিতবাহীরূপে কাজ করবে এবং জনশক্তি রফতানী প্রশাসন স্থানীয় উৎপাদন/সেবা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পরিহারার্থে অনুমোদনযোগ্য রফতানী হার নিরূপণের সিদ্ধান্তের সুস্পষ্ট ইংগিত দেবে।

(৩) একটি অতিরিক্ত কর্ম-সংস্থান সৃষ্টির জন্যে মূলধন বিনিয়োগের পরিমাপ প্রদর্শনার্থে জনশক্তি মন্ত্রণালয় সরকারী ও বেসরকারী মালিকানাধীন এই উভয় খাতের সকল প্রকল্পে প্রয়োজনীয় শ্রমের পরিমাণ নিরূপণ করবে। এই কাজটি অর্থনীতির প্রত্যেক খাতওয়ারী হবে এবং শিক্ষাগত সমতুল্যতার সংজ্ঞানুসারে পেশা/দক্ষতার পর্যায়ের ভিত্তিতে নিরূপিত হবে। অবশ্য প্রয়োজনীয় হিসেবে, জনশক্তি মন্ত্রণালয় কর্ম-সংস্থানের দৃষ্টিকোণ থেকে সকল প্রকল্প-ছক পরীক্ষা করবে এবং সকল খাতের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সদস্য হবে।

১৯'৩৩ তদারকী নিরিক্ষণের (মনিটরিং) এমনি একটি ধারা প্রচলনার্থে জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের (১) একটি কর্ম-সংস্থান গবেষণা ইন্সটিটিউট এবং (২) সকল জেলা পর্যায়ে জনশক্তি ও কর্ম-সংস্থান কার্যালয় থাকবে। এ সকল ব্যাপারের জন্যে জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের নিকট উপযুক্ত আইনগত কাঠামো থাকা উচিত।

১৯.৩৪ **শ্রমের উৎপাদনশীলতা মনিটরিং :** অর্থনীতির সকল খাতে শ্রমের উৎপাদনশীলতার সাধারণ প্রবণতা অবিরাম নিরীক্ষণ প্রয়োজন। শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় এ কাজের ভার নেবে। এই পরিকল্পনাকালে এই কার্য সম্পাদনার্থে শ্রমিক উৎপাদনশীলতা নিরীক্ষনের একটি জাতীয় কেন্দ্র স্থাপিত হবে। সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতের উৎপাদন ইউনিট এবং সেবামূলক ইউনিটের নিকট থেকে শ্রম মন্ত্রণালয়ের নিকট এ জন্যে প্রয়োজন সকল উপাত্ত সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্যে একটি উপযুক্ত আইনগত ভিত্তি প্রয়োজন।

১৯'৩৫ **শ্রম-সম্পর্ক এবং শ্রমকল্যাণ :** নিম্নোক্ত বিষয়াদিতে শ্রম-সম্পর্কের উপর প্রশিক্ষণ ও ও গবেষণা চালানো প্রয়োজন : (১) শ্রম-সম্পর্কিত প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, পরীক্ষামূলক গবেষণা ও যোগাযোগ, (২) ট্রেড-ইউনিয়ন নেতাদের, তত্ত্বধারকগণের, প্রবীণ শ্রমিকদের, ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত এবং শ্রম-কার্যালয়াদিতে কর্মরত সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যক্তিবর্গের মধ্য-পর্যায়ের প্রশিক্ষণ, (৩) সাধারণ শ্রমিকদের উৎপাদনস্থলে নাগরিকতাবোধ ও প্রেরণা সৃষ্টিকারী শিক্ষা।

১৯'৩৬ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে, টঙ্গীস্থ শ্রম-সম্পর্ক ইনষ্টিটিউটকে শ্রম-সম্পর্কিত উচ্চ-পর্যায়ের প্রশিক্ষণ এবং গবেষণার উদ্দেশ্যে শ্রম-প্রশাসন সম্পর্কিত জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (নিলা)-এ রূপান্তরিত করার প্রস্তাব রাখা হচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানে শ্রম-প্রশাসনের উপর ডিপ্লোমা প্রদানের জন্যে একটি পাঠ্যধারা প্রবর্তন করা হবে। তদুপরি, শ্রমিক, ব্যবস্থাপনা এবং সরকারের মধ্যে নিয়মিত একটি যোগাযোগ মাধ্যম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিয়মিত ভিত্তিতে 'নিলা' সঠিক তথ্য এবং ধ্যান ধারণা প্রচার করবে।

১৯'৩৭ দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে নতুন কোনও প্রতিষ্ঠান গড়ার পরিবর্তে মধ্য পর্যায়ের প্রশিক্ষণের জন্যে রাজশাহী, খুলনা ও চট্টগ্রামে অধুনা-নির্মিত শিল্প-সম্পর্ক ইনষ্টিটিউটত্রয়ের (আই আর আই) ব্যাপক সদ্ব্যবহার হবে। সাধারণ শ্রমিকদের জন্যে প্রেরণা সৃষ্টিকারী শিক্ষার ব্যাপারে শিল্প সম্পর্ক ইনষ্টিটিউট এবং শ্রম-কল্যাণ কেন্দ্রসমূহের মধ্যে দায়িত্ব বন্টনের একটি কর্মোপযোগী পদ্ধতি রক্ষণ করা বিধেয়। শ্রম-সম্পর্ক ইনষ্টিটিউটগুলোতে শ্রমিকদের শিক্ষা কর্মসূচীর পরিকল্পনা এবং শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি প্রস্তুত করণ করা যায়। শ্রমিকদের উপর স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে এ সকল শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচী অবিরাম প্রক্রিয়ার একটি বিষয় হওয়া উচিত। এরূপ একটি ধ্রুব ফল পর্যালোচনাকর্ম (ফলোআপ) শ্রম-কল্যাণ কেন্দ্রের ন্যায় একটি স্থায়ী সংগঠনের দ্বারা করানো যায়। এতদভিন্ন শ্রম-কল্যাণ কেন্দ্রসমূহে, শ্রম সম্পর্ক ইনষ্টিটিউটগুলোতে এবং 'নিলা'-য় প্রদর্শনার্থ শ্রমিক শিক্ষার উপর কিছু প্রামাণ্য-চলচ্চিত্র প্রযোজনের জন্য আর্থিক বরাদ্দের প্রস্তাব করা হচ্ছে।

১৯.৩৮ শ্রম-উৎপাদনশীলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হচ্ছে শ্রমিক-শক্তির কল্যাণ সাধন। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে, বিদ্যমান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগত কাঠামোকে শ্রম-কল্যাণের জন্যে সুসংহত করার এবং শিল্প শ্রমিকদের জন্য শিক্ষা, চিকিৎসা এবং চিত্তবিনোদনমূলক সুযোগাদির অধিকতর ফলপ্রসূ বন্দোবস্ত করার জন্যে যেখানে অপরিহার্য সেখানে ঐ সকল কাঠামো বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেয়া হবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে তিনটি নতুন শ্রম-কল্যাণ কেন্দ্র (চট্টগ্রামে চা বাগান শ্রমিকদের জন্যে একটি সহ) স্থাপন করা হবে। তদুপরি, সড়ক পরিবহন শ্রমিকদের জন্যে ৪টি, অভ্যন্তরীণ জলপরিবহণ শ্রমিকদের জন্যে ৪টি এবং সিলেটের নির্বাচিত এলাকাসমূহের চা-বাগান শ্রমিকদের জন্যে অতিরিক্ত আরও ২টি শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করার কার্যাদি আরম্ভ করার প্রস্তাবও করা হচ্ছে।

১৯'৩৯ বাংলাদেশে কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শকরকে চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরের জাহাজগুলো পরিদর্শন করা এবং জাহাজগুলোকে নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদান করার বিনিময়ে সনদ-ফী আদায়ের (বিদেশী জাহাজের নিকট থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় ঐ ফী আদায় সহ) অধিকার প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশে এই ব্যাপারে সুষ্ঠু ব্যবস্থার অভাবহেতু, বাংলাদেশ বন্দরে নোংগরকারী প্রায় জাহাজই পরিদর্শন এবং সনদ গ্রহণ কার্যটি আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নিকট থেকে সম্পন্ন করে। পরীক্ষাকারী পেশাদার কর্মীদের এবং তৎসহ সাধারণ ডক কর্মকর্তা এবং কর্মীদেরকেও ডক নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে একটি ডক শ্রমিক নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হবে এবং সেইসাথে জাহাজগুলোর নিরাপত্তা সনদ প্রদান করার সুযোগ সুবিধেও সৃষ্ট হবে।

১৯.৪০ **বিবিধ :** এই পরিকল্পনাকালে উন্নয়ন এর প্রকল্পগুলোর সূত্রবদ্ধকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাস্তবায়ন এবং তদারকী বা মনিটরিং এর ব্যাপারে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়সমূহ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের পর্যায়ে যোগ্যতা সুসংহত করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা এবং পরিসংখ্যান কোষ সুসংহত করা হবে এবং কর্মচারীদেরকে উন্নয়ন পরিকল্পনা অধিবদ্ধবাদে, কার্যপ্রণালীতে এবং অনুশীলনচর্চার পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা হবে। একটি ভবিষ্যৎ-তহবিল এবং সামাজিক নিরাপত্তা কোষ সংগঠনার্থে ধারণা ও পরিসংখ্যানগত ভিত্তি পাওয়ার জন্যে এই পরিকল্পনাকালে একটি গবেষণা প্রকল্প হাতে নেয়া হবে।

আর্থিক বরাদ্দ

১৯.৪১ উপরোক্ত কর্মসূচীর আর্থিক দায় বাবদ ব্যপদেশে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জনশক্তি ও শ্রম খাতে ৬১.০০ কোটি টাকা (১৯৭৯-৮০ এর মূল্যে) বরাদ্দ করা হয়েছে। উপরোক্ত বরাদ্দের বার্ষিক পর্যায়ক্রমিক বাপ ১৯৭৯-৮০ সালের স্থির এবং চলতি এই উভয় মূল্যে নিম্নে দেখানো হোল :

(কোটি টাকায়)

মূল্য	১৯৮০/৮১	১৯৮১/৮২	১৯৮২/৮৩	১৯৮৩/৮৪	১৯৮৪/৮৫	মোট বরাদ্দ (১৯৮০—৮৫)
(১) স্থির মূল্যে	৯.৩৯	১৫.৭৫	১৩.৫০	১০.২৮	১২.০৮	৬১.০০
(২) চলতি মূল্যে	১০.৫২	১৯.৭৬	২০.৪৯	১৬.১৪	২১.০৯	৮৮.০০

বিংশ অধ্যায়

জন-প্রশাসন

২০·১ যে দেশে সরকারী খাত সার্বিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় একটি প্রধান স্থান দখল করে এবং বেসরকারী খাতের একটি বিরাট অংশ সরকারের নিয়ন্ত্রণমূলক ও উন্নয়নমূলক প্রভাবের আওতায় আসে, জন প্রশাসন সে দেশে বিশেষ গুরুত্ব পরিগ্রহ করে। বাংলাদেশের ন্যায় একটি উন্নয়নশীল দেশকে তার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আশা-আকাংখার সংগে সংগতি রেখে সরকারী চাকুরীতে দক্ষতা বিধানের উদ্দেশ্যে তার প্রশাসনিক সংগঠন, আর্থিক ও লোক নিয়োগ ব্যবস্থা এবং নিয়ম ও পদ্ধতি যুক্তি-যুক্তকরণের প্রতি গভীর দৃষ্টি প্রদান করতে হবে। একদিকে রাষ্ট্রের সনাতনী নিয়ামক ব্যবস্থা বহুল পরিমাণে বেড়ে চলেছে, অন্যদিকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সংগে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা এতো বেশী সংশ্লিষ্ট হচ্ছে যে তাতে প্রশাসনিক কাঠামোকে আর কিছুতেই উন্নয়ন পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকীর একটি নিছক ব্যবস্থা বলে গণ্য করা যায় না বরং একে উন্নয়ন প্রক্রিয়ারই একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান বলে গণ্য করতে হয়। তাই জন-প্রশাসন উন্নয়নের প্রশ্নটি দেশের উন্নয়ন-প্রচেষ্টার এক প্রান্ত বিন্দু থেকে এর কেন্দ্রস্থলে এসে অবস্থান নিয়েছে।

অতীত প্রচেষ্টার পর্যালোচনা

২০·২ অতীতে এদেশে জন-প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ ও উন্নতি বিধানের প্রচেষ্টা বেশ অসমন্বিত ছিল এবং লক্ষ্য, অগ্রাধিকার ও কর্ম-কৌশল মূলক একটি সুসংহত ও অখণ্ড পরিকল্পনার ভিত্তিতে একটি ব্যবস্থা হিসেবে এর উন্নয়নের জন্য তেমন কোন প্রচেষ্টা চালানো হয়নি। সংস্থাপন বিভাগের 'সংগঠন ও পদ্ধতি' উপ-শাখা আকস্মিক পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া ছাড়া একটি বিরতিহীন বিন্যাস বা প্রক্রিয়া হিসেবে কোন পদ্ধতি বিকাশে এখনও তার প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি। ফলে প্রশাসন ব্যবস্থার প্রশিক্ষণ, গবেষণা, কর্মচারীর-ব্যবস্থাপনার অফিস পদ্ধতি, পরিকল্পনা উন্নয়ন প্রক্রিয়া, রাজস্ব, হিসাবরক্ষণ, বাজেট তৈরী প্রভৃতি সকল কৌশলগত ক্ষেত্রে যথেষ্ট অপ্রতুলতা বিরাজ করছে।

২০·৩ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৭৩—৭৮) "শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ" খাতের অধীনে একটি উপখাত হিসেবে জন-প্রশাসনের বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য ১৩·১২ কোটি টাকার একটি পরিমিত ব্যয় বরাদ্দ ছিলো। তবে এসব প্রকল্পের অধিকাংশ জন-প্রশাসন উন্নয়নের জন্য প্রকৃতপক্ষে কোন কর্মসূচীর রূপ গ্রহণ করেনি। এই বরাদ্দ থেকে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে আনুমানিক ব্যয় হয় মাত্র ৪·০৬ কোটি টাকা এবং অন্যান্য কারণের মধ্যে অপর্যাপ্ত আত্মভূতকরণ ক্ষমতার দরুন অবশিষ্ট বরাদ্দের কোন সদ্ব্যবহার করা হয়নি।

২০·৪ সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জন-প্রশাসনের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের ফলে দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৮—৮০) কাঠামোতেই সর্বপ্রথম ১১·১২ কোটি টাকার বরাদ্দ সহ একটি পৃথক "জন-প্রশাসন" খাত সৃষ্টি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠে এবং এই বরাদ্দ থেকে আনুমানিক ৮·৯৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়। এ খাতের কর্মসূচীগুলো প্রধানতঃ প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীতে কেন্দ্রীভূত ছিলো। এসব কার্যাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

২০·৫ **প্রশিক্ষণ :** বাংলাদেশ প্রশাসনিক স্টাফ কলেজ (বি এ এস সি), জাতীয় জনপ্রশাসন ইনস্টিটিউট (নিপা), সিভিল অফিসার্স প্রশিক্ষণ একডেমী (কোটা) ও কর্মচারী প্রশিক্ষণ ইনসটিটিউট

(এস টি আই) কে নিয়ে প্রশাসনিক প্রশিক্ষণের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠিত এসব প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ সাফল্য নিম্নে সারণী ২০·১-এ প্রদর্শন করা হলো :

সারণী ২০·১

তুলনামূলক প্রশিক্ষণ অগ্রগতি

প্রতিষ্ঠান	প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের সংখ্যা		মোট
	প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা	
(১) বাংলাদেশ প্রশাসনিক স্টাফ কলেজ (বি এ এস সি)	৩০৩	৪৭	৩৫০
(২) জাতীয় জন-প্রশাসন ইনস্টিটিউট (নিপা)	২,১১৩	২,৭৮৭	*৪,৯০০
(৩) সিভিল অফিসার্স প্রশিক্ষণ একাডেমী (কোটা)	১৪৪	৩০৩	৩৪৭
(৪) স্টাফ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এস টি আই)	১,২০৯	২,৪৯২	*৩,৭০১

* বিশেষ কর্মসূচীর আওতায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তিদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২০·৬ অধিকন্তু, জন-প্রশাসনে জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন-প্রশাসন বিভাগ এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের পাঠ্যসূচী সরকারী প্রচেষ্টাকে পরিপূরন করেছে। ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কেন্দ্র, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার আঞ্চলিক পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, ব্যবস্থাপনা প্রশাসন ইনস্টিটিউট, কুমিল্লার সমবায় কলেজ এবং বিভিন্ন বিভাগীয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সরকারী খাতে নিয়োজিত কর্মচারীদের প্রশিক্ষণে বাস্তব অবদান রেখেছে।

২০·৭ দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের সুবিধা সম্প্রসারণ ও দৃঢ়করণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। প্রশাসনিক স্টাফ কলেজ, জাতীয় জন-প্রশাসন ইনস্টিটিউট এবং সিভিল অফিসার্স প্রশিক্ষণ একাডেমীকে একই অঙ্গনে স্থাপনের লক্ষ্যে জন-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (পি এ টি সি) প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত একটি প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়েছিল। হিসাব-রক্ষণ, হিসাব-নিরীক্ষা ও ব্যবসা-ব্যবস্থাপনায় বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদানকারী 'ইনস্টিটিউট অফ কস্ট এন্ড মেনেজমেন্ট একাউন্ট্যানটস্' এবং 'ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্স অব বাংলাদেশ' এর ভবন তৈরীর জন্য অর্থ প্রদান করা হয়েছিল। সাংবাদিকতা ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ঢাকার বাছিক মহকুমাকে প্রশিক্ষণ-দানের ক্ষমতা সম্পন্ন একটি প্রেস ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাছাড়া, চলচ্চিত্র নির্মাণে কলা-কৌশল ও প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করার জন্য অর্থ ও বেতার মন্ত্রণালয়ের বাছিক ঘাট জনকে প্রশিক্ষণ দানের ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ফিল্ম ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

২০·৮ গবেষণা : দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে জন-প্রশাসন খাতের গবেষণা কর্মসূচীগুলো জন-প্রশাসনের থেকে অর্থ-সামাজিক বিষয় এবং মানব সম্পদের উন্নয়নের সঙ্গেই প্রধানতঃ সংশ্লিষ্ট ছিল। ঐ সময়ে (ক) বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা ইনস্টিটিউট [বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ষ্টাডিজ (বি আই ডি এস)]-এর গবেষণা ক্ষমতা জোরদারকরণ, (খ) জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন গবেষণা কাউন্সে-

শানের ভবন নির্মাণ, (গ) সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ প্রতিষ্ঠা এবং (ঘ) 'কোটা'র একটি গবেষণা ও উন্নয়ন কোষ স্থাপনের প্রচেষ্টা করা হয়। নিপার তত্ত্বাবধানে প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ ও জনগণের অংশগ্রহণ সম্পর্কে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। অপর কতিপয় প্রতিষ্ঠান যেমন ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কেন্দ্র, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, আঞ্চলিক পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, ব্যবসা প্রশাসন ইনস্টিটিউট এবং সমবায় কলেজ নিজ নিজ দায়িত্বভুক্ত বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করে।

২০·৯ **অন্যান্য কর্মসূচী:** উপরে আলোচিত কর্মসূচী ছাড়াও অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সবক'টি প্রশাসনিক বিভাগ নিজ নিজ কার্যাবলীর আরও দক্ষ ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য জন-প্রশাসন খাত থেকে অর্থানুকূল্য লাভ করেছে।

২০·১০ প্রথম পঞ্চবার্ষিক ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এই খাতে বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের আর্থিক দিকটির একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নে প্রদান করা হলো:

সারণী ২০·২

তুলনামূলক আর্থিক অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্ষেত্র	প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩—৭৮)			দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮—৮০)		
	বরাদ্দ	ব্যয়	শতকরা হার	বরাদ্দ	ব্যয়	শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(ক) প্রশিক্ষণ	৭·০০	০·৫৬	৮·০০	৩·৮২	২·৯৮	৭৮·০১
(খ) গবেষণা	৩·১২	১·২৯	১৪·৩৫	৩·৭৩	২·৫৯	৬৯·৪৫
(গ) পরিসংখ্যান ব্যবস্থা উন্নয়ন	৩·০০	২·২১	৭৩·৬৭	২·৭৩	২·৮২	১০৩·৩০
(ঘ) সাংগঠনিক উন্নয়ন	..	..	..	০·৮৪	০·৫৯	৭০·২৪
মোট ..	১৩·১২	৪·০৬	৩০·৯৫	১১·১২	৮·৯৮	৮০·৭৬

২০·১১ **জন-প্রশাসন খাতের অন্যান্য প্রচেষ্টা:** স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধিকতর ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ ও পল্লী উন্নয়নের উপর যে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্থানীয় পর্যায়ে একটি পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও রিপোর্টিং প্রক্রিয়া ক্রমান্বয়ে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কতিপয় সুনির্দিষ্ট প্রায়োগিক কর্মসূচী রূপায়নের প্রচেষ্টা চালানো হয়। এ প্রচেষ্টার সাথে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম জড়িত। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, আঞ্চলিক পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, সমবায় কলেজ, আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউটগুলো, পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট ও স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়াও ৪৩০টি থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র রয়েছে, যেগুলো পল্লী উন্নয়ন ও স্থানীয় প্রশাসনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ দায়িত্ব পালন করে থাকে।

২০·১২ জাতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টার সঙ্গে সরাসরি ভাবে জড়িত সরকারী সংস্থা (কর্পোরেশন) ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা (এজেন্সী) দেশের সামগ্রিক প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় একটি কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যবস্থাপনায় নিষ্ক্রিয়তা, পর্যাপ্তভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপকের অপ্রতুলতা, কর্মচারী-প্রশাসন ব্যবস্থা ও পদ্ধতির অনুপযুক্ততা, মান্ধাতার আমলের আর্থিক ও হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা এবং অকার্যকর কর্মচারী-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এ সব সংস্থার সামগ্রিক কার্যসাধনকে প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করেছে। নিম্নমুখী উৎপাদনশীলতা, ঊর্দ্ধমুখী উৎপাদন ব্যয় এবং উৎপাদিত দ্রব্যের নিম্নতর মান এর সাক্ষ্য বহন করে। আলোচ্য সময়ে যৌথ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য প্রাপ্ত সুবিধাদি ও শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ সুবিধাদিও মোটেই সন্তোষজনক ছিল না।

২০·১৩ দেশের বর্তমান বাজেট-প্রণয়ন পদ্ধতি, হিসাব-রক্ষণ ব্যবস্থা সেকেলে ধরণের এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজনের সংগে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এগুলো আর আধুনিক ব্যয়-বিশ্লেষণ ও ব্যবস্থা-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন মিটায় না। তদুপরি, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীনে একটি হিসাব-নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ একাডেমী, আয়কর বিভাগের অধিনে একটি প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর এবং চট্টগ্রামে সদ্য প্রতিষ্ঠিত শুল্ক ও আবগারী একাডেমী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, হিসাব-রক্ষণ ও হিসাব-নিরীক্ষা সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বর্তমান কর্মচারীবৃন্দের মধ্যে পেশাগত উৎকর্ষতার উচ্চমানের অভাব রয়েছে। অবশ্য ব্যাংকে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্যে প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদি এই এলাকার বর্তমান প্রয়োজনকে মেটাবার জন্য অধিকতর ব্যাপক।

২০·১৪ উপরে আলোচিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ছাড়াও পেশাগত ক্ষেত্রে এবং কারিগরী বৃত্তিমূলক পেশায় প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে উন্নীত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী

২০·১৫ একটি দক্ষ ও কার্যকর পাবলিক সার্ভিস গড়ে তোলাই হচ্ছে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জন-প্রশাসন কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য। কতিপয় উপাদান যেমন (১) চাকুরীর জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাব, (২) পদ্ধতি ও কাঠামো, (৩) কর্মচারীদের প্রেরণাবোধ ও প্রদত্ত দায়িত্বের সংগে তাঁদের একাত্মতা এবং (৪) তথ্য ও উপাত্তের সমাবেশ ইত্যাদির উপর প্রশাসনিক দক্ষতা নির্ভরশীল। পাবলিক সার্ভিসে দক্ষতা অর্জনে এ সব উপাদানের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ১নং চিত্রে প্রদর্শন করা হল:

চিত্র-১

প্রশাসনিক উন্নয়ন কার্যক্রমের পারস্পরিক সম্পর্ক

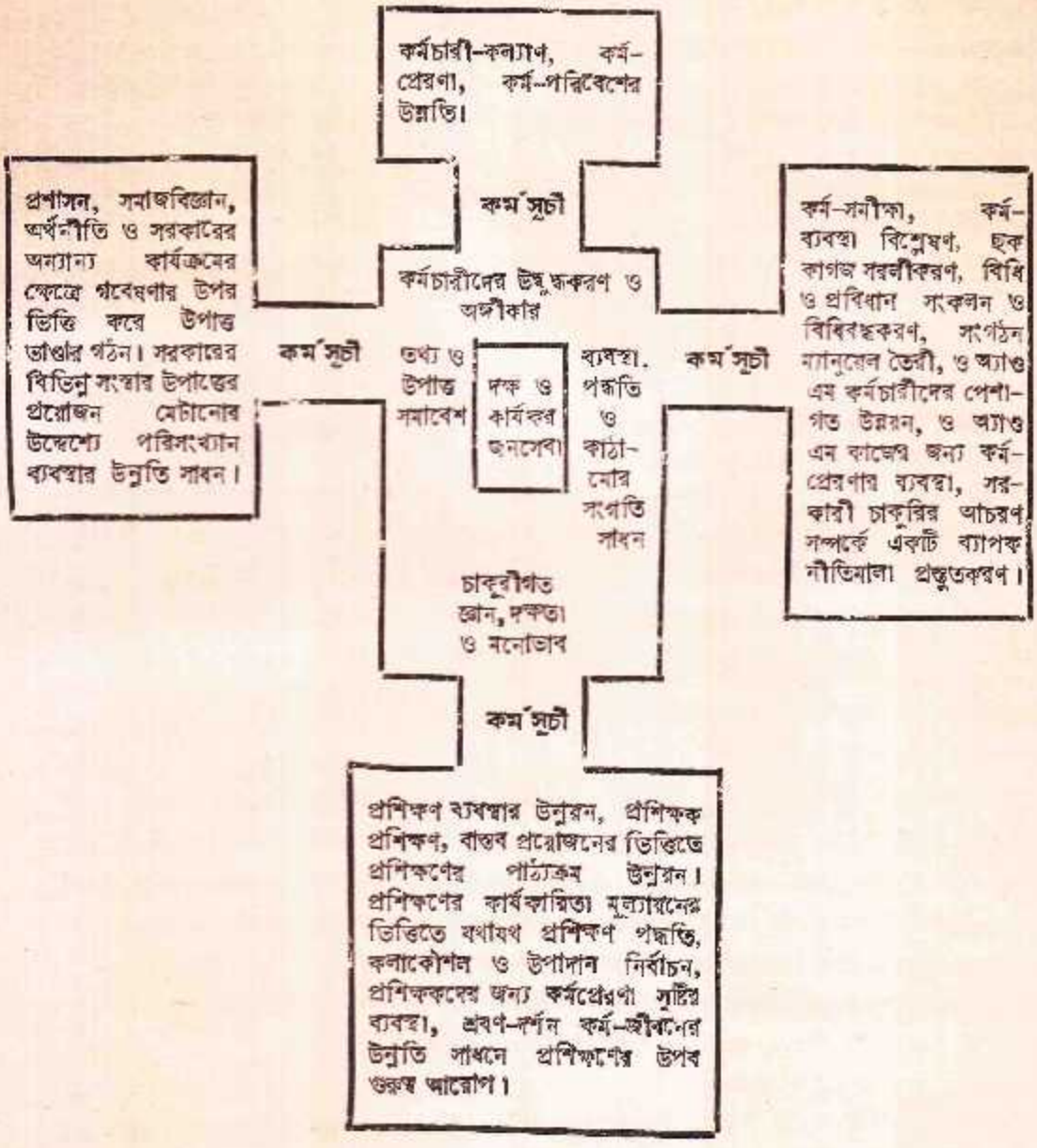

২০·১৬ দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার সামগ্রিক লক্ষ্যের আওতায় জন-প্রশাসন খাতের উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ :-

(১) প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় নিয়মাবদ্ধ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সরকারী কর্মচারীদের চাকুরীগত জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নতি সাধনের সাথে সাথে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী উন্নয়ন;

(২) সরকারী চাকুরীতে বিশেষজ্ঞতা ও পেশাগত উৎকর্ষতা বর্ধনকল্পে কর্মচারী ব্যবস্থাপনায়, কর্মজীবন পরিকল্পনা প্রবর্তন ;

(৩) প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে জন-প্রশাসন ক্ষেত্রের তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিকে উন্নতকরণ;

(৪) সরকারী অফিস ও অন্যান্য সংস্থার ব্যবস্থা পদ্ধতি ও কাঠামোর যুক্তিযুক্ত রূপায়ন;

(৫) প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য হিসাব রক্ষণ, বাজেট-প্রণয়ন ও আর্থিক-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সংস্করণ ;

(৬) স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোতে পল্লী উন্নয়নের জন্য প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সমর্থ আত্মনির্ভরশীল এক একটি প্রশাসনিক একককে পরিণত করে তোলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান ;

(৭) প্রশাসনিক নিবৃত্তি ও সংস্কারের মাধ্যমে সরকারী চাকুরীতে দুর্নীতি ও অসদাচরণের নিয়ন্ত্রণ ;

(৮) কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও কাজ ভিত্তিক উদ্দীপনা প্রদানের মাধ্যমে সরকারী কর্মচারীদের নৈতিক অবস্থার উন্নতি ; এবং

(৯) সরকারী চাকুরীতে কর্মদক্ষতা ও কার্যকারিতার উন্নতি সাধন, অপ্রয়োজনীয় অফিস ও সংস্থার উচ্ছেদ সাধন, আমলাতন্ত্রের বাহুল্য বর্জন ও পাবলিক সার্ভিস সম্প্রসারণের উপর নিয়ন্ত্রণ।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মকৌশল

২০·১৭ জন-প্রশাসনকে একটি ব্যবস্থারূপে উন্নয়নের জন্য স্বভাবতই বিভিন্ন খাতে প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে। মন্ত্রণালয়/সংস্থাগুলোতে তাদের নিজ নিজ সাংগঠনিক লক্ষ্য ও প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচী চালু করতে হইবে। অবশ্য একটি একীভূত জাতীয় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন নীতির আওতায় অধিকতর সমন্বয় ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে জন-প্রশাসন ক্ষেত্রে সরকারের একটি একক অঙ্গকে কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসাবে কাজ করতে হবে, যেমনটি হয়ে থাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন খাতে। কর্ম বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সংস্থাপন বিভাগের পক্ষে জন-প্রশাসনের সর্বপ্রকার উন্নয়ন তৎপরতায় সমন্বয়কারীর ভূমিকা গ্রহণ সবচেয়ে উপযুক্ত ও কার্যকর হবে। এ খাতে উন্নয়ন কর্মসূচীর বৃহত্তম উপাদানগুলো হবে কর্মচারী প্রশিক্ষণ, প্রশাসনিক গবেষণা ও পদ্ধতি আধুনিকীকরণ।

২০·১৮ সংস্থাপন বিভাগের আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে জন-প্রশাসন খাতের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা বিষয়ক কর্মসূচীগুলো বাস্তবায়িত হলেও পল্লী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা, শিল্প ও অর্থ, প্রভৃতি খাতের অধীনেও প্রশিক্ষণ, শিক্ষা এবং গবেষণার বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে হবে। অন্যান্য খাতের অধীনে প্রশাসনিক উন্নয়ন কর্মসূচীগুলো যতোটা সম্ভব জন-প্রশাসনে উন্নয়নের জাতীয় উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। নিজ নিজ ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক তৎপরতার কার্যকর বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধানের জন্য নির্বাহী প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক আয়োজন নিশ্চিত করতে হবে।

২০·১৯ কর্মচারী প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি সংক্রান্ত প্রকল্পগুলোকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। উন্নয়ন প্রকল্প তৈরীর সময় ইট-সুড়কীর চাইতে প্রকল্পের কার্য-সম্পাদনমূলক দিক-গুলোর উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হবে। তহবিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে যাতে প্রশিক্ষণের অত্যাবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠানিক সুবিধাগুলো চালু হয় তা নিশ্চিত করা হবে। এতে পরিকল্পনার কাজ চালু হওয়ার অব্যবহিত পরই প্রশাসন ব্যবস্থা প্রশিক্ষণ থেকে উপকারিতা লাভ করতে শুরু করবে।

২০·২০ পল্লী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ও শিল্প, খাতে জন-প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সংগে সংশ্লিষ্ট কর্মসূচাসমূহের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করা হবে। সেজন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ সব খাতের বিনিয়োগকেও জন-প্রশাসন খাতে মোট বিনিয়োগের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরতে হবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান প্রধান কর্মসূচী

২০·২১ প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ, সাংগঠনিক উন্নয়ন, ব্যবস্থা ও পদ্ধতির আধুনিকীকরণ, ব্যবস্থাপনা ও মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রায়োগিক গবেষণা এবং কর্মচারীদের অনুপ্রেরণা প্রদান সংক্রান্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প জন-প্রশাসন খাতের কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এগুলো নিম্নে কয়েকটি অনুচ্ছেদে আলোচিত হলো :

২০·২২ **প্রশিক্ষণ :** প্রশিক্ষণ নীতি সমূহের মূল্যায়ন, বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কাঠামোর সুসংহতকরণ ও উন্নয়ন এবং পর্যায়ক্রমে এই কাঠামোর সম্প্রসারণ এ সব বিষয়ের উপর সংস্থাপন বিভাগকে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে বিনিয়োগকে অর্থবহ করে তোলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নির্ধারণের জন্য প্রায়োগিক গবেষণা, দেশীয় প্রশিক্ষণ সামগ্রীর উন্নয়ন, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ কৌশল ও পাঠক্রম উদ্ভাবন এবং প্রশিক্ষণের প্রভাব সম্পর্কে বাস্তব মূল্যায়ন প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হবে। প্রায়োগিক পর্যায়ে এ কর্মসূচীর লক্ষ্য হবে প্রশিক্ষণার্থীদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সনাক্তকরণ, বিভিন্ন প্রশিক্ষণার্থী গোষ্ঠির (গ্রুপের) আপেক্ষিক অগ্রাধিকার নির্ণয় এবং প্রশিক্ষণমূলক কার্য-কলাপ সম্পর্কে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সমর্থন প্রদান, যাতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে প্রশিক্ষণার্থী ও প্রশিক্ষক উভয়ের কর্ম-জীবনে প্রেরণা, আন্তঃ সংস্থা গতিময়, এবং সরকারের কর্মচারী-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় সরকারের প্রশিক্ষণ-উপাদান যোগানকীতে সক্ষম একটি নিয়ন্ত্রণ-যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

২০·২৩ সরকারী কর্মচারীদের প্রশিক্ষণকে ব্যাপকতর প্রেক্ষাপটে কর্মচারী ব্যবস্থাপনার নীতি ও পদ্ধতির সংগে অবশ্যই সংগতিপূর্ণ হতে হবে এবং সে জন্য একটি জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতির কাঠামোর মধ্যে প্রশিক্ষণ খাতের বিনিয়োগ পরিকল্পনা অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে। সদ্য প্রতিষ্ঠিত জাতীয় প্রশিক্ষণ পরিষদ এরূপ নীতি প্রণয়ন করবেন বলে আশা করা যায়।

২০·২৪ জন-প্রশাসন প্রশিক্ষণের তিনটি প্রতিষ্ঠানকে (বাংলাদেশ প্রশাসনিক স্টাফ কলেজ, জাতীয় জন-প্রশাসন ইনষ্টিটিউট ও সিভিল অফিসার্স প্রশিক্ষণ একাডেমী) বর্ধিত সুযোগ-সুবিধা সহ একটি জন-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্সের অধীনে আরো উন্নত করা হবে। এগুলো একই অঞ্চলে অবস্থিত হবে কিন্তু কার্য সম্পাদনে নিজেদের স্বায়ত্তশাসন ও পৃথক সত্ত্বা বজায় রাখবে। সম্পূর্ণভাবে উন্নয়নের পর প্রশাসনিক স্টাফ কলেজ, জাতীয় জন-প্রশাসন ইনষ্টিটিউট ও সিভিল অফিসার্স প্রশিক্ষণ একাডেমীর বার্ষিক প্রশিক্ষণ ক্ষমতা যথাক্রমে ৩০০, ৫০০ ও ৪০০ হবে।

২০·২৫ সচিবালয় ও সংযুক্ত বিভাগ/অফিসগুলোতে ১৯৮৫ সালে অফিসারদের আনুমানিক সংখ্যা হবে ২৪,৫০০। যার মধ্যে আনুমানিক ৯,৯০০ জন স্টাফ কলেজ, নিপা ও কোটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় আসবে। ১৯৮০—৮৫ সালে এ সব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৬,০০০ অফিসারকে প্রশিক্ষণ প্রদান সম্ভব হবে। ফলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক মেয়াদে প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন এরূপ শতকরা ৬১ ভাগ অফিসারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাবে। নতুন কাডার ব্যবস্থপনা পদ্ধতিতে পেশাগত ও কারিগরী চাকুরীতে যোগদানকারীদেরও প্রশাসনিক বিষয়ে মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। বর্তমান জন-প্রশাসন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার আওতায় বিশেষ ভাবে পরিকল্পিত স্বল্প মেয়াদী কোর্সের মাধ্যমে এ ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২০'২৬ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্টাফ প্রশিক্ষণকে উচ্চতর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। দক্ষতার উপর ধনাত্মক প্রভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে অপরিহার্য ভাবে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোতে অধিকতর সংখ্যায় প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করা হবে। ঢাকা ও বিভাগীয় সদর দপ্তরগুলোতে বিদ্যমান স্টাফ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলোকে অধিকতর শক্তিশালী করা হবে। এই প্রশিক্ষণ কাঠামোর বার্ষিক প্রশিক্ষণ ক্ষমতা হবে ১,৯৫০। "প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের" বিশেষ বন্দোবস্ত করা হবে। এই প্রশিক্ষকগণ প্রধান প্রধান বিভাগ ও সংস্থাগুলোতে প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন।

২০'২৭ ১৯৮৫ সালে কর্মচারী ও অফিস স্টাফের আনুমানিক সংখ্যা হবে ১,৫০,০০০ জন, যার মধ্যে ১,০৬,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজন হবে। স্টাফ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের নিয়মিত কর্মসূচীর মাধ্যমে ৯,৭৫০ জনকে এবং বিশেষভাবে পরিকল্পিত দ্রুত সুফলদায়ক (ক্র্যাশ প্রোগ্রাম) কর্মসূচীর মাধ্যমে ১২,০০০ জন সর্বমোট ২১,৭৫০ জন স্টাফকে প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হবে। অতএব পরিকল্পনা মেয়াদে স্টাফ প্রশিক্ষণের পরিমাণ দাঁড়াবে শতকরা ২১ ভাগ। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জন-প্রশাসন খাতে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যসমূহ সারণী ২০'৩ এ প্রদর্শিত হয়েছে:

সারণী ২০'৩

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮০—৮৫) প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা

অফিসার/স্টাফ প্রশিক্ষণ ইন-স্টিটিউট	বার্ষিক প্রশিক্ষণ ক্ষমতা	পাঁচ বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা	যাঁদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন তাঁদের আনুমানিক সংখ্যা	শতকরা হিসাব
বি এ এস সি	৩০০	১,৫০০	..	..
নিপা	৫০০	২,৫০০	..	..
কোটা	৪০০	২,০০০	..	..
মোট (অফিসার)	১,২০০	৬,০০০	৯,৯০০	৬১
এস টি আই এবং এর বিভাগীয় কেন্দ্রগুলো	১,৯৫০	৯,৭৫০	..	..
দ্রুত সুফলদায়ক কর্মসূচী (ক্র্যাশ প্রোগ্রাম)	২,৪০০	১২,০০০	..	..
মোট (স্টাফ)	৪,৩৫০	২১,৭৫০	১,০৬,০০০	২১

২০'২৮ প্রশাসনিক পুনর্গঠন এবং অফিসে যান্ত্রিক ও স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে প্রায়ই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মচারী, বিশেষ করে নিম্নস্তরের কর্মচারী উদ্বৃত্ত হয়। এঁদেরকে যদি প্রয়োজনীয় দক্ষতায় ও পেশায় পুনঃ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, তাহলে তাঁরা পুনর্গঠিত ব্যবস্থায় কিংবা সরকারী অফিসের বাইরেও অন্যান্য পেশাগত ক্ষেত্রে লাভজনক ভাবে আত্মীকৃত হতে পারেন। সচিবালয়ের কাজে, বৃত্তিমূলক দক্ষতায় এবং বিভিন্ন পেশায় প্রশিক্ষণের যে সব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে তার মাধ্যমে প্রয়োজন বোধে এসব উদ্বৃত্ত কর্মচারীকে পুনঃ প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।

২০'২৯ শুধু প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার অধিকতর সম্প্রসারণ যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতে পারে না। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মচারীদের যথাযথ কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে তাদের যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য সংস্থাপন বিভাগকে কর্ম-জীবন পরিকল্পনার একটি নীতি উদ্ভাবন করতে হবে। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে সক্ষম প্রশিক্ষক সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে একটি প্রশিক্ষণ ভাণ্ডার (পুল) সৃষ্টির ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বের সংগে বিবেচনা করতে হবে।

২০.৩০ **পরিকল্পনা ব্যবস্থার উন্নয়ন :** পরিকল্পনার কারিগরী পারদর্শিতা উন্নতি সাধনের জন্য পরিকল্পনা কমিশন এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ও সংস্থার পরিকল্পনা কোষের কর্মকর্তাদের প্রকল্প রূপায়ন, প্রকল্পের প্রাক-বিনিয়োগ মূল্যায়ন, কার্যক্রম প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, তদারকী ও মূল্যায়নের বিশেষ প্রতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনই উপযুক্ত সংগঠন বলে বিবেচনা করা হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় একটি পরিকল্পনা একাডেমী স্থাপিত হবে বলে স্থির করা হয়েছে।

২০.৩১ **গবেষণা :** দেশের প্রশাসন ব্যবস্থার কাঠামো, পদ্ধতি ও কর্মসূচীর উন্নতিকল্পে প্রশাসন সংক্রান্ত গবেষণা নিয়মিত ভিত্তিতে পরিচালনা করতে হবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিম্নে কর্মসূচীগুলো গ্রহণ করা হয়েছে :

(১) সংস্থাপন বিভাগের প্রশিক্ষণ ও কর্ম-জীবন পরিকল্পনা উপ-বিভাগ কর্মচারী-ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করবে, যার বিশেষ উদ্দেশ্য হবে কর্মচারীদের প্রয়োজন নিরূপন, কর্মচারী সংক্রান্ত নীতির পুনরীক্ষণ এবং কর্মচারী প্রশাসনে উন্নতি বিধানের উপায় সন্ধান।

(২) কোটায় বর্তমান গবেষণা উন্নয়ন কোষকে আরো শক্তিশালী করা হবে এবং স্টাফ কলেজ ও নিপার অনুরূপ গবেষণা ও উন্নয়ন কোষ স্থাপন করা হবে। এতে প্রশিক্ষণের সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনগুলো সনাক্ত করণ, চাকুরীর সুনির্দিষ্ট বিষয় নির্ধারণ, চাকুরী বিশ্লেষণ এবং কার্য সম্পাদনের মান, উপাদান ও সহায়ক উপকরণ, প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মূল্যায়ণ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেয়া হবে।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণার উল্লেখযোগ্য বাস্তব সুযোগ সুবিধা ও সম্ভাবনা রয়েছে, তাই এগুলোকে ক্রমবর্ধমান ভাবে এ প্রক্রিয়ার সংগে যুক্ত করা হবে। দেশে ও দেশের বাইরের বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা থেকে সুযোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে এদের সংগে সংযোগ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানো হবে।

২০.৩২ এ ছাড়াও মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে গবেষণার প্রতিষ্ঠানিক উন্নয়নের জন্য একটি কতিপয় কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজে জনশক্তি উন্নয়ন ও ব্যবহার সম্পর্কে সমীক্ষা ও গবেষণা চালানোর জন্য একটি উপ-বিভাগ এবং জনসংখ্যা সমীক্ষার জন্য অপর একটি উপ-বিভাগ থাকবে। বি আই ডি এস-এর নিজস্ব অঙ্গন নির্মাণ করা হবে এবং সেটি ব্যবহারে আনা হবে। পরিকল্পনা কমিশনের আওতায় সামাজিক বিজ্ঞান পরিষদ আর্থ-সামাজিক বিষয়ে গবেষণা তৎপরতার সমন্বয়কে জোরদার করবে।

২০.৩৩ **কর্মচারী ব্যবস্থাপনা :** প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও মান সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের দক্ষতার উপর নির্ভরশীল। প্রশাসনের অনেক প্রধান ক্ষেত্রে যথাযথ প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত জনশক্তির ঘাটতি কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের উদ্বৃত্ত, নিয়োগের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যহীনতা এবং সুষ্ঠ কর্মচারী নীতি ও কর্মজীবন পরিকল্পনা অবর্তমানে প্রশাসন যন্ত্রের উন্নতির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে নিম্নে। ব্যবস্থাগুলো গ্রহণের প্রস্তাব করা হচ্ছে :

(১) সরকারী চাকুরীর সকল শাখার কর্মচারীদের মেধা, কর্তব্য পালনে তৎপরতা ও উপযুক্ততার ভিত্তিতে তাদের চাকুরী জীবনে অগ্রগতির সমান সুযোগ-সুবিধা বিধানের জন্য পর্যায়ক্রমে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(২) চাকুরীর সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর প্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত ক্ষমতার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে যতটা সম্ভব কার্য সম্পাদনের বাস্তব মূল্যায়ন করতে হবে এবং কর্মচারীদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় রেকর্ড তৈরীর জন্য নিয়মিতভাবে এগুলো মূল্যায়ন প্রতিবেদন পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করতে হবে।

(৩) প্রশাসনিক বিশেষজ্ঞতার উন্নয়নের জন্য এবং সরকারী চাকুরীতে সুদীর্ঘ কর্মজীবনের প্রেক্ষিতে সৃষ্টির জন্য প্রশাসনে কর্ম-জীবন পরিকল্পনা প্রবর্তন করতে হবে।

২০.৩৪ **প্রশাসনিক জবাবদিহি ব্যবস্থা ও অপব্যবহারের নিয়ন্ত্রণ ঃ** দুর্নীতি ও প্রশাসনিক অনিয়মের সমস্যাটিকে অধিকতর নিরপেক্ষভাবে ও সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ করতে হবে, যাতে এর কারণগুলো চিহ্নিত করা যায় ও উপযুক্ত প্রতিকার ব্যবস্থার প্রস্তাব করা যায়। প্রশাসনিক দুর্নীতির ঘটনা রোধের জন্য সুরূপ ও দীর্ঘ-মেয়াদী এই উভয় রকমের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নিম্নোক্ত সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে :

(১) কোন বিষয় নিষ্পত্তিতে বিলম্ব পরিহার, দুর্নীতির সুযোগ হ্রাস এবং সরকারী ক্ষমতা ও সুযোগের অপব্যবহার রোধের জন্য বর্তমান পদ্ধতি, বিধি ও প্রবিধানাদি সহজ ও যুক্তি-ভিত্তিক করতে হবে। ব্যক্তি বিশেষের অবাধ ক্ষমতাকে হ্রাস করতে হবে এবং আর্থিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কমিটি ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

(২) উচ্চতর পর্যায়ের অফিসারদের দ্বারা কড়াকড়িভাবে নিয়মিত পরিদর্শন ও তদারকীর ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) দ্রব্য তালিকা রক্ষক দফ ও কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের সাথে সরকারী বিভাগ ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর ক্রয়-পদ্ধতির সুষ্ঠুতা বিধান করতে হবে।

(৪) উচ্চমানের পেশাগত দক্ষতা সহকারে বাজেট প্রণয়ন ও আর্থিক নিয়মাবলী প্রয়োগ করা উচিৎ। সরকারী তহবিলের ব্যবস্থাপনার বিধি ও পদ্ধতি অনুসরণ সুনিশ্চিত করার জন্য তদারককারী অফিসারদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং একটি প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র হিসাবে কার্যসম্পাদন নীতি ও মাপকাঠির উদ্ভাবন করতে হবে।

২০.৩৫ **সংগঠন ও পদ্ধতি ঃ** সংস্থাপন বিভাগের ও অ্যাণ্ড এম (O&M) উপ-বিভাগকে পুনর্গঠন এবং কার্য-সম্পাদনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট শক্তিশালী ও উন্নত করতে হবে। এতে গবেষণায় সক্ষম ও পদ্ধতিমূলক কাজে বিশেষজ্ঞ এবং পেশাগতভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন অফিসার ও স্টাফের প্রয়োজন। বর্তমান নিয়ম পদ্ধতি সহজ ও বিধিবদ্ধ করার জন্য এবং নতুন পদ্ধতি ও কলাকৌশল প্রবর্তনের জন্য বহুবিধ কাজ রয়েছে। প্রবিধান শাখার সংগে পরামর্শক্রমে ও অ্যাণ্ড এম শাখার সহায়তায় বিধি ও প্রবিধান সমূহের আধিক্য ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত সমস্যাবলীর সমাধান করা। নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণের সুপারিশ করা যাচ্ছে :

(১) একটি অধিকতর দক্ষ ও প্রগতিশীল প্রশাসনের স্বার্থে ও অ্যাণ্ড এম উপ-বিভাগকে সরকারী অফিসে কার্য সম্পাদনের ধরণ, রেকর্ড ও দলিলপত্র সংরক্ষণ এবং কার্য সম্পাদন বিলম্বের কারণ নির্ণয় এবং কাঠামোগত কর্ম-পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য যথাযথভাবে সমীক্ষা পরিচালনা করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ও এণ্ড এম অফিসারকে প্রশিক্ষণ দানের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থাদি করতে হবে।

(২) মন্ত্রণালয়গুলোকে তাদের নতুন উন্নয়নমূলক ভূমিকার প্রেক্ষিতে অভিন্ন ব্যবস্থা-পদ্ধতি ও কাঠামো যুক্তিভিত্তিক করে তোলার জন্য ব্যাপকভাবে পুনর্গঠিত করতে হবে। পরীক্ষা-মূলকভাবে কতিপয় নির্বাচিত মন্ত্রণালয়ে এ ধরণের পুনর্গঠনের কাজ শুরু করা উচিত।

২০·৩৬ **কর্মচারী কল্যাণ:** সরকারী কর্মচারীদের অনুপ্রেরণার মাত্রা বৃদ্ধির জন্য সতর্কভাবে প্রণীত একটি উদ্দীপনা পদ্ধতির আওতায় কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তরের কর্মসূচীগুলোতে অবশ্যই উচ্চতর ও উৎপাদনশীলতার প্রেরণা হিসাবে কাজে লাগাতে হবে। কর্মচারীদের জীবন ধারন ও তাদের কাজের পরিবেশের উন্নতি সাধন করতে হবে। কর্মচারীদের মানসিক স্বাস্থ্য, চিত্তবিনোদন, শিক্ষা ও বাসস্থানের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি দিতে হবে। প্রশাসনে মিতব্যয়িতা ও দক্ষতার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থাসহ পরামর্শ দান পদ্ধতি প্রবর্তন ও উৎসাহিত করা উচিত।

২০·৩৭ **ব্যবস্থপনা উন্নয়ন:** দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সরকারী খাতের কর্পোরেশন/সংস্থাগুলো যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে তার প্রতি দৃষ্টি রেখে তাদের ব্যবস্থাপনা শক্তি উন্নতির জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

২০·৩৮ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সরকারী খাতে পরিচালিত শিল্প সমূহে যথেষ্ট পরিমাণ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের প্রয়োজন দেখা দিবে এবং তা সারণী ২০·৪ এ অবলোকন করা যেতে পারে:

সারণী ২০·৪

দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারী খাতের শিল্প সমূহে ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের প্রয়োজন সংক্রান্ত অভিক্ষেপ

স্তর	১৯৮০/৮১	১৯৮১/৮২	১৯৮২/৮৩	১৯৮৩/৮৪	১৯৮৪/৮৫	মোট ১৯৮০—৮৫
(১) ব্যবস্থাপনা	৪৮৩	৫৫০	৬৬৩	৮৫৯	১,১১২	৩,৬৭৫
	(৫·৬৮)	(৬·৩৪)	(৬·৬৫)	(৭·৫)	(৮·৫)	(৭·১০)
(২) মাঝারী ব্যবস্থাপনা	৩,০৭১	৩,০৭১	৩,৭৮৫	৪,৪৬৮	৫,২৭০	১৯,৬৬৫
	(৩৬·১৭)	(৩৫·৪৪)	(৩৮·০)	(৩৯·০)	(৪০·০)	(৩৮·০)
(৩) জুনিয়র ব্যবস্থাপনা তদকারী ব্যবস্থাপনা	৪,৯৫০	৫,০৪৩	৫,৫১৫	৬,১৩০	৬,৭৮৫	২৮,৪১৩
	(৫৮·১৫)	(৫৮·২২)	(৫৫·৩৫)	(৫৩·৫)	(৫১·৫)	(৫৪·৯০)
মোট ...	৮,৪৯৪	৮,৬৬৪	৯,৯৬৩	১১,৪৫৭	১৩,১৭৫	৫১,৭৫৩
	(১০০)	(১০০)	(১০০)	(১০০)	(১০০)	(১০০)
বাংলাদেশ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কেন্দ্র (বি এম ডি সি) এর অংশ, শতকরা হিসাবে	১৯·২	২২·০	২০·৬	২১·৪	২১·৭	২১·০৬

বন্ধনীভুক্ত অংকে মোট সংখ্যার তুলনায় প্রত্যেক স্তরের শতকরা হার দেখানো হয়েছে।

২০·৩৯ ব্যবস্থাপনার সর্বপ্রকার প্রশিক্ষণমূলক কার্যকলাপ একটি জাতীয় ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন নীতির সামগ্রিক কাঠামো ও বিস্তারিত নির্দেশনার অধীনে অনুসৃত হওয়া উচিত। জাতীয় প্রশিক্ষণ পরিষদের উদ্যোগে যে জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতি রূপায়িত হচ্ছে এটি তারই অংশ হবে।

২০·৪০ সরকারী কর্পোরেশন/সংস্থা এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নির্বাহী সরবরাহের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রমের সুপারিশ করা হলো:

(১) দেশে ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পরামর্শ ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্রিক ভিত্তি গড়ে তোলার জন্য বি এম ডি সির অধীন সুবিধাসমূহ আরো সম্প্রসারিত করতে হবে। ঢাকা কেন্দ্র এবং চট্টগ্রামস্থ উপ-কেন্দ্র ছাড়াও খুলনা এবং রংপুরে বি এম ডি সির আরো দু'টি উপকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।

(২) শিল্প খাত সমূহের নিম্নতর স্তরের ব্যবস্থাপকদের ও তত্ত্বধারকদের (সুপারভাইজার) প্রশিক্ষণ প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য একটি বিশেষ ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(৩) সরকারী খাতে অর্থ বিনিয়োগ করে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পরামর্শ দানের সুযোগ সুবিধা বিধানের মাধ্যমে বেসরকারী খাতের ব্যবস্থাপনার সহায়তা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

(৪) ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসা সংক্রান্ত শিক্ষার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য এবং একই সংগে কার্যরত নির্বাহীদের প্রশিক্ষণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসা প্রশাসন ইন্সটিটিউটের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

২০·৪১ সরকারী খাতের প্রধান সংস্থাগুলোতে সকল পর্যায়ে কর্মচারী উন্নয়নের সামগ্রিক দায়িত্বসহ নিজস্ব প্রশিক্ষণ ইউনিট থাকা উচিত। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে, ব্যবস্থাপকদের স্তর ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ে এ ধরনের আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ বিভাগ/ইন্সটিটিউটের এবং বাইরের ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমা নির্ধারিত হওয়া উচিত, যাতে একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ও দ্বৈত প্রচেষ্টা পরিহার করা যায়।

২০·৪২ ব্যবস্থাপনার কলাকৌশল ও চর্চার উন্নতি সাধনের জন্য বি এম ডি সি, আই বি এ, বি আই ডি এস এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন শিক্ষাদানকারী বিভাগ সমূহ কর্তৃক প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা উচিত।

২০·৪৩ **পল্লী প্রতিষ্ঠান সমূহ:** পল্লী উন্নয়নের কৌশল অনুসারে এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক স্থানীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের নীতি অনুসারে স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং তথ্য সরবরাহের একটি প্রক্রিয়ার বিকাশসাধন করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবধান দূরিকরণের উদ্দেশ্যে এবং পল্লী উন্নয়নে কার্যোপযোগী একটি আদর্শ (মডেল) গড়ে তোলার জন্য পল্লী প্রতিষ্ঠান খাতে বিনিয়োগসহ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হবে।

২০·৪৪ **আর্থিক প্রশাসন:** জাতীয় উন্নয়নের পরিবর্তনশীল প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে অর্থ-ব্যবস্থা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ যেমন বাজেট প্রণয়ন, হিসাব-নিরীক্ষা ও হিসাব-রক্ষণ প্রভৃতির উন্নতি সাধনের বিষয়টিকে উচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে এসব কৌশলগত এলাকার পেশাগত প্রশিক্ষণের সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী করার প্রয়োজন হবে। এই কর্মসূচী পরিচালনার নিম্নোক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ করা হবে:

(১) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর অহেতুক সংখ্যা বৃদ্ধি না করে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুসংহত করা ও তাদের সর্বাধিক ব্যবহারের উপর জোর দিতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের তুলনায় কার্যকালীন ও কার্যভুক্ত প্রশিক্ষণের উপর অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে।

(২) বর্তমান প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে পর্যাপ্ত বাস্তব সুযোগ সুবিধা ও যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন পেশাগত প্রশিক্ষক দ্বারা সুসজ্জিত করে তুলতে হবে। আর্থিক সংগঠনসমূহে প্রধান প্রধান নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান যেমন বি এম ডি সি, আই বি এ, ইনস্টিটিউট অব কস্ট এ্যান্ড মেনেজমেন্ট একাউনটেন্টস এবং ইনষ্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউনটেন্ট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে হবে।

(৩) বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে এবং স্থানীয় সংস্থাতে দক্ষতার উন্নয়নের জন্য আঞ্চলিক পর্যায়ে আর্থিক প্রশাসনে প্রশিক্ষণ দানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এসব স্তর/সংস্থা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ উন্নয়ণ তহবিল পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে। যেসব প্রতিষ্ঠান বর্তমানে পল্লী উন্নয়নে প্রশিক্ষণ দান করছে সেগুলোর প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে আর্থিক প্রশাসন এবং নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সংক্রান্ত উপাদান অধিক পরিমাণে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

২০'৪৫ আর্থিক প্রশাসন ব্যবস্থার বর্তমান কাঠামোর নিরূপণে ও ঐ ব্যবস্থা শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে পরামর্শ লাভের জন্য সমীক্ষা পরিচালনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানতঃ সরকারী আওতার বাইরে অবস্থিত প্রশিক্ষণ/গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো এক্ষেত্রে গবেষণা পরিচালনায় আর্থিক ব্যবস্থাপনার সাধারণ দিকগুলো নিয়েই ব্যস্ত থাকে। এসব ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বিষয় ও সমস্যাবলী সম্পর্কে গবেষণা কার্য পরিচালনার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

২০'৪৬ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ক্ষেত্রে উপরোল্লিখিত কর্মসূচী ছাড়াও, প্রস্তাব করা হচ্ছে যে,

(১) সরকারী হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থাকে পর্যায়ক্রমে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে এবং বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসন ও উন্নয়নের প্রয়োজনে বাজেট প্রণয়ন ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে সহজ উপযোগী করে তুলতে হবে।

(২) বর্তমান হস্তলিখিত হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার স্থলে পর্যায়ক্রমে যান্ত্রিক হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। এ ব্যবস্থার কার্যকর প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে কর্মচারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পরিসংখ্যান ব্যুরো এ ধরণের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন মিটাতে পারে।

(৩) প্রতি বছর নিয়মিতভাবে পেশাগত প্রাধান্য সহকারে হিসাব-নিরীক্ষার কাজ সম্পন্ন করতে হবে, এবং

(৪) হিসাবরক্ষণ থেকে হিসাব-নিরীক্ষাকে পৃথক করতে হবে এবং হিসাবনিরীক্ষা ও হিসাব-রক্ষণে নিয়োজিত কর্মচারীদের কর্মজীবন ব্যবস্থাপনা পৃথক ও স্বতন্ত্র থাকবে।

২০'৪৭ **আমলাতন্ত্রের সম্প্রসারণ ও অহেতুক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণঃ** স্বাধীনতার পর আমলাতন্ত্র বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। অগণিত সংখ্যক প্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠেছে এবং বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলো দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ও পদ্ধতি আমলাতন্ত্রের এই সম্প্রসারণের সংগে তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি। আমলাতন্ত্রের এই অহেতুক বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের কোন সমালোচনা-মূলক নিরীক্ষা করা হয়নি। শুধু যে নতুন নতুন পরিদপ্তর, আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তাই নয়, প্রয়োজন নিঃশেষিত হবার পরেও অনেক সংস্থাকে গুটিয়ে ফেলা হয়নি। অনেক সময় সরকারী অফিসগুলোকে চাকুরী সংস্থানের সংস্থা হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং এসব অফিসের সম্প্রসারণ যে স্বভাবতাই তাদের সেবামূলক কার্যকলাপকে উন্নততর বা ত্বরান্বিত করেছে তা নয়। এই সম্প্রসারণ কর্মকুশলতাকে প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করেছে, কারণ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা মেটানো সম্ভব হয়নি। সরকারী সংস্থাগুলোর মধ্যকার আন্তঃসংস্থা সমন্বয় এমনকি একই সংস্থার অভ্যন্তরে সমন্বয়ের অবক্ষয় ঘটেছে। অপর প্রতিকূল প্রভাবটি হচ্ছে অনুৎপাদনশীল আমলা-তন্ত্রের সম্প্রসারণে সম্পদের অপচয়।

২০.৪৮ বিদ্যমান সংস্থাগুলোর কর্মচারী কাঠামো আরও গভীরভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যাতে এবার সংস্কার স্ফীত আয়তনকে কমিয়ে আনা যায় এবং এদেরকে সুবিন্যস্ত ও পরিচালনসাধ্য করে তোলা যায়। কিছু কিছু সংস্থা গুটিয়ে ফেলার লক্ষ্যে এদের অস্তিত্ব থাকার যৌক্তিকতাকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কোন কোন সংস্থাকে একে অপরের সংগে মিলিয়ে ফেলতে হবে এবং যে সব সংস্থা সক্রিয় থাকবে তাদের কার্যাবলীকে সুবিন্যস্ত করতে হবে। নতুন সংস্থা সৃষ্টির প্রস্তাব খুবই কঠোরভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমলাতন্ত্রের আয়তনকে দৃঢ় নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনতে হবে।

আর্থিক ব্যয়-বরাদ্দ

২০.৪৯ উপরে বর্ণিত কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য এই খাতে ৩৮ কোটি টাকা (১৯৭৯/৮০ মূল্যে) বরাদ্দ করা হয়েছে। স্থির ও বর্তমান এই উভয় মূল্যে প্রধান প্রধান কর্মসূচী অনুযায়ী এই বরাদ্দের একটি বিভাজন এবং এই বরাদ্দের পর্যায়ক্রমিক বার্ষিক ব্যয়ের হিসাব যথাক্রমে সারণী ২০.৫ ও ২০.৬-এ প্রদর্শন করা হলো :

সারণী ২০.৫

প্রধান প্রধান কর্মসূচী অনুযায়ী জন-প্রশাসন খাতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

কর্মসূচী	দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বরাদ্দ	
	১৯৭৯/৮০ মূল্যে	চলতি মূল্যে
১। জন-প্রশাসন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও সুবিধাদির উন্নতি বিধান	২২.৩০	৩৩.৮০
২। সাংগঠনিক উন্নয়ন ও পদ্ধতিগত উন্নতি বিধান	৬.৬২	৯.৮০
৩। আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক গবেষণা	৮.০২	১০.০৩
৪। কর্মচারী কল্যাণ	১.০৬	১.৩৭
মোট ..	৩৮.০০	৫৫.০০

সারণী ২০.৬

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বরাদ্দের পর্যায়ক্রমিক বার্ষিক ব্যয়ের হিসাব

(কোটি টাকায়)

বৎসর	দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বরাদ্দ	
	স্থির মূল্যে	চলতি মূল্যে
১৯৮০—৮২	১১.০১	১৩.২১
১৯৮২/৮৩	৭.৪৩	১০.৩৯
১৯৮৩/৮৪	৯.০০	১৪.৪৯
১৯৮৪/৮৫	১০.৫৬	১৬.৯১
মোট ..	৩৮.০০	৫৫.০০

একবিংশ অধ্যায়

থানা উন্নয়ন

বাংলাদেশ মূলত গ্রাম ভিত্তিক ও কৃষি প্রধান দেশ, খুবই ঘন বসতিপূর্ণ এবং চরম দরিদ্র। মোট জনসংখ্যা ৯'২ কোটির মধ্যে ৮'৩ কোটি লোক বা ৯০ শতাংশ গ্রামে বাস করে। এখানে ৬৮,০০০ গ্রাম আছে এবং ভূমির উপর জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে এর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এছাড়া অনুন্নত বাস্তব অবকাঠামোর জন্য গ্রাম বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে এবং নির্ভরশীল অর্থনীতিই এর সাধারণ চরিত্র। শুধু জাতীয় অর্থনীতিতে একে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি তা নয় বরং জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন এদের এড়িয়ে গেছে যেহেতু বাংলাদেশে জাতীয় কাঠামোতে পদ্ধতিগতভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি মূলতঃ এককভাবে সরকারী সংস্থার মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গুরুত্ব আরোপ করেছে যদিও পল্লী এলাকার বসবাসকারী বিপুল জন-গোষ্ঠীর কাছে প্রবৃদ্ধিকে অর্থবহ করার জন্য ইন্সুরেন্স, কর্মসংস্থান ও পল্লী উন্নয়নকে উৎসাহিত করা হয়েছে তবুও স্থানীয় উন্নয়নে সরকারী সংস্থার অংশগ্রহণ খুবই নগণ্য। প্রকৃতঃ অতীতে উন্নয়ন কৌশল ছিল শহর ভিত্তিক, দ্বিতীয়তঃ পল্লী অঞ্চলে শক্তিশালী স্থানীয় প্রশাসনের অনুপস্থিতি। যদিও থানা নামে অভিহিত স্থানীয় প্রশাসন ইউনিট ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন তৎপরতার লক্ষ্যস্থল কিন্তু সরকারী সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বিত প্রচেষ্টার অভাবে এবং স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়নে জনগণের কার্যকর অংশ গ্রহণের অভাবে এর প্রভাব নগণ্য ছিল। এর ফলে পল্লীর জনগণ সরকারী সুযোগ-সুবিধা ও সম্পদের অংশীদারীত্ব পায়নি এবং তাদের সমস্যা আরো বেড়ে গেছে। ভূমিহীনতা ও বেকারত্ব বেড়ে গেছে এবং আয়ের বৈষম্য আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীর উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বঞ্চিত এই বিপুল জনগোষ্ঠির ক্রমবর্ধমান দুর্দশা লাঘবের জন্য পল্লী পূর্ত কর্মসূচী, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী ও খাল খননের মত পল্লী পূর্ত কাজের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এই সরকারী প্রচেষ্টার পাশে বহু সংখ্যক বেসরকারী সংস্থাও এগিয়ে আসছে। তা সত্বেও এ কর্মসূচী যেহেতু মূল উন্নয়ন স্রোতের বাইরে রয়ে যাচ্ছে এবং প্রধানতঃ মৌসুমী বেকারত্বের মত স্বল্পমেয়াদী সমস্যার প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে তাই সাধারণ মানুষ পল্লী ও শহরের বিশিষ্টদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না।

২১'২ পল্লী উন্নয়নে নীতি, কর্মসূচী ও প্রকল্পের ব্যর্থতা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে পল্লীর জীবনমান উন্নয়নে জাতীয় প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করতে প্রতিষ্ঠানিক দুর্বলতার সব চেয়ে বেশী ভূমিকা রয়েছে। যদিও খাল খনন কর্মসূচীতে স্থানীয় উৎসাহের কোন অভাব পরিলক্ষিত হয়নি তবুও স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন প্রকল্প সফল বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের সমর্থনের অভাবে ব্যাহত হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতে পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ এমনভাবে কেন্দ্রীভূত হয়েছে যে যাদের এ সুবিধা প্রাপ্য তারা প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে অথবা স্থানীয় প্রতিশ্রুতির অভাবে খোদ প্রকল্পই অপ্রয়োজনীয় প্রচেষ্টায় পর্যবসিত হয়েছে।

২১'৩ উল্লেখিত পরিস্থিতির পটভূমিতে দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে পল্লীর জনগণকে উন্নয়নের সুবিধা প্রদানের জন্য পল্লী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে পল্লীর জনগনের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন। বিচ্ছিন্ন পল্লী অর্থনীতিকে জাতীয় অর্থনীতিতে সমন্বিত করার জন্য অত্যাবশ্যকীয় গণমুখী সার্ভিসের সম্প্রসারণ ঘটানোর পাশাপাশি উৎপাদনমুখী তৎপরতা বহুমুখীকরণ, পল্লী অর্থনীতির প্রযুক্তিগত ভিত্তি উন্নতকরণ এবং পল্লী অবকাঠামোর উন্নয়ন এই পরিকল্পনায় স্থান পেয়েছে। কিন্তু বিগত পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর সাথে এর পার্থক্য হচ্ছে এসব তৎপরতার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করবে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ। সরকার যথেষ্ট আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা স্থানীয় প্রচেষ্টার সাথে যুক্ত করবেন।

সর্বনিম্ন পর্যায়ে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের একটি কাঠামো বের করার জন্য স্থানীয় উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হবে। এভাবে পল্লী খাত শুধু উন্নয়ন ব্যয়ের বৃহত্তর অংশই পাবে না বরং জেলা ও থানা পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলিকে উন্নয়ন ও শক্তিশালী করে এবং সেগুলোকে স্থানীয় সরকারে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে পল্লী কর্মসূচীর কার্যকারিতাকে নিশ্চিত করা হবে। এছাড়াও কিছু আর্থিক ক্ষমতা উপভোগ করার নিমিত্তে স্থানীয় সংস্থাসমূহ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অধীনে জাতীয় সরকারের রাজস্ব ও তহবিলের অংশ পাবে।

২১·৪ সরকার ইতিমধ্যেই থানা পর্যায়ের প্রশাসনকে পুনর্গঠন এবং একে "থানা পরিষদ" নামে স্থানীয় সংস্থার সাথে সমন্বিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই পুনর্গঠিত কাঠামোর মধ্যে প্রতিটি থানা হবে সব প্রশাসনিক তৎপরতার কেন্দ্র বিন্দু। স্থানীয় পর্যায়ে সকল উন্নয়ন তৎপরতার দায়িত্ব থানা পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। পক্ষান্তরে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বের ক্ষেত্রে পরিষদ সমন্বয় সংস্থা ও স্থানীয় পর্যায়ের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে কাজ করবে। থানাকে উন্নীত করে থানা প্রশাসনকে জোরদার করা হচ্ছে যাতে তা জাতীয় সরকারের কাছ থেকে সম্পদের সংস্থান নিয়ে স্থানীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে। থানা প্রশাসন ও থানা পরিষদের সমন্বয় সাধন সরকারী কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের স্থানীয় সমস্যা ভালভাবে অনুধাবন ও জনগণের দাবিদা উপলব্ধি এবং সেই সংগে স্থানীয় স্বার্থে উন্নয়ন তৎপরতার ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার এই বিস্তৃতি পরিকল্পিত তৎপরতার বৃহত্তর সমন্বয় এবং সেই সংগে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে গতিশীলতার আরো প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে।

২১·৫ পল্লী উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপের প্রেক্ষিতে থানা প্রশাসনকে পল্লী উন্নয়নের প্রকৃত মাধ্যম করার জন্য জোরদার করা হচ্ছে। থানা নির্বাহী অফিসার (টিএনও) নামে অভিহিত থানা প্রশাসনিক কর্মকর্তা কৃষি উপকরণ ও ক্ষুদ্র সেচ সরঞ্জাম সরবরাহ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সুবিধা প্রতিষ্ঠা, পল্লী পূর্ত কর্মসূচী ও কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ন্যায় গণমুখী কর্মসূচীর জন্য সমন্বয় কারীর ভূমিকা পালন করবেন। সরকার ইতিমধ্যেই বহু সংখ্যক থানায় ইউনিয়ন পর্যায়ের স্থানীয় সরকারকে থানা পরিষদের সাথে সমন্বিত করেছেন। থানা নির্বাহী অফিসার থানা পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যানের স্টাফ অফিসার হিসাবে কাজ করবেন। তিনি হবেন থানা পরিষদের প্রধান নির্বাহী অফিসার ও থানা পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে দায়ী থাকবেন এবং থানা পরিষদের নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সহায়তা করবেন। থানা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত থানা নির্বাহী অফিসার থানা পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন।

২১·৬ থানা পরিষদে স্থানান্তরিত বিষয়সমূহের দায়িত্বে নিযুক্ত অফিসারদের চাকরী থানা পরিষদের হাতে ন্যস্ত বলে গণ্য হবে এবং তাদেরকে সংশ্লিষ্ট থানা পরিষদে জবাবদিহী করতে হবে। অবশ্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলি এসব অফিসারের মনোনয়ন, বদলী, পদোন্নতি, শৃংখলা ও বেতনের জন্য দায়ী থাকবে। সরকারী বিষয়গুলির দায়িত্বে নিযুক্ত অফিসারদের থানা পরিষদের কাছে জবাবদিহী করতে হবে। এই সব অফিসারদের তাদের কাজের রিপোর্ট পেশ বা শুনানীর জন্য তলব করার ক্ষমতা থানা পরিষদের থাকবে। থানা পরিষদ তাদের কার্যালয় পরিদর্শন এবং তাদের দায়িত্ব পালনে কোন গাফিলতি দেখলে তা সরকারকে রিপোর্ট করতে পারবে। থানার সুষ্ঠুভাবে কাজ করার জন্য থানা পরিষদ এসব অফিসারকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে।

২১·৭ পল্লী উন্নয়ন ও জনগণের অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপের ফলে প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ার উল্লেখিতভাবে থানা পর্যায়ে প্রশাসন পুনর্গঠনকে নিশ্চিত করেছে। পর্যায়ক্রমে পুনর্গঠিত প্রশাসনিক কাঠামো চালু করা হচ্ছে। ৪৯৩টি

থানার মধ্যে ৪০৭টিকে পল্লী এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, এর মধ্যে ২১২টি থানাকে ইতিমধ্যে উন্নীত করা হয়েছে এবং বাকী ১৯৫টি থানা ১৯৮৩ সালের নভেম্বরের মধ্যে চার পর্যায়ে উন্নীত করা হবে। প্রতিটি থানার এলাকা গড়পড়তা ১১৩ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ১৯০ হাজার। থানা পরিষদকে থানা উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে এর উন্নয়ন তৎপরতা কার্যকরভাবে সংগঠিত করার কাজে সহায়তা করার জন্য গত আদমশুমারীর (১৯৮১) ভিত্তিতে থানার নকশা প্রণয়ন করা হবে এবং অব্যাহত প্রক্রিয়ার তাতে সর্বশেষ তথ্য ভিত্তিক করা হবে। আগামী বছর কৃষি শুমারীর সমাপ্তিতে থানার আরো ভালো চিত্র পাওয়া যাবে।

২১·৮ এ ছাড়া স্থানীয়/আঞ্চলিক পর্যায়ে উন্নয়ন তৎপরতার দায়িত্ব বহনের জন্য বর্তমান স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলিকে জোরদার করা হবে এবং নতুন প্রতিষ্ঠান গঠন করা হবে। এই উদ্দেশ্যে স্থানীয়/আঞ্চলিক পরিকল্পনা ও মনিটরিং সেল গঠন করা হবে। স্থানীয় সরকারের সংস্থাগুলোকে পুনর্গঠিত করা হবে যাতে তারা দক্ষতারসাথে উন্নয়নের কাজ করতে পারে। স্থানীয়/আঞ্চলিক সেলে অর্থ ও পরিকল্পনা অফিসারসহ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পরিকল্পনাকারী ও প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার নিয়োগ করা হবে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগনের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করতে স্থানীয় পর্যায়ের স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বাবলম্বনের মনোভাব গড়ে তোলার জন্য উৎসাহিত করা হবে। অনুরূপ প্রতিষ্ঠানগুলি স্বেচ্ছাশ্রমীদের উপযুক্তভাবে পল্লী জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহারের মাধ্যম হিসাবে কাজ করবে; শুধু উৎপাদনই নয় সমাজ উন্নয়নেও।

২১·৯ থানা পরিষদকে তহবিল প্রদানের প্রধান প্রধান নীতিমালা হবে:

(১) বিভিন্ন কর্মসূচীর ধরন ও কর্মসূচী ভিত্তিক বরাদ্দের কথা স্মরণ করে উন্নীত থানায় সরাসরি বরাদ্দের জন্য তহবিলের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এখানে শুধুমাত্র আর্থিক ও পরিকল্পনার কাজ অর্পণের পরিবর্তে সরাসরি স্থানান্তরের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

(২) স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বর্তমান পর্যায়ের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাসহ থানাগুলি পল্লীপূর্ত কর্মসূচী, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, শীতকালীন নিবিড় চাষাবাদ কর্মসূচী, থানা মৎস্য চাষ ইত্যাদির মত জাতীয় প্রকল্পগুলি ব্যবস্থাপনা করতে সক্ষম। বর্তমানে জাতীয় সরকার কর্তৃক বাস্তবায়নকারী অনুরূপ প্রকল্পগুলির দায়িত্ব থানা পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা যেতে পারে।

(৩) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলি তাদের আওতাধীন নির্দিষ্ট প্রকল্পগুলি এমনভাবে অনুমোদন করবে যাতে সহজেই তা উন্নীত থানাগুলির কাছে হস্তান্তর করা যায়। ১৯৮৩/৮৪ সাল নাগাদ কয়েকটি জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য থানায় স্থানান্তর করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন, পল্লী পানি সরবরাহ ও স্যানিটারী সুবিধা, এতিমখানার সাহায্য ইত্যাদি জাতীয় প্রকল্পগুলি থানা পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক বরাদ্দ ও প্রকল্প কর্মচারীসহ থানায় স্থানান্তর করা হবে।

(৪) চলতি ব্যয় ও উন্নয়নের জন্য থানা পরিষদের তহবিল প্রয়োজন। কালক্রমে চলতি খাতের দাবী বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে কারণ তাদেরকে বেশী কর্মচারীর বেতন দিতে হবে ও আরো সুযোগ-সুবিধা রাখতে হবে। থানা পরিষদের তহবিল আসবে নিম্ন-লিখিত চারটি সূত্র থেকে:

(ক) থানা পরিষদের ধার্য কর (ট্যাক্স), রেট (খাজনা), তোলা (টোল) এবং ফি;

(খ) বিনোদন ট্যাক্স, ভূমি উন্নয়ন কর, ভূমি হস্তান্তর ফি ইত্যাদি কতিপয় জাতীয় সরকারের রাজস্বের আনুপাতিক অংশ;

(গ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে (এডিপি) একবালীন বরাদ্দ; এবং

(ঘ) নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য নির্দিষ্ট বরাদ্দ যা জাতীয় সংসদের নিকট হতে থানা পরিষদে স্থানান্তরিত বলে গণ্য হবে।

২১.১০ রাজস্ব ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রধানতঃ (ক) ও (খ) সূত্র থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব ব্যবহার করা হবে। এই সূত্র গুলোর বাড়তি অংশ উন্নয়ন তৎপরতায় ব্যয় করা হবে।

২১.১১ এটা স্বীকৃত যে দক্ষতার সাথে কাজ করতে হলে থানা পরিষদের কিছু বাস্তব সুবিধা থাকা দরকার। তাদের প্রশাসনিক ভবন, কিছু রাস্তা বা দেশের বাকী অংশের সাথে যোগাযোগের জন্য মাধ্যম এবং সার্ভিস থাকা উচিত যা সুপ্ত গ্রামগুলিকে জীবনের কোলাহলে নিয়ে আসার জন্য জনগনকে উদ্দীপ্ত করবে। এই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় থানা উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে এবং ৪২৫ কোটি টাকা (বর্তমান মূল্য অনুযায়ী) বরাদ্দ করা হয়েছে। এটা স্বীকৃত যে মিনি-সরকারের কেন্দ্র হিসাবে থানার এই রূপান্তরে বর্তমান ব্যয়ের পরিধি কিছুটা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু উন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে লক্ষ্যে উন্নতির ফলে এর পুরোপুরি ক্ষতিপূরণ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। আরও ধারণা করা হচ্ছে যে কালক্রমে থানা পর্যায়ে সরকারের উত্তরণ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসন হ্রাস নিশ্চিত করবে।

থাসনবু-৮৩/৮৪-৩৩৪৬ই—১,০০০—১১-২-৮৫ইং